রামধনু

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিক-পত্রিকা

চতুর্থ বর্ষ

মাঘ ১৩৩৭—পৌষ ১৩৩৮

সম্পাদক

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য এম্‌. এ, বি-এল্‌

রামধনু কার্য্যালয়

১৬ নং টাউনসেণ্ড্‌ রোড্‌, ভবানীপুর,

কলিকাতা

পৃষ্ঠা
৪৫৮
১২৪
৫০২
১৮৪
২৪৭
২৮৬
...
৪৩৬
১৯৭
৪৫৪
২৯৫
৩৩২
৪৬৩
৪৫
৫৭১
৫২
৫৯৩
২৭২
১৫
৪৬৮
৪৩
৫৪০
৪২
৫১
২৭৬
১২০
২৯৬
৫৫৭
...
২৪৯
১৬৭
৩৯১
৬২১

রামধনু (মাঘ ১৩৩৭—পৌষ ১৩৩৮)

বিষয়-সূচী

বর্ণানুক্রমিক

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অগ্নি কাণ্ড (কবিতা) ...	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্, এ ...	৪৪৪
অবাক্ (কবিতা) ...	শ্রীঅনিলকুমার সরকার ...	৮৮
অমাবস্যার রাতে (গল্প) ...	শ্রীসুবিনয় রায় ...	২৩৫
আকাশ পথের রাজা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	২১৩
আমার ঘর (কবিতা) ...	শ্রীরামরতি চক্রবর্ত্তী ...	৩৫৪
আলোক স্তম্ভের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	৪৩২
আশায় (কবিতা) ...	শ্রীসন্তোষ বন্দোপাধ্যায় ...	৩০২
উটপাখী (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৩৭৪
উঁচু জিনিষ (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	৭২
এ দেশের মহা পণ্ডিত (জীবনী) ...	... ...	২৩০
এনাকোণ্ডা সাপ (সচিত্র প্রবন্ধ ...	শ্রীহেমলতা দেবী ...	১৯৩
কলের মানুষ (বিজ্ঞানের কথা) ...	শ্রীসুবিনয় রায় ...	৪৯৬
কলোসিয়াম্ (ইতিহাসের গল্প) ...	শ্রীচারুলতা দেবী ...	৫৮৯
কল্পনা সাথী (কবিতা) ...	শ্রীভবেশানন্দ চক্রবর্ত্তী ...	১৯৭
কষ্টি-পাথর (ধারাবাহিক গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	...
...	৯৩, ১৪৪, ১৯৮, [illegible]৮৭, ৩৪৬, ৪০১, ৪৫৪, ৫১৩, ৫৫৯, ৬১১	
কয়েকটি অদ্ভুত মাছ (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৪২৪
কাগজের জন্ম-কথা (বিজ্ঞানের কথা)	... ঐ ...	৫৭২
কাজের আরাম (কবিতা) ...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৪৮৫
কালাপাণির অতলে (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৩৬১
কাশ্মীরী রহস্য (গল্প) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৫২৭
কাঁটা (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৫৮[illegible]
কি ভালো লাগে বল্ (কবিতা) ...	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী ...	২৯৮
কুম্ভকর্ণের জাত ভাই (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৪৮১
কোম্পানী কি কলই বানিয়েছে (গল্প)	... ...	১৩৯
কোল জাতির কথা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্ ...	৫১০
ক্যাবলার কাণ্ড (গল্প) ...	শ্রীনরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৫৯
খোদার উপর খোদকারী (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	১৬৩
গন্ধুর কাণ্ড (কবিতা) ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ, ...	৫[illegible]

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
গুণ্ডা (গল্প) ...	শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য ...	৪৫৮
গুবরে-গঙ্গা-সংবাদ (কবিতা) ...	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	১২৪
গ্রহের ফের (গল্প) ...	শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্ ...	৫০২
গ্রাম (কবিতা) ...	শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ...	১৮৪
ঘুমপাড়ানী গান (গান) ...	শ্রীঅখিল নিয়োগী ...	২৪৭
খুড়ীর শক্তি (সচিত্র) ...	... ...	২৮৬
ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি (ধারাবাহিক গল্প	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্ এ, বি-এল্ ...	...
...	১৮, ৭৯, ১০৮, ১৮৬ ২৬৬, ৩৯৫, ৪৩৬	
চায়ের স্তুতিগান (গান) ...	শ্রীঅরুণা দেবী ...	১৯৭
চিত্রকৌতুক (সচিত্র) ...	... ...	৪৫৪
চোরধরা (কবিতা) ...	শ্রীহেমলতা দেবী ...	২৯৫
চোরের উপদ্রব (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীসুবিনয় রায় ...	৩৩২
ছবির কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীচিত্রগুপ্ত ...	৪৬৩
ছাত্র-চরিত (চিত্র) ...	শ্রীঅজয়কুমার সরকার ...	৪৫
ছেলে ভুলানো ছড়া (কবিতা) ...	শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত ...	৫৭১
ছোটখাট ব্যাপার (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৫২
ছোট ছেলে (গল্প) ...	শ্রীরসোদর শর্ম্মা ...	৫৯৩
জন্তু জানোয়ারের ভালবাসা (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	২৭২
জানোয়ার-চরিত (সচিত্র প্রবন্ধ)	... ...	১৫
জান্তাম যদি একটু গ্রামার (কবিতা)	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি ...	৪৬৮
ঝরণা (কবিতা) ...	শ্রীজ্যোৎস্না দেবী ...	৪৩
টেলিফোনের আবিষ্কার (বিজ্ঞানের গল্প)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৫৪০
ঠি[illegible]বিতা) ...	... ...	৪২
ডা[illegible]বিতা) ...	শ্রীমুরারিমোহন সেন, বি-এ ...	৫১
ডাঃ[illegible]রর ডায়েরী (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ...	২৭৬
ঢুঢু[illegible]হিনী (গল্প) ...	শ্রীমাঠব্য ...	১২০
তোরা [illegible]বি যদি আয় (কবিতা)	শ্রীচাঁদ মল ...	২৯৬
ত্যাগ (গল্প) ...	শ্রীগুরুগৌরব রায় ...	৫৫৭
দর্প-চূর্ণ (গল্প) ...	শ্রীসুধেন্দুপ্রকাশ সোম চৌধুরী ও ...	...
... ...	শ্রীদুর্গাপদ ঘোষ ...	২৪৯
দুলাল (গল্প) ...	শ্রীযতীন সাহা ...	১৬৭
ধাঁধার উত্তর ...	... ৪৯, ১০০, ১৫১, ২০৩, ২৫৪, ৩৯১	
... ...	... ৩৫৮, ৪০৯, ৪৬০, ৫১০, ৫৭০, ৬২১	

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ধূমকেতু (বিজ্ঞানের কথা) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৮
নদীর কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্ ...	৫৫৩
নববর্ষে (কবিতা) ...	শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য ...	১৯৫
নানা দেশের বাড়ী ঘর (সচিত্র প্রবন্ধ)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	১১৬
নারিকেল (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীমনোরমা দেবী ...	৫৯৯
নীল পাখী (গল্প) ...	শ্রীযতীন সাহা ...	৬৮
নূতন ধাঁধা ...	...	৫০, ১০০, ১৫২, ২০৪ ২৫৫, ৩০৬
... ...	...	৩৫৭, ৪১০, ৪৬০, ৫১৮, ৫৭০, ৬২
নূতন বরষ এল নূতন রূপে (কবিতা)	শ্রীবিকাশ দত্ত ...	১৫৩
নূনের কথা (বিজ্ঞানের কথা)...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	১৭৩
ন্যায়ের সিংহাসন (গল্প) ...	শ্রীপুষ্পলতা গোস্বামী ...	৫৪৯
পাখীর গান (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৪৬১
পার্ব্বণী চাঁদ (কবিতা) ...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	১৪
পিস্তলের গুলি (গল্প) ...	শ্রীসুবিনয় রায় ...	২২৭
পুরস্কার প্রতিযোগিতা ...	... ...	৫১৯
পুস্তক-পরিচয় (সমালোচনা) ...	শ্রীন——	৪১০
ফুলের পরী (গল্প) ...	অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীল চন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস্)	৭৬
বত্তিনাথের বিয়ে (গল্প) ...	শ্রীধীরেন্দ্র রায় ...	৪৪৫
বরষা আগমনে (কবিতা) ...	শ্রীবীণা দেবী ...	৩০১
বহবঃ সন্তি শশকাঃ (গল্প) ...	শ্রীমাঠব্য ...	২৫৮
বড় (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি এ ...	৩০৭
বাঘের বাচ্চা (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	৪৮৬
বাদশাই স্বপ্ন (গল্প) ...	শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ ...	[illegible]
বাদশাহ ও তাঁর ভৃত্য (গল্প)...	কাদের নওয়াজ বি-এ, ...	[illegible]
বারবেলা (গল্প) ...	শ্রীসুবিনয় রায়, ...	[illegible]
বাঁশীর সুর (কবিতা) ...	শ্রীঅনিলকুমার সরকার ...	[illegible]
বিধাতার দান (কবিতা) ...	শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র ...	২৫৭
বিপদ্ বরণ (কবিতা) ...	শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৪৫৭
বিবিধ ...	... ...	২৯৭
বিলাতী ডাক (ভ্রমণ-কাহিনী) ...	শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল, বি-এ	৬৪, ১০২, ২০৭
বিশ্রী (কবিতা) ...	শ্রীমুরারিমোহন সেন, বি-এ ...	২০৫
বীর-চরিত (ইতিহাসের গল্প)...	... ...	৫২২
বেজায় সৌখীন (গল্প) ...	শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্ ...	৩৩৬

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
বৈজ্ঞানিক বরযাত্রী সম্বর্দ্ধনা (গল্প)	অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্ এ, ডি-লিট্ (প্যারিস্)	৩৫
ক্রু—উ—উ—স্ (কবিতা) ...	শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম-এ, বি-টি ...	৫৩৭
ভানুমতীর বাঘ (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৬০৩
ভালবাসা (কবিতা) ...	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী ...	১৪১
ভালবাসি (কবিতা) ...	শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী ...	১৪০
ভূতুড়ে পাহাড় (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	৩১৩
ভূমিকম্প (বিজ্ঞানের কথা) ...	শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ...	৩৪২
ভোরের সাথী (কবিতা) ...	শ্রীবিজনকুমার জোয়ার্দ্দার ...	৫৫১
মঞ্জুলিকার পণ (গল্প) ...	শ্রীরসোদর শর্ম্মা ...	৩০
মহাত্মা (সচিত্র) ...	...	৪৫৬
মা (কবিতা) ...	কাদের নওয়াজ ...	৫০৯
মাছির কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীননীগোপাল মজুমদার ...	১৩৪
মানহানির মামলা (গল্প) ...	শ্রীপুষ্পলতা গোস্বামী ...	৯১
মায়ের শাস্তি (কবিতা) ...	শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী ...	৫৫১
মুক্তা-চরিত (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	২৬১
মেডেল-বিভ্রাট (গল্প) ...	... ...	১৭৮
মেরুর আলো (বিজ্ঞানের কথা)	শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি ...	৩০৮
যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর (গল্প)	শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৫৪৬
রঙ্গকণা (রঙ্গ) ...	শ্রীপুষ্পলতা গোস্বামী ...	৪৪
„ ...	শ্রীউমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৪
„ ...	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাহা ...	৪৪
„ ...	শ্রীদেবকীনন্দন অধিকারী ...	৪৪
„ ...	শ্রীপুষ্প বসু ও শ্রীদেবকুমার বসু ...	৪৫
„ ...	শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত ...	১৬৬
„ ...	শ্রীদেবকীনন্দন অধিকারী ...	২৫১
„ ...	শ্রীপুষ্পলতা গোস্বামী ...	৪৬৭
„ ...	শ্রীঅনিলকুমার সরকার ...	৫৪৫
রজব মিয়া (কবিতা) ...	কাদের নওয়াজ ...	৩৮৫
রং তামাসা (রঙ্গ) ...	শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু ...	৪৮৪
রাজকুমারী (গল্প) ...	শ্রীযতীন সাহা ...	৩৮৭
রাজপুত-মহিমা (কবিতা) ...	শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ, কবিশেখর ...	১০১
রামধনু (কবিতা) ...	শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৩৫৩
রামধনু „ ...	শ্রীশ্রীগোপাল মিত্র ...	৪০৮

বিষয়
অগ্নি কাণ্ড
অবাক্ (
অমাবস্যার
আকাশ
আমার ঘ
আলোক
আশায় (
উটপাখী
উঁচু জমি
এ দেশের
এনাৎকাণ্ড
কলের মা
কলোসিয়া
কল্পনা সা
কষ্টি-পাথর
কয়েকটি
কাগজের
কাজের
কালাপা
কাশ্মীরী
কাঁটা
কি ভাল
কুম্ভকর্ণের
কোম্পানি
কোল জা
ক্যাবলা
খোদার
গল্পর কা

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
রামধনুকের দেশে (কবিতা)...	শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী ...	১৯৬
রামধনুকের ভেলা ,, ...	শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত ...	৮৬
রামধনুর বাণী ,, ...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্ ...	১
রামসুক তেওয়ারী ,, ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৩৭২
রামের ধনু ,, ...	শ্রীসুনির্ম্মল বসু ...	৩৫৯
রায় বেঁশে দল ,, ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ ...	৪১১
লঙ্কা-কাণ্ড (গল্প) ...	... ...	৫৭৮
লাইট্ হাউসে (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ...	৪৭২
শয়তানের দ্বীপ ,, ...	ঐ ...	২১৭
শিল্পী রামকুমার (সচিত্র) ...	... ...	৪০০
সত্যের অভিযান (গল্প) ...	শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য ...	১৫৫
সন্দেশ ...	৪৭, ৯৮ ১৪৯, ২০২, ২৫২, ৩০৩, ৩৫৬, ৪০৬, ৫১৭, ৫৬৭	৬১৯
সবই ভুল (কবিতা) ...	শ্রীমাঠব্য ...	২৩৯
সান্ত্বনা ,, ...	শ্রীশ্রীগোপাল মিত্র ...	৮৯
সাবধানতা (রঙ্গ) ...	শ্রীকীর্ত্তীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৫৪৮
সাঁঝের মায়া (কবিতা) ...	শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হালদার ...	৩০০
সীতারাম সীতারাম (গল্প) ...	অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্ ...	৪১২
সুখ দুঃখ (কবিতা) ...	শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ ...	৫২১
সূর্য্য ঠাকুরের মণি (পৌরাণিক গল্প)	শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্...	২৪১
হানিবল (ইতিহাসের গল্প) ...	ঐ ...	২৪
হাস্য-কৌতুক (রঙ্গ) ..	শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত ...	৩০২
হ্রদের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) ...	শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্ ...	৩৮৮

রামধনু—

রাখাল

বঙ্গলক্ষ্মীর সৌজন্যে]

বিষয়

অগ্নি কাণ্ড
অবাক্ (ব
অমাবস্যার
আকাশ প
আমার ঘর
আলোক
আশায় (
উটপাখী (
উঁচু জিনি
এ দেশের
এনাকোণ্ড
কলের মা
কলোসিয়া
কল্পনা সাং
কষ্টি-পাথর

কয়েকটি
কাগজের
কাজের ত
কালাপা
কাশ্মীরী
কাঁটা , ক
কি ভালে
কুম্ভকর্ণের
কোম্পানী
কোল জা
ক্যাবলার
খোদার উ
গজুর কা

বিষয়		লেখকের নাম		পৃষ্ঠা
রামধনুকের দেশে (কবিতা) …		শ্রীনীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী	…	১৯৬
রামধনুকের ভেলা ,, …		শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত	…	৮৬
রামধনুর বাণী ,, …		শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্	…	১
রামসুক তেওয়ারী ,, …		শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	…	৩৭২
রামের ধনু ,, …		শ্রীসুনির্ম্মল বসু	…	৩৫৯
রায় বেঁশে দল ,, …		শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ	…	৪১১
লঙ্কা-কাণ্ড (গল্প) …		…	…	৫৭৮
লাইট্ হাউসে (গল্প) …		শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	…	৪৭২
শয়তানের দ্বীপ ,, …		ঐ	…	২১৭
শিল্পী রামকুমার (সচিত্র) …		…	…	৪০০
সত্যের অভিযান (গল্প) …		শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য	…	১৫৫
সন্দেশ …		৪৭, ৯৮ ১৪৯, ২০২, ২৫২, ৩০৩, ৩৫৬, ৪০৬, ৫১৭, ৫৬৭		৬১৯
সবই ভুল (কবিতা) …		শ্রীমাঠব্য	…	২৩৯
সান্ত্বনা ,, …		শ্রীশ্রীগোপাল মিত্র	…	৮৯
সাবধানতা (রঙ্গ) …		শ্রীকীর্ত্তীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	…	৫৪৮
সাঁঝের মায়া (কবিতা) …		শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হালদার	…	৩০০
সীতারাম সীতারাম (গল্প) …	অধ্যাপক	শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্	…	৪১২
সুখ দুঃখ (কবিতা) …		শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ	…	৫২১
সূর্য্য ঠাকুরের মণি (পৌরাণিক গল্প)		শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্	…	২৪১
হানিবল (ইতিহাসের গল্প) …		ঐ	…	২৪
হাস্য-কৌতুক (রঙ্গ) …		শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত	…	৩০২
হ্রদের কথা (সচিত্র প্রবন্ধ) …		শ্রীরমেশ চন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্	…	৩৮৮

রাখাল

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

অগ্নি
অবা
অমা
আক
আমা
আলে
আশা
উটপা
উঁচু
এ দে
এনা
কলের
কলো
কল্পনা
কষ্টি-

কয়েক
কাগ
কাজে
কালা
কাশ্মী
কাঁটা
কি ভ
কুম্ভক
কোম্প
কোল
ক্যাবং
খোদা
গন্থর

৪র্থ বর্ষ } মাঘ, ১৩৩৭ { ১ম সংখ্যা

রামধনুর বাণী

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার)

তিনটি বছর তোমা সবে আনন্দেতে মাতিয়ে,
নমি আমি বিশ্বনাথে, চার বছরে পা দিয়ে।
মাথায় নিয়ে শিশুগণের শিক্ষাদানের দায়িত্ব—
আমার গায়ের সাতটি রংএ রঞ্জিয়াছি সাহিত্য।
বিদ্যালাভে হওগো সবে ছোট ছোট তপস্বী ;
সাধু কাজে ধরার মাঝে হওগো সবে যশস্বী।
নেয়ে ধেয়ে শুভদিনে পুণ্য জ্ঞানের নির্ঝরে—
শক্তি পাবে প্রাণে আর ভক্তি হবে ঈশ্বরে।

তোমা সবে ক'র্‌ব সেবা আবার নূতন বৎসরে ;
সুস্থ দেহে, গেহে গেহে বেড়ে ওঠ বৎস,রে।

বারবেলা

(শ্রীসুবিনয় রায়)

বড়দিনের ছুটি ; পরীক্ষাও হয়ে গেছে ; স্কুল খুল্‌লে প্রমোশন হবে। এ কয়দিন কোন ভাবনা-চিন্তা নাই, পড়াশুনাও নাই ; কাজেকাজেই দুপুরে একটু বিশ্রাম করার ইচ্ছা হয়। সেদিন বিকালে হুঁকোটোলার ময়দানে মেলা দেখ্‌তে যাবার কথা ; তারপর সন্ধ্যা ৬টায় ইস্কুলের বন্ধু নীলমাধব তপাদারের কাকার বাড়ীতে বায়োস্কোপ আর ম্যাজিক দেখার আর রাত্রে সেখানে ভোজের নেমন্তন্ন। নীলমাধবের কাকা প্রভঞ্জন তপাদার সিঙ্গাপুরে ডাক্তারী করেন ; বিস্তর টাকা। তাঁর একটি খান্‌সামা আছে, সে নাকি ফরাসী দেশে থেকে রান্না শিখেছে—তা'কে নাকি তিনি পঁচাত্তর টাকা মাইনে দেন্। প্রভঞ্জন বাবুর খাওয়াবার সখটাও খুব। কাজেই রাত্রে ভোজের ব্যাপার যে ভাল রকম হবে সেটা বলাই বাহুল্য।

প্রভঞ্জন বাবুর ছেলে নিরঞ্জনের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল ; তাই সেদিন সে আমার মামার বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে বল্‌ল, "দয়া করে পাশের বাড়ী থেকে ভ্যাব্‌লাকে ডেকে দিন্ না।" (ভ্যাব্‌লা আমার ডাক নাম)। আমি টেলিফোন ধর্‌তেই সে বল্‌ল, "পরশু রাত্রে আমাদের বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন রইল—আস্‌তে হবে কিন্তু ভাই। আর, সন্ধ্যা ৬টায় বায়োস্কোপ আর ম্যাজিক হবে ; তা'তেও তোমার নেমন্তন্ন। আমাদের টেলিফোনের নম্বরটা টুকে নাও। যদি আসতে পার তো ৫॥০ টায় ফোন্ ক'রো, মোটর পাঠিয়ে দেবো।" আমি "আচ্ছা" ব'লে তা'র টেলিফোন নম্বরটা জিজ্ঞাসা ক'রে দেওয়ালে লিখে রেখে দিলাম ;—পাছে হারিয়ে ফেলি।

কখন সেই 'পরশু' আস্‌বে তাই শুধু ভাব্‌ছি। সেদিন বিকালে মেলা দেখে প্রভঞ্জন বাবুর বাড়ী যাব ঠিক ক'রেছি। তাঁরা থাকেন সহরের অন্য

মাথায় ; কাজেই তাঁদের মোটরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই ; আমি বাড়ীও চিনি না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে সবে-মাত্র একটু বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছি—মতলবটা, এক্‌চোট ঘুমিয়ে নিই—এমন সময় কে যেন ডাক দিল "ভ্যাব্‌লা!" মনে কর্‌লাম নিরঞ্জন, তাই ছুটে নীচে গেলাম। গিয়ে দেখি আমাদের ক্লাশের নরেশটা দাঁত বের করে হাস্‌ছে। তখন যা' রাগটা হ'লো!—ঘুমটা একেবারেই মাটি ক'রে দিল!

আমাকে দেখেই নরেশ বল্‌ল, "আজ হুঁকোটোলার মেলায় যাবি নাকি ভাই? চল্ না, আমিও যাব।" আমি বল্‌লাম, "খেয়ে দেয়ে আর কাজ নাই ; এই দুপুর রোদে মেলায় যাব কোন্ দুঃখে? তা'ছাড়া, বেলা ৩টা পর্য্যন্ত 'বারবেলা', 'যাত্রা নাস্তি' পঞ্জিকায় লিখেছে। তিনটের আগে কিছুতেই আমি বেরুচ্ছি না। শেষটায় রাত্রের বায়োস্কোপ, ম্যাজিক, দারুণ ভোজ, সবই মাটি হোক্ আর কি! মেলা দেখ্‌তে বড় জোর একটি ঘণ্টা ; যেতে-আস্‌তে আধ ঘণ্টা।"

নরেশ বেচারা আর করে কি? সে আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে চল্‌ল। আমি তা'কে ডেকে বল্‌লাম, "যাস্ না ভাই ; আয় ততক্ষণ একটু গল্প করি ; পৌনে তিনটার সময় বেরোবার ব্যবস্থা করা যাবে—কি বলিস্ ভাই?"

আড়াইটা পর্য্যন্ত তো গল্প করা গেল ; তারপর, হঠাৎ আমার মনে হ'লো, নিরঞ্জনরা তো বেজায় সাহেব ; তাদের বাড়ীতে সাহেবী পোষাক প'রে যাওয়াই ভাল। তখনই চট্ ক'রে উঠে, বাক্স থেকে কোট, প্যাণ্ট, টাই, সার্ট বের ক'রে নিয়ে পর্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। তিনটের আগেই পূরো-দস্তুর সাহেব সেজে, টুপি মাথায় দিয়ে মেলার পথে রওয়ানা হ'য়ে পড়্‌লাম। নরেশকে দেখে মনে হ'লো আমার সঙ্গে যেতে যেন তার লজ্জা হচ্ছে।

মেলায় পৌঁছে দেখ্‌লাম খুব ভিড় জমেছে। সব চেয়ে বেশী ভিড় জমেছে একটা গোলক ধাঁধার সাম্‌নে। সেখানে মস্ত বড় সাইন্-বোর্ডে লেখা রয়েছে—

"প্রোফেসার গোলকচাঁদের গোলক ধাঁধা
বিংশ-শতাব্দীর অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দশ মিনিটের মধ্যে বাহিরে আসিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ ২৫৲ টাকা পুরস্কার। প্রবেশিকা মাত্র ৵০ আনা।”

এক পাশে দেখ্‌লাম, কতগুলো লোক একটা পোলের উপর দাঁড়িয়ে গোলকধাঁধার একটা জানালার দিকে চেয়ে হাসাহাসি কর্‌ছে আর ভিতরের লোকদের ঠাট্টা ক'রে হাততালি দিচ্ছে। নরেশ যাচ্ছিল সেদিকে দেখ্‌তে; আমি তা'কে ধমক্ দিয়ে বল্‌লাম, “দেখ্‌বার আর জিনিষ পাওনি! বেচারারা ফাঁপরে পড়েছে; তাই নিয়ে আবার ঠাট্টা;—ছিঃ—!”

নরেশ বল্‌ল, “তবে চল এখান থেকে; অন্য তামাসা দেখি গিয়ে; পাঁচটা তো বাজে প্রায়।” আমি বল্‌লাম, “নাঃ! পঁচিশটে টাকা ছাড়া যায় না। দশ মিনিট ছেড়ে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ব। গোলক ধাঁধার পথ বের কর্‌তে আমি ওস্তাদ।”—এ কথা ব'লেই আমি গোলোক ধাঁধার ফটকে ৵০ আনা দিয়ে ঢুকে পড়্‌লাম; নরেশ বাইরেই রয়ে গেল।

প্রথমেই একটা ছোট কাম্‌রা; তার মধ্যে খুব উজ্জ্বল আলো; তারপর গোলক-ধাঁধার ভিতরের রাস্তা। কাম্‌রায় একটা ঘড়ি রয়েছে, আর একটা খাতায় নাম লেখা হচ্ছে। আমি আমার নামটি খাতায় লিখ্‌লাম আর অম্‌নি কাম্‌রার মধ্যের একটি ভদ্র-লোক বল্‌লেন, “পাঁচটা বাজ্‌তে পাঁচ মিনিট দশ সেকেণ্ড—যান্, ঢুকে পড়ুন।” আমিও ঢুক্‌লাম, ভদ্রলোকটিও সময়টা টুকে নিলেন। ঠিক ঢুক্‌বার মুখেই একটি মোটা ভদ্রলোক ঘেমে ঝুল হয়ে বেরিয়ে এলেন, আর কাম্‌রার ভদ্রলোকটি তাঁকে দেখে বল্‌লেন, “আদিত্যনাথ চক্রবর্ত্তী?—আপনার এক ঘণ্টা সাত মিনিট লেগেছে।” আমি ভাব্‌লাম, যেমন মোটা লোক, বুদ্ধিও তেম্নি মোটা;—না হ'লে কি আর এক ঘণ্টা সাত মিনিট লাগে?

গোলক ধাঁধার পথটি অন্ধকার; চোখে অতি কমই দেখা যায়। আমিও খুবই সাবধানে চল্‌লাম। খানিকটা গিয়ে বাধা পেলাম, আবার ফির্‌লাম, অন্য পথে গেলাম, আবার খানিকটা গিয়ে বাধা পেলাম, আবার একটু ফিরে একটা চৌমাথায় এলাম। যাঁহাতক আসা, অম্‌নি মাথার উপর দপ্ ক'রে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক লাইট্ জ্বলে উঠ্‌ল, আর আমার চোখ একেবারে ঝল্‌সে গেল। অনেক কষ্টে সাম্‌লে নিয়ে চল্‌তে

লাগ্‌লাম—আবার একটা চৌমাথায় এসে ঐ রকম ঘট্‌ল। এই রকম ৩।৪ বার ঘটার পর আমার মনে হ'লো গোলক ধাঁধার প্রায় মাঝামাঝি এসেছি। ইতি মধ্যে একবার মনে হ'লো, যেন সেই জানালাটার পাশ দিয়ে চ'লে গেলাম, পোলের ওপর থেকে যেটার দিকে লোকেরা দেখ্‌ছিল আর হাত-তালি দিচ্ছিল। তখন আর ও সব দেখ্‌বার সময় ছিল না—আমি কেবল মাঝখানে যাবার জন্য ব্যস্ত।

খানিক বাদেই টের পেলাম একটা বড় কাম্‌রায় এসে পৌঁছে গেছি—সেটাই গোলক ধাঁধার মাঝখান। কাম্‌রার মাঝখানে একটা তক্তার উপর বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—

“এম্‌নি সংসার পথ ধাঁধার ভ্রমণ,
যে পায় প্রকৃত পথ সেই বিচক্ষণ।”

সেখানে একটি লোক বসে ছিল, সে আমার নাম জিজ্ঞাসা কর্‌ল। আমি নাম বল্‌তেই সে টেলিফোনে বাইরের কাম্‌রার ভদ্রলোকটিকে ব'লে দিল, ওমুক বাবু মাঝে পৌঁছিয়েছেন। মাঝের কাম্‌রায় ঘড়ি ছিল, সেটা নাকি বাইরের ঘড়ির সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক মেলানো। সেটাতে দেখ্‌লাম, আমার ঠিক ছয় মিনিট লেগেছে ভেতরে ঢুক্‌তে। ভাব্‌লাম, বাইরে বেরুতে তা'র অর্দ্ধেকের বেশী সময় লাগ্‌তেই পারে না। পাশে একটি বুড়ো ভদ্রলোক হাঁড়িমুখ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনি বল্‌লেন, “দেখ্‌ছ কি সাহেব? বেরোতে ঠেলাখানা বুঝ্‌বে এখন। আমি সাত মিনিটে ঢুকেছিলাম; এক ঘণ্টা বেরুতে চেষ্টা ক'রে আবার মাঝখানে ফিরে এসেছি। চার আনা পয়সা দিলে নাকি বের হবার পথ এঁরা দেখিয়ে দেবেন;—তবে, এক ঘণ্টার আগে নয়, আর চোখ বেঁধে বের করে দেবেন। এ পর্য্যন্ত পাঁচ শো পঁচাত্তর জন লোক হিমসিম খেয়ে গেছে সাহেব বুঝি শুধু ঘুঘুই দেখেছ, ফাঁদটি আর দেখ নি!”

আমি বুড়োর কথায় ততটা মনোযোগ না দিয়ে চট্ ক'রে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়্‌লাম। পিছনের রাস্তাটা ধরে কিছু দূর গিয়ে আবার মাঝখানেই ফিরে এলাম; আবার অন্য রাস্তা ধ'রে কিছুদূর গিয়ে দেখ্‌লাম সাম্‌নে বন্ধ; খানিকটা ফিরে অন্য রাস্তা ধরে আবার দেখ্‌লাম সাম্‌নে বন্ধ; আবার অন্য রাস্তা ধ'রে খানিকটা গিয়ে দেখি আবার মাঝখানেই পৌঁছে গেছি। তখন যা' রাগটা হ'লো! আবার চেষ্টা কর্‌লাম বের

হ'চ্ছে ; সাতবার সাম্‌নে বাধা পেয়ে যখন রাগটা চড়্‌তে আরম্ভ করেছে তখন দেখি সেই জানালাটার সাম্নে পেঁাছেছি। মনে হ'লো একটু আগেই একবার জানালাটার সাম্নে দিয়ে গেছিলাম—আবার মনে হ'লো যাই নি। যা' হোক্, একটু এগিয়ে বাঁয়ে একটা রাস্তা পেলাম, সেটা দিয়ে খানিকটা গিয়ে দেখি আবার সেই জানালার পাশে! তখন রাগে আমার গা জ্বলে গেল। সাম্‌নে একটা টুপি পড়ে ছিল, তাতেই দিলাম এক লাথি। টুপিটা দেয়ালে লেগে আমার পায়ের কাছেই এসে পড়্‌ল। আর কিছুর উপর রাগ ঝাড়্‌তে না পেরে এক লাফে টুপির উপর পড়ে দিলাম তা'কে চ্যাপ্টা ক'রে একেবারে থেত্‌লিয়ে। লাফাবার সময় নিজের মাথার টুপিটা হাত দিয়ে সাম্‌লাতে গিয়ে দেখি—ও মা! মাথা যে খালি! আমারই টুপি আমি পা দিয়ে থেত্‌লিয়ে দিয়েছি। কি আর করা যায়? মানে মানে রওয়ানা হওয়াই ভাল। বাইরের লোকগুলো পোলের উপর থেকে আমার কাণ্ড দেখে হো হো ক'রে হেসে হাত-তালি দিয়ে উঠ্‌ল। একজন বল্‌ল, "বাঃ রে সাহেব! আবার নাচ হচ্ছে!" নরেশের মত গলায় কে যেন বল্‌ল, "সাড়ে পাঁচটা কিন্তু বাজে!" -তখন আমার

চ্যাপ্‌টা করে থেৎলিয়ে দিলাম।

রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল, কিন্তু, সাড়ে পাঁচটা বাজে শুনে আর থাক্‌তে পার্‌লাম না—দৌড়ে আগে যেতে লাগ্‌লাম। সাম্‌নেই দেখি এক বুড়োকে চোখ বেঁধে একটা দরোয়ান হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে। বুঝ্‌লাম, সেই বুড়ো, যে আমায়

ঠাট্টা করেছিল। তাড়াতাড়ি তার পিছু ধর্‌লাম। পা টিপে চলার দরুণ দরোয়ানও কিছু টের পেল না; আমিও অল্পক্ষণের মধ্যে নির্ব্বিবাদে বেরিয়ে এলাম। এসেই আর কথাবার্ত্তা নেই, সটান্ সেই পোলের কাছে।

নরেশ বল্‌ল, "চল যাই ; সময় হয়েছে!" আমি বল্‌লাম, "একটু দাঁড়া ভাই ; জান্‌লা দিয়ে ভেতরের লোকগুলোকে দেখা যাক্।" ঠিক সেই সময় একজন ভদ্রলোক জানালার সাম্‌নে দিয়ে গেলেন, আমি তাঁকে দেখেই, "দুয়ো! দুয়ো!" ব'লে হাততালি দিলাম। পোলের উপরের দুটি লোক আমাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ওরে, সেই সাহেব রে!"—আমিও মানে মানে প্রস্থান কর্‌লাম। তখন ঠিক সাড়ে পাঁচটা।

ঊর্দ্ধশ্বাসে মামার বাড়ীর দিকে ছুট্‌লাম। সেখানে পৌঁছেই টেলিফোনের ঘরের দিকে গেলাম। ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। ঠেলাঠেলি কর্‌তে কে যেন ব'লে উঠ্‌ল, "একটু দাঁড়ান্, এখনই খুল্‌ছি।"

একটু বাদেই দরজা খুলে দু'জন রাজমিস্ত্রি বেরিয়ে এল ; তাদের হাতে পোঁচ্‌ড়া আর চূণের বাল্‌তি। ঘরে ঢুকে দেখি, সর্ব্বনাশ! এই মাত্র ঘর চূণকাম করা হ'লো ; দেয়ালের লেখার নামগন্ধও নাই। টেলিফোনের নম্বরটা যে লিখে রেখেছিলাম তার চিহ্নই নাই। এখন করা যায় কি?

ছুট্টে নীলমাধবদের বাড়ী গেলাম ; তাদের সঙ্গে যদি যেতে পারি। গিয়ে শুন্‌লাম তা'রা ৫ মিনিট হ'লো রওয়ানা হয়েছে ; বাড়ীতে চাকর ছাড়া আর কেউই নাই ; সেও নিরঞ্জনদের বাড়ী জানে না।

কি আর করি? হেঁটে বাড়ী পানে রওয়ানা হ'লাম। ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা পার হবার সময় একটা প্রকাণ্ড সবুজ মোটর সাম্‌নে দিয়ে "ভঁ—অঁ—অঁ—প্" ক'রে হর্ণ বাজিয়ে চ'লে গেল আর আমার নতুন ইস্তিরি করা প্যাণ্টে কাদা ছিটিয়ে দিয়ে গেল। রাগে আমার গা জ্বলে গেল। বাড়ীর এত কাছে এসে কিনা এই কাণ্ড!

বাড়ী পৌঁছাবা মাত্র রামা চাকরটা বল্‌ল, "দাদাবাবু! এই মাত্তর একটা সবুজ মোটর গাড়ী এয়েছিল, আপনাকে নিয়ে যাবার তরে, ন্যারঞ্জুন বাবু নাকি গাড়ী পাঠিয়েছিলেন। আমি বল্‌লুম, 'দাদাবাবু বেইরে গেছেন।"

তখন আর আমার বুঝ্‌তে বাকি রইল না কোন্ সবুজ মোটর এসেছিল, আর কেই বা 'ন্যারজ্জুন বাবু'। রাগটা যা হ'লো! বারবেলা কেটেই তো গেছিল; তবে কেন এমন হ'লো?

ধূমকেতু

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

প্রায় পৌনে পাঁচ শ' বছর আগেকার কথা। সেটা বোধ হয় ১৪৫১ সন। সমস্ত পৃথিবীময় একেবারে হা হুতাশ পড়িয়া গিয়াছে। ইয়োরোপের যে সব চাইতে বড় পাদ্রী—রোমের পোপ, তিনি শুদ্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঘোষণা করা হইয়াছে "যে যেখানে আছ শীঘ্র আসিয়া জোট, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর, পৃথিবী যেন এবার ধ্বংস না হয়।" দেশ শুদ্ধ ছেলেবুড়ার সে কি কান্না! গেল, গেল, এত দিনে সৃষ্টিটা সত্যই লোপ পাইল রে!

ব্যাপারটা আর কিছুই না, আকাশের কোণে এক বিরাট্ ধূমকেতু দেখা দিয়াছে। কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা! শরীরের পিছনে ঝাঁটার মত একটা লেজ, লম্বায় সেটা অন্ততঃ লক্ষ মাইলের কম হইবে না। ভীমবেগে সে পৃথিবীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। ওর একটা ঢুঁ কিংবা ঐ দারুণ লেজের একটা বাড়ি খাইলে কি আর পৃথিবীর রক্ষা আছে? টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া পৃথিবী চার দিকে ছড়াইয়া পড়িবে!

ধূমকেতুর নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। গ্রহ উপগ্রহের মত ধূমকেতুও আকাশে দেখা দেয়, কিন্তু সে কালে ভদ্রে; আর চেহারায়ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের সাথে তার কোনই মিল নাই। শরীরের পিছনে লক্ষ কিংবা কোটি মাইল লম্বা এক এক খানি লেজ আর কারও আছে বলিয়া শুনিয়াছ কি?

বেচারার বরাত কিন্তু বড় মন্দ। পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই তাকে একটা 'অলক্ষুণে' ব্যাপার বলিয়া মনে করে। কোন একটা ধূমকেতু আসিলেই যে সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশটা যুড়িয়া নানা রকম দুর্ঘটনা, মহামারীর ধূম পড়িয়া যাইবে সেটা সকলেই এক বাক্যে ধরিয়া রাখে। আজকাল অবশ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে লোকের কুসংস্কার

কমিয়াছে, কিন্তু সেকালে অর্থাৎ এই কয়েক শ' বছর আগেও লোকে কত যে বড় বড় দুর্ঘটনার দোষ নিরপরাধ ধূমকেতুর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে তা বোধ হয় গণিয়া শেষ করা যায় না।

বাস্তবিক ধূমকেতুকে ভয় করিবার কিন্তু তেমন কারণ নাই। স্বীকার করি, তার চেহারাটা একটু কিন্তুতকিমাকার। দেহের পিছনে যদি কারও ৮।১০ কোটি মাইল লম্বা ঝাঁটার মত একটা লেজ থাকে তবে তাকে 'যে সে' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে খুব সহজ নয়। পৃথিবী হইতে সূর্য্যের দূরত্ব যতটা কোন কোন ধূমকেতুর লেজটি তার চাইতেও লম্বা হয়। কারও কারও আবার একটি লেজে মন উঠে না—দু'টি, তিনটি, চারটি এমনকি ছয়টি লেজও কোন কোন ধূমকেতুর থাকে। কিন্তু সে লেজ বহরেই বড়, আসলে ফাঁকা। বৈজ্ঞানিকের দল পরীক্ষা করিয়া বাহির করিয়াছেন—ধূমকেতুর দেহটা অসম্ভব রকম হাল্কা। জিনিষ তাতে খুবই কম আছে—আর যে টুকু আছে তাও ধোঁয়ার মতন। ঐ যে লক্ষ মাইল পুরু আর কোটি কোটি মাইল লম্বা লেজটির কথা বলিলাম, সেটির ভিতরেও আছে খানিকটা পাৎলা গ্যাস—এত পাৎলা যে সেটাকে তেমন ভাবে ঘন করিতে পারিলে হয় ত একটা সাধারণ বোতলের মধ্যেই পূরিয়া ফেলা যায়। ঐ লেজের ভিতর দিয়া দূর আকাশের তারাগুলি দেখিতে কিছু মাত্র বেগ পাইতে হয় না।

কাজেই আগেকার দিনে যে লোকের ধারণা ছিল—ধূমকেতুর লেজের একখানা বাড়ি যদি আমাদের পৃথিবীর গায়ে আসিয়া লাগে তবে আর পৃথিবীকে আস্ত থাকিতে হইবে না—সেটা একেবারে ভুয়ো কথা। ধোঁয়াটে জিনিষের ধাক্কায় কি কারও কিছু হয়? ১৯১০ সনে একবার একটা ধূমকেতু দেখা দিয়াছিল। ধূমকেতু আসিবার আগেই পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষিয়া খবর দিলেন—এই যে ধূমকেতুটি আসিতেছে এর লেজের সাথে পৃথিবীর ধাক্কা লাগিবে। কাগজে দারুণ হৈ চৈ পড়িয়া গেল। পণ্ডিতদের মধ্যেও ভয়ানক তর্ক বিতর্ক উঠিল। কেউ কেউ এমনও বলিলেন, যে এইবার প্রলয় হইবে, পৃথিবী চুরমার হইয়া যাইবে, একটি প্রাণীকেও আর বাঁচিতে হইবে না। তারপর যথা সময়ে ধূমকেতু আসিল। পৃথিবীর সঙ্গে তার ধাক্কাও লাগিল; কিন্তু হরি, হরি! পৃথিবীর ত' কিছুই হইল না, উল্টা ধূমকেতুর লেজটাই ছিঁড়িয়া দু'টুক্‌রা হইয়া গেল।

হঠাৎ কয়েক দিনের জন্য কেউ আসিয়া আবার চলিয়া গেলে আমরা বলি, "ধূমকেতুর মত এল, আর গেল।" বাস্তবিক গ্রহ উপগ্রহদের যেমন চলিবার একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে ধূমকেতুগুলির যেন তেমন কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম নাই। কোথায় ছিল কে জানে? হঠাৎ একদিন এক লম্বা লেজ সমেত আসিয়া চোখের দেখা দিয়া

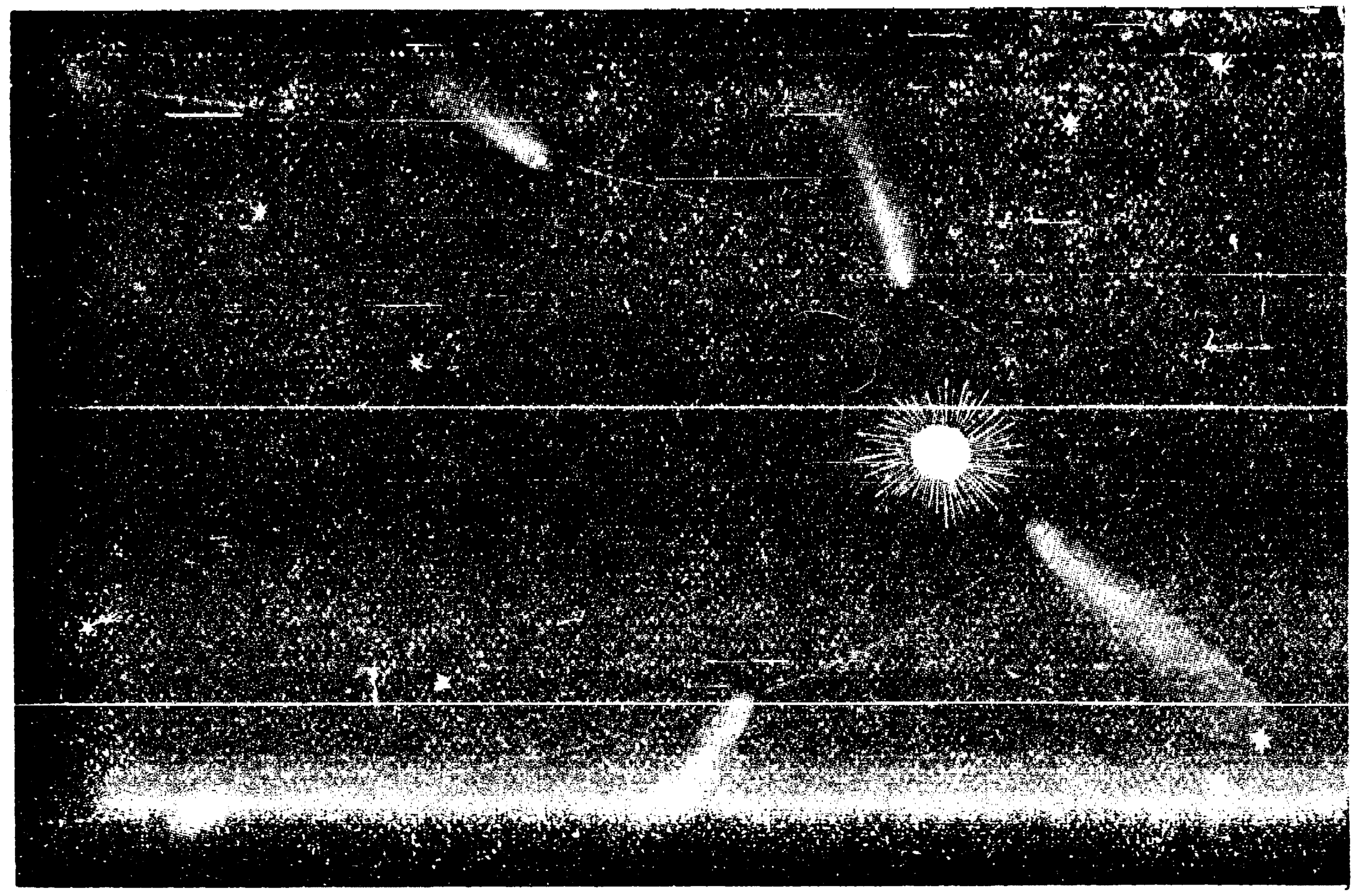

সূর্য্যের কাছে আসিলে ধূমকেতুর চেহারা কেমন ধীরে ধীরে বদ্লাইয়া যায় এই ছবিতে তাহাই দেখান হইয়াছে।

আবার কোথায় উধাও হইয়া গেল। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা ঠিক তা নয়! হেলি নামে এক বৈজ্ঞানিক উহা আবিষ্কার করিয়াছেন।

হেলি ছিলেন এক মস্ত বড় জ্যোতির্ব্বিদ্। আকাশের কোণে কোথায় কি ঘটিল, কোন্ গ্রহ নক্ষত্র কখন একটু নড়িয়া বসিল—এই সব খুঁটিনাটি ব্যাপার লইয়া তিনি সর্ব্বদা মাথা ঘামাইতেন। হেলির আগে যে সব বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদ জন্মিয়া গিয়াছেন তাঁদের লেখা বই, কাগজপত্রও তিনি ভাল করিয়া ঘাঁটাঘাটি করিয়া দেখিতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতার সাথে সেগুলি মিলাইয়া লইতেন এইভাবে একদিন তিনি লক্ষ্য করিলেন—১৫৩১, ১৬০৭ প্রভৃতি সনে এক একবার এক একটি ধূমকেতু দেখা দিয়াছে। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে আবার একটি ধূমকেতু

দেখা গেল; আর মজা এই—সেই সব পুঁথিতে ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দের ধূমকেতুটা আকাশের ঠিক যে জায়গায় দেখা গিয়াছিল বলিয়া লেখা আছে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দের ধূমকেতুটাকেও ঠিক সেই জায়গায়ই দেখা গেল। হেলি দেখিলেন ঠিক ৭৫।৭৬ বছর পর পর ধূমকেতুটি একবার করিয়া আসিয়া দেখা দিতেছে। তাঁহার ধারণা হইল—হয়ত অন্যান্য গ্রহের মত এই ধূমকেতুটিরও একটা নির্দ্দিষ্ট পথ আছে, আর সে পথ একবার ঘুরিয়া আসিতে তার ৭৫ বছর সময় লাগে। এ কথা যদি সত্য হয় তবে ১৭৫৭ কি ১৭৫৮ সনে ধূমকেতুটির আবার ফিরিয়া আসিবার কথা। কিছুদিন পরে পণ্ডিতেরা অঙ্ক কষিয়া বলিলেন—এবার বৃহস্পতি আর শনির টানে পড়িয়া ধূমকেতুটির আসিতে এক আধ বছর দেরী হইতে পারে। যাহা হউক্ হেলির ধারণা সত্য হইলে ১৭৫৯ সনে আন্দাজ সেটা নিশ্চয়ই আসিবে। ১৭৫৯ সনে আসিল, ধূমকেতুও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া হাজির। চারিদিকে হেলির জয়জয়কার পড়িয়া গেল। সকলেই জানিল ধূমকেতুদেরও একটা নির্দ্দিষ্ট চলিবার পথ আছে, স্বভাব তার পাগ্‌লাটে মোটেই নয়; আর হেলির আবিষ্কৃত এই বিশেষ ধূমকেতুটির ঐ পথ একবার পার হইয়া আসিতে ৭৫ বছর লাগে। হেলির নামানুসারে ঐ ধূমকেতুর নাম দেওয়া হইল "হেলির ধূমকেতু"। তারপর আরও দু' বার—১৮৩৫ ও ১৯১০ সনে এই ধূমকেতু দেখা গিয়াছে। শেষ বার অর্থাৎ ১৯১০ সনে যখন সেটা আসে তখন বৈজ্ঞানিক মহলে সে কি হুলস্থূল ব্যাপার! নানা রকম সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ক্যামেরা প্রভৃতি লইয়া তাঁরা বসিয়া রহিলেন—এবার যেন ধূমকেতুর সম্বন্ধে কোন খবরই আর জানিতে বাকী না থাকে। কিন্তু সে যাত্রা ধূমকেতুটি বড় ছোট হইয়া দেখা দিল।

বড় বড় ধূমকেতু কালে ভদ্রে এক আধটা দেখা যায়, তাই সেকালের লোকেরা ধূমকেতু দেখিলেই অমন ভয় পাইয়া যাইত; কিন্তু আজকাল নানা রকম প্রচণ্ড শক্তিশালী দুরবীণ তৈরী হওয়ার পর পণ্ডিতেরা বলিতেছেন—ধূমকেতু জিনিষটা অত দুর্ল্লভ নয়, ছোটখাট ধূমকেতু আকাশের গায় বিস্তর আছে। প্রত্যেক বছরই তাদের দেখা সম্ভব। তবে খালি চোখে নয়, দূরবীণের সাহায্যে তাদের দেখিতে হয়। এক একটা ধূমকেতুর ঘুরিবার নিয়ম এক এক রকম। কোনটা হয় ত ৩।৪ বছর পর পর ফিরিয়া আসে, কোনটা বা লক্ষ লক্ষ বছর পরে ফিরিয়া আসে; আবার এমন ধূমকেতুও

দেখা গিয়াছে যে আর কোনদিন ফিরিয়া আসিবে বলিয়া মনে হয় না। অনেক সময় অন্য গ্রহের টানে পড়িয়া বা ধাক্কা খাইয়া ধূমকেতুর পথ গোলমাল হইয়া যায়,—যেটার ফিরিবার কথা পাঁচ বছর পরে সেটা হয় ত আর ফিরিয়াই আসে না।

আগেই বলিয়াছি ধূমকেতুর চেহারা বড়ই অদ্ভুত। উজ্জ্বল বলের মত একটা মাথা, তার চারধারে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলের মত একরাশ ধোঁয়াটে জিনিষ। তার পিছনে একটা বা কয়েকটা ঝাঁটার মত লম্বা লেজ। লেজটা কিন্তু সব সময়ে থাকে না। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের কাছ হইতে দূরে থাকে তখন তার আর লেজের বালাই নাই, তখন শুধু থাকে একরাশ বাবরি চুল। ইংরাজিতে ধূমকেতুকে বলা হয় 'কোমেট্'। 'কোমে' কথাটা গ্রীক, তার মানে 'চুল'। ঐ চেহারার জন্যই এই নাম। ধূমকেতু যতই সূর্য্যের কাছাকাছি যায় তার বেগও ততই বাড়িয়া চলে, আর আস্তে আস্তে পিছন দিকে একটি লেজ খাড়া হইয়া উঠে। লেজটি কখনও সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া থাকেনা, যেদিক্‌টা সূর্য্য হইতে দূরে সর্ব্বদা সেই দিকে থাকে। সূর্য্যের কাছাকাছি আসিলে ধূমকেতুর বেগ দারুণ রকম হইয়া পড়ে। দেখিলে মনে হয় যেন সূর্য্যের হাত হইতে কোন রকমে লেজটি বাঁচান'ই তার উদ্দেশ্য; লেজ লইয়া যত তাড়াতাড়ি পারে বিদায় হইতে পারিলে সে বাঁচে। দূরে গিয়া আবার তাহার বেগ কমিয়া আসে—লেজও খসিয়া যায়। বৈজ্ঞানিকের দল কিন্তু এই লেজেরও একটি ব্যাখ্যা দিতে ছাড়েন নাই। তাঁরা বলেন অন্যান্য জিনিষের মত আলো এবং তাপ—এদেরও চাপ দিবার ক্ষমতা আছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে এ কথা তাঁরা প্রমাণও করিয়াছেন। এই চাপকে তাঁরা বলেন Radiation pressure (রেডিয়েশন প্রেসার)। ধূমকেতু সূর্য্যের কাছাকাছি আসিলে সূর্য্যের আলো গিয়া তার ঐ ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে চাপ দিতে থাকে। আগেই বলিয়াছি ধূমকেতু জিনিষটি ভয়ানক হাল্কা, কাজেই ঐ চাপের ফলে খানিকটা অংশ ঠেলা খাইয়া পিছন দিকে বাহির হইয়া আসে—আর সেটাই হইল ধূমকেতুর লেজ।

অনেক সময় কোন কোন ধূমকেতু নানা কারণে ভাঙ্গিয়া কয়েক টুক্‌রা হইয়া যায়। প্রথম প্রথম তাতে সে মোটেই ঘাবড়ায় না। ঐ ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলিই এক সঙ্গে—যেন পাল্লা দিয়া ছুটিতে থাকে। কিন্তু বেশী দিন সে ভাব থাকে না।

কিছুদিন পরেই সেগুলি আরও ছোট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া যায়। বিয়েলা নামে এক বৈজ্ঞানিক একবার এই ধরণের একটি ধূমকেতু আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ধূমকেতুটী সাড়ে ছ' বছর পর পর একবার করিয়া দেখা দিত। হঠাৎ একবার সে ভাঙ্গিয়া দু'টুকরা হইয়া গেল। পরের বার যখন সে আসিল তখন দেখা গেল ঐ দুই টুক্‌রাই একসাথে পাল্লা দিয়া ছুটিয়াছে। তার পরের বার আর তাদের দেখা গেলনা কিন্তু ঠিক সেই সময়ে খানিকটা উল্কা বৃষ্টি হইল। তার পরের বারও ঠিক তাই। পণ্ডিতেরা মনে করেন ঐ ধূমকেতুই ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইতে হইতে শেষটায় উল্কায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে; এরকম অনেক ধূমকেতুই যায়। উল্কা কাকে বলে তা তোমরা নিশ্চয়ই জান। তার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ তোমাদের আর এক দিন বলিব।

উল্কা বৃষ্টি।

পার্ব্বণী-চাঁদ

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

পার্ব্বণী-চাঁদ উঠ্‌লোরে আজ
পউষ-আকাশে ;
নলেন গুড়ের পিঠের থালা—
রসেই মাখা সে।
আজ্‌কে শীতের কাঁপন ভুলে
বের হয়ে আয় দরজা খুলে,
দেখ্‌বি যদি চাঁদের আলো—
শিকেয় রাখা সে !
পার্ব্বণী-চাঁদ—পিঠের থালা—
পউষ-আকাশে।

ছড়িয়ে গেছে নানান্ পিঠে—
তারার মত রে,—
চাঁদের দেশের চন্দ্রপুলি—
চাল্‌লে হোত রে !
সাপ্‌টে পাটি-সাপ্‌টাগুলি
মুখের ভিতর দিতাম তুলি,
আস্‌কে সরু-চাক্‌লী-পুলি
আলোয় ছাঁকা সে ;
পার্ব্বণী-চাঁদ রইল আঁকা
দূরের আকাশে।

জানোয়ার-চরিত

আজকাল আলিপুরের চিড়িয়াখানার দৌলতে দুনিয়ার হরেক রকম জানোয়ারের সহিত প্রত্যহই তোমাদের পরিচয় ঘটিতেছে। তাদের আকৃতি প্রকৃতি, চাল-চলন আচার ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়েও তোমরা অনেকে অনেক খবর রাখ তাও অস্বীকার করি না। তবুও কিন্তু বলিব, মানুষের নিতান্ত পরিচিত জানোয়ারদের সম্বন্ধেও এমন অনেক মোটা মোটা কথা আছে যা বোধ করি নিশ্চয়ই তোমরা জাননা।

গণ্ডার কাদায় গড়াইতে অত ভালবাসে কেন ?

এ প্রশ্নের তোমরা কি জবাব দিবে জানি ; বলিবে যার যা স্বভাব ! কথাটা কিন্তু তা নয়।

গণ্ডার কাদায় নামিবার উদ্যোগ করিতেছে।

তোমরা জান, গণ্ডারের চামড়া দারুণ শক্ত, বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত সময়ে সময়ে তা ভেদ করিতে পারে না। শরীরের সব জায়গার চামড়া সম্বন্ধে কিন্তু এ কথা খাটে না ; ঘাড়ের উপরকার চামড়া এবং পায়ের উপরিভাগের চাম্‌ড়াকে বেশ নরমই বলা চলে। এখন অসুবিধা হইতেছে এই যে, অন্যান্য জানোয়ারের মত গণ্ডারের চাম্‌ড়া একটানা নয়, ভাঁজ খাওয়া খাওয়া। দুই চাম্‌ড়ার মধ্যে যে ভাঁজ পড়ে রাজ্যের পোকা গিয়া তার মধ্যে বাসা বাঁধে। তার পরেই মনের সুখে কুটুস্ কুটুস্ কামড় ! জায়গাগুলির চাম্‌ড়া নরম হওয়াতে ভায়া তখন বেশ একটু মুস্কিলে পড়ে, অথচ কোথাও

গা ঘষিয়া যে পোকাগুলিকে ঘাল করিবে সে সম্ভাবনাও থাকে না, কেননা চাম্‌ড়ার ভাঁজের মধ্যে তারা দিব্যি সুরক্ষিত দুর্গ বানাইয়া বাস করিতেছে। কাজেই বেচারা গিয়া শেষটায় কাদার শরণ নেয়। কাদায় খুব খানিকটা গড়াইয়া লইলে ভাঁজগুলার ভিতরকার ফাঁক ভর্‌তি হইয়া যায়; পোকারা আসিয়া 'দুর্গদ্বার বন্ধ দেখিয়া ফিরিয়া যায়, বেচারাও হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কেমন, গণ্ডার ভায়াকে পূরা দস্তুর বৈজ্ঞানিক বলা চলে না?

হিপ্পোপটেমাস অত জল-ঘেঁষা কেন।

হিপ্পোপটেমাস বা জলহস্তী যে ডাঙ্গার জীব তা তার চেহারাখানা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। হাতীর মত বিশাল একটী দেহ চারিখানা ছোট ছোট পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া। পা গুলিতে আবার ক্ষুরও আছে। মাছের মত জলের ভিতরে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইবার ক্ষমতা তার আদবেই নাই, দম বন্ধ করিয়া পাঁচ-সাত মিনিটের বেশী জলের তলায় থাকিতেও সে পারে না। অথচ গিয়া দেখ, হিপ্পো ভায়া আমাদের সারাদিন যেন জলের ভিতরেই পড়িয়া আছেন। কারণ কি?

এর উত্তরেও যদি তোমরা বল 'স্বভাব,' তবে অমনি আমি পাল্টা প্রশ্ন করিয়া বসিব, স্বভাব তো বুঝিলাম, কিন্তু এমন স্বভাবটা গড়িয়া উঠিল কি জন্য?'

ভয় নাই, কাম্‌ড়াইবে না! জল হইতে উঠিয়া ভায়া একটু হাই তুলিতেছে মাত্র।

কারণ আর কিছুই নয়, হিপ্পো ভায়া আমাদের একটু "অজ্ঞাত বাসে'র পক্ষপাতী। তার দেশ হইতেছে জঙ্গলের রাজা অফ্রিকায়। সেখানে এমন দারুণ দারুণ সব জানোয়ারের বাস যাদের

সঙ্গে অতর্কিত মোলাকাৎ হইলে ভায়ার আমাদের বেশ একটু বিপদের সম্ভাবনা। আর তা ছাড়া যে সব বাঘা বাঘা অসভ্য জাতি সেখানে রহিয়াছে তারা বোধ করি আরও ভয়ানক। হিপ্পো তাই সর্ব্বদাই হুঁসিয়ার। সে জানে, ডাঙ্গার উপর তার ঐ পাহাড়ের মত দেহটাকে লুকাইয়া রাখা এক অতি কষ্টকর ব্যাপার, তাই সে জলে গিয়া আশ্রয় নেয়। বিশাল শরীরটী তার সমস্তটাই জলের তলায় থাকে, উপরে শুধু ভাসে দুটী চোখ, দুটী কাণ এবং নাকটী। নাকটী উপরে থাকায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস লইতে তার কোনই কষ্ট নাই, এবং চোখ ও কাণ উপরে থাকায় শত্রুকে দূর হইতে দেখা, এবং তার হাঁটা-চলার আওয়াজ শোনা—কোনটারই বাধা জন্মায় না। অথচ দূর হইতে কার সাধ্য বোঝে যে ঐ ক্ষুদে চোখ, নাক আর কাণের নীচে একটী চলন্ত পাহাড় ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আর যদি কেউ তার এই "অজ্ঞাত বাস" টেরই পাইয়া যায়, ভায়া তখন ভারী চমৎকার এক চালাকি খেলে! এক ডুবে সে একেবারে নদীর তলায় নামিয়া পড়ে, তারপর মাটীর উপর দিয়া হাঁটিতে সুরু করে। খানিক দূর হাঁটিয়া ফের ভাসিয়া উঠিলেই হইল! আগেই বলিয়াছি, দম বন্ধ করিয়া পাঁচ-সাত মিনিট্ ইহারা জলের তলে কাটাইয়া দিতে পারে।

দেখ দেখি, চারিপাশের অবস্থা একটা জীবের স্বভাবটাকেই কেমন ফিরাইয়া দিয়াছে!

বানরেরা নদী পার হয় কিভাবে?

বানর জাত যে সাঁতার কাটিতে জানে না সে খবর তোমরা নিশ্চয়ই রাখ। অথচ অনেক সময়ে দেখা যায় যে এক দল বানর নদীর এ পারে ছিল, খানিক বাদে তাহারা দলবলশুদ্ধ ওপারে গিয়া হাজির হইয়াছে। এ অসম্ভব কাজ তারা সম্পন্ন করে কি ভাবে বলতো! লাফ দিয়া নিশ্চয়ই নয়, কেননা রামায়ণের যুগে সে কেরামতি তাদের কত খানি ছিল জানি না, আজকাল যে তা আর নাই সে আমি তোমাদের বলিয়া দিতে পারি।

আসলে বানরেরা করে কি জান? যে নদীটী পার হইতে হইবে তারই তীরে একটা গাছের নীচে প্রথমে সকলে আসিয়া জমায়েৎ হয়। তারপর একটী বানর তার এক সঙ্গীর লেজ চাপিয়া ধরে, আর একটী বানর ধরে তার লেজ, অপর একটী তার—এই ভাবে পরস্পরের লেজ চাপিয়া ধরিয়া প্রকাণ্ড একটা সারি তারা বানাইয়া তোলে। সাম্‌নের বানরটা তখন লাফাইয়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলে, আর সব শেষের বানরটাও ধরে ঠিক তেম্‌নি আর একটা ডাল। ব্যস্, তারপর সেই বানরের সার দারুণ জোরে দোল খাইতে থাকে। দোল খাইতে খাইতে সব শেষের বানরটা হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়া দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে দোলের ধাক্কায় পড়ে গিয়া নদীর ওপারে। মাটীতে পড়িবার আগেই কিন্তু সে ওপারের কোন গাছের একটা ডাল আঁকড়াইয়া ধরে, অবশ্য সে গাছটাকে আগে হইতেই দেখিয়া শুনিয়া রাখা হয়। তখন দৃশ্যটা দাঁড়ায় এই—এ পারের

একটা গাছের ডাল ধরিয়া এক বানর, ওপারের আর একটা গাছের ডাল ধরিয়া আর এক বানর, আর নদীর উপর দিয়া লেজ ধরাধরি করিয়া বরাবর বানরের সার। এই অবস্থায় বানর ভায়ারা আবার দারুণ জোরে দোল খাইতে সুরু করে; তার একটু পরেই এ পারের প্রথম বানরটী হাত ছাড়িয়া দেয় এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে সবাই মিলিয়া একেবারে ওপারে গিয়া হাজির হয়!

আমি হইলে তো নোবেল প্রাইজ্‌টা বানর ভায়াদেরই দিয়া দিতাম! কিন্তু আজকাল নাকি কোন কোন প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বানরদের এ ক্ষমতাটা অস্বীকার করিতে চান।

মরুভূমিতে উটের কুঁজ ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসে কেন?

আরব দেশের লোকেরা যখন মরুভূমির উপর দিয়া লম্বা পাড়ি দেওয়ার বন্দোবস্ত করে তখন গোড়াতেই তারা দেখিয়া নেয় যে, যে উটের পিঠে চাপিয়া এতটা পথ তারা যাইবে সেটীর কুঁজটী বেশ উঁচু এবং পুষ্ট আছে কিনা। দীর্ঘ পথ তাদের যাইতে হইবে, সারাটা রাস্তা তো আর উটের খাবার সঙ্গে বহিয়া নেওয়া সম্ভব হয় না! খানিক দূর যাওয়ার পরেই হয়তো উটের খাবার কম্‌তি হইয়া গেল! মরুভূমির ভিতর তখন আর খাবার মিলিবে কোথায়? অন্য জানোয়ার হইলে সেখানেই তার ইতি হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু উটের বেলায় ভগবান্ অন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। তার পিঠের উপর যে কুঁজটী আছে, সেটী চর্ব্বিতে ভরা; খাবার যখন ফুরাইয়া যায়, তখন খাবার-দাবারের কাজ ঐ চর্ব্বি হইতেই উট চালাইয়া নেয়। কুঁজের চর্ব্বি হইতে শরীরের পুষ্টি হওয়ার দরুণ কুঁজটী ক্রমেই ছোট হইয়া আসে, এবং যাত্রার শেষে অনেক সময় দেখা যায় সে বিরাট্ কুঁজটীর আর চিহ্ন মাত্র নাই। তারপর আবার কিছুদিন ধরিয়া উটের "খানা-পিনার" একটু ভাল রকম ব্যবস্থা করিয়া দাও দেখি, কুঁজটী আবার আগের মতই জাঁকিয়া উঠিবে।

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

[**পূর্ব্ব কথা**—নলকোপার জমিদার ভূপেশ বাবুর স্বর্গগত পিতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটা অল্প দামী সেকেলে ঘড়ি ছিল, সেটী একরাত্রে কে যেন চুরী করিয়া তাঁর বাড়ীর বাগানে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যায়। তিনি ব্যাপারটীতে অনুসন্ধান করিবার জন্য বিখ্যাত অপরাধতত্ত্ববিদ্ হুকা-কাশিকে নিযুক্ত করেন, রণজিৎও হুকা-কাশির সঙ্গে থাকে। ঠিক সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক প্রোফেসার গঙ্গাধর গুপ্তের পুত্র বিমল, তাহাদের ল্যাবোরেটারীর তত্ত্বাবধায়ক বিরূপাক্ষ আচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া হুকা-কাশিকে জানাইয়া যায় যে তার বাবা পরীক্ষাগারে কাজ

করিতে করিতে হঠাৎ পাগল হইয়া গেছেন। ভিতরে কোন রহস্য নিশ্চয়ই আছে, হুকা-কাশিকে তাহা ভেদ করিয়া দিতে হইবে।

এদিকে হুকা-কাশি অসাধারণ বুদ্ধি বলে টের পান যে এক ঘড়িওয়ালার দোকান হইতে একটা ঘড়ি চুরী গিয়াছে, সে ঘড়ির মার্কা ও ভূপেশ বাবুর ঘড়ির মার্কা এক। ডাষ্টবিনে ঘড়িটা পড়িয়া ছিল। হুকা-কাশি রণজিৎকে এইটুকুমাত্র জানাইলেন যে ভূপেশ বাবুর ঘড়ি যে লইয়াছে, এ ঘড়িও চুরী করিয়াছে সেই। তারপর একটী কাঠি দিয়া ঘড়িটী তিনি তুলিয়া লইলেন।]

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

দুইজনে মিলিয়া যখন হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইলেন, কলিকাতার গলিতে গলিতে অন্ধকার তখন বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে। চলিতে চলিতে হুকা-কাশি একবার পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন কেউ তাঁহাদের লক্ষ্য করিতেছে কিনা, কিন্তু সেই জমাট্‌বাধা অন্ধকারের মধ্যে কোন মনুষ্য-মূর্ত্তিই তাঁর চোখে পড়িল না।

নিজের বসিবার ঘরটীতে ফিরিয়া আসিয়া হুকা-কাশি প্রথমেই ঘড়িটীকে আলগোছে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলেন; তারপর দরজা বন্ধ করিয়া ইলেক্‌ট্রিকের সুইচ্‌টী টিপিয়া দিতেই উজ্জ্বল আলোকে ঘরখানা দিনের মত ঝল্‌মল্ করিয়া উঠিল। রণজিতের দিকে তাকাইয়া একটী বার মৃদু হাসিয়া হুকা-কাশি তখন কহিলেন, "বিজ্ঞানের দৌলতে দিনে আর রেতে আজকাল তফাৎ নেই কিছু। উঠে আসুন দেখি এদিকে রণজিৎ বাবু, ঘড়িটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখুন তো কিছু নজরে আসে কিনা!"

রণজিৎ আগাইয়া গিয়া ঘড়িটীর প্রতি মিনিট্ কয়েক চাহিয়া রহিল শেষে কহিল, "হ্যাঁ, ষ্টোভার নামটা বেশ স্পষ্টই পড়া যাচ্ছে বটে!"

"ওতো পুরোনো খবর হ'ল। আর নতুন কিছু বল্‌তে পারেন?"

চোখের সাম্‌নে ঘড়িটিকে আনিয়া ধরিবে বলিয়া রণজিৎ হাত বাড়াইতে যাইতেছিল, হুকা কাশি বাধা দিয়া কহিলেন, "না না হাতে পাবেন না, এইভাবেই দেখে বল্‌তে হবে!"

রণজিতের মনে পড়িল ডাষ্টবিন হইতে সে যখন ঘড়িটীকে তুলিতে যাইতেছিল তখনও হুকা-কাশি তাহাকে বাধা দিয়াছিলেন, এখনও দিতেছেন;

নিজেও তিনি ঘড়িটাকে হাতে করিয়া ধরিতেছেন না! অথচ এই অদ্ভুত ব্যবহারের কী যে অর্থ হইতে পারে তাহাও সে ভাবিয়া ভাবিয়া কিছু ঠিক করিতে পারিল না।

তার মনের ভাব হুকা-কাশি বোধ করি বুঝিতে পারিলেন; পাশের দেরাজটী খুলিয়া একটা কৌটা হইতে সাদামত কি একটা গুঁড়া বাহির করিয়া সেগুলি ঘড়িটার উপরে তিনি ছড়াইয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে ঘড়ির উপরকার চেহারা একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল এবং বিস্মিত রণজিতের চোখে পড়িল ঘড়ির উপর কার যেন বুড়ো-আঙ্গুলের কয়েকটী ছাপ উঠিয়াছে। রবার-ষ্ট্যাম্পের প্যাড্ হইতে আঙ্গুলে কালী মাখাইয়া সেই আঙ্গুল কাগজের উপর চাপিয়া ধরিলে যেমন প্রত্যেকটী রেখা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, ঘড়ির উপরকার ছাপগুলিও ঠিক তেমনই স্পষ্ট।

"দেখ্‌লেন কেমন মজা! ডাষ্ট্‌বিনে ঘড়িটাকে ফেলে দিয়ে চোর ভেবেছে সে ভারী উৎরে গেছে; কে আর জান্‌তে যাচ্ছে যে সেই সেখানে ঘড়ি ফেলেছে। কিন্তু ঘড়িও যে ওদিকে আবার তার হাতের ছাপ বুকের ওপর ধরে রাখ্‌তে পারে, চোরের পো'র বোধ হয় সেকথা খেয়ালে আসেনি। শুধু এই কারণেই আমি নিজে ঘড়ির ওপর হাত দিই নি, বা আপনাকে হাত দিতে দিই নি। তা দিলে, নির্ঘাৎ চোরের হাতের দাগ চাপা পড়ে যেত, আর জেগে উঠ্‌তো হয় আপনার হাতের দাগ, আর নয়তো আমার। এটা নিশ্চয়ই আপনি জানেন যে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের হাতের ছাপ ভিন্ন ভিন্ন রকমের। দুনিয়ায় এই যে এত কোটী কোটী লোক, কিন্তু এম্‌নি আশ্চর্য্য, এক জন লোকের হাতের ছাপের সাথে আর একজনের হাতের ছাপ একেবারেই মিল্‌বে না। দুটো হাতের ছাপ মিলিয়ে অনায়াসে সে হাতের মালিককে চিনে ফেলা যায়। এ রকম ক্ষেত্রে চোরের হাতের ছাপ পাওয়াটা যে আমাদের মস্ত একটা লাভের জিনিষ হয়েছে তা আপনি সহজেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন!" বলিয়া হুকা-কাশি উৎসুকভাবে রণজিতের মুখের দিকে তাকাইলেন।

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া রণজিৎ বলিল, "হাতের ছাপ থেকে অপরাধীকে খুঁজে বার করা যে সম্ভব তা আমি জানি, মিষ্টার হুকা-কাশি! কিন্তু তবুও কিছুতেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কল্‌কাতার এই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে থেকে শুধু হাতের ছাপ মিলিয়ে চোর ধর্‌বেন আপনি কি ভাবে!"

এ প্রশ্নের জবাবে হুকা-কাশি হাসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, কল্‌কাতার প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী ঢুকে সবাইকার হাতের ছাপ নেবার প্রস্তাব যদি আমি কর্‌তাম তবে আপনি আমায় পাগ্‌লা গারদে পাঠাবার বন্দোবস্ত অনায়াসে কর্‌তে পার্‌তেন,আমি তাতে কথাটী পর্য্যন্ত কইতাম না। কিন্তু তা নয়, ঘড়ি যে সরিয়েছে, স্থির জান্‌বেন ঘড়িওয়ালার সাথে তার বেশ ভালমতোই আলাপ-পরিচয় আছে। অথচ ঘড়িওয়ালা বুঝ্‌ছে না সে কে। তাকে খুঁজে বার কর্‌বার জন্যে ঘড়িওয়ালার সাহায্য চাইলে খুব খুসী হয়েই সে রাজী হয়ে যাবে......" কথা কয়টী শেষ হইবার পূর্ব্বেই কিন্তু হঠাৎ যেন তিনি কেমন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন; রণজিৎ চোখ তুলিয়া দেখিল তিনি নিবিষ্টভাবে ঘড়ির উপরে কি একটা দেখিতে সুরু করিয়া দিয়াছেন।

একটু পরেই আবার তিনি কথা বলিলেন, কহিলেন, "আচ্ছা, বলুন দেখি রণজিৎ বাবু, বুড়ো আঙ্গুলের ছাপের পাশে পাশে আর একটা যে দাগ দেখা যাচ্ছে ওটা কি?"

রণজিৎ দাগটীকে ভাল মতন পরীক্ষা করিয়া বলিল, "ওটা বোধ করি বাকী চার্‌টে আঙ্গুলের কোন একটার দাগ হবে; সবটা আঙ্গুল বসেনি বলে অমন ছোট আর অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।"

"কিন্তু বুড়ো আঙ্গুল ঐখানে ঐ অবস্থাতে থাক্‌লে অন্য কোন আঙ্গুল তো ওখানে আস্‌তে পারে না রণজিৎ বাবু, অন্ততঃ আসা স্বাভাবিক নয়।" বলিতে বলিতে অমনি তিনি ঘড়িটী উল্‌টাইয়া ফেলিয়া অপর দিকেও খানিকটা সেই সাদা গুঁড়া মাখাইয়া দিলেন। মুহূর্ত্তেকের মধ্যেই তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কথাবার্ত্তায় দুজনে এমনই ডুবিয়া গিয়াছিলেন যে দুজনার কেহই লক্ষ্য করিলেন না, পেছনের খড়্‌খড়িটীর ফাঁক্ দিয়া একজোড়া চোখ অতি সন্তর্পণে তাঁহাদের কাজকর্ম্ম সমস্তই দেখিয়া লইল; শুধু তাই নয়, দুজনার মধ্যে নিরালায় এবং গোপনে যে কথাগুলি হইল, একজোড়া কাণ সেগুলি পর্য্যন্ত শুনিতে পাইল। হুকা-কাশি এদিকে একটু ফিরিবার উপক্রম করিতেই সেই চোখ ও কাণের মালিক দেওয়ালের কোণ্‌টিতে নিজেকে একেবারে মিশাইয়া দিল, এবং তার একটু পরেই পা টিপিতে টিপিতে একেবারে রাস্তায় আসিয়া নামিয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে রণজিৎ চোখ মেলিয়া দেখে সূর্য্যের আলো জানালা-দরজার ফাঁক দিয়া ঘরের মধ্যে দস্তুরমত উঁকি দিতে সুরু করিয়া দিয়াছে। তাড়াতাড়ি শিয়রের কাছ হইতে রিষ্ট্‌ওয়াচ্‌টি তুলিয়া দেখিল, বেলা সাড়ে সাতটা। ধড়্‌মড়্‌ করিয়া সে উঠিয়া বসিল; বাহিরের বারান্দায় চাকর আগেই বাল্‌তি ভরা জল রাখিয়া গিয়াছিল, মুখ-হাত ধুইয়া বাহির হইয়া পড়িতে সময় তাহার বেশী লাগিল না। রাস্তায় বাহির হইয়াই সে ধরিল সোজা ডাফ্‌ ষ্ট্রীটের পথ; ভোরে আসিয়া তাঁহার সহিত চা খাইবার জন্য হুকা-কাশি কাল রাত্রেই তাকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন, চা-পানের পর তুইজন একই সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িবেন, এই রকম কথা আছে।

বীডন ষ্ট্রীটের মোড় ছাড়াইয়া ডাফ্‌ ষ্ট্রীটে ঢুকিতেই রণজিৎ দেখিল খুব জম্‌কালো আচ্‌কান ও তক্‌মা-পরা এক বিশাল চেহারার ভোজপুরী দ্বারোয়ান একখানা কাগজের স্লিপ হাতে লইয়া গোটা ফুটপাথ্‌ ময় কাপাটী খেলার মত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে; কোন একটা বাড়ীর ঠিকানা সে চায়, অথচ খুঁজিয়া সে তা বাহির করিতে পারিতেছে না। রণজিৎকে সামনে পাইয়াই সে আড়াই গজি এক সেলাম ঠুকিয়া স্লিপের কাগজখানা তাহার হাতে দিল, উদ্দেশ্য বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া সে তাহার এই কাপাটী খেলা হইতে তাহাকে রেহাই দেয়।

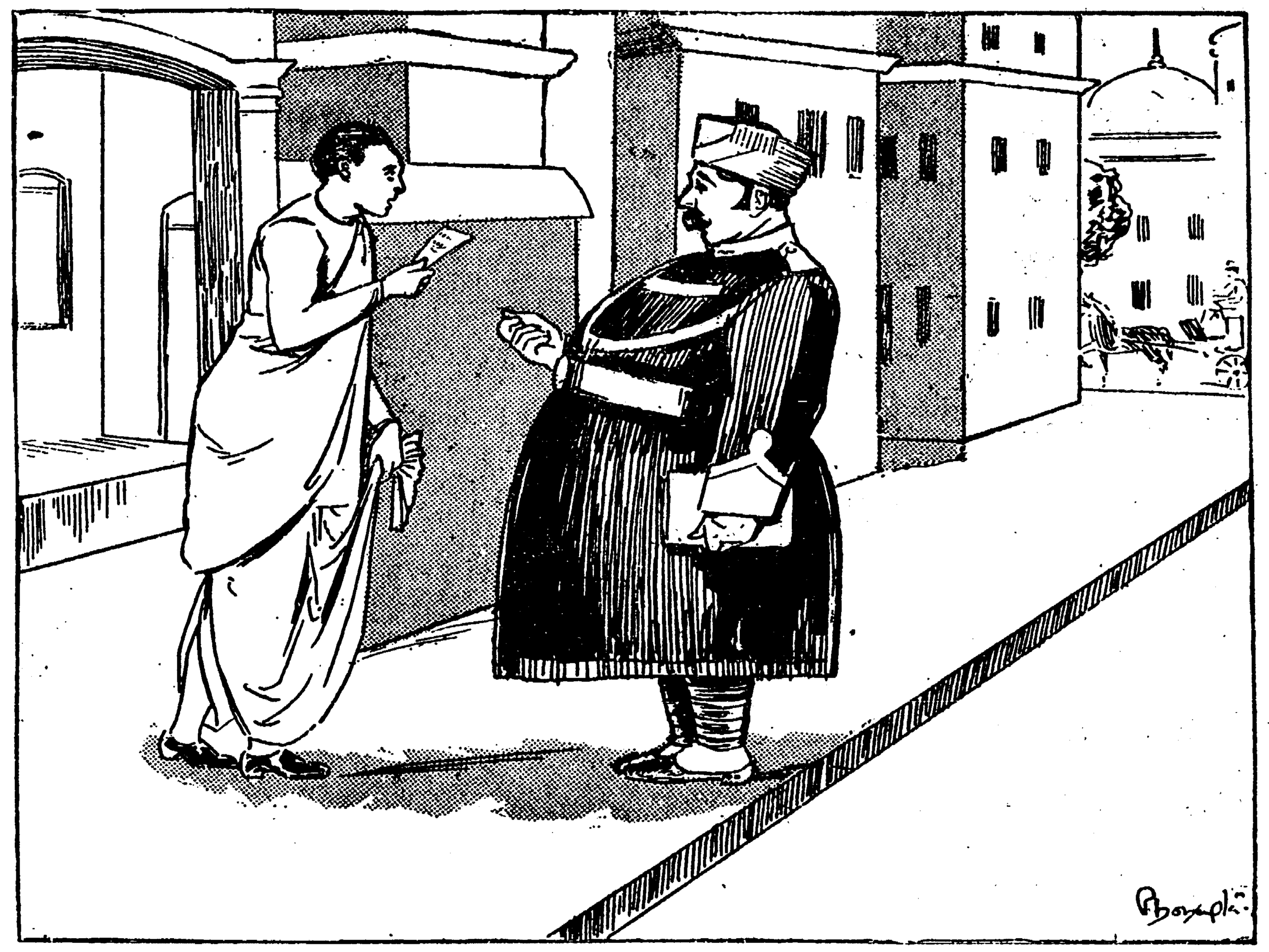
বিশাল চেহারার ভোজপুরী দ্বারোয়ান।

উপরের শিরোনামার উপর চোখ পড়িতেই কিন্তু রণজিৎ চম্‌কাইয়া উঠিল—হুকা-কাশির নাম!

লোকটাকে প্রশ্ন করিয়া সে জানিতে পারিল 'নলকোপা-কুঠিসে' সে আসিতেছে। ইহারই মধ্যে কথা বলিতে বলিতে কোন্‌ ফাঁকে তার চোখ তুটী যে লেখা কাগজখানার উপর দিয়া চলিয়া গেল তা বোধ করি সে নিজেও টের পায় নাই। কিন্তু লেখার মর্ম্ম টুকু জানিতে পারিয়া সে এমনই বিচলিত হইয়া উঠিল যে পরের উদ্দেশ্যে লেখা স্লিপ্‌খানা পড়া যে তার উচিত হয় নাই—একথা একবারও তার মনে জাগিল না, পরম আগ্রহভরে দ্বারোয়ানকে সঙ্গে লইয়া হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে সে আগাইয়া চলিল। স্লিপ্‌খানায় নীল পেন্সিলে খুব তাড়াতাড়ি মাত্র এই কয়টী কথা লেখা ছিল—"পাখী ধরা পড়িয়াছে, আপনার আসা নিতান্ত দরকার।"

হুকা-কাশির বাড়ীর সামনে আসিয়া রণজিৎ দেখিল দরজা-জানালা সবই ভিতর হইতে বন্ধ। ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখে বেলা সাড়ে আট্‌টা বাজিয়া গেছে। খুব ভোরে ঘুম হইতে ওঠা হুকা-কাশির বহুদিনকার অভ্যাস রণজিৎ তা জানিত, তার উপর আবার তিনি তাকে চায়ের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। এত বেলা পর্য্যন্ত তাই দরজা-জানালা বন্ধ থাকায় সে ভারী আশ্চর্য্য বোধ করিল, ঘরে উঠিয়া সে যে অপেক্ষা করিবে এমন দরজাটী পর্য্যন্ত খোলা নাই। খুব খানিকটা কড়া নাড়িয়াও যখন ভিতর হইতে কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না, তখন অবাক্‌ হইয়া রণজিৎ ভাবিতে লাগিল, আজ ইহাদের হইল কি? ভিতরের অবস্থাটা যদি বোঝা যায়, এই ভরসায় এদিক্‌ ওদিক্‌ সে নানা রকম উঁকি-ঝুঁকি মারিতেও কসুর করিল না, কিন্তু সবই বৃথা, বাড়ীতে যে কোন লোকজন আছে কোন প্রমাণই তার পাওয়া গেল না। কি করিবে, দাঁড়াইয়া তাই যখন সে ভাবিতেছিল হঠাৎ তখন একটা কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায়, ভূপেশ বাবুর দ্বারোয়ানকে সে সেইখানে দাঁড় করাইয়া পাশের একটা সরু গলি দিয়া একেবারে বাড়ীর পেছনে আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই সবিস্ময়ে দেখে পেছনের দরজা একেবারে সম্পূর্ণ খোলা। সেই খোলা দরজার পথে রণজিৎ বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু তবুও লোকজনের সাক্ষাৎ নাই! ভিতরে ঢুকিয়া প্রথমেই সে চট্‌পট্‌ আলো বাতাস প্রবেশের জন্য কয়েকটা জানালা খুলিয়া দিয়া শেষে হুকা-কাশির নাম ধরিয়া জোরে কয়েকটা হাঁক ছাড়িল, কিন্তু যথা পূর্ব্বং তথা পরং—না মিলিল হুকা-কাশির জবাব, না তার বেহারা-অমৃতের। জবাব মিলিল না

বটে, কিন্তু তার যেন মনে হইল পাশের ভাঁড়ার ঘরটি হইতে কেমন একটা ছুটো-পটির শব্দ আসিতেছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজা খুলিয়া সেই ঘরে ঢুকিতেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়িল বোধ করি তার পায়ের তলাকার মাটি ফাটিয়া দুইভাগ হইয়া গেলেও সে তার চাইতে বেশী স্তব্ধ হইত না—হুকা-কাশি ও তাঁহার বেহারা অমৃত পাশাপাশি মাটীতে পড়িয়া গড়াইতেছে; তাঁহাদের হাত-পা মোটা শক্ত দড়ি দিয়া বাঁধা এবং প্রত্যেকেরই মুখে এক একটী কাপড় গোঁজা। মনে হইল সে কাপড় একেবারে তাঁহাদের গলা অবধি চলিয়া গেছে এবং তাহারই চাপে দম যেন তাঁহাদের বন্ধ হইয়া আসিতেছে; মুখখানাকে হাতের সহিত ঘষিয়া ঘষিয়া সে কাপড় তাঁহারা সরাইয়া ফেলিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন বটে কিন্তু সে চেষ্টা তাঁদের সফল হইতেছে না!

(ক্রমশঃ)

হানিবল

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর-এ-এস্)

(১)

"এই বেদীর উপর প্রতিজ্ঞা কর তুমি কখন রোমের লোকের প্রতি বন্ধুত্বের ভাব পুষিবে না"—৯ বৎসরের বালকের উপর পিতার এই আদেশ হইল। বালক বিনা ওজরে আদেশ মানিয়া লইল।

এই বালক হানিবল। পিতা হামিল্‌কার ছিলেন কার্থেজের সেনাপতি। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন স্পেন দেশের খানিকটা কার্থেজের দখলে ছিল। হামিল্‌কার সেখানে কার্থেজের ক্ষমতা আরও বাড়াইবার জন্য যাত্রা করার উদ্যোগে ছিলেন ও দেবতার নিকট পূজা দিতেছিলেন। পুত্র হানিবলকে নিকটে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি স্পেনে যাইবে?" বালক আহ্লাদের সহিত স্বীকার করিল। তখন কার্থেজের সহিত রোমের ঘোর বিবাদ। তাই হামিল্‌কার পুত্রকে এইরূপ শপথ করাইয়া লইলেন।

(২)

একটু গোড়ার কথা জানা আবশ্যক। জগদ্বিখ্যাত রোম নগর এই সময়ে আস্তে আস্তে দেশ-

* তখনও খৃষ্টান বা মুসলমান ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। যীশুখৃষ্টের জন্মের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে হানিবলের এই শপথ।

বিদেশ জয় করিতেছিল। আবার, তাহার পূর্ব্বেই এসিয়ার পশ্চিম ভাগে আর একটা জাতি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সাবেক কালে বাণিজ্যে এত বড় জাতি আর হয় নাই। ইহাদের জাহাজ নানাদেশে ঘুরিত, পশ্চিমে বিলাত ও পূর্ব্বে ভারতবর্ষও বাদ পড়িত না। বাণিজ্যরক্ষার জন্য জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র-সমেত যোদ্ধা থাকিত; খাঁটি যুদ্ধজাহাজও যথেষ্ট ছিল। ইহারা স্থানে স্থানে বাণিজ্যের কুঠী বসাইত আর সে সব জায়গার যতটা পারিত নিজেরা দখল করিয়া লইত। এই ফিনিসীয় জাতির একটা শাখা আফ্রিকার উত্তরে কার্থেজ নগর বসাইয়াছিল। সেখানে যেমন বাণিজ্য, তেমনি রাজত্বও চলিত। রোমের লোক যুদ্ধবিদ্যাটাই ভাল বুঝিত, ইহারা বুঝিত—সকলের উপরে ধন-দৌলত।

হানিবল।

এই ধন-দৌলত উপলক্ষেই আশে পাশের জায়গা লইয়া দুই পক্ষে বিবাদ বাধে। এক দিকে ইটালী—রাজধানী রোম—অন্যদিকে কার্থেজ; মধ্যে ভূমধ্য সাগর ও তাহার মধ্যে কতকগুলি দ্বীপ। এই সকল দ্বীপের কর্ত্তৃত্ব লইয়া খুব রেষারেষি লাগিয়া যায়। সিসিলী দ্বীপ অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্থেজের হুকুম মানিয়া চলিত, শেষে ইহার বেশীর ভাগই রোমের হাতে গিয়া পড়ে। সার্ডিনিয়া দ্বীপও আগে কার্থেজের ছিল, পরে রোমের হয়। রোম কার্থেজের দেখাদেখি—কার্থেজের একটা ভাঙ্গা জাহাজকে নমুনা করিয়া, লোকজনকে বালির উপর দাঁড় টানা অভ্যাস করাইয়া নিজের যুদ্ধজাহাজ তৈয়ারী করিয়াছিল। অনেক বার মা'র খাইয়া ক্রমে সমুদ্রেও সে একটা বড় গোছের হইয়া পড়ে।

হামিল্‌কার বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সিসিলী দ্বীপে কার্থেজের মান রাখিয়াছিলেন। অন্য লোকের দোষে কার্থেজ সিসিলী হারাইয়াছিল, তাঁহার দোষে নয়। কার্থেজের বিদেশী সৈন্যসামন্ত বিদ্রোহী হইলে হামিল্‌কারই তাহাদের হাত হইতে নিজের দেশটাকে বাঁচাইয়াছিলেন। স্পেনে বড় রকমের কিছু করিয়া কার্থেজকে আবার বড় করিবেন, রোমকে

আবার জব্দ করিবেন এই উদ্দেশ্যেই তিনি স্পেন্ দেশের ভার লইলেন। বালক হানিবল সঙ্গে চলিল।

(৩)

হানিবল পিতার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধ ত শিখিলেনই, আরও অনেক কিছু শিখিলেন; কলাবিদ্যাও বাদ পড়িল না। গ্রীক্ ভাষা পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিলেন। হামিল্‌কার স্পেন্ দেশে কার্থেজের প্রভুত্ব বাড়াইতে লাগিলেন, চোর ডাকাতদের জব্দ করিতে লাগিলেন, নূতন নগর বসাইলেন, যাহাতে দেশের ধন-দৌলত বাড়ে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে একবার দস্যুদিগের হাতে পড়িয়া, নিজের পুত্র ও বন্ধুদিগকে বাঁচাইতে গিয়া এক নদীতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন। তখন তাঁহার স্থান অধিকার করিলেন তাঁহার জামাতা হ্যাজ্‌ড্রুবল, আর এই ভগিনীপতির অধীনে দ্বিতীয় সেনাপতির পদ পাইলেন হানিবল। হানিবলের বয়স তখন ১৮ বৎসর মাত্র। হ্যাজড্রুবল ফন্দীবাজ লোক ছিলেন, কিন্তু কেবল ফন্দীতে সব কাজ হয় না, যেখানে বলের প্রয়োজন হইত সেখানে প্রায়ই হানিবলের ডাক পড়িত। স্পেনে কার্থেজের রাজ্য ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিল। নূতন কার্থেজ নামে একটী ভাল রকমের নগর বসিল (কার্ত্তাজেনা নামে এই নগর এখনও বর্ত্তমান)। রোম হিংসায় জ্বলিয়া গেল।

(৪)

হ্যাজড্রুবল ৮ বৎসর স্পেনে কর্ত্তৃত্ব করার পর এক ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিলেন। তখন সৈন্যের দল হানিবলকে তাহাদের কর্ত্তা ঠিক করিয়া লইল। কার্থেজের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে সায় দিলেন। হানিবল নানা রকমে কার্থেজের ক্ষমতা বাড়াইতে লাগিলেন। স্পেনের একটা নগর লইয়া রোমের সহিত তাঁহার বিবাদ বাধিল। তিনি রোমের দূতদিগকে অল্প কথায় বিদায় দিয়া নগরটী নিজে ঘেরাও করিলেন ও ক্রমে দখল করিয়া লইলেন। রোমের তখন বুঝিতে বাকী রহিল না যে কেবল কথায় চিঁড়ে ভিজিবে না, যুদ্ধ বাধিবেই। রোম হইতে কার্থেজে দূত গিয়া অনেক কথা শুনাইয়া দিল। দূতদিগের দলপতি তাঁহার লম্বা পোষাকের ভাঁজ দেখাইয়া বলিলেন—"যুদ্ধ ও সন্ধি ইহার মধ্যে, কোন্‌টা চাই?"—কার্থেজের কর্ত্তৃপক্ষ উত্তরে বলিলেন—"যাহা আপনার ইচ্ছা"। দলপতি তখন বলিলেন, "তবে যুদ্ধই দিলাম"। কার্থেজের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সভ্য বলিলেন—"তথাস্তু।"

রোমানেরা মনে করিয়াছিল স্পেনেই যুদ্ধটা চলিবে। তখনও তাহারা হানিবলকে চিনিত না। তিনি যে আল্পস্ পর্ব্বত ডিঙ্গাইয়া একেবারে ইটালীতে গিয়া রোমানদিগকে ঠেঙ্গাইবেন ইহা কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারে নাই। কিন্তু হানিবল তাহাই করিলেন। আর, সে কেমন তেজে? রোমান সৈন্য তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যেখানে যেখানে পথ আট্‌কাইবে মনে করিয়াছিল তাহারা

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তিনি সে সব স্থান ছাড়াইয়া গেলেন। শীত, গ্রীষ্ম, বরফ, রৌদ্র গ্রাহ্য না করিয়া হুড়্ হুড়্ করিয়া হাতী-ঘোড়া লইয়া, কত নদী-পর্ব্বত পার হইয়া, কত অসভ্য জাতির বাধা-বিঘ্ন এড়াইয়া একেবারে ইটালীতে গিয়া পড়িলেন। আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত সৈন্যসামন্ত লইয়া পার হওয়া—সে কি সোজা কথা? কিন্তু হানিবল লোকটাই কি সোজা ছিলেন? শীতে বরফের মধ্যে কাঁপিতে কাঁপিতে কত সৈন্য, কত ঘোড়া হাতী মারা গেল, খাবার জিনিষ ফুরাইতে লাগিল, কিন্তু হানিবল পিছ্‌পা হইলেন না। যে সৈন্য লইয়া তিনি রওনা হইয়াছিলেন তাহার অল্পই ইটালী পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিয়াছিল কিন্তু তিনি তাহাতেও দমিলেন না।

টিসিনাস্ নদীর উপর রোমের কন্‌সাল্ * সিপিওর সহিত যুদ্ধ বাধিল। রোমানেরা হারিয়া গেল। কন্‌সাল্ ঘা খাইয়া তাঁহার ১৮ বৎসর বয়সের পুত্র কর্ণিলিয়াস্ সিপিওর চেষ্টায় প্রাণে রক্ষা পাইলেন। যুদ্ধে জয় হইলেই অনেক বন্ধু যোটে। গল্ জাতীয় অনেক লোক হানিবলের সৈন্যের খাবার জিনিষ যোগাইতে আসিল ও তাঁহার দলে ঢুকিয়া পড়িল। হানিবল ৩০ হাজারেরও কম সৈন্য ইটালী পর্য্যন্ত আনিতে পারিয়াছিলেন; তাঁহাকে সৈন্য যোটাইতে হইল এই সব রোমের বিপক্ষ-দলে হইতে। টিসিনাসের যুদ্ধের পর একটা বড় যুদ্ধ হইল ট্রিবিয়া নদীর তীরে। রোমের দুই কন্‌সাল্‌ই এই যুদ্ধে ভয়ানক রকম হারিয়া গেলেন।

ইহার পর হানিবল আপিনাইন্ পর্ব্বত পার হইলেন এবং এক ভীষণ যুদ্ধে রোমের সৈন্য ধ্বংস করিয়া দিলেন। রোমে হাহাকার পড়িয়া গেল—লোক এক দেবতা ছাড়িয়া অন্য দেবতার দয়া ভিক্ষা করিতে লাগিল। কন্‌সাল্ মহাশয় ম্যাক্সিমাস্ নামক এক ব্যক্তিকে সর্ব্বময় কর্ত্তা (dictator) করিয়া তাঁহার হাতে কার্য্যভার ছাড়িয়া দিলেন।

হানিবল কখনও বীরত্ব, কখনও কৌশল দেখাইয়া ইটালীতে ঘুরিতে লাগিলেন এবং লুট্‌পাট্ করিয়া দেশটা ছারখার করিয়া দিলেন। আবার ক্যানি নামক স্থানে একটা বড় রকমের যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে হানিবল রোমের ৮০ হাজার সৈন্য কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে তিনি রোম আক্রমণ করিবেন এইরূপ ভাণ করিয়া অনেক দূর অগ্রসর হইলেন কিন্তু সত্য সত্যই রোম আক্রমণ করিলেন না। রোম ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, হানিবল যেখানে সেখানে রোমের সৈন্য আক্রমণ করিয়া নাস্তানাবুদ করিতে লাগিলেন।

(৫)

হানিবলের দলে তাঁহার স্বদেশী সৈন্য অল্পই ছিল আর তিনি বহু কাল ছিলেন পরের দেশে, একটী মস্ত বড় বীরজাতির দেশে। রোমানেরা হারিয়াও হারিল না—আস্তে আস্তে যেখানে সুবিধা পাইল নিজেদের নগরগুলি আবার দখল করিতে লাগিল। হানিবলের এক ভ্রাতা তাঁহাকে সাহায্য

* রোমে শাসনকার্য্যের ভার দুইজন প্রধান ব্যক্তির উপর থাকিত। ইহাদিগকে কন্‌সাল্ বলিত।

করিতে স্পেন হইতে আসিতেছিলেন কিন্তু পথেই রোমানেরা তাঁহাকে ভয়ানক রকম হারাইয়া দিয়া তাঁহার মাথাটা কাটিয়া ফেলিল ; তার পর সেই মাথাটা হানিবলের এক তাঁবুতে ফেলিয়া দিয়া গেল। হানিবলের অন্য এক ভ্রাতাও অন্য জায়গায় যুদ্ধে আঘাত পাইয়া মারা গেলেন।

এদিকে স্পেন হইতে রোমের সেনাপতি কর্ণিলিয়াস্ সিপিও ফিরিয়া আসিলেন—তাঁহার মনে হইল, কার্থেজে গিয়া আঁতে ঘা লাগাইতে পারিলে হানিবল কাবু হইবেন। লোকে তাঁহাকেই কন্সাল্ করিয়া দিল এবং সিসিলীর শাসনভারও তাঁহার উপর পড়িল। নিজের চেষ্টায় সৈন্য যোটাইয়া সিপিও আফ্রিকার দিকে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া যুদ্ধের পর যুদ্ধ জিতিতে লাগিলেন, কার্থেজের সেনাপতিদের শিবির পোড়াইয়া দিলেন। কার্থেজের লোক ভয়ে হানিবলকে দেশে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রায় ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ইটালীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া হানিবল দুঃখিত মনে কার্থেজ যাত্রা করিলেন।

(৬)

হানিবল কেবল বীর ছিলেন না, তিনি রাজনীতিও বুঝিতেন। দেশের অবস্থা দেখিয়া তিনি প্রথমে সন্ধির চেষ্টা করিলেন। তাহাতে কোন ফল হইল না, যুদ্ধই বাধিল। হানিবলের দলে নানা রকমের লোক মিশান ছিল। তাঁহার ভক্ত হইলেও সকলেই কার্থেজের ভক্ত ছিল না। যুদ্ধের সময় তাহারা অন্য সৈন্যের সহিত একযোগে কাজ করিল না, তাঁহার হাতীগুলিও বিগ্ড়াইয়া গেল। ফলে জামার যুদ্ধে হানিবল সিপিওর নিকট হারিয়া গেলেন—রোমের জয়জয়কারে আকাশ ভরিয়া গেল।

রোমের সহিত কার্থেজের সন্ধি হইল। কার্থেজ স্বাধীনতা হারাইল না বটে কিন্তু তাহার ক্ষমতা অত্যন্ত কমিয়া গেল, রোমকে মোটা রকমের জরীমানাও দিতে হইল। সিপিও দেশে ফিরিয়া আফ্রিকেনাস্ উপাধি পাইলেন।

(৭)

কিছুদিন হানিবল কার্থেজে রাজকার্য্য চালাইলেন, দেশের উন্নতির অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার বিপক্ষে একটা প্রবল দল ছিল। দেশের লোকের টাকায় সুখভোগই তাহারা জীবনের সার বুঝিয়াছিল। তাহারা রোমের সাহায্যে হানিবলের সর্ব্বনাশ করার চেষ্টায় রহিল। হানিবল বেগতিক দেখিয়া এক জাহাজে চড়িয়া টায়ার নগরে চলিয়া আসিলেন। টায়ার ছিল ফিনিসীয় জাতির মূল আড্ডা। টায়ারের লোক তাঁহার খুব আদর-যত্ন করিল। তিনি শেষে সিরিয়ার গ্রীক্ রাজা এন্টিওকাসের নিকট গিয়া তাঁহার কার্য্যে ভর্ত্তি হইলেন। রোম হানিবলের চিরশত্রু ; হানিবল সিরিয়ার রাজাকে ইটালী আক্রমণের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু হানিবলের পরামর্শ গ্রহণের মত সাহস এন্টিওকাসের ছিল না। এন্টিওকাস্ হানিবলের পরামর্শ-মত চলিলেন না,

অথচ রোমের সহিত যুদ্ধ বাধাইয়া দিয়া নিজে হারিয়া গেলেন। হানিবল দেখিলেন—মহা বিপদ্। এখন হয়ত রোমের লোক রাজার নিকট হইতে তাঁহাকে চাহিয়া লইবে, শেষে যাহা করিবে তাহা ত সহজেই বোঝা যায়! হানিবল একদিন নিজেই বিষ খাইয়া নিজের প্রাণনাশ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৬৪ বৎসর।

(৮)

একটী গল্প আছে ঃ—যখন এন্টিওকসের সহিত যুদ্ধের পূর্ব্বে তাঁহার নিকট রোমের প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন তখন সেই দলে ছিলেন স্বয়ং সিপিও আফ্রিকেনাস্। সিপিও কথায় কথায় হানিবলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আচ্ছা, আপনার মতে, যত সেনাপতি জন্মিয়াছে তাহাদের মধ্যে সকলের সেরা কে ?"

হানিবল বলিলেন—আলেক্জান্দার।

সিপিও—তাঁহার পর ?

হানিবল—পিরাস্।

সিপিও—তৃতীয় ?

হানিবল—আমি নিজে।

সিপিও—আচ্ছা, আমাকে জয় করিতে পারিলে আপনি কি বলিতেন ?

হানিবল উত্তরে বলিলেন—তাহা হইলে আমি নিজেকে আলেক্জান্দারেরও উপরে বলিতাম।

আলেক্জান্দার।

বাস্তবিক এত বড় বীর পৃথিবীতে খুব কমই জন্মিয়াছে, আফ্রিকাতে ত আর জন্মেই নাই। যেমন সাহস, তেমনি যুদ্ধকৌশল। সৈন্যেরা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিত। না বাসিবেই বা কেন ? তাহাদিগকে যে সকল কষ্ট সহ্য করিতে হইত তিনি তাহাদিগের সহিত সমানে তাহা সহ্য করিতেন। যেখানে বিপদ্ সেখানে যাইতেন সকলের আগে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া অকাতরে কাজে লাগিয়া থাকিতেন। বিছানা-পত্র নাই, মাটীর উপর শুইয়াই রাত্রি কাটাইয়া দিতে পারিতেন। নিজে খুব ভাল ঘোড়-সওয়ার হইলেও আবশ্যকমত সৈন্যদলের সহিত হাঁটিয়া চলিতেন,

মাথা-পোড়ান রৌদ্র বা রক্তজমান বরফ কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না! সেকালে বা একালে এ রকমের বীর কয়জন পাওয়া যায়?

মঞ্জুলিকার পণ

(শ্রীরসোদর শর্ম্মা)

রাজকুমারী মঞ্জুলিকার আর কোন বিষয়ে খুঁত ছিল না, কেবল দোষের মধ্যে ছিল তার বিদ্যার অহঙ্কার। অবশ্য বিদ্যা-বুদ্ধি যে তার যথেষ্ট ছিল সে কথা কেউ অস্বীকার করিবে না কিন্তু তাই বলিয়া অতটা জাঁক করা তার উচিত হয় নাই। ব্যাপারটা বুঝি জান না? তবে শোন। রাজামশাই মেয়ের বিবাহের জন্য দেশ-বিদেশ খুঁজিয়া এমন চমৎকার পাত্র ঠিক করিলেন আর মেয়ে কিনা বলিয়া বসিল—যাকে তাকে সে বিবাহ করিতে পারিবে না; তার বর সে নাকি নিজে পরীক্ষা করিয়া লইবে। বুদ্ধির লড়াইয়ে যে তাকে হারাইতে পারিবে তাকেই সে বিবাহ করিবে, আর কাহাকেও নয়।

রাজার আর ছেলেপিলে নাই, ঐ একটি মাত্র মেয়ে,—বড় আদরের। রাজা তার কথা ঠেলিতে পারিলেন না। রাজকুমারীর বড়াইএর কথা শুনিয়া দেশ বিদেশ হইতে রাজপুত্র আসিতে লাগিল; কিন্তু ওরে বাবা! মঞ্জুলিকার বুদ্ধির কাছে তাহাদের কাহাকেও দাঁড়াইতে হইল না। সে এমন এক একটা প্রশ্ন করিয়া বসে কিংবা এমন এক একটা কাজের ভার দেয় যে দু'দিনেই রাজপুত্রের দল বাপ্ বাপ্ করিয়া পালাইতে পথ পায় না। এমনি করিয়া দিন যায়, বছর যায়, রাজকন্যার আর পাত্র মেলে না।

২

শিবু বেচারার বাপও নাই, মাও নাই। সে মামাবাড়ীতে থাকে আর পড়াশুনা করে। মামীমা তাহাকে একটুও দেখিতে পারেন না, কথায় কথায় ধমক্, বকুনি এমন কি মারও খাইতে হয়। তার উপর সব সময় ভাল করিয়া খাবারও পায় না। শিবু ঠিক করিল আর সে এভাবে থাকিবে না। পুরুষ মানুষ, নিজের পায়ে ভর দিয়া

দাঁড়াইবে। দেশে ভাত না জোটে বিদেশে গিয়া রোজগার করিয়া খাইবে। এ রকম কত লোকে করে, সে বইতে পড়িয়াছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে মঞ্জুলিকার বাপের দেশে আসিয়া হাজির। সারা দিন হাঁটিয়া হাঁটিয়া পায়ে বেদনা ধরিয়া গিয়াছে, দু'দিন ধরিয়া পেটেও কিছু পড়ে নাই, সে আর চলিতে পারিতেছিল না; সম্মুখে এক মুদির দোকান্ দেখিয়া তার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল। মুদি চোখে এক ভাঙ্গা টিনের চশমা লাগাইয়া এক মনে রামায়ণ পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, "কি চাই?"

শিবু নিজের অবস্থা খুলিয়া বলিল। সে বিদেশী, চাকরীর খোঁজে আসিয়াছে। মুদি যদি তাকে দয়া করিয়া রাখে—, মাহিনা সে বেশী চায় না।

মুদি বিরক্ত হইয়া জবাব দিল, "না, না, এখানে কোন লোকের দরকার নেই, তুমি যেতে পার।"

শিবু যাইবার জন্য উঠিতেছিল, হঠাৎ ভিতর হইতে মুদির বৌ ডাক দিল। মুদির ছেলেপিলে ছিল না। রোগা মত, সুন্দর চেহারার অল্পবয়সী ছেলেটিকে দেখিয়া মুদি-বৌর বড় মায়া হইল। সে স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, "আহা, থাক্ না। বিদেশ থেকে এসেছে, যে ক'দিন কাজ না জোটে আমাদের এখানেই থাক্ না। এস বাবা, তুমি ভিতরে এস।"

৩

শিবু মুদির দোকানেই রহিয়া গেল। মুদিবৌ তাহাকে ছাড়িল না, শেষটায় মুদিও তার দিকে ঝুঁকিল। ছেলেটির স্বভাব বড় ভাল—আর বেশ তোখোড় বুদ্ধি। যে সব হিসাব মিলাইতে গিয়া মুদি এতদিন একেবারে হিমসিম খাইয়া যাইত শিবু এখন সেগুলি দিব্যি সহজে ঠিক দিয়া রাখে। মুদিকে দোকানের কাজেও সাহায্য করে, আবার অবসর সময় পুঁথিপত্র খুলিয়া কি সব দেখে, আর লেখে। মুদির বৌকে সে মাসী বলিয়া ডাকে।

সন্ধ্যার পর মুদিবৌর কাছে বসিয়া শিবু সে রাজ্যের নানা গল্প শোনে, মাঝে মাঝে ফোড়নও দেয়। মুদিবৌর কাছেই সে রাজকুমারী মঞ্জুলিকার পণের কথা শুনিল।

দু'দিন গেল, তিন দিন গেল, চারদিনের দিন শিবু বলিয়া বসিল—সে একবার রাজকুমারীর কাছে গিয়া দেখিবে তাকে হারাইতে পারে কিনা। শুনিয়া মুদিবৌ হাসিয়া মাটীতে গড়াইয়া পড়িল।

৪

রাজবাড়ীর সিংহ-দরজায় ঘা পড়িল ; রাজার কাছে খবর গেল রাজকুমারীর জন্য নতুন পাত্র আসিয়াছে ; রাজা শিবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পাত্র দেখিয়া তো রাজার চক্ষুস্থির। এতটুকু একটি ছেলে ; যেমন রোগা, তেমনি তার পোষাক। এই সাজে নাকি আবার কেউ রাজকন্যা বিবাহ করিতে আসে ? এর পরে ত দেখিতেছি রাস্তার কুলি-মজুরও আসিতে সুরু করিবে। যাক্, তবু রাজকুমারীর কাছে খবর গেল।

রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, "পাত্রের পরিচয় কি, কোথায় তার বাড়ী, কি করে সে ?"

উত্তর আসিল, সে কথায় তো কোন দরকার নাই। রাজকুমারীর কাছে বুদ্ধির পরীক্ষা দিতে আসিয়াছে, তাহাই শুধু সে দিবে। জিতিলে রাজকুমারীকে লইয়া যাইবে, বাড়ী ঘর দো'র তখনই তিনি দেখিতে পাইবেন।

লোকটার দম্ভভরা কথা শুনিয়া মঞ্জুলিকার গা জ্বলিয়া গেল। সে বলিয়া পাঠাইল—রাত দিন যে সে আসিয়া তাকে বিরক্ত করিবে, এ সে সহ্য করিবে না। এবার হইতে যে হারিবে তাকে চাকর হইয়া থাকিতে হইবে। শিবু উত্তরে বলিয়া পাঠাইল, "বেশ, আমি রাজী।"

পাত্রের চেহারা দেখিয়া মঞ্জুলিকা আর এক দফা জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু উপায় কি ? ছেলেটা সব সর্ত্তেই রাজী। রাজকন্যা বলিল, "আমি তোমাকে তিনটি কাজ কর্‌তে দেব, যদি তা কর্‌তে পার তবেই তুমি জিত্‌বে ; কাল সকালে এস।" ছোট্ট একটি "বেশ" বলিয়া শিবু চলিয়া আসিল।

৫

পরের দিন শিবু রাজবাড়ীতে হাজির হইলে রাজকন্যা তাকে বাগানের ভিতর লইয়া গেল। বাগানের এক কোণে ছোট্ট একটি কূয়া। কূয়াটি ১০।১২ হাত গভীর; কিন্তু তাতে এক ফোঁটাও জল নাই—একেবারে খট্‌খটে শুক্‌না। চওড়ায় কূয়াটা

দু' হাতের বেশী হইবে না। রাজকুমারী একটা রবারের বল্ লইয়া তার মধ্যে ফেলিয়া দিল। তার পর শিবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, "এই কূয়োর মধ্যে না নেমে, কিংবা কোন আঁক্‌শী না দিয়ে শুধু হাতে বল্‌টা আমাকে তুলে দাও।" শিবু মিনিট খানেক ভাবিয়া লইল, তার পর এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কাছেই একটা পুকুর রহিয়াছে আর তার ধারে কতকগুলি আধ-ভাঙ্গা মাটীর হাঁড়ী পড়িয়া আছে। সে হাঁড়ীতে করিয়া পুকুর হইতে জল তুলিয়া আনিয়া কূয়ার মধ্যে ঢালিতে লাগিল। খানিক পরেই কূয়া ভর্ত্তি হইয়া গেল আর বল্‌টা উপরে ভাসিয়া উঠিল। শিবু হাসিয়া বল্‌টি তুলিয়া রাজকুমারীর হাতে দিল। পরাজয়ের রাগে রাজকুমারীর মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। কোন রকমে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "আচ্ছা কাল আবার এস, দ্বিতীয় কাজ দেব।"

হাসিয়া বল্‌টি তুলিয়া রাজকুমারীর হাতে দিল।

৬

পরের দিন শিবু আবার গিয়া হাজির। রাজকুমারী তাকে একটা ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। ঘরের মেঝেতে এক আঁটি খড় বিছান ছিল। সেইটার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া রাজকন্যা বলিল, "এই খড়টুকু দিয়ে এই ঘরটা ভর্ত্তি কর্‌তে হ'বে।"

শিবু প্রথমটা চটিয়া বলিল, "সে কেমন করে হবে ?" রাজকুমারীর মুখে এক ঝলক হাসি খেলিয়া গেল, শিবু বড় ঘাবড়াইয়া গেল। তার পর খানিক ভাবিয়া লইয়া বলিল, "আচ্ছা দাঁড়ান, আমি আসছি।" একটু পরেই শিবু ফিরিল ; তার এক হাতে এক ঘটি জল আর এক হাতে একটা দিয়াশলাই। গম্ভীর মুখে খড়ের আঁটিতে জল

ছিটাইয়া সে তার মধ্যে একটা দিয়াশলাইএর কাঠি জ্বালাইয়া ধরিল। দেখিতে দেখিতে কুণ্ডলী পাকাইয়া গাঢ় ধোঁয়া সমস্ত ঘর ভরিয়া ফেলিল। ধোঁয়ায় রাজকন্যার চোখ ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে রাগিয়া বলিল, "এ কি হচ্ছে ?" শিবু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, "কেন, আপনিই ত বল্লেন এই খড়গুলো দিয়ে ঘর ভর্ত্তি করতে। এ সব ধোঁয়া ত ঐ খড়টুকু থেকেই বার হচ্ছে আর তা দিয়ে ঘরও ভর্ত্তি হয়েছে বোধ হয়।" রাজকন্যা চোখ মুছিতে মুছিতে ঘর হইতে বাহির হইল। তার পর রাগে ফুলিয়া বলিল, "কাল তৃতীয় কাজ দেব।"

সে রাত্রে আর রাজকুমারীর ঘুম হইল না। শেষটায় কি এই ছেলেটার কাছেই তাকে হার মানিতে হইবে নাকি! অবশ্য ছেলেটিকে যে তার খুব মন্দ লাগিতেছিল তা নয়, আর বুদ্ধিতেও যে সে কারও চাইতে কম নয় তাও মঞ্জুলিকা টের পাইয়াছে কিন্তু তাই বলিয়া তার কাছে হার স্বীকার করা অসম্ভব, অসম্ভব; মঞ্জুলিকার যে তাতে মাথা কাটা যাইবে! সারা রাত্রি সে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কাল ছেলেটা আসিলে তাকে কি কাজ দেওয়া যায়।

৭

পরদিন যথা সময়ে শিবু আবার হাজির। রাজকুমারী তাকে একটা কাচের লণ্ঠন দিয়া বলিল, "এটা জ্বেলে আনতে হবে, কিন্তু খবরদার, এতে আগুন লাগাতে পারবে না।" শিবু লণ্ঠন লইয়া বলিল—সে রাত্রে আলো সমেত হাজির হইবে।

বাড়ী ফিরিয়া লণ্ঠনটি ঘরের কোণে রাখিয়া শিবু খাওয়া-দাওয়া করিল। তার পর লাগাইল ঘুম। সন্ধ্যাবেলা মুদিবৌ তাকে ঠেলিয়া তুলিল। মুদিবৌ তো অবাক্! যার মাথার উপর এমন একটা অসম্ভব কাজের ভার সে নাকি সারাদিন নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারে?

শিবু ধীরে-সুস্থে উঠিয়া হাত মুখ ধুইল; তারপর লণ্ঠনটি হাতে করিয়া নদীর ধারে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল।

৮

রাত তখন অনেক হইয়াছে। শিবু এখনও আসে নাই। রাজকন্যার মনে ভয়ানক ফূর্ত্তি। যাক্, তার আর অপমানের ভয় নাই। শিবু নিশ্চয়ই কাজ হাঁসিল

করিতে না পারিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চম্পট দিয়াছে। এমন সময় হাঁফাইতে হাঁফাইতে দাসী আসিয়া শিবুর আগমন-সংবাদ দিল। রাজকুমারী উঠিয়া দেখিল—শিবুর হাতে লণ্ঠন, তার ভিতরে এক ঝাঁক জোনাকি পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। রাজকন্যা তো অবাক্!

তার পর আর কি? রাজকন্যার তো আর আপত্তি করিবার পথ নাই। আর আপত্তি সে করেও না। এমন বুদ্ধিমান্ স্বামী পাইয়া সে সুখীই হইয়াছে। শিবু এখন রাজার জামাই, কিন্তু তাই বলিয়া সে মুদি আর মুদিবৌকে ভুলে নাই। তাদের সে ঠিক তেমনি খাতির করে, আর তারা থাকেও এখন রাজার হালে।

বৈজ্ঞানিক বরযাত্রী সম্বর্দ্ধনা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্-এ, ডি-লিট্ (প্যারিস)

(**পূর্ব্ব কথা** ঃ—হিমাচল বাবু তাঁর জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটিনাটি কাজ বৈজ্ঞানিক মতে করেন। লেখক মহাশয় তাঁর মেয়ের বিবাহে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়া সে সব দেখিয়া আসিয়াছেন এবং সেই বিবাহের বর্ণনা তোমাদের উপহার দিতেছেন)

[শেষাংশ]

ছাদে উঠে দেখি, বিরাট্ ব্যাপার। খানিক ক্ষণ সময় গেল ঠিক করতে যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছি,-- সেটা একটা বাড়ীর ছাদ,—না—কোন রেলওয়ের একটা বড় জংসন ষ্টেসনের কাছাকাছি একটা রেলপথ। ছাদের এক প্রান্ত থেকে রেলওয়ে লাইনের মত তেরো সারি লোহার পাইপ বেরিয়ে চলে গিয়েছে ছাদের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, এবং তার পাশাপাশি চলে গিয়েছে, সরু সরু শিশের তার। অপর প্রান্তে একটু উঁচুতে একটা পর্দ্দা টাঙানো। তার পাশে একটা টেবিলের উপর একটা রেডিও সেট। প্রকাণ্ড ছাদে তেরো সারি আসন পাতা হ'য়েছে। প্রত্যেক সারিতে কতগুলি আসন ছিল, তা গুণ্‌বার সুবিধা হয়নি,—তবে আন্দাজে মনে হ'ল ত্রিশ পঁয়ত্রিশের কম নয়। এক সঙ্গে আন্দাজ পাঁচ শ লোক খাওয়ানোর বন্দোবস্ত। প্রত্যেক আসনের বাঁদিকে দেখ্‌লাম্ টেলিগ্রাফ পোষ্টের মত এক হাত করে উঁচু দুটী খুঁটি। একটী উঠেছে পাইপটা থেকে, অপরটী শিশের তারটী থেকে। পাইপ থেকে যে খুঁটীটা উঠেছে তার উপরের দিক্‌টা গোল হ'য়ে আবার একটু নেমে এসেছে—কতকটা রাস্তার ধারে ইলেক্‌ট্রিক ল্যাম্প-পোষ্টের মত। তার মাঝ-

খানে একটা বোতামের মতন, তার উপর লেখা "টিপুন"। শিশের তারটী থেকে যে খুঁটীটী উঠেছে, তার তলায় একটা সরু কাঠের উপর তিনটী বোতাম, একটীতে লেখা, "লাল," আর একটীতে "সবুজ" ও তৃতীয়টীতে "সাদা"; এবং সেই খুঁটীটীর উপর ঐ তিন রঙের তিনটী ইলেক্‌ট্রিকের বাল্‌ব। এবং সেই খুঁটীটীর উপরে একটা ক্লিপ দিয়ে আটকানো একটী করে ছাপান খাদ্য-তালিকা।

এই সব দেখে শুনে ত আমি অবাক্‌। যা'হো'ক একটা আসনে ত বসে পড়া গেল। বসেই দেখি, খাদ্য তালিকাটার উপরে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—"অনুগ্রহ করিয়া পরিবেশনের পূর্ব্বেই নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পড়িয়া আয়ত্ত করিয়া ফেলুন, নচেৎ পরিবেশনে বিশেষ অসুবিধা হইতে পারে।" লেখাটা দেখেই ক্লিপ থেকে কার্ডখানা খুলে নিয়ে ব্যবস্থাগুলি পড়্‌তে আরম্ভ করে দিলাম।

সবে মাত্র দু' এক লাইন পড়েছি, এমন সময় রেডিও বেজে উঠ্‌ল। মনে কর্‌লাম বুঝি, বিয়ে আরম্ভ হ'ল,—কিন্তু তা' নয়। হিমাচল বাবু রেডিওতে তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কিছু উপদেশ দিচ্ছিলেন। তাঁর সে সুদীর্ঘ বক্তৃতার সারাংশটুকু মাত্র আমি এখানে দিতে পারি; তাঁর ভাষা হুবহু পুনরাবৃত্তি কর্‌তে পারি, এমন স্মৃতি-শক্তি আমার নাই। তাঁর প্রথম বক্তব্য ছিল,—কো-অপারেশন অর্থাৎ সহযোগিতার প্রয়োজনীতা। সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোনো সুব্যবস্থাই সম্ভব নয়। আজকের এই বিরাট ভোজ-ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন কর্‌তে হ'লে, প্রথমেই চাই, ভোজনকারী ও পরিবেশনকারীদের মধ্যে পরিপূর্ণ সহযোগিতা। অতএব তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর পরিবেশন আরম্ভের মধ্যে যে দশ মিনিট কাল ব্যবধান থাকবে, তার মধ্যে আমরা যেন খাদ্য-তালিকায় মুদ্রিত উপদেশগুলি আয়ত্ত করে নিই, এবং অক্ষরে অক্ষরে তা মেনে চলি। হিমাচল বাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল, এই অনুরোধের জন্য একটা কৈফিয়ৎ। অনেক চিন্তা করেও তাঁর আয়োজন তিনি এর চেয়ে বেশী সরল কর্‌তে পারেন নি। তবে সেজন্য বেশী দুঃখ নাই। বিজ্ঞানের দান আমরা যে পরিমাণে গ্রহণ করে জীবনে অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ কর্‌তে থাক্‌ব, ঠিক সেই পরিমাণেই আমাদের জীবনটা জটিলতর হ'য়ে উঠ্‌বে, তার কোন উপায় নাই। কি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়, কি সামাজিক ব্যবস্থায়, কি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, জীবনটা আজকাল সর্ব্বত্রই আগের চেয়ে অনেক জটিলতর হ'য়ে উঠেছে; কিন্তু তাই বলে আমরা বিজ্ঞান-প্রদত্ত সুবিধাগুলো ছেড়ে দিতে পারি না। গোলাপ ফুলের গন্ধ যদি উপভোগ কর্‌তে চাও, তবে গোলাপ গাছের কাঁটা এড়িয়ে চল্‌তে গেলে চল্‌বে না। অতএব আমরা যেন খাদ্য-তালিকায় মুদ্রিত উপদেশগুলো আয়ত্ত কর্‌বার এবং তা' মেনে চল্‌বার কষ্ট স্বীকার থেকে বিরত না হই। হিমাচল বাবুর বক্তৃতার তৃতীয় কথা ছিল, —অপব্যয়-নিবারণ। এই সব ভোজ-ব্যাপারে কত জিনিষ যে বৃথা নষ্ট হ'য়ে থাকে,—তার ইয়ত্তা নাই, অথচ এই অপচয় নিবারণের কোন সদুপায় উদ্ভাবন করা বিশেষ শক্ত। তার প্রধান কারণ

কোন রকম ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের অভাব। আজ পর্য্যন্ত কোন গৃহস্থ, এই সব ভোজ-ব্যাপারে তাঁর অতিথির সংখ্যা, কিংবা কোন্‌ খাদ্যদ্রব্য কত পরিমাণে রান্না হ'য়েছিল, তার কতখানিই বা পরিবেশিত হ'য়ে ছিল, আর কতখানিই বা রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হ'য়েছিল, তার কোনো বিবরণ রাখেন নি। হিমাচল বাবু তাঁর বড় মেয়ে আরতির বিয়ের সময় এই রকম একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, এবং বর্ত্তমান ব্যাপার উপলক্ষে সেটা ব্যবহার করে রান্নার পরিমাণও কিছু কমিয়েছেন। এবারেও তিনি ঐ রকম একটা বিবরণ রাখবার ব্যবস্থা করেছেন, এবং তাঁর ছোট মেয়ে প্রণতির বিয়ের সময় এই দুটো বিবরণই ব্যবহার কর্ব্বেন। কিন্তু অন্যান্য গৃহস্থেরাও যদি তাঁর প্রদর্শিত এই পথ অনুসরণ করেন, তবে সেই সব বিবরণগুলো মিলিয়ে ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য একটা বিশেষ রকম উপযোগী ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স গড়ে উঠ্‌তেও পারে। তবে সেই ষ্ট্যাটিস্‌টিক্সের মধ্যে লিপিবদ্ধ সংখ্যাগুলো যতটা সম্ভব নির্ভুল হওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমরা যেন তাঁহাকে সাহায্য করি। যে আহার্য্যগুলি রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হয়, শুধু সেইগুলিই যে নষ্ট হয় তা ত' নয়, পাতে পরিবেশিত হ'য়েও অনেক জিনিষ নষ্ট হয় এবং সেগুলির আর পরিমাপ করা সম্ভব হয় না। অতএব হিমাচল বাবু আমাদের তৃতীয়বার অনুরোধ কর্‌লেন যেন আমরা খাদ্যতালিকায় মুদ্রিত উপদেশগুলি ভাল রকমই আয়ত্ত করে নিয়ে সেগুলো মেনে চলি। হিমাচল বাবু আরো বল্লেন যে,— সময়-সংক্ষেপ এবং কষ্ট-লাঘবের জন্য পরিবেশনের ব্যবস্থা যতটা অটোমেটিক করা সম্ভব, তা' তিনি করেছেন। যথা—খেতে খেতে কখন যে গেলাসের জল ফুরিয়ে যায়, তার ঠিক নেই, অথচ যখন তখন 'জল' 'জল', করে' চিৎকার করাটা বিশেষ অসুবিধাজনক। এবং তার জন্য পাঁচ সাত জন লোক নিযুক্ত করে রাখাটাও মানব-শক্তির বিরাট্‌ অপব্যয়। তাই তিনি প্রত্যেক আসনের পাশেই একটা করে জলের কল বসিয়ে দিয়েছেন। দরকার হ'লেই বোতাম টেপো, আর যত ইচ্ছা জল গড়িয়ে খাও। হিমাচল বাবু আরো যে কত কি বলেছিলেন,—তা' আমার মনে নেই। বিজ্ঞানের বিন্দু-বিসর্গও জানি না আমি; অত বড় বৈজ্ঞানিকের বক্তৃতা শুনে বুঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌তেই গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'য়ে গেলাম; তা' সে সব কথা মনে থাক্‌বে কি ক'রে? বক্তৃতা যখন শেষ হ'ল, তখন মানসিক পরিশ্রমের ফলে যে বিষম ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল, তাইতেই চারদিক অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। পরিবেশন আরম্ভ হওয়ার আগে পর্য্যন্ত যে দশ মিনিট কাল ব্যবধান ছিল, সেই দশ মিনিট আমার কাছে মনে হ'ল যেন দশ বছর। খাদ্য-তালিকায় মুদ্রিত উপদেশগুলি পড়বার চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় কোন অর্থবোধ হ'ল না। কার্ডখানি সঙ্গে এনেছিলাম, তাই থেকে উপদেশগুলি এইখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

"১। উপরের খাদ্যদ্রব্যগুলি যে অনুসারে মুদ্রিত রহিয়াছে, ঠিক সেই অনুসারেই একটী একটী করিয়া পাতে পরিবেশন করা হইবে।

২। সমস্ত আহার্য্যই নির্দ্দিষ্ট সমান অংশে ছোট ছোট মাটির খুরিতে সাজান হইয়াছে, এবং সেই

খুরি-শুদ্ধই পরিবেশিত হইবে। প্রত্যেক খুরিতে যেটুকু করিয়া আহার্য্য সাজান হইয়াছে, সেইটুই প্রত্যেক আহার্য্যের ইউনিট্। একজন সাধারণ সুস্থ ব্যক্তি স্বাভাবিক ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় প্রত্যেকটি আহার্য্যই আহার করিলে প্রত্যেকটী আহার্য্যের যতটুকু পরিমাণ আহার করিতে পারেন, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রত্যেকটী আহার্য্যের ইউনিট্ ততটুকু পরিমাণেই নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

"৩। ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। কেহ কেহ হয় ত কোনো আহার্য্য একেবারেই খাইতে চাহিবেন না, আবার কোন আহার্য্য হয় ত এক ইউনিটের বেশী পরিমাণে খাইতে চাহিবেন। অনুগ্রহ করিয়া প্রথম কেসে সেই আহার্য্যের পরিবেশন আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাম হস্তে লাল সুইচটী টিপিয়া লাল বাতিটী জ্বালাইয়া রাখিবেন। তাহা হইলে পরিবেশনকারী সেই আহার্য্যটী আপনার পাতে ফেলিবে না। হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিলে তাড়াতাড়িতে সব সময় সেই ইঙ্গিতের অর্থবোধ হয় না। পরিবেশনকারী আপনাকে ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেই আবার সুইচটী টিপিয়া বাতিটী নিভাইয়া রাখিবেন। নতুবা যতক্ষণ আপনার আসনে লাল বাতি জ্বলিতে থাকিবে, ততক্ষণ আপনার পাতে কোন আহার্য্যই পড়িবে না।

"৪। দ্বিতীয় কেসে অনুগ্রহ করিয়া আহার্য্যটী পরিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে সবুজ সুইচটী টিপিয়া সবুজ বাতিটী জ্বালাইয়া রাখিবেন এবং পরিবেশনকারী আপনার পাতে আসিলেই, যে কয় ইউনিট্ আপনার প্রয়োজন, সেই সংখ্যাটী শুদ্ধ উচ্চারণ করিবেন। তাহা হইলেই পরিবেশনকারী আপনার পাতে সেই কয় ইউনিট্ দিয়া যাইবে! পরিবেশনের সময়, "আর একটু দিয়া যান, মশাই" বলাটা যেমন অসুবিধাজনক, তেমনি লজ্জাজনক। পরিবেশনকারীর পক্ষেও সেটা সুবিধার নয়, কেননা প্রথমতঃ তাড়াতাড়িতে সে একটু অগ্রসর হইলে তাহাকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়, এবং সেজন্য পরিবেশনে দেরী হয়; দ্বিতীয়তঃ 'আর একটু' মানে যে ঠিক কতখানি তার একটা ধারণা করিবার কোনোই উপায় নাই।

"৫। যে আহার্য্য পরিবেশন করা হইয়া গিয়াছে, তাহা যদি পুনরায় আপনার প্রয়োজন হয়, বা অন্য কোনো আবশ্যক হইলে, অনুগ্রহপূর্ব্বক সাদা বাতিটী জ্বালাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই এটেণ্ডিং ষ্টাফ্ (attending staff=দেখাশুনা কর্ব্বার লোক) আসিয়া আপনার প্রয়োজন অনুসন্ধান করিবে।

"৬। যখন যে বাতিই জ্বালান না কেন,—কাজ হইয়া গেলেই তাহা পুনরায় নিভাইয়া দিতে ভুলিবেন না। নতুবা অনেক রকম গোলোযোগ হইবার সম্ভাবনা।"

আগেই বলেছি,—হিমাচল বাবুর লম্বা বক্তৃতা শুনে আমার এমনই ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছিল,—যে এই সব উপদেশগুলো পড়বার ধৈর্য্য তখন আর ছিল না। যেটুকু বা চেষ্টা করেছিলেম,—তার কোনো অর্থবোধ হয় নি। যাহো'ক সেই দীর্ঘ দশ মিনিট কাল শেষ পর্য্যন্ত কেটেই গেল,—

এবং তার পর পরিবেশনও আরম্ভ হ'ল। পরিবেশনের প্রণালী দেখে আমার যে কি মজা লেগেছিল,—তা বর্ণনা করতে পারা যায় না। ঝুড়ি বা বাল্‌তির কোনো বালাই ছিল না। তার বদলে আস্‌ছিল একরকম নূতন ধরণের ঠেলাগাড়ী। মস্ত বড় বড় কাঠের তক্তার দু'দিকে চারটে করে ছোট ছোট চাকা লাগান,—এবং পিছন দিকে তক্তার মাঝখানটায় একখণ্ড লম্বা সরু কাঠ দিয়ে একটা হ্যাণ্ডেল মতন করা। তক্তাটা সারি সারি সাজান খুরিতে ভর্ত্তি। একজন লোক পিছন থেকে গাড়ীটা ঠেল্‌ছে,—আর দু'দিকে দুজন লোক খুরিগুলো পাতে পাতে ফেলে চলেছে।

প্রথম নম্বর এল একখানি খুরিতে দু' খানি লুচি, এবং তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিছনে আর একখানা গাড়ীতে একটা করে বেগুন-ভাজা! বলা বাহুল্য আস্‌বামাত্রই তা' আমি সাবাড় করে ফেলেছিলাম। শেষ করেই একটা গোলমাল শুনলাম। চেয়ে দেখি,—দু' তিন সারি পরে আমার সামনের একটা সারিতে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক চিৎকার করছেন,—"এ পাতে লুচি বেগুন-ভাজা কিছুই পড়্‌ল না যে!" তাঁর পাশেই বসেছিল,—একটী ছোট মেয়ে,—বয়স আন্দাজ পাচ ছ' বছর হ'বে। একবার চিৎকারে কোনো ফল হ'ল না দেখে তিনি ক্রমাগত চিৎকার আরম্ভ কর্লেন,—"এ পাতে লুচি বেগুন-ভাজা কিছু পড়্‌ল না যে"।

অমনি হিমাচল বাবুর গম্ভীর কণ্ঠের হুঙ্কার শুন্‌তে পেলাম,—"কোথায় লুচি বেগুন-ভাজা পড়্‌ল না,—য়্যা? লুচি-বেগুনভাজা পড়্‌ল না কেন?" ফিরে দেখি তাঁর বিশাল বপু নিয়ে তিনি একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নাম্‌ছেন, আর হুঙ্কার কর্‌ছেন। ছাদের যে প্রান্তে পর্দ্দাটা টাঙানো ছিল,—তারই অপরপ্রান্তে একটা ছাদওয়ালা সরু বারান্দা ছিল। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি,—সেই বারান্দার ছাদে একটা টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন বসানো ছিল। তিনি বোধ হয় সেই লণ্ঠনটা নিয়ে কিছু করছিলেন,—এখন চিৎকার শুনে নেমে এলেন। কিন্তু তাঁর বিশাল বপু দুলিয়ে সরু কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে সে পাতে লুচি বেগুনভাজা পড়ে গেল,—আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকারও থেমে গেল। হিমাচল বাবু তবুও ছাড়লেন না। পরিবেশনকারীকে জোরসে ধমক দিয়ে উঠ্‌লেন, -"একটা পাতে লুচি বেগুনভাজা পড়েনি কেন?"

পরিবেশনকারীও তেমনি উচ্চকণ্ঠে জবাব দিল, "ওখানে লালবাতি জ্বলছিল যে!"

তখনি হিমাচল বাবু অনুসন্ধান করে দেখ্‌লেন, - যে, - যে পাতে লুচি বেগুনভাজা পড়েনি,—সে পাতের দখলকারিণী একটী ছোট মেয়ে। সেই দশ মিনিট কাল ব্যবধানের মধ্যে খেলা করতে করতে লাল বাতিটা টিপে দিয়ে থাক্‌বে।

হা হতোঽস্মি! হুকুম হ'ল পাঁচ মিনিট কাল পরিবেশন বন্ধ রেখে রেডিও ও লাউড-স্পীকারের সাহায্যে উপদেশগুলি পড়ে সরলভাষায় ব্যাখ্যা করে দেওয়া হো'ক!

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রেডিওতে সোঁ সোঁ করে শব্দ উঠ্‌ল। একজন লোক চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌ল,—"রেডিওতে যে মন্ত্র ব্রড্‌কাষ্ট আরম্ভ হ'চ্চে"।

হিমাচল বাবু হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন,—"সে কি কথা! আমার যে এখনো লণ্ঠনে স্লাইড পরানো হয় নি। শীগ্‌গির দানের ঘরে টেলিফোন করে বিয়ে বন্ধ রাখ্‌তে বলে দাও"।

ছাদের এককোণে একটা টেলিফোন ছিল। একজন পাত্‌লামতন লোক—লম্বা, উঁচু নাক—লাফিয়ে গিয়ে তার রিসিভারটা তুলে চিৎকার করে উঠ্‌ল,—"হ্যালো! পুরুত মশাই! হ্যালো, পুরুত মশাই!"

রেডিওতে মন্ত্র বেজে উঠ্‌ল।

"হ্যালো, পুরুতমশাই! হ্যালো! পুরুতমশাই!"

হিমাচল বাবু আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "কই, বিয়ে বন্ধ কর্লে না?"

"কি কর্ব্ব? নো রিপ্লাই। হ্যালো, পুরুতমশাই! হ্যালো পুরুতমশাই!"

মন্ত্র বেজে চল্‌ল।

হিমাচল বাবুর হুঙ্কার। "নো রিপ্লাই,—ত দৌড়ে নেমে যাও। গিয়ে দেখ কি হ'ল,—আর বিয়ে দশ মিনিটের জন্য বন্ধ রাখ্‌তে বলে এস।"

পাতলা মতন লোকটী নেমে গেল। কিন্তু হিমাচল বাবুর বাড়ীটা প্রকাণ্ড,—তাই রেডিওতে মন্ত্রটা খানিকক্ষণ বেজে তারপর বন্ধ হ'ল। খানিকক্ষণ পরে দেখি, সেই ভদ্রলোকটী হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এসে বল্‌ছেন,—"একটী লোক আছে কি দানের ঘরে,—যে টেলিফোন ধরবে? ম্যান-পাওয়ারের ইকনমি হ'য়েছে!"

হিমাচল বাবু, এমন কি স্বয়ং বরকর্ত্তাকেও ছাদের উপর সমস্ত বন্দোবস্ত আছে বলে,—খেতে বসিয়েছেন। দানের ঘরে ছিলেন কেবল,—দু'জন পুরুত—তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্র পড়াচ্চিলেন, আর অপরজন মন্ত্রপাঠে ভুল হয় কি না তার তদারক করছিলেন;—আর ছিলেন সম্প্রদাতা,—তিনি মন্ত্রপাঠ করছিলেন,—আর ছিলেন, বর। টেলিফোন ধরবে কে?

তারপর রেডিওতে উপরের উপদেশগুলি ব্যাখ্যা সহ শুন্‌লাম। ভালই হ'ল। নইলে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর মত কখন কি অবৈজ্ঞানিক বেয়াদবী করে বস্‌তাম তার ঠিক কি? আবার পরিবেশন আরম্ভ হ'ল। বিয়েও আরম্ভ হ'ল, রেডিওতে মন্ত্র বাজ্‌তে লাগ্‌ল। স্ক্রীনের উপর দেখ্‌লাম দানের ঘরের ছবি। তখন পরিবেশন হ'চ্চিল ছেঁচ্‌ড়া। সেটা আমি খাইনে। লাল বাতিটা টিপে দিয়ে ছবি দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। দানের ঘরের একেবারে পরিষ্কার পুঙ্খানু-পুঙ্খ ছবি। দানের আঙ্‌টীটা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্চিল। পুরুত, সম্প্রদাতা এবং বর বসে আছেন দেখ্‌লাম। ক'নে তখনো আসে নি। খানিক পরে পাতের উপর চোখ নামিয়ে দেখি,—লাল বাতিটা তখনো জ্বল্‌ছে,—আর আমার

সাম্‌নে দিয়ে কাট্‌লেটের গাড়ীটা গড় গড় করে চলে গেল। কাট্‌লেট্‌টা আমার অত্যন্ত প্রিয় জিনিস, কিন্তু সকলের পাতেই পড়্‌ল, আমারই পাতে পড়্‌ল না। তখনি সাদা বাতি টিপে আবার কাট্‌লেট আন্‌তে বল্‌তে বড়ই লজ্জা করতে লাগ্‌ল। অথচ অমন প্রিয় জিনিসটা ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভাব্‌লাম আর দু'টো তিন্‌টে জিনিস পরিবেষণের পরে আবার সাদা বাতি টিপে কাট্‌লেট চাইলেই হ'বে।

কিন্তু কাট্‌লেট্‌ খাওয়া সেদিন আমার অদৃষ্টে ছিল না। খানিকটা বাদেই উঠ্‌ল ভয়ানক গোলমাল। সে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড। খাওয়া যখন অর্দ্ধেকটা অগ্রসর হ'য়েছে,—তখন এক সঙ্গেই বোধ হয় অনেকেরই জলের দরকার হ'য়েছিল,—অথচ আগের দিকের লোকেরা যতক্ষণ জলের কল টিপে ছিলেন, ততক্ষণ পেছনের দিকের লোকেরা জল পাচ্ছিলেন না। অনেককে বোধ হয় এমন পাঁচ মিনিট পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর্‌তে হ'চ্চিল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা ধৈর্য্য হারিয়ে 'জল' 'জল' করে বিষম চীৎকার আরম্ভ করে দিলেন। "একি চালাকি নাকি মশাই, জল পাই না কেন?" তাঁরা যে বরযাত্রী সে কথা বোধ হয় হিমাচল বাবু ভুলে গিয়েছিলেন। রেডিওর আওয়াজের সঙ্গে নানাকণ্ঠের মিশ্রিত আওয়াজ কেবলি শুন্‌তে লাগ্‌লাম,—"জল! জল।" "বোতাম টিপুন" "বোতাম টিপুন!" "জল কই মশাই,—একি চালাকি না কি?"

ব্যাপারটা এইখানেই থাম্‌ল না। আরো কিছুদূর গড়াল। একজন বরযাত্রী অধীর হ'য়ে বোতামের উপর বোধ হয় এমন একটা জোর টিপুনি লাগিয়েছিলেন, যে সে বোতাম টেপাই রইল,—আর উঠ্‌ল না। তাই সে কলে অবশেষে জল যখন এল, তখন একেবারে ছাদশুদ্ধ ভাসিয়ে দিল।

"কল বন্ধ করুন। কল বন্ধ করুন!" আর কল বন্ধ! জল পড়্‌তে লাগ্‌ল। ছাদ ভেসে গেল। বরযাত্রীরা অনেকেই তড়াক্‌ করে আসন থেকে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। ঠিক সেই সময় ভাগ্যদোষে ইলেক্‌ট্রিক আলোও গেল নিভে। সঙ্গে সঙ্গে রেডিও ও থাম্‌ল। পর্দ্দাও অন্ধকার। তারপর যে লুচি ছোঁড়াছুঁড়ির ব্যাপার চল্‌ল তা বেশ কল্পনা করে নেওয়া যায়। আমার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

বরকর্ত্তা ছিলেন বিশেষ ভদ্রলোক। তাই বরকে সভা থেকে তুলে নেওয়া হয় নি। আমিও বরের বিশেষ বন্ধু, তাই শেষ পর্য্যন্তই ছিলাম।

বিয়ে হ'য়ে যাওয়ার পর হিমাচল বাবু অত্যন্ত গম্ভীর ও বিষণ্ণ মুখে বসেছিলেন, এমন সময় বরকর্ত্তা মশাই এসে একটু হেসে বল্লেন,—"হিমাচল বাবু! আপনার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগুলো বিয়ের খাওয়ানোর ছাদের উপর না করে ল্যাবরেটারির ভিতর কর্‌লেই ভাল হয়"।

হিমাচল বাবু অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে উত্তর দিলেন,—"না—না,—কি জানেন, একটু ভুলের জন্য এই কাণ্ডটা হ'য়ে গেল। আগে থেকেই একটা ব্রেক-ডাউন সারভিস্‌ অরগ্যানাইজ (ভণ্ডুল হলে পরে তার ব্যবস্থা) করে রাখা উচিত ছিল।"

ঠিক্ই তো !

(১)

দোল্ খায় দোল্নায়, তাও ক'রে হিংসে
দড়ি নিয়ে গেল ভেগে রামাধীন শিং সে।

(২)

চীনে খুকি লিংচিং দেখে বলে,
"ঠিকই তো !
নাই যদি থাকে দড়ি, আছে মোর
টিকি তো?"

(৩)

চটপট্ চ'ড়ে গাছে দিল টিকি ঝুলিয়ে,
বেঁধে তারে দোল্নায় খোকা হাসে তুলিয়ে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ঝরণা

(শ্রীজ্যোৎস্না দেবী)

ঝর ঝর ঝর
বরষের পর
নীরবতা ভাঙ্গি
কলনিনাদিনি,
তরুরাজি তোমা
ফুলভারে নত
তপন উদিলে
চাঁদিনীতে পুন
কোন্ পাথরের
বিটপীর তলে
অবিরাম ওই
তেমনি করিয়া
তোমার তীরেতে
বাসনার পাশে

ঝরিয়া ঝরিয়া
বরষ ছুটিছ,
বনপথ বাহি
ওলো লোনটিনি,
উচ্ছ্বাসভরে
তরুশাখা পরে
সোণালি কিরণ
দেখি যে তোমারে
তল হ'তে তুমি
শীতল ছায়ায়
ঝরণার ধারা
মানবের বুকে
বাঘিনী দেখিয়া
নিরাশা দেখিয়া

ফেনিল হইয়া ছোটে,
আশা কি তবু না মেটে ?
চলিয়াছ কোন্ টানে,
কোন্ গীতি জাগে প্রাণে ?
পরশ করিতে চায়,
তব তালে পাখী গায়।
ঝরিছে তোমার গায়,
রজত-ধারারই প্রায়।
আসিয়াছ জানা নাই,
তোমারে দেখিতে পাই।
ঝরিছে পাথর পরে,
বাসনার ধারা ঝরে।
হরিণী ফিরিয়া যায়,
মানবও তেমনি হায়।

রঙ্গ-কণা

(শ্রীমতী পুষ্পলতা গোস্বামী, বেতিয়া)

(১)

একদিন আমি সাঁতার শিখ্‌বার জন্য জলে অর্থাৎ —পুকুরে নাম্‌তে যাচ্ছি এমন সময় আমাদের বাড়ীর একটী চাকর দৌড়ে এসে বল্লে, "খোকা বাবু, বাবু এখন পুকুরে নামতে মানা কর্‌লেন। আগে সাঁতারটা শিখে নিন্, তবে জলে নাম্‌বেন।"

(২)

(শ্রীউমাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাণ্ডারহাটী)

নায়েব মহাশয় কোন মুচী প্রজাকে ব'ল্‌ছেন,—

নায়েব। হাঁরে হরি! তোর খাজনা কমিয়ে দেব, আমায় জল খেতে কি দিবি ?

মুচী। আজ্ঞে,—আপনাকে কি আর দিতে পারবো হুজুর ? জল খেতে চটী জুতো একজোড়া দেব।

(৩)

(শ্রীমৃত্যুঞ্জয় সাহা, পাঁচ্‌লা, হাওড়া)

কাকাববু—বলি ; হ্যাঁরে মান্‌কে, তুই আবার তামাক খাওয়া ধরেছিস, নয় ?

মাণিকচাঁদ—আজ্ঞে না কাকাবাবু, তামাকটা তো অনেকদিন আগেই ছেড়েছি।

কাকাবাবু—তবে তোর হাতে তামাক টানা দাগ কেন রে, পাজি ?

মাণিকচাঁদ—(হাতের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া) ও ঠিক বটে, ঠিক, বিনু ছোঁড়াটা, যখন ঘুমাচ্ছিলাম, তখন আমার হাতে তামাক খেয়ে গেছে।

(৪)

(শ্রীদেবকীনন্দন অধিকারী, তমলুক)

এক রাজা একদা শিকার করিবার জন্য বন্দুক হস্তে করিয়া একটী মোসাহেবের সঙ্গে যাইতেছেন। হঠাৎ একটা পাখী দেখিতে পাইলেন। রাজা পাখীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন কিন্তু পাখী মরিল না।

রাজা—"তাই ত হে! পাখীটা পড়্‌লো না।"

মোসাহেব—"আজ্ঞে হুজুর! আপনার বড় দয়ার শরীর, বন্দুক ছোঁড়া মাত্রই দয়ার উদ্রেক হওয়ায়, আর পাখীটা মর্‌লো না।"

(৫)

(শ্রীপুষ্প বসু ও দেবকুমার বসু)

নূতন মনিব—আগেকার মনিবের কাজে জবাব দিবার সময় তুমি তাহার সহিত কোন তর্ক-বিতর্ক কর নাই ত ?

আবেদনকারী ভৃত্য—আজ্ঞে না ; তিনি বাথরুমে প্রবেশ করিলে তাঁহাকে চাবী বন্ধ করিয়া নীরবে চলিয়া আসিয়াছি।

ছাত্র-চরিত

(শ্রীঅজয়কুমার সরকার)

ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি পড়্‌ছে, অল্প অল্প হাওয়া বইছে, ঘড়িটায় বারোটা বাজ্‌ল। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, ঐ যাঃ পরশু হিষ্ট্রির পরীক্ষা। তাড়াতাড়ি হিষ্ট্রির বইটা নিয়ে পড়ি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, অনেক পরে গলা শুকিয়ে আসে। সোরাইটা থেকে খানিক জল ঢেলে ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেলি, ফ্যানটা চালিয়ে দি, জোরে জোরে ঘোরে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে, ভাবি একটা দুপুর না হয় ফাঁকিই দিলুম। ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে বালিশটা চেপে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি। উঠে দেখি, বেজায় ঘেমে গেছি ; ওদিকে বেলাও শেষ হয়ে আসে, ঘড়ির পানে চেয়ে দেখি, ও হরি! সেই বারটাতেই থেমে গেছে। দরজা ঠেলে রামা চা দিয়ে যায়, মনটা খুসীতে ভরে ওঠে, হঠাৎ মনে পড়ে যায় পরশু হিষ্ট্রির পরীক্ষা। ছাদে পাইচারী করি, আর 'আকবর' মুখস্থ করি। সূর্য্যাস্ত দেখতে দেখতে সব পড়া ভুলে যাই, ভাবি আজ রাতে দুটো পর্য্যন্ত পড়্‌তে হবে। কিন্তু ৯টা না বাজ্‌তে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করি কাল হতে ২৪ ঘণ্টাই পড়্‌ব। ঘড়িতে চারটের সময় এলার্ম দিয়ে মশারিটা ফেলে, আলো নিবিয়ে, শুয়ে পড়ি। মনের মত স্বপ্ন দেখি, এমন সময় ভীষণ জোরে এলার্ম বেজে উঠে ; মনে মনে অকৃতজ্ঞ ঘড়িকে অভিসম্পাত দিতে দিতে, এলার্ম বন্ধ করে আবার ঘুমোই। দ্বিতীয় বার ঘুম ভাঙ্গে ফাষ্ট বেলের ঘণ্টায়। তাড়াতাড়ি বই নিয়ে স্কুলে ছুটি। পেন্সিলটা নিতেও ভুলে যাই। দশটায় ছুটী হলে বাড়ী এসে আবার ঘুম।

দ্রষ্টব্যঃ (১) আমাদের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কষ্টি-পাথর গল্পটী এ সংখ্যাতেও স্থগিত রাখিতে হইল। কারণ, ডক্টর সুশীলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বৈজ্ঞানিক বরযাত্রী-সম্বর্দ্ধনা গত মাসে আমরা শেষ করিতে পারি নাই, এ মাসে তাহা শেষ হইল। কষ্টি-পাথর দিলে বৎসরের প্রথম সংখ্যাখানাতেই পর পর তিনটী ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প বাহির হইত; নূতন গ্রাহকদের তাহা ভাল লাগিত না।

আগামী সংখ্যা হইতে "পূর্ব্বকথা" দিয়া আবার কষ্টি-পাথর বাহির করা হইবে।

(২) 'ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে' যাঁহারা লেখা পাঠাইবেন, তাঁহারা যেন লেখার নকল নিজেদের কাছে রাখেন। সে লেখার সহিত কেউ ডাক-টিকিট পাঠাইবেন না, কেননা প্রত্যহ এত লেখা আসে যে প্রত্যেকটী অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া কিম্বা মতামত সঙ্গে সঙ্গে জানান আমাদের সম্ভবপর হয় না। আগেই একবার জানাইয়াছি যে 'ভাবী সাহিত্যিকের' বৈঠকে লেখা বাহির হইতে কিছু দেরী হয়ই, কেননা স্থান অল্প, কাজেই আগের লেখাগুলিকে প্রথমে দিতে হয়, পরে পাওয়া লেখা ভাল হইলেও ছাপিতে দেরী হয়।

যদি গ্রাহকেরা এভাবে অপেক্ষা করিতে না পারেন তবে কোন্ তারিখের মধ্যে ছাপাইলে তাঁদের চলিতে পারে তাহা যেন রচনার সহিতই লিখিয়া দেন। সে সময় পার হইয়া গেলে বুঝিতে হইবে লেখা মনোনীত হয় নাই। আর যদি মনোনীত হয়, অথচ ছাপাইতে একটু দেরী হয়, তবে আমরা পূর্ব্বেই তাহা জানাইব। কেউ যদি সে লেখা ইতিমধ্যে অন্য কোন কাগজে পাঠান, তাহা হইলে আমাদের যেন সে খবরটা দেন। এ কথাগুলি মনে রাখিলে আমাদের কাজের বড়ই সুবিধা হইবে।

(৩) আর একটা কথা, যে কোন প্রকারের চিঠিই হউক না কেন, কেহই যেন গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিতে ভুল না করেন। "আমি পুরানো চেনা গ্রাহক"—এই মনে করিয়া কেউ যেন গ্রাহক-নম্বরটী লিখিতে বাদ না দেন। এ জন্য একটী নাম বাহির করিতে আমাদের কত অসুবিধা হয় তা বলিবার নয়।

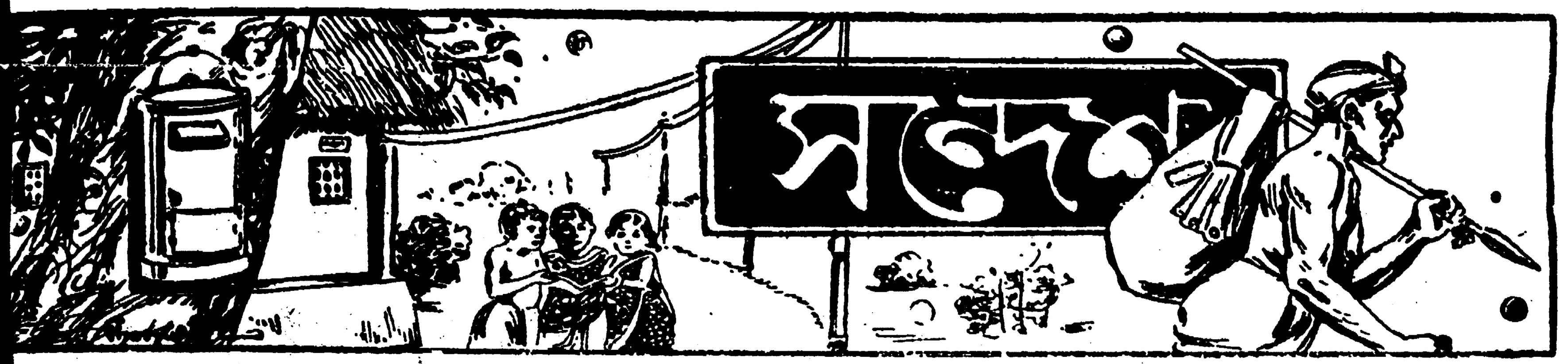

জন্মদিনে :—রামধনুর চতুর্থ জন্মতিথিতে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ ও বন্ধুবর্গকে আমরা আমাদের সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি।

পরলোকে মৌলানা মহম্মদ আলি :—আমাদের ছাপার কাজ চলিতেছে এমন সময় বিলাত হইতে একটী অত্যন্ত শোকের সংবাদ আসিয়াছে—ভারতের সুসন্তান ও দেশের স্বনামধন্য নেতা মৌলানা মহম্মদ আলি সেখানে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মৌলানার এই অকাল মৃত্যুতে দেশে আজ শোকের বন্যা বহিয়াছে—দেশকে এবং জাতিকে তিনি খুবই ভাল বাসিতেন কিনা! যে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই জানে কি রকম প্রতিভা লইয়া মৌলানা মহম্মদ আলি জন্মিয়াছিলেন।

সাহিত্যের দিক্ দিয়াও মৌলানা এক অতি উঁচুদরের ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সেই সুললিত, মধুর ইংরাজ রচনা পড়িয়া মুগ্ধ না হইয়াছে এমন লোক দেশে খুব কমই আছে। বক্তৃতায় মৌলানাজীর সমকক্ষ গোটা ভারতে যে দু চার জনের বেশী নাই এ কথা কে না স্বীকার করিবে? সে বক্তৃতার স্রোত এক বার বহিতে আরম্ভ করিলে শ্রোতাদের যেন আনন্দে ভাসাইয়া লইয়া যাইত।

সাতমণী মহিলা

কিছুদিন আগে রামধনুতে ৬ মণ ওজনের একটি আমেরিকান্ মেয়ের ছবি বাহির হইয়াছিল। তাঁকেও কিন্তু হার মানিতে হইয়াছিল ইটালীর ডোমেনিকো জান্জি নামে একটি ২১ বছরের মেয়ের কাছে। ইঁহার ওজন সাত মণ। ইনি সার্কাসের দলে যোগ দিয়া অনেক টাকা রোজগার করিয়াছিলেন। সাধারণ রেলগাড়ী কিংবা মোটরকারের দরজা দিয়া ইনি কখনও ঢুকিতে পারিতেননা, তাই এঁর জন্য অর্ডার দিয়া একটা বিশেষ গাড়ী তৈয়ার করা হইয়াছিল। বেচারা হৃদ্‌রোগে মারা গিয়াছেন।

আমেরিকার আমোদ প্রমোদ

আমেরিকান্‌রা সব দিক্ দিয়াই জগতের অন্যান্য জাতির উপর টেক্কা দিতে চায়। টাকাও তারা যেমন রোজগার করে, খরচও করে তেমনি। মজালুটিবার ব্যাপারে তাদের যুড়ি আর কোথাও মিলিবেনা। বছর বছর সেখানে প্রায় ৬৩১৫ কোটি টাকা আমোদপ্রমোদে খরচ হয়। তার মধ্যে বায়স্কোপে প্রায় সাড়ে চার কোটি আর সৌখীন মোটর গাড়ীতে যায় ১৫০০ কোটি।

আগুনের হাত হইতে পালাইবার নতুন ব্যবস্থা।

বাড়ীতে আগুন লাগিলে কি রকম মারাত্মক ব্যাপার হইয়া পড়ে তা তোমরা সকলেই জান। চার দিকে দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, কার সাধ্য তার ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া আসে? যাদের শক্তি সামর্থ্য আছে তারা হয়ত কোন গতিকে পার পাইল কিন্তু ঘরে রোগী থাকিলে তার কি অবস্থা বল দেখি! এখন ভাবিয়া দেখ কোন হাসপাতালে যদি আগুন লাগিয়া যায় তবে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইবে। সেখানে সকলেই রোগী, ধরিয়া না নামাইলে কারও নড়িবার সাধ্য নাই। এম্‌নিই তাদের নাড়া-চাড়া করান একটা কঠিন ব্যাপার, আগুনের ভিতর দিয়া ত অসম্ভব বলিলেই চলে।

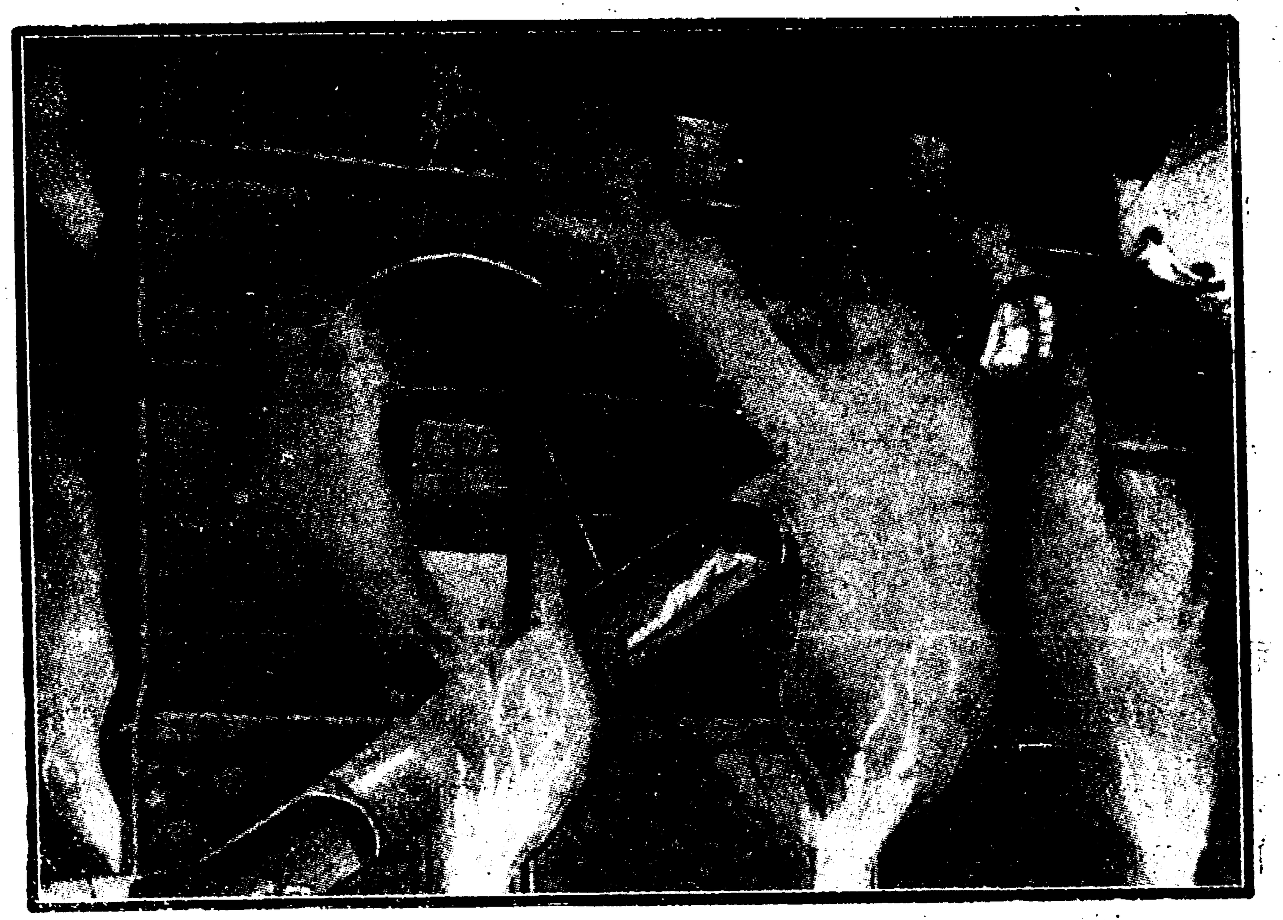

নলের ভিতর দিয়া রোগীদের ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—আগুন গায়ে লাগিতেছে না।

আমেরিকার হাসপাতালগুলিতে কিন্তু আজকাল এর একটা চমৎকার ব্যবস্থা হইয়াছে। ছবিতে দেখ, হাসপাতালের মধ্যে কেমন বড় বড় নল বসান হইয়াছে; নলে ঢুকিবার জন্য প্রত্যেক ঘরে দরজা বসান আছে। রোগীকে একটা বিছানায় শোয়াইয়া এই নলের ভিতর দিয়া ছাড়িয়া দাও, আস্তে আস্তে সে নীচে গড়াইয়া আসিবে। কোন রকম চোট ত লাগিবেই না, তা ছাড়া বাহিরের আগুন বা সে আগুন নিভাইবার জল, ধোঁয়া কোনটাই নলের ভিতর ঢুকিবে না। রোগী নীচে নিরাপদ জায়গায় গড়াইয়া আসিলে নলের দরজা খুলিয়া তাকে বাহির করিয়া নিলেই হইল। সুস্থ লোকেরাও এই নলের ভিতর দিয়া বেশ আরামে নিরাপদ জায়গায় যাইতে পারে।

কলের টিকিট বাবু

লণ্ডনে যে টিউব রেলওয়ে আছে তার একটা ষ্টেশনের নাম ভিক্টোরিয়া। সম্প্রতি সেখানে টিকিট বিক্রীর জন্য কেরাণীবাবুর বদলে একটা কল খাড়া করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে টাকা

পয়সা ফেলিয়া দিলে কলটি সে টাকা গণিয়া, বুঝিয়া আবশ্যক মত বাকী পয়সা ফেরৎ দেয়। অচল টাকা দিলেও তাহা সঙ্গে সঙ্গে ধরিয়া দেয়।

স্কুলে বেতারের চলন

বেতারের নানা রকম উন্নতির কথা তোমাদের আগে অনেকবার বলিয়াছি। আজ কাল বিলাতের অনেক স্কুলে বেতারের সাহায্যে লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইতেছে। শুধু ইংলণ্ডেই এই ধরণের স্কুল আছে দু' হাজারের উপর।

কলি যুগের রাবণ

ত্রেতা যুগে রাবণের নাকি একশটি ছেলে ছিল, দ্বাপরে ধৃতরাষ্ট্রেরও তাই, কিন্তু সেটা আর কলি যুগে সম্ভব নয় বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ছিল; সে বিশ্বাস কিন্তু টলাইতে চলিয়াছেন সাইন্‌বুর্গ্‌ নামে এক জার্ম্মাণ ভদ্রলোক। ভদ্রলোক ২ বার বিবাহ করিয়াছেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে ৬৯টি ছেলে হইয়াছে। (চারবার এক সাথে ৪টি করিয়া, ৭বার ৩টি করিয়া ও ১৬ বার যমজ), দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে এ পর্য্যন্ত ১৮ টি সন্তান হইয়াছে—এখনও আরও হইবার আশা আছে। সবশুদ্ধ ভদ্রলোকের ৮৭টি ছেলে। তাঁর নিজের বয়স ৭৭, কিন্তু স্বাস্থ্য অতি চমৎকার।

গাছের পোকা নষ্ট করিবার নতুন উপায়

যে সব পোকা গাছপালার ক্ষতি করে তাদের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য ওয়েল্‌সের এক বৈজ্ঞানিক এক অদ্ভুত বৈদ্যুতিক আলো বাহির করিয়াছেন। ঐ আলো গাছের উপর ফেলিলে দেখিতে দেখিতে পোকাগুলি মরিয়া যায়। কিন্তু গাছের কোনও ক্ষতি হয় না।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) কাশীরাম দাস
(২) ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
(৩) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
(৪) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৫) বাল গঙ্গাধর তিলক
(৬) মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

শান্তিলতা ঘোষ (কলিকাতা), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), সুধীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ (দিনাজপুর), সুব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, নরেশ ও সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), পূর্ণিমা মিত্র (কলিকাতা), সনৎকুমার রায় (ফরাশগঞ্জ, ঢাকা), অজয়, আরতি, নীলাদ্রি, শশাঙ্ক, রবি, জ্যোতিঃপ্রকাশ, অবনী, ছবি ও খোকা (মজঃফরপুর), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), কালিদাসী দাসী (কৃষ্ণনগর), প্রবোধ, সুষমা, গারি (খিদিরপুর), কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, গোপী, শিবরাণী ও পুষ্পরাণী (হাজারিবাগ), খুলনা জেলা স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (খুলনা), কমলা বসু (কলিকাতা), নিমাই, আনন্দ, মনু, বাণী, বেলা, মিনতি, মুরলী (কটক), নন্দ, নলিনী, হীরেন, ঋষি বিদ্যালয় মধ্যবাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম (জয়দেবপুর, ঢাকা), গীতা, শৈলেন্দু, অরুণেন্দু ঘোষ (বেগু সরাই), অমিয়া গুপ্ত, (বেলডাঙা, বরিশাল), গীতাসতী দেবী (খাণ্ডোয়া), পারিজাতরেণু দেবী (মহিমাগঞ্জ), রাজলক্ষ্মী, জয়লক্ষ্মী, সতীলক্ষ্মী অপর্ণা, অখিল, নূতন পেকো (আকুই), তারাকুমার সান্ন্যাল (কলিকাতা) হিমাংকুমার মল্লিক (গোলঘর, পাবনা), বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী, বাদল, দুলাল, বেণু, টনা, গোরা ও বন্ধুগণ (কানুনগো পাড়া, চট্টগ্রাম), দীনেন, রথীন, জীবেন ও পুষ্পেন (কলিকাতা), অঞ্জলিকুমার বসু (হাজারিবাগ), মণিগোপাল বিশ্বাস (কুমিল্লা), সুধা, খুকু, মণিকা, ও সন্ধ্যা (হবিগঞ্জ), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া), নিরুপমা, অনুপমা ও সুলেখা দেবী (চট্টগ্রাম), মনীষা সেন (গৌহাটী), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ভবানীপুর), তারা লাহিড়ী (কলিকাতা), জ্যোৎস্না দেবী (কলিকাতা) অশোকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, বারদ্রোণ ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (বারদ্রোণ), দি ইয়ং ভৌমিক্‌স্ য়্যাণ্ড কাকীমা (ভবানীপুর), উমা, তোতা, গোরা, নন্দ (কাটিহার)

যাঁহাদের একটি ভুল হইয়াছে ঃ—

আবু সৈয়দ (মসিকরা, ত্রিপুরা), নৃপেন্দ্র, ধরণী, অমিয়, অমল, সুধীর, (জয়গঞ্জ), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), রবি, সত্য, সরোজ ও নীহাররঞ্জন চক্রবর্ত্তী (বাজিতপুর), ইন্দু, অমিয়, শান্তি, প্রবোধ ও বিমল দত্ত (শিবসাগর), দেবকীনন্দন অধিকারী (তমলুক)

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

প্রশান্তকুমার রায় (কলিকাতা), রেণুকা সিংহ (জামুই), জেবুন্নিসা বেগম (শ্রীহট্ট)

নূতন ধাঁধা

(১)

কাঠির মতন দেহ, শুধু ভুঁড়ি সার,
তাও হায় মিশ্‌কালো, রং কি বাহার!
মাথায় আগুন চড়ে যখন তখন;
বক্ বক্ সারাদিন, প্রাণ জ্বালাতন।

(২)

কখনো ফুল হই, কখনো পাতা; গাছের ডালে ডালে কভুবা ঝুলি,
মাটীর নীচে গিয়া কখনো থাকি, হেলায় গুরুভার কভুবা তুলি।

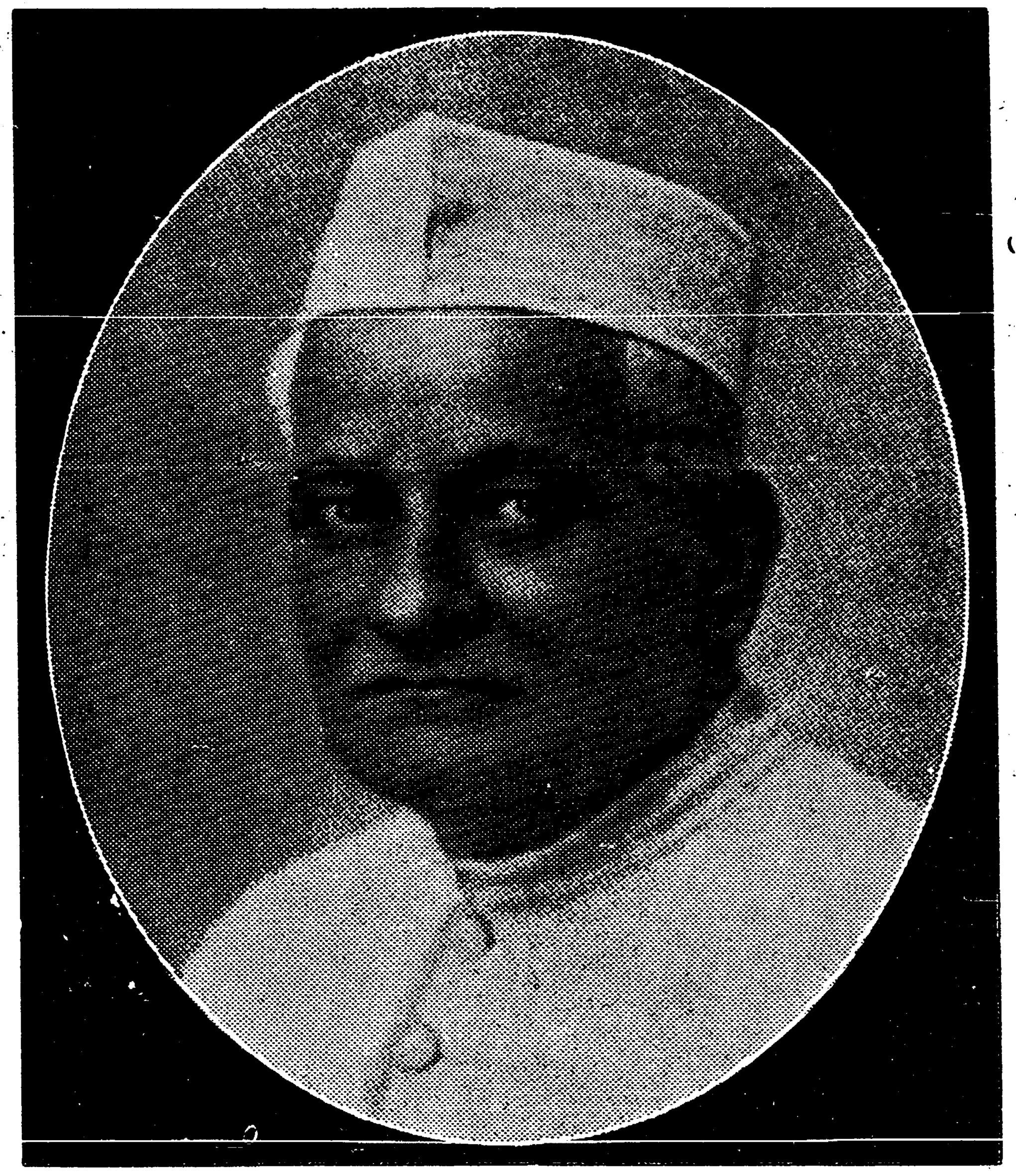

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

৪র্থ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৭ { ২য় সংখ্যা

ডান্‌পিটে

(শ্রীমুরারিমোহন সেন, বি-এ)

ডান্‌পিটে ছেলে—
কিছু আর নাহি চায় দুষ্টুমী পেলে !
সারাদিন কোথা থাকে, কোনো খোঁজ নেই তার
মারামারি কাড়াকাড়ি শাসনের ছিল বার !
কারো কথা শোনা নেই, বলা নেই, কওয়া নেই,
দুপ্‌দাপ্‌ লুটপাট্‌ কোরে ছায় নিমেষেই—
কোন্‌ দিন ধরা প'ড়ে যায় বুঝি জেলে
—ডান্‌পিটে ছেলে !

পুণ্যশ্লোক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু

৪র্থ বর্ষ } ফাল্গুন, ১৩৩৭ { ২য় সংখ্যা

ডান্‌পিটে

(শ্রীমুরারিমোহন সেন, বি-এ)

ডান্‌পিটে ছেলে—
কিছু আর নাহি চায় দুষ্টুমী পেলে !
সারাদিন কোথা থাকে, কোনো খোঁজ নেই তার
মারামারি কাড়াকাড়ি শাসনের ছিল বার !
কারো কথা শোনা নেই, বলা নেই, কওয়া নেই,
দুপ্‌দাপ্‌ লুটপাট্‌ কোরে ছায় নিমেষেই—
কোন্‌ দিন ধরা প'ড়ে যায় বুঝি জেলে
—ডান্‌পিটে ছেলে !

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

ডান্‌পিটে ছেলে,—
সবে তারে করে ঘৃণা—দূরে ছায় ঠেলে !
……তারপর আপ্‌শোষ্, সে বছর, সেই গাঁয়
একে একে মরে সব কালরোগ কলেরায় !
লোক নেই, জন নেই, সে গাঁয়ের ঘর-ঘর
সেবা করে শুধু সে-ই—নেই তার ভয় ডর্ !
মরণের কোলে আর লোক নাহি মেলে
—ডান্‌পিটে ছেলে !

ডান্‌পিটে ছেলে—
কোথাও সে নাহি যায় রোগীদের ফেলে !
ঘুম নেই, খাওয়া নেই, সারাদিন সারারাত
কুশল শুধায় স্নেহে, মাথায় বুলায় হাত ;
কত লোক বেঁচে যায়—তারপর হায় হায়,
ডান্‌পিটে নেয় হেসে কালরোগ তার গায়—
মরণের মুখে হেসে যায় অবহেলে
—ডান্‌পিটে ছেলে !

ছোটখাট ব্যাপার

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

আজকালকার পণ্ডিতেরা বলেন আমাদের এই সময়টা নাকি বিজ্ঞানের যুগ। আজকালকার যা কিছু ব্যাপার সবটার মধ্যেই নাকি বিজ্ঞানকে ঢুকান হইয়াছে। কথাটা কিন্তু আমাদের দেশে ততটা খাপ খায়না। অবশ্য এটা ঠিক্ যে অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও এমন সব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার দেখা দিয়াছে যা আমাদের ঠাকুরদাদের আমলে লোকে ধারণায়ও আনিতে পারিত না ; যেমন ধর মোটর,

এয়ারোপ্লেন্, গ্রামোফোন, টেলিফোন, বায়স্কোপ, টকি, বেতার প্রভৃতি। তবু কিন্তু বলিতে হইবে আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে আমরা এখনও বিজ্ঞানকে তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারি নাই। সে করিয়াছে বিলাতের লোকেরা—বিশেষ করিয়া আমেরিকা। বড় বড় ব্যাপারের কথা ছাড়িয়া দিলাম, নিতান্ত ছোটখাট ব্যাপার—যে সবের কথা আমাদের মনের কোণেও কখনো ভুলিয়া জাগে না, সেই সব ব্যাপারেও তাদের কি রকম খর দৃষ্টি তা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। আজ তোমাদের তারই কয়েকটা শুনাইব।

আজকাল আমাদের দেশে একটু অবস্থাপন্ন লোকের ঘরেই মোটরের ছড়াছড়ি। শুধু সকালে বিকালে হাওয়া খাওয়া নয়, মোটরে করিয়া লম্বা লম্বা পাড়ি – কলিকাতা হইতে কাশী, আগ্রা, কাশ্মীর প্রভৃতি ভ্রমণের বিবরণ আজকাল মাসিকপত্র খুলিলে হামেশাই চোখে পড়ে। ধর, এই ধরণের কোনও ভদ্রলোক মোটরে চড়িয়া লম্বা ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। যাইতে যাইতে পথে হইয়া গেল রাত্রি। তখন তাঁকে খুঁজিতে হইবে কোথায় আছে ডাক-বাংলো, হোটেল কিংবা রাত্রি কাটাইবার মত অন্য কোন আশ্রয়। সারা রাতটা ত আর গাড়ীতে বসিয়া কাটানো যায় না। হাতের কাছে কোনও আশ্রয় না পাইলে কি রকম অসুবিধা বল দেখি ! আমেরিকার ভ্রমণকারী হইলে কিন্তু এ দুর্ভোগটা পোহাইতে হইত না। বেড়াইবার জন্য তারা আজকাল দিব্যি চারদিক্ ঘেরা নূতন ধরণের 'সিডন্' গাড়ী তৈরী করিয়া লইয়াছে। দরকার হইলেই হ্যাণ্ডেল ঘুরাইয়া দাও। দুই ঝাঁকানিতে সম্মুখের ও পিছনের সিট্ কাৎ হইয়া মিশিয়া চমৎকার গদীওয়ালা এক খাট তৈরী করিয়া দিবে। তারপর পর্দ্দা ফেলিয়া, কম্বল টানিয়া শুইয়া পড়। বাস্, একেবারে যাকে বলে "হোম-কম্ফর্ট্" অর্থাৎ নিজের বাড়ীর মত আরাম। ওপাতার ছবিখানা দেখিলেই বুঝিবে আমার কথা ঠিক কিনা।

দারুণ শীত, চারদিক্ কুয়াসায় ঘেরা, ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বরফ পড়িতেছে, তুমি মোটর চালাইয়া যাইতেছ। মোটরের সম্মুখে হাওয়া আটকাইবার কাচখানার উপর অনবরত বরফ জমিয়া জমিয়া তোমাকে কিছুই দেখিতে দিতেছে না— কেমন করিয়া চালাইবে বল ত ? আজকাল এ ভাবনারও কোন কারণ নাই। কাচের সম্মুখে ছোট্ট একটি যন্ত্র বসান। সেটা আবার তার দিয়া ব্যাটারীর সাথে যোড়া। বোতাম

টিপিয়া দাও, কাচের পিছনের বাতাসটা সঙ্গে সঙ্গে গরম হইয়া উঠিবে আর সেই উত্তাপে কাচের উপরে বরফ পড়া মাত্র সে বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইবে। চোখের দৃষ্টি আটকাইবার কোনই ভয় নাই।

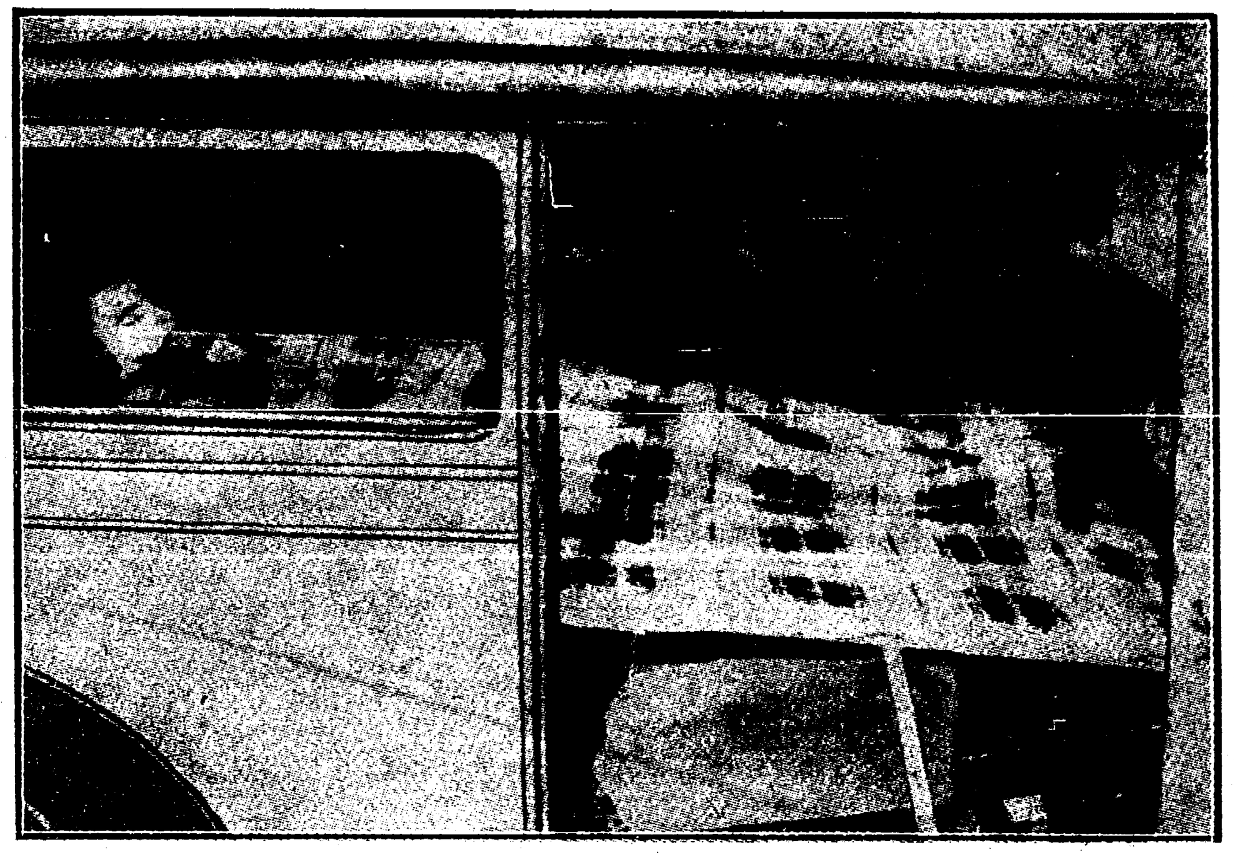

রাত কাটাইবার আর কোনও ভাবনা নাই।

মনে কর তুমি খুব একটা কাজের লোক, একটা জরুরী কাজে মোটর হাঁকাইয়া যাইতেছ। হঠাৎ তোমার মনে পড়িল—অমুক লোকটাকে ত একটা টেলিফোন করা দরকার। মোটর থামাইয়া বাড়ার ভিতর ঢুকিয়া টেলিফোন করিবার মত সময় তোমার হাতে নাই। কি করা যায়? জায়গাটা ক্যালিফোর্নিয়া হইলে তোমার আর কোনও ভাবনা থাকিত না। পথে ঘাটে থামের উপর টেলিফোনের কল বসান আছে। কষ্ট করিয়া মোটর হইতে নামিতেও হইবে না, হাত বাড়াইয়া আস্তে রিসিভারটি তুলিয়া লইলেই হইল।

রাস্তার ধারে খালি মোটর দাঁড়াইয়া আছে। যে কেউ (বিশেষতঃ যেখানে প্রায় প্রত্যেকেই মোটর চালাইতে জানে) আসিয়া মোটর লইয়া সরিয়া পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তার জন্য মোটর পাহারা দিবার একটি লোকের দরকার। ব্যাপারটা নাকি একেবারে অবৈজ্ঞানিক। অষ্ট্রেলিয়ার মোটরওয়ালারা ইহারও একটা ব্যবস্থা করিয়াছেন। মোটরের নম্বর বসান প্লেটের সাথে ছোট্ট একটি কল বসান। গাড়ী হইতে নামিবার সময় কল টিপিয়া গাড়ীর নম্বর বসান প্লেটটা খাড়া ভাবে ঝুলাইয়া

দাও। তারপর তার মধ্যে চাবি লাগাইয়া দিলে কারও সাধ্য নাই বিনা চাবিতে ঐ প্লেট আবার ঠিক জায়গায় বসাইতে পারে। আর নম্বরের প্লেট্ খাড়া অবস্থায় রাখিয়া মোটর চালাইলেই মুস্কিল। পুলিশ অমনি বুঝিয়া লইবে, বাবাজী মোটর চুরি করিয়া পালাইতেছেন। অমনি হাতে হাতকড়া।

বর্ষার রাত্রে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, তুমি থিয়েটার দেখিতে গিয়াছ। তোমার হাতে একটি ছাতা, গায়ে একটি লম্বা ওয়াটারপ্রুফ্, আবার সঙ্গে একটা সুট্‌কেস্। থিয়েটার হলে ঢুকিয়া তুমি বড় বিপদে পড়িয়া যাইবে। ওয়াটারপ্রুফ্‌টি না খুলিলে তেমন জুত লাগিবে না। ছাতা, সুট্‌কেস্ প্রভৃতি কাছাকাছি রাখা চাই, নহিলে হারাইয়া যাইবে। তোমার বসিবার জন্য মাত্র একখানি চেয়ার অত জিনিষ কোথায় রাখা যায়? তার উপর ছাতা হইতে টিপ্ টিপ্ করিয়া জল পড়িতেছে, সকলের ছাতা হইতেই ঐ রকম পড়িলে সমস্ত মেঝে ভাসিয়া যাইবে। আমেরিকার কোন কোন থিয়েটারে গেলে কিন্তু এ সব ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হয় না। থিয়েটারের কর্ত্তারাই এ সব ভাবিয়া রাখেন। ছবিতে দেখ, তোমার মত এক ভদ্রলোক থিয়েটার দেখিতে আসিয়া কেমন নির্ঝঞ্ঝাটে প্রোগ্রাম দেখিতেছেন। তাঁর চেয়ারটির গায়েই সমস্ত বন্দোবস্ত আছে। ওয়াটারপ্রুফ্ রাখিবার আল্‌না, ছাতা রাখিবার ব্রাকেট্, সুট্‌কেস্, টুপি প্রভৃতি রাখিবার শেল্‌ফ্ সবই চেয়ারের মধ্যে লাগান আছে,—অথচ বেশী জায়গা যে যুড়িয়া আছে, তা নয়। উপরন্তু ছাতার তলায় জল ধরিবার একটা নলও বসান আছে, মেঝেতে জল ঝরিবার কোনও আশঙ্কা নাই। আমেরিকার অনেক বাড়ীতেই দরজার গায় এই রকম ছাতা রাখিবার ব্রাকেট বসান থাকে, আর তার তলায় জল ধরিবার পাত্র বসান থাকে। ইহাতে ছাতা হারায়ও না, ঘরেও কোন রকম কাদা হয় না।

কোথাও হয় ত চড়ুই ভাতি করিতে গেলে, সঙ্গে অনেক জিনিষ লইতে হয়। সাহেবদের ত আবার চেয়ার টেবিল না হইলে জুত করিয়া খাওয়াই হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেউ আর চেয়ার টেবিল ঘাড়ে করিয়া চড়ুই ভাতি করিতে যায়? সাহেবেরা উত্তর দিবে, "কেন যাইবে না?" এমনি কায়দা করিয়া তাহারা টেবিল চেয়ার বানাইয়া লইয়াছে যে দরকার হইলে খুলিয়া পাত, আবার কাজ হইয়া গেলে ভাঁজ

করিয়া একটা সুট্‌কেসে পূরিয়া ফেল। চেয়ার টেবিলগুলি এত হাল্কা যে চারখানা চেয়ার আর একখানা টেবিল অনায়াসে যে কেউ হাতে ঝুলাইয়া লইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সে চেয়ারে বসিতে যে কম আরাম তা যেন কেউ মনে করিও না।

থিয়েটারে বসিবার চেয়ারেই সমস্ত বন্দোবস্ত আছে।

টেবিলের কাছে বসিয়া কাজ করিবার সময় ছেঁড়া কাগজের টুকরি সকলেরই দরকার হয়। যাঁরা কাজ করেন তাঁদের অনেকেরই আবার চুরুট খাওয়ার অভ্যাস আছে। চুরুটের ছাই ফেলিতে গিয়া আগুনের দু' একটা ফুল্‌কি যদি ঐ কাগজের টুক্‌রিতে পড়ে তবে একটা অগ্নিকাণ্ড হইয়া যাওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়। এ রকম ঘটনার কথা দু' একটা আমি জানি। একবার সিগারেটের আগুনে একটা গোটা বাজার পুড়িয়া যাইতেও দেখিয়াছি। আগুনের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য বিলাতে তাই এক রকম নতুন ধরণের ধাতুর তৈরী কাগজের টুকরির চলন হইয়াছে। হ্যাণ্ডেল্ ঘুরাইলেই টুকরির মুখ খুলিয়া যায়, আবার কাগজ ফেলিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ হইয়া যায়। গরম ছাই ত ভিতরে পড়িতেই পারে না, পড়িলেও টুকরির ভিতরটা এমন ভাবে তৈরী যে তাতে কখনও আগুন জ্বলিতে পারে না।

পথে ঘাটে চলিবার সময় অনেক জায়গায় হাতের কাছে কলম কিংবা পেন্সিল্ না থাকায় বড় অসুবিধা বোধ হয়। সেজন্য আজকাল এক রকম আংটি-পেন্সিলের চলন হইয়াছে। আংটির গায়ে ছোট পেন্সিল্‌টি গুটান' থাকে। কাজের সময় সীস টানিয়া লিখিলেই হইল, মনে হইবে ঠিক যেন আঙ্গুল দিয়া লিখিতেছি। পেন্সিল ক্ষয়

হইয়া গেলে নতুন সীস ভরিয়া লইলেই হইল। এই আংটিগুলি ওজনেও সাধারণ আংটির মত, পরিলে কোন রকম অস্বোয়াস্তি বোধ হয় না।

অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছ, হঠাৎ হয় ত একটা কথা লিখিয়া লইবার দরকার হইল। তোমার কাছে ফাউন্‌টেন্ পেন্ আছে কিন্তু আলো নাই। কাছাকাছি কোথাও যে আলো পাইবে তারও আশা নাই। সে অবস্থায় কি রকম রাগ হয় বলতো? আজকালকার নতুন ধরণের ফাউন্‌টেন্ পেন্ একটা সঙ্গে থাকিলে কিন্তু রাগ হইবার কোন কারণ থাকে না। সে কলমের নিবের নীচে ছোট একটি টর্চের মত বাল্‌ব্ বসান। কলমের মধ্যেই ছোট্ট একটি ব্যাটারী। বোতাম টিপিয়া কলমের আলোতেই তর তর করিয়া লিখিয়া যাওয়া চলে—অথচ সে কলম আকারে সাধারণ ফাউণ্টেন্ পেনের চাইতে একটুও বড় নয়।

দাড়ি কামান ব্যাপারটা যে কি রকম হাঙ্গামার তা তোমরা নিশ্চয়ই জান না। রামধনুর পাঠিকাদের ত ও বালাই নাই-ই, পাঠকদেরও এখন পর্য্যন্ত ও ভাবনা ভাবিতে হয় না, কিন্তু কয়েক বছর পরেই তারা আমার কথার সত্যতা বুঝিবে। তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইবে, অথচ গালময় খোঁচা খোঁচা দাড়ী—তা লইয়া ত আর ভদ্রসমাজে যাওয়া চলে ন। ধীরে সুস্থে কামাইবার ধৈর্য্য থাকে না, আবার তাড়াতাড়ি করিতে গেলে গাল কাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া যাইবে। সেফ্‌টি রেজার বা নিরাপদ ক্ষুর যদিও অনেক দিন হইল বাহির হইয়াছে কিন্তু সেটাও যে খুব সুবিধার তা নয়। ইংল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক তাই আজকাল এক নতুন ধরণের ক্ষুর বাহির করিয়াছেন। অনেকটা সেফ্‌টি রেজারেরই মত, তার মধ্যে স্প্রিংএর কল বসান আছে। স্প্রিংএ চাবি দিয়া ক্ষুরটি ইচ্ছামত গালের উপর ধরিলেই হইল। ক্ষুরের ফলা অমনি আপনা হইতেই দুলিয়া দুলিয়া গা খানাকে নিখুঁত ভাবে কামাইয়া দিবে। কাটিয়া যাইবারও ভয় নাই, আরামও যথেষ্ট, সময়ের দিক্ দিয়া সুবিধা ত বটেই।

বড় বড় সহরে গাড়ী ঘোড়ার উৎপাৎ কি রকম তা তোমরা কলিকাতা সহর হইতেই আন্দাজ করিতে পার। বিলাতে কলিকাতার চাইতেও ঢের ঢের বড় সহর আছে। ঐ সব সহরের বড় বড় রাস্তার মোড়ে যখন এক এক সময় শত শত মোটর চারদিক হইতে ছুটিতে থাকে তখন অবস্থাটা কি রকম হয় বল ত? গাড়ীর

চলাচল ঠিক করিবার জন্য অবশ্য পুলিশ থাকে। দিনের বেলা সে হয় ত কোন রকমে কাজ চালাইয়া দিল কিন্তু যত গোলমাল বাধে রাত্রে। রাস্তার মোড়ে যতই প্রচণ্ড আলো বসাও না কেন, দূর হইতে পুলিশের হাতের ইসারা বুঝা সব সময় সম্ভব হইয়া উঠে না। প্যারিসের পুলিশদের হাতে তাই আজকাল এক রকম লাঠি দেওয়া হইয়াছে। লাঠির আগায় একটা লাল আর একটা সাদা আলো বসান। পুলিশের কোমরের বেল্টের মধ্যে ব্যাটারী থাকে, তারই সাথে থাকে সে আলোর যোগ। লাঠির গোড়ায় বসান সুইচ্ টিপিয়া পুলিশ ভায়া খুব সহজেই লাল কিংবা সাদা বাতী জ্বালাইয়া রাস্তার গাড়ী-ঘোড়া থামাইতে বা চালাইতে দিতে পারে।

কাপড় কাচা কল।

অনেক রাস্তায় আবার সন্ধ্যার পর মেথর কিংবা ঝারুদারেরা কাজ করে। মোটরের দিকে নজর দিতে হইলে তাদের আর কাজ করা পোষায় না। তারা যাতে মোটর চাপা না পড়ে সে বিষয়েও কর্ত্তাদের হুঁশ আছে। তাদের জামার মধ্যে এমন ধরণের রঙ্গিন কাচ লাগান থাকে যার উপর আলো পড়িলে সেগুলি দারুণ রকম চক্

চক্ করে, আর দেখাও যায় অনেক দূর হইতে। মোটরের চালকেরা তাই দেখিয়া সাবধান হয়।

শুধু কি পথে ঘাটে? ঘর-গৃহস্থালী, রান্নাবান্না প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে আজকাল নিত্য নূতন বিজ্ঞানের দেখা মিলিতেছে। তাড়াতাড়ি ডিম সিদ্ধ করিতে হইবে—তার জন্যও আলাদা ছোট্ট যন্ত্র; পরিমাণ মত জল ঢালিয়া দু'টি তারের ভিতর বিদ্যুৎ চালাইয়া দাও, কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ডিম সিদ্ধ হইয়া যাইবে। বিদ্যুতের সাহায্যে চট্‌পট্ কাপড় কাচা, ইস্ত্রি করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা সবই আজকাল চলিতেছে। খরচ যে বেশী তা নয়, হাঙ্গামা তো নয়ই। তা' ছাড়া ছোট খাট কল তো এমন সব নিত্য নূতন বাহির হইতেছে যার নাম শুনিলেই তোমরা হাসিয়া ফেলিবে, —কিন্তু তার প্রত্যেকটি মানুষের সুখ সুবিধা হাজার গুণে বাড়াইয়া তুলিতেছে। যেমন ধর—পাঁউরুটি-কাটা কল, মাখন-মাখানো কল, টেবিল্ ঝাড়া কল, জুতা ব্রাশ্ করা কল, চুল আঁচড়ানো কল, গা-টেপা কল, স্নান করিবার সময় গা রগড়াইবার কল, আর কত নাম করিব?

ক্যাব্‌লার কাণ্ড

(শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

সেবার খুলনায় বেড়াতে যাচ্ছিলাম, ক্যাব্‌লার সঙ্গে। ক্যাব্‌লা কে তা তোমরা জান্‌তে চাও? আমাদের অঞ্চলে সবাই তার নাম দিয়েছিল রামমূর্ত্তির পিস্‌তুতো ভাই। কী যণ্ডামার্ক চেহারা রে বাবা! দুনিয়ায় যদি লোহার চাইতেও শক্ত কোন পদার্থ থাকতো তো আমরা নিঃসংশয়ে বলে ফেল্‌তাম যে ক্যাব্‌লা ভায়ার আমাদের শরীর খানা তাতেই তৈরী। টিফিনের সময় আমরা নিরীহ গো-বেচারার দল ইস্কুলের হাতার ভেতরেই নিজেদের ভেতর একটু খেলাধূলো করে বেড়াতাম, ক্যাব্‌লা গম্ভীর ভাবে এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আড়-চোখে তাই দেখ্‌তো। তখন তার চোখমুখের ভাব দেখে মনে হ'ত, ঐ ক' হাত দূরে যে ছিদাম মণ্ডলের ভেড়াগুলো চর্‌ছে তাদের চাইতে আমাদের সে এতটুকু বড় করে দেখে না। বুড়ো চাণক্য পণ্ডিত লিখে গেছে রাস্তা

দিয়ে হাতী চলে মানুষের ক' হাত দূর দিয়ে চলা উচিত; ঘোড়া চললেই বা কত খানি ফাঁক রেখে চলা নিরাপদ্। কিন্তু তা সত্বেও বুড়োর কথা সব খানি তোমরা মেনে চল কিনা জানি না। তবে এ কথা আমি অনায়াসেই বল্তে পারি যে ক্যাব্লা রাস্তা দিয়ে হাঁটা সুরু করলে তোমরা হাত দশেক ফাঁরাক রেখে চল্তেই, যদিও চাণক্য বুড়ো তার শ্লোকের বইয়ে সে সম্বন্ধে কোন উপদেশই রেখে যায় নি। এ হেন ক্যাব্লার সাথে আমার যে খোলাখুলি ভাবে মিশ্তে বেশ একটু ভয় হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কেন জানি না; ক্যাব্লা কিন্তু আমায় ভারী পছন্দ করত; তার আপন-করা ভাবে তার প্রতি আমার যে একটু ভয় ছিল তা ক্রমেই কেটে যেতে লাগ্ল।

সেদিন হোষ্টেলের রকের ওপর আন্মনা বসেছিলাম, হঠাৎ ঝড়ের মত কোথা থেকে ক্যাব্লা এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হ্যাঁরে, খুল্না যাবি? চল্না একটু 'জার্ণি' দেওয়া যাক্।"

ও যেন আমারই মনের ইচ্ছাটাকে টেনে বার করলে, ভাব্লাম মন আমার এই জিনিষটাই চাইছিল বটে। বহুদিন কোথাও নড়া হয়নি, মনটা আপ্না থেকেই উড়ু উড়ু করছিল, তার ওপর আবার কি একটা কারণে দু-দুটো দিন ইস্কুল ছুটি! এমন সুযোগ আর মিল্বে কখন্? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ট্যাকের অবস্থা স্মরণ করে তখনই বুক আবার সাত হাত বসে গেল। সেখানে যে একেবারে ঢুঁ ঢুঁ। বাবা টাকা পাঠাতে দেরী করায় এ রকমটা ঘটেছে। ক্ষুণ্ণভাবে কথাটা ক্যাব্লাকে জানাতেই সে প্রচণ্ড উৎসাহে আমার পিঠ্ চাপ্ড়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে তার বাংলা ছেড়ে একেবারে হিন্দি 'বাৎ' ছুট্ল, "কুছ্ পরোয়া নেই।" তারপর নিজের পকেটে হাত পূরে এক মুঠো চক্চকে রূপোর চাক্তি বার করে সে সেই রকের উপর রাখ্লে।

আমি তো অবাক্! ছোঁড়া রাতারাতি এমন টাকার কুমীর বনে গেল কি করে? হোল যেন ওর বাবা বড় কারবারী লোক, কিন্তু ছেলের আব্দারে ভেজার পাত্তর তো সে বুড়ো মোটেই নয়। হাতের ফাঁক দিয়ে যার জলটুকু পর্য্যন্ত গলে না, পাড়ার লোকে যার নাম করতে হলে বলে একাদশী হালদার, ছেলের জলপানীর জন্যে যে দৈনিক একটী আধ্লা বরাদ্দ করে দিয়েছে, সে দেবে চাইবা মাত্র অম্নি ঝনাৎ করে টাকা ফেলে? রাম কহ! ভাব্লাম, ছোঁড়া কি তবে বাক্স ভেঙ্গে বাপের মাথাতেই

হাত বুলালো নাকি? দুশ্চিন্তাটাকে চেপে না রাখ্তে পেরে ঠারেঠোরে এক রকম প্রকাশই করে ফেল্লাম। ক্যাব্লা কিন্তু স্রেফ্ অস্বীকার করে বস্লে, বল্লে সে টাকা সে কোন খারাপ ভাবে জোগাড় করে নি।

বেলা দশটার সময় দু জনে রওনা হয়ে পড়্লাম। অতগুলো টাকা হাতে পেয়ে ক্যাব্লার মন খুসীতে একেবারে ভরে গিয়েছিল, পথে সে দু টাকার খাবারই কিনে ফেল্ল দু জনার জন্য। কিন্তু সব চাইতে বেশী আশ্চর্য্য আমায় সে করলে ষ্টেশনে এসে পৌঁছোবার পর। আমায় বাইরে দাঁড়াতে বলে সে সটান টিকিট ঘরের ভেতর ঢুকে গেল, এবং একটু পরেই সে যখন বেরিয়ে এল তখন দেখি তার হাতে ইণ্টারও নয়, সেকেণ্ড্ও নয়, একেবারে ফার্ষ্ট ক্লাশের দু দুখানা টিকেট। আমার হাতে সে দু খানা তুলে দিয়ে ও বল্লে, "রাখ্ দিকিন।"

আমি কতকটা আপত্তির সুরে বল্লাম, "আবার এতগুলো টাকা বাজে নষ্ট করতে গেলি কেন? ইণ্টার, আর না হয় নিদেন সেকেণ্ড্ ক্লাশেরই খান দুই নিতি, কিন্তু ফার্ষ্ট্ ক্লাশ……"

ক্যাব্লা ধমক্ দিয়ে বল্ল, "থাম্, থাম্, তোকে আর সুরেন বাঁড়ুয্যের মত বক্তৃতা করতে হবে না। যা বল্লাম তাই কর্, টিকেট দু'খানা তোর কাছে রেখে দে।"

ট্রেণ এলে উঠে পড়া গেল। ফার্ষ্ট্ ক্লাশের কাম্রাটাতে একটী ফিরিঙ্গি 'সাহেব' বসে ছিল, আমাদের সুড়্ সুড়্ করে সেই গাড়ীতে ঢুক্তে দেখে সে দস্তুর মত সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে চাইতে সুরু করলে। বোধ হয় সে ভেবেছিল, ফার্ষ্ট্ ক্লাশের টিকেট এদের কাছে থাক্তেই পারে না, এরা রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার মৎলবে আছে। তা যাই হোক্, মনের ভাব তার যাই থাক্না কেন, মুখে সে কোন কথা কইলে না, মুখ খানাকে সাংঘাতিক রকম গম্ভীর করে চুপ্ চাপ্ বসে রইল।

সাহেবের মনোগত ভাবটা কিন্তু ক্যাব্লা এক নিমেষেই আঁচ্ করে নিলে। আমার দিকে আড়চোখে একটু মুচ্কি হেসে সে বল্লে, "দাঁড়া একটু রগড় করি।"

হঠাৎ উঠে গিয়ে একেবারে সাহেবের নাকের সাম্নে বসে পড়ে সে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করল, "মশা'য়ের নাম?"

সাহেবের মুখ দেখেই বোঝা গেল সে তখন কি পরিমাণ চটেছে; ভ্রূ কুঁচ্কে

এবং মুখটাকে যত দূর সম্ভব বিট্‌কেল করে সে আধা বাংলা বুলি ঝাড়্‌লে, "কেঁও, নামে টোমার কি কাম আছে ?"

ক্যাব্‌লা তো এই চায়। মুখ খানাকে সে বাস্তবিকই 'ক্যাব্‌লা'র মত করে বল্লে, "ভদ্দর লোককে 'তুমি' বল্‌তে নেই সাহেব, 'আপনি' বল্‌তে হয়। এ খবরও রাখনা, তুমি কেমন ধারা সাহেব হ্যা ? এদিকে চেপে তো বসেছ দেখি আবার ফাষ্টো কেলাসে। বলি ফাষ্টো কেলাসের ভাড়া দিয়েছ তো ? দেখি তোমার টিকেট খানা।" বলে ক্যাব্‌লা হাত বাড়ালে।

এ ব্যাপারের পর কোন সাহেবের পক্ষে ধৈর্য্য ধরে থাকা একেবারেই যে অসম্ভব তা বোধ করি আর তোমাদের বলে দিতে হবে না। দু জনে মহা যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, আর তার দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম শুধু একা আমি। দৃশ্যটা মন্দ নয়! হু হু করে বায়ুবেগে গাড়ী চলেছে, আর তারই ভেতরে বালি-সুগ্রীব, শুম্ভ-নিশুম্ভ কিম্বা গজ-কচ্ছপ—যারই বলনা কেন সংগ্রাম চল্‌ছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে ক্যাব্‌লা সাহেবের নাদুস্‌-নুদুস্‌ শরীরটাকে ঠেসে ধরে দু হা'তে চাপ দিতেই সে বেচারা মেঝের ওপর একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়্‌ল। ক্যাব্‌লা তখন তাকে কীচক-বধ করে আর কি ? কিন্তু তখনই আবার কি মনে করে সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল।

দু'জনে নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে বস্‌ল, কারো শরীরই অক্ষত ছিল না। বেচারা সাহেবের দিকে তাকিয়ে হাসি সাম্‌লানো দায় হোল, অপমানে তার কালো মুখ একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। ক্যাব্‌লা কিন্তু জান্‌লা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আন্‌মনে কি ভাব্‌ছিল, হঠাৎ দেখি, সে হাত দুটো একত্র করে সাহেবকে নমস্কার কর্‌লে। সাহেব কিন্তু প্রতিনমস্কার করা দূরে থাক্‌, একবার ফিরেও তাকালে না। ট্রেন খুল্‌নায় এসে পড়েছিল, আমরা নেমে পড়্‌লাম।

তারপর মহা আনন্দের ভিতর দিয়ে কীভাবে সারা বিকেলটা যে কেটে গেল তা যেন টেরই আমরা পেলাম না। সন্ধ্যাবেলায় শরৎ ঘোষের 'জাতিচ্যুত' নামে যে থিয়েটারটা হলো, সেটা পর্য্যন্ত ক্যাব্‌লা বাদ যেতে দিলে না। আমাদেরই চেনা সূর্য্যকান্ত সেন মশাই খুলনার উকীল, তাঁরই বাড়ীতে বাকী রাতটা কাটাবার জন্যে রাত দুপুরে গিয়ে হাজির হলাম।

পরদিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরে বেরিয়ে আস্‌তেই যে দৃশ্য চোখে পড়্‌ল তাতে আমাদের একেবারে চক্ষুস্থির—দোরের সাম্‌নেই পুলিশ দাঁড়িয়ে। ক্যাব্‌লা তাদের সুমুখে যেতেই একজন সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর বল্লে, "আপনাকে আমরা গ্রেপ্তার কর্‌লাম।"

ক্যাব্‌লা গোড়াতে একটু থতমত খেয়ে গেল, কিন্তু চট্‌ করে সে ভাব কাটিয়ে উঠে বল্লে, "হেতু ?"

"হেতু, কাল আপনি ট্রেণের ভেতর মিষ্টার ডিরোজাকে প্রহার করেছেন।"

"ওঃ, তা বেশ, চলুন!"

ক্যাব্‌লাকে সাথে করে পুলিশ বিদায় নিতেই সাহেবটার ওপর অশ্রদ্ধায় মন আমার ভরে উঠ্‌ল। মারামারিতে হেরে গিয়ে শেষটায় কিনা আদালতের আশ্রয়। কোথাকার ছ্যাঁচ্‌ড়া গাড়োয়ান সাহেব রে! যাই হোক্‌, সমস্ত কথা গুছিয়ে সূর্য্য বাবুকে এখন বলা দরকার, যদি তিনি কিছু এর বিহিত করতে পারেন।

সূর্য্য বাবু সব কথা শুনে বল্‌লেন, "দেখা যাক্‌ কোর্টে গিয়ে কি হয়।"

পরের দিন কোর্টে মাম্‌লা উঠল। বিচারক একজন সাহেব ; দেখে মনে হল

বাঁ গালে···

লোকটা বেশ খোস্‌-মেজাজীই হবেন! রসিকও যে তিনি বিলক্ষণ তা একটু বাদে তাঁর

মাম্‌লার রায় বার হতেই বোঝা গেল। তিনি বিচার করে ঠিক কর্‌লেন—'ক্যাব্‌লা ও সাহেব দু জনাই পরস্পরকে মেরেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্যাব্‌লার মারের সংখ্যাই হয়েছে বেশী। ধরা গেল একটা চড় সে বেশী মেরেছে; কাজেই তিনি তাকে দশ টাকা জরিমানা কর্‌লেন।'

হাকিমের রায় শুনে ক্যাব্‌লা একটু চুপ করে থেকে বল্লে, "একটা চড়ের দাম দশ টাকা নাকি ?"

হাকিম মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "হাঁ।"

মাথা নীচু করে ক্যাব্‌লা আবার কি একটু ভাব্‌লে, তারপর হঠাৎ ডিরোজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল, "একটা চড়ের দাম দশ টাকা! আমার পকেটে এখনো কুড়িটী টাকা রয়েছে। তা হলে আরও একটা চড়…"কথাটা শেষ কর্‌বার আগেই ক্যাব্‌লা ডিরোজার বাঁ গালে এম্‌নি এক চড় কষালে যে সমস্ত ঘরটা যেন কেঁপে উঠ্‌ল।

কুড়িটী টাকা ফেলে দিয়ে গট্‌ গট্‌ করে ক্যাব্‌লা যখন আদালত হতে বেরিয়ে এল, তখন আদালত-শুদ্ধ লোক ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বিলাতী ডাক

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল, বি-এ)

টুটু মিনু এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধব,

ভূমধ্যসাগর। পূর্ব্বের সীমানা ছাড়িয়ে এবার পশ্চিমে এসে পড়েছি। শীত পড়ি পড়ি কর্‌ছে। সূর্য্যের আলো আছে, তেজ কম। সকাল বেলার রোদটুকু বড় মিষ্টি লাগে। দুপুর বেলায় অল্প গরম পড়ে, আবার সন্ধ্যাবেলায় মনে হয় কম্বলটা গায়ের ওপর টেনে দিই। একে একে দিন কাটে। সেদিন হঠাৎ সমুদ্র আবার তার নিজ মূর্ত্তি ধারণ করেছে। সবাইকে বেশ আবার খানিকটা দোলালে। পরের দিন সকালে আকাশ পরিষ্কার, পায়ের তলায় নীল জল, গভীর নীল—যেন কার গাঢ় নীল চোখ, তার ওপর যেন আমাদের ছায়া পড়েছে ছোট্ট হয়ে—সত্যিকারের আমরা কোথায় কে জানে! সারাদিন ধরে সেদিন আমরা ক্রীটদ্বীপের ধার দিয়ে চলেছি। ক্রীটদ্বীপ

ইতিহাসে বিখ্যাত। গাছপালা বড় বিশেষ নেই। ছোট ছোট গ্রাম দেখা যায়। ক্রীটে গ্রীক আর তুর্কীর বাস। সেখানেও ইংরেজের পতাকা ওড়ে, কিন্তু গ্রীক আর তুর্কীর বিবাদ নেই, একটু যেন তাজ্জব মনে হয়। খটখটে পাহাড়ে দেশে মানুষের জীবনযাত্রা কেমন করে চলে জানি না। দূর থেকে যেন দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় ভেড়া আর গরু চরে বেড়ায়, আবার স্থানে স্থানে যেন জেলেদের ডিঙ্গী।

সন্ধ্যাবেলা নীল আকাশ—কে যেন তার ওপর মুঠো মুঠো তারার ফুল ছড়িয়ে দিয়েছে। এক টুক্‌রো চাঁদ,—নীল জলে তার ছায়া পড়েছে। আকাশকে সাগর বলে মনে হয়, সাগরকে আকাশ ভুল হয়, কে কার ছায়া। সাগরের হুঙ্কার নেই, শুধু চারি দিকে এক অস্ফুট মৃদুমর্ম্মরে আপন অস্তিত্বকে সে প্রকাশ কর্‌ছে। মাঝে মাঝে অল্প অল্প হাওয়া দেয়, ঠিক যেন আমাদের দেশের দক্ষিণে হাওয়া। তাকে তাচ্ছিল্য করবার উপায় নেই। দুরন্ত শিশুর হাসির মত সে যেন গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মনে হয়, চারিদিকে এই অল্প আলো আর অল্প ছায়ার রং মিশিয়ে যে ছবি-আঁকিয়ে এই যে ছবিটি রচনা কর্‌ছেন, সে না জানি কত বড় ওস্তাদ। সে কেমন করে আমাদের মনের খবর জান্‌লে! এ যে আমাদের ভালো লাগে, এ কথা কি আমরা তাকে কোনো দিন বলেছি? একটা কথা কি তোমরা কোনো দিন ভেবেছ? মন যখন খুসীতে একেবারে ভরে ওঠে, তখন কি মনে হয়? আমার ত একেবারে যা'তা' কর্‌তে ইচ্ছে করে। মনে হয়, চারিদিকে যেন আমার আমিটি আলোর সঙ্গে, হাওয়ার সঙ্গে, ছায়ার সঙ্গে মিশে একেবারে একাকার হয়ে গেছে। জ্যোৎস্না রাতে স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখি এ আর এক স্বপ্ন, এ জেগে থাকার স্বপ্ন। আবার মনে হয় এটা একেবারে ভুল, মস্ত ভুল, এ যেন আঁধার রাতে ভূতের ভয়ে চোখ বুজে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকার মত। জগতে রূপ বলে, ভালো ব'লে, কিছু আছে কি না সন্দেহ হয়। সেদিন ফরাসীরা মিলে সমস্ত এসিয়াবাসীর যে অপমানটা কর্‌লে, তাতে তাই ত মনে হয়। যাক্‌ সে কথা!

আমরা চলেছি দুটো মহাদেশের মাঝখান দিয়ে, একদিকে আফ্রিকা আর একদিকে ইউরোপ। ভূমধ্যসাগরের এই দু'টী তীরের ইতিহাসের পাতায় রক্তের ছাপ এখনও লেগে আছে। জয়ের আনন্দে কার্থেজের সভ্যতা আজ মাটীর নীচে,

ওদিকেও আরবরা বড় কসুর করে নি ; এমন দিন ছিল, যখন সমস্ত ইউরোপের দক্ষিণ দিক্‌টা আরবদের খাসমহল হয়ে দাঁড়িয়েছিল ; তার পরিচয় এখনও অনেক জায়গায় বর্ত্তমান। গোটা স্পেন দেশটাই যেন ইউরোপের সমাজ থেকে একেবারেই বাইরে। সে সব কথা পরে বল্‌বো।

সেদিন সকালে আমরা "স্তম্বোলি" আগ্নেয় গিরির ধার দিয়ে চলেছি। দিনের বেলায় শুধু ধোঁয়া দেখা যায়, রাতে নাকি ভারী সুন্দর দেখায়। স্তম্বোলির চারিদিকে বেশ একটি ছোট্ট ছবির মত সহর গড়ে উঠেছে। জাহাজ তীরের খুব ধার দিয়ে চল্‌ছে। বাড়ী-ঘর-দোর সব বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দূরে ঐ গির্জ্জেটি যেন ছবির মত। পাহাড়ের ওপর আঁকা বাঁকা পথ। চারিদিকে সমুদ্র। এই ছোট্ট আগ্নেয় দ্বীপটি যেন স্থলের হাতের তেলোয় প্রদীপটির মত, এই দিয়ে জলের নীচে মাটী যেন সবাইকে বল্‌ছে, "আমি আছি।" পাহাড়ের গায়ে ঘা খেয়ে, জলের এখানে বেজায় ঘূর্ণী ; এ জায়গাটার চারিদিকেই জলের ওপর মাথা-উঁচু-করা পাহাড়—দূরে একটা

মার্স্তাই সহরের একটী দৃশ্য।

পাহাড়কে ঠিক একটা মস্ত ঘোড়া বলে ভুল হয়। এমনি করে দিন যায়, একদিন ভোরে আমাদের জাহাজ মার্স্তাই পৌঁছাল—ফরাসীদেশের দক্ষিণে। দূর থেকে ইউরোপের আভাস পাওয়া যায়। চারিদিকে কল আর কারখানা—কালা আর

কালো। ক্রমে বন্দরে এসে জাহাজ লাগ্‌লো। মার্স্তাই সহরটি সত্যিই সুন্দর। দলে দলে লোক এসেছে, বাবা, ভাই, বোন, তীরে দাঁড়িয়ে রুমাল নাড়্‌ছে। আমাদের পাস্‌পোর্ট্‌ পরীক্ষা করে তবে ছেড়ে দেবে। যে ফরাসী ভদ্রলোকটির স্ত্রী আনামী, তাঁকে সবার সাম্‌নে সে কথাটা মান্‌তেই হলো। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার মশাই হাস্‌তে গিয়ে বড় বড় গোঁফের তলায় একটু কেসে নিলেন। সবার সঙ্গে এবার বিদায়, "ও রেভোয়ার, ও রেভোয়ার"। চীনে ছোকরাগুলির প্রায় কাঁদকাঁদ মুখ, আমরা বেশ ছিলাম এক রকম। যাবার সময় পিঠ চাপ্‌ড়ে বলে দিলাম, "কর্ত্তব্য ভুলো না।" এবার আমাদের দলে আমরা চারটি ভারতবাসী আর সেই জাভানী ভদ্র লোকটি মিঃ সিজিদ্‌। "প্যারিস," অথবা "পারী" পর্য্যন্ত আমরা একসঙ্গেই যাবো। গোটা একটা দিন মার্স্তাইতে থাক্‌বো, ভেবে চিন্তে ঠিক করা গেল। আমরা সবাই তখন রীতিমত ক্লান্ত। অনেক দিন পরে আবার জমী! ইতিমধ্যে এক ভারতীয় ভদ্রলোক এসে আমাদের মালপত্রের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাঁদের এই সহরেই কারবার, জাহাজে মানুষ আর মাল বোঝাই আর জাহাজ থেকে নামাই। ব্যবসা মন্দ নয়। ভদ্রলোক আসলে পাঞ্জাবী, তবে একটু এদিকের রক্তও মেশানো আছে মনে হয়। ঠিক হলো সেদিন মার্স্তাই দেখা হবে। ইতি—

দাদা।

নীল-পাখী

(শ্রীযতীন সাহা)

—এক—

সে ছিল এক রাজকুমার—মাথায় তার কালো মিস্‌মিসে একমা বাব্‌রী চুল, নিটোল দেহ—ঢল্ ঢলে তুটি চোখ ; দেখ্‌লেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে।

—কিন্তু—

রাজার ছেলে হলে হবে কি !—সে চায় তার সমবয়সী ছেলেদের সাথে প্রাণ খুলে কথা কইতে। প্রকাণ্ড রাজ-প্রাসাদটা তার কাছে মনে হয়—ঠিক যেন একটা কারাগার। সে শুধুই চায় সে কারাগার থেকে দূরে সরে থাক্‌তে। কথায় কথায় রাজকুমার বলে—'চাইনা এ কয়েদখানায় থাক্‌তে—চলে যাবো !

রাজা বলেন—'সে কি রে পাগল !—যাবি কোথা ?'

রাণী বলেন—'ষাঠ আমার !—অমন কথা কি বল্‌তে আছে ?'

রাজকুমার কারুর কথা শোনে না—শুধুই বলে, 'চাই না—রাজ্য চাই না, ধন চাই না, তার চাইতে বনের ধারের কুঁড়ে ঘর, ঝর্‌ণার জল আর পাহাড়ের ফলই আমার ভালো—আমি যাবোই—যাবো !'

—"আরে যাবি কোথা ?"

নি ভাবেই কুমার উত্তর দেয়—'যেদিকে ছ'চোখ যায়।'

সত্যি তা'ই হ'ল !—

নিশুতি রাতে পুরীর সবাই যখন বিভোর ঘুমে অচেতন, ঠিক তেম্‌নি সময়

একদিন কুমার শুধু তার তীর-ধনুটা নিয়ে খিরকির দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়্‌লো ; কোথায়—তা' সেই জানে !

—তুই—

রাজকুমার পথ চলে, ক্ষুধা পেলে গাছের ফল খায়, রাত হ'লে গাছে চড়ে ঘুমোয়—দিন হলে আবার চলে। এম্‌নি দিনের পর দিন চল্‌তে চল্‌তে একদিন তার তু' পা অবশ হয়ে এলো—হাজার হলেও রাজার ছেলে তো! এত কষ্ট সইবে কেন ?

কুমার আর চল্‌তে পার্‌লো না, কাজেই একটা কৃষ্ণচূড়ো গাছের ছায়ায় ধপাস্ করে বসে পড়্‌লো। তেষ্টায় তার বুক ফাট ফাট—কিন্তু এই নিবিড় বনে জল পাবে কোথা।

তুঃখে কুমারের তু চোখ বেয়ে জল এলো। ঠিক এম্‌নি সময় চোখে পড়্‌লো তার ছোট্টো একটা পাখী। হঠাৎ পাখীটা দেখে কুমার সেইদিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলো। অনেক পাখীই সে দেখেছে কিন্তু অমনটি তো আর দেখে নি—কি চমৎকার সেই অতটুকু পাখীটি।

নিমেষে সকল কষ্ট ভুলে কুমার হাত বাড়িয়ে ডাক্‌লো 'ছোট্টো পাখী, আয় আয় !'

পাখী উড়ে এসে কুমারের মাথার উপর দোল্ দিয়ে একটা চাড়া গাছের ডগায় বসে মানুষের কথায় বল্‌লো—

'রাজকুমারী পাঠায় বাণী,
কোথায় আছে তাও তো জানি।
এই পথেতে নীল পাখী যায়—
যাবি যদি সঙ্গেতে আয় !'

পাখীর গলায় মিষ্টি কথা শুনে কুমার বল্‌লো—'পাখী তুমি কে ?' পাখী তার কোনই জবাব দিলো না, শুধু ঐ কথা কয়টি বল্‌তে বল্‌তে ঝোপ্‌ঝড়ের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চল্‌লো।

পাখী চলে যায় দেখে কুমার তাকে ধর্‌তে গেল—কিন্তু সে কি আর ধরা দেয় ?

—তিন—

সারাটা দিন পাখীর পেছু পেছু ঘুরেও যখন কুমার কিছুতেই তাকে ধর্‌তে পার্‌লো না তখন সে তার ধনুতে তীর জুড়্‌লো। রাজার ছেলের লক্ষ্য সে কি আর মিছে হয় ?

অতটুকু পাখী বুকের রক্তে রাঙ্গা হয়ে ঠিক গাছের ঝড়া পাতাটিরই মত এসে কুমারের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়লো—তখনও শেষ নিঃশ্বাস টুকু তার বয়ে যায় নি।

রাজকুমার সেই আধমরা পাখীটাকে হাতে তুলে নিতেই পাখী অতি কষ্টে তার ঠোঁট নেড়ে বল্‌লো—

'রাজকুমারী পাঠায় বাণী
কোথায় আছে তাও তো জানি—
......'

তার পর পাখী আর কিছু বল্‌তে পারলো না, শুধু কুমারের বুকের উপর ঢলে পড়্‌লো। পাখীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কুমার শুধুই কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। সেই নিবিড় বনে রাজকুমার চলে আর শুধুই বলে—

'রাজকুমারী পাঠায় বাণী,
কোথায় থাকে তাও না জানি,
কোন্ পথেতে নীল-পাখী যায়
সেই কথা কেউ বল্‌বে আমায় ?'

বছরের পর বছর কেটে গেল, কেউ কুমারের কথার জবাব দিলো না—কেউ বল্‌লো পাগল—কেউ বল্‌লো খামখেয়ালী।

রাজকুমারকে এখন আর রাজকুমার বলে চেনা যায় না। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে তার সেই ডগ্‌ডগে সোণার রং তামাটে হয়ে গেছে—অযত্নে চুলে জটা বেঁধে গেছে—যে দেখে সেই ভাবে পথের ভিখিরী।

—চার—

এম্‌নি চল্‌তে চল্‌তে রাজকুমারের পথ ফুরোল একদিন এসে এক গভীর বনের ভেতর। পথ হারিয়ে কুমার বেজায় ভাবনায় পড়ে গেল ; ঠিক এম্‌নি সময় কোথা

থেকে ঠিক তেম্‌নি একটা পাখী এসে কুমারের মাথার উপর বস্‌লো। কুমার খপ্‌করে পাখীটাকে ধরে ফেল্‌তেই পাখী তার ছুঁচের মত ধারালো ঠোঁট দিয়ে তার হাতে ঠোকর মেরে রক্ত বের করে দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুমার পাখীটাকে ছেড়ে দিতেই কোথায় গেল সে পাখী! কুমার চেয়ে দেখ্‌লো রূপের ছটায় সারা বন আলো করে তার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে এক রাজকুমারী।

আমিই সেই রাজকুমারী।

সহসা রাজকুমার তার চোখকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লো না, দুহাতে চোখ রগ্‌ড়ে চাইতেই দেখ্‌লো সত্যিই রাজকুমারী তার হাত্‌খানা ধরে চুপি চুপি বল্‌ছে, 'রাজকুমার দেখ্‌ছো কি, আমিই সেই রাজকুমারী যার বার্ত্তা নিয়ে এক পাখী দেশে দেশে ঘুড়ে বেড়াতো। এতদিন পাখী ছিলেম, আজ তোমার পরশে আবার মানুষ হয়েছি। সে সব কথা বল্‌বো পরে, আগে চলো এখান থেকে শিগ্‌গির পালিয়ে যাই। সেই ডাইনী বুড়ী দেখ্‌তে পেলে কিন্তু আর রক্ষে নেই, আবার দুজনকেই পাখী হ'তে হবে। এ বনে এক ডাইনী থাকে, সে মানুষ দেখ্‌লেই তাদের পাখী করে রাখে।

—পাঁচ—

রাজকুমার আর রাজকুমারীর পালানো হ'ল না। পথে তারা ধরা পড়্‌লো সেই ডাইনী বুড়ীর হাতে—ডাইনী বুড়ী রাগে গড়্ গড়্ কর্‌তে কর্‌তে রাজকুমারীকে মন্ত্র দিয়ে করে দিলো ফুল, আর রাজকুমারকে করে দিল ছোট্টো একটা নীল পাখী।

কিন্তু কেউ কারুর কথা ভুল্‌তে পার্‌লো না। সেই থেকে নীল পাখী ফুলে ফুলে ঘুরে বেড়ায় রাজকুমারীর খোঁজে—কতদিনে তার দেখা পাবে কে জানে!

উঁচু জিনিষ

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

বিষ্টুপদ'র বড়্‌দা সেবার কলকাতা এসে মনুমেণ্ট দেখে নাকি হাঁ হ'য়ে গিয়েছিল, বাপরে! অত উঁচু জিনিষও নাকি আবার হয়! কিন্তু বেচারী জান্‌তো না যে মার্কিণ মুল্লুকে অম্‌নিতর 'ক্ষুদে' দালান হামেশাই তৈরী করা হচ্ছে। দালানের মাথায় চড়ে চাঁদামামার ঘরবাড়ীই যদি দেখ্‌তে না পাওয়া গেল, তবে আবার নাকি সেটা বাড়ী। রামচন্দ্রঃ!

তা আমাদের অতদূর যাবারই বা দরকারটা কি? আমাদের দিল্লীর কুতুব-মিনারও ত' কমসম করে এর দেড়গুণ! আমাদের এই কুতুব মিনারের মত উঁচু একটা স্তম্ভ বিলাতেও আছে—তার নাম হলো 'দি মনুমেণ্ট'। লণ্ডনে একবার দারুণ আগুন লেগে সারা সহরটা পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘটনা মনে রাখবার জন্যই এই স্তম্ভটা তৈরী।

কিন্তু সবচেয়ে সেরা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় প্যারীর 'ইফেল টাওয়ার'টাকে প্রায় এক হাজার ফিট হলো উঁচু,—সমস্তটা কেবল লোহা দিয়ে তৈরী। বোঝ ব্যাপার খানা!'

ব্যাপারটাকে তোমরা নেহাৎ ডাল-ভাত মনে কর্‌লে না ত? এই এক হাজার ফিট উঁচু মানে হলো, আমাদের মনুমেণ্টের ঘাড়ে যদি পর পর আরও ঐ রকম প্রায় গোটা সাতেক মনুমেণ্ট চাপানো যায় তবে যত উঁচু হবে, তত উঁচু হলো এই স্তম্ভটা। আর সে যেন একখানা ছোটখাট সহর আর কি! থিয়েটার, বায়স্কোপ, রেষ্টুরেণ্ট, লিফ্‌ট্—যা চাও সবই সেখানে মিল্‌বে। আবার মাটি থেকে প্রায় ন'শো পাঁচ ফুট উঠ্‌লে পার একটা মস্ত বড় কাচের দরদালান,—সেখানে শ'খানেক লোক বসে

অনায়াসে একটা মিটিং কর্‌তে পারে। তা ছাড়া এর মাথায় আছে একটা মস্ত বড় আলো,—প্যারী থেকে প্রায় মাইল পাঁচেকের লোকেরা সে আলো দেখ্‌তে পায়।

উঁচুতে এই ইফেল টাওয়ারের মত না হলেও আমেরিকার ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল স্তম্ভটাও নেহাৎ কম যায় না। পাঁচশো পঁচাত্তর ফিট উঁচু একখানা ছবির মত সাদা পাথর যেন সগর্ব্বে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা যুক্তরাজ্যের প্রথম সভাপতি ওয়াশিংটনের নাম নিশ্চয়ই শুনেছ। কেমন ভাবে তিনি সামান্য লোক থেকে ক্রমে ক্রমে সাহস ও বীরত্ব দেখিয়ে গোটা দেশটার 'শির' হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন; কি রকম করে কুলি, মুটে, মজুর, চাষা-ভূষোদের নিয়ে বীরের মত যুদ্ধ করে নিজের দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন; কি রকম করে, এক পরাধীন দেশকে নতুন করে গড়েপিটে স্বাধীন সুন্দর করে তুলেছিলেন;—এসব খবর তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই কিছু নতুন নয়। সেই প্রথম বীরের কথা মনে রাখ্‌বার জন্যই এই সুন্দর স্তম্ভের সৃষ্টি।

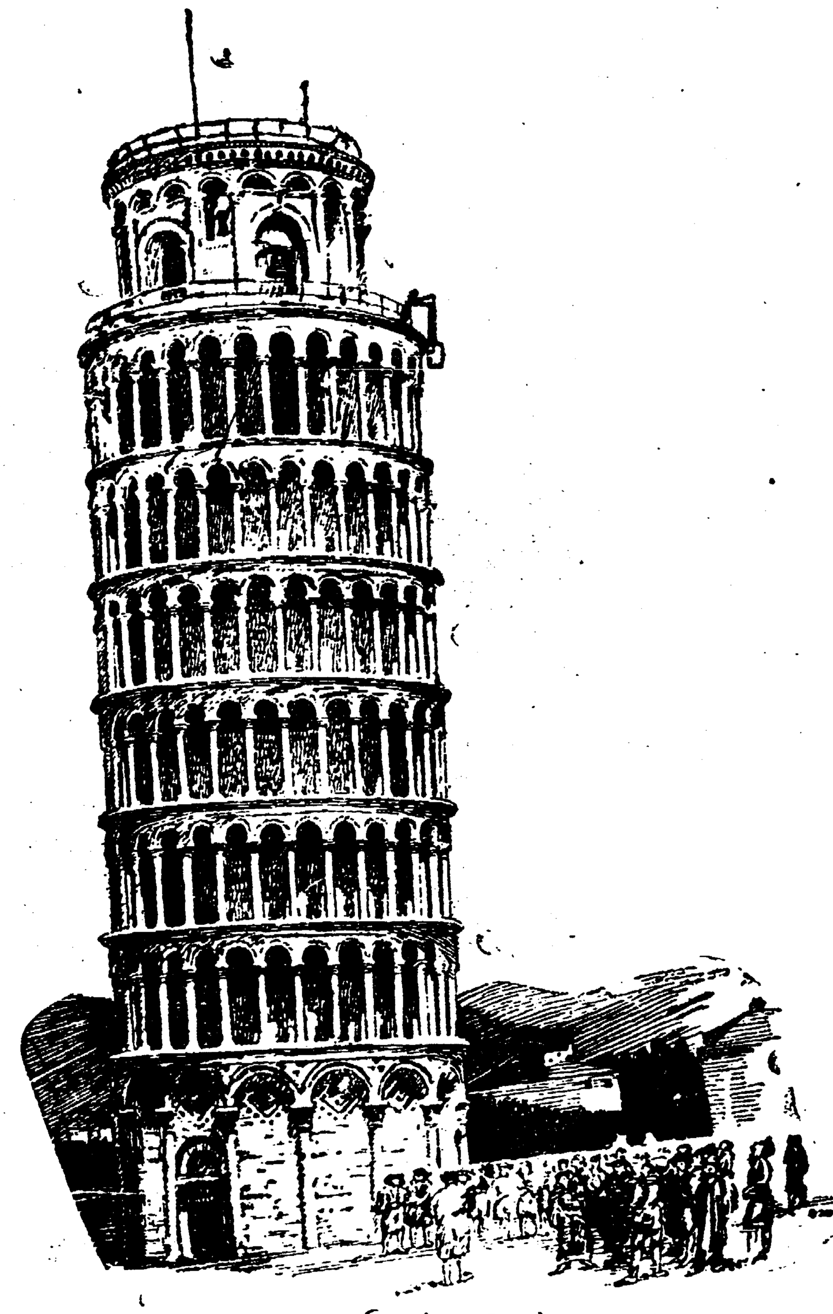

পিসার স্তম্ভ।

এ স্তম্ভটার কথা বল্‌তে বল্‌তে আর একটা স্তম্ভের কথা মনে পড়ে গেল। ওয়াশিংটনের স্মৃতিস্তম্ভ যেমন তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে তোলা হয়েছিল, এ স্তম্ভটাও ঠিক তেম্‌নি। স্তম্ভটার নাম হলো "ক্লিওপেট্রাস্ নিড্‌ল্" (অর্থাৎ ক্লিওপেট্রার সূঁচ)। স্তম্ভটার আসল বাড়ী হলো মিশর দেশে। মিশরে অনেক দিন আগে এক রাণী ছিলেন, ক্লিওপেট্রা—ভারী সুন্দরী, দেশজোড়া ছিল তাঁর নাম। লোকে মিশরটার আর

একটা নামই দিয়ে দিয়েছিল, "ক্লিওপেট্রার দেশ।" এখানেই এই স্তম্ভটা ছিল, সেখান থেকে বিলাতে নিয়ে আসা হয়েছে। সে ১৮০১ সনের কথা, বিলাতের এক জেনারেল দেখেন যে এই স্তম্ভটা মাটিতে পড়ে আছে। তিনি সেটাকে সেখান থেকে বিলেতে নিয়ে আসতে চেষ্টা কর্‌লেন, কিন্তু কিছুতেই আন্‌তে পার্‌লেন না। ইংরেজদের রোখ চাপ্‌ল, এটাকে দেশে আন্‌তেই হবে। শেষকালে, তার প্রায় ৭৬ বছর পরে আর এক ভদ্রলোক লোকজন নিয়ে এসে, এই স্তম্ভের চারদিকে একটা সুন্দর খাঁচা তৈরী করে, তার উপরে একটা জাহাজ তৈরী করে ফেল্‌লেন; নাম দিলেন "ক্লিওপেট্রা।" তার পর মাঝি মাল্লা নিয়ে বিলাতের দিকে রওনা হলেন। কিন্তু বেশী দূর যেতে হলো না, খানিকটা গিয়েই সাগরে এমন ঝড় উঠ্‌ল যে, সবাই 'ক্লিওপেটা' ছেড়ে আর একটা বড় জাহাজে চড়ে পালালেন। ক্লিওপেট্রা তার আপন মনে ভেসে চল্‌ল। যেতে যেতে পথে Fitzmaurice নামে এক জাহাজের সাথে দেখা। শেষে সেই জাহাজ 'ক্লিওপেট্রা'কে বেঁধে নিয়ে বিলাতে পৌঁছে দেয়। এখন টেম্‌স্ নদীর পারে স্তম্ভটী দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

রোড্‌সের বিশাল অগ্নিমূর্ত্তি—কলোসাস্।

এর পরেই মনে পড়ে পিসার হেলান স্তম্ভের কথা। তার কথা তোমরা অনেক শুনেছ, কাজেই সে সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বল্‌লাম না।

এম্‌নি ধারা জগতের দেশবিদেশে যে সব চমৎকার চমৎকার মস্ত মস্ত স্তম্ভ আর মূর্ত্তি আছে, তা দেখ্‌লে বাস্তবিকই আশ্চর্য্য হ'তে হয়।

সেকালে রোড্‌স্ বন্দরে ঢোকবার পথে এক মস্ত বড় মূর্ত্তি করা হয়েছিল, সেই মূর্ত্তির পা'র তলা দিয়ে জাহাজগুলি মালপত্র নিয়ে বন্দরে ঢুক্‌তো! বোঝ ব্যাপারখানা। আগের পৃষ্ঠায় তা'র একটা ছবি দেওয়া হলো, তা থেকেও খানিকটা আঁচ করে নিতে পার্‌বে। এর নাম ছিল "কল্‌সাস্ অব রোড্‌স্।" কল্‌সাস্ যেন আবার 'কলোসাম্' বলে ভুল করে ব'স না।—কলসাম হলো একটা বিরাট দালান। ইটালীর রোম সহরের এক রাজা সেটা গড়েছিলেন, তা'তে রাজ্যের যত খেলা-ধূলা, কুস্তি-কসরৎ, আমোদ প্রমোদ হতো। দেশ বিদেশ থেকে লোকেরা সব দেখ্‌তে আস্‌ত।—জায়গার অবশ্য অকুলান হবার কোনই কারণ নেই, কেননা কমসম করেও দালানটায় লাখখানেক লোক ত ধর্‌তোই।

আমেরিকার 'স্বাধীনতা-মূর্ত্তি'।

এম্‌নি করে বড় বড় দালান কোঠা, স্তম্ভগুলির নাম কর্‌তে গেলেও অনেক লিখ্‌তে হয়। তোমরা অনেকে হয় তো কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল দেখেছ। আগ্রার তাজমহলের মত ক'রে এটাকে গড়ে তোল্‌বার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আসলে আর তা হয়ে ওঠেনি। বিলাতেও একটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল আছে। সেখানে অবশ্য এখানকার

মত বাড়ী একটা নেই, কিন্তু ভিক্টোরিয়ার একটী মূর্ত্তি আছে বিরাশী ফিট উঁচু।— সুন্দর জিনিষটি !

আর একটি সুন্দর মূর্ত্তি হলো আমেরিকার "ষ্ট্যাচু অব লিবার্টি" অর্থাৎ স্বাধীনতার মূর্ত্তি (ছবি দেখ)। এই মূর্ত্তিটা উঁচু হলো একশো একান্ন ফিট। তার হাতে যে একটা আলো দেখ্‌ছ, অনেক দূর থেকে এ আলো দেখ্‌তে পাওয়া যায়। এ মূর্ত্তিটা মার্কিণরা উপহার পায় ফরাসীদের কাছ থেকে, তাদের স্বাধীন হওয়ার ঠিক একশো বছর পরে।

তা ছাড়া, বিলাতের হাইড্‌ পার্কে "পিটার প্যানের" মূর্ত্তি, আমাদের তাজমহল, গ্রাস দেশের ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতিরও সুন্দর বলে নাম ডাক আছে। তোমরা বড় হয়ে বিদেশের না পার, একবার অন্ততঃ দেশের এই আজব জিনিষগুলি দেখে নিও।

ফুলের পরী

[জাপানী রূপকথার ছায়া অবলম্বনে]

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুশীলচন্দ্র মিত্র, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌ (প্যারিস্‌)

অনেক দিন আগে একটা নির্জ্জন পাহাড়ের উপর একটা বাগান-ঘেরা ছোট্ট বাড়ীতে একটী লোক থাকৃত। তার কেউ ছিল না। সে একলাই থাকৃত। বাড়ীতে এমন কি,—একটা চাকর পর্য্যন্ত ছিল না। তবুও তার মোটেই খারাপ লাগ্‌ত না—কখনো সে নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে করত না। তার কারণ সে ভয়ানক ফুল ভালবাস্‌ত। রোজই সে তার বাগানে নানারকম ফুলের গাছ লাগাত—লাল, নীল, সাদা, হল্‌দে, বেগুনী, গোলাপী,—এই রকম কত রঙের সব ফুল। এই সব ফুল যখন ফুটে উঠ্‌ত তখন তার বাগানে রঙের যে কী মেলা বস্‌ত তা' বর্ণনা করা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় সূর্য্যাস্তের সময় পশ্চিম-আকাশে যে রকম রঙের ঘটা দেখা যায়, সেই রকম রঙের ঘটা তার বাগানে সমস্ত দিন—সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত।

রোজই সে বাগানে নিজে হাতে করে মাটী কোপাত,—ফুলের জমী তৈরী করত। তারপর নিজে হাতে করে নূতন নূতন ফুলের চারা বসাত। সযত্নে, সস্নেহে, সেই গাছের তলায় জল দিত। তার পর সেই ফুলের চারা যখন তার ডালপালা মেলে দিত,—পাতা ধরত,—তার ডালে যখন কুঁড়ি

ফুট্‌ত, তখন তার কী আহ্লাদ! ছোট্ট শিশু যখন মায়ের কোলে বাড়তে থাকে, তখন মায়ের যেমন আহ্লাদ হয়, তেমনি। তার-পর সেই সব ফুল যখন নানা রকম রঙ ছড়িয়ে ফুটে উঠ্‌ত, চারদিক্‌ গন্ধে ভরপূর করে দিয়ে বাতাসে একটু একটু দুল্‌ত, পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত,— তখন সে আনন্দে আকুল হ'য়ে একদৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকৃত,—তার আর জ্ঞান থাকৃত না। কখনো বা তার হাতের অতি কোমল স্নেহ-পরশ ফুলের পাঁপ্‌ড়িগুলির উপর একটু বুলিয়ে দিত,— কখনো বা অতি সন্তর্পণে, মুখটী ফুলের উপর ঠেকিয়ে একটু গন্ধ শুঁকৃত। তার পর ক্রমে যখন সেই ফুল শুকিয়ে গিয়ে ডাল থেকে ঝরে পড়্‌ত তখন মনের মধ্যে একটা গভীর গোপন বেদনা চেপে নিয়ে সকরুণ হাতে গাছতলা থেকে সেই ঝরা ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের ভিতর কাচের আলমারীর মধ্যে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখ্‌ত। এই ছিল তার ঘরের একমাত্র শোভা। কখনো গাছ থেকে তাজা ফুল তুলে এনে তার ঘর সাজাত না।

এম্‌নি করে বেশ সুখে তার অনেক দিন কেটে গেল,—তার পর হঠাৎ একদিন তার হ'ল অসুখ। আর বাগানে যেতে পারে না,—তার ফুলগাছের সেবা কর্‌তে পারে না, আনন্দ-বিহ্বল দৃষ্টিতে আর ফুলগুলির দিকে চেয়ে থাকৃতে পারে না। একাকী রোগ-শয্যায় নিরানন্দে তার দিন কাট্‌তে লাগ্‌ল। এতদিন পরে তার হঠাৎ একদিন মনে হ'ল,—কী ভয়ানক এক্‌লা সে! তার যদি অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে থাকৃত,—তাহ'লে নানা রঙের পোষাক পরে তারা কেমন তার বিছানার চারদিকে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে খেলা কর্‌তে পার্‌ত; আর তাদের দেখে দেখে তার রোগ-ক্লিষ্ট দিনগুলি কেটে যেতে পার্‌ত। তা হ'লে কেমন হ'ত!

কিন্তু ছেলেমেয়ে ত তার ছিল না! তাই দিন আর কাটে না। তার পর অসুখ যেমনি একটু কম্‌ল,—তখনি সে তার বিছানা ছেড়ে ঘরের জানালার ধারে এসে একটা আরাম-কেদারায় বস্‌ল। অনেক দিন রোগে ভুগে ভুগে তার দৃষ্টি তখন ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। তাই, বাগানে নানা রঙের সেই বিরাট্‌ মেলা তার চোখের উপর যেন ভয়ানক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভেসে উঠ্‌ল। কিন্তু তবুও সে রইল,—তার ফুলের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে; একবারও চোখ নামাল না। অনেকক্ষণ ধরে অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে, নির্নিমেষ পলকে চেয়ে রইল তার ফুলগুলির দিকে;—একবারও চোখের পাতা পড়্‌ল না।

এম্‌নি করে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকৃতে থাকৃতে তার ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে ভেসে উঠ্‌ল যেন অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মূর্ত্তি। নানা রঙের পোষাক পরা; তার ফুলগুলিকে ঘিরে ঘিরে চারিদিকে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে নানা রকমের অপরূপ ভঙ্গিমায় নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে খেলা কর্‌ছে। নির্নিমেষ নয়নে সে চেয়ে চেয়ে ছেলেমেয়েদের নাচ দেখ্‌তে লাগ্‌ল। ক্রমে তার দৃষ্টি আরো ক্ষীণ হ'য়ে এল। শরীর অবশ হ'য়ে এলিয়ে পড়্‌ল। চোখে ঘুমের ঘোর জড়িয়ে এল; কিন্তু

তখনো সে যেন অর্দ্ধ-নিমীলিতনয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌ল সেই নানা রঙের পোষাক-পরা অপরূপ ছেলে-মেয়েদের সেই অপরূপ নাচ। এখন আর তারা ফুলগুলির চারদিকে নাচ্‌ছে না,—এখন তারা নেচে নেচে এগিয়ে আস্‌ছে,—তারই জানালার দিকে। ক্রমে যেন তারা তারই ঘরের মধ্যে তাকেই ঘিরে ঘিরে নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

এম্‌নি ভাবে আপন-হারা হ'য়ে ছেলেমেয়েদের নাচ দেখ্‌তে দেখ্‌তে অনেকক্ষণ কেটে গেল। তার পর সে যেন হঠাৎ শুন্‌তে পেল,—তাদেরই মধ্যে একটী মেয়ে বল্‌ছে,—"আমরা হচ্চি ফুলের পরী, তোমারই ফুলগুলির প্রাণ। তোমার অসুখ করেছে বলে তুমি আমাদের কাছে আস্‌তে পার না; তাই আমরাই তোমার কাছে এসেছি। এখন রাত হ'য়েছে,—চল্লাম, কাল আবার আস্‌ব।"

শুনেই সে ধর্‌মড়্‌ করে উঠে বস্‌ল। চেয়ে দেখে চারদিক্‌ অন্ধকারে ভরে গিয়েছে। আকাশে আবার চিকিমিকি। পাহাড়ের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের ফাঁক দিয়ে দিয়ে একটু আধটু ম্লান জ্যোৎস্না তার বাগানের রঙের মেলার সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা যেন মায়ার সৃষ্টি করেছে।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বিছানায় এসে শুল।

পরদিন আবার জানালার ধারে বসে বসে সে দেখ্‌ল, তার ফুলগুলি ঘিরে ঘিরে সেই সব ছেলেমেয়েদের নাচ। ক্রমে আবার তারা তার নিকট এগিয়ে এল, এবং তাকে ঘিরে ঘিরে হাসির ফোয়ারা ছড়িয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। তারপর একটী মেয়ে বল্লে—"তোমার জন্য এই ফুলের একটু শিশির-বিন্দু এনেছি। এইটুকু খেয়ে ফেল, তাহলে কাল তোমার অসুখ ভাল হ'য়ে যাবে।"

পরদিন সত্য সত্যই তার অসুখ ভাল হ'য়ে গেল। সে আবার বাগানে বেরিয়ে আস্‌তে পার্‌ল,—তার ফুলগুলির মাঝ্‌খানে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, যেদিন থেকে তার অসুখ ভাল হ'য়ে গেল,—তারপরে আর এক দিনের জন্যও সেই ছেলেমেয়েদের দেখা পেল না।

তবুও তার ফুলগুলি নিয়ে তার দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাট্‌তে লাগ্‌ল। দিন গেল, মাস গেল, বছর গেল,—ক্রমে তার চুলে পাক ধর্‌ল। তার পর জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে আবার এক দিন সে রোগ-শয্যায় শয়ন কর্‌ল।

শুয়ে শুয়ে তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল,—সেই অনেক দিন আগেকার অসুখের কথা। সেই সব ছেলেমেয়েদের নানা রঙের পোষাক, অপরূপ ভঙ্গিমায় তাকে ঘিরে ঘিরে তাদের নাচ। তারপর সেই অসুখ সেরে গিয়ে অবধি আর তাদের দেখা নেই। তারা যদি আবার আসে!

তারা এল। আবার তাকে ঘিরে ঘিরে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। বৃদ্ধ সেই মেয়েটীকে বল্ল,—"তোমার সেই শিশির-বিন্দুটা আমাকে আবার দাওনা, তা হ'লে আমি আবার ভাল হ'য়ে যাব।"

মেয়েটী বল্লে,—"তা কি হয়? এবার যে তোমাকে আমাদের দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় হ'য়েছে। তোমাকে আমরা নিয়ে যেতে এসেছি।"

শন্‌ শন্‌ করে একটা সুগন্ধি হাওয়া ঘরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল। বৃদ্ধ চলে গেল সেই পরীদের দেশে।

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

মুহূর্ত্ত মধ্যেই রণজিতের চমক ভাঙ্গিয়া গেল, সে বুঝিল—বিস্ময় প্রকাশের সময় তার ঢের পড়িয়া আছে, কিন্তু কাল রাত হইতে যে দুটী প্রাণী হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সারাটাক্ষণ পড়িয়া, তাহাদের মুক্তির ব্যবস্থা করা দরকার সবার আগে। তাকের উপর সুপারী-কাটা জাঁতিটা তার চোখে পড়িতেই সেটীর সাহায্যে চট্‌পট্‌ সে দুজনার হাত-পায়ের বাঁধন কাটিয়া দিল।

মুক্তির ব্যবস্থা করা দরকার।

ছাড়া পাইয়া প্রথমেই হুকা-কাশি যে কাজটী করিলেন সেটী বাস্তবিকই উল্লেখ-যোগ্য। ভাঁড়ার ঘরের একপাশে খাবার রাখিবার একটী জালের আল্‌মারী ছিল, তারই সাম্‌নে গিয়া একটী ড্রয়ার তিনি সামান্য একটু টানিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। তারপর সোরাই হইতে খানিকটা জল নিজের মাথায় ঢালিয়া রণজিতের হাত ধরিয়া সোজা একেবারে বাহিরে বসিবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

চেয়ারে বসিতে বসিতে হুকা-কাশি খুব সংক্ষেপে দু'চার কথায় গত রাত্রির একটী বিবরণ দিলেন, কহিলেন, "যত তুচ্ছ ব্যাপারই হোক্ না কেন, রণজিৎ বাবু, আমাদের সাবধানতা কোন ক্রমেই এতটুকু কম্‌তে দিতে নেই। এ কথাটী সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বেন। সামান্য একটু সময়ের জন্য এ কথাটাকে তেমন আমলে আনিনি বলে, এই দারুণ নির্য্যাতন আমাদের ভোগ কর্‌তে হোল। তবে বেশীদূর ব্যাপারটা গড়াতে পারে নি এই যা রক্ষা!"

অধীর ভাবে রণজিৎ প্রশ্ন করিল, "কি হয়েছিল মিষ্টার হুকা-কাশি? ব্যাপার সবটা খুলে বলুন আমায়!"

"খুলে বল্‌বার বড় বেশী কিছু নেই; শুধু এইটুকু জান্‌বেন যে কাল আমাদের ঘড়ি-ওয়ালার দোকান থেকে বার হওয়া এবং সেখান থেকে আমার নিজের বাড়ীতে এসে পৌঁছান এই দুটো ঘটনা ঘট্‌বার মাঝখানে আমাদের সম্পূর্ণ অজানাতে আমরা ঘড়ি-চোরের চোখে পড়ে গেছি। এই চোখে পড়ায় অবশ্য ক্ষতি কিছুই হোত না যদি না এরই মধ্যে সে টের পেয়ে যেত যে আমরা লোক বড় সুবিধের নই, তাকে খুঁজে বের করার ফন্দি-ফিকিরেই ঘুর্‌ছি। তার অপরাধের সব চাইতে বড় চিহ্ন সেই পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়ি—যেটা আমাদের হস্তগত হয়েছে—সেটাকে যদি কোন ক্রমে সরিয়ে ফেলা যায় তবে অপরাধীকে আঁচ কর্‌বার যেটুকু সুবিধা আমাদের ছিল সেটুকুও উবে যাবে, আমরা আবার অকূল সমুদ্রে পড়ে যাব। তাই সে ঘড়িটী সরাবার মৎলবেই কাল সে সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে—এবং সে সাঙ্গপাঙ্গদলকে দেখে আমার ধারণা হোল তারা ভাড়াটে গুণ্ডা—আমার বাড়ীতে এসে হানা দিয়েছিল। তার পরের ঘটনা বোধ হয় আর না বল্লেও চলে, ভাঁড়ার ঘরে আমাদের কীচক-বধের মত দশা দেখে আপনি তা

অনুমান করে নিয়েছেন। কিন্তু…" হুকা-কাশি একটু থামিলেন, তারপর দম লইয়া আবার বলিতে সুরু করিলেন, "কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তাদের সে আশা পূর্ণ হয়নি। ছাড়া পেয়ে গোড়াতেই ভাঁড়ার ঘরে জালের আলমারীর দেরাজটা খুলে দেখ্‌লাম, আমার গুপ্ত স্থানের সন্ধান তারা পায়নি, ঘড়িটী নিরাপদে সেই দেরাজের ভেতরেই রয়েছে।"

এতক্ষণ পরে রণজিৎ উৎসাহ প্রকাশের অবকাশ পাইল, বলিল, "ঘড়ি নিরাপদে আছে, ওদিকে আবার চোর মশাই বড়ই বিপদে পড়েছেন—একেবারে ভূপেশ বাবুর খপ্পরে, এই দেখুন…" বলিয়া রণজিৎ দ্বারোয়ানের দেওয়া সেই কাগজের স্লিপ্‌টুকু হুকা-কাশির চোখের সাম্‌নে মেলিয়া ধরিল।

কাগজখানা রণজিতের হাত হইতে নিজের হাতে লইয়া হুকা-কাশি বার দুই তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেলেন, শেষে সেখানাকে একপাশে সরাইয়া নস্যদানী হইতে বেশ ধীরে সুস্থে—টিপ্ দুই নস্য লইলেন। পর মূহূর্ত্তেই রণজিৎ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, একখানা সাদা কাগজের গায়ে তিনি পেন্সিল দিয়া কয়েকটী তারিখের অঙ্ক লিখিতেছেন, এবং ঠিক তারই অব্যবহিত পরে সে চরম বিস্ময়ের সহিত দেখিল হুকা-কাশির মাথাটী অবিশ্বাস-সূচক ভাবে এপাশ হইতে ওপাশে নড়িতেছে। মনের উদ্বেগ সে কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "ওভাবে ঘাড় নাড়্‌ছেন কেন মিষ্টার হুকা-কাশি? আপনার কি বিশ্বাস ভূপেশ বাবু ভুল করেছেন, আসল চোর ধরা পড়েনি?"

"আমার মনের ভাব আপনি ঠিক অনুমান করেছেন রণজিৎ বাবু।"

"কিন্তু তবুও, ভূপেশ বাবু যখন এতটা জোর করে লিখ্‌ছেন তখন তাঁর ওখানে গিয়ে ব্যাপারটা অন্ততঃ পরীক্ষা করাও আমাদের উচিত নয় কি?"

"নিশ্চয়ই, তাঁর ওখানে যেতে হবেই তো! যদিও আমার মন বল্‌ছে ভূপেশ বাবুর বাড়ী না গিয়ে আমার বন্ধু, রিপন কলেজের বোটানীর প্রোফেসারের বাড়ী এখনই সোজা চলে গেলে তাতে করে অনেক খানি বেশী ফল পাওয়া যাবে, তবুও ভূপেশ বাবুর সম্মান রাখ্‌বার জন্যে তাঁর ওখানে গোড়াতে যাওয়াই সব চাইতে দরকার!"

"রিপন কলেজের বোটানীর প্রোফেসার? তিনি এ ঘড়ি চুরীর কি জানেন?"

"কিছুই না।"

"আমায় মাপ কর্‌বেন মিষ্টার হুকা-কাশি, আপনার এ হেঁয়ালীর মানে বোঝা আমার ঠাকুরদারও অসাধ্য।"

হুকা-কাশি বালকের মত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, তারপর কহিলেন, "একটু ধৈর্য্য ধরুন, আস্তে আস্তে সমস্তই একেবারে জল হয়ে আস্‌বে। অবশ্য ধৈর্য্য ধরে থাকা যে খুবই কঠিন তা আমি বুঝি। এই ধরুন, প্রোফেসার গুপ্তের ছেলে বিমল বাবু, তাঁকে তো সেদিন অত করে বলে দেওয়া হোল যে আমরাই তাঁকে খবর পাঠাব তবুও তিনি সুস্থচিত্তে থাক্‌তে পার্‌লেন কই! কাল এখান থেকে আপনি বিদায় নেবার পরেই তিনি বিরূপাক্ষ বাবুকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত। ভাল কথা, আহা হা, বেচারা বিরূপাক্ষ বাবুর একটা বড় য়্যাক্‌সিডেণ্ট্ হ'য়ে গেছে, জানেন নাকি?"

"য়্যাক্‌সিডেণ্ট্? না, কই কিছুইতো জানিনা আমি!"

"চল্‌তি বাস্ থেকে নাম্‌তে গিয়ে বেচারা বড়ই চোট্ পেয়েছে। সব চাইতে বেশী লেগেছে হাঁটুর ওপরে আর ডান হাতের কব্জিতে। যে সময়টুকু তিনি এখানে ছিলেন, বাইরে অস্বস্তির ভাব এতটুকু প্রকাশ পেতে দেননি বটে, কিন্তু মুখ দেখেই আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছিলাম কি দারুণ যন্ত্রণা ভেতরে ভেতরে ভদ্রলোক চেপে রেখেছেন। ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে দিয়েছে—গলার সাথে ফালি দিয়ে হাতটা ঝুলিয়ে দিয়েছে। ...যাক্ সে সব কথা বিতম্ দিয়ে বল্‌তে গেলে আজ আর ভূপেশ বাবুর বাড়ীতে যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না। চায়ের বন্দোবস্ত এখন আর বাড়ীতে করা সম্ভব হবে না, তা'হলে বড়ই দেরী হয়ে পড়্‌বে। পথে চল্‌তে চল্‌তে একটু ভদ্রগোছের দোকান থেকে ও কাজটা সেরে নেওয়া যাবে।

ভূপেশ বাবুর বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়া একটু আগাইতেই তাঁহারা দেখিলেন, কর্ত্তা স্বয়ং অধীর ভাবে সাম্‌নের বারান্দার এধার হইতে ওধার পর্য্যন্ত পাইচারি করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং ঘন ঘন হাত ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি নজর পড়িতেই তিনি সাগ্রহে কহিলেন, "এই যে এসেছেন আপনারা, আমি অনেকক্ষণ ধরে আপনাদেরই অপেক্ষায় বসে রয়েছি।" তারপর হুকা-কাশি আরও একটু নিকটে আসিলে তিনি বলিলেন, "আমার সেদিনকার অনুমানই কিন্তু সতি বলে প্রমাণ হয়েছে মিষ্টার হুকা-কাশি! যাক্কে আপনি গোড়াতে একেবারেই

হিসাবের বাইরে ফেল্‌তে চাচ্ছিলেন, এখন দেখা যাচ্ছে অততা সাধুপুরুষ সে আদবেই নয়। আপনার মনে আছে নলকোপার একটী লোকের নাম আমি উল্লেখ করে বলে ছিলাম যে সে আমার বাবাকে তার জীবনের সব চাইতে বড় শত্রু বলে ঠাউরে বসে আছে। এ পৃথিবীতে বাবার কোন স্মৃতিচিহ্নই সে রাখ্‌তে দেবে না তাই জন্যেই যখন অত খরচ-পত্র করে তাঁর ওয়াটার পেণ্টিংটা নলকোপায় পাঠালাম তখন জুতোর ঠোক্কর মেরে সেটাকে গুঁড়ো করে দিতে তার এতটুকু বাধেনি। তাঁর শেষ চিহ্ন ষ্টোভার ঘড়িটাও গভীর রাতে এসে সেই গুঁড়ো করে রেখে গেছে। ওঃ, প্রতিহিংসা মানুষকে এমনই জঘন্য আর হীন করে ফেলে!" তার পর আরোও একটু থামিয়া কহিলেন, "এই পাশের ঘরেই তাকে আট্‌কে রাখা হয়েছে।"

হুকা-কাশি নিবিষ্ট মনে সমস্ত কথাগুলি শুনিয়া গেলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কিন্তু এই লোকটাই যে ঘড়ি সরিয়েছে এ রকম মনে কর্‌বার হেতু কি?"

"প্রমাণ রয়েছে, এবং সে প্রমাণ একেবারে অকাট্য,......কাল সন্ধ্যের একটু পরে আমার দ্বারোয়ানটাকে পিওন বুক দিয়ে একটা জরুরী কাজে পাঠাতে হল। অবশ্য মিনিট্ পনেরোর মধ্যেই সে ঘুরে এল বটে, কিন্তু এই পনেরো মিনিট্‌কাল দেউড়ি একেবারে খালি ছিল। ঠিক এম্‌নি সময় আমার ভাগ্নে বিনোদ বাইরে কোথায় বার হচ্ছিল, তার যেন মনে হ'ল কম্পাউণ্ডের ভেতর অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে একটা লোক অনিমেষ চোখে আমার বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। লোকের পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়া-তাড়ি সে একটা গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। নিশ্চয় সে ভেবেছিল বিনোদের নজর অন্ধকারে অতদূর অবধি পৌঁছোবে না, সদর ফটক দিয়ে সে বেরিয়ে গেলে অনায়াসেই আবার তার আগেকার জায়গাটাতে ফিরে আস্‌তে সে পার্‌বে। বিনোদের কিন্তু মনে একটা কেমন খট্‌কা লাগায় পা টিপে টিপে সন্তর্পণে তারই দিকে সে এগিয়ে চল্ল। বেগতিক দেখে সে তখন প্যারাপেট্ ডিঙ্গিয়ে চোঁ চাঁ দৌড়! কিন্তু বাছাধন আমার ভুলে গিয়েছিলেন যে সহরটা নলকোপা নয়, কল্‌কাতা; 'চোর' বলে সজোরে একটা হাঁক্ দিলেই তখুনি ঝাঁকে ঝাঁকে লোক এসে তাকে ঘিরে ফেল্‌বে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সবাই তাকে হিড়্ হিড়্ করে টেনে এনে আমার সমুখে হাজির

করলে। মুখের পানে একবার চেয়েই টের পেলাম মূর্ত্তিমান্‌টী কে। অনেক করে তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল কেন সে চুপি চুপি আমার বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আর বিনোদকে দেখে অমন পালাতেই বা গেল কেন সে। কিন্তু কোন কথার জবাবই সে দিলে না, মুখ বুঁজে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিনোদ ছাড়্‌বার পাত্তর নয়, নানা ভাবে তাকে পরীক্ষা করে দেখ্‌তে লাগ্‌ল—ট্যাঁকে কিছু গোঁজা আছে কিনা, জামার পকেটে কিছু রয়েছে কিনা। এই জামার পকেটে হাত দিতেই কিন্তু যে জিনিষ বেরিয়ে এল তা শুন্‌লে আপনারাও স্তম্ভিত হয়ে যাবেন। এক খানা ভাঁজ করা কাগজ, তার ভেতরে লেখা আছে 'ঘড়ির নাম ষ্টোভার—···নং···ষ্ট্রীটে মেরামৎ কর্‌তে দেওয়া হ'য়েছে।' আপনার নিশ্চয়ই মনে পড়্‌ছে মিষ্টার হুকা-কাশি যে, নম্বরটা সেই দোকানের নম্বর যেখানে আমি আমার ঘড়ি সারাতে দিয়েছিলাম, আমার কাছ থেকে ক্যাশমেমো চেয়ে নিয়ে আপনি সে নম্বরটা দেখে নিয়েছেন। সমস্ত ব্যাপারটা তখন এক নিমেষে জলের মত সোজা হয়ে এল; নিশ্চয়ই এ লোকটা কোন রকমে টের পেয়ে থাক্‌বে যে বাবার ষ্টোভার ঘড়িটী আমি অমুক দোকানে সারাতে দিয়েছি। মৎলব ছিল তার দোকান থেকেই ঘড়িটা সরানো, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি, সে যাবার আগেই আমি ঘড়ি ফিরিয়ে এনেছি। কাজেই দোকানে যা সে পায়নি, গভীর রাত্রে আমার শোবার ঘরে ঢুকে দেরাজের ভেতরে অনায়াসেই তা সে পেয়েছে। এই লোকটীই যে ঘড়ি-চোর সে বিষয়ে আমার আর বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নেই।"

রণজিৎ আড়্‌চোখে একবার হুকা-কাশির দিকে তাকাইয়া দেখিয়া লইল মুখের ভাব তাঁর কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, কিন্তু সে প্রশান্ত মহাসাগরে ঢেউয়ের লীলা কেউ কখনো বুঝিতে পারে না, রণজিৎও পারিল না। স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া তিনি ভূপেশ বাবুকে তাঁহার বর্ণনা শেষ করিতে দিলেন, তার পর মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "কোথায় রেখেছেন তাকে চলুন, আমার একবার তাকে দেখা চাই!"

একটু বাদেই তাঁদের দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ভূপেশ বাবু ছোট্ট একটী কুঠুরীতে ঢুকিলেন। ঘরের এক কোণায় বেঞ্চির উপর লোকটী বসিয়া ছিল; বয়স তার পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নর কম নয়; মাথায় ঝাঁক্‌ড়া ঝাঁক্‌ড়া চুল, সমস্ত মুখখানায় দারিদ্র্যের ছাপ মাখানো, কিন্তু চোখ দুটী তার অসম্ভব রকম উজ্জ্বল। মিনিট্‌খানেক হুকা-কাশি

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। সে দৃষ্টি এমনি যে মনে হইল বুঝি তাহা তাহার অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। কিন্তু সে খুব অল্প ক্ষণের জন্য। তার পরেই হুক-কাশি তাঁর চোখ নামাইয়া আনিলেন এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া লোকটীর পাশে, সেই বেঞ্চির উপরই বসিয়া পড়িলেন।

ভূপেশ বাবুও হুকা-কাশির সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, বলিলেন, "যাই বলুন মশাই, ভদ্দরলোকের কল্পনা-শক্তির তারিফ্ কর্‌তে হবে, সময়ে চেষ্টা কর্‌লে গল্প-লিখিয়ে হিসেবে ইনি রবি ঠাকুর-শরৎ চাটুয্যেকেও ছাড়িয়ে যেতেন। উঃ, গল্প বানাবার কি শক্তি! জিজ্ঞাসা করা হোল, 'ও কাগজখানা আপনার পকেটে এল কি করে'? তা বল্লে কি জানেন? বল্লে, নলকোপার কে নাকি দিন পনেরো কুড়ি আগে একবার কল্‌কাতা এসেছিল, তখন সে তার ষ্টোভার ঘড়িটা ওই দোকানে মেরামৎ কর্‌তে দিয়ে যায়। ঘড়ি সারাতে দিয়ে সে বাড়ী চলে গিয়েছিল, ইনি কল্‌কাতা আস্‌ছেন শুনে ঘড়িটী ফিরিয়ে নিয়ে যাবার বরাত এঁকে সে দিয়েছে। তাই শুনে বিনোদ ফের জিজ্ঞাসা কর্‌লে, 'তা সে ঘড়িটা কোথায়, দেখি!' তার জবাব হোল—সে ঘড়ি আর দেখাবার উপায় নেই, কেননা ঘড়িওয়ালা বলেছে তার দোকান থেকে সেটা নাকি চুরী গেছে। রসিদও নাকি আস্‌বার সময় ভুলে ইনি নলকোপায় ফেলে এসেছেন। কেমন! চেষ্টা কর্‌লে ইনি বড় নভেলিষ্ট্ হতে পারতেন না? কি মনে হয় আপনার?"

এবার আড়্ চোখে চাহিবার পালা হুকা-কাশির, রণজিতের দিকে তিনি একটী চোরা চাহনি হানিয়া হাসিয়া কহিলেন, "না ভূপেশ বাবু, শুধু এর থেকেই এঁকে আমি বড় নভেলিষ্ট্ বলে মেনে নিতে রাজী নই, কেননা ইনি যা বলেছেন তা এঁর বানানো গল্প নয়, সেটা একটা সত্যি ঘটনা। বাস্তবিকই ওই ঘড়ি-ওলার কাছে আরও একটী ষ্টোভার ঘড়ি মেরামৎ হতে এসেছিল এবং বাস্তবিকই সে ঘড়িটী খোয়া গেছে। সে ঘড়ি দেখাবার এঁর আর কোনই ক্ষমতা নেই, তবে আপনি সেটা দেখ্‌তে চান্ তো আমি তা দেখাতে পারি, কেননা বর্ত্তমানে আমার কাছে সেটা রয়েছে। এর ওপরেও যদি আপনি আরো প্রমাণ চান, তবে জেনে রাখুন যে আপনার ঘড়ি-চোর কাল রাতদুপুরে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আমার বাড়ী চড়াও করেছিল। শুধু তাই নয়, আমাকে

আর আমার বেয়ারাকে ভাঁড়ার ঘরে দড়ি দিয়ে তারা বেঁধে রেখে এসেছিল, আজ ভোরে রণজিৎ বাবু গিয়ে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। (ক্রমশঃ)

রামধনুকের ভেলা

(শ্রীবিমলচন্দ্র দত্ত)

রোদ্ বাদলে খেলা করে আলোছায়ার খেলা
আকাশ গাঙে উঠ্‌ল ভেসে' রামধনুকের ভেলা।
কে যাবিরে আয়,
রামধনুকের ভেলায় চড়ে' আকাশ কিনারায়।
ঘরের কথা ভোল্,
মায়ার নোঙর তোল,
আয়, ছুটে আয়, ধরার বুকে জাগিয়ে কলরোল্।

আলোর পরী নাচছে মেঘের কাজল ছাওয়াতে
সুর আজি ভাই উপ্‌ছে পড়ে পাখীর গাওয়াতে।
আলোক পরীর সাজ,
ধীরে ধীরে কাটিয়ে এসে কালোমেঘের ভাঁজ
ঝল্‌মলিয়ে ওঠে;
ফুলের কচি ঠোঁটে
আল্‌গোছে ঐ চুম্ দিয়ে যায়, তাই ত' কুসুম ফোটে।

মেঘের কালো চুল্ বেয়ে ওই নাম্‌ল অঝোর ধারা
বর্ষা নটী নাচ্‌ছে বনে আকুল পাগলপারা।
সরল মেঘের থাক্,
আলোক পাখী আস্‌ছে নেমে ঐ দেখ ঝাঁক ঝাঁক।

তালপুকুরের পাড়ে,
সন্ধ্যা পাখা নাড়ে,
বর্ষা-নটী মুখ ঢেকেছে শাদা মেঘের আড়ে।

রামধনুকের ভেলায় চড়ে' চল্‌ব নিরুদ্দেশ
যে দেশে ভাই পৌঁছাবে না দুঃখ সুখের লেশ।
দিনগুলো যায় উড়ে
আকাশ পুরে বাজায় বাঁশী কোন্ সে সাপুড়ে?
আলোক বীণার তান্
নাচিয়ে তোলে প্রাণ
অনেক দূরের পাড়ির তরে মন করে আন্‌চান্।

রোদ্ বাদলে খেলা করে লুকোচুরী খেলা
আকাশ জুড়ে বসেছে আজ রঙিন্ মেঘের মেলা।
শাঙন্ দুপুরে
ক্ষণে ক্ষণে গান বাজে তাই বর্ষা-নূপুরে।
আজকে বিকেলবেলা
আয় থুয়ে সব খেলা
আকাশ গাঙে দুল্‌ছে দোদুল্ রামধনুকের ভেলা।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

অবাক্

(শ্রীঅনিলকুমার সরকার)

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙেছে খোকার,
বাইরে তাকায়, বুঁজ্‌বে না' ক চোখ আর।
ঘুম ভেঙেছে খোকার।

পার্শ্বেতে তার ঘুমান মাতা ঘোরে,
জাগ্‌ল খোকা মাতার অগোচরে।
ঘুমান মাতা ঘোরে।

নীল আকাশের সবুজ চাঁদের আলো,
ছিটায় সুধা হায় রে কি জম্‌কালো!
সবুজ চাঁদের আলো।

স্তব্ধ জগৎ সকল ভোলা মায়ায়,
আলোর খেলা হাস্নাহানার ছায়ায়।
সকল ভোলা মায়ায়।

দেখ্‌ছে খোকা আকাশে এক ভেলা
ভাসছে তথায় কেমন রাত্রিবেলা।
আকাশে এক ভেলা।

চাইছে খোকা লাখ্ তারকার পানে,
কইছে তারা কি যেন তার কাণে।
লাখ্ তারকার পানে।

খোকা যেন সত্যি, চাঁদের দেশে,
কেমন করে পৌঁছিয়াছে এসে।
সত্যি, চাঁদের দেশে।

অবাক খোকা চাঁদের দেশে গিয়ে,
গভীর ঘুম, কে গেল তার নিয়ে?

সান্ত্বনা *

(শ্রীশ্রীগোপাল মিত্র, বারদ্রোণ, ২৪ পরগণা)

(১)

একই মায়ের স্তনে লালিত তাহারা,
তাহাদের হাস্যে গৃহ ছিল ভরপুর;
আজিকে তাদের হায়, দেহ প্রাণহারা,
পড়িয়া রয়েছে কোথা—কত দূর দূর।

(২)

একই মায়ের গাঢ় স্নেহভরা চুম
নিদ্রিত যাদের মুখ করিত রঙ্গীন,

* Mrs Hemans এর The graves of a household এর অনুসরণে।

—মুদ্রিত কুসুম প্রায় নিদ্রায় নিঝুম—
স্বপ্নদূত কোথা তারা কাটাইছে দিন ?

(৩)

পাহাড়ি দেশেতে—যেথা অসভ্যের বাস,
নদীতীরে ছায়া-ঘন অশথের তলে
একটী রয়েছে পড়ে ; শীতল বাতাস
প্রাণহীন দেহ 'পরে কাঁদি যায় চলে ।

(৪)

সকলের প্রিয় যেটি, আজ সেই হায়,
সুনীল সাগরতলে মুক্তাদল সাথ
লয়েছে সমাধি তার ; পশে না সেথায়
প্রিয়জন সকলের নিত্য অশ্রুপাত ।

(৫)

সুদূর কাবুলে রক্ত-রাঙা রণক্ষেতে
জাতির পতাকা নিয়ে আপনার বুকে
একটি শায়িত আছে ; তারে সুযশেতে
জীবিত রেখেছে আজো সকলের মুখে ।

(৬)

শিশুদলে ছোট যেটি ছিল সবাকার
ফুলের মতন হায়, গিয়াছে সে ঝরে
দূর মধুপুরে ;—মধুমাখা স্মৃতি তার
আজিও সবার মনে ব্যথা দেয় ভ'রে ।

(৭)

একই গাছের তলে খেলিত যাহারা,
একগৃহ যাহাদের সঙ্গীতে মুখর,
একই মায়ের পাশে বর্দ্ধিত, তাহারা
বিচ্ছিন্ন কোথায় আজ মরণের পর ?

(৮)

পরলোক কিছু যদি না থাকিত হায়,
পৃথিবীর সাথে যদি শেষ সব হয়,
সান্ত্বনা ধরায়ে তবে মিলিত কোথায় ?
ভালবাসা চিরতরে পেয়ে যেত লয় !

মানহানির মামলা

[সত্য নহে]

(কুমারী পুষ্পলতা গোস্বামী, বেতিয়া)

বেতিয়ার হাসপাতালের খুব নাম। চিকিৎসা নাকি এখানে খুব ভাল হয়। নানা দেশ বিদেশ থেকে এখানে চিকিৎসা করাতে লোক আসে।

হাসপাতালটী মন্দ নয়। এর নির্ম্মাণ-ক্রিয়া অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। সাম্‌নে একটী মস্ত বড় রমনা আছে। সেজন্য রোগীদের মুক্ত বায়ুর অভাব হয় না। কঠিন কঠিন রোগের চিকিৎসার জন্য নানারকম যন্ত্রপাতিও আছে। হাসপাতালের ব্যবস্থাও ভাল। রোগীরা নাকি খুব আরামে এখানে থাক্‌তে পায়।

হাসপাতালের মাহাত্ম্য শুনে আমি একবার এখানে চিকিৎসা করাতে এসে একটী মজার ঘটনা দেখে গিয়েছিলুম ; সেইটী আজ তোমাদেরকে শোনাব।

এখানকার লোকে য্যাসিস্‌টান্ট সার্জ্জনকে সংক্ষেপে বড় ডাক্তার বাবু বলে থাকে। আমিও তাই বলব।

এখানে আসার পর প্রথম দিন আমি বড় ডাক্তার বাবুর নিকট চিকিৎসা করাতে গেলুম। ডাক্তার বাবুর টেবিলটীর চারপাশ লোকে ঘিরে ফেলেছে। ভাগ্যিস্ ডাক্তার বাবুর মাথার উপর ফ্যান ঘুর্‌ছিল, তা না হলে তাঁকে টেবিল ছেড়ে পালাতে হ'ত। হাসপাতালের চাপরাশী মাঝে মাঝে ঠেলে ঠেলে ভীড় সরাচ্ছিল। তবু কি কেউ মানে ? সকলেই আগে আগে করে পাগল। আমি ত ব্যাপার দেখে টেবিলের এক পাশে বসে পড়লুম ! এমন সময় একটি লোক তাড়াতাড়ি এসে বল্লে, 'ডাক্তার বাবু,

আমার কানটাতে বড় ব্যথা হয়েছে।' ডাক্তারবাবু একটু মুখ খিঁচিয়ে বল্লেন, 'বস, বস, যারা তোমার আগে এসেছে তাদের আগে শেষ করি।' লোকটী আর কিছু বল্‌তে সাহস না পেয়ে মুখখানা মলিন করে আমার পাশেই বসে পড়্‌ল। ভীড় কম্‌লে ডাক্তারবাবু বল্লেন, 'দেখি, দেখি, তোমার কানের কোন্ খানটায় ব্যথা হয়েছে ?' লোকটী ডাক্তার বাবুর কানটা ধরে, 'ঠিক এই জায়গায়,' বলে একটু কান-মলা গোচের করে দিলে। ডাক্তার বাবুর আত্ম-মর্য্যাদার জ্ঞান খুব আছে। এ হেন হাসপাতালের ডাক্তারের কানে হাত ! তিনি তৎক্ষণাৎ চাপরাশী দিয়ে লোকটীকে হাসপাতাল হতে বার করে দিলেন। ডাক্তার বাবু কি তাতেই ক্ষান্ত হলেন ? তার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করে বিচারালয়ে তার নামে এক মানহানির মামলা রুজু করে দিলেন। আমার রোগ আর সেদিনকে ডাক্তার বাবুকে দেখান হল না।

মোকদ্দমার দিন স্থির হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত কি হয় জানবার জন্য আমিও সে দিন কাছারিতে গেছলুম। এত বড় লোকের কান ধরেছে! ভেবেছিলুম লোকটার নিশ্চয়ই কোন শাস্তি হবেই। কিন্তু হ'য়ে গেল আর এক রকম। বিচারকরে সামনে ডাক্তার বাবু এবং লোকটী—দু'জনেই হাজির। বিচারক লোকটীকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি ডাক্তার বাবুর কান মলেছিলে ?'

সেই লোকটী উত্তর দিল, 'আজ্ঞে না, আমি তাঁর কানে হাত দিয়েছিলুম মাত্র।'

বিচারক প্রশ্ন করলে, 'কেন হাত দিয়েছিলে ?'

লোকটী, বল্লে 'তবে শুনুন কেন হাত দিয়েছিলুম ; আমার কানে বড্ড ব্যথা হয়, তা আমি ডাক্তার বাবুকে দেখাতে যাই। ডাক্তার বাবু আমাকে বল্লেন, 'দেখি তোমার কানের কোন্ খানটায় ব্যথা হয়েছে ?' আমি ডাক্তার বাবুর কানেতে সেই জায়গাটী নির্দ্দেশ করে দিলুম। কারণ, আমার কানে এমন অসম্ভব ব্যথা হয়েছিল যে যদি আমার কানে কেউ হাত দিত, তা হলে আমি বোধ হয় তৎক্ষণাৎ মারা যেতুম।"

হাকিমের রায় বার হ'ল আসামীকে এবারকার মত মাপ করা গেল।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(**পূর্ব্বকথা**—ইংল্যাণ্ডের হেলষ্টন্‌লি সহরে মিষ্টার চ্যানিং নামে এক ভদ্রলোক বাস করিতেন। তাঁর চার ছেলে—হামিশ, আর্থার, টম্ ও চার্লি। দুই মেয়ে, বড় কন্‌স্‌ট্যান্স, ছোট এনাবেল। মিষ্টার চ্যানিং নিজে বাতের অসুখে একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁর জায়গায় আপিসে তাই তাঁর হইয়া হামিশ কাজ-কর্ম্ম করিত। আর্থার ছিল গ্যাল্‌ওয়ে নামে এক এটর্ণীর আপিসে কেরাণী। টম্ ও চার্লি ছোট, স্কুলের ছাত্র।

একটা বড় মকদ্দমায় হার হওয়ায় চ্যানিং-পরিবারের দারুণ অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। হামিশ একটু 'বাবু' মানুষ—লুকাইয়া লুকাইয়া ইতিমধ্যে সে কিছু ধার করিয়াছিল—তার নামে পাওনাদারেরা আদালতে নালিশ করিল, অবশ্য আর্থার ও কন্‌স্‌ট্যান্স ভিন্ন সে খবর আর কেউ জানিত না। কন্‌স্‌ট্যান্সকে বাধ্য হইয়া লেডি আগাষ্টা নামে এক মহিলার বাড়ীতে গভর্ণেসের চাক্‌রী লইতে হইয়াছিল। এই মহিলাটির এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্কের সহিত কন্‌স্‌ট্যান্সের বিবাহের কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া ছিল। লেডি আগাষ্টার বড় ছেলে রোল্যাণ্ড ইয়র্ক আর্থারের বন্ধু, একই আপিসে আর্থার, সে, ও জেঙ্কিন্স নামে আর একটী লোক কাজ করিত। রোল্যাণ্ডের ছোট দুই ভাই—জেরাল্ড ও টড্ টম্-চার্লিদের স্কুলেরই ছাত্র। সে স্কুলে কিছু দিন হইল একটী গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে—কে বা কাহারা একটী ছেলের গীর্জ্জায় যাইবার পবিত্র 'সারপ্লিসে' লুকাইয়া কালী ঢালিয়া সেটী নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। হেড-মাষ্টার কাউকে এখন পর্য্যন্ত ধরিতে পারেন নাই।

এদিকে হঠাৎ এক দিন একটা ঘটনা ঘটিয়া চ্যানিং-পরিবারের মনের শান্তি একেবারে নষ্ট করিয়া দিল। আর্থার, গ্যাল্‌ওয়ে নামে যে এটর্ণীর আপিসে চাক্‌রী করিত এক দিন সেই আপিসের একখানা চিঠির মধ্য হইতে একটী কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ চুরী গেল। বন্ধ চিঠি খানার কাছে আর্থার ব্যতীত আর কেউ ছিল না, তবে কতক্ষণের জন্য হামিশকে আপিস-পাহারায় রাখিয়া আর্থার একবার বাহিরে গিয়াছিল বটে। ঠিক এই ঘটনার দু'দিন পরেই আর্থার জানিতে পারিল হামিশ নাকি তার দেনা শোধ করিয়া দিয়াছে।

ক্রমে চুরীর খবর প্রকাশ পাইতেই সকলের সন্দেহ আর্থারের উপর গিয়া পড়িল। আর্থারের নিজের কিন্তু মনে হইল এ নিশ্চয়ই হামিশের কাজ, নতুবা সে হঠাৎ এত টাকা পাইয়া দেনা শোধ করিল কিরূপে ? এ কথা কিন্তু সে কন্‌স্‌ট্যান্স ভিন্ন অপর কাহাকেও বলিল না।

এটর্ণী গ্যাল্‌ওয়ে আর্থারকে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস হইল আর্থার প্রকৃতই অপরাধী—নচেৎ সে জোর করিয়া নিজেকে নিরপরাধ বলিতে পারিতেছে না কেন ? আর্থার কিন্তু নিজের নির্দ্দোষিতা জোর গলায় জাহির করিল না অন্য কারণে—পাছে তাহা হইলে লোকের সন্দেহ হামিশের উপর পড়ে !

এর পর হইতে লোকের কাছে আর্থারের লাঞ্ছনার আর সীমা রহিল না। তার এটর্ণী আপিসের চাক্‌রী গেল, লোকে তাহাকে দেখিয়া মুখ বাঁকাইত, মিষ্টার চ্যানিং পর্য্যন্ত ঘৃণা করিতেন। শুধু তার উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল কন্‌স্‌ট্যান্স, টম্ এবং বন্ধু রোল্যাণ্ড ইয়র্কের। এ ছাড়া আরও একটী লোক ছিলেন, তিনি মিষ্টার হার্ণ্টলি। মিষ্টার হার্ণ্টলির ইচ্ছা

ছিল৹তাঁর মেয়ের সহিত হামিশের বিবাহ দেন। আর্থারের সহিত কথাবার্ত্তায় একদিন তাঁর মনে হইল, প্রকৃত অপরাধী
আর্থার নয়। তিনি সেই হইতে গোপনে গোপনে খোঁজ লইতে লাগিলেন এবং শেষে তাঁহার ধারণা হইল দোষী হামিশ
—আর্থার নয়। নিজের মেয়েকে হামিশের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে তিনি আদেশ দিলেন।

এদিকে এই ঘটনার পর রেভারেণ্ড মিষ্টার ইয়র্কও কন্‌স্ট্যান্সকে বিবাহ করিতে কেমন একটু ইতস্ততঃ করিতে
লাগিলেন—কন্‌স্ট্যান্স বুঝিতে পারিয়া দারুণ অভিমানে তাঁহার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিল।

হেলষ্টনলি স্কুলে নতুন 'সিনিয়র' নিযুক্ত হইবার সময় আসিয়াছিল। এ পদে সব চাইতে অধিকার বেশী টম্
চ্যানিংয়ের। কিন্তু কতকগুলি ছেলে প্রবল আন্দোলন চালাইতে লাগিল—চোরের ভাইকে তাহারা কিছুতেই 'সিনিয়র'
বলিয়া মানিয়া লইবে না। আশ্চর্য্য, এ ব্যাপারের পাণ্ডা ছিল কিন্তু রোল্যাণ্ড ইয়র্কেরই ভাই দুটী—অথচ রোল্যাণ্ডের কাছে
এ কথা বলিলে তাহারা মার খাইত সন্দেহ নাই। —এই বার পড়—)

দুটী সভা

সহরের গীর্জ্জা এবং কলেজিয়েট্ স্কুলটীকে খুব ঘটা করিয়া সাজান হইয়াছে,
কারণ, আজ তাদের উৎসবের দিন। একটু বেলা হইতেই তাই ছাত্রের দল একে
একে আসিয়া জুটিতে লাগিল। অনুপস্থিত আজ আর কেহই নাই, কেননা এদিনে
কেবল যে স্কুলের নূতন 'সিনিয়র'ই নিযুক্ত হয় তা নয়, গীর্জ্জার অভিভাবকদের নিকট
সমস্ত ছাত্রের মুখে মুখে একটী পরীক্ষা দিবারও নিয়ম আছে। হ্যারি হাণ্ট্‌লি,
জেরাল্ড্ ইয়র্ক্ এবং টম্ চ্যানিংয়ের উপর নানা রকম তত্ত্ব-তালাসের ভার পড়িয়াছে।
বিশেষ করিয়া টম্ চ্যানিংয়ের উপর, কেননা গত কল্য হইতে গণ্ট্ বিদায় নেওয়ায়
স্কুলের অস্থায়ী সিনিয়র এখন সে-ই। আজ ভোর হইতেই টমের বুক রীতিমত দুরু দুরু
করিতে সুরু করিয়াছে—যেন তার জীবনের আজ প্রকাণ্ড একটা পরীক্ষা। আজ যদি
তাকে তার এই ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া,—তাহাকে ডিঙ্গাইয়া—অপর
কাহাকেও 'সিনিয়র' করা হয়, তবে সেই অপমান এবং গ্লানির দুঃখ সে রাখিবে
কোথায়? আর এ তো শুধু অপমান এবং গ্লানির কথাই নয়, সিনিয়র হইতে না
পারিলে যে তাহার সমস্ত ভবিষ্যৎই অন্ধকার! টাকা দিয়া কলেজে পড়া চালান কি
তাদের সাধ্য? (কাজেই হ্যারি হাণ্ট্‌লি যখন প্রথমেই স্কুলে ঢুকিয়া তাহাকে শুভেচ্ছা
জানাইয়া 'সিনিয়র' বলিয়া সম্বোধন করিল তখন বেচারার 'ধন্যবাদ' কথাটীও ভাল
করিয়া উচ্চারণ করিতে সাহস হইল না, পাছে অতিরিক্ত আশা শেষটায় দারুণ
নিরাশায় গিয়া ঠেকে!)

ক্রমে বেলা আরও একটু বাড়িলে পর স্কুলের সমস্ত ছেলে সারবন্দী হইয়া টমের

অধীনে 'মার্চ্চ' করিতে করিতে স্কুল ছাড়িয়া গীর্জ্জার দিকে রওয়ানা হইল। গোড়াতে
উপাসনা হইবে, পরীক্ষা হইবে তারপর।

উপাসনা এবং পরীক্ষা ক্রমে ক্রমে আরম্ভ হইয়া সুষ্ঠুভাবে শেষ হইয়া গেল।
পরীক্ষার ফল দেখিয়া কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, বুঝিলেন, ছেলেরা দুষ্টামী এবং
লেখাপড়া দুটী বিদ্যারই সমানভাবে চর্চ্চা করিয়া আসিয়াছে, এঁচোড়ে পাকা সাধারণ
ছেলেদের মত আসল বেলায় তাহারা ফাঁপা নয়। টম্ চ্যানিং সম্বন্ধে তাঁহারা মত
দিলেন, লেখাপড়ায় সারা স্কুলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে তো বটেই, তা ছাড়া ওবয়সে অত
খানি জিনিষ জানিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁরা খুব কম ইংরাজ ছেলেকেই দেখিয়াছেন।

এইবার 'সিনিয়র' ঘোষণা করা হইবে, এবং সে ঘোষণা করিবেন হেড্ মাষ্টার
মশাই। দাঁড়াইয়া সামান্য একটু গলা ঝাড়িয়া তিনি আরম্ভ করিলেন, "প্রিয় ছাত্র-
বৃন্দ, আজ তোমরা পরীক্ষায় যে ভাল ফল দেখাতে পেরেছ তাতে করে তোমাদের
ওপর আমি যে কতখানি খুসী হয়েছি তা আর কি বল্‌ব? আশা করি বড় হয়ে তোমরা
তোমাদের জীবনের প্রত্যেকটী কাজে ঠিক এম্‌নি কর্ত্তব্য-নিষ্ঠার পরিচয় দেবে।
আজকের দিনে আমাদের আর মাত্র একটী কাজ বাকী আছে—সেটী হচ্ছে গণ্টের
জায়গায় তোমাদের নতুন সিনিয়র কে হবে তারই ঘোষণা করা। বড়ই দুঃখের সঙ্গে
আমাকে জানাতে হচ্ছে যে যে ছাত্রটীর নাম খাতায় সববার ওপরে, কোন একটা
বিশেষ কারণে তাকে সিনিয়র করা চল্‌বে না। এ কথাটা তোমাদের জানাতে দুঃখ
আমার আরও বেড়ে যাচ্ছে এই জন্যে যে, যে কারণে তাকে বাদ দিতে হোল সেটা
তার নিজের কোন অপরাধ নয়। তারপরেই খাতায় নাম হচ্ছে হ্যারি হাণ্ট্‌লির।
হ্যারি হাণ্ট্‌লি, এদিকে এগিয়ে এস, আজ হ'তে তোমায় হেল্‌ষ্টনলি স্কুলের সিনিয়র
করা হ'ল।"

সমস্ত সভাস্থল মুহূর্ত্তে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। টম্ চ্যানিংয়ের মুখ দেখিয়া মনে
হইল সে বুঝি মৃত্যু-দণ্ড পাইয়াছে।

আবেগ-ভরা বুকে হ্যারি আগাইয়া হেড মাষ্টার মশা'য়ের নিকট আসিয়া কহিল,
"স্যর, আমায় আজ যে সম্মান দিলেন সেজন্য অশেষ ধন্যবাদ।...কিন্তু স্যর, ন্যায়তঃ এ
পদ যে টমের! তাকে কি কোন মতেই সিনিয়র করা চলে না?"

দৃঢ়স্বরে হেড্ মাষ্টার মশাই জবাব দিলেন, "না।"

এর পর সভা ভঙ্গ হইল এবং স্কুলের চত্বরে সকলে আসিয়া পৌঁছিতেই হ্যারিকে অভিনন্দন দিবার যেন ধূম পড়িয়া গেল। যাহারা টমের বিরুদ্ধে এতদিন জটলা পাকাইতেছিল তাদের যেন হাতে হাতে স্বর্গলাভ হইল, আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া তাহারা কহিতে লাগিল, "যাক্, বাঁচা গেল, চোট্টার ভাইয়ের আর তাঁবেদারী কর্‌তে হবে না।" জেরাল্ড্ ইয়র্ক্ নিজে সিনিয়র হইতে না পারায় কারো সঙ্গে আর কথাবার্ত্তা বড় কহিল না, গোম্‌রা মুখ লইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল।

সকলে তখনও মাঠের উপর দাঁড়াইয়া, হঠাৎ দেখা গেল একটী ভদ্রলোক দ্রুত-পদে সেদিকে আসিতেছেন। কাছে আসিতেই তাঁহাকে চেনা গেল—মিষ্টার হাণ্ট্‌লি। পৌঁছিয়াই টুপিটী হাতে লইয়া তিনি কহিলেন "তারপর? তোমাদের 'সিনিয়র' ঠিক হয়ে গেল? কে হল?"

বালকের দল একেবারে আহ্লাদে গলিয়া গিয়া কহিল, "হেঁ হেঁ, হ্যারি, হ্যারি!"

"যারপরনাই দুঃখিত হলাম শুনে" বলিয়া মিষ্টার হাণ্ট্‌লি মুখ তুলিয়া ভীড়ের মধ্যে কাহাকে যেন খুঁজিতে লাগিলেন। এক কোণে টমের উপর তাঁর নজর পড়িল, সকলের কাছ হইতে একটু সরিয়া গিয়া একদিকে শূন্যমনে সে দাঁড়াইয়া আছে। তার কাছে গিয়া আস্তে কাঁধের উপর হাতখানা রাখিতেই টম্ চমকিয়া মুখ ফিরাইল। মিষ্টার হাণ্ট্‌লি কহিলেন, "একেবারে ভেঙ্গে প'ড় না টম, ভগবানে বিশ্বাস রাখ। তোমার বাবার কথা স্মরণ কর, প্রার্থনা কর যেন সর্ব্বাংশে তাঁর উপযুক্ত ছেলে হতে পার।" তার পর এদিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হেড্‌মাষ্টার মশাই গেলেন কোথা, এই না তাঁকে এখানেই দেখ্‌ছিলাম?"

মিষ্টার পাই নিকটেই ছিলেন, তাঁর নামের উল্লেখ হইতেই তিনি আরও একটু আগাইয়া আসিলেন। মিষ্টার হাণ্ট্‌লি সকলকে শুনাইয়া কহিলেন, "দেখুন মিষ্টার পাই, আপনাদের স্কুলের নিয়ম হচ্ছে যে, যে সিনিয়র হয় তাকেই আপনারা স্কলারশিপ্ দিয়ে কলেজে পড়াতে পাঠান। এইমাত্র ছেলেদের মুখে শুন্‌লাম যে আমার ছেলেকে আজ নতুন সিনিয়র করা হয়েছে। তার তরফ্ থেকে আমি আপনাকে জানিয়ে রাখ্‌ছি যে স্কুলের এ স্কলারশিপ্ সে নেবে না। তার বদলে সেই টাকা দিয়ে আপনার

স্কুলের সব চাইতে যে ভাল ছেলে তাকে আপনারা কলেজে পাঠাবেন" বলিয়া আড়্‌চোখে তিনি একবার টমের দিকে চাহিলেন।

হেড্‌মাষ্টার মশাই জবাব দিলেন, "ধন্যবাদ, আপনার ইচ্ছেমতই ব্যবস্থা হবে।"

সভায় যাহারা যাহারা আসিয়াছিল ক্রমে সকলেই বাড়ী ফিরিয়া গেল, এবার নদীর ধারে এক কোণে আর একটী ছোট্ট সভা বসিল। এ সভার সভ্য খুব বেশী নয়, কেবল জন পাঁচ-সাত ছাত্র এবং সভাপতি স্বয়ং দলের চাঁই—ষ্টিফেন্ বাইওয়াটার। সভার আলোচ্য বিষয়টীও খুব গুরুতর—চার্লি চ্যানিংয়ের বড় 'বাড়' হইয়াছে, তাহাকে একটু 'চাঙ্গা' করিয়া দিতে হইবে। একটা কথা এখানে একটু বলিয়া রাখা দরকার; এরই মধ্যে এক দিন বাইওয়াটার চার্লিকে এক্‌লা পাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সারপ্লিসে কালী-ঢালা ব্যাপারের সে কিছু জানে কি না। চার্লি কিছুই বলিতে রাজী হয় নাই। সেই হইতেই বাইওয়াটারের রাগ, এবং সেই জন্যই সে এই গুপ্ত সভা আহ্বান করিয়াছে। স্কুলে যে যে ছেলের চার্লির উপর রাগ ছিল, ঝাল ঝাড়িতে তাহারা সকলেই আসিয়া জুটিয়াছে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্থির হইয়া গেল যে 'চাঙ্গা' যে করা দরকার সে সম্বন্ধে আর সন্দেহই নাই শুধু প্রশ্ন এই 'চাঙ্গা' করা কাজটা কি ভাবে হইবে! পিয়ার্স্ ছোঁড়া চির-কালই বদ্-রসিক, সে কহিল "কি ভাবে আবার? ধরে তূলোধুনো করে দেব, আবার কি?"

কিন্তু মার দেওয়ার প্রস্তাবে অনেকেই রাজী হইল না, বিশেষতঃ সভাপতি মহাশয় নিজে। সে কহিল, "না না, ওর তো ওই মেয়েলি চেহারা, মার দিলে মরেই যাবে।"

ভোটে হারিয়া গিয়া পিয়ার্স্ মুখ খানা বিট্‌কেল করিয়া বসিল। টড্ ইয়র্ক্ চিরকালই চ্যানিংদের হিতকারী 'বন্ধু,' সে কহিল "তবে ফেল ওকে এক রাত কেচ্ বুড়োর মত গীর্জ্জার হাতায় বন্ধ করে; যে মারাত্মক ভূতের ভয় ওর, ঠিক্ ঢিট্ হয়ে যাবে।"

বাইওয়াটার জিজ্ঞাসা করিল "বড্ড বেশী ভূতের ভয় নাকি ওর?"

"উঃ, দারুণ!"

"তা হলে ঠিক হয়েছে, ভূতের ভয়ই ওকে দেখাতে হবে। তবে কেচের মত

বন্ধ করে নয়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়্‌ব ? অন্য কোথাও পাক্‌ড়াতে হবে। পিয়ার্সের চেহারাটা হাড়্‌গিলে পাখীর মত আছে, ওকেই ভূত মানাবে ভাল···চুপ্‌ চুপ্‌ কে আস্‌ছে এদিকে ?” বলিয়া বাইওস্কাটার থামিল।

গলা উঁচাইয়া ছেলেরা দেখিল কেচ্‌ আসিতেছে। সকলে অমনি গাছ-গাছ্‌ড়ার আড়ালে যে যেখানে পারিল লুকাইয়া পড়িল। তারপর কেচ্‌ কাছে আসিতেই সকলে একেবারে এক সঙ্গে লাফাইয়া বাহিরে আসিয়া চেঁচাইয়া উঠিল,—“হু—প্‌ !”

বুড়ো ভয়ে প্রায় পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু তারপরেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া এম্‌নি গাল আরম্ভ করিল যে গোটা অভিধানখানাতেও অত কথা আছে কিনা সন্দেহ।

(ক্রমশঃ)

পণ্ডিত মতিলাল

মাত্র কয়েক দিন হইল ভারতের কত বড় একজন লোক যে চলিয়া গিয়াছেন তা আর কি বলিব ? পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাম জাননা, এমন তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ নাই। এত বড় ত্যাগী, এত বড় মহাপ্রাণ, এত বড় দেশ-প্রেমিক খুব কমই দেখা যায়। রাজার মত ঐশ্বর্য্য পায়ে ঠেলিয়া তিনি দীন-দরিদ্রের মত পথে নামিয়াছিলেন, নানা রকম দুঃখ কষ্ট হাসি-মুখে সহ্য করিয়াছিলেন। কি জন্য জান ? নিজের জন্য এতটুকুও নয়, কিসে তোমরা পাঁচ জন সুখে-শান্তিতে থাকিতে পারিবে শুধু সেই জন্য। তাই আজ তাঁহাকে হারাইয়া সমস্ত দেশ শোকে হায় হায় করিতেছে।

এই পুণ্যশ্লোক মহাত্মার ছবি বুকে ধরিয়া ‘রামধনু’ তাঁর স্মৃতির পূজা করিয়া ধন্য হইল।

কাগজের বাড়ী

নরওয়ের এক কাগজওয়ালা তার দোকান ঘরটিকে ভারী অদ্ভুত ভাবে গড়িয়াছে। কাগজের দোকান, সেখানে কাগজ ছাড়া আর কিছুই নাই—সমস্ত দোকানটাই কাগজ দিয়া তৈরী। ঘরের

শক্ত শক্ত অংশগুলি পুরু পেষ্ট্‌বোর্ডের আর জানলা দরজার পর্দাগুলি ফিন্‌ফিনে কাগজের তৈরী। ছাদ এমন কায়দায় গড়া যে রোদ বৃষ্টিতে তা সহজে নষ্ট হইবার নয়।

গাছের আঠার কাচ

আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক এক রকম গাছের সন্ধান পাইয়াছেন। এই গাছের আঠা জমিলে ঠিক কাচের মত দেখিতে হয়। বৈজ্ঞানিকটি আশা করেন—এই গাছ যদি কিছু বেশী পরিমাণে যোগাড় করা যায় তবে হয় ত ইহাকে কাচের বদলে চালান’ যাইবে।

অদ্ভুত খাওয়ার পাল্লা

বিলাতে এক বড় সহরে এই অদ্ভুত খাওয়ার পরীক্ষা হইয়াছিল। পাল্লা ছিল কে কত গরম জিনিষ খাইতে পারে ? যিনি প্রথম হইয়াছেন তিনি প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়াছেন। ইনি এত গরম খাবার খাইয়াছিলেন যে খাওয়ার পর তাঁর জিভের ফোস্কা সারিতে সময় লাগিয়াছিল পূরা বারো দিন।

লাল রংএর বৃষ্টি

দিন কয়েক আগে ফ্রান্সের প্যারিস্‌ সহরে এক অদ্ভুত রকম বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। তখনও ভাল মত ভোর হয় নাই, ঝাড়ুদারেরা সবে রাস্তা পরিষ্কার করিতে বাহির হইয়াছে—হঠাৎ টিপ্‌ টিপ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইল, জলের ফোঁটাগুলি একেবারে লালচে। দেখিতে দেখিতে বাড়ীর ছাদে,জানালায়, রাস্তার গাছপালার উপর সে লাল রং জমিয়া গেল। লোকে ত অবাক্‌।

পণ্ডিতেরা বলিতেছেন এ রং আসিয়াছে আফ্রিকার সাহারা মরুভূমি হইতে। সেখানকার লালচে বালি বাতাসে ভাসিয়া মেঘের উপর গিয়া জমিয়াছিল– তাহাই মেঘের সাথে শত শত মাইল ভাসিয়া প্যারিসে আসিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড ঘটাইয়াছে।

ইন্দুরের চাষ

ইংল্যাণ্ডের নানা অঞ্চলে আজকাল মাস্ক র‍্যাট্‌ নামে এক রকম বড় জাতীয় ইন্দুরের কারবার খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই ইন্দুরের লোমে তৈরী জামা নাকি আজকাল খুব একটা বড় রকম ফ্যাশানের জিনিষ।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) হুঁকা (২) কপি

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অলকা সেন (সেন হাটী) শিশিরকুমার রায় (বসির হাট), রেণুকা সিংহ (জামুই), কালীদাসী দাসী (কৃষ্ণনগর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (ইটালী, কলিকাতা) দেবকী, তরেন, সুধীন, অজিত, রাম (তমলুক), হিমাংশুকুমার মল্লিক (পাটনা), অজয়, নীলাদ্রি, শশাঙ্ক, রবি, জ্যোতি, অবনী, ছবি ও বেবি (মজঃফরপুর), পুষ্পলতা, দেবী (বেতিয়া)।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন—

গৌরীরাণী ঘোষ (ভোলা), যাদব, বিমল, সাবিত্রী, জয়ন্তী, জাহ্নবী, বিজয়া (কলিকাতা), নির্ম্মলেন্দু, অমি, সমি, হাব্‌লি, বাব্‌লি, মন্টু, খোকন্ ও ভেলুৎ (ভবানীপুর), বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী (ঝালকাঠি), রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় (অম্বল), ভুবনানন্দ চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক (হাজারিবাগ), হেমনলিনী দেবী (সিমলা), মনীষা সেন (গৌহাটী), নলীনকুমার সেন, বিমলচন্দ্র মিত্র (শিলং), সুব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, ভূপতি, নরেশ ও সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), অরুণ, প্রফুল্ল, অমিয়া রায়, উষাময়ী, নিশাময়ী, সন্ধ্যাময়ী, পরিতোষ, সন্তোষ ঘোষাল (গাজিপুর), প্রতিমা সেন (হাজারি বাগ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), অনিলচন্দ্র সরকার (লক্ষ্ণৌ), মায়া মুখোপাধ্যায় (ফয়জাবাদ), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

(১)

গেলাসের পিছনেতে গরু যদি আসে,
আজব সহর এক সমুখেতে ভাসে।

শ্রীগৌরীরাণী ঘোষ

(২)

বল দেখি এক খানি গণিতের ফাঁকি ?
ক-ত থেকে কত গেলে কত থাকে বাকী ?

শ্রীহেমনলিনী দেবী

রামধনু—

মহাত্মা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) হুঁকা (২) কপি

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অলকা সেন (সেন হাটী) শিশিরকুমার রায় (বসির হাট), রেণুকা সিংহ (জামুই), কালীদাসী দাসী (কৃষ্ণনগর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (ইটালী, কলিকাতা) দেবকী, তরেন, সুধীন, অজিত, রাম (তমলুক), হিমাংশুকুমার মল্লিক (পাটনা), অজয়, নীলাদ্রি, শশাঙ্ক, ররি, জ্যোতি, অবনী, ছবি ও বেবি (মজঃফরপুর), পুষ্পলতা, দেবী (বেতিয়া)।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন—

গৌরীরাণী ঘোষ (ভোলা), যাদব, বিমল, সাবিত্রী, জয়ন্তী, জাহ্নবী, বিজয়া (কলিকাতা), নির্ম্মলেন্দু, অমি, সমি, হাবলি, বাবলি, মণ্ডু, খোকন্ ও ভেলুৎ (ভবানীপুর), বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী (ঝালকাঠি), রেবতীনাথ চট্টোপাধ্যায় (অম্বল), ভুবনানন্দ চক্রবর্ত্তী, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক (হাজারিবাগ), হেমনলিনী দেবী (সিমলা), মনীষা সেন (গৌহাটী), নলীনকুমার সেন, বিমলচন্দ্র মিত্র (শিলং), সুব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, ভূপতি, নরেশ ও সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), অরুণ, প্রফুল্ল, অমিয়া রায়, ঊষাময়ী, নিশাময়ী, সন্ধ্যাময়ী, পরিতোষ, সন্তোষ ঘোষাল (গাজিপুর), প্রতিমা সেন (হাজারি বাগ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), অনিলচন্দ্র সরকার (লক্ষ্ণৌ), মায়া মুখোপাধ্যায় (ফয়জাবাদ), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

(১)

গেলাসের পিছনেতে গরু যদি আসে,
আজব সহর এক সুমুখেতে ভাসে।

শ্রীগৌরীরাণী ঘোষ

(২)

বল দেখি এক খানি গণিতের ফাঁকি ?
ক-ত থেকে কত গেলে কত থাকে বাকী ?

শ্রীহেমনলিনী দেবী

রামধনু—

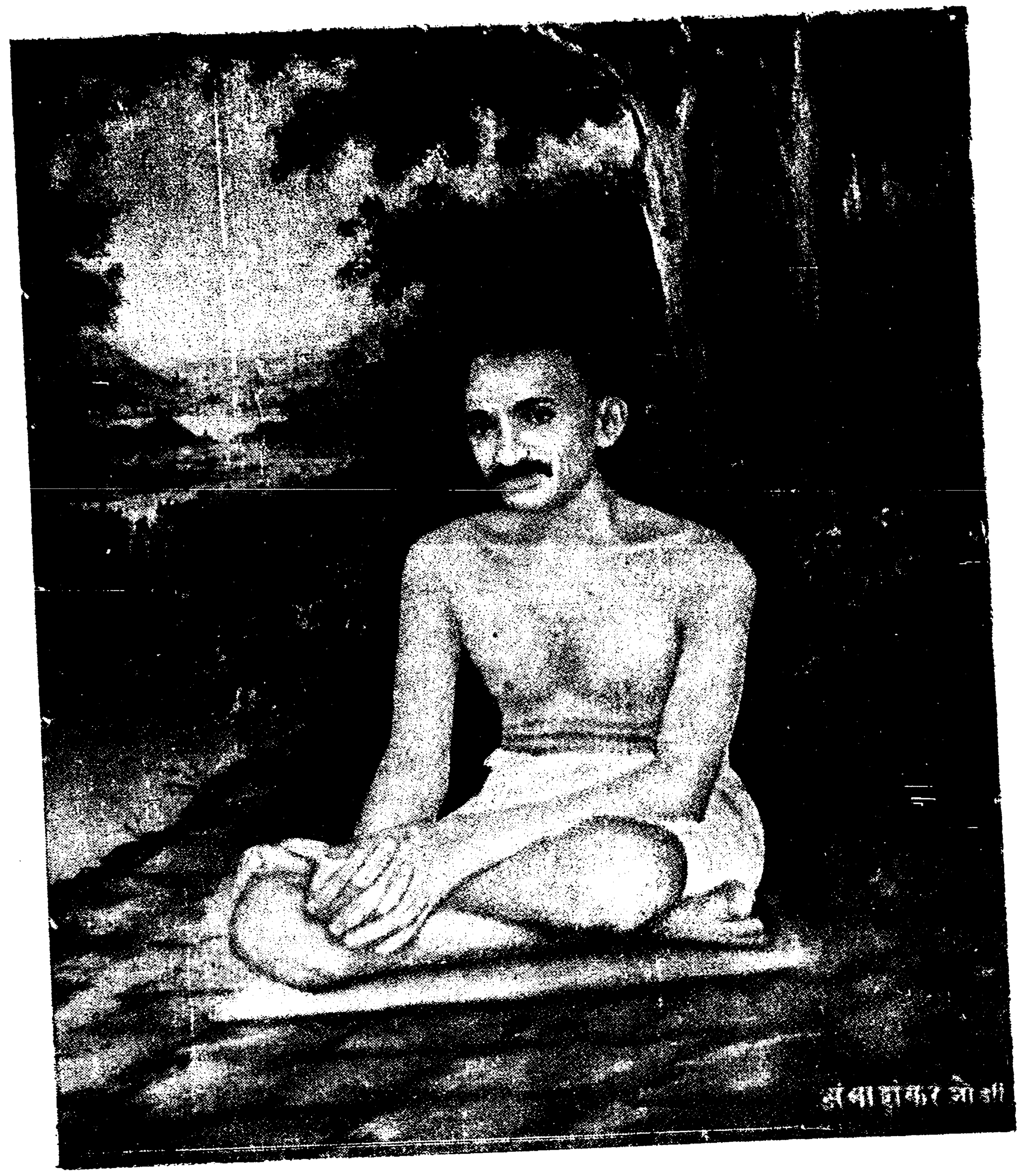

মহাত্মা।

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

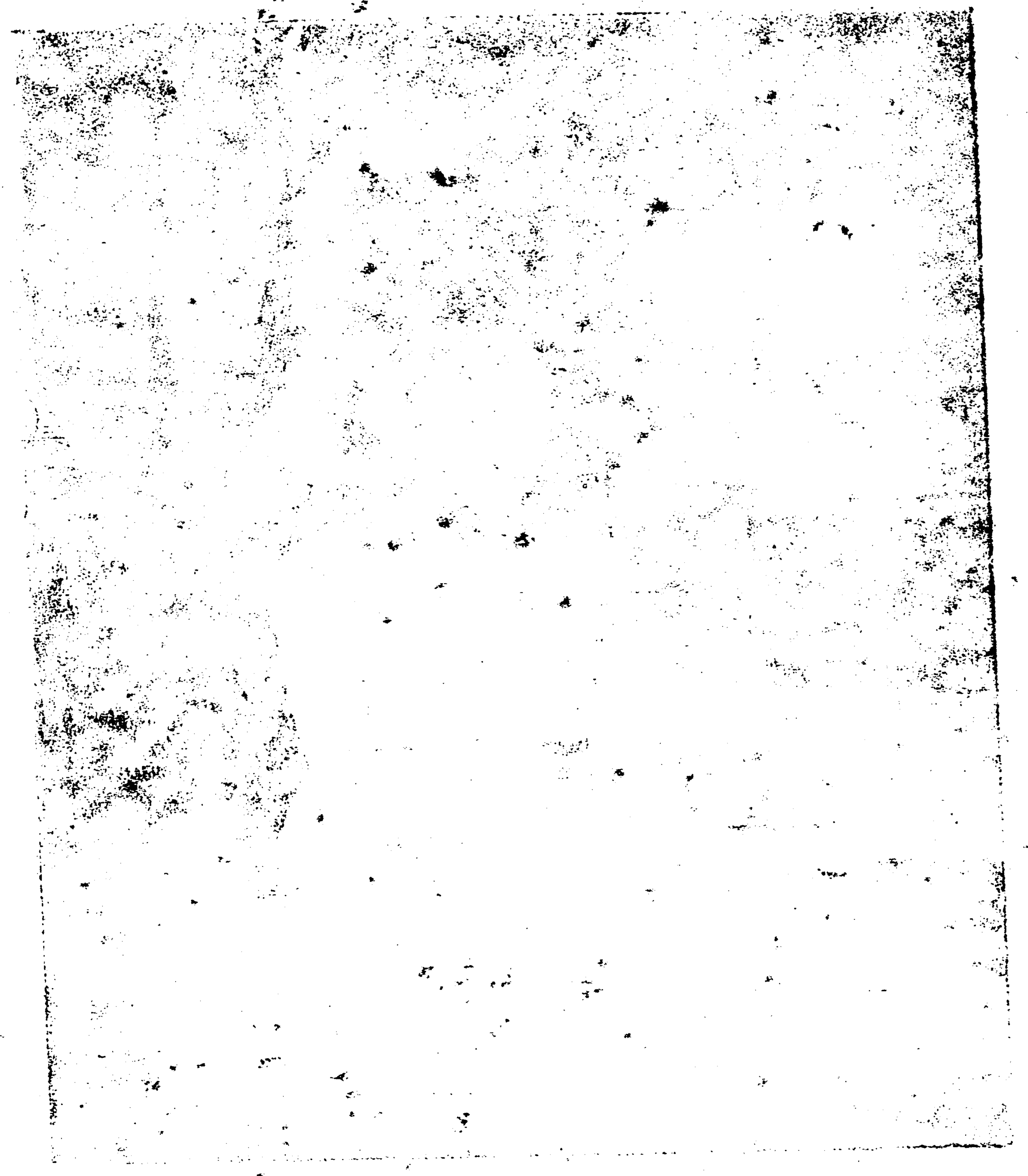

৪র্থ বর্ষ } চৈত্র, ১৩৩৭ { ৩য় সংখ্যা

রাজপুত-মহিমা

(শ্রীকালিদাস রায় বি-এ, কবিশেখর)

আত্মা যাদের তেয়াগের বলে করেছে সৃষ্টি জয়
গাও তাহাদের জয়।

ধর্ম্মেরে যারা পূজেছে, করেনি ধর্ম্মরাজেরে ভয়
গাও তাহাদের জয়।

নারী, ধর্ম্মেরে রক্ষা করিতে—
যারা কোন দিন ডরেনি মরিতে
পৌরুষে যারা পূজ্য করেছে নিখিল ভারতময়
গাও তাহাদের জয়।

শির দিল যারা দিল নাক সার
রাখিবারে মান ভারত মাতার।
যাহাদের হাড়ে মেবার পাহাড় লভিয়াছে উপচয়।
গাও তাহাদের জয়।

জয় করি যারা সব প্রলোভন,
বনের দৈন্য করিল বরণ,
স্মৃতিলোপেও তাদের কীর্ত্তি কখনো পাবেনা লয়
গাও তাহাদের জয়।

বিলাতী ডাক

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল, বি-এ)

টুটু, মিনু এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধব,

জাহাজ থেকে মার্স্যাইয়ে নেমে দেশটাকে ঠিক বিলেত ব'লে মনে হয় না। সেই ক'ল্‌কাতার গঙ্গার ধারের গুদাম ঘরের মত একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে মালপত্র আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হলো, আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করে তবে সহরের ভেতর ঢুক্‌তে দেবে। ইতি মধ্যে একটি ভারতীয় ভদ্রলোক যে আমাদের মালপত্র সাম্‌লানোর ভার নিয়েছিলেন, তা কি তোমাদের বলেছি? তিনি কালীঘাটের পাণ্ডার মত আমাদের জাহাজ থেকেই পাক্‌ড়াও করেছিলেন, এবং তাঁর মুলুক পাঞ্জাব এবং আমাদের বন্ধু সহযাত্রী মালহোত্রার মুলুক পাঞ্জাব হয়ে পড়াতে তাঁরা উভয়েই উচ্ছ্বসিত ভাবে এক জোর সেক্‌হ্যাণ্ড্‌ (করমর্দ্দন) করেছিলেন। আমাদের ভরসা, সেই সেক্‌হ্যাণ্ড্‌টুকু ভাঙ্গিয়ে যদি কিছু হয়! যাই হোক, বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, সেই ভদ্রলোক তাঁর চোখের এক অদ্ভুত ইসারায় আমাদের পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তে আদেশ কর্‌লেন—ভঙ্গীটা, কেল্লা মার দিয়া! পরীক্ষার ত্রুটি নেই, পকেটগুলো পর্য্যন্ত একবার হাত্‌ড়ে নিলে, মুখে হাজার বার জিজ্ঞেস কর্‌লে, পকেটে তামাক, আফিং, গাঁজা, গুলি, প্রভৃতি আছে কিনা এবং সে বিষয়ে একটু করুণা মিল্‌লে 'দক্ষিণা'র আশা কি রকম।

শেষকালে এক পুলিস্‌ এসে বলে, "মোয়া?" (অর্থাৎ আমাকে?) কাজেই ফরাসী বুঝিনা—এই ভাব দেখিয়ে বাংলায় বল্‌তে হলো, "যাও বাপু, ওসব মোয়া-মুড়কী বুঝি টুঝি না।" কি বুঝ্‌লে সে জানি না, কিন্তু গেল ভালোয় ভালোয়। বন্দরের বাইরে এসে ট্রাম ধরে একেবারে সেই ভদ্রলোকের খাস-কাছারীতে। ভদ্রলোক ব্যবসা ফেঁদেছেন মন্দ নয়। মার্স্যাই দিয়ে ভারতীয়দের যাওয়া আসা যখন তখন হয়ে থাকে; এখানে ভারতীয়দের দিব্যি পুরু পশম কাট্‌তে হলে, যে ধারালো কাঁচিখানি চাই, তা এ ভদ্রলোকের হাতে আছে। সেটা আর কিছুই নয়, অজস্র সহানুভূতি, এবং "হুজুরকা জুতিমে লেপ্টে হেঁ" ভঙ্গীটুকু। অতি ব্যস্ত ভাবে তিনি আমাদের সমস্ত মালপত্র ষ্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এবং শেষকালে তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত এক তাড়া বিজ্ঞাপণ ও বিশিষ্ট খরিদ্দারদের ফটোগ্রাফ এনে হাজির কর্‌লেন। তাঁকে নগদ পাঁচটি পাউণ্ড্‌ দক্ষিণা দিলে, তিনি আমাদে সকলকে একখানা ট্যাক্সিতে বোঝাই করে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। লোভনীয় প্রস্তাব। আমরা রাজী। সঙ্গে এলেন তাঁরই এক সাক্‌রেদ্‌ ভারতীয় পর্ত্তুগীজ্‌ সিঙর গঞ্জোলা। ট্যাক্সী ক'রে ঘুর্‌তে বেরুনো গেল।

মার্স্যাই সহর কতকটা পাহাড়ের ওপর, কতকটা সমতল ভূমিতে—পাহাড়ের কোলে সাগরের নীল বিস্তার। শীত পড়ি পড়ি কর্‌ছে, অথচ সমস্ত সহরটাতে রোদের আলোর অভাব নেই। চারিদিকের গাছপালা সবুজ, গাছে গাছে ছায়া করা পথ। তার ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। ভারী পরিষ্কার সহরটি, যেন ছবির মতন। সমুদ্রের ধার দিয়ে চার পাঁচ মাইল ব্যেপে একটি পথ, "প্রমনাদ্‌ দ্যে লা কর্‌নিশ্‌।" সত্যিই ঠিক সেটা যেন একটা কার্ণিশ্‌, আমরা যেন এতটুকু খেলাঘরের গাড়ীতে ক'রে ছাদের আল্‌সে দিয়ে চলেছি। ভারী সুন্দর। "কর্‌নিশ্‌" ঘুরে আমরা "নোত্র দাম দ্যে লা গার্দ"এ এসে পড়্‌লাম, পাহাড়ের ওপর বহু পুরাতন গির্জ্জে, বেশ উঁচু পাহাড়। উঠ্‌তে হলে, লিফ্‌টে উঠ্‌তে হয়। সে এক ভারী মজার লিফ্‌ট্‌। বেশ বড় একটা রেল গাড়ীর কাম্‌রার মত। হুস্‌ ক'রে একেবারে পাহাড়ের মাথায়! উঃ, যা ভয় ক'রে, একবার যদি কল্‌ বিগ্‌ড়ে যায় ত মা বল্‌তেও নেই বাবা বল্‌তেও নেই, সব একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। পাহাড়ের মাথায় এসে খানিকটা পায়ে হেঁটে গির্জ্জে,

শির দিল যারা দিল নাক সার
রাখিবারে মান ভারত মাতার।
যাহাদের হাড়ে মেবার পাহাড় লভিয়াছে উপচয়।
গাও তাহাদের জয়।

জয় করি যারা সব প্রলোভন,
বনের দৈন্য করিল বরণ,
সৃষ্টিলোপেও তাদের কীর্ত্তি কখনো পাবেনা লয়
গাও তাহাদের জয়।

বিলাতী ডাক

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল, বি-এ)

টুটু, মিনু এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধব,

জাহাজ থেকে মার্স্যাইয়ে নেমে দেশটাকে ঠিক বিলেত ব'লে মনে হয় না। সেই ক'ল্‌কাতার গঙ্গার ধারের গুদাম ঘরের মত একটা প্রকাণ্ড ঘরের মধ্যে মালপত্র আগ্‌লে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হলো, আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করে তবে সহরের ভেতর ঢুক্‌তে দেবে। ইতি মধ্যে একটি ভারতীয় ভদ্রলোক যে আমাদের মালপত্র সাম্‌লানোর ভার নিয়েছিলেন, তা কি তোমাদের বলেছি? তিনি কালীঘাটের পাণ্ডার মত আমাদের জাহাজ থেকেই পাক্‌ড়াও করেছিলেন, এবং তাঁর মুলুক পাঞ্জাব এবং আমাদের বন্ধু সহযাত্রী মালহোত্রার মুলুক পাঞ্জাব হয়ে পড়াতে তাঁরা উভয়েই উচ্ছ্বসিত ভাবে এক জোর সেক্‌হ্যাণ্ড্‌ (করমর্দ্দন) করেছিলেন। আমাদের ভরসা, সেই সেক্‌হ্যাণ্ড্‌টুকু ভাঙ্গিয়ে যদি কিছু হয়! যাই হোক, বেশ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর, সেই ভদ্রলোক তাঁর চোখের এক অদ্ভুত ইসারায় আমাদের পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তে আদেশ কর্‌লেন—ভঙ্গীটা, কেল্লা মার দিয়া! পরীক্ষার ত্রুটি নেই, পকেটগুলো পর্য্যন্ত একবার হাত্‌ড়ে নিলে, মুখে হাজার বার জিজ্ঞেস কর্‌লে, পকেটে তামাক, আফিং, গাঁজা, গুলি, প্রভৃতি আছে কিনা এবং সে বিষয়ে একটু করুণা মিল্‌লে 'দক্ষিণা'র আশা কি রকম।

শেষকালে এক পুলিস্‌ এসে বলে, "মোয়া?" (অর্থাৎ আমাকে?) কাজেই ফরাসী বুঝিনা—এই ভাব দেখিয়ে বাংলায় বল্‌তে হলো, "যাও বাপু, ওসব মোয়া-মুড়কী বুঝি টুঝি না।" কি বুঝ্‌লে সে জানি না, কিন্তু গেল ভালোয় ভালোয়। বন্দরের বাইরে এসে ট্রাম ধরে একেবারে সেই ভদ্রলোকের খাস-কাছারীতে। ভদ্রলোক ব্যবসা ফেঁদেছেন মন্দ নয়। মার্স্যাই দিয়ে ভারতীয়দের যাওয়া আসা যখন তখন হয়ে থাকে; এখানে ভারতীয়দের দিব্যি পুরু পশম কাট্‌তে হলে, যে ধারালো কাঁচিখানি চাই, তা এ ভদ্রলোকের হাতে আছে। সেটা আর কিছুই নয়, অজস্র সহানুভূতি, এবং "হুজুরকা জুতিমে লেপ্টে হেঁ" ভঙ্গীটুকু। অতি ব্যস্ত ভাবে তিনি আমাদের সমস্ত মালপত্র ষ্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এবং শেষকালে তাঁর ব্যবসা-সংক্রান্ত এক তাড়া বিজ্ঞাপণ ও বিশিষ্ট খরিদ্দারদের ফটোগ্রাফ এনে হাজির কর্‌লেন। তাঁকে নগদ পাঁচটি পাউণ্ড্‌ দক্ষিণা দিলে, তিনি আমাদে সকলকে একখানা ট্যাক্সিতে বোঝাই করে সমস্ত সহর ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেবেন। লোভনীয় প্রস্তাব। আমরা রাজী। সঙ্গে এলেন তাঁরই এক সাক্‌রেদ্‌ ভারতীয় পর্ত্তুগীজ্‌ সিঙর গঞ্জোলা। ট্যাক্সী ক'রে ঘুর্‌তে বেরুনো গেল।

মার্স্যাই সহর কতকটা পাহাড়ের ওপর, কতকটা সমতল ভূমিতে—পাহাড়ের কোলে সাগরের নীল বিস্তার। শীত পড়ি পড়ি কর্‌ছে, অথচ সমস্ত সহরটাতে রোদের আলোর অভাব নেই। চারিদিকের গাছপালা সবুজ, গাছে গাছে ছায়া করা পথ। তার ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ী চলেছে। ভারী পরিষ্কার সহরটি, যেন ছবির মতন। সমুদ্রের ধার দিয়ে চার পাঁচ মাইল ব্যেপে একটি পথ, "প্রমনাদ্‌ দ্যে লা কর্‌নিশ্‌।" সত্যিই ঠিক সেটা যেন একটা কার্ণিশ্‌, আমরা যেন এতটুকু খেলাঘরের গাড়ীতে ক'রে ছাদের আল্‌সে দিয়ে চলেছি। ভারী সুন্দর। "কর্‌নিশ্‌" ঘুরে আমরা "নোত্র দাম দ্যে লা গার্দ"এ এসে পড়্‌লাম, পাহাড়ের ওপর বহু পুরাতন গির্জ্জে, বেশ উঁচু পাহাড়। উঠ্‌তে হলে, লিফ্‌টে উঠ্‌তে হয়। সে এক ভারী মজার লিফ্‌ট্‌। বেশ বড় একটা রেল গাড়ীর কাম্‌রার মত। হুস্‌ ক'রে একেবারে পাহাড়ের মাথায়! উঃ, যা ভয় ক'রে, একবার যদি কল্‌ বিগ্‌ড়ে যায় ত মা বল্‌তেও নেই বাবা বল্‌তেও নেই, সব একেবারে গুঁড়িয়ে যাবে। পাহাড়ের মাথায় এসে খানিকটা পায়ে হেঁটে গির্জ্জে,

গির্জ্জের সিঁড়িতে ভিখারীর দল, বাতীর দোকান, ঠিক আমাদের দেশের মত, তবে বেশ পরিষ্কার। গির্জ্জের ছু'টি অংশ, প্রথম অংশ পাহাড়ের গুহার ভেতর, অনেক পুরাণো, ১২শ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী, দ্বিতীয় অংশটি নতুন। ভেতরের আসবাবপত্রের মধ্যে বেশীর ভাগই বিগত মহাযুদ্ধ সম্বন্ধীয়—কে কোথায় মরেছে, কার কী রকম বীরত্ব! এখনও অনেক বুড়ী মা, বিধবা স্ত্রী এসে তাদের নামে বাতী জেলে দিয়ে যান। পাহাড়ের

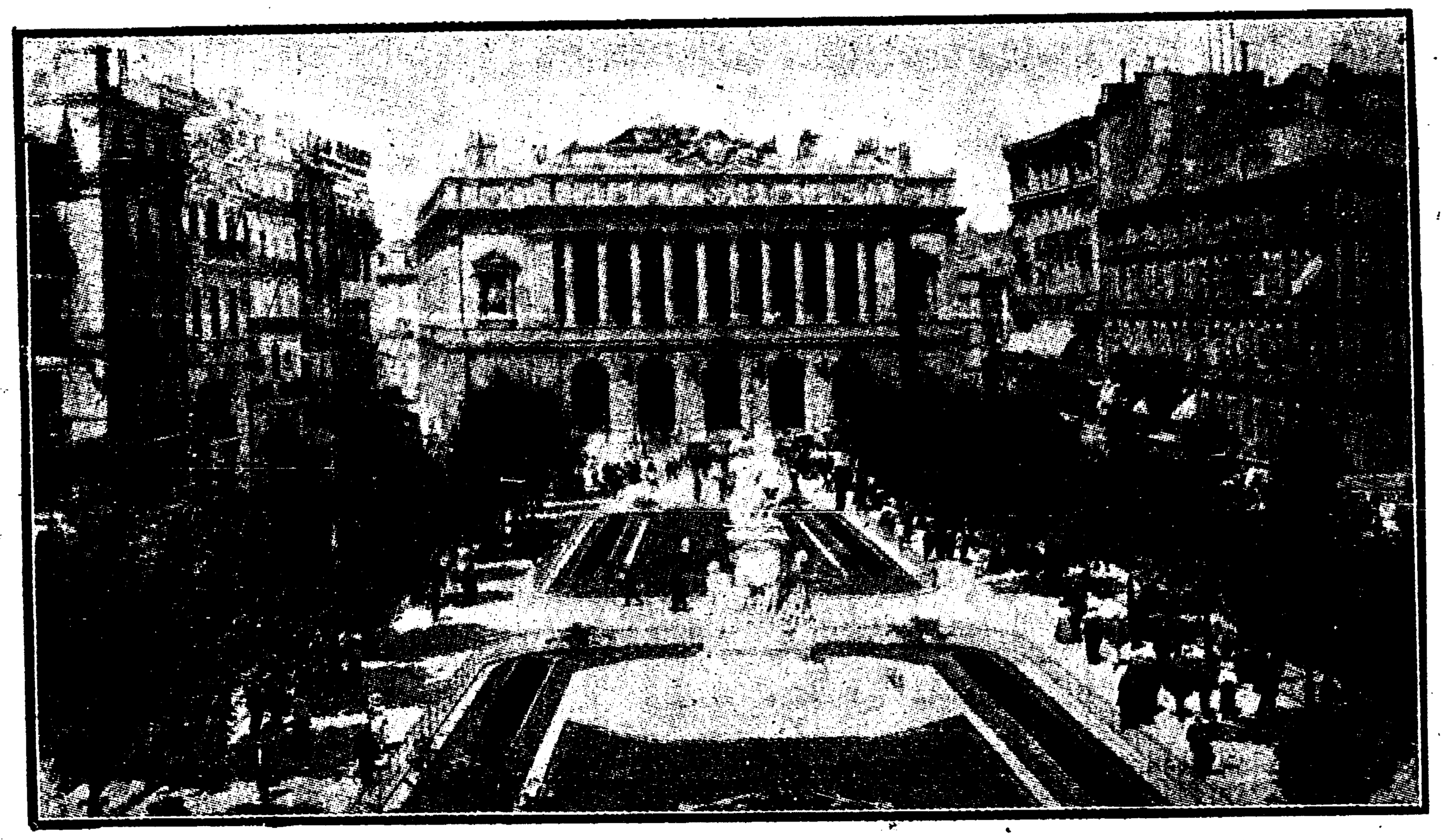

মার্স্যাইয়ের একটী প্রাসাদ।

ওপর থেকে মার্স্যাই সহরটার সবটাই দেখা যায়। দূরে সাগর, তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট জাহাজ ভাস্‌ছে, তারও ওধারে একটি ছোট্ট দ্বীপ, "ডেভিল্‌স্ আইল্যাণ্ড্।" এটা জেলখানা। আলেক্‌সাঁন্দর্ ত্যুমার বইয়ে এর কথা পাওয়া যায়। এই পাহাড়ের ওপর থেকে মার্স্যাইকে দেখে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

গির্জ্জে থেকে নেমে যাবার পথ, সেই রকম ছায়া করা। তবে বিশেষত্ব এই যে, এর মাঝখানে বেশ চওড়া পায়ে চলার পথ, যেন বরাবর লম্বা একটানা একটা পার্কের মাঠ, মাঝে মাঝে বেঞ্চ্ পাতা। দেখে মনে হয়, আমাদের দেশটাকে কী করেই রখেছে!—অথচ আমাদের দেশের মত সবুজের সে বাহার ত এ দেশে নেই! একটি

ফুলের বাগানের ভেতর দিয়ে চলেছি। অমন ফুল সাজাতে ফরাসীর সঙ্গে এক জাপান ছাড়া বোধ হয় আর কেউ পারে না।

এইবার এক প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদের সাম্‌নে আমাদের গাড়ী এসে দাঁড়ালো। রোমক যুগের প্রাসাদ এটা, তার পরও তার ওপর নতুন বাড়ী করে তাকে আধুনিক প্রাসাদভাবে ব্যবহার করা হতো, ফরাশী বিদ্রোহের আগে পর্য্যন্ত। প্রাসাদের সাম্‌নে ঝর্ণার জল এসে পড়্‌ছে একটি চৌবাচ্চায়,—একটা লক্ষ্য কর্‌বার জিনিষ, যে ঝর্ণার মুখ একটা গরুর মুখ, যেন গোমুখী। প্রাসাদের পেছনে খুব বড় পার্ক্ তার ভেতর চিড়িয়াখানা। পার্কের নামও অদ্ভুত, পেন্‌সন্‌ভোগীদের পার্ক্। সঙ্গের গাইড সিঙর গঞ্জেলা বল্‌লেন, অর্থাৎ যাদের কাজ নেই কর্ম্ম নেই, তারাই এসে এখানে রোদ পোহায়। বেলা বেশ বেড়েছে, খাঁচার মধ্যে একটা চিতাবাঘ যে রকম আনন্দে একটা মাংসের টুক্‌রোকে তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল, তাই দেখে আমাদেরও মনে পড়ে গেল, এইবার আহারের চেষ্টা দেখা উচিত। সটান এক সিংহলী রেস্তোরাঁয়। কত দিন পরে ভাত আর তরকারীর মুখ দেখ্‌লাম! ছোট্ট পরিষ্কার জায়গাটি; চলেও বেশ। খাওয়া দাওয়ার পর এদিক ওদিক একটু ঘুরে আমরা আবার হাজির হলাম, আমাদের সেই পুরাণো আড্ডায়। ফিরে আস্‌তেই, কর্ত্তা মশাই বল্লেন, তাঁদেরই এক দোকান আছে। সেটা কিছু—কিনি আর নাই কিনি, একবার দেখে আস্‌তে দোষটা কী? —জানো ত সেই ছড়াটা, "টেক্ টেক্ টেক্ নো টেক্ নো টেক্ একবারও ত সী!"—সেই গোছ আর কি! তাঁর অনুরোধ রাখ্‌তেই হলো। আসলে দোকানটি যে এঁদের নয় তা ঢুক্‌তেই বোঝা গেল। নাম "ও দাম দ্যে ফ্রাস্।" মার্স্যাই সহরের সব চেয়ে বড় মনিহারী দোকান ও কাপড়জামার। আসলে ব্যাপারটা এই যে সন্ত আগত ভারতীয়দের এখানে এঁরা পাঠিয়ে দেন সটান, তারপর যদি কিছু পশম পাওয়া যায় ত তার ওপর বখরা হয় তাঁদের মধ্যে। ব্যাবসা মন্দ নয়। কিছু কিছু জিনিষ কেনা গেল। জিনিষপত্র লণ্ডনের চেয়ে অবশ্য সস্তা। সন্ধ্যার সময় ট্রেণ। কর্ত্তাদের কাছ থেকে বিদায় নিতে গিয়ে মহা গণ্ডোগোল! লম্বা এক ফর্দ্দ, তাইত দেখেই আমাদের চক্ষু চড়ক গাছ! তার মধ্যে তিনি কাস্‌টমস্ হাউসকে কত ঘুষ দিয়েছিলেন, তাও ধরা আছে। মজা মন্দ নয়! এতক্ষণে তাঁর চক্ষের ইসারা ও সেকহ্যাণ্ডের

অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি হলো। জিজ্ঞেস কর্‌লাম, ঘুষ দিতে কে তোমায় বলেছিল বাপু? বল্লেন, তিনি কি জানেন, যদি আমাদের বাক্সের মধ্যে সত্যিই কিছু থেকে থাকে, মদ্ আফিং গোছের কিছু! তাঁর বুদ্ধির তারিফ্ না ক'রে থাকা যায় না। তার ওপর মালপত্রের ব্যবস্থার জন্যে যা দাম ধরেছেন, মালপত্র শুদ্ধ আমাদের সকলকে বেচ্‌লেও তা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আরও মজা, সমস্ত খরচ ধরে তাকে যোগ দিতে গিয়ে তাকে তার দেড়া করা হয়েছে। বল্লেন, ওটা ঠিকে ভুল, কিন্তু ঠিকে ভুলে কিছু কমত হয় নি! বল্‌লাম, ওসব হবে টবেনা বাপু! শেষে অনেক ধস্তাধস্তির পর প্রায় সিকি দামে রফা হলো। তবে ভদ্রলোক আমাদের জন্যে করেছিলেন যথেষ্ট। সন্ধ্যার সময় যে ট্রেনখানি তিনি ধরিয়ে দিলেন, সেখানি তাঁর পক্ষে খুব সুবিধাজনক হলেও, আমাদের অসুবিধাটা আমরা পরের দিন পারি না যাওয়া পর্য্যন্ত ঠিক বুঝতে পারি নি।

সারারাত ধরে গাড়ী চলেছে, বেশ শীত, তবে গাড়ীর ভেতরটি ইঞ্জিনের থেকে বাষ্পের সাহায্যে বেশ গরম করে রাখা হয়েছে। ভালো কথা, তখনও আমাদের সঙ্গে সেই জাভানী ভদ্রলোকটি রয়েছেন, বেচারীর শরীর ভালো নয়, চীনে ছোক্‌রা বাইলাক তাঁকে ঠাট্টা করে বলেছিল—আপনার সমুদ্রপীড়ার মত ট্রেন্ পীড়াও হওয়া আশ্চর্য্য নয়। তার কথাটা সত্যিই খেটে গিয়েছিল। সকালে ফরাসী দেশ। ভারী সবুজ, যেন বাংলা দেশ। দূরে ছোট ছোট পাহাড়, সুন্দর রংচঙে ছোট ছোট বাড়ী, আপেলের বাগান। ভোর বেলায় এক ছোট ষ্টেশনে কফি আর রুটি, এই হলো প্রাতরাশ। সকাল আট্‌টার সময় পারী।

পারীতে নেমে ট্যাক্সি করে, এক ষ্টেশন থেকে আর এক ষ্টেশনে, যেন শেয়ালদা' থেকে হাওড়া। পারী থেকে কালে বা বুলোঁয়্ যাবার গাড়ী অনেক, তবে একটিতেও তৃতীয় শ্রেণী নেই, সেই বেলা তিনটে পর্য্যন্ত বসে থাকো হাঁ ক'রে। অথচ সময় এত অল্প যে সহর ঘুরে দেখাও যায় না। কাজেই "গড়ি মাসি" ক'রে সময় কাটাও! এক রেলওয়ে কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞেস করা গেল কালে না বুলোঁয়্ কোন্‌টা সুবিধা, তিনি টাইমটেব্‌ল্ দেখে বল্‌লেন দুই সমান। শুনেছি, বুলোঁয়্ থেকে ফোক্‌ষ্টোন্‌টা বেশী চওড়া, তার ওপর—ইংলিশ্ চ্যানেলের কীর্ত্তির

কথা আগেও অনেক শুনেছি। কাজেই ঠিক করা গেল, কালে-ডোভার দিয়ে যাওয়াই প্রশস্ত।

পারী থেকে কালের পথে অনেকগুলি বেশ সুন্দর সুন্দর সহর চোখে পড়ে। তার মধ্যে আমিয়ঁ একটি, বিগত মহাযুদ্ধের সময় আমিয়ঁ থেকে জার্ম্মান গোলার আওয়াজ ফরাসীদের কাণে পৌঁছেছিল। বেশ আনন্দে মাঝে মাঝে স্যাণ্ড্‌উইচ্ খাওয়া যাচ্ছে, আর বাইরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যাচ্ছে। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গেল, রাত আটটায় আমরা বুলোঁয়্ ছাড়িয়ে কালের দিকে চল্লাম। রাত ন'টায় কালে। ট্রেণ থেকে লোক বড় বেশী নাম্‌লো না। প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে জিনিষপত্র নামিয়ে এক ভদ্রলোককে জাহাজের খেয়া ঘাটের পথ জিজ্ঞেস করায় তিনি তাঁর ফরাসীসুলভ ভদ্রতা বাঁচাতে যথেষ্ট চেষ্টা করেও হেসে ফেলে, সেই "হাত ঘুরোলে নাড়ু দেবো" ভঙ্গীতে বল্‌লেন, "নেই নেই"—কালে থেকে শেষ জাহাজ ছেড়ে গেছে বিকাল পাঁচটায়। নিরুপায়। জিনিষপত্রগুলো ষ্টেশনের বিশ্রাম-ঘরের মধ্যে জড়ো ক'রে রেখে এখন ঠিক করতে হলো করা যায় কী। বন্ধু নাইডু ত রেগেই খুন্। দোষটা আমারই এবং আমার আরও দোষ এ দেশের ভাষাটা আমার জানা ছিল। যাই হোক্ নাইডুকে ঠাণ্ডা করে আমরা সহরের ভেতর চল্লাম কিছু একটা ব্যবস্থার জন্যে। পকেটে এদিকে ফরাসী পয়সাকড়ি কিছু নেই। সব ব্যাঙ্ক তখন বন্ধ হয়ে গেছে, উপায় নেই যে একটা পাউণ্ড্ ভাঙ্গাই। শেষকালে অনেক হাত্‌ড়ে জড়ো করা গেল, প্রায় দেড় ফ্রাঁর কাছাকাছি, অর্থাৎ তিন আনা। তাই দিয়ে ত আর চারটি প্রাণীর পেট ভরে না! শেষকালে, পথের ধারে এক ঠেলা গাড়ীতে ক'রে আলু ভাজছিল, তাই কেনা গেল, কিছু খেয়ে, কিছু নিয়ে যাওয়া হলো নাইডুর জন্যে, বেচারা তখন ষ্টেশনে মালপত্র চৌকী দিচ্ছে। আমাদের দেখেই তাঁর আরও রাগ বেড়ে গেল, বল্লেন, তাঁকে অমন ক'রে এক্‌লা ফেলে যাওয়া! যাক্! আলু ভাজা দিয়ে তাঁকে ত অনেক ক'রে থামানো গেল। ষ্টেশনের কাছেই একটি ছোট্ট হোটেলে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে আমরা মালপত্র নিয়ে একেবারে শোবার ঘরে এসে হাজির। তারপর যা ঘুম! সে রাত্রিতে খাওয়া ঐ পর্য্যন্ত!

কালে সহরটি খুব ছোট্ট, দেখ্‌বার বিশেষ কিছু নেই। তবে তোমাদের মধ্যে যারা

ইতিহাস পড়েছ তারা নিশ্চয়ই কালের ছ'জন বণিকের গল্প জানো—কেমন করে তাঁরা তাঁদের দেশকে বাঁচাবার জন্যে ইংলণ্ডের রাজার কাছে তাঁদের মাথা দিতে রাজী হয়েছিলেন ; তাঁদের প্রতিমূর্ত্তি দেখ্‌লাম।

বিকাল বেলা জাহাজ ছাড়লো। ইংলিশ চ্যানেল সেদিন ভারী শান্ত, জোর কপাল বল্‌তে হবে। দূর থেকে ডোভারের খড়ির পাহাড় দেখা যায়। ইংলণ্ডের আর এক নাম এ্যাল্‌বিয়ন, তা তোমরা জানো ত ? এ্যাল্‌বিয়ন নাম হয়েছে, এই সাদা রঙের খড়ির পাহাড় থেকে। ভারী সুন্দর। কী যেন একটা কবিতা মনে পড়ে, অথচ তাকে ছন্দে ধরা যায় না।

এইবার সত্যিকার বিলেতে! এদের দেশটিকে যে কি মন্তর করে রেখেছে, তা কী ব'ল্‌বো! যেদিকে তাকাও যেন ছবি। সন্ধ্যার সময় লণ্ডন। লণ্ডনে নেমেই ত একেবারে ভ এ য ফলা আকার, ব এ আকার, আর চ এ য ফলা আকার, ক এ আকার!

ইতি—দাদা।

ঘোষ চৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

স্তব্ধ হইয়া ভূপেশ বাবু মিনিট্ খানেক হাঁ করিয়া রহিলেন, তারপর কহিলেন, "আপনার বাড়ীতে হানা ? য়্যাঁ খোদ্ সিংহের বিবরে ?"

"হ্যাঁ, এবং 'সিংহ' একেবারে দস্তুর মত কূপোকাৎ! তা যাক্ সে সম্বন্ধে আলোচনা বরং এখন স্থগিত থাক্, কেননা শীগ্‌গিরই আমায় একবার ভবানীপুরে রিপন কলেজের বোটানীর প্রোফেসারের বাড়ী গিয়ে পৌঁছাতে হবে, দেরী হলে তিনি আবার বালীগঞ্জের ল্যাবোরেটারীতে বেরিয়ে পড়্‌বেন ; সেখানে অনেক লোক, গোপনে কথা-বার্ত্তা কইবার তেমন জুৎ হবে না" বলিয়া হুকা-কাশি নলকোপার সেই শীর্ণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এবার দু'কথায় আপনার বক্তব্যটা সারা করে

ফেলুন দেখি। আপনাকে অন্যায় ভাবে আটক রাখা হয়েছে জেনে ভূপেশ বাবু অবশ্যই খুব লজ্জিত এবং দুঃখিত হয়েছেন, তা আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু ব্যাপার এতটা গড়িয়েছে শুধু আপনারই অদ্ভুত আচরণের দরুণ। কেনই বা আপনি অন্ধকারে বাগানের এক কোণ্‌টীতে অমন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আর কেনই বা লোক আস্‌তে দেখে অমন তাড়াতাড়ি সরে পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌লেন ?"

হুকা-কাশি আসিবার পর লোকটী এই প্রথম মুখ খুলিল, কহিল, "হ্যাঁ, আমারই অবিবেচনা বটে!" তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতে লাগিল, "কতগুলো কারণেতে ভূপেশের বাপের ওপর আমার দারুণ আক্রোশ ছিল, শুধু আক্রোশ নয়—ভূপেশ বাবা, তুমি কিছু মনে ক'র না—প্রবল ঘৃণাও ছিল। কিন্তু রাগের বশে এবং সাময়িক উত্তেজনায় একদিন এমন একটা কাজ আমি করে বস্‌লাম যে সে কথা মনে কর্‌তে আজও লজ্জায় আমার মাথা নুইয়ে আস্‌ছে।"

"ভূপেশ বাবুর মৃত পিতার ওয়াটার-পেন্টিংটা লাথি মেরে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে দিলেন, এই তো ?"

"হ্যাঁ। স্থির জান্‌তাম; এ ব্যাপারের পর ভূপেশ আর কিছুতেই আমায় ক্ষমার চক্ষে দেখ্‌তে পার্‌বে না, তাই এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে ওতে আমাতে কিছুতেই যাতে আর দেখা-সাক্ষাৎ না হয় সেই ভাবে চলে এসেছি। কিন্তু এই দিন কয়েক হ'ল আমি কল্‌কাতা এয়েছি ; এর আগেও যে এখানে আর কখনো আসিনি তা নয়, কিন্তু সে খুব কম, বোধ করি গুণে বলা যায় ক'বার। দেশে থাক্‌তেই শুনেছিলাম, ভূপেশ নাকি কল্‌কাতায় এক বিরাট্ বাড়ী করেছে সে নাকি একটা দেখ্‌বার জিনিষ। ভাব্‌লাম, বাড়ীটা এবার দেখে যেতে হবে। গোপনে এ কাজটা সার্‌বার পক্ষে সন্ধ্যের পরটাই হচ্ছে সব চাইতে ভাল সময়, তা বোধ হয় অস্বীকার কর্‌বেন না। অন্ধকার ঘনিয়ে আস্‌তেই তাই ধীরে ধীরে কম্পাউণ্ডের ভেতরে একটু ঢুকে বাড়ীখানার দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—হাঁ বাড়ী বটে একখানা! হঠাৎ সেই সময় কে একজন ভেতর থেকে বেরিয়ে আমারই দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল। আমি দেখ্‌লাম আমার পক্ষে এবার সরে পড়াই মঙ্গল, কেননা এর পর হয় তো আমার পরিচয় আর গোপন রাখা সম্ভব হবেনা। কিন্তু কল্‌কাতার রাস্তায় আচম্‌কা দৌড়ে পালানো যে এত বড় বিপদের

ব্যাপার তা কি তখন ঘুণাক্ষরেও জান্‌তাম্‌—উঃ পিঠ্‌টা এখন পর্য্যন্ত টনটনিয়ে রয়েছে।”

বৃদ্ধের উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া অল্পক্ষণের মধ্যেই দুজনে সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। হুকা-কাশি বিপরীত দিকের রাস্তা ধরিয়া কহিলেন, “আপনাকে আর রোদের ভেতরে টান্‌বার বড় ইচ্ছে নেই রণজিৎ বাবু, আপনি বরং এইবার বাড়ী ফিরুন, আমি আস্তে আস্তে ভবানীপুরের দিকে এগোই।”

“কিন্তু কেন মিষ্টার হুকা-কাশি? বোটানীর অধ্যাপক মশাই আপনাকে এ ব্যাপারে কিভাবে যে সাহায্য করতে পারেন, হাজার ভেবে ভেবে আমি এখন পর্য্যন্ত তার এক তিলও আঁচ্‌ করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না যে!”

হুকা-কাশি অন্য কি একটা বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, কথাটা তাঁর কাণে গেল কিনা ঠিক বোঝা গেল না, তিনি আচম্‌কা প্রশ্ন করিলেন, “ঘড়ির ও দাগগুলো কোথা থেকে এল বলে আপনার মনে হয় রণজিৎ বাবু?”

রণজিৎ ঈষৎ বিস্ময়ের সহিত কহিল, “কোন্‌ দাগগুলোর কথা বল্‌ছেন?”

“বাঃ, কাল রাত্রে আপনাকে দেখালাম না যে চোরের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ-গুলোর পাশে পাশে কেমন একটা অস্পষ্ট দাগ পড়েছে—যেমন ঘড়ির এপিঠে তেম্‌নি ওপিঠে। এখন কথা হচ্ছে অতগুলো জিনিষের দাগ ঘড়ির গায়ে এল কি করে? আর কেমন অস্পষ্ট দাগগুলো দেখেছেন?”

একটু দূরেই দেখা গেল দু’নম্বরের ‘বাস্‌’ আসিতেছে, কাজেই আলোচনাটা সেইখানেই তখনকার মত বন্ধ করিতে হইল। হুকা-কাশি ইঙ্গিতে ‘বাস্‌’ থামাইয়া তাহাতে গিয়া উঠিলেন, রণজিৎ ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে হাঁটা দিল।

নানা জায়গা হইতে দিন কয়েক হইল কতগুলি চিঠি-পত্র আসিয়া জড় হইয়া ছিল, ঠিক ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর রণজিৎ আজ সেগুলির জবাব লিখিতে বসিবে। এই জবাব দিতে বসিয়াই সারা দুপুরটা তার কোন্‌ ফাঁক্‌ দিয়া যে চলিয়া গেল বিকাল হইবার পূর্ব্বে সে তার কিছু ঠিক-ঠিকানাই পাইল না। হাতের কাজগুলি সারিয়া কাগজ-পত্র গুছাইতে গুছাইতে চাকরকে চা আনিবার জন্য সে যখন হুকুম দিল, বেলা

তখন পাঁচটা বাজিয়া গেছে। চা-পানান্তেই রণজিৎ বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িল; বড় রাস্তা দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে ক্রমে সে সেই মোড়টার নিকট আসিয়া পৌঁছিল যেখানে ঘড়ির দোকানটা অবস্থিত। কয়েক পা আগাইয়া গেলেই প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী। রণজিতের মনে হইল প্রোফেসার-পুত্র বিমলের সহিত একবার দেখা করিয়া তার বাবা বর্ত্তমানে কেমন আছেন সে খবরটা লওয়া বরং মন্দ নয়। এই উদ্দেশ্যেই সে একটু আগাইয়া বাহিরের ফটকটা পার হইয়া অধ্যাপক মশা’য়ের বাড়ীর বারান্দায় গিয়া উঠিল। সাম্‌নের ঘরটিতে দুটী লোক কি একটা বিষয় নিয়া উচ্চ কণ্ঠে আলোচনা করিতেছিল, তার দু’ একটা কথা কাণে আসিতেই রণজিৎ টের পাইল প্রোফেসার গুপ্তের রহস্য-জনক উন্মাদ রোগ লইয়াই আলোচনা চলিতেছে এবং সে আলোচনাটা চালাইতেছে বিমল এবং বিরূপাক্ষ আচার্য্য। বিরূপাক্ষ সান্ত্বনার সুরে বিমলকে বুঝাইতেছিল যে সে নিরর্থক অমন ‘ভাঙ্গিয়া’ পড়িতেছে, কেননা স্বনাম-ধন্য হুকা-কাশি নিজমুখে যখন একবার আশ্বাস দিয়াছেন যে ব্যাপারটার কিনারা তিনি করিবেনই, তখন কিনারা একটা হইবেই। হুকা-কাশির প্রয়াস কখনো ব্যর্থ হইবার নয়, তবে ব্যাপারটা একটু ঢিমে-তেতালায় চলিতেছে, এই যা!

“ভেতরে অস্‌তে পারি কি?” রণজিৎ বাহির হইতে প্রশ্ন করিল। বিরূপাক্ষ গলা বাড়াইয়া দেখিল রণজিৎ, মুখখানা তার স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়া উঠিল, সে কহিল, “এই যে আসুন, আসুন, আস্‌তে আজ্ঞা হোক্‌। এক্ষুণি আপনাদের কথাই হচ্ছিল; আমার কিন্তু একটু ছোট্ট নালিশ আছে রণজিৎ বাবু, আপনারা এবার একটু গা’ কর্‌তে সুরু করুন, অধ্যাপক মশা’য়ের ব্যাপারটা একেবারে মিইয়ে এল যে!”

প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িতে পড়িতে রণজিৎ বলিল, “হ্যাঁ, গা কর্‌তে এবার সুরু কর্‌ব বই কি? কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, মিষ্টার হুকা-কাশি অন্য একটা জটিল ব্যাপার নিয়ে বড় মেতে গেছেন, সেটার একটু মীমাংসা করে আন্‌তে পার্‌লেই আপনাদের এটাতে হাত দেবেন। তাঁর ক্ষমতা অসাধারণ, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রোফেসার গুপ্তের এ ব্যাপারের কোথাও যদি এতটুকু রহস্য থেকে থাকে তবে ঠিক্‌ তিনি তা টেনে বার কর্‌বেন...” তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার কহিল, “যদিও আমার নিজের কিন্তু বিশ্বাস, অতিরিক্ত

মানসিক মেহনতের জন্যেই তাঁর স্নায়ুর কোথাও কিছু হয়ে থাক্‌বে, যার ফলে এ বিষম বিপত্তিটি ঘটেছে।

বিমল এ কথার কোনই জবাব দিল না, গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। কথা কহিল বিরূপাক্ষ, বলিল, "গোড়াতে অই রকমই মনে হয় রণজিৎ বাবু, আমি তা অস্বীকার কর্‌ব না। সত্যি বল্‌তে কি ছ'দিন আগ অবধি আমার মনের ধারণাও ছিল আপনারই মত। কিন্তু যতই আমি নিরালায় বসে ব্যাপারটা তলিয়ে বোঝ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি ততই যেন আমার স্পষ্ট ধারণা জন্মাচ্ছে এ বিষয়ে বিমল বাবুই ঠিক ধরেছেন, আমরাই ভুল কর্‌ছি। বড় দরের রহস্য কোথায় যেন এর একটা জড়িয়ে আছেই—উঃ"

শেষের শব্দটী যন্ত্রণা-ব্যঞ্জক—অন্যমনস্কভাবে টেবিলের সহিত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটার একটা গুঁতা লাগিতে বিরূপাক্ষের মুখ দিয়া শব্দটী বাহির হইয়া পড়িল।

বিমল এবং রণজিৎ উভয়েই ত্রস্ত হইয়া উঠিল, রণজিৎ কহিল, "মিষ্টার হুকা-কাশির মুখে আজ প্রাতেই আপনার য়্যাক্‌সিডেণ্টের কথা শুন্‌ছিলাম, বড্ড বেশী চোট্‌ লেগেছে, নয় ?"

"চোট্‌ ?" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বিরূপাক্ষ জবাব দিল, "কব্জিটা যেন নেই বল্লেই চলে !" তারপর একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "শাস্ত্রে আছে 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা'—এতটুকু বয়েস থেকে কল্‌কাতা-বারাকপুর ডেলি প্যাসেঞ্জারি কর্‌ছি, চল্‌তি ট্রেণে ওঠানামা হরদম্‌ অভ্যাস্‌। বিশ্বাস ছিল, আপনাদের মত খেলোয়াড় হই আর নাই নই, এ বিষয়টাতে অন্ততঃ সব্বার ওপরেই টেক্কা মার্‌তে পারি। তারই ফল একেবারে ভগবান্‌ হাতে হাতে দেখিয়ে দিলেন, নিতান্ত অজ-পাড়াগেঁয়ের মত 'বাস্‌' থেকে পড়ে পঙ্গু হতে হ'ল !"

প্রোফেসার গুপ্তের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটী তত্ত্ব লইয়া বিমল ও বিরূপাক্ষের নিকট রণজিৎ সেদিনকার মত বিদায় লইল, বোধ করি সর্ব্ব সাকল্যে পনেরো মিনিটের বেশী সময় সে সেখানে থাকে নাই। রাস্তায় নামিয়া সে নিজের চিন্তায় নিশ্চয়ই নিতান্ত বিভোর হইয়া থাকিবে, নতুবা একটী ব্যাপার কিছুতেই তার চোখ এড়াইত না, যে ব্যাপারটী ক্ষুদ্র হইলেও বেশ কিছু গুরুতর—পূর্ব্ব-কথিত ঘড়ির

দোকানটীর ঠিক পাশে নিজের শরীরটীকে যতদূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়া বাজ-পক্ষীর মত খর দৃষ্টিতে একটী লোক প্রোফেসারের বাড়ীর ফটকটীর দিকে তাকাইয়া আছে। লোকটা নিম্নশ্রেণীর হিন্দুস্থানী, দেখিলে কোন বাড়ীর চাকর-দ্বারোয়ান বলিয়া বোধ হয়। ফটক দিয়া রণজিৎকে বাহির হইতে দেখিয়াই সে শশব্যস্তে দুই পা সরিয়া আসিল, তারপর হঠাৎ ধূলা-মাখা ফুট্‌পাথের উপরেই ধপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িয়া এম্‌নি নিবিষ্ট ভাবে হাতের তেলোর উপর 'খৈনি' ডলিতে সুরু করিল যেন পৃথিবীতে ঐ একটী মাত্র বস্তুই সে সার বুঝিয়াছে, অপর কাজ কর্ম্ম সমস্তই মায়া। কিন্তু যেই মুহূর্ত্ত রণজিৎ তাহার পাশ কাটাইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল, তৎক্ষণাৎ সে তড়াক্‌ করিয়া লাফাইয়া উঠিল, হাতের খৈনি তাহার ফুট্‌পাথের উপর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল, অতি সন্তর্পণে নিজেকে গোপন রাখিয়া রণজিতের পিছু পিছু সে হাঁটা আরম্ভ করিল।

অতি সন্তর্পণে।

পথ চলিতে চলিতে রণজিৎ দু'একবার পিছনে যে না ফিরিয়াছে এমন নয়, লোকটী তার নজরেও আসিয়াছে, কিন্তু তবুও ঐ তেল-চিট্‌চিটে কোর্ত্তা-পরা ছাতুমার্কা খোট্টা যে কোন উদ্দেশ্য লইয়া তাহার পেছু পেছু আসিতে পারে, এ সম্ভাবনা একবারও তার মনে আসে নাই। ব্যাপার কিন্তু ক্রমে এমনই গড়াইতে আরম্ভ করিল যে সে

সন্দেহও ধীরে ধীরে তার মনে উঁকি দিতে কসুর করিল না—যত বারই সে আড়-চোখে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকায় ততবারই দিব্যি দেখিতে পায় ছায়ার মত লোকটী অনবরত কেবল তাহারই পিছনে পিছনে আসিতেছে। তাহাকেই অনুসরণ করা লোকটার সত্যিকার উদ্দেশ্য কিনা সেইটী পরখ্ করিবার জন্য রণজিৎ কারণে অকারণে নানা গলি-ঘুঁজি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিতে লাগিল, কিন্তু নাঃ, এ সন্দেহ অকাট্য, নিতান্ত বালক ভিন্ন কেহই ইহা অস্বীকার করিবে না যে তাহারই তাকে তাকে লোকটী আসিতেছে। রণজিতের মনে পড়িল হুকা-কাশি বলিয়াছেন চোর ঘড়িওয়ালার নিতান্ত পরিচিত—এ লোকটাকেও তো খানিক আগে ঘড়ির দোকানেরই ঠিক সাম্‌নে ফুট্‌পাথের উপর বসিয়া থাকিতে সে দেখিয়াছে! তাহার আরও মনে পড়িয়া গেল, সে নিজেও তো ঘড়ি-চোরের নিকট আর অপরিচিত নয়, সে যে তাকে আর হুকা-কাশিকে কাল রাত্রে একত্র দেখিয়াছে,—ভূপেশ বাবুর বাড়ীর চুরী সম্বন্ধে গভীর ভাবে আলোচনা করিতে শুনিয়াছে! সে ক্ষেত্রে কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লইয়া চোরের পক্ষে তাহার পিছু লওয়া অসম্ভব তো নয়ই, বরং সেইটাই আরো বেশী মাত্রায় সম্ভব।

সাত-পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে রণজিতের মাথা গরম হইয়া উঠিল, সাম্‌নে দিয়া একখানা বাস্ যাইতেছে দেখিয়া সে এক লাফে তাহাতেই চড়িয়া বসিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই বিস্ময় তার একেবারে চরমে গিয়া উঠিল এই দেখিয়া যে হিন্দুস্থানীটা পিছন হইতে হাত তুলিয়া বাসের কণ্ডাক্টরকে থামিতে বলিতেছে। গাড়ী থামিলে সেই ছাতু-মূর্ত্তি হাঁফাইতে হাঁফাইতে ছুটিয়া আসিয়া এমন একটী জায়গা দেখিয়া বসিয়া পড়িল যেখান হইতে রণজিতের মুখের উপরে পূর্ণ দৃষ্টি সে রাখিতে পারে। তার পর স্বচ্ছন্দচিত্তে সাম্‌নের বেঞ্চিটীতে ঠ্যাং দুটী তুলিয়া দিয়া নিজের মনে ভাঙ্গা গলায় সে কী জুড়িয়া দিল বল দেখি? গান। বোধ হয় উদ্দেশ্যটা এই যে এবার রণজিৎ তাহাকে সত্ত বিহার হইতে আম্‌দানী মনে না করিয়া আর যায় কোথা?

গ্রে-ষ্ট্রীটের মোড়ে রণজিৎ বাস্ হইতে নামিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন একটী গলির রাস্তা ধরিল, কিন্তু পিছন ফিরিয়া যখন সে দেখিল সেই মূর্ত্তি সমানে তার পিছনে লাগিয়াই আছে তখন ধৈর্য্য ধরা তার পক্ষে আর অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। ঠিক

করিল, এস্‌পার ওস্‌পার একটা কিছু এখনই সে করিয়া ফেলিবে, এমন সংশয়ের দোলায় দুলিতে থাকা অসম্ভব। সে যা' মনে করিতেছে বাস্তবিকই এ লোক যদি তাই হয় তবে বাংলা মুলুকের সবল বাহুর স্বাদ কাহাকে বলে সে আজ তাহাকে তা ভাল মতেই বুঝাইবে। শত্রুপক্ষকে একটুও সময় দেওয়া হইবে না ভাবিয়া চলিতে চলিতেই সে মাল্‌কোছাটা মারিয়া লইল। তার পর সিংহ-বিক্রমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াই সে একেবারে থতমত খাইয়া গেল, মনে হইল আলাদীনের আশ্চর্য্য প্রদীপের ক্রিয়া বুঝি তার চ'খের সাম্‌নেই ঘটিয়া গিয়াছে, নতুবা এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে লোক সমানে আসিতেছিল হঠাৎ ভোজ-বাজীর মত সে অদৃশ্য হইয়া গেল কিরূপে? রণজিৎ একটু আগাইয়া এদিক্ ওদিক্ ফিরিয়া দেখিল—হ্যাঁ, সত্যই সে 'ছাতু' অন্তর্হিত হইয়াছে, কোথাও তার টিকিটিরও আর দেখা নাই।

ঘণ্টা দুই পরের কথা, রাত তখন আট্‌টা বাজিয়া গেছে। একে সেটা কৃষ্ণ পক্ষ, তার উপর এই সারা পল্লীটাতেই রাস্তায় আলোর সংখ্যা কিছু কম; কাজেই পাড়া বেশ নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে যে লোকটী ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া প্রত্যেকটী বাড়ী তীক্ষ্নদৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে করিতে আগাইয়া চলিতেছিল, একটু ভাল করিয়া নজর দিলে চিনিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না যে সে সেই হিন্দুস্থানী একটু আগেই যে রণজিৎকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া সট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। চলিতে চলিতে একটা বাড়ীর সাম্‌নে হঠাৎ সে থামিয়া পড়িল; তার পর একটু এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া হাঁক্ ছাড়িল, "এ দেশ্‌ওয়ালী ভাই, দেশ্‌ওয়ালী ভাই হো!"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ঝপ্ করিয়া হুড়্‌কা খোলার আওয়াজ হইল এবং খোলা দরজার পথে বাহির হইয়া আসিল আর একটী হিন্দুস্থানী।

(ক্রমশঃ)

নানা দেশের বাড়ী-ঘর

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

এক এক দেশের লোকের এক এক রকম বাড়ী। আমাদের বাংলা দেশের পাড়াগাঁ'য়ে প্রায় সবই এক ধরণের বাড়ী ;—উপরে খড়ের কিংবা টিনের চাল, নীচে বাঁশের খুঁটার সাথে বাঁধা বাঁশের বেড়া, বড় জোর তার উপর একটা মাটীর আস্তর। ইটের বাড়ীও যে একেবারে নাই তা নয়, তবে সেটার রেওয়াজ পাড়াগাঁ'র চাইতে সহর অঞ্চলেই বেশী।

বাংলা ছাড়াইয়া আর একটু সরিয়া ছোটনাগপুর কিংবা উড়িষ্যায় যাও, দেখিবে সেখানকার অনেক জায়গায় ইটের-বদলে পাথর দিয়া বাড়ী তৈরী করা হইয়াছে। কাঁচা বাড়ীগুলির চেহারাও ঠিক বাংলা দেশের মত নয়, অনেকটা বদ্‌লাইয়া গিয়াছে।

তফাৎটার কারণ আর কিছুই নয়, লোকে সাধারণতঃ হাতের কাছে যে সব মাল মসলা পায় তাহা দিয়াই নিজের দরকারী জিনিষগুলি তৈরী করে ; বাড়ীর বেলায়ও ঠিক সেই নিয়ম খাটিয়াছে। শুধু বংলা আর উড়িষ্যা নয়, পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় এই ব্যবস্থা।

আদ্যিকালের সেই অসভ্য মানুষ যারা বন্য জীবজন্তুর সাথে সমানে পাল্লা দিয়া জীবন কাটাইত, বাড়ী ঘর তৈরী করিয়া লইবার মত বুদ্ধি তখনও তাদের হয় নাই—তারা নাকি থাকিত পাহাড়ের গুহায়। আমাদের দেশেও মুনি-ঋষিরা শেষ বয়সে পাহাড়ের গুহায় গিয়া তপস্যা সুরু করিতেন। গুহা বলিতেই যেন তোমরা নাক সিঁটকাইওনা। অনেক সময় এই সব গুহার গা-খুদিয়া আশ্চর্য্য রকম কারিকুরি করা হইত ; ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ডগিরি উদয়গিরি নামে যে দুইটা পাহাড় আছে তা' বোধ হয় তোমরা অনেকেই দেখিয়াছ। কি চমৎকার তার কাজ! যেন সত্যি সত্যি এক একটা রাজার বাড়ী। আজকাল অবশ্য এ সব গুহায় কেউ থাকে না কিন্তু তাই বলিয়া মানুষ যে গুহায় বাস করা ছাড়িয়া দিয়াছে তা যেন কেউ মনে করিওনা। এসিয়া

মাইনরের কাপাডোসিয়া পাহাড়ের উপর এখনও এই রকম গুহা দিয়া তৈরী একটা আস্ত সহর আছে। উইএর ঢিপির মত পাহাড়ের গায়ে গর্ত্ত খুড়িয়া খুঁড়িয়া অসংখ্য ঘর বাড়ী তৈরী করিয়া লোকে সেখানে নির্ব্বিবাদে দিন কাটাইতেছে।

গাছের ডালে পাখীরাই বাসা বাঁধে বলিয়া আমরা জানি, কিন্তু মানুষও যে গাছের ডালে বাসা বাঁধিয়া দিন কাটায় এ কথা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছে ? —বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। নিউগিনি গেলে কিন্তু দেখিবে আমার কথাটা একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নয়। সেখানকার লোকেরা উঁচু গাছের ডালে দিব্যি বড় বড় বাড়ী তৈরী করিয়াছে। সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিতে হইলে আগে লম্বা মই যোগাড় করিতে হয়।

নিউগিনি দেশের গেছো বাড়ী।

আফ্রিকায় যদি একবার যাইতে পার তবে আরও কত মজার মজার বাড়ী যে চোখে পড়িবে তার আর কি বলিব! সেখানকার জুলুদের নাম বোধ হয় শুনিয়াছ। তারা কি রকম বাড়ীতে থাকে জান কি ? আমরা যেমন বেত দিয়া ধামা বুনি তারাও ঠিক তেমনি বেত দিয়া বাড়ী বোনে, তারপর সেই ধামার মত বাড়ীতে ছোট্ট ছোট্ট দরজা বসাইয়া তার মধ্যে আরামে দিন কাটায়। এই সব বাড়ী বেশ মজবুত হয়, আর দেখিতেও অনেকটা হয় ধামার মত।

সে দেশে বেচুয়ানা নামে আর এক জাতের কাফ্রী থাকে, তাদের বাড়ীটা

দেখিতে আরও অদ্ভুত। দূর হইতে সে বাড়ী দেখিলে মনে হইবে যেন কেউ একটা প্রকাণ্ড ছাতা খুলিয়া উপুড় করিয়া বসাইয়া রাখিয়াছে। মায় ছাতার ডাঁটের যে অংশটুকু উপরে চূড়ার মত দেখা যায় সেটুকু পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

জলের উপর বাসা বাঁধিতেও মানুষ বাকী রাখে নাই। জলের মধ্যে মাচা বাঁধিয়া তার উপর ঘর বানানো—এ ত অনেক দেশেই আছে। চীন দেশের অনেকে সারা জীবন জলের উপরেই নৌকার মধ্যে কাটাইয়া দেয়। সে দেশে লোক খুব বেশী—এত বেশী যে ডাঙ্গায় সকলের জায়গা সংকুলান হয় না, জলে গিয়া থাকিতে হয়।

নৌকার মধ্যে বাড়ী-ঘরের রেওয়াজ আমাদের ভারতবর্ষেও আছে। কিছুদিন আগে একবার আমরা কাশ্মীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানকার অনেক লোক জলে বাস করে। যারা সে দেশে বেড়াইতে যায় তারাও জলের উপর নৌকা-বাড়ীর মধ্যে থাকে। সেগুলিকে বলে 'হাউস-বোট্'। এর কোন কোনটা বেশ প্রকাণ্ড বড় হয় আর সাজানও থাকে সাহেবী কায়দায়। তার মধ্যে ৭।৮ খানা ঘর, বাথ রুম, রান্না ঘর, বেড়াইবার জায়গা, বারান্দা সবই থাকে। এমন কি ইলেকট্রিক আলোও পাওয়া যায়। দরকার হইলে দাঁড় টানিয়া সে বাড়ী যেখানে খুসী লইয়া যাওয়া চলে।

কাশ্মীরের নৌকা-বাড়ী (হাউস্‌বোট্)।

কাপড়ের বাড়ী তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। আমি তাঁবুর কথা বলিতেছি। অল্প কয়েক দিনের জন্য কোথাও থাকিতে হইলে, বিশেষতঃ সেখানে সুবিধা মত বাড়ী না থাকিলে তাঁবু খাটাইয়া থাকা বেশ সুবিধা-জনক। পৃথিবীতে এমন জাতও আছে

যারা সারা জীবন এমনি ধারা তাঁবুর মধ্যে কাটাইয়া দেয়। তাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাড়ী ঘর থাকে না। আজ এখানে, কাল এখানে এমনি ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে দিনের পর দিন সারা জীবনটা কাটিয়া যায়।

উত্তর মেরুর এস্কিমোদের কথা তোমরা বোধ হয় সকলেই জান। সেই বরফের দেশ—যেখানে মাসের পর মাস ধরিয়া ক্রমাগত রাত্রি চলিতে থাকে। সেখানে ইটও পাওয়া যায় না, গাছের ডালও পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু রাশি রাশি বরফ। এস্কিমোরা কিন্তু তাতে মোটেই ঘাবড়াইবার পাত্র নয়। সেই বরফ দিয়াই তারা তাদের বাড়ী তৈরী করিয়া লয়। বরফের ঘর অবশ্য শীতের পক্ষে বিশেষ গরম হইবার কথা নয়, কিন্তু বাহিরের শীতের তুলনায় সেই বরফের ঘরই নাকি তাদের কাছে স্বর্গ।

আজকালকার আমেরিকার বাড়ী।

আজকালকার বাড়ীর কথা বলিতে গেলে সকলের আগে নাম করিতে হয় আমেরিকার। বাড়ী তো নয় যেন এক একটি সহর। এক একটা বাড়ী ৫০।৬০ তালা

ছাড়াইয়া যায়। রাস্তা, ঘাট, দোকান, আপিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, থিয়েটার, বায়স্কোপ, খেলিবার জায়গা অনেক সময় এই সমস্তই এক বাড়ীর মধ্যে থাকে। হাজার হাজার লোক সে বাড়ীতে বাস করে। মানুষের সুখ সুবিধার জন্য যা কিছু এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার করা হইয়াছে তার সবেরই বন্দোবস্ত সে বাড়ীতে থাকে।

মজার মজার বাড়ীও সেখানে কত রকম তৈরী হইতেছে তার আর কি হিসাব দিব! মোটর গাড়ীতে চড়িয়া ত দিব্যি বেড়াইতে যাও কিন্তু মোটর-বাড়ীর মধ্যে কোন দিন গিয়াছ কি? আমেরিকার কোন কোন জায়গায় আজকাল এগুলির চলন সুরু হইয়াছে। সে মোটরের মধ্যে শোবার, খাবার, রান্নার সমস্ত বন্দোবস্ত থাকে। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাব, সৌখিন জিনিষপত্র, মায় বইএর আলমারি কিছুই বাদ যায় না। আর সুবিধা এই, বাড়ীতে বসিয়াই যেখানে খুসী যাওয়া চলে—গাড়ীর দরকার হয় না।

কিন্তু ইহাতেও লোকের মন উঠে নাই। সেদিন কাগজে পড়িলাম এক ভদ্রলোক এয়ারোপ্লেনের মধ্যে তাঁর থাকিবার বাড়ী বানাইবার মতলব সুরু করিয়াছেন, তার জন্য বিশেষ ভাবে তৈরী আবশ্যকীয় আসবাব পত্রেরও ফরমাস দিয়াছেন। তাঁর ইচ্ছা সে বাড়ী তৈরী হইলে তিনি আকাশে আকাশেই বাকী দিন কয়টা কাটাইয়া যাইবেন।

ঢুঢুরিয়া-কাহিনী

(শ্রীমাঠবা)

ছাগল লাল ঢুঢুরিয়ার নাম তোমরা শুনিয়াছ কি? ওকি, নাম শুনিয়াই একেবারে ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলে যে! তা হাস, তোমাদের মনে একটু আহ্লাদ হইয়াছে তাইতো হাসিতেছ, আমি কেন তাহাতে বাধা দিতে যাইব? তবে একটা কথা বলিয়া রাখি, লোকটা কেমন করিত-কর্ম্মা তা জানিলে কিন্তু অতটা তাচ্ছিল্যের হাসি তোমরা হাসিতে না।

গাঁয়ের যারা বুড়া লোক তারা বলিত এই ছাগললাল যখন প্রথম তার মুলুক

হইতে এদেশে আসে তখন সম্বলের মধ্যে তার ছিল লোটা আর কম্বল। দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও বোধ হয় তখন তার জুটিত না, তাই পিঠের চামড়া আর পেটের চামড়া ঠেকিয়া এক হইয়া গিয়াছিল; কথা বলিবার সময় গলা দিয়া চিঁ চিঁ আওয়াজ বাহির হইত। আর ক' বছর যাইতে না যাইতেই কি সাংঘাতিক ব্যাপার বলতো—ব্যব্সা ফাঁদিয়া একেবারে যারে বলে লাল! এখন পেটের চামড়ায় আর পিঠের চামড়ায় ফারাক্ দেড় হাতের উপর; আর কথা বলে কি? গাঁক্ গাঁক্!

লোকে বলিত ছাগল লাল ঢুঢুরিয়ার ভারী বুদ্ধি, এক টিপিতে কার পেটে কি আছে অনায়াসে সে তা বলিয়া দিতে পারে। কথাটা কে কতখানি মানিত বলা শক্ত, তবে ছাগল লালের নিজের পুত্র বগল লাল ঢুঢুরিয়ার মুখ দেখিয়া মনে হইত কথাটাতে সে তেমন বড় বিশ্বাস করে না। তার ধারণা ছিল ভগবান্ মানুষ সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিটাকে মগজে পূরিবার সময় আন্মনে কারো মগজে সে জিনিষটা যদি একটু বেশী পরিমাণে দিয়া থাকেন তো তা তাহারই মগজে! দুনিয়ার সমস্ত লোককে সে যদি কিছু কিছু বুদ্ধি ধারও দিতে সুরু করে তবুও তার সে বস্তুটীর কিছুমাত্র কম্‌তি হইবে না—বিশাল সমুদ্র হইতে দু-পাঁচ ঘটি জল তুলিয়া লইলে সমুদ্রের তাতে কী আসিয়া যায় বল!

ছাগল লালের সহিত বগল লালের প্রায়ই ঠোক্কর লাগিত পদম্ রাজ নামে এক যুবককে লইয়া। সে ছিল বগল লালের প্রাণের বন্ধু। বন্ধুতো বন্ধু, তার নজর ছিল সর্ব্বদা কিভাবে বগল লালের মাথায় সে একটু ভাল করিয়া হাত বুলাইবে। হাত বুলাইতও প্রচুর, সোণাটা দানাটা সর্ব্বদাই বগল লালকে ফাঁকি দিয়া সে ট্যাঁকে গুঁজিত। কিন্তু অত বড় বুদ্ধি-ওয়ালা মগজের অধিকারী বগল লাল তার বিন্দু-বিসর্গ কিছুই টের পাইত না। টের কিন্তু আস্‌লে যে পাইত সে হইতেছে ছাগল লাল, তার চো'খে ধূলা দেওয়ার ক্ষমতা পদম্‌রাজ তো দূরের কথা পদম্‌রাজের ঠাকুরদাদারও ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেকথা বগল লালকে বুঝায় কে? এই তো সেদিন ছেলেকে এক্‌লাটী নিরিবিলিতে পাইয়া ছাগল লাল একবার কহিয়াছিল "ছাখ্, বগল, ও ছোঁড়াটাকে অমন আস্কারা দিস্ নে, ওর মত অত বড় জোচ্চোর এই সারা গাঁয়ে আর দ্বিতীয়টী নেই; মুখে ও যতই ভাল-মান্‌ষী কথা-বার্ত্তা বলুক না কেন, ওর আসল

মৎলব আমার আর জানতে বাকী নেই, ও আছে কি করে তোর [illegible] সর্ব্বস্ব লুটুবে!"

একথায় বগললাল দারুণ চটিয়াছিল, বলিয়াছিল, "কী যে তুমি বল বাবা, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা নেই। পদম্‌রাজের মত সাধু পুরুষ সারা গাঁ খুঁজ্‌লে আর দ্বিতীয়টী পাবে নাকি? কোম্পানীর বাগান থেকে রোজ যে সে ফল পেড়ে আনে, সেখানে পর্য্যন্ত ফি রোজ জঙ্গলে গাছের গোড়াতে তিন্‌টে করে পয়সা ও রেখে আসে। জানে কিনা যে সে গাছটাতো আর ওর নিজের সম্পত্তি নয়! হোলই বা পোড়ো গাছ, বিনে পয়সায় ফল নেবার ওর অধিকার কি? এমন যে সাধু, তাকে কিনা তুমি বল জোচ্চোর! ছা—"

সেবার গুজ্‌রাট্ হইতে খবর আসিল, ব্যবসার দরুণ কি একটা কাজে ছাগল লালের একবার সেখানে যাওয়া নিতান্ত দরকার—গেলে অনেক টাকা লাভের সম্ভাবনা, আবার না গেলেও তেম্‌নি বিস্তর লোকসান হইবার কথা। বগল লালকেও সঙ্গে লইতে হইবে। ছাগল লাল তো ভাবিয়াই অস্থির। গাঁয়ে আজকাল যেমন চোর-ডাকাতের বাড়াবাড়ি সুরু হইয়াছে এমন অবস্থায় তার ধনদৌলৎ রাখিয়া যায় কোথায়? যার তার জিম্মায় তো আর রাখিয়া যাওয়া চলে না, তা গেলে কি আর ফিরিয়া আসিয়া কাণাকড়িটিও সে চোখে দেখিতে পাইবে? ভাব্‌নার কথাতো বটেই।

বাপের দুর্ভাবনার কথা ক্রমে বগল লালের কাণে গেল, সে বলিল "তা এতে এমন ভাব্‌নার কারণটা কি হোল বাবা, তাতো আমি বুঝেই উঠ্‌তে পার্‌ছি না। গাঁয়ে পদম্‌রাজ অমন সাঁচ্চা লোকটা রয়েছে, তারই কাছে সব রেখে যাও; তোমার জিনিষ যেমনটী রয়েছে, ঠিক্ তেম্‌নিটীই থাক্‌বে, এক চুলও তার নড়-চড় হবে না!"

ছাগল লাল ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া সামান্য একটু চিন্তা করিল, তারপর বলিল, "আচ্ছা তাই হবে, তোমার মত অনুযায়ীই কাজ হবে। হাজার হোক্, তুমি এখন বড়-সড় হয়েছ, বুদ্ধি-সুদ্ধিও পেকেছে, তোমার পরামর্শ নিয়ে কাজকর্ম্ম করা আমার উচিতই তো!"

খানিকটা বাদে সে খুব শক্ত মজ্‌বুৎ একটা বাক্স বগল লালের হাতে আনিয়া

দিল, কহিল, "ধন-দৌলৎ সব ভাল করে এরই ভেতর আট্‌কে রাখা হ'ল, এবারে যাও, তোমার বন্ধু পদম্‌রাজের জিম্মায় এটাকে রেখে এস। খুব যত্ন করে রাখ্‌তে বল, যেন কোন মতে খোয়া না যায়। পরে গুজরাট্ থেকে ফিরে এসে এটাকে তার কাছ হ'তে আনিয়ে নিলেই চল্‌বে।"

সেদিনই সন্ধ্যার পর ছাগল লাল ও বগল লাল একত্রে গুজরাট্ রওয়ানা হইয়া গেল।

গুজরাট্ হইতে ফিরিল তাহারা প্রায় মাস দুই পরে। তখন তাদের ভারী আনন্দ, ব্যবসায় প্রচুর লাভ হইয়াছে, কোঁচড় ভরিয়া তারা টাকা লুটিয়া আনিয়াছে। বগল লাল গাঁয়ের লোকেদের কাছে এম্‌নি ভাব দেখাইতে লাগিল যে ব্যবসায় লাভ হইয়াছে আগাগোড়া তাহারই বুদ্ধির ফলে। তার বাপ কেবল উপলক্ষ্য, সঙ্গে ছিল মাত্র।

বাড়ী ফিরিবার পর দিন প্রাতে ছাগল লাল বগল লালকে ডাকিয়া বলিল, "যাও এবার, পদম্‌রাজের কাছ থেকে টাকার বাক্সটা ফিরিয়ে আন গে। আমরা এসে পড়েছি, এখন আর সেটা তার কাছে ফেলে রেখে লাভ কি?"

আধঘণ্টাটেক বাদে বগল লাল যখন ফিরিয়া আসিল, তখন রাগে তার মুখ সিঁদূরের মত রাঙ্গা হইয়া গেছে। বাপকে কাছে পাইয়াই সে বলিয়া উঠিল, "এ তোমার কেমন ধারা ব্যবহার বাবা, কেন তুমি খাম্‌কা আমার বন্ধু পদম্‌রাজকে অপমান করলে?..." সব কথাগুলি খুলিয়া সে বলিতে পর্য্যন্ত পারিল না, রাগে কেবল ফোঁস্ ফোঁস্ করিতে লাগিল।

ছাগল লাল বলিল, "অপমান? অপমান আবার কর্‌লাম কখন?"

বগল লাল উত্তর দিল, "তা বই আর কি? তার কাছে যেতেই সে বল্লে, 'তোমার বাবা বলে পাঠালেন বাক্সের ভেতর ধন-দৌলৎ পূরে আমার জিম্মায় তা রেখে যাচ্ছেন, অথচ আসলে বাক্সে তিনি ধন-দৌলৎ আদবেই রাখেন নি, রেখেছেন কতগুলো ভাঙ্গা পাথরের কুঁচি।' এটা তাকে দস্তুর মত অপমান করা হ'ল না?"

ছাগল লাল বলিল, "আরে রাখ রাখ, আস্তে, অত হড়্‌বড়্ ক'রনা; ব্যাপারটা ভাল করে বুঝ্‌তে দাও। তুমি যা বল্‌ছ তাতে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, আমার সেই

মজ্‌বুৎ বাক্সটাতে আমি যে তিনটে দামী দামী শক্ত তালা লাগিয়েছিলাম, আমরা চলে যাওয়ার পর আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞানাতে, গোপনে তোমার পদমরাজ সেগুলো ভেঙ্গে বাক্সটী খুলেছে। এর পরেও কি তুমি বল্‌তে চাও যে বাক্সটাতে সত্যিকার টাকা না রেখে পাথরকুঁচি রেখে আমি ভাল করিনি? এ হেন লোকের কাছে সত্যিকার টাকা রাখ্‌লে একটী পয়সাও তুমি তার ফিরে পেতে?"

বাপের প্রশ্নের জবাবে বগল লাল একটী কথাও বলিতে পারিল না, তার প্রকাণ্ড মগজ-ওয়ালা মাথাটা ধীরে ধীরে নুইয়া পড়িল।

তারপর হইতে বগল লাল লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইত, "বাবার বুদ্ধির ধারে পাশেও আমরা দাঁড়াতে পারি না! আমাদের মত ম্যাড়াকে তিনি এক হাটে কিনে আর এক হাটে বেচে আস্‌তে পারেন।"

গুব্‌রে-গঙ্গা সংবাদ

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

গুব্‌রে পোকাটি ডাকে,
গঙ্গা ফড়িংটাকে,—
"ওরে দাদা তুই, লংজাম্প্‌ ক'রে
হারালি রে কাকে কাকে?

লিক্‌ লিকে ঠ্যাং হ্যাঁরে,
মচ্‌কিয়ে যায় না রে?
কত জোর আছে ও গুলোর মাঝে
বড় সাধ দেখিবারে!

আমিতো গুব্‌রে পোকা,
লোকে বলে হাঁদা, বোকা
তুই ভাই বড় "খেলোয়াড়" হলি
বল্‌ছিল মোর খোকা।"

গঙ্গা ফড়িং হেসে
গোঁফে চাড়া দিয়ে শেষে
বলে, "মোরে 'রেসে' হারাবারে পারে
হেন কেহ নেই দেশে।"

"সেদিন স্পোর্টসে লোকে
দেখে গেল নিজ চোখে
ভেল্কীবাজীর ঘটাময় দানে
বল্‌বো কি আর তোকে।

আরশুলা গেল হেরে,
উই চিংড়েও যে রে,—
প্রজাপতিটার ঘাড় হেঁট হ'ল
হেসে আর বাঁচি নে রে!"

গুব্‌রে বলিল, "দাদা—
বলি এক কথা সাদা,
যদি মোরা দু'য়ে 'রেশ্‌' দিই আজ—
আছে কি তোমার বাধা?"

গঙ্গা বলিল "না—না
তাহাতে নাহিক মানা—
তবে এক কথা হেরে যাবি ভাই—
এতো আছে মোর জানা।

"মিছে হবি হয়রাণ
হয়তো খোয়াবি প্রাণ
হেরে গেলে লোকে করতালি দেবে
তা'তে কি বাড়িবে মান?"

মরিয়া গুব্‌রে পোকা—
একগুঁয়ে, এক রোখা
বলে, "ওরে-তাহে নাহি দুখী আমি
দিস্‌নে মিথ্যে ধোঁকা!"

'রেস্' হ'য়ে গেল সুরু
বুক কাঁপে দুরু দুরু
কে হারে কে জেতে, কে বলিতে পারে—
কেবা হয় কার গুরু!

কে বলে গুব্‌রে বোকা?
দেখেছ কি এক রোখা—
পন্‌ পন্‌ করে ছোটে যেন ঠিক—
পক্ষি-রাজের খোকা!

গেলরে ফড়িং বুঝি
লাফায় চক্ষু বুজি'
ওরে ও গঙ্গা, হেরে গেলি শেষে—
এত করে হায় যুঝি'।

গুব্‌রে তুলিয়া ঠ্যাং
নাচে ড্যাং ড্যাং ড্যাং
গঙ্গা ফড়িং হেঁট মুখে ভাবে—
নিজেরে করিবে হ্যাঙ্গ্।

পিস্তলের গুলি

(শ্রীসুবিনয় রায়)

বল্‌বন্ত সিং ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়্‌ত। তার বাড়ী পাঞ্জাবে; বেশ সুপুরুষ চেহারা; লম্বায় তখনই সাড়ে পাঁচ ফুট ছিল। তারপর আর তার সঙ্গে বহু দিন দেখা হয়নি,—প্রায় ১৫।১৬ বছর কেটে গেছে। দু'জনে খুবই বন্ধুতা ছিল বটে; কিন্তু তার ঠিকানা আমার জানা না থাকায় আর আমার ঠিকানাও তার জানা না থাকায় দু'জনে চিঠি লেখালেখিও চলেনি।

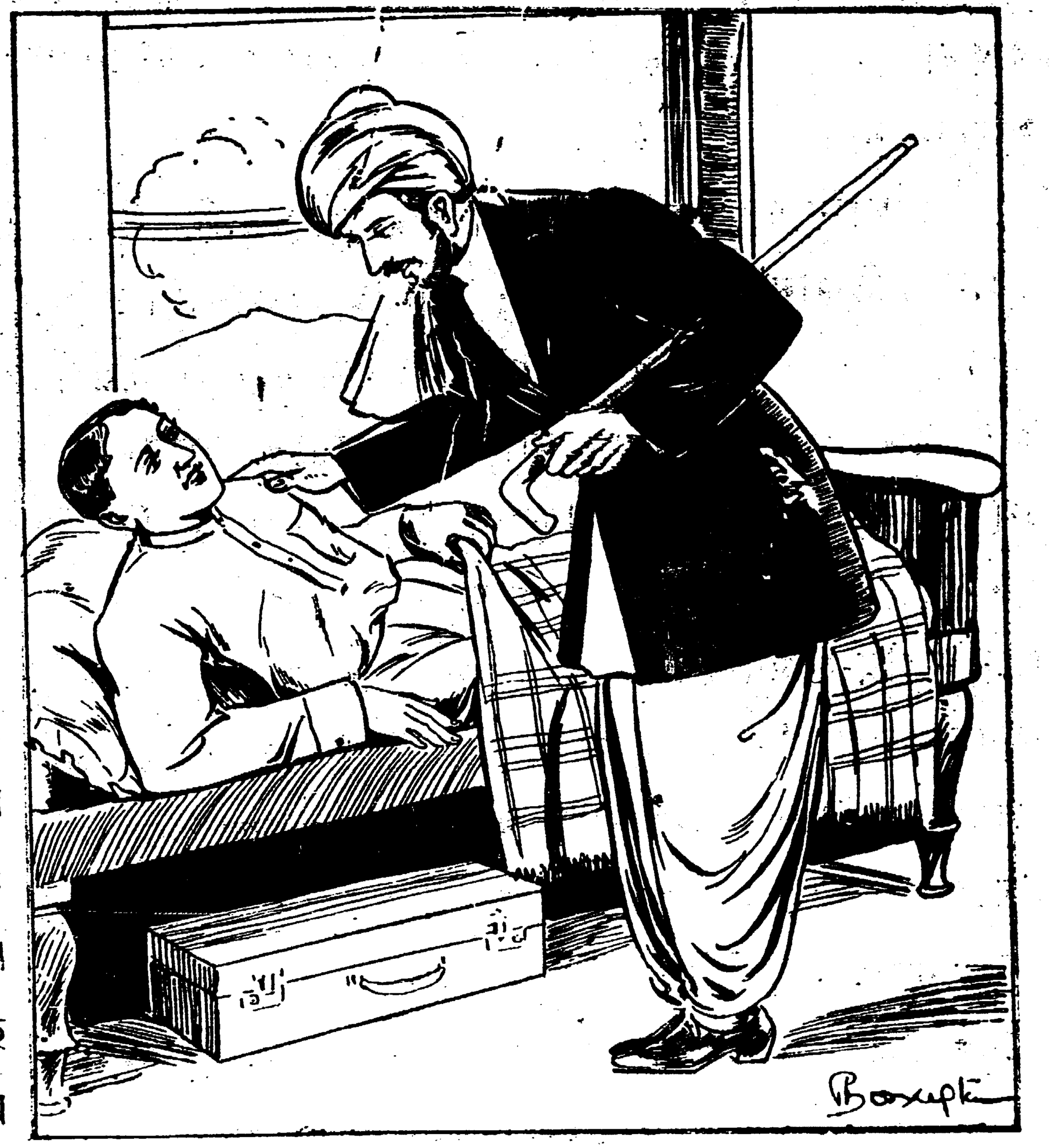

কাঁধে হাত দিল।

সেবার পূজোর ছুটিতে পাঞ্জাব বেড়াতে যাই। লাহোরে আমার বিশেষ বন্ধু বিজয় ঘোষ ওকালতী করে; তারই বাড়ীতে ওঠা স্থির হয়। লম্বা রাস্তা, যেন আর ফুরোয়ই না; ঠাণ্ডাও বেশী পড়েনি তখনও। ট্রেণ তখন লাহোরের কাছাকাছি এসেছে; আমি ক্লান্ত হয়ে একটু ঝিমাচ্ছি। হঠাৎ দরজা খুলে একটি লোক কামরায় ঢুকে পড়্‌ল আর সাম্‌নে আমাকে দেখে "আরে!" ব'লে আমার কাঁধে হাত দিল। চম্‌কে চেয়ে দেখি বল্‌বন্ত সিং আমার সাম্‌নে।

তখনই আমি সরে গিয়ে বল্‌বন্ত সিংকে পাশে বসালাম আর সঙ্গে সঙ্গে কুশল-

প্রশ্ন ইত্যাদি চল্‌তে লাগ্‌ল। বল্‌বন্ত বল্‌ল, "আমি স্কুল ছেড়ে পাঞ্জাবে চ'লে আসি; এখানের ইউনিভার্সিটিতে আই-এস্‌-সি পাশ ক'রে কৃষি-বিদ্যা শিখ্‌বার জন্য এগ্রিকাল্‌চারাল কলেজে ভর্ত্তি হই। সেখান থেকে পাশ ক'রে কিছুদিন সরকারী চাকরী করি। সম্প্রতি সে চাকরী ছেড়ে নিজে চাষবাস করার মতলব কর্‌ছি। চার বছর হ'লো আমার বাবা মারা গেছেন, তাঁর সব সম্পত্তির অধিকারী আমিই। লাহোর থেকে ২০০ মাইল দূরে কিষণপুরে আমার দু'হাজার বিঘে জমি আছে; সেখানেই আমি থাক্‌ব স্থির করেছি। জায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর; সেখানকার দৃশ্যও বড় চমৎকার। অসুবিধার মধ্যে, ৫০ মাইল গরুর গাড়ীতে যেতে হয়; তবে, আমি ঘোড়ার টঙ্গার ব্যবস্থা কর্‌ছি। তোমাকে ভাই একবার আমার ওখানে যেতেই হবে; কিছুতে ছাড়্‌ছি না।"

আমি বল্‌লাম, "বন্ধু বিজয় বাবু যদি নিতান্ত নারাজ না হন্‌, নিশ্চয়ই যাব। তোমার ঠিকানাটা দাও ভাই; আমার ঠিকানাটাও লিখে রাখ।"

কথা বল্‌তে বল্‌তে ট্রেণ লাহোরে পৌঁছিয়ে গেল। ষ্টেশনে বিজয় এসেছিল; তার সঙ্গে বল্‌বন্ত সিংএর আলাপ করিয়ে দিলাম। বিজয় অনেক পীড়াপীড়ি কর্‌ল বল্‌বন্তকে, তার বাড়ীতে থাক্‌বার জন্য; বল্‌বন্ত কিছুতে রাজী হ'লো না; সে সরাই-খানাতে গিয়ে উঠ্‌ল। সেখান থেকে রোজই সে আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আসে; অনেক গল্প-গুজব হয়। তিনদিন পর যখন আমার লাহোর দেখা শেষ হ'লো, তখন বল্‌বন্ত বল্‌ল, "এবার আমার ওখানে যেতে হচ্ছে ভাই। বিজয় বাবুকে নিয়ে কাল দুপুরের গাড়ীতে রওয়ানা হয়ে হার্‌বন্‌ওয়ালা ষ্টেশনে পৌঁছাব। রাত্রে ওয়েটিং রুমে ঘুমিয়ে ভোর বেলা রওয়ানা হ'য়ে ১১টার মধ্যে কিষণপুর পৌঁছাব। আমিও অনেক দিন সেখানে যাইনি। কাল সেখানকার জমাদারের চিঠি পেলাম; আমাকে চিঠি পেয়েই যেতে লিখেছে। ঘোড়ার টঙ্গার বন্দোবস্ত হার্‌বন্‌ওয়ালায় করা হয়েছে।"

পরদিন খাওয়া দাওয়ার পর আমি, বিজয় আর বল্‌বন্ত ১২টার ট্রেণে রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম। সন্ধ্যার সময় হার্‌বন্‌ওয়ালায় পৌঁছে ষ্টেশনের ওয়েটিং রুমে রাত্তিরটা কাটালাম।

ভোর বেলা উঠে, চা খেয়ে, আমরা ঘোড়ার টঙ্গায় রওয়ানা হয়ে পড়্‌লাম।

রাস্তা বেশ পরিষ্কার, ধূলো-বালি নাই বেশী। জঙ্গল মাঝে মাঝে রয়েছে, ছোট পাহাড়ও বিস্তর আছে। পথে এক জায়গায় ঘোড়া বদল হ'লো; সেখান থেকে কিষণপুর ২৫ মাইল। বেলা ১০½টায় আমরা বল্‌বন্তের সম্পত্তির দরজায় পৌঁছালাম।

গাড়ী থেকে নেমে যা' দেখ্‌লাম তা'তে আমার মনে বড়ই আনন্দ হ'লো। চারিদিক্‌ সুন্দর গাছপালায় সবুজ হয়ে আছে; পিছনে দূরে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট নদীও বয়ে যাচ্ছে। বাগানের মাঝে একটি ছোট্ট বাংলো-ধরণের বাড়ী। উঁচু থামের উপর তিনটি কাঠের ঘর, তার চারিদিকে বারান্দা; কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সেই বারান্দায় উঠে ঘরে ঢুক্‌তে হয়। ঘরের উপরে লাল টালির ছাত, ঘরের রং সবুজ। দূর থেকে সুন্দর ছবির মত দেখায়।

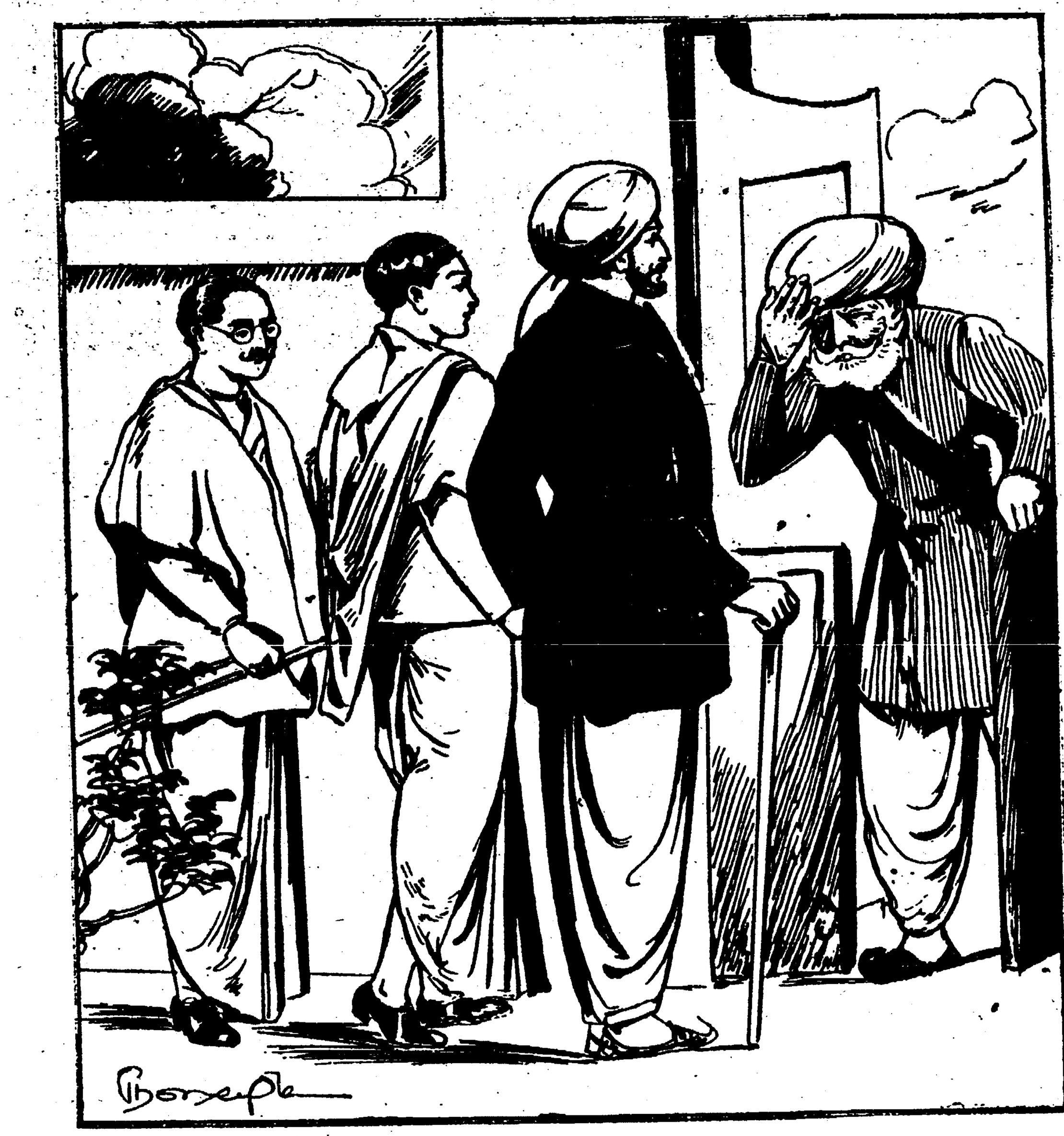
সকলকে সেলাম কর্‌ল।

আমরা পৌঁছাবামাত্র বল্‌বন্তের জমাদার বুড়ো নিরঞ্জন সিং দৌড়ে এসে সকলকে সেলাম কর্‌ল। তার বয়স প্রায় ৭০ বছর, কিন্তু শরীর খুব সবল আছে। লম্বায় প্রায় সাড়ে চার হাত; ধব্‌ধবে সাদা দাড়ি-গোঁফ। মুখে কিন্তু তার ভয়ের চিহ্ন। আমাদের বারান্দায় বস্‌বার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে সে খাবার আন্‌তে গেল।

খেতে ব'সে আমরা নিরঞ্জনের কাছে যে ঘটনা শুন্‌লাম তা'তে আমাদের মন অনেকটা দমে গেল। সে বল্‌ল যে কিষণপুরের ঐ বাগানে নাকি অনেকদিন থেকে

ভূতের বাস। সে প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করেনি, এবং প্রথমে কিছুদিন ভূতের নাম-গন্ধও ছিল না। শেষে শুন্‌তে পেল যে, ভূত নাকি শরৎকালে চাঁদ্‌নী-রাতে দেখা দেয়। প্রথমে সে হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু তিনদিন আগে যা' সে নিজের চোখে দেখেছে তাতে ভূতকে আর অবিশ্বাস করা চল্‌তে পারে না।

তিনদিন আগে সন্ধ্যার পর সে দক্ষিণের বারান্দার উপর বসেছিল। সেদিন শুক্লপক্ষের একাদশী; সুন্দর জ্যোৎস্না হয়েছে। কতক্ষণ বসেছিল তার মনে নাই। বাগানের মালী শার্দ্দূল সিং সঙ্গে ছিল। দু'জনে গল্প কর্‌তে কর্‌তে সবেমাত্র একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর্‌ছে, এমন সময় হঠাৎ মনে হ'লো যেন সোঁ সোঁ শব্দে ঝড় উঠেছে। চম্‌কে সাম্‌নে চাওয়া মাত্র দেখ্‌তে পেল প্রকাণ্ড একটা সাদা মূর্ত্তি উর্দ্ধশ্বাসে তাদের দিকে ছুটে আস্‌ছে। দু'জনেই উঠে ঘরে পালাবার চেষ্টা কর্‌ল, কিন্তু একটু দূরে গিয়েই মাথা ঘুরে প'ড়ে গেল। তারপর কি হ'লো মনে নাই। অনেকক্ষণ পরে যখন তাদের চেতনা হ'লো তখন দেখ্‌ল যে ভোর হয়ে গেছে, আর তারা দু'জনেই ঘরের দরজার সাম্‌নে পড়ে আছে। সেদিন থেকে ভয়ে তারা রাত্রে ঘরের ভিতর শোয়, কিন্তু ভূত আর সেদিন থেকে আসেনি। এর আগেও নাকি একটি লোক ঐ দক্ষিণের বারান্দা থেকে শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না রাতে ঠিক ঐ রকমের ভূত দেখ্‌তে পেয়েছিল। নিরঞ্জন সিং সাহসের জন্য বিখ্যাত; লড়াইয়ে সে অনেক মেডেলও পেয়েছে। কিন্তু, সেদিনের ভূত তা'কে ভয়ে একেবারে কাবু ক'রে ফেলেছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা বাগানে বেড়াতে গেলাম আর পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল রাত্রে কি করা যায়। বল্‌বন্ত্‌ ভূতে বিশ্বাস মেটেই কর্‌ত না; আমি আর বিজয়ও অনেকটা সাহসী ছিলাম; কাজেই ভূতের ভয়ে আমরা পিছ্‌-পা হ'লাম না। পরামর্শ ক'রে ঠিক কর্‌লাম সেই রাত্রেই (সেদিন পূর্ণিমা) আমরা তিন জনেই দক্ষিণের বারান্দায় শুয়ে থাক্‌ব; বল্‌বন্তের হাতে পিস্তল থাক্‌বে; আমার কাছে বন্দুক থাক্‌বে। ভূত দেখ্‌লেই তা'কে গুলি কর্‌ব।

গল্প-গুজব, বেড়ান, চা খাওয়া, রাত্রের খাওয়া ইত্যাদি সার্‌তে রাত ৮টা বাজ্‌ল। ততক্ষণে দক্ষিণের বারান্দায় আমাদের বস্‌বার জন্য গালিচা আর তাকিয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেছে; আমরাও খাওয়া দাওয়া সেরে দিব্য আরামে তাকিয়া ঠেস্‌ দিয়ে গল্প-গাছা

কর্‌তে লাগ্‌লাম, আর মাঝে মাঝে দক্ষিণের পাহাড়ের দিকে আর গাছপালার দিকে নজর দিতে লাগ্‌লাম। চমৎকার জ্যোৎস্না, দিব্য ফুর্‌ফুরে বাতাস, সুন্দর ফুলের গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছে, তার উপর পথের ক্লান্তি—কাজেই ঘুম আর কতক্ষণ আট্‌কা থাকে? ক্রমেই আমাদের তন্দ্রা বোধ হ'তে লাগ্‌ল। বল্‌বন্ত্‌ সিং কিন্তু তখনও সজাগ।

কিছুক্ষণ বাদে বিজয় আর আমি একরকম ঘুমিয়েই পড়্‌লাম; বল্‌বন্তও ঝিমাতে লাগ্‌ল;—হঠাৎ ঝড়ের মত সোঁ সোঁ আওয়াজ হ'লো আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পেলাম দক্ষিণ দিক্‌ থেকে প্রকাণ্ড একটা সাদা মূর্ত্তি শূন্যপথে উর্দ্ধশ্বাসে আমাদের দিকে চলে আস্‌ছে। আমি বন্দুক উঠাতে চেষ্টা কর্‌লাম; হাত কেঁপে বন্দুক প'ড়ে গেল। বল্‌বন্ত্‌ দুড়ুম ক'রে পিস্তল ছাড়্‌ল, কিন্তু মূর্ত্তির কিছুই হ'লো না। আমরা তিনজনেই উঠে ঘরের দিকে ছুট্‌তে চাইলাম কিন্তু মাথা ঘুরে তিনজনেই প'ড়ে গেলাম।

যখন চেতনা হ'লো তখন দেখ্‌লাম ভোর হয়ে এসেছে। মাথা তখনও যেন ঘুর্‌ছে। আগের রাতের ঘটনা সব স্বপ্নের মত মনে হ'তে লাগ্‌ল।

সকালে চা খেয়ে আমরা তিনজনে আগের রাতের ঘটনার বিষয় আলোচনা কর্‌তে বস্‌লাম। মূর্ত্তিটা যে কি রকম ছিল তা' স্পষ্টভাবে কা'রো মনে নাই;—শুধু আব্‌ছায়া গোছের মনে আছে। ঝড়ের শব্দটা তিনজনে এক সঙ্গে শুনেছি কি না তা'ও ঠিক বোঝা গেল না; তবে মোটামুটি এই বোঝা গেল যে, প্রথমে তিনজনেরই মাথা ঘুরেছিল, তার পর তন্দ্রার ভাব এসেছিল, তা'র কিছুক্ষণ পরে ঝড়ের শব্দ শোনা গেছিল।

সেদিন রাত্রে কি করা হবে সে বিষয়ে আমরা ঠিক ক'রে নিলাম। বল্‌বন্ত বল্‌ল, সে দক্ষিণের বারান্দায়ই থাক্‌বে; আমি থাক্‌ব পশ্চিমের বারান্দায়, বিজয় থাক্‌বে দক্ষিণের ঘরে। প্রত্যেকের হাতেই পিস্তল থাক্‌বে; মূর্ত্তি দেখা দিলেই 'ঐ-ঐ' ব'লে প্রত্যেকে অন্যদের জানিয়ে দেবে। ঝড়ের শব্দ শোনা গেলেও জানাবে।

সারাদিন ঘোরাঘুরি, গল্প-গুজব ক'রে কাটিয়ে রাত্রে আমরা কথা-মত যে যার

জায়গায় বস্‌লাম আর কথাবার্ত্তা চল্‌তে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ বাদে বল্‌বন্ত ঝিমাতে লাগ্‌ল; বিজয় আর আমি গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম। হঠাৎ বল্‌বন্ত চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল 'ঐ-ঐ-ঐ ঝড়'; একটু বাদেই আবার বল্‌ল, 'ঐ-ঐ-মূর্ত্তি';—ব'লেই দুড়ুম্ ক'রে পিস্তল ছেড়ে দিল। আমরা কিন্তু ঝড়ও শুন্‌লাম না, মূর্ত্তিও দেখ্‌লাম না।

ছুটে গিয়ে বল্‌বন্তকে দু'জনে ধরে টানাটানি ক'রে পশ্চিমের বারান্দায় নিয়ে এলাম; তখনও সে অজ্ঞান হয় নি, কিন্তু টল্‌ছে। খানিকক্ষণ বাতাস করার পর তার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল; তখন সে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌ল, ঝড়, মূর্ত্তি এ সব আমরা টের পেয়েছি কি না। আশ্চর্য্যের বিষয় আমরা দু'জনে ঝড়ের শব্দ একটুও শুনি নি, মূর্ত্তিও দেখি নি। মাথাটা খুব সামান্য ভার মনে হয়েছিল;—আর কিছুই টের পাই নি। অথচ, আমরা তিনজনেই একদিকে চেয়ে ছিলাম।

সারা রাত আমি এ বিষয় ব'সে ভাব্‌লাম। ছেলেবেলা থেকে সায়েন্স্ পড়ার সখ আছে; এ বিষয়ে দু'চারটা পুঁথিও নাড়াচাড়া ক'রেছি, কাজেই এ বিষয়ের একটা বৈজ্ঞানিক মীমাংসার কথা আমার মাথায় ঘুর্‌তে লাগ্‌ল। বিজয় আর বল্‌বন্ত্ এটাকে একটা ভৌতিক কাণ্ড ব'লেই ধরে নিল। বল্‌বন্ত্ স্পষ্টই বল্‌ল, "এতদিনে আমার ভূতে বিশ্বাস জন্মাল। চোখের দেখা তো আর অবিশ্বাস কর্‌তে পারি না!"

সকালে উঠে বিজয় আর বল্‌বন্ত বাগানে বেড়াতে গেল; আমি আর তাদের সঙ্গে গেলাম না। চুপচাপ একটু তদন্ত কর্‌বার চেষ্টায় বাড়ীর দক্ষিণ দিকে গেলাম। থামের উপর বাড়ীটি তৈরী করা হয়েছে; সেই থামের গায়ে সুন্দর লতা বেয়ে উঠেছে; তা'তে কেমন সুন্দর সোণালী ফুল ফুটেছে; তার গন্ধই বা কি সুন্দর! একটি লতা একটু নূতন ধরণের। তার পাতার রং লাল্‌চে গোছের; একটি মাত্র প্রকাণ্ড বেগুনি ফুল সেই লতায় ফুটেছে। ফুলটি বারান্দার রেলিংএর গায়; সকালবেলা আধ ফুটো অবস্থায় রয়েছে। এমন সুন্দর ফুল আমি খুব কমই দেখেছি।

দক্ষিণ দিকের শোভাটা এত সুন্দর যে আমি ভূতের বিষয় তদন্তের কথা একেবারেই ভুলে গেলাম। চারিদিক্ দেখ্‌তে দেখ্‌তে আবার বারান্দার দক্ষিণ দিকে উঠে গেলাম; ইচ্ছা, সেই ফুলটি ভাল ক'রে দেখি। কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম ফুলটি দূরে থেকে যত সুন্দর, কাছ থেকে আরও অনেক বেশী সুন্দর দেখায়। ফুলের গায় কি

সুন্দর কাজ করা! কাছ থেকে ফুলের গন্ধটিও খাসা। রাত্রে যে গন্ধ বাতাসে ভেসে আস্‌ছিল সে এই ফুলেরই গন্ধ।

একটু বাদেই ফুলের গন্ধে আমার মাথাটা ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—আমি চট্ ক'রে সরে এলাম। তখনই কাণের মধ্যে একটু সোঁ সোঁ আওয়াজ হ'লো, আর চোখের সাম্নে একটা সাদা গোছের পর্দ্দার মত জিনিষ দেখা দিল; সঙ্গে সঙ্গে মাথাটাও ঘুরে গেল। কিছুক্ষণ বাতাসে বসার পর আবার মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে ভূতের ব্যাপারও পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন বুঝ্‌লাম, ঐ ফুলের গন্ধেই আমাদের নেশার মত হ'তো আর তা'র ফলেই ঝড়ের আওয়াজ, মূর্ত্তি দেখা, এ সব আমরা শুন্‌তাম এবং দেখ্‌তাম। নেশা ক্রমে ঘোর হ'য়ে অজ্ঞান ক'রে ফেল্‌ত এবং অজ্ঞান হবার অল্পক্ষণ আগেই চোখের সাম্‌নে ঝাপ্‌সা মূর্ত্তির মত দেখা যেত। আমরা কেউ মূর্ত্তিটি আবছায়া গোছের ছাড়া স্পষ্ট দেখিনি এবং মূহূর্ত্তের মধ্যে সেই মূর্ত্তি মিলিয়ে যেত; তার পর চেতনা থাক্‌তা না। সেই ফুলের লতা নাকি বল্‌বন্তের বাবার এক বিশেষ বন্ধু হনলুলু থেকে এনেছিলেন। ফুলের দোষ-গুণ তিনি জান্‌তেন না; তার অপরূপ চেহারা দেখেই লতাটি অনেক টাকা দিয়ে কিনে, খুব যত্ন ক'রে ভারতবর্ষে এনে বল্‌বন্তের বাবাকে উপহার দিয়েছিলেন। আগের দিন বাগানে বেড়াবার সময় বল বন্ত ঐ ফুলের লতার কথা আমাকে ব'লেছিল।

সেদিন রাত্রে আমি দক্ষিণের বারান্দায় থাক্‌ব ঠিক কর্‌লাম; বল্‌বন্ত থাক্‌বে পশ্চিমের বারান্দায়, বিজয় দক্ষিণের ঘরে।

রাত্রে আমরা যে-যার জায়গায় ব'সে গল্প কর্‌তে লাগ্‌লাম। আমি মাথাটাকে পিছনে হেলিয়ে সেই বেগুনি ফুলটি থেকে যথাসম্ভব দূরে রেখেছি আর তা'র দিকে নজরও রেখেছি। জ্যোৎস্না দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফুলটি আস্তে আস্তে ফুটে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছি, আর সঙ্গে সঙ্গে তার গন্ধও পাওয়া যাচ্ছে।

বুঝ্‌লাম, বেশী দেরি করা উচিত হবে না; তাই হঠাৎ 'ঐ-ঐ' ব'লে চেঁচিয়ে, চট্ ক'রে উঠে ফুলটিকে ছিঁড়ে দূরে ফেলে দিলাম; সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুম্ ক'রে পিস্তলও ছেড়ে দিলাম। তার পর আস্তে আস্তে হেঁটে বল্‌বন্তের কাছে গিয়ে বল্‌লাম, "দেখ্‌লে না, ভূতকে গুলি ক'রে মেরে ফেল্‌লাম?" বল্‌বন্ত ভয়ে কাঁপ্‌ছিল। আমার কথা

শুনে বল্‌ল, "ভূত আমি দেখ্‌তে পাই নি ; তবে তা'কে মেরে ফেলেছ শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম্।" আমি বল্‌লাম, "চল যাই ঘুমাই গিয়ে।"

পরদিন সকালে উঠেই আগে আমি বাগানে গিয়ে সেই ফুলটি দেখ্‌তে গেলাম। গিয়ে দেখি, ফুল একেবারে শুখিয়ে গেছে। তখনই তা'কে মাটিতে পুঁতে ফেল্‌লাম। তার পর সেই লতার শিকড়টি টেনে উপ্‌ড়িয়ে ফেলে দিলাম ;—যা'তে আর না গজায়। আশে-পাশে বেশ ক'রে খুঁজে দেখ্‌লাম সেই লতা আর আছে কিনা—দেখ্‌লাম একটিও নাই।

সে রাত্রে আমরা তিনজনেই দক্ষিণের বারান্দায় রইলাম। রাত্রে সুন্দর জ্যোৎস্না উঠ্‌ল ; ফুরফুরে বাতাস্ বইল ; চমৎকার ফুলের গন্ধ পাওয়া গেল—কিন্তু, সেদিনের গন্ধটা যেন একটু অন্য ধরণের। বল্‌বন্ত বল্‌ল, "ভূত পালাবার সঙ্গে সঙ্গে কি ফুলের গন্ধও বদ্‌লে গেল ?" আমি শুধু "হুঁ" বল্‌লাম। সে রাত্রে আর ভূত দেখা দিল না ;—এমন কি, তখন থেকে নাকি সেখানে ভূত আর দেখাই দেয় নি। এর জন্য বল্‌বন্ত আমার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। সে বল্‌ল, "পিস্তল তো অনেকেই ছোঁড়ে ; কিন্তু, তোমার মত অব্যর্থ হাত কা'রো নাই।"

মাছির কথা

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

তোমাদের মধ্যে যারা দার্জ্জিলিং, শিলং কিম্বা সীমলা শৈলে থাক তারা অবশ্য টেরটি পাওনি আমরা কল্‌কাতাতে কেমন মজায় আছি। গ্রীষ্ম ভায়ার আবির্ভাবের পূরো একমাস থাক্‌তেই এখানে যা গরম পড়ে্‌ছে। বাপরে !

গরম অবশ্য পড়্‌বার জিনিষ—পড়বেই। তা পড়ুক, আপত্তি নেই, কিন্তু শুধু একলাটি সে এলে আমরা তাকে দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কর্‌তাম। কিন্তু তাতো হবার জো টী নেই, গরম যখন আসে, সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে আসে যত রাজ্যের মাছি। সারাদিন ভ'র খালি ভোঁ—ওঁ—ওঁ। শীতকালের ঐ একটী সুবিধে—পিঠে পুলি নির্ব্বিবাদে রেঁধেবেড়ে দু'দিন পরে খাওনা কেন, মাছির হাঙ্গামা পোহাতে হবে না।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাব্‌ছ, শীতকালে মাছির বালাই নেই, অথচ গরম পড়্‌তে

না পড়্‌তে তারা এসে জোটে কোথা থেকে ? সেটী বুঝ্‌তে হলে কিন্তু তোমাদের মাছির জন্ম-বৃত্তান্তটী একটু জান্‌তে হবে।

মাছির জন্মস্থান হ'ল ময়লার ঢিবি—তা সে ডাষ্টবিনই হোক্ আর যাই হোক্। মা-মাছিরা এসে সেই ময়লার গাদায় ডিম পেড়ে যায়—ছোট্ট ছোট্ট ভাতের মত তখন তাদের চেহারা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সে ভাতটী ফুটে গিয়ে একটী পোকা বার হয়, তাদের না থাকে ডানা, না থাকে পা। কাছাকাছি নড়াচড়া ক'রে, আশে পাশের ময়লা জিনিষ খেয়ে তারা বড় হ'তে থাকে। চার পাঁচ দিন খুব খানিকটা খেয়ে হঠাৎ তারা একদিন হাঙ্গার-ষ্ট্রাইক (খাওয়া বন্ধ) সুরু করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের গায়ের চাম্‌ড়া হতে থাকে মোটা আর শক্ত। এম্‌নি করে মোটা হতে হতে সুন্দর একটী চামড়ার ঘর হয়ে পড়ে—মাছি-শিশু সেই ঘরে বন্ধ হয়ে পড়ে থাকে। এইবার সুরু হয় তার চেহারা বদ্‌লানো, দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঐ কদাকার চেহারায় সুন্দর সুন্দর পা গজায়, গা হয়, মাথা হয়, ডানা হয়, মুখ, চোখ, আরো কত কি।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে এ কাণ্ডটী ঘট্‌তে গরমের দিনে সময় লাগে মাত্র তিন চার দিন। শীতকালে কিন্তু সে চালাকী হবার যো নেই। গোটা শীতকালট ধরে চামড়ার ঘরে বাস কর্‌লে পর তবে বাচ্ছা-মাছির ছুটী মিল্‌বে। কাজেই সহজেই বুঝ্‌ছ শীতকালে নতুন মাছি হবার কোন সম্ভাবনাই নেই, অথচ গরমের সময় ফি দিনই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি নতুন গজিয়ে উঠ্‌ছে। সবে নতুন পৃথিবীটাকে দেখ্‌ছে তারা কি আর ডানা মেলে তোমার সাম্‌নে একটু উড়্‌বেও না, তোমার খাবারে একটু ভাগও বসাবে না ? গ্রীষ্মকালে তাই মাছির এত উৎপাৎ। এই জন্যে যাঁরা বাড়ীর ভাল গিন্নী তাঁদের কাজই হচ্ছে গরম পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই আবর্জ্জনা-জঞ্জাল সব দূর করে দিয়ে, ধুয়ে পুঁছে ঘর-দোরগুলো ফিট্ ফাট্ করে রাখা। ময়লার গাদা না পেলে মা-মাছি তোমার বাড়ীতে ডিম পাড়্‌বেনা।

মাছিরা গ্রাষ্মকালে শুধু যদি আমাদের একটু বিরক্ত করেই থেমে যেত, তা হলে ততটা এসে যেত না, কিন্তু তাতো নয়, গ্রীষ্ম কালে আমাদের দেশে যত ব্যারাম-পীড়া পড়ে তার বারো আনা কারণই এই ছোট্ট পতঙ্গটী। কেন, এবং কি করে, এক্ষুণি তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ভায়ার চরণ দু' খানির বিবরণ শুন্‌লেই আসল ব্যাপারটা অনেক খানি আঁচ্ কর্‌তে পার্‌বে। লম্বা লম্বা তিন জোড়া ঠ্যাং—আগায় আবার শিং ; সারা পায়ে কাঁটার মত সব শুঁয়ো, তাতেও রক্ষা নেই, প্রত্তেক পায়ে দুটি করে মাংসের ঢিবলীর মত জিনিষ দেখ্‌তে পাওয়া যায়। সেই ঢিব্‌লীগুলি যদি খুব ভাল একটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র বা মাইক্রোস্‌কোপ দিয়ে দেখ, তা হলে দেখ্‌বে আসলে ঢিব্‌লিগুলিও হল কতগুলো শুঁয়ো দিয়ে তৈরী। এই শুঁয়ো থেকে তারা আঠার মত এক রকম জিনিষ বার কর্‌তে পারে। অনেক সময় তোমরা হয় তো দেখে অবাক্ হয়ে গেছ যে মাছি খুব পালিশ করা কাচের জান্‌লার ওপর দিয়ে দিব্যি ওপরের দিকে হেঁটে চলেছে। এটি কিন্তু সম্ভব হয়, পা থেকে ঐ আঠা বার করার দরুণ—পা আর পিছ্‌লে পড়ার সুযোগ পায় না। হ্যাঁ তারপর যা বল্‌ছিলাম। মাছির স্বভাবই হচ্ছে ময়লা দেখ্‌লেই তার ওপর গিয়ে বসে পড়া—খাবারের আশায়, সন্দেহ নেই। একটু আগেই বলেছি, তার পায়ে আগা-গোড়া কাঁটার মত এক রকম শুঁয়ো আছে, অবশ্য সেগুলো খালি চোখে দেখা একটু কঠিন। ময়লায় বস্‌বামাত্র এই শুঁয়োগুলোয় কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড্ প্রভৃতি নানা রোগের বীজাণু জড়িয়ে যায়। তারপর খানিক বাদে তুমি যখন খেতে বস্‌লে তখনই হয় তো সে তোমার খাবারের কাছে এসে উপস্থিত ; খাবারের ওপর যেই সে বস্‌ল, অম্‌নি তার পায়ের শুঁয়ো আর ঢিব্‌লীর আঠা থেকে যত কিছু বীজাণু ছিল সব তোমার খাবারের সাথে মিশে গেল। সে খাবার খেলে তোমার শরীর যদি অসুস্থ হয় তবে শরীর বেচারার আর দোষ কি ? এই জন্যেই কোন অসুখ-বিসুখের মড়ক পড়্‌লেই তোমার বাবা-কাকা-ওঁরা মাছি থেকে অত্যাসাবধান হতে বলেন।

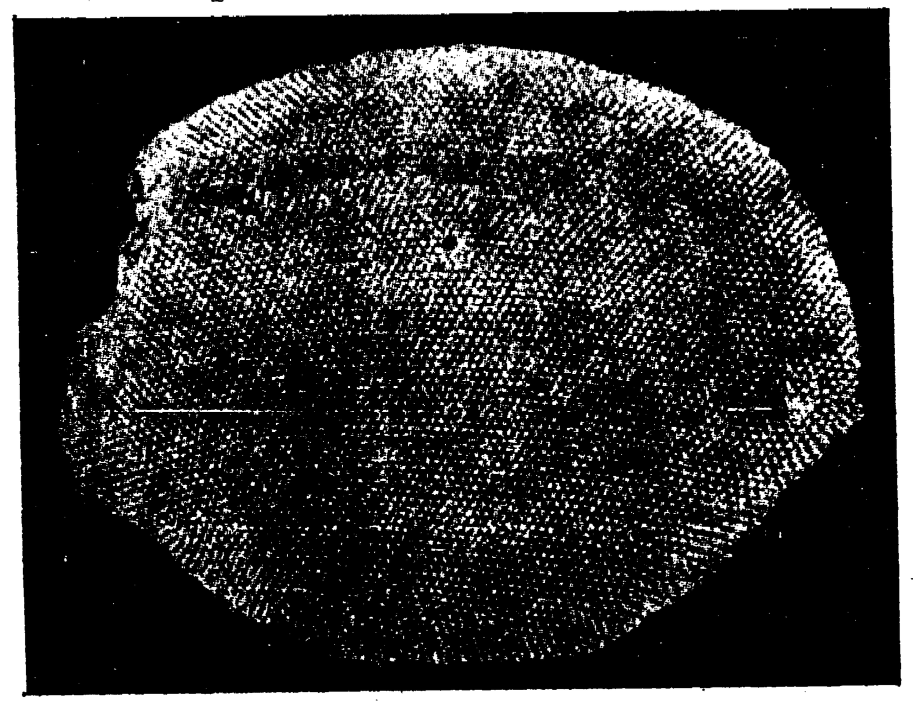

মাছির চোখ।

অথচ তুমি যে তাকে ধরে খুব খানিকটা শাস্তি দেবে তারও জোটী নেই—যা চোখ বাবাজীবনের! আগের পাতায় ছবিতে একটা জালের মত জিনিষ দেখ্‌ছ ও কিন্তু আসলে মোটেই জাল নয়, মাছির একটী চোখ মাত্র। তার সারা মাথাটা জুড়ে ঐ রকম দু'টি পর্দ্দা আছে, তা'তে ফোকর কতগুলি জান ?—প্রায় চার হাজার! এই চা'র হাজার ফোকরের প্রত্যেকটীই এক একটী চোখ। কাজেই তাকে যে খপ্ করে ধরে বস্‌বে তার উপায় নেই, অতগুলি চক্ষুর একটা না একটা তোমার হাতের চালাকী ধরে ফেল্‌বেই।

মাছির জিভ।

এম্‌নি ধারা যদি মাছির আচার-ব্যভার,গা, পা প্রভৃতি দেখ, তা হ'লে বুঝ্‌বে, ভায়ার আমাদের সব কিছুই একটু আজব ধরণের। মুখখানারই বা বহর কি! পাশেই যে ছবিখানা দেখ্‌ছ, এই হলো মাছির জিভের চেহারা। আগায় দেখ্‌ছো ত কেমন একটা পাখার মত ছড়ান জিনিষ। ঐ জিনিষটি হলো মাছির জিভের আগা। আর ঐ শিকড়-মত জিনিষগুলির প্রত্যেকটী হলো এক একটী নল। মাছিরা এই নল দিয়ে খাবার চুষে চুষে খায়। তার পর পেছন দিকে যে একটা মোটা নলের মত দেখ্‌ছ, ছোট নলগুলি দিয়ে খাবার এসে এখানে পড়ে। তারপর এখান দিয়েই মাছির মুখের মধ্যে যায়। জিভ্‌টী কিন্তু সব সময়েই এ রকম ভাবে খুলে থাকে না ; ঐ যে ছোট ছোট নলগুলির পাশে দাঁড়ার মত দুইটি কালো

কালো জিনিষ দেখ্‌ছ, সে দু'টি গুটালেই সমস্ত জিভ্‌টা ছাতার মত গুটিয়ে আসে।—তারপর দরকার মত দাঁড়া দু'টি নাড়া দিলেই হলো। সমস্ত জিভ্‌টি ঝুলে পড়ে। তখন ত বস্‌তে আরম্ভ করা বাকী আর কি !

গাছপালা থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্য্যন্ত কেউই বাতাস ছাড়া বাঁচ্‌তে পারে না। আমাদের এই ক্ষুদে মাছিটিরও বাতাস চাই, কিন্তু ওদের আবার আমাদের মত নাকও নাই, ফুসফুসও নাই।

ফুসফুস কা'কে বলে জান ত ?—আমাদের বুকের দু পাশে দু'টি ভারী চমৎকার হাপরের মত জিনিষ আছে, তাতে রক্ত থাকে। বাতাস গিয়ে এই হাপরে ঢুকে রক্তকে চাঙ্গা করে তোলে, আর সেই রক্ত শেষে আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। রক্তকে তাজা করে না তুল্‌তে পার্‌লে, আমাদের শরীরের ভেতরের কাজকর্ম্ম চল্‌তে পারে না। এ কাজটী হলো ঐ হাপর দু'টির। এই হাপর দু'টিকেই বলে ফুসফুস বা lungs. মাছির কিন্তু আমাদের মত দু'টি ফুসফুস নাই। বল্‌তে গেলে সারা গা টাই তার একটা মস্ত বড় ফুসফুস—ভাল করে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায় এর শরীরের দু'পাশে দু'সার ছোট ছোট ফুটো—এই গুলিই মাছির নাক। এখান দিয়ে বাতাস গিয়ে কতগুলি সরু সরু নাড়িভুঁড়ির মত জড়ানো নলে ঢোকে। নলগুলি রক্তে ডুবে থাকে, আর এই নলের মধ্য দিয়ে বাতাস গিয়েই রক্তকে তাজা করে তোলে।

এবারে এর চলার কথা শুন। ঐ যে ভন্ ভন্ করে শব্দ হয় না, সে শব্দটা হলো মাছির ডানার ঝট্‌পটানির শব্দ। খুব জোরে আর খুব তাড়াতাড়ি ডানা ঝাপটার ফলে এ রকম একটা ব—ন্—ন্ শব্দ ওঠে। সেকেণ্ডে কম করে ছ'শো বার ত' ডানা ঝাপটায়ই, আর তেমন তেমন তাড়া খেলে এরা এক এক সেকেণ্ডে প্রায় বিশ পঁচিশ হাত উড়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা কিন্তু নেহাৎ সামান্য বলে ধরে নিওনা—অর্থাৎ এ বেগে যদি মাছিরা সমানে ঘণ্টাখানেক চলে তবে ঘণ্টায় কতখানি যেতে পারে জান—পঁচিশ মাইলেরও বেশী ! আর আমরা অনেক চেষ্টা চরিত্র করেও মাইল পাঁচ ছয়ের বেশী হাঁটতে পারিনে ! বোঝ ব্যাপারখানা !

কোম্পানী কি কলই বানিয়েছে !

দেশে তখন সবে নতুনই টেলিগ্রামের প্রচলন হইয়াছে। তিনকড়ি ভারী চিন্তান্বিত মুখে আসিয়া একদিন তাহার বন্ধু ভজহরিকে বলিল "ভায়াহে বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি।"

"কেন হে, ব্যাপার কি ?"

"আর ভাই, ছেলেটা থাকে বিদেশে, বোধ হয় হাতের টাকাকড়ি ফুরিয়ে এসেছে, চিঠি লিখেছে শীগ্‌গির এক জোড়া শাল পাঠিয়ে দিতে—শীতে নাকি বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। তা' ভাই তাড়াতাড়ি শাল পাঠাই কি করে, যেতে তো দিন তিনেক লাগ্‌বেই ! আর এতটা সময় ছেলেটা শীতে কষ্ট পাবে !"

ভজহরি একটু ভাবিয়া বলিল, "সে জন্য আর চিন্তা কি ? আজকাল টেলিগ্রামের রেওয়াজ হয়েছে ; কত লোক টেলিগ্রামে টাকা পর্য্যন্ত পাঠাচ্ছে, শাল জোড়াটাও টেলিগ্রামেই পাঠিয়ে দাওনা, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে।"

দুই বন্ধু তখন নতুন শাল জোড়া লইয়া টেলিগ্রামের তারে বাঁধিয়া দিয়া আসিল। এক ধড়িবাজ লোক দূর হইতে ব্যাপারটা দেখিয়াছিল, তিনকড়ি ও ভজহরি চলিয়া যাইতেই সে তাহার পুরানো ছেঁড়া শালটা সেখানে বাঁধিয়া দিয়া নতুন শালটী লইয়া চম্পট্ দিল।

একটু পরে তিনকড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখে সেই নতুন শালের জায়গায় একটা পুরানো, ময়লা, ছেঁড়া শাল ঝুলিতেছে। আনন্দে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি সে ভজহরিকে ডাকিয়া বলিল, "আরে ভায়া, দেখ এসে কোম্পানী কি কলই বানিয়েছে ! এর মধ্যেই সে শাল ছেলেটার কাছে চলে গেছে আর সেও তার পুরানো শাল জোড়া টেলিগ্রাম করে ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছে !" *

---

* ইংরাজী চুট্‌কী হইতে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ভালবাসি

(শ্রীবিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী, ঝালকাঠী, বরিশাল)

ভালবাসি সদা আমি প্রকৃতির শোভা,
ধরণীর মাঝে যাহা অতি মনোলোভা।
ভালবাসি তটিনীর সুমধুর গান,
ভালবাসি বিহগের মধুমাখা তান
ভালবাসি প্রভাতের নব-রবি-কর,
ভালবাসি দিনান্তের লোহিত ভাস্কর।
ভালবাসি প্রাবৃটের কৃষ্ণ মেঘ-রাশি,
চপলার হাসি আমি বড় ভালবাসি।

ভালবাসি সরসীর লোহিত কমল,
ভালবাসি শরতের শশী-সুাবমল।
ভালবাসি মেঘ-মুক্ত-গগন-সুনীল,
ভালবাসি নির্ঝরের শীতল সলিল।
ভালবাসি প্রান্তরের শস্য রাশি রাশি,
শিশু মুখে হাসি আমি বড় ভালবাসি।

ভালবাসি বসন্তের মলয়-পবন,
ভালবাসি মধুমাখা কোকিল-কূজন।

ভালবাসি শরতের শেফালি সুবাস
ভালবাসি মধুময় আর মধুমাস।
ভালবাসি কল্লোলিত জলধি ফেনিল,
ভালবাসি সুরভিত মলয় অনিল।
ভালবাসি নিশাকালে তারকার রাশি,
স্নেহময়ী জননীকে বড় ভালবাসি।

ভালবাসি নির্ঝরের সুমধুর গান,
ভালবাসি বিহগের স্বাধীন পরাণ।
ভালবাসি পুষ্পমাঝে অলি-গুঞ্জরণ,
ভালবাসি দেশতরে সুখের মরণ।
ভালবাসি দুঃখি-মুখে হরষের হাসি,
কুসুম পল্লব-লতা বড় ভালবাসি।

ভালবাসি পরাধীনা এ ভারত-মাতা,
ভালবাসি ঘুচাইতে জননীর ব্যথা।
ভালবাসি শুনিবারে রাখালের বেণু,
ভালবাসি প্রিয়সাথী আর "রামধনু।"
যাঁহার কৃপায় হাসে সদা রবি-শশী,
ভক্তি সহ আমি তাঁরে সদা ভালবাসি।

ভালবাসা

(শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, অমরদহ কাব্যকুঞ্জ, হাওড়া)

আমি তারে ভালবাসি,
যার,
দুঃখে, দৈন্যে, বিপদে, বাধায় ;
ফুটে ওঠে মধু হাসি।

যারে— শত যন্ত্রণা দিতে নারে ক্লেশ,
শত বিপদেও অমলিন বেশ
দুখের ভয়াল অট্টহাস্তে,
নাহি যার কোন ভয়।
তারে ভালবাসি অতিশয়!
আমি তারে ভালবাসি,
যার,
গর্ব্ব কখনো নাই কোন দিন,
মধু-নম্রতা-নাশী।
যার— সম্পদে দীন ভিখারীর সাজ,
লক্ষ্য যাহার পরহিত কাজ,
ধনমদে যারে করিতে না পারে
হীন মত্ততাময়!
তারে— ভালবাসি অতিশয়!
আমি তারে ভালবাসি,
যার,
দুখীর নয়নে অশ্রু ঝরিলে
ঝরে পড়ে বারি-রাশি।
যার— পরের বিপদ্ করিতে মোচন,
বিপদে বরিতে নাহি আনমন;
পরের লাগিয়া ত্যজিতে জীবন,
চিত যার ভীত নয়,
তারে— ভালবাসি অতিশয়।
আমি তারে ভালবাসি,
যার,
বিমল প্রেমের প্রবল ধারায়,
পাপ তাপ যায় ভাসি'।
যারে, প্রলোভন কভু টলাতে না পারে,
হিংসা না করে হীন পশু যারে,

হিয়ায় যাহার মলিনতা নাই।
দীপ্তি জ্যোতির্ম্ময়!
তারে — ভালবাসি অতিশয়।
আমি তারে ভালবাসি
যার, স্বকীয় প্রতিভা চমকিত করি
ফেলেছে জগৎবাসী।
যারে, জ্ঞানে সর্ব্বদা করেছে ভূষিত,
হিয়া যার সদা অমৃত-তৃষিত।
রহস্য-ভরা জগতের যেই
নিতে চায় পরিচয়।
তারে— ভালবাসি অতিশয়।
আমি তারে ভালবাসি
যার,
ছলী শত্রুরা চরণে লুটায়
কাঁদিয়া দ্বারেতে আসি।
যারে ক্ষমাগুণ দেখি শত্রুর দলে,
চরণ ধুয়া'য়ে দেয় আঁখি জলে;
ভুলে যায় সব পাপের বাসনা
মধুময় হৃদি হয়।
তারে— ভালবাসি অতিশয়!
আমি তারে ভালবাসি
যার
পীড়িত পতিত মানবে হেরিয়া
ঝরে গো অশ্রুরাশি।
যেই আর্ত্তজনের, দীনের শরণ,
অনাথ জনের চির পরিজন,
দুর্ব্বলদের বল দেয় যেই
ঘৃণ্যেরে বুকে লয়!
তারে— ভালবাসি অতিশয়।

আমি তারে ভালবাসি,
যার,
মনটি কখনো অসরল নয়
সকল তৃপ্তি-নাশী
যেই সত্য রাখিতে সব ত্যাগী বীর
স্নিগ্ধ-শান্ত, ধীর-গম্ভীর,
দেবতা যাহার হৃদে নেয় বাস
চিত্ত সুবাসময়
তারে ভালবাসি অতিশয় !

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

হতভাগ্য চার্লি

ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনা তেমন আর কিছু ঘটে নাই। কেবল একদিন কন্‌স্‌ট্যান্স্‌কে লেডি আগাষ্টার বাড়ীতে পাইয়া রোল্যাণ্ড্ ইয়র্কের বুড়া মামা লর্ড্ ক্যারিক্ মুখখানা কাঁচু-মাচু করিয়া জানাইয়াছিলেন যে তিনি তাহাকে বড়ই পছন্দ করেন, যদি সে তাঁকে বিবাহ করিয়া কৃতার্থ করে তবে সুখের আর তাঁর সীমাই থাকিবে না।

'লেডি ক্যারিক্' হইবার নিমন্ত্রণ পাইয়া কন্‌স্‌ট্যান্স্ প্রথমটা একেবারে 'থ' হইয়া খানিকক্ষণ লর্ডের মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, কিন্তু তার পরেই হো হো করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া জবাব দিয়াছিল, "সে অসম্ভব; যাক্, আমার মত ক্ষুদ্র জীবের কথা আপনি অতটা বড় করে আর ভাব্‌বেন না।"

এ কথায় কিন্তু লর্ড্ একটুও অসন্তুষ্ট হন নাই, রোল্যাণ্ড্ ইয়র্কেরই তো মামা! হাত দিয়া নিজের পাকা চুলগুলি দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বুঝেছি, বুঝেছি, মুস্কিল বেধেছে এখানে; আর তা ছাড়া উইলিয়ম্ ইয়র্ক্‌কেও তুমি ভুল্‌তে পারনি! আচ্ছা গর্দ্দভ সে ছোঁড়াটা! এমন মেয়ে, অথচ......"

ইহার কয়েকদিন বাদেই যে ঘটনাটি ঘটিয়া সমস্ত হেল্‌ষ্টন্‌লি সহরকে তোল্‌পাড়্ করিয়া দিল, সেটা কিন্তু মোটেই হাস্যরসের নয়। বলিতেছি।

সেদিন বিকাল বেলা বাইওয়াটার চার্লি চ্যানিংকে স্কুলের একটা নিরিবিলি কোণে ডাকিয়া নিয়া কহিল, "শোন চার্লি, একটা কথা আছে। খুব গোপনীয় কিন্তু, কারো কাছে আবার ফাঁস করে বস' না যেন। আমরা ক'জন মিলে ঠিক করেছি, কেচ্‌বুড়োকে ফের একটু জ্বালাতে হবে। কৌশলে তার কাছ হতে চাবিটা বাগিয়ে নিয়ে আজ রাত্রে গীর্জ্জের হাতার ভেতর আমরা খানিকক্ষণ খেলাধূলো করব। তোমাকেও দলের ভেতর ধরা হয়েছে। ঘড়ি ধরে ঠিক স'সাতটার সময় আস্‌বে, জান্‌লে?"

সময়টা বাড়ীতে তাহার এবং টমের পড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট, তাই চার্লির আসিতে ইচ্ছা ছিল না, সে বলিল, "না ভাই, আমায় বরং বাদ দাও।"

"ওঃ, বুঝ্‌তে পেরেছি, ভূতের ভয়, নয়? বলে—এ দেব সবাইকে!"

ছোট বেলা চার্লিদের বাড়ীর এক দাসী তার একটী মহা অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, চার্লি সামান্য কাঁদা-কাটা করিলেই সে নানা রকম ভূত-প্রেতের ভয় দেখাইত। তার ফল শেষে দাঁড়াইল এই যে বড় হইয়াও চার্লি চ্যানিংয়ের সে ভয় আর গেল না। বাড়ীর সবাই তাহাকে নানা রকম সাহস দিত, ভূত বলিয়া পৃথিবীতে কোন জিনিষ নাই একথা বুঝাইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু ছোট বেলায় যে ভয় একবার শিকড় গাঁড়িয়াছে তাহাকে সরানো কি এতই সোজা? আজ পর্য্যন্ত একা অন্ধকারে দোতালায় যাইতে হইলে চার্লির বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিয়া উঠে। পাছে এ কথাটা আবার সঙ্গী মহলে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, তাই চার্লির সমস্ত মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, আস্‌বো, ঠিক্ স'সাতটার সময় তো?"

"হাঁ"

সাতটার কিছু আগে ইস্কুলের দ্বারোয়ান কেচ্ তার নিজের ঘরটীতে আহারে বসিয়াছিল। আসলে কিন্তু খাবার খাওয়া এবং গালি দেওয়া—কোন্ কাজটা সে বেশী করিতেছিল বলা খুবই কঠিন। উপস্থিত অবশ্য কেউই সেখানে ছিল না, কিন্তু কেচ্ সাহেবের তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, নিজের মনেই সে রুটীওয়ালার বাপের

শ্রাদ্ধ করিল, বলিল এ রুটী তার কুকুরকেও সে দিবে না, বেচারার দাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে। মাখনওয়ালার ঠাকুরদাকেও সে আপ্যায়িত করিয়া দিল—পচা ঘায়েও লোকে নাকি সে মাখন লাগায় না!

ঠিক এম্‌নি সময় তার দুয়ারে আস্তে কয়টী ঘা পড়িল। কেচ্ অমনি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কে?" এ কথার কোন জবাব আসিল না, আসিল আরও আস্তে একটী ঘা। রাগে ফাটিয়া পড়িতে পড়িতে বুড়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দেখে, ছোট্ট একটী আট দশ বছরের মেয়ে দাঁড়াইয়া। বুড়াকে দেখিয়াই সে বলিল, "আজ্ঞে, আপনাকে যে খুঁজ্‌ছে!"

ষাঁড়ের গলায় কেচ্ হাঁকিল, "কে?"

"বোধ হয় বিশপ্ মশাই হবেন, ওই ওখানে" বলিয়া মেয়েটী আঙ্গুল দিয়া একটা দিক্ দেখাইয়া আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল।

বিশপের নাম শুনিয়া কেচ্‌কে অবশ্য তখনই ধড়মড়াইয়া বাহির হইতে হইল। একটু আগাইয়া সে দেখিতে লাগিল,—কই! বিশপ মশাই তো কোথাও নাই! তার বদলে রাস্তা দিয়া পাইচারি করিতেছে ষ্টিফেন্ বাইওয়াটার; কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারেই নির্ব্বিকার!

বোধ হয় বিশপ্ মহাশয় অপেক্ষা করিয়া করিয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কেচ্ গুটিগুটি পুনরায় নিজের 'ডেরা'য় ফিরিয়া আসিল। সর্ব্বসমেত দু'চার মিনিটের বেশী নিশ্চয়ই সে বাহিরে থাকে নাই, কিন্তু এই অতি অল্প সময়টুকুর মধ্যেই ঘরের ভিতর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো কেচের চাবিটী সেখানে আর নাই, দ্বিতীয়তঃ টেবিলের উপর একটুক্‌রা কাগজে কে কি লিখিয়া রাখিয়া গেছে। দেয়ালের দিকে বুড়ার নজর না পড়িয়া পড়িল সেই কাগজ খানার উপর—জেঙ্কিন্‌স্ তাহাকে সন্ধ্যার পরই মাংসের কালিয়া খাইবার নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছে। চিঠি পড়িয়া কেচের শুধু জিভ্ দিয়াই জল পড়িল না, নিজেও সে একেবারে 'জল' হইয়া গেল। মাংসের কালিয়া—আঃ! কোন মতে দরজাটা বন্ধ করিয়াই সে ঊর্দ্ধশ্বাসে জেঙ্কিন্সের বাড়ীর দিকে ছুটিল। হায় রে বুড়া, বাইওয়াটারকে সাম্‌নে ঘুরিতে দেখিয়াও তোর মনে কোন সন্দেহ হইল না? জেঙ্কিন্স্

যে এ নিমন্ত্রণের বিন্দু-বিসর্গও জানে না, অসুখে পড়িয়া নিজেই যে সে তখন কাৎরাইতেছে!

* * *

চাবিটী পকেটে পূরিয়াই বাইওয়াটার এক দৌড়ে তার সঙ্গীদের কাছে আসিয়া জুটিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "পিয়ার্স্, ঝট্‌পট্ সেরে নাও, চার্লি কিন্তু ঠিক্ স' সাতটায় গীর্জ্জের হাতায় ঢুক্‌বে।"

বাইওয়াটারকে চার্লি কথা দিয়াছিল ঠিকই, সওয়া সাতটা বাজিবার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই গীর্জ্জার হাতার সাম্‌নে সে আসিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে যাইবার দরজা খোলা—বুঝিল খেলিবার জন্য দলবল লইয়া বাইওয়াটার পূর্ব্বেই ঢুকিয়াছে, নতুবা ইহার অনেক আগেই তো কেচের দরজা বন্ধ করার কথা। তাই সাহসে ভর করিয়া চার্লি খোলা দরজার পথে ভিতরের দিকে আগাইয়া চলিল।

ভিতরে ঢুকিয়াই কিন্তু তার বুকটা কেমন দুরু দুরু করিতে লাগিল। চারিদিক্ নিঝুম অন্ধকারে ছাইয়া গেছে, ধারে পাশে ত্রিসীমানার মধ্যেও জন-প্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। শ্মশানের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা সর্ব্বত্র যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। হঠাৎ মাথার উপরকার গাছ হইতে একটা প্যাঁচা এমনই বিশ্রী এক আওয়াজ করিল, যে তা শুনিয়া চার্লির সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল। সঙ্গীদের নাম ধরিয়া সে ডাকিতে লাগিল, চীৎকারে চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলার উপক্রম করিল, কিন্তু কোথায় কে, কারোই সাড়া-শব্দ নাই।

ভয়ের স্পষ্ট রেখা এবার চার্লির মুখে দেখা দিল, সে ভাবিল আর নয়, এবার তাহাকে এখান হইতে বাহির হইতেই হইবে।

উল্টা দিকে মুখ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে দরজার গোড়া পর্য্যন্ত আসিয়াই কিন্তু চার্লি যা দেখিল তাহাতে সেখানেই মাটীর উপর সে বসিয়া পড়িল—দরজা বাহির হইতে তালা লাগাইয়া কে বন্ধ করিয়া দিয়াছে। য়্যাঁ, তবে কি এই জন-মানব-হীন গীর্জ্জার হাতার ভিতর, ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে একা সে বন্ধ হইয়া গেল নাকি? ভাবিতেই চার্লির বুকের ভিতর পর্য্যন্ত হিম হইয়া আসিল। অদূরে, একটু আগাইয়া গেলেই পাদ্রীদের কবরভূমি। সহরের লোকে বলাবলি করিত, সন্ধ্যার পর গীর্জ্জার

হাতা সম্পূর্ণ নির্জ্জন হইয়া গেলে মৃত পাদ্রীদের প্রেতাত্মারা নাকি সমস্ত মাঠময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—এ দৃশ্য কেহ কেহ নাকি চোখে পর্য্যন্ত দেখিয়াছে। কবরের উপরকার সাদা স্তম্ভগুলি দেখিয়া চার্লির কেবলই মনে হইতে লাগিল ঐ বুঝি প্রেতাত্মারা তার দিকে চাহিয়া চাহিয়া ভীষণ অট্টহাসি হাসিতেছে। অন্ধকার ক্রমেই নিবিড় হইয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ করিয়া একটু হাওয়াও দিতে আরম্ভ করিল, অর্দ্ধচেতন চার্লির মনে হইতে লাগিল কবর হইতে মৃত পাদ্রীরা উঠিয়া তাহারই ঠিক পিছনে, কাণের গোড়ায়, বুঝি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতেছে। সমস্ত শরীর তার অবশ হইয়া আসিল, সে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু সেই জনশূন্য শ্মশানে কে তাহার উদ্ধারের জন্য বসিয়া আছে?

প্রেত-মূর্ত্তি আগাইয়া আসিতেছে।

হঠাৎ ওকি? কবরের ভিতর হইতে তার পানে ধীরে ধীরে ওটা কি আগাইয়া আসিতেছে?—চার্লির শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। সে এক বিভীষণ মূর্ত্তি—সাদা ধব্‌ধবে রং, মুখ মড়ার মত পাণ্ডুর, চোখে পলক নাই, হাত হইতে নীল আলো উঠিতেছে। এক পা, দুপা করিয়া সেই প্রেত-মূর্ত্তি তাহার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। আসিল, আসিল, এই আসিয়া পড়িল!

ইহার পর চার্লি যে কাজগুলি করিয়া গেল তাহাকে আর কোন মতেই তাহার

নিজের কাজ বলা চলে না, কে যেন তাহার ভিতর হইতে সেগুলি করাইয়া লইল। একবার সে তাকাইয়া দেখিল পশ্চিম দিকের দরজাটা খুলিয়া গিয়াছে। ব্যস্, অমনি প্রেতাত্মার গা ঘেঁষিয়াই সেই খোলা পথে মরি-বাঁচি-জ্ঞান-শূন্য হইয়া সে ছুটিয়া চলিল। পিছনে পিছনে প্রেতাত্মাও ধাইয়া আসিল, তার সে কি চীৎকার! বুক হিম হইয়া আসে।

উন্মত্তের মত চার্লি ছুটিয়া চলিয়াছে, দিগ্বিদিক্ জ্ঞান আর তখন তার নাই। রাস্তাটী একটু মোড় ফিরিয়া মিশিয়াছে একটি ঘাটের সহিত; তারই অব্যবহিত পরে হেল্‌ষ্টন্‌লির নদী—ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে।

চার্লি সোজা ছুটিয়াছে চোখ তার অন্ধ; হঠাৎ একটু পরেই ঝপ্ করিয়া সেই নদীর বুকে একটী শব্দ হইল, তারপর সামান্য একটু হুটোপটি! ব্যস্, তারপর সব নিস্তব্ধ! মিসেস্ চ্যানিংয়ের প্রাণ-প্রিয় পুত্র চার্লি নদীর অতল গর্ভে ডুবিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত ছবি

ইটালির এক চিত্রকর একখানা পোষ্ট্‌কার্ডের মধ্যে বাইবেলের নানা ঘটনা লইয়া ৩৩৬টি দৃশ্যের ছবি আঁকিয়াছেন। এই ছবির মালিক হইবার জন্য বিলাতের বড় বড় লোকেরা লাখে লাখে টাকা হাঁকিতেছেন। কে কত বেশী দাম দিতে পারে তার রেষা-রেষিও কম হইতেছে না। চিত্রকরের কিন্তু ছবি বিক্রী করিবার ততটা গরজ দেখা যাইতেছে না। এই ছবির মধ্যে রংএর যে কারিকুরি দেখান হইয়াছে তা নাকি অত্যাশ্চর্য্য।

পেটের ভিতর ক্যামেরা

অনেক সময় পেটের ভিতরে এমন অনেক রোগ হয় যা বাহির হইতে চোখে না দেখিয়া ঠিক মত ধরিতে পারা যায় না। এক্স্‌-রে আবিষ্কারের পরে যদিও কোন কোন রোগ ধরার বিশেষ

সুবিধা হইয়াছে কিন্তু তবুও এমন অনেক ব্যারাম আছে যা এক্স্-রের সাহায্যেও ধরা সম্ভব নয়। সম্প্রতি দুই জন অষ্ট্রিয়ান্ বৈজ্ঞানিক এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য এক নতুন ধরণের অতি ছোট্ট ক্যামেরা আবিষ্কার করিয়াছেন। এই ক্যামেরা এত ছোট যে নির্ব্বিবাদে রোগীকে উহা গিলাইয়া দেওয়া যায়। ক্যামেরা পেটের ভিতর হাজির হইলে কৃত্রিম আলো দিয়া ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে পেটের ভিতরকার ১৬ খানা ছবি ঐ ক্যামেরায় তুলিয়া লওয়া যায়। ছবি তোলা শেষ হইলে পেটের ভিতর হইতে ক্যামেরা বাহির করিতেও বিশেষ বেগ পাইতে হয় না।

শিম্পাঞ্জীর কীর্ত্তি

আমেরিকার এক সাহেবের বানর পোষার ভারী সখ। তাঁর একটি পোষা শিম্পাঞ্জী আছে, তার নাম লচু। তোমরা নিশ্চয়ই জান, বানরেরা মানুষের চাল-চলন কেমন করিয়া অনুকরণ করে। সাহেবের দেখাদেখি লচুও অনেক কিছু শিখিয়াছে। সে টেবিল চেয়ারে বসিয়া খানা খায়, মানুষের মত পোষাক পরে, ছড়ি হাতে করিয়া বেড়াইতে যায়, মাঝে মাঝে সিগারেটেও দুই এক টান দিতে ছাড়ে না। একদিন সাহেব দাড়ী কামাইয়া তাড়াতাড়ি কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছেন, লচু তাঁর ঘরে ঢুকিয়া দেখে আয়নার সম্মুখে সাহেবের কামাইবার সমস্ত সরঞ্জাম পড়িয়া। আর যায় কোথা? লচু অমনি আয়নার সামনে চেয়ারে বসিয়া পড়িল, তার পর ব্রাশে সাবান মাখিয়া পরিপাটি করিয়া গালে মাখিল। তারপর ক্ষুর বাহির করিয়া গালে এক টান,— ব্যস্ ঐ পর্য্যন্ত। সঙ্গে সঙ্গে লচুর দারুণ চীৎকারে সাহেবের মেম ছুটিয়া আসিয়া দেখেন লচুর আধখানা গাল নাই, রক্তে ঘর ভাসিয়া গিয়াছে। ক্ষুর দিয়া এমন টানই সে লাগাইয়াছে, যে সে টানে গালের মাংস সম্পূর্ণ ভাবে উঠিয়া আসিয়াছে।

লচু নাকি এখন অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে, তবে তার গালের প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা ২ ইঞ্চি চওড়া খানিকটা জায়গা নাই,—সেখানে আছে এক বিরাট্ ছেঁদা। না বুঝিয়া অনুকরণের ফল এই রকমই হয়—মানুষের বেলায়ও।

রেকর্ডের চিঠি

আমেরিকার কোন কোন সহরে আজকাল পথে ঘাটে ভারী অদ্ভুত এক রকম চিঠির বাক্স বসান হইয়াছে। কাহারও কাছে চিঠি পাঠাইতে হইলে সে চিঠি কাগজ কলমে না লিখিয়া এই বাক্সের কাছে আসিয়া মুখে বলিয়া গেলেই চলে, বাক্সের মধ্যে রেকর্ডে অমনি সে কথা গাঁথা হইয়া যাইবে। চিঠি শেষ করিয়া দরকার মত ঠিকানা বসাইয়া দিলে যথা সময় সেই রেকর্ডের চিঠি ঠিক জায়গায় গিয়া হাজির হইবে। চিঠির মালিক গ্রামোফোনে সেই রেকর্ড লাগাইয়া চিঠির মর্ম্ম জানিতে পারিবেন।

মানুষ কি ঘাস খায়?

ধরিতে গেলে আমরা সকলেই ঘাস খাই। বৈজ্ঞানিকদের মতে ধান গাছ ঘাস-বংশের মধ্যেই পড়ে, আখও তাই। কিন্তু আসল ঘাস বলিতে আমরা যা বুঝি, যে ঘাস গরু ভেড়া খায় তা ত আর মানুষে খায় না! খায় বই কি। অষ্ট্রেলিয়ার কাছে ছোট্ট একটা দ্বীপ আছে, সেখানে মড়ুরা বলিয়া এক রকম জাত বাস করে, তারা ঘাস খাইতে শুধু অভ্যস্ত নয়, ঘাস তাদের একটা খুব প্রিয় খাদ্য। তবে কাঁচা ঘাস নয়, তারা ঘাস রাঁধিয়া খায়।

মানুষ না সোলা?

মিস্ হেলেন বটো গ্রীস দেশের এক কলেজের ছাত্রী। এ বছর সে আঠারো পার হইয়া উনিশ বছরে পা দিয়াছে,—কিন্তু শরীরের ওজনটা তার বয়সের অনুযায়ী বাড়িতে পারে নাই। তার ওজন এখন দশ সেরেরও কিছু কম। কিন্তু ওজন কম হইলে কি হয়, বিদ্যায় সে তাহা পুষাইয়া লইয়াছে। লেখাপড়ায় সে নাকি ভারী তুখোড়,—এই বয়সেই সাত আটটা ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) গ্লাসগো

(২) খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (ইটালি, কলিকাতা), শিশির কুমার রায় (বসিরহাট), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), মান্না মুখোপাধ্যায় (ফয়জাবাদ), দেবকীনন্দন অধিকারী ও রাধিকা (তমলুক), অনিলচন্দ্র সরকার (লক্ষ্ণৌ), চাঁদ মিঞা (মসিকারা, ত্রিপুরা), শচীরাণী ঘোষ (লাহোর), ললিতমোহন কুণ্ডু (রামরাজতলা), সুজাতা, শেফালি, সবিতা, শিবু ও চিত্রা (ইটামোগরা), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগো পাড়া চট্টগ্রাম), জেবুন্নিসা (কুয়ার পার, শ্রীহট্ট), রামরতি, রঞ্জিৎ, পানু, নীহার, রাণু, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (কালিঘাট), গোবর্দ্ধন, গোপাল, বিভূতি ও ভবানী (বড়া, হুগলী), সুজাতা দেবী (ভবানীপুর, কলিকাতা), আনন্দ, অমল, শিশি, কুবা ও নলি (আলিপুর), হিমাংশুকুমার মল্লিক (কলিকাতা), নির্ম্মলচন্দ্র সেন (ঢাকা), সুধাময় বসু (চট্টগ্রাম)।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন :—

প্রতিভা ব্যানার্জ্জী (ভবানীপুর), মনোরমা দেবী (ভবানীপুর), তাপসকুমার ভৌমিক (রংপুর), দীনেশ, গুণেন ও ধ্রুবেন (ইটালি, কলিকাতা), ভুবনানন্দ চক্রবর্ত্তী (কুচবিহার), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ল্যাটপ্যাট সমিতির সভ্যগণ

(কলিকাতা), হারু, বাদল, নলিনকুমার সেন (ঢাকা), সুব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, নরেশ ও সুনীতি দেবী (ভাগলপুর), বিমলচন্দ্র মিত্র (শিলং), অজিত, নির্ম্মল, শিবু, স্নেহ, মায়া, সুধা, প্রভাত, প্রফুল্ল, অমল, সমল, সুনীতা, আমু, কুবু, মণ্টু, ঝুণ্টু, মঞ্জু, হাবলি, বাবলি, পিণ্টু, জেলুৎ (ভবানীপুর), উষাময়ী, নিশাময়ী, লক্ষীরাণী, খোকন ও সন্তোষ ঘোষাল (গাজিপুর), কিশোর লাইব্রেরীর পরিচালিকাবৃন্দ (শ্রীরামপুর), গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), রণেন্দ্রনাথ চৌধুরী (খুলনা), সুষমা দেবী (ভবানীপুর), ইন্দুবিকাশ, প্রবোধ, শান্তি, বিমল ও অমিয় (শিবসাগর), অমরনাথ চৌধুরী (কালিঘাট), প্রফুল্ল হাজরা, অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (মধুপুর), অজয়, আরতি, নীলাদ্রি, শশাঙ্ক, রবি, জ্যোতি অবনী, ছবি ও খোকা (মজঃফরপুর), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), ক্ষেপুত এম্. ই স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ (ক্ষেপুত), নিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর), অলকা সেন (সেনহাটী), মহবুবুর রব চৌধুরী (শ্রীহট্ট), কীর্ত্তীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ফরিদপুর), বিধুভূষণ চক্রবর্ত্তী (ঝালকাঠি), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), রণেন্দ্রকুমার মিত্র (পাটনা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), তারাকুমার সান্ন্যাল (কলিকাতা), অমরেন্দ্রনাথ দাস (চন্দননগর), মীরা, মণি, কল্যাণ, কুশল, জনী ও কুমুদ বাগচি (পাটনা), দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর, হাওড়া), বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় (বালী, হাওড়া), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), সুচারু ঘোষ, মিনি, নসি, হেমনলিনী দেবী (সীমলা), পুষ্পলতা দেবী (বেতিয়া), প্রতিমা, রমা ও পূর্ণিমা (হাজারীবাগ), শৈলেন্দ্রনাথ সেন (বসিন—বর্ম্মা) কানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী (অমরদহ, হাওড়া)।

নূতন ধাঁধা

জমীদার বাড়ীতে পুকুর কাটা হইতেছিল, মাটী খুঁড়িতে খুঁড়িতে বাহির হইল এক প্রকাণ্ড পাথর—তার মধ্যে হিজিবিজি কি সব লেখা। ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিবার পর দেখা গেল—হরফগুলি বাংলা হরফই বটে, কিন্তু কি আবোল তাবোল ভাবে বসান! পর পর পড়িলে কিছুই মানে বুঝা যায় না। অনুমানে বোধ হয় এগুলি কোন সেকেলে রাজার দেওয়া উপদেশ—জায়গা বাঁচাইবার জন্য সাঙ্কেতিক ভাবে লেখা। আমরা লেখাটির অবিকল নকল রামধনুতে তুলিয়া দিলাম। দেখ ত তোমরা ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পার কি না—

জান	বলিও	বেশী	বলে	জানে	বলে।
শোন	রটাইও	বেশী	রটায়	শোনে	রটায়।
উপার্জ্জন কর	খরচ করিও	অনেক	খরচ করে	উপার্জ্জন করে	খরচ করে।
পার	খাইও	খুব	খায়	হজম করে	খায়।
যাহা }	তাহাই }	না, কেননা }	যাহারা }	তাহারাই যাহা }	তাহার চেয়ে বেশী }

সিন্ধু-বধ

শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ সেনগুপ্ত]

৪র্থ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৮ { ৪র্থ সংখ্যা

নূতন বরষ এল নূতন রূপে

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

১

নূতন বরষ এল নূতন রূপে,
চৈতী-শেষে কখন্ চুপে চুপে !
কখন্ এল অমল চরণ রাখি'—
ধরার বুকে ; মেলে অরুণ আঁখি
অরুণ আলো মেখে,
হঠাৎ কোথা থেকে !

সিন্ধু-বধ

শিল্পী—শ্রী[illegible]।

৪র্থ বর্ষ } বৈশাখ, ১৩৩৮ { ৪র্থ সংখ্যা

নূতন বরষ এল নূতন রূপে

(শ্রীবিকাশ দত্ত)

১

নূতন বরষ এল নূতন রূপে,
চৈতী-শেষে কখন্ চুপে চুপে !
কখন্ এল অমল চরণ রাখি'—
ধরার বুকে ; মেলে অরুণ আঁখি
অরুণ আলো মেখে,
হঠাৎ কোথা থেকে !

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

২

উধাও হ'ল দখিণ হাওয়া আজি
শূন্য রবে,—ভরবেনা ফুল-সাজি ;
শেষ হ'ল কি বসন্ত উৎসব—
না দেয় সাড়া তাহারি দূত সব !
কোথায় তারা যায়—
সে কোন্ দেশে গাঁয় ?

৩

নিদয় নিদাঘ তপ্ত নিশাস ঢালি'
ভরিয়ে দিল ধরারি বুক খালি,
দিবস রাত্তি চল্‌ল আগুন-খেলা
হাস্‌লো না আর অযুত ফুলের মেলা ;
মরুর মত ধূ—ধূ—
রইল ধরা শুধু।

৪

নদী-নালার বুকের সুধা হরি'
এই ধরারে রিক্ত কাঙাল করি'
রুদ্র নিদাঘ আবার চলে যাবে
শ্যামলতায় ধরা তখন ছা'বে।
এম্‌নি ধারা ক'রে—
প্রতি বরষ ঘোরে।

৫

বরষ তুমি এসেছ তা' জানি
মোদের তরে এনেছ কী বাণী ?

বল্‌তে পার "মুক্তি" কত দূরে—
নিকটে না দূরে—বহু—দূরে ?
নূতন তবে কিসে—
ভেবে না পাই দিশে !

সত্যের অভিযান

(শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য)

আমার নাম শ্রীমান্ সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়। নাম থেকেই তোমরা বুঝতে পেরেছ সত্যই আমার জীবনের ব্রত, অর্থাৎ কিনা মিথ্যা কথা ভিন্ন সত্য কথা আমার মুখ দিয়ে বারই হতে পারে না। অথচ পাড়াপড়শীরা এম্‌নি যে আমায় নাম দিয়েছে 'মিছুরাম'।

বয়স আমার তেরো বছর। ইস্কুলে পড়ি, ফোর্থ ক্লাসে। অঙ্কটঙ্ক সবই জানি ও বুঝি একটু একটু। কিন্তু স্বভাব-দোষ, এ তো আর সহজে এড়ানো যায় না। তাই হিষ্ট্রির দিন জিওগ্রাফি, এরিথ্‌মেটিকের দিন য়্যাল্‌জাব্রা, য়্যাল্‌জাব্রার দিন জিওমেট্রি, গ্রামারের দিন ট্রানশ্লেশন, ব্যাকরণের দিন রচনা—এম্‌নি সব ওলট্-পালট্ ক'রে পড়া বা লেখা তৈরি ক'রে নিই ; ফাঁকি দিই না কখনোই। মাষ্টার মশায়েরা ধমকান রোজই ; উত্তম-মধ্যমও দেন মাঝে মাঝে। কিন্তু আমি নির্ব্বিকার ; কিছুতেই কিছু হয় না ; 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন' কী-ই বা আর হ'বে দাদা ? হ্যাঁ, ভাল কথা—রংটাও আমার কিন্তু ঐ জিনিষটারই অনুরূপ !

কিন্তু যাক্,—যে কথা বল্‌ছিলাম ঃ—

সেদিন ভোরবেলা উঠে' জিওগ্রাফির ঘণ্টার পড়া 'লাইফ্ অব বুদ্ধ' মুখস্থ ক'রে তৈরি ক'রে রেখে, য়্যাল্‌জাব্রার ঘণ্টার জন্য লেট্ এ বি সি, বি এ ট্রায়াঙ্গ্‌ল পড়্‌তে সুরু ক'রেছি, এমন সময় মা এসে বল্লেন, "ওরে, শীগ্‌গির আয়। ক্ষুদিরাম ঠাকুর

এসেছেন ; হাঁড়িঘাটা থেকে পাতার হাটে এসে নাম্‌লেন ;—দেখ্‌বি তো দেখে' যা,··· নৈলে কিন্তু জুড়ানপুর চল্লেন !"

আসল কথাটা এই—ক্ষুদ্ জল রেঁধেছেন, হাঁড়ি থেকে পাতায় ঢেলেছেন ; গরম-গরম এখনি না খেলে তা' জুড়িয়ে যাবে ! কিন্তু বল্‌বার ধরণটা দেখ্‌লে ?

যা হোক্, তাড়াতাড়ি উঠে পড়া গেল ! দিব্যি কাঁচ-কলা—থুড়ি,—গোল-আলু-ভাতে আর ভাত ! আঃ,···খেয়ে যা আরাম !

খেয়ে উঠে পুনশ্চ আপন্ পাঠেতে মন নিবেশ কর্‌তে যেতেই জননী বল্লেন, "দেখ খোকা, এক কাজ কর্। পড়াটা আজ থাক্। আজ আর ইস্কুলে না গেলি ; তোর দাদার শ্বশুর বাড়ীটা একবার ঘুরে' আয়। আজ জামাই ষষ্ঠী কি না, তোর দাদার যাওয়ার কথা,—তা সে তো গেল গোপালগঞ্জে মকদ্দমা কত্তে ; তুইই এবার সেখান থেকে জামাইষষ্ঠীটা সেরে আয়। একটা 'জামা' গায়ে দিয়ে যাস্, তা'হ'লেই সকলে তোকে 'জামাই-বাবু' বল্‌বে'খন্ !"

"তথাস্তু" ব'লে মায়ের আদেশ মাথা.পেতে' নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল দাদার শ্বশুর বাড়ীর পথে চরণরথে ! বেলা তখন নগদ ৮টা ৩৫ মিনিট্ ৩ সেকেণ্ড্—এ'র ভেতর আর বাকী-বকেয়া কিছু ছিল না !

পাঁচ মিনিটের ভিতরই মিত্তিরদের বড়বাগান পার হ'য়ে তা'দের সুমুখ-দুয়ারের ছোট রাস্তায় পৌঁছ্‌লাম। পৌঁছে' দেখি মেজো বাবুর ন বছরের মেয়ে ফেনিলা একখানা হাত-পাখা নিয়ে শিউলি-গাছটার ছায়ায় ব'সে সাম্‌নের রৌদ্রের ভিতর জোরে-জোরে বাতাস দিচ্ছে !

অবাক্ হ'য়েই বল্লাম, "ও কি রে ফেনি, কচ্ছিস্ কি ?"

কর্ত্তব্য কর্ম্মে কিছুমাত্র অবহেলা না ক'রেই আমার মুখের পানে চেয়ে শ্রীমতী বল্ল, "রোদের গায়ে বাতাস দিচ্ছি সত্য-দা ! দেখ্‌ছ না কী ভীষণ গরো—ম্···একেবারে আগু—ন্ ! তাই ব'সে ব'সে ও'কে একটু হাওয়া কচ্ছি !"

বল্লাম, "দূর পাগ্‌লী ! ও তোকে কত্তে ব'লেছে কে ? ওতে কি হ'বে ?"

সপ্রতিভ কণ্ঠেই তার ঝাঁকড়া চুলের গোছাটি দুলিয়ে সে অম্‌নি ব'লে উঠ্‌লো, "বাঃ রে ! আমায় একেবারেই বোকা পেয়েছ কি না ? শুধু শুধুই বুঝি আমি এ

কর্‌ছি ?—হুঁ ! তা নয় গো, তা নয়। দেখেছো,—রোদ্দুর তো গরম হয়েছে, য়্যাঁ ?

"হ্যাঁ, তা হ'য়েছে বৈকি !"

"তবে ? তোমাদের গা যখন রোদে পুড়ে গরম হ'য়ে ওঠে, তখন কি কর ? বাতাস দিয়ে তা' ঠাণ্ডা করো না ?"

"করি তো,—তার কি ?"

"তা হলে, গরম রোদ্দুরের গায়ে বাতাস দিলে তাও ঠাণ্ডা হবে না ? এম্‌নি বাতাস খেয়ে খেয়ে রোদ্দুর যদি একবার ঠাণ্ডাই হয় তো ভাবো তো কী মজাটাই তখন হ'বে ! রোজ রোজ দেখতো গরম রোদ্দুরের ভিতর মানুষগুলো কেমন ছট্‌ফট্ ক'রে দিন কাটায়। ঠাণ্ডা রোদ্দুর পেলে—বাস্ !—কারুর আর কোন কষ্টই হ'বে না ; দিব্যি হেসে খেলে মনের আনন্দেই সবাই দিন কাটাতে পার্‌বে ! এ তোমার কাড়ি কাড়ি ইংরিজী মুখস্থ করা নয় ; এ দস্তুর মত জ্ঞানের কথা হে !"

তার সেই অপূর্ব্ব প্রতিভামণ্ডিত মুখের পানে চেয়ে মনটা আমার নেচে উঠ্‌ল। য়ুরোপের মেয়েরা নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, আমাদের দেশের মেয়েরা আজ পর্য্যন্ত ততদূর পৌঁছুতে পারে নি। ফেনিলা তাদের এ কলঙ্কটা নির্ঘাৎ ঘুচাবে। নিজের দিক্ থেকেও আমার খুসী হবার কারণ ছিল ঢের ; মাঠ ভেঙ্গে এতটা পথ যেতে হবে, রোদ্দুরটা গরম না হয়ে ঠাণ্ডা হলেই তো বাঁচোয়া। সে কথাটা ফেনিলাকে জানাতেই সে একান্ত নির্ভাবনায় আমার দিকে তাকিয়ে বল্লে, "তুমি যাও, কোন ভাবনা নেই তোমার ! বাতাস দিয়ে দিয়ে রোদ আমি ঠাণ্ডা ক'রে দেবই !"

আবার চল্‌তি পথে।

চল্‌তে চল্‌তে মাঠে এসে পড়েছি। হঠাৎ ঝোপের ভিতর থেকে আওয়াজ বার হল—ঘোঁৎ—ঘোঁৎ—! !

ফিরে দেখি—ওরে বাবা-রে ! এ'যে মস্ত এক দাঁতালো শূয়োর ! পরিত্রাহি-রবে উঠে' প'ড়ে অম্নি ভোঁ দৌড়···! শূয়োরও ছুট্‌লো পেছু পেছু···! আর যা-ই হোক্, সে-টা আদর্শ-বীর কখনোই নয় ; নইলে পলায়িত শত্রুর পিছনে কখনো তাড়া

করে ?···ছুট্‌ছি তো ছুট্‌ছিই ! বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, নিঃশ্বাস নেই, প্রশ্বাস নেই, একদমে একবারে···ছুট্‌-ছুট্‌-ছুট্‌ ! পিছনেও শুনি···হুট্‌-হুট্‌-হুট্‌ ! ওরে বাবা, ডাইনে যাই তো সেটাও চলে ডাইনে ; বাঁয়ে চলি তো সেটাও যায় বাঁয়ে ! নিরুপায়—নিরুপায় ! কোনো দিকেই আজ আর রক্ষা নেই ! আজ নির্ঘাৎ মরণ ! যে দাঁতাল শূয়োর,··· আর যে ও'র গোঁ—!

পেছনে একটা চোরা চাউনি দিতেই জানোয়ারটার চোখের দিকে নজর পড়্‌ল, বাবারে বাবা, চোখ নয় তো যেন দুটো আগুনের গোলা। হঠাৎ কিন্তু সেই সময়েই একটা কথা মনে পড়ে গেল যার দৌলতে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে আজ তোমাদের এ সব কথা শোনাবার সুযোগ পাচ্ছি।

ফোর্থ্‌ ক্লাশে পড়্‌লে কি হবে, বিজ্ঞান জিনিষটার ওপর বরাবরই আমার খুব দখল। বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রবি ঠাকুরের একখানা বইয়ে পড়েছিলাম যে চোখ বুজ্‌লেই পৃথিবীটা এক্কেবারে অন্ধকার হয়ে যায়। চোখে আর কিছুই দেখা যায় না, তা সে বাইরে যতই খট্‌খটে রোদ থাক্‌না কেন। বুঝ্‌লাম এই বৈজ্ঞানিক তথ্যটিকে পরীক্ষা কর্‌বার এত বড় সুযোগ জীবনে আর কখনো পাব না। অম্‌নি গুরুদেবের নাম স্মরণ করে তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেল্লাম। সঙ্গে সঙ্গে কি ঘোর পরিবর্ত্তন ; বিজ্ঞানের কি অপার মহিমা ! কোথায় গেল সেই খট্‌খটে কাঠ-ফাটা রোদ, তার জায়গায় এলো কিনা—সূচিভেদ্য ঘুরঘুটি অন্ধকার ! ছ্যাঁচ্‌ড়া শূয়োরটা এবার ভারী মুস্কিলে পড়ে গেল, সেই অন্ধকারে চোখে মালুম এলে তো আমায় তাড়া কর্‌বে ! আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে আমি গুটি গুটি এগিয়ে চল্লাম, লোকালয়ে এসে পৌঁছাবার আগে একবারটীও থামিনি। এম্‌নি ভাবে বিজ্ঞানের কৃপায় সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে 'শ্রীদুর্গা' বলে আবার আমার গন্তব্য পথে অগ্রসর হলাম।

আর এক গাঁয়ের মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দেখি কতকগুলি লোক জুতো পায়ে ধুচ্‌নি-ছাতা মাথায়, কাপড় তুলে, ঠায় রোদ্দুরের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে—নড়েও না চড়েও না। তাদের সবার পিঠে, কোলে, বগলে, কনুইতে কতগুলো ঘট বাঁধা। এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেসা করাতে জানা গেল সে দেশে এবার দারুণ অনাবৃষ্টি হয়েছে—খালে বিলে একফোঁটা জল নেই। কিন্তু তাতে করে কাবু হবার পাত্তর এরা নয়। আকাশ

থেকে তরল আগুন ঝরে পড়ে গোটা বিশ্বটাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আর তারই তলায় এরা নির্ব্বিকার-চিত্তে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেন বলতো ? অতি সোজা প্রশ্ন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের গা দিয়ে ঘামের নদী বয়ে যাবে—তখন সেই ঘামকে ঘটের ভেতর পূরে ফেল্লেই হ'ল। ঘাম শরীরের বিষাক্ত জলীয় পদার্থ হলেও অপর্য্যাপ্ত সঞ্চয়ের শেষে যখন তাকে ফিট্‌কিরি-কর্পূর প্রভৃতি দিয়ে

কেন বলতো ?

নানা রকম প্রক্রিয়ায় 'পিউরিফাই' করে নেওয়া হবে তখন কি সে পিপাসায় শান্তি ও স্বাস্থ্য-শান্তি দুই-ই আমাদের দিতে পার্‌বে না ? নিশ্চয় পার্‌বে। হেসেই উড়িয়ে দেবার কথা নয় দাদা ! আমেরিকান্‌ ভায়ারা যদি যত রাজ্যের নোংরা জিনিষকে পিউরিফাই করে পরম পবিত্র করে নিতে পারে তবে এদের এই জ্বলন্ত কীর্ত্তিটাই শুধু উপহাস্য হতে যাবে কেন ? ভালই হোক্‌ আর মন্দই হোক্‌, জগৎকে ফাঁকি না দিয়ে যারা একটা কিছু করে তাদের আমি অন্তরের সঙ্গেই শ্রদ্ধা করে থাকি।

অম্‌নিভাবে ছাতা মাথায় আর জুতো পায়ে দিয়ে নেবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। একজন উত্তরে বল্লেন "এও বোঝনা, সবদিক্‌ই সাম্‌লে চল্‌তে হয়—

শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি হে ছোকরা, শ্রেয়াংসি বহু-বিঘ্নানি। পা যদি তেতে উঠে একবার তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে, তবে কতখানি ঘাম মাটীতে পড়ে নষ্ট হবে খেয়াল রাখ? আবার মাথাও যদি গরম হয়ে মানুষকে পাগল করে দেয় তবেও কোন কাজ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ওদুটীকে বাঁচিয়ে তারপরে অন্য কাজ। তাই আমরা এমন জুতো মাথায় আর ছাতা পায়ে—থুড়ি ছাতা মাথায় আর জুতো পায়ে কাজে আত্মনিয়োগ করেছি।”

এমনি ভাবে নানান্ কথার আদান-প্রদান হ'তে হ'তেই জান্‌তে পার্‌লাম, মানব-শরীর থেকে এমন চমৎকার ভাবে জল সংগ্রহার্থ এই ঘটবাঁধা প্রণালীর প্রবর্ত্তক তাদের দেশের স্বনামধন্য ডাক্তার ভজঘট। [মূল নাম, ভজহরি ঘটক ; ঘটবাঁধা নিয়মের প্রচারের পর থেকে ডাক্তার ভজঘট নামেই এখন তিনি সর্ব্বসাধারণে পরিচিত।]

এই ভজঘট নামটার তিন রকমে মানে করা চলে। এক,—ভজঘট,—কি না, ঘট ভজনা কর,—এই মন্ত্রের যিনি প্রচারক তিনি হ'চ্ছেন, ভজঘট! তারপর দুই নম্বর, যে স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষ দেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্যে এম্নি এক বৈজ্ঞানিক-বিপ্লব ঘটিয়ে এক ভজঘট-কাণ্ডের স্বৃষ্টি কত্তে পারেন, তাকেও কি তা'হ'লে ভজঘট নামে অভিহিত করা যায় না?

অতঃপর তৃতীয় কারণটী তোমাদের মধ্যে যারা সংস্কৃত জান তারা অতি সহজেই বুঝে ফেল্‌তে পার্‌বে। তোমাদের জানা আছে শব্দের উত্তর স্বার্থে 'ক' প্রত্যয় হয়—যেমন বাল + স্বার্থে ক = বালক। স্বার্থে যদি ক যোগ হয়, তবে তোমরাই বল, নিঃস্বার্থে কেন 'ক' বাদ যাবে না? শুন্‌লাম, ভজঘটক ডাক্তার সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে এই আবিষ্কারটী করেছেন, কাজেই তাঁর নাম থেকে 'ক'টী বাদ যাবে, রইবে শুধু ভজঘট! এ পাণিনির সূত্র, চালাকি নয়!

কিন্তু যাক্ সে কথা। এদের উদ্যম দেখে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করা গেল। অনাবৃষ্টি ও জলের অভাব তো আমাদের দেশে হর-হামেশা লেগে-ই আছে। তার প্রতীকারের আপাততঃ একটা সহজ পথ তো জানা রইলো!

এম্‌নি ভাবে নানান্ বৈচিত্র্য-পূর্ণ ভ্রমণের পরে শেষটায়—এসে তো পৌঁছান

গেল দাদার শ্বশুরবাড়ী! কিন্তু কোথায় সেখানে জামাই-ষষ্ঠীর আয়োজন, আর কোথায়ই বা সেখানে কুটুম্বের ছেলের এতটুকু আদর-আপ্যায়ন পাবার প্রত্যাশা! শুধু সে বাড়ীর আর এক অভ্যাগত কুটুম্ব মনোরঞ্জন বাবুর হাতের এক কাপ 'চায়ের ধোঁয়া' উঠে, সেই নির্জ্জনতার বুকে এক মৌন-মাধুরী দান কর্‌ছিল। তারি কতটুকুর আস্বাদন নিয়ে অন্তরটিকে কথঞ্চিৎ শান্ত করা গেল! কুমুদরঞ্জনের ভাষায় মনে হ'লো, মনুবাবু চায়ের পেয়ালায় বুঝি বা অমৃত পরিবেষণই কল্লেন! যাক্,—কিন্তু এঁদের আক্কেলটা কি? নিমন্ত্রণ ক'রে তারপর কিনা এই ব্যবহার! অবিশ্যি সবটা দোষই যে এঁদের ঘাড়ে চাপাবো, তাও পাচ্ছি না—আমার দেরী করে এসে পৌঁছানোর ত্রুটীটুকুও কম অপরাধ নয়! আসল কথা তাঁরা কেউই তখন বাড়ী ছিলেন না, সুতরাং কেই বা কর্‌বে আমায় আদর-যত্ন আর কেই বা কর্‌বে অভ্যর্থনা। শুন্‌লাম দাদার শ্বশুর মশাই জামাই-ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌বার জন্যে বাড়ীর সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিজের শ্বশুরবাড়ী গেছেন। সে জায়গাটা খুব বেশী দূরে নয়, কাজেই অনেক বুদ্ধি খরচ করে 'শ্বশুরস্য শ্বশুর বাড়ী' গিয়ে হানা দেওয়াই ঠিক করে ফেল্লাম। ওমা! সেখানে গিয়ে কি শুনি জান? সে শ্বশুর মশাইও নাকি ঐ একই কারণে গেছেন সগোষ্ঠী সমাগত পরিজনদের নিয়ে তাঁর নিজের শ্বশুরবাড়ী। গেলাম আবার সেদিকেই। সেখানে গিয়েও জানা গেল, সে শ্বশুরও নিমন্ত্রণ রাখ্‌তে হয়েছেন—তাঁর শ্বশুরালয়ের অধিবাসী।

হায় গো হায়, এম্‌নি ক'রে যদি শ্বশুরবাড়ীর পর শ্বশুরবাড়ীর রেকারিং ডেসিম্যাল চল্‌তে থাকে তো সে যে দেখ্‌ছি, দুনিয়ার আদিম শ্বশুরবাড়ীতেই গিয়ে শেষ হ'বে! সে কোথায়? তা'র জন্যে কত যুগ-যুগান্তের য়্যাড্‌ভেঞ্চারই বা প্রয়োজন কে বল্‌বে আজ! সুতরাং সে অসাধ্যসাধন থেকে আপাততঃ নিবৃত্ত হ'য়ে অনারারী পোষাকে এবং অনাহারী ভাবে সুবোধ ছেলের মতো গুটিগুটি ঘরের পথেই আবার পা বাড়ালাম!

ঘরের পথে তো ফির্‌চি—মধ্য মাঠে কি বল্‌বো ভাই? জ্যোছনা রাত্তির; চাঁদের আলোয় চারদিক্ ফিক্ ফিক্ ক'রে হাস্‌চে; রাতও হ'য়েছে নিঝুম; চল্‌ছি একা একা; গা কর্‌ছে ছম্ ছম্;—মধ্য মাঠে শুনি কি, পিছন থেকে কে যেন গান গাইছে! ভারী মিষ্টি সুর! কি গাইছিল জানো? গাইছিল—

'জামা' গায়ে দিয়েই বাবু হ'য়ে গেলেন 'জামাই'!
হোঃ হোঃ হোঃ! আস্‌চে হাসি, কেম্‌নে বলো থামাই?
"নিমা" গায়েই তা হ'লে সে
নবদ্বীপের 'নিমাই' এসে
হরিনামে ভাসালো দেশ! বলে গেলেন মামা-ই!
বুঝ্‌ছো কিনা,—বুঝ্‌লে কিনা, ও ভাই সখের জামাই?

পিছন ফিরে' চেয়ে দেখ্‌লাম, কেউ কোথাও নেই; দিব্যি চারদিক্ ফাঁকা, জ্যোছ্‌নায় ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ আর ফিক্ ফিক্ ক'রে হাস্‌ছে! এদিক্ ওদিক্ চারদিক্ ফির্‌লাম—কই, কেউ তো নেই! তবে কে গাইলে গান? বুকটা ধুক্ ধুক্ ক'রে উঠ্‌লো!

ভয়ে ভয়ে মাঝে মাঝে চকিত চোখে পেছুপানে চেয়ে চেয়ে সাম্‌নের দিকেই হেঁটে চল্লাম। হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে উদোম মাঠ পাড়ি দিয়ে পৌঁছালাম এসে আমাদের গাঁয়ের ধারে! বুকের ধুক্‌ধুকি, মনের আতঙ্ক, শরীরের শিহরণ তখনো থামেনি। তবু খানিকটা হাঁফ ছেড়ে নিয়ে প্রাণপুরুষকে একটু নিশ্চিন্ত করতে চাইলাম। হঠাৎ পেছন থেকে শুন্‌লাম এক ভীম-গম্ভীর আওয়াজ···

—হালুম!

মা—গো, এ আবার কি? পিছন ফিয়ে চেয়ে—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই অম্‌নি আমার একেবারে মূর্চ্ছা! ইয়া ভীষণ, আর ইয়া লম্বা এক শার্দ্দূল বর্ম্মা সেখানে দাঁড়িয়ে লাল টক্‌টকে এতখানি জিভ বের করে চক্ চক্ ক'রে সেটির জল সাম্‌লাচ্ছেন! আত্মারাম, তুমি কোথায়? ধক্ ধক্ ক'রে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে দাঁতকপাটি লেগে পড়ি আর কি! এমন সময় মাভৈঃ মন্ত্রে তিনি মানুষের ভাষায় আমাকে আশ্বাস দিয়ে বলে উঠ্‌লেন, "ভয় নেইরে! আমি অখিল নিয়োগীর 'বাঘমামা'; একটু দরকারেই তোর কাছে এসেছি! তোর ঐ 'জামা'টা খুলে আমায় দে—আমি একটু 'জামাই' সেজে শ্বশুরবাড়ী ঘুরে আস্‌বো!

তাঁর কথায় আশ্বস্ত হ'য়ে নির্ব্বিরোধে জামাটি খুলে' তাঁর হাতে দিলাম।

আপত্তি তুল্‌বার মতো শক্তি বা সাহস আমার হ'লো না। বাব্বাঃ,—যে 'নখর-দন্ত-রক্তনয়ন' তাঁর, ও দেখে' কেউ আপত্তি করতে পারে?

তিনি খুসী হ'য়ে হাসি ছড়িয়ে বল্লেন, "প্রীত হ'লুম্ [হালুম্?] বৎস, তোমার ব্যবহারে! আশীর্ব্বাদ করি, মানুষ হও। আমার লেজে যত 'গুলিন্' লোম আছে, তত বৎসর পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক।"

তারপর রাত-দুপুরে তো 'পুনর্মূষিকো' হ'য়ে আবার নির্ব্বিঘ্নে এসে' ঘরে পৌঁছানো গেল! দরজার কাছে এসে' ডাক্‌লাম, "মা,···মা,···"

খট্ ক'রে খিল্ খুলে' সেখানে দাঁড়িয়েই মা বল্লেন, "এই যে,—ঘরে আয়। তারপর, সব ভালো তো?"

বল্লাম, "সে কথা এখন থাক্ মা! আগে একটু ঘুমিয়ে নি!"······

এই যে এতখানি কথা, এ তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, আগাগোড়া একেবারে মিথ্যা! এ'র ভিতর বিন্দুমাত্রও সত্য নেই। তা' ঠিক, তবে এইবার একটা ছোট রকম সত্য কথা বলি শুনে' নাও। আমার কোনো দাদা নেই; আমি মাত্র এক মার এক ছেলে! আর যা'-কিছু বল্লাম, তা' সবই
খাঁটি-স্বপ্নাদ্য!···

বিশ্বাস হ'লো? তবে আজকার মতো বিদায় বন্ধু!

খোদার উপর খোদ্‌কারী

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

শুনেছি কে একজন নাকি বলেছিলেন, "হায়রে, ভগবানের এম্‌নি বিচার, কুমড়া, কদু রেখে কি না ক্ষুদে সরষের মধ্যে দিলেন তেল!"—ব্যাপারটা সত্যি কি না জানি না, তবে সরষের বদলে কুমড়া পিষ্‌লেই যদি তেল মিল্‌তো তবে আমাদের খাটুনি যে অনেক কমে যেত সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। তবে অবশ্য আজকাল বিজ্ঞান ভগবানের উপরও যেমন টেক্কা দিতে আরম্ভ করেছে, তা'তে যে কয়েক বছরের মধ্যে এম্‌নি কোন আজব ব্যাপার সম্ভব করে তুল্‌তে পারবে না, তা বলা শক্ত।

এই ত' সেদিনকার কথা, একটা কাগজে দেখ্‌ছিলুম, চীন দেশের কোন্ এক ডাক্তার নাকি সিম জাতীয় একটা ফল থেকে খাঁটি গাইয়ের দুধের মত একটা জিনিষ বের করেছেন। এই দুধ খেলে গাইয়ের দুধের মতই ফল পাওয়া যাবে। ফলের রস বলে কোন রকম অনিষ্ট হবারও আশঙ্কা নেই। কিন্তু একেবারে চোখে আঙ্গুল দিয়ে 'খোদার উপর খোদ্‌কারী' কর্‌ছেন, উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিকেরা। ব্যাপারটার পত্তন অবশ্য হয়েছিল অনেক দিন আগেই, কিন্তু সবার কাছে খোলা পুঁথির মত সরল করে সেটাকে ধরেন একজন মার্কিণ ভদ্রলোক। তাঁর নাম হলো লুথার বারবেঙ্ক।

বারবেঙ্ক ছিলেন রূপকথার যাদুকরের মত। ছোট বেলা পড়েছিলাম কোন্ এক যাদুকর নাকি তার যাদুদণ্ড বুলিয়ে দিয়ে মস্ত বড় পাহাড়কে একটা হীরে জহরতের খনি করে ফেলেছিলেন। লুথার বারবেঙ্কও তার চেয়ে বড় কম যান না। মাটির

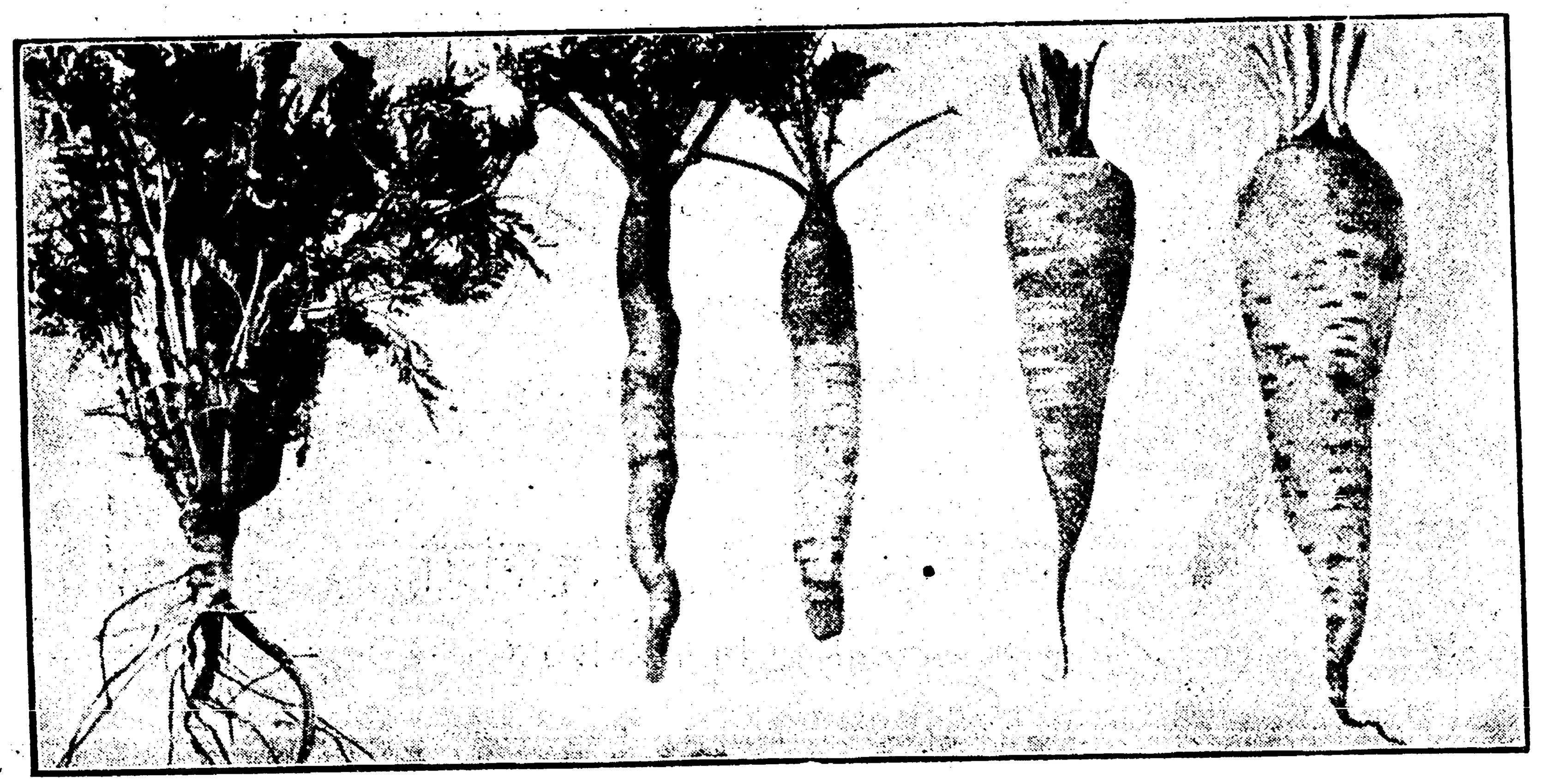

বাঁদিকের ঐ বাজে শিকড়টাকে ডানদিকের মূলায় এনে পরিণত করা হয়েছে।

পাহাড়কে হীরে জহরৎ কর্‌তে না পারলেও বনের বাজে জঙ্গলগুলিকে তিনি চমৎকার ফুলের ঝোপ করে তুলেছিলেন, মানুষের অখাদ্য ফলগুলিকে করে তুলেছিলেন সুস্বাদু, মিষ্ট, সুন্দর।

লুথারের নূতন ফলের মধ্যে সব চেয়ে নামজাদা হচ্ছে আলু। বারবেঙ্কের আগে

আলুগুলি জন্মাত ভারী বদ্‌খৎ চেহারা নিয়ে। দেখ্‌তে মোটেই সুন্দর নয়, তুল্‌তেও অসুবিধে, আর আকারেও ছোট। তিনি কর্‌লেন কি, কতগুলি আলুর মধ্যে যেগুলি দেখ্‌তে বেশ সুন্দর সেগুলি ক্ষেতে লাগালেন ; তারপর তাদের যে ফল হলো, তার মধ্যে সব চেয়ে ভালগুলি আবার লাগালেন। এবারে যা হলো, তার প্রায় সবগুলিই দেখ্‌তে বেশী সুন্দর। তার মধ্যেও বেছে বেছে সুন্দর সুন্দর আলুগুলির আলাদা চাষ হতে লাগ্‌লো।—এইভাবে তিনি সুন্দর আর বড় আলু কর্‌লেন, আলুর চাহিদা বেড়ে গেল, আমেরিকারও লাভ হতে লাগ্‌ল যথেষ্ট।

তোমরা আঁশ ফল দেখে থাক্‌বে। তিনি একরকম সাদা আঁশ ফল করেছিলেন। তা ছাড়া, নতুন নতুন ফলও তিনি জন্মিয়েছিলেন প্রচুর। তাঁর ফলের এক-টার নাম হলো পমেটো—আলু আর বিলাতী বেগুনের মাঝামাঝি ('পটেটো'র প, আর টমেটোর মেটো)। আর একটার নাম Plumcot (কুল আর অপ্‌রিফলের মাঝামাঝি)। আর একটা হলো Wonderberry (একটা আজব রকমের আঁশফল)। এ ছাড়া তিনি কত বুনো ফলকে যে ভাল, সুন্দর ও খাবার উপযোগী করে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই।

ওপরের ঐ গোলারটাকে নীচের পুরুষ্টু ফুলে পরিণত করেছে।

মরুভূমিতে Cactus বলে 'মনসা' গাছ জাতের মস্ত মস্ত গাছ জন্মায়, আর জন্মায়ও

তা প্রচুর পরিমাণে। বারবেঙ্ক ভাব্‌লেন, তাইত, এই Cactus জিনিষটা যদি খাবার উপযোগী করে তুল্‌তে পারা যায়, আর এর গায়ে যদি কাঁটা না থাকে, তাহ'লে আর মরুভূমিতে চল্‌তে কারও কষ্ট হবে না। তিনি Cactus নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ কর্‌লেন, আর কয়েক বছরের মধ্যেই কাঁটাহীন মনসা গাছ বার করে ফেল্‌লেন; কিন্তু মরুভূমিতে গিয়ে আর তার পরীক্ষা করা হলো না—উদ্ভিজ্জগতের এ যাদুকর তার আগেই সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

বারবেঙ্ক আর এখন নেই, কিন্তু তা বলে যে তাঁর কাজ চল্‌ছে না, তা যেন মনে করো না। ছোট্ট, কুৎসিৎ, অখাদ্য বুনো ফুলফলগুলিকে বড় সুন্দর, সুস্বাদু করে তোলবার চেষ্টা করা হচ্ছে, আর তা'তে নতুন নতুন ফুল, ফলও জন্মাচ্ছে যথেষ্ট, দুতিনপাতা-ওয়ালা গোলাপ বদ্‌লে গিয়ে চমৎকার একটী অনেক-পাঁপড়িওয়ালা ফুল হচ্ছে, ছোট জাতের কপিগুলি হচ্ছে ধামার মত দেখতে, সরু সরু মূলোগুলি হচ্ছে ইয়া মোটা সোটা।

এম্‌নি করে দিন দিন দেশবিদেশের লোক সংখ্যা বাড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে, ও সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যেমন নতুন নতুন জিনিষের প্রয়োজন বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক তেম্‌নি সে প্রয়োজন মেটাবার উপায়ও হচ্ছে চমৎকার।

রঙ্গ-কণা

(শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত)

ভিক্ষুক—বাবু! আমি বড় গরীব। গাড়ীতে আমার একটী হাত কাটা গেছে।

বাবু—তা আমি কি করব বাছা, আমার কাছে ত আর কোন হাত নেই।

(শ্রীযতীন সাহা)

—এক—

তিন তিন বার আক্রমণ করেও যখন দুর্জ্জয় পুরের রাজা অজয় সিংহকে হারাতে পার্‌লেন না সমর সিংহ তখন পণ করে বস্‌লেন- এই তাঁর শেষ আক্রমণ। এ আক্রমণে হয় দুর্জ্জয় পুরের জয়, নচেৎ তাঁর চিরপরাজয়।

সাত সাতটা বছর ধরে সমর সিংহ শুধু দলে দলে সৈন্য গঠন করতে লাগ্‌লেন। রাজ্যের সমস্ত অর্থ ব্যয় হতে লাগ্‌লো শুধু সেই হিংস্র প্রবৃত্তিকে সতেজ রাখ্‌বার জন্যে।

এদিকে রাজ্যময় প্রজাদের হাহাকার রব উঠ্‌লো—দুর্দ্দান্ত সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচারে ব্যথিত হয়ে তারা রাজার দুয়ারে নালিশ জানালো। রাজা তাদের কথা শুনে শ্লেষের হাসি হেসে বল্‌লেন, "রাজ্যের রাজার অপমানের চাইতে প্রজাদের দুঃখ বড় বেশী কথা নয়। সৈন্যদের যা খুসী কর্‌বে; কেউ তাতে বাধা দিতে পার্‌বে না। এদের দিয়েই তো আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে!"

প্রজারা চোখের জল নিয়ে ঘরে ফিরে যায়;—দুঃখ তাদের কেউ বোঝে না।

—দুই—

সাত বছর পর সত্যিই এক দিন রাজা অমর সিংহের দুর্গদ্বার খুলে গেল। রাজার ইঙ্গিতে সেনাদল বেরিয়ে পড়্‌লো; ঠিক ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রেরই মত।

রাজার হাতী চল্‌লো সেই বিপুল সেনাদলের পেছু পেছু - দুর্জ্জয়পুরের গড়ের দিকে।

গ্রাম, নগর, প্রান্তর উজাড় করে তারা এগিয়ে চল্‌লো। প্রাণে তাদের দয়া নেই, মায়া নেই—পাথরে গড়া তাদের সে প্রাণ! পাথরও হয় তো গলে; কিন্তু তাদের প্রাণ গলে না,—এম্‌নি কঠোর এম্‌নি নির্ম্মম।

ভেরীর ভৈরব নিনাদে, রণ-ডঙ্কার তালে তালে তারা সব পা ঠুকে চল্‌লো—বীর দর্পে। চার দিক্ ধূলোয় অন্ধকার হয়ে গেল আর তারই ভেতর থেকে শুধু রব উঠ্‌-লা, "সামাল—সামাল!"

দিনের পর দিন সে গর্জ্জন এগিয়ে এসে একদিন দুর্জ্জয়পুরের গগন কাঁপিয়ে তুল্‌লো।

দুর্জ্জয়পুরের রাজা অজয় সিংহ অপ্রত্যাশিত এই খবর শুনে দু' চক্ষে অন্ধকার দেখ্‌লেন। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বল্‌লেন, "মন্ত্রী! এখন উপায়?"

মন্ত্রী মশায় বিজ্ঞের মত মাথা চুল্‌কে বল্‌লেন, "মহারাজ! আপনার স্বর্গীয় পিতার কাছে বার বার পরাজিত হয়েও যে শত্রু মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শুধু আপনার উপর দিয়ে তার প্রতিশোধ নিতে, তাকে তার সমুচিত দণ্ড দেওয়াই তো আমার মতে উচিত। তাতে যদি রাজ্যের সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর্‌তে হয় তাও শ্রেয়ঃ।"

অজয় সিংহ একটু চুপ্‌ করে থেকে বল্‌লেন, "কিন্তু মন্ত্রী! বিনা কারণে যুদ্ধ!—না সে হয় না।—শুধু শুধু একটা রক্তপাত আমি ঘট্‌তে দেবো না, আর সেটাকে আমি সব চাইতে ঘৃণা করি।"

মন্ত্রী বল্‌লেন, "মহারাজ সে খুবই সত্যি; কিন্তু আমাদের এখন সে বিবেচনা কর্‌বার সময় নেই—পাপিষ্ঠকে তার সমুচিত দণ্ড দেওয়াই উচিত, ঐ শুনুন নিরীহ গ্রামবাসীদের করুণ চীৎকার। এখন তো আর চুপ্‌ করে থাক্‌লে চল্‌বে না? এতক্ষণ হয় ত বিপক্ষের সৈন্যেরা পরিখার কাছে পৌঁছে থাক্‌বে। উঠুন্ মহারাজ!"

—তিন—

সাত দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ চল্‌লো; কত যে লোকের প্রাণ বিনষ্ট হ'ল তার

ইয়ত্তা নেই। রক্তের স্রোত বয়ে গেল—গ্রামকে গ্রাম পুড়িয়ে দিয়ে উভয় দলের সৈন্য মরণের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো।

অজয় সিংহ যখন দেখ্‌লেন সমর সিংহের সৈন্য সমস্ত রাজপ্রাসাদ ছেয়ে ফেলেছে, তিনি জয়ের আশা ছেড়ে দিলেন। ছত্র-ভঙ্গ হয়ে তাঁর সমস্ত সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালাবার পথ খুঁজ্‌ছে, ঠিক এম্‌নি সময় দুধের মত ধব্‌-ধবে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এলো এক তরুণ যুবক; দেখ্‌তে কিন্তু সে ঠিক বালকের মতই সুকুমার। আর কি চমৎকার তার চেহারা, বুঝি রাজার ছেলেও তার রূপের কাছে হার মানে।

বালক—এই নামেই আমরা তাকে অভিহিত কর্‌ব—ঘোড়া চালিয়ে এসে অজয় সিংহের বিচ্ছিন্ন সেনাদলের মাঝে দাঁড়ালো। সবাই অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখ্‌লো, পরণে তার গৈরিক বসন, গলায় যজ্ঞোপবীত, মুখখানা শান্ত সৌম্য, চোখে তার উজ্জ্বল দৃষ্টি। বালক সৈন্যদের লক্ষ্য করে উচ্চকণ্ঠে বল্লে, "সৈন্যগণ! দুর্জ্জয়পুরের ভাগ্যলক্ষ্মী যদি ফিরাতে চাও তো বিনা বাক্যব্যয়ে আমার পশ্চাৎ অনুসরণ কর।"

কি আশ্চর্য্য! এক নিমেষে সব সৈন্যদের যেন কে যাদু করে ফেল্‌লো। মৌমাছির চাক ভাঙ্‌লে যেমন তারা পাগলের মত ছোটে, ঠিক তেম্‌নি করে সৈন্যেরা সব ছুট্‌লো সেই বালকের পিছু পিছু।

বালক দক্ষিণ হস্তে সজোরে তার তরবারি কোষ থেকে বের করে মধুর কণ্ঠে বল্‌লো, "জয় রাজা অজয় সিংহের জয়"। তার পর উন্মত্তের মত ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো বিপক্ষের সৈন্যদলের উপর।

রাজা অজয় সিংহ কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লেন না, শুধু দূর হতে হস্তি-পৃষ্ঠে চড়ে অবাক্‌নেত্রে এ দৃশ্য দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

—চার—

সাত দিন পর একদিন সন্ধ্যায় দুর্জ্জয়পুরের জয়পতাকা হস্তে ফিরে এলো সেই বালক, সাথে তার অগুন্তি সৈন্য। রাজা সসম্মানে তাকে প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে পরিচয় শুধালেন।

শান্ত, মধুর কণ্ঠে সে বল্‌লো, "রাজন্! দুর্জ্জয়পুরের রাজমুকুট যে আজ শত্রুর কর থেকে ফিরিয়ে এনেছে সে আপনারই রাজ্যের এক গরীব প্রজা—বনের

ফলে, ঝরণার জলে মানুষ—নাম তার দুলাল। এর চাইতে বিশেষ করে আত্ম-পরিচয় দেবার মতন তো আর আমার কিছুই নেই মহারাজ!"

অজয় সিংহ একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, "বালক, তোমার বয়সের হিসেবে শক্তি অসাধারণ! যদিও আমি দুর্জ্জয়পুরের রাজা, কিন্তু এ রাজমুকুট তোমারই মাথায় শোভা পায়!"

সসম্মানে দুলাল রাজাকে অভিবাদন করে করজোড়ে বল্‌লো, "মহারাজ, ও রাজমুকুটের মর্য্যাদা রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য নয়, তার চাইতে বনের ফল আর নদীর জলই আমার ভাল! আপনি অনুমতি করুন আমি আমার স্বাধীন পথে বেরিয়ে পড়ি।"

এর উত্তর কি দেবেন অজয় সিংহ বুঝি ভেবে পেলেন না। বালক আর একবার রাজাকে অভিবাদন করে প্রাসাদের বাইরে এসে বনের পথটা ধরে এগিয়ে চল্‌লো।

—পাঁচ—

মুষ্টিমেয় সৈন্য আর নিজের প্রাণ নিয়ে যখন সমর সিংহ নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন তাঁর কেবলই তখন মনে পড়তে লাগ্‌ল সেই বালকের কথা।—শুধু তার জন্যেই তো আজ এই পরাজয়! তাঁর মনে শত শত বার একই প্রশ্ন উঠ্‌লো, "কে সে বালক—কালবৈশাখীর মত উড়ে এসে সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল? সে যেই হোক্ অসাধারণ তার শক্তি। তাকে আমার চাই-ই।

রাজ-আদেশে দেশে দেশে চর চল্‌লো সেই বালকের খোঁজে।

দিন যায়, একদিন রাজার চর ধরে নিয়ে এলো সেই বালককে।

বন্দী বালক সমর সিংহের সম্মুখে বুক ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল! সমর সিংহ শুধালেন, "কুমার! শুধু তোমার জন্যই যে অপমান আমি মাথা পেতে নিয়েছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাকেই। কেমন পারবে তো—পুরস্কার তার—রাজ্যের অংশ।"

নির্ভয়ে বালক উত্তর করল, "রাজন্! আপনি কি বলছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—খুলে বলুন।"

সমর সিংহ বল্‌লেন, "বুঝতে পারছ না বালক? তোমাকে আমার পক্ষ নিয়ে দুর্জ্জয়পুরের রাজার বিরুদ্ধে সৈন্য-চালনা করতে হবে।"

বালক সরল ভাবে উত্তর দিল, "সৈন্যচালনা করবার ক্ষমতা আমার যথেষ্ট আছে মহারাজ, কারণ যদিও আমায় আপনি দেখ্‌ছেন অতি দীন দরিদ্র, তবুও ছোটবেলা থেকেই আমার পিতার কাছে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিলাম। সে যাক্—কিন্তু বৃথা রক্তপাতের পক্ষপাতী আমি নই।"

রাজা উত্তেজিত কণ্ঠে বল্‌লেন, "বৃথা নয় বালক;—এ প্রতিহিংসা!—পারবে তো?"

শাণিত কৃপাণ ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌ল।

ঠিক তেম্‌নি ভাবেই বালক উত্তর দিল—"না মহারাজ, আমি পারবো না!"

—"পারবে না?"

—"না, পারবো না!"

ক্রোধে অন্ধ হয়ে সমর সিংহ বালককে নিয়ে এলেন বধ্যভূমিতে—হাতে তাঁর শাণিত কৃপাণ ঝল্‌মল্ করে উঠ্‌লো।

বন্দী বালককে সজোরে আকর্ষণ করে সমর সিংহ তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বল্‌লেন—"বালক, এখনও বল, অজয় সিংহের বিরুদ্ধে আমার সৈন্য চালনা করতে পারবে কি না?"

কঠোর অথচ শান্ত কণ্ঠে উত্তর এলো—"না, কিছুতেই না।"

সমর সিংহ ক্রূর হাসি হেসে বল্‌লেন—"বালক, তুমি নির্ব্বোধ, নইলে একটা রাজত্বের জন্যেও......

সমর সিংহের কথা শেষ না হতেই বালক বীরের মত বল্‌লো— "মহারাজ, আপনি আমায় যতই প্রলোভন দেখান না কেন, আমি কিছুতেই আমার স্বদেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র-চালনা কর্‌তে পার্‌বো না।"

ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমর সিংহ গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন—"পার্‌বে না ?—তবে তোমার রক্তে তার প্রায়শ্চিত্ত হোক্‌—

—প্রহরী !"

প্রহরী ছুটে এলো—কিন্তু একটা সংবাদ নিয়ে। রাজাকে অভিবাদন করে সে এক খানা পত্র দিল। পত্র পাঠ কর্‌তে কর্‌তে সহসা সমর সিংহের ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো। চিঠি খানা মুঠোর ভেতর কসে ধরে তিনি আদেশ কর্‌লেন—"নিয়ে এসো।"

—ছয়—

প্রহরীর সঙ্গে যখন অজয় সিংহ এসে সমর সিংহের সম্মুখে দাঁড়ালেন, সমর সিংহ অবাক্‌ হয়ে শুধু তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

অজয় সিংহ মৃদু হেসে বল্‌লেন—"আপনার সন্দেহ হচ্ছে মহারাজ ? কিন্তু ভয় নেই, আমি নিরস্ত্র।" তারপর খোলা জানালাটা দিয়ে নীল আকাশের পানে কিছুকাল চেয়ে থেকে তিনি ধীর ভাবে বল্‌লেন—"মহারাজ, আপনি এই বালককে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌তে বল্‌ছিলেন না ? কিন্তু তার আর প্রয়োজন নেই। আজ সে খবর পেয়ে আমিই স্বেচ্ছায় আপনাকে শির দিতে এসেছি। কেন জানেন ? সে শুধু অই স্বদেশভক্ত বালকের প্রাণভিক্ষার জন্যে। আমাকে বন্দী করে বালককে মুক্ত করে দিন মহারাজ!—আজ থেকে আমার রাজ্যের প্রজারা আপনাকে রাজা বলে মেনে নিতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করবে না। এই নিন্‌ দুর্জ্জয়পুরের রাজ মুকুট।"

এতক্ষণ সমর সিংহ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় অসার হয়ে দাঁড়িয়ে অজয় সিংহের কথা গুলো শুন্‌ছিলেন কিন্তু তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই তাঁর হাত থেকে তরবারি খসে পড়্‌লো। নিমেষে তাঁর মনে হল—একি সত্যি না স্বপ্ন !

তারপর অজয় সিংহের হাত দু'খানা ধরে বল্‌লেন—"বন্ধু, আজ যে রাজায় আর প্রজায় মিলে আমায় পরাজিত কর্‌লে এ পরাজয় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি ;

কিন্তু তাই বলে আমি তোমাদের বন্দী কর্‌তে কুণ্ঠিত হব না। এই আমি দুজনকেই বন্দী কর্‌লাম বন্ধু!—এ কারাগার থেকে কেউ আর এ জীবনে তোমাদের মুক্ত কর্‌তে পার্‌বে না।—" বলে তিনি অজয় সিংহ এবং বালককে আপ্‌নার বক্ষে জড়িয়ে ধর্‌লেন।

চোখের কোণে তাঁর আনন্দাশ্রু ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌লো !

নূনের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

ছেলে বেলায় একটা মজার গল্প পড়িয়াছিলাম। এক সওদাগরের ছিল তিন মেয়ে। একদিন সওদাগর মেয়েদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁকে কে কি রকম ভালবাসে ? বড় দুই মেয়ে অনেক বড় বড় কথা বলিল, ছোটটি বলিল—"বাবা, আমি তোমাকে ভালবাসি ঠিক নূনের মতন।" শুনিয়া সওদাগর তো চটিয়া আগুন ! কি ? পৃথিবীতে এত সুন্দর সুন্দর জিনিষ থাকিতে মেয়ে কিনা তাঁকে ভালবাসে নূনের মত একটা বিশ্রী জিনিষের সাথে এক ভাবে ! তার মানে আর কিছুই না, মেয়ে তাঁকে মোটেই দেখিতে পারে না। সওদাগর অনেক গালাগালি করিলেন,—ফলে মেয়েটি মনের দুঃখে বাড়ী হইতে চলিয়া গেল। ঘটনাচক্রে সে দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে মেয়েটির হইল বিবাহ। বৌভাতের দিন অন্যান্য লোকের সাথে সওদাগরেরও নিমন্ত্রণ হইল। খাওয়ার কথায় সকলেরই আনন্দ হয়, তার উপর রাজবাড়ীর খাওয়া, না জানি সে কি ? সওদাগর মহানন্দে খাইতে চলিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া খাবার মুখে দিয়া সে আনন্দ তাঁর আর রহিল না। অমন চমৎকার চমৎকার জিনিষ, কিন্তু কোনটার মধ্যেই নূনের নাম-গন্ধও নাই—একেবারে বিস্বাদ। সমস্ত খাওয়াটাই একদম মাটী। সওদাগরের তখন মনে পড়িল সেই মেয়ের কথা যে বলিয়াছিল তাঁকে নূনের মত ভালবাসে। সত্যিই তো সে তবে তাঁকে ভাল বাসিত। কেননা আজ আর নূনকে বিশ্রী বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই ; ঐ একটি জিনিষের অভাবে আজ তাঁর এত বড় আনন্দটা একেবারে মাটী হইয়া গিয়াছে। তাঁকে তখন স্বীকার করিতে হইল নূনের মত জিনিষ আর নাই।

বাস্তবিক নূনের মত নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ আমাদের বোধ হয় খুব কমই আছে। দরকার মত নূন না পাইলে যে আমাদের কি অবস্থা হইত তাহা ধারণা করাও মুস্কিল। শুধু মুখের স্বাদের জন্য নয়, জীবনধারণের জন্যও বটে। জল না হইলে যেমন আমরা বাঁচিতে পারি না, নূনও ঠিক তেমনি। শরীর রক্ষার জন্য কোনটিকেই বাদ দিলে চলে না।

শুধু খাওয়ার জন্যই যে নূনের দরকার তা' যেন কেউ মনে করিও না। আমাদের দরকারী দরকারী কত জিনিষ যে নূন হইতে তৈরী হয় তা বোধ হয় তোমরা অনেকেই খবর রাখ না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, নূন তৈরী হইয়াছে দু'টি জিনিষ মিলিয়া।

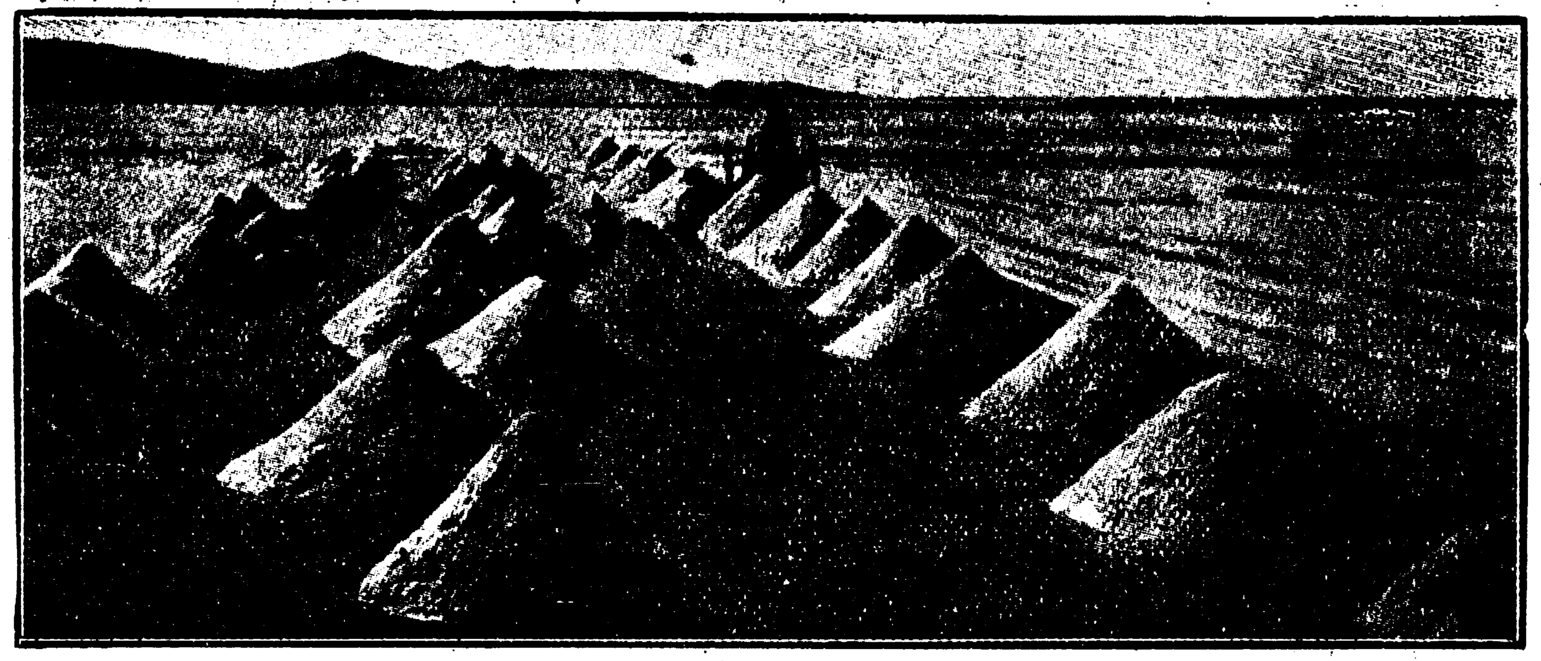

সমুদ্রের ধারে নূন জমাইয়া রাখা হইয়াছে।

—সোডিয়াম্ নামে একটা ধাতু আর ক্লোরিণ নামে একটা ফিকা সবুজ রংএর গ্যাস। এ দু'টির কোনটিই কিন্তু খাইবার জিনিষ নয়, বরঞ্চ ঠিক্ তার উল্টা। সোডিয়াম্ বড় সর্ব্বনেশে ধাতু। এক বাটি জলের মধ্যে এক টুক্রা সোডিয়াম্ ফেলিয়া দাও, অমনি দপ্ করিয়া সেই জলের মধ্যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। কিন্তু তা হইলে কি হয়, বৈজ্ঞানিকদের কাছে সোডিয়ামের ভয়ানক কদর। তাঁদের পরীক্ষাগারে উহা না থাকিলেই নয়।

ক্লোরিণ গ্যাসটি আরও ভয়ানক চীজ্। খানিকক্ষণ নাকের কাছে ধরিয়া রাখিলে সশরীরে না হইলেও একেবারে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গলাভ হইবেই।—এমনি দারুণ

বিষাক্ত। কিন্তু ভগবানের কি আশ্চর্য্য বিধান! এই দুই ভয়ানক জিনিষ একত্র মিশিলেই হইয়া যায় আমাদের খাবার জিনিষ নূন, যা না হইলে আমাদের এক দিনও চলে না।

সোডিয়াম্ আর ক্লোরিণ দুই-ই তৈরী হয় নূন হইতে। ক্লোরিণ্ গ্যাস বিষাক্ত হইলেও সভ্য জগতে উহা না হইলে এক দণ্ডও চলে না। জল বিশুদ্ধ করা, নানা রকম রোগের জীবাণু নষ্ট করা, এই সব কাজে ক্লোরিণের ভয়ানক দরকার। আর দরকার হয় ময়লা কিংবা রঙ্গিন জিনিষ সাদা করিবার কাজে। চুণের সাথে ক্লোরিণ মিশাইয়া এক রকম সাদা গুঁড়া হয়, তাকে বলে "ব্লিচিং পাউডার"। নানা ধরণের জিনিষ পত্র—জামা, কাপড়, কাগজ তূলা, সূতা যাই হউক না কেন, পরিষ্কার করিয়া নিখুঁৎ সাদা করিতে এই জিনিষটার যুড়ি আর নাই।

ধূলা, ময়লা আমাদের সারাক্ষণ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তার হাত হইতে রেহাই পাইতে হইলে সাবান ছাড়া আমাদের চলে না। সাবান বাদে কাপড় কাচিবার জন্য সোডারও দরকার। সাবান, সোডা এ গুলিও সবই তৈরী হয় নূন হইতে।

মাছ, মাংস, মাখন প্রভৃতি নানা রকম খাবার টাট্কা রাখিবার জন্য নূনের ব্যবহার তোমরা সকলেই বোধ হয় দেখিয়াছ। নূন দিলে খাবার সহজে পচে না, তাই এক দেশ হইতে অন্য দেশে খাবার চালান দিতে রাশি রাশি নূন ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া ছোট খাট কত রকম কাজে যে লোকে সর্ব্বদা নূন ব্যবহার করে তার আর কি হিসাব দিব? মাটীর বাসন চক্চকে করা, শীত-প্রধান দেশে শীতকালে বরফ গলাইয়া রাস্তা সাফ করা, বরফের কারখানায় বরফ তৈরী করা, নানা রকম ওষুধ-পত্র, এসিড এবং রাসায়নিক মাল মশলা তৈরী করা—আরও কত কি!

এখন কথা হইতেছে, এত নূন যোগাড় হয় কোথা হইতে? বড় বড় বৈজ্ঞানিক ব্যবসার কথা ছাড়িয়া দিয়া শুধু খাওয়ার কথাটাই ধরনা কেন? হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে পৃথিবীর প্রত্যেক লোকের খাইবার জন্য গড়ে বছরে ১৫ সের করিয়া নূন লাগে। পৃথিবীতে কত কোটি কোটি লোক, তাদের জন্য কোটি কোটি মন নূনের দরকার। তা ছাড়া অন্যান্য ব্যবসায় ধরিলেও বছর বছর লক্ষ লক্ষ মণ নূনের প্রয়োজন। এত নূন আসে কোথা হইতে?

এর উত্তরে তোমরা সকলেই কি বলিবে তা আমি জানি। পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগই যে সমুদ্র আর সেই সমুদ্রের জল যে লোণা, তা আর কে না জানে? কিন্তু সমুদ্রেই বা এত নূন আসিল কোথা হইতে?

আমাদের পৃথিবীর গায়ে, মাটীতে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে সর্ব্বত্রই কিছু না কিছু নূন মিশান আছে। বৃষ্টির জলে সেই নূন ধুইয়া প্রথমে নদীতে, তার পর সমুদ্রে গিয়া হাজির হয়। সমুদ্রের জল সূর্য্যের আলোয় বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, তার পর মেঘ হইয়া আবার মাটীর উপর ঝরিয়া পড়ে। কিন্তু লবণ গুলি ত আর বাষ্পের সাথে উড়িতে পারে না, সেগুলি সমুদ্রের মধ্যেই পড়িয়া থাকে। যুগের পর যুগ লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া এই ব্যাপার চলিয়া আসিয়াছে, আজও চলিতেছে;—আর এই জন্যই সমুদ্রের জল লোণা। সাধারণতঃ সমুদ্রের জলে শত করা তিন ভাগ নূন থাকে, কিন্তু কোন কোন সমুদ্রে নূনের ভাগ আরও বেশী। তোমরা মরু সাগর (Dead sea)র নাম অনেকেই বোধ হয় শুনিয়াছ। সেখানকার জলে শত করা ৮।৯ ভাগ নূন। এই নূনের জন্য সেখানকার জল এত ভারী যে তার মধ্যে তুমি অনয়াসে শুইয়া শুইয়া বই পড়িতে পার, ডুবিবার কোন ভয়ই নাই। সমুদ্রের জল ক্রমাগত শুকাইতে শুকাইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাশি রাশি নূন জমিতে জমিতে এই ব্যাপারে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমুদ্র হইতে নূন তৈরী করা ব্যাপারটা বিশেষ কঠিন নয়। লোণা জল হইতে জল টুকু কোন রকমে তাড়াইয়া দিতে পারিলেই হইল। যে দেশে সূর্য্যের আলো পাইবার বিশেষ অসুবিধা নাই সেখানে সূর্য্য ঠাকুরের উপরেই মানুষ এই কাজের ভারটা চাপাইয়া দেয়। সমুদ্রের ধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুকুরের মত বড় বড় চৌবাচ্চা বসান হয়। সমুদ্রের জল তার মধ্যে জমা করা হয়। তার পর সূর্য্যের আলোয় সে জল ক্রমে ক্রমে উড়িতে থাকে। লোণা জলের মধ্যে খাঁটি নূন ছাড়া আরও অন্যান্য জিনিষ থাকে। প্রথমটা এই গুলি তলায় জমিতে থাকে। উপরের লোণা জলটা তখন সরাইয়া অন্য একটা চৌবাচ্চায় লওয়া হয়। সেখানে আবার খানিকটা জল উড়িয়া যায়। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত জল শুকাইয়া গেলে পড়িয়া থাকে কতকগুলি নূনের ঢিপি। বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে এই নূনই চলে। খাওয়ার জন্য হইলে

অনেক সময় আবার এই নূন নানা উপায়ে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। সূর্য্যের আলো তেমন না পাওয়া গেলে লোণা জল জ্বাল দিয়া জল তাড়ান হয়; ইহাতে অবশ্য খরচ বেশী।

শুধু সমুদ্র হইতেই যে সমস্ত নূন পাওয়া যায় তা' নয়। পৃথিবীর নানা জায়গায় নূনের পাহাড় আছে। খনির সাহায্যে সে নূন তুলিতে হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, এই সব জায়গায়ও এক সময় সমুদ্র ছিল। ক্রমে নানা কারণে হয়ত সমুদ্র সরিয়া গিয়াছে, কিংবা শুকাইয়া গিয়াছে—আর তার নূনগুলি পাহাড়ের মধ্যে পাথরের মত জমিয়া আছে। সব সময়ই যে আবার পাথরের মত চাকা চাকা নূন কাটিয়া বাহির করা হয়, তা নয়। অনেক সময় পাহাড়ের ভিতর বিস্ফোরকের সাহায্যে গভীর কূয়া খুঁড়িয়া তার মধ্যে জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ঐ জল নীচে গিয়া সেখানকার পাথুরে নূন গলাইয়া ফেলে। তার পর সেই লোণা জল পাম্প্ করিয়া বাহির করা হয়। অনেক সময় জল দেওয়ারও দরকার হয় না, পাহাড়ের তলায় লোণা জলের ঝরণা থাকে—নল খুঁড়িয়া সেই জল পাম্প্ করিয়া লইলেই হইল।

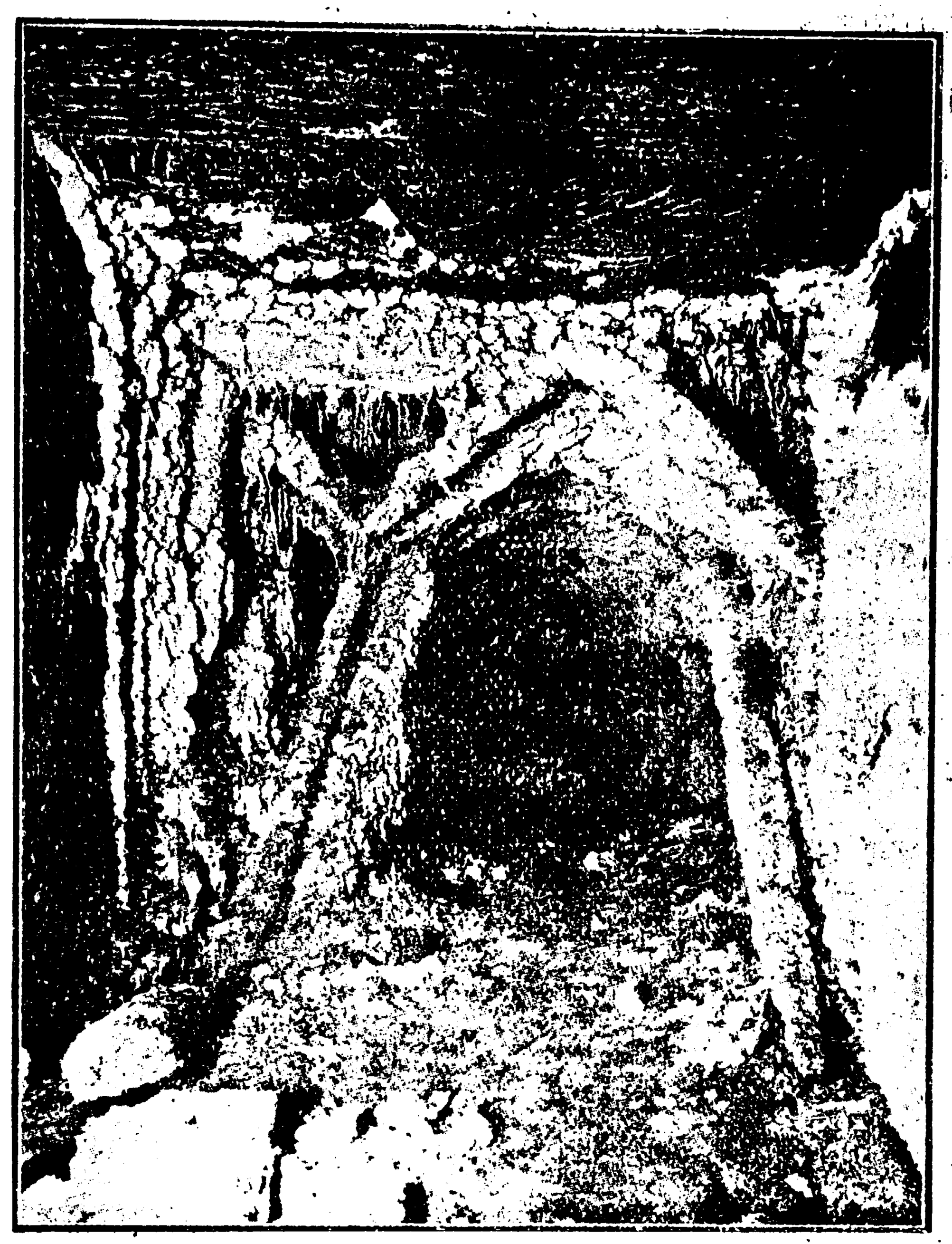

নূনের খনি।

এই সব লোণা জল জ্বাল দিয়া, জল তাড়াইয়া নূন তৈরী হয়। কখনও কখনও বাতাসের সাহায্যে গোড়ার দিকের খানিকটা কাজ আগাইয়া রাখা হয়। পরিষ্কার, বিশুদ্ধ নূন তৈরী করিতে হইলে শুধু জ্বাল দিলেই চলে না, নানা রকম মাল মশলা মিশাইয়া তাকে বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এই সব কাজের জন্য আজকাল অনেক কারখানায় আর সেকালকার মত "হাতা-কড়াই" এর উপর নির্ভর করা হয় না; তার জন্য থাকে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নানা রকম নতুন ধরণের যন্ত্র-পাতি, কল-কব্জা, বাসন—পত্র এই সব।

মেডেল-বিভ্রাট্

সেবার আমাদের ক্লাশে একেবারে হুলুস্থূল কাণ্ড পড়িয়া গেল। নিধিরাম ফটোগ্রাফ তুলিতে শিখিয়াছে, তাই তার মেজ মামা তাকে ছোট্ট একটা ক্যামেরা কিনিয়া দিয়াছেন। রোজ সে চামড়ার ষ্ট্যাপে বাঁধা ক্যামেরাটাকে পিঠে ঝুলাইয়া স্কুলে নিয়া আসে, তারপর ক্লাশ বসিবার আগে, টিফিনের সময়, ছুটির পর, ঝুড়ি ঝুড়ি ফটো তোলা হয়। দেখিতে দেখিতে আমাদের ডেক্স ফটোগ্রাফে ভর্‌তি হইয়া উঠিল। এত দিন আমার তো সম্বলের মধ্যে ছিল মাত্র আড়াই বছর বয়সের তোলা, ফ্রক্ গায়ে লোল-ঝরা একখানা ফটো। কিন্তু দিন পনেরোর মধ্যে শুধু আমার একারই দাঁড়াইল কম্‌সে কম্ চার পাঁচ খানা ছবি। তাও আবার হরেক রকমের। কোন খানাতে আমি পাগ্‌ড়ি মাথায় শিখ্ সর্দ্দারের বেশে, কোন খানাতে চেয়ারের উপর হাফ্-নিলডাউন। বিটু, রহিমের 'ফেজ'টা চাহিয়া লইয়া এমনি বীরবিক্রমে এক খানা ছবি তুলিল যে কে বলিবে সে কেমাল পাশা নয়, আমাদেরি বিটু, ওরফে হীরেন গাঙ্গুলী।

এই ভাবে প্রথম প্রথম খুব এক চোট ফটো তোলার পর বাতিকটা একটু কমিয়া আসিলে আমরা একদিন নিধিরামকে ধরিয়া বসিলাম, গোটা ক্লাশটার একটা গ্রুপ্ ফটো তুলিতে হইবে। শুনিয়া নিধিরাম তো প্রথমটা হাসিয়াই উঠিল, শোন কথা! তার অতটুকু এক রত্তি ক্যামেরা তাতে নাকি আবার সারা ক্লাশের ছবি তোলা যায়—যে ক্লাশে ছেলের সংখ্যা ত্রিশ জন। হিমাংশু নিধিরামের ভুল ধরিয়া

বলিল, "ত্রিশ কোথায়রে একত্রিশ তো! রামপদ নামে কাল যে নতুন ছোঁড়াটা ভর্ত্তি হল তাকে বুঝি হিসেবের বাইরেই ফেল্লি!"

নিধিরাম জবাব দিল, "দেখ বুদ্ধি! তাতে করে অসুবিধেটা আরও বাড়্‌লো না কম্‌লো রে?"

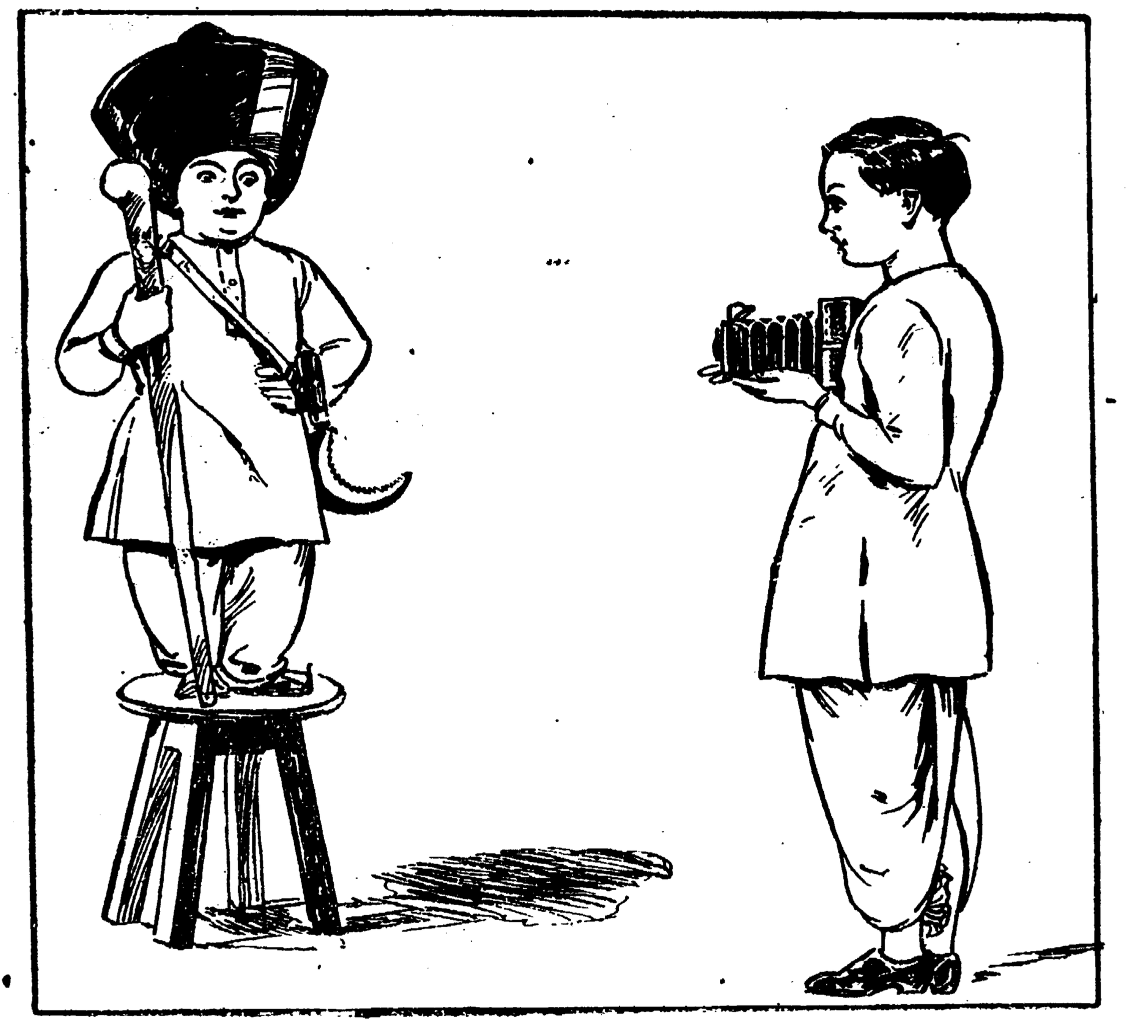

শিখ্ সর্দ্দারের বেশে।

হিমাংশুর মাথাটা বাস্তবিকই 'হিমাংশু' অর্থাৎ চন্দ্রদেবের মত গোলাকার, সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না যে অসুবিধাটা ইহাতে বাড়িবে কি কমিবে। কিন্তু আমরা তাকে বুঝাইয়া দিলাম, নিধিরাম ঠিক কথাই বলিতেছে। তারপর নিধিরামের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "তা বাপু, তুই এক কাজ কর্ না, তোর মেজ মামার বড় ক্যামেরাটা দিয়ে ছবিটা তোল। না হয় নাই বা হোল ইস্কুলে। সাম্‌নে পরশু দিনই তো রবিবার আছে, আমরা সবাই বরং খাওয়া দাওয়ার পর তোদের বাড়ী গিয়ে জুট্‌বো'খুন।"

নিধিরাম মনে মনে একটুখানি চিন্তা করিয়া তারপর কহিল, "এটা কিন্তু বুদ্ধি দিয়েছিস্ ভালই। আস্‌ছে রবিবার মামা বাবুদের সব শিকারে যাবার কথা আছে। দশটা বাজ্‌তে-না-বাজ্‌তে বড় মামা, মেজ মামা, ছোট মামা সব বাড়ীর বার হয়ে পড়্‌বেন। ফির্‌তে সেই রাত নটা। কাজেই ও দিনটাতে আমাদের ওখানে মেজ মামার বড় ক্যামেরায় ফটো তোলার বন্দোবস্ত করা যায় বটে!"

আমরা সকলে বলিলাম, "বেশ, তবে তাই কথা রইল, রবিবার দিন খাওয়া দাওয়ার পর বারোটার ভেতর সবাই তোদের বাড়ী গিয়ে জুটবো', সেই সময়েই ছবি তুলিস্ !"

নিধিরাম হাসিয়া বলিল, "ক্ষ্যাপা নাকিরে, বেলা বারোটার সময় অই চন্‌চনে রোদ্দুরে কখনো ফটো ভাল হয় ? সে তুল্‌তে হবে চারটের পর। তবে তোরা বারোটার সময় গিয়েই জুটিস্, বাকী সময়টা গল্প-গুজবে কাটান যাবে।"

রবিবার দিন বারোটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটাইয়া সকলে গিয়া নিধিরামদের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। দেখা গেল, বাড়ী হইতে রওয়ানা হইবার পূর্ব্বে ভাল ভাল জামা-কাপড় পরিয়া নিতে কারোই ভুল হয় নাই। সকলে আসিয়া একত্র মিলিলে নিধিরাম বলিল, "আজ তোদের সবাইকে এমন একটা জিনিষ দেখাব, যা দেখে তোরা বাস্তবিকই খুব খুসী হবি।"

"কি জিনিষরে ভাই, কি জিনিষ ?"

"ছোট মামার ছবির গ্যালারি।"

খুসী হইলাম সকলে বাস্তবিকই। নিধিরামের ছোট মামা একজন নাম-জাদা আর্টিষ্ট্; শুনিয়াছি জীবজন্তুর ছবি তিনি নাকি যেমনটী আঁকিতে পারেন, বাংলা দেশে তেমনটী আর কেহই পারে না। কিন্তু হইলে হইবে কি, তিনি ভারী রাসভারী লোক, তাঁর সেই গম্ভীর চেহারার সাম্‌নে গিয়া ছবি দেখার আব্‌দার ধরিতে আমাদের কারোই সাহসে কুলাইত না। কাজেই আজ যখন নিধিরাম এই লোভনীয় প্রস্তাবটা করিল তখন আমরা যে খুবই খুসী হইব তাহাতে আর কথা কি ?

নিধিরামের সঙ্গে আমরা সকলে গিয়া তার ছোট মামার 'ষ্টুডিও'তে ঢুকিলাম। বাস্তবিকই চোখ যেন জুড়াইয়া গেল! কত রকম রকম জানোয়ারের ছবি! কোনটাতে আফ্রিকার সিংহ দশ হাত লাফাইয়া তার শিকারের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, কোনটাতে পাহাড়ী বাইসন্ মাথা নীচু করিয়া যমদূতের মত ধাইয়া আসিতেছে। কিন্তু সব চাইতে যে ছবিখানা আমাদের ভাল লাগিল সেখানা হইতেছে একটী ওরাং ওটাংএর। কী বিট্‌কেল মুখের ছিরিরে মশায়! দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়। মাছি যেমন

সন্দেশের থালাটীকে ছাঁকিয়া ধরে ঠিক্ তেম্‌নি করিয়াই আমরা সকলে সেই ছবিটার চারপাশে জটলা করিতে আরম্ভ করিলাম।

দুনিয়ায় যত রকম অদ্ভুত কল্পনা থাকিতে পারে তার সমস্তই খেলিত আমাদের নিমাই ছোঁড়ার মাথায়। সে একদৃষ্টে খানিকক্ষণ ছবিখানার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া এক উদ্ভট্ প্রস্তাব করিয়া বসিল, কহিল, "আয়রে, আজ সবাই মিলে একটা মজা করা যাক্! নিধে যখন আমাদের ফটো তুল্‌বে তখন এই ওরাং ভায়ার ছবিখানা নিয়ে তার ক্যামেরার পাশে আমরা দাঁড় করিয়ে দেব; তারপর ক্যামেরার সাম্‌নে বসে আমরা সবাই এটার দিকে তাকিয়ে ঠিক এই রকমই বিট্‌কেল মুখ ভঙ্গী করে থাক্‌বো। সেই ফাঁকে নিধে আমাদের ছবি তুলে ফেল্‌বে। ছবি তোলার পর এই বানরটার মুখের সঙ্গে যার মুখের চেহারা সব চাইতে বেশী মিলে যাবে, বুঝ্‌বো সেই আমাদের ভেতর ওস্তাদ্।"

প্রস্তাবটা শুনিয়া আমরা একেবারে লাফাইয়া উঠিলাম, বাঃ রে, এতো ভারী মজার কথা। একবাক্যে সকলে অম্‌নি রাজী হইয়া গেলাম।

আমাদের মধ্যে মুখভেংচি কাটিতে সব চাইতে ওস্তাদ ছিল বিষ্টু; সে ভাবিল তার তো পোয়াবার, কহিল, "নাঃ রে বাপু, যে ফাষ্ট্ হবে তার জন্যে কি প্রাইজের ব্যবস্থা কর্‌ছ শুনি! নইলে অম্‌নি অম্‌নি বানরের মত মুখ কর্‌তে গেলাম কেন?"

তখন সেখানে বসিয়াই ঠিক হইল 'বানরের মত মুখ করায়' যে প্রথম হইবে আমরা ক্লাশের সকল ছেলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া তাকে একটী রূপার মেডেল গড়াইয়া দিব।

চারিটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার-বেঞ্চি লইয়া আমরা নিধিরামদের বাড়ীর হাতায় সাজ-সরঞ্জাম সব ঠিক করিয়া লইলাম। নিধিরাম তার মামার ক্যামেরা আনিয়া আমাদের সাম্‌নে সেটাকে রাখিল; আর ঠিক তার পাশেই রাখা হইল ওরাং-ওটাংএর ছবিখানা।

"আচ্ছা, তবে তোরা এবার মুখ বিট্‌কেল কর্‌তে সুরু কর্, আমি 'ফোকাস্'টা ঠিক করে নিই; দেখিস্, নড়া-চড়া করিস্‌নে যেন" বলিয়া কাল কাপড়ের ঢাক্‌নীটা নিধিরাম তার মাথার উপর টানিয়া লইল। আমরাও ওরাংওটাংটার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া অবিকল সেই রকম মুখের ভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

ঠিক সেই সময়ে হুড় মুড় একটা শব্দ হইতেই আড়চোখে চাহিয়া দেখি, একটা ছেলে উর্দ্ধশ্বাসে হন হন্ করিয়া আমাদের পানে ছুটিয়া আসিতেছে। ছেলেটা আরও একটু নিকটে আসিলে দেখিলাম, সে রামপদ—ছোঁড়া আমাদেরই পাড়ায় থাকে, কাল সবে ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছে। ফটো তোলার কথা তাকে যে জানান হয় নাই এমন নয়, কিন্তু সে জবাব দিয়াছিল, দুপুরে নিধিদের বাড়ীতে আসা তার ঘটিয়া উঠিবে না, তবে বেলা চারিটায় যখন ছবি তোলা হইবে তখন আসিয়া জুটিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। কিছু দেরী হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে এমন হন্ত দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে। মুহূর্ত্ত পরেই দেখিলাম, সে শেষের সারিটাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেছে। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিধিরাম কাল কাপড়ের ঢাকনী হইতে মাথাটা বাহির করিয়া আনিল, তারপর ক্যামেরার সাম্‌নেস্থিত একটা রবারের পুঁটুলী ডান হাতে ধরিয়া বলিল, "এইবার ছবি উঠবে, তোরা সব স্থির হ—রেডি, ওয়ান, টু, থ্রি—ব্যস্"......ফটো উঠিয়া গেল।

রেডি ?

দিন দুতিন পরে নিধিরাম যখন ফটো আনিয়া আমাদের কাছে হাজির করিল তখন আমরা তো হাসিয়াই মরি। এ যেন আলিপুরের গোটা গাবের হাউস্টাই

লইয়া আসিয়াছে রে! কাকে ছাড়িয়া কার দিকে তাকাই! ঠিক করিলাম, আমরা যখন সকলেই প্রতিযোগিতায় নামিয়াছি তখন বিচারের ভার আর আমাদের নিজেদের হাতে রাখাটা উচিত হইবে না, সে ভার দেওয়া হইবে আশুদার উপর। আশুদা ফার্ষ্টক্লাশে পড়ে, ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন, সমস্ত ইস্কুলটারই মুরুব্বি। ছুটীর পর নিধিরাম আশুদাকে সঙ্গে লইয়া তাদের বাড়ীর ওরাংওটাংটা দেখাইয়া দিবে, তারপর আশুদা বিচার করিয়া বলিয়া দিবে কার চেহারা সেটার সহিত সব চাইতে বেশী মিলিয়া গিয়াছে। বিষ্টু কিন্তু বরাবরই এম্‌নি ভাব দেখাইতে লাগিল, যে এত আয়োজন সমস্তই মিছামিছি, কেননা যেই বিচার করুক, প্রথম স্থান তাহারই বাঁধা—মেডেল ঝুলিতেছে তাহারই বরাতে।

পরদিন আশুদা'র 'রায়' বাহির হইল, সে রায় শুনিয়া আমরা তো থ! সবাই তলাইয়া গিয়াছে, প্রথম হইয়াছে নতুন ছোঁড়া রামপদ। তার চেহারাটাই নাকি বানরের সঙ্গে একেবারে অবিকল মিলিয়া গিয়াছে। শুধু আশুদা নয়, তার সঙ্গে ফার্ষ্টক্লাশের আরো অনেকে ছবি দেখিয়াছে, সকলেরই নাকি এই একই অভিমত।

তখন খোঁজ খোঁজ রামপদকে। জল খাইবার ঘরে তার দেখা পাইতেই আমরা পাঁচ-সাত জন তাকে একেবারে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিলাম। সে তো হতভম্ব—বলে, "তোরা পাগল হলি নাকি রে, এর মানে কি?"

সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া তখন রামপদকে বলা হইল। শুনিয়া সেতো চটিয়াই অস্থির! কই, এমন একটা প্রতিযোগিতা হইতেছে এ কথা তো কেউ তাকে ঘুণাক্ষরে বলে নাই! সেতো বানরের মত মুখ-ভঙ্গী করিবার এতটুকু চেষ্টাও করে নাই,—এম্‌নি স্বাভাবিক ভাবেই তো ছবি তুলিয়াছে! তবে কি সকলে বলিতে চায় নাকি যে তার স্বাভাবিক চেহারাই ওরাং ওটাংএর মত? ইঃ!"

* * * * *

রামপদকে কিছুতেই মেডেল লইতে সম্মত করান যাইতেছে না। তবে একটা ব্যবস্থায় সে রাজী আছে। সমস্ত ঘটনাটা আমরা 'রামধনু'তে তুলিয়া দিব—'রামধনু'র অধিকাংশ পাঠকপাঠিকার মতে যদি মেডেলটা তাহার লওয়াই উচিত বলিয়া

ঠিক হয় তবে সে সেটী লইতে পারে। মতামতের জন্য সে খুবই উদ্বিগ্ন হইয়া রহিয়াছে।*

গ্রাম

(শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার)

আমাদের গ্রামটি মিষ্টি কী নামটি !
হেমদের জাম ভাল আমাদের আমটি !
রায়দের পেয়ারা ভুল্‌তে পারে’কে !
কে যায় ‘রামু’দার দই ক্ষীর না চেখে !

নদীতে কী জল ছল্‌ ছল্‌ ও কল্‌ কল্‌ !
সঁাতারে নিশ্চয় গায় পায় বাড়ে বল !
পাল তুলে নৌকো সেঁা সেঁা চলে যায় !
জেলেদের ডিঙি ঢেউয়ে ঐ দোল্‌ খায় !

কিনারায় হাস্‌ছে গাছ সব সারে সার !
পাতায় হাওয়া,রোদ, পাখীদের সোর সার্‌ !
নীচ দিয়ে পথ সব চলেছে কোন্‌ দূর !
আস্‌ছে রাখালের বাঁশীর সরু সুর !

সোণার রংঢালা ছবিটি ধান-ক্ষেত !
ছুঁয়ে যে তারে নুয়েছে বাঁশ বেত।
পাখীরা অফুর্‌ বাতাসে ভাস্‌ছে !
মেঘের রথ খানি ঘুরে ঠিক আস্‌ছে !

* ফরাসী গল্পের ভাব লইয়া রচিত।

গাছের ফঁাক দিয়ে বাড়ীর চালে ধূম !
কুম্‌ড়ো ফলেছে, কবুতর ‘বুক্‌কুম্‌ !’
সেণারি কল্‌সী রৌদ্রে ঝলকে !—
পুকুরের ঘাটে দেখা যায় পলকে !

পাড়ে বাঁকা পথ, চলেছে লোকজন !
চিঠির ব্যাগ নিয়ে আসিছে পিয়ন !
হাল-গরু কেউ নেয়, যায় কেউ বাজারে !
মোষের গাড়ীটি পথের মাঝারে !

ছিপ্‌ নিয়ে ঝিলে যায় ভুলো পট্‌লা !
বাগ্দী বাড়ীতে কুকুরের জট্‌লা !
ডাক্তারখানা আজ ‘রোগী নেই’ বল্‌ছে !
বই নে’ ছেলেরা ইস্কুলে চল্‌ছে !

ধানের মরা’য়ের উঁচু ওই চূড়া !
নিড়েন্‌ হাতে যায় বুড়ো-দার খুড়া !
বাড়ী বাড়ীতে ভিখিরীর আশিস্‌ !
পাকুড় তলাতে পথিকের মজ্‌লিশ্‌ !

হাটের কোলাহল বুধ আর রবিবার !
কত কি দোকান মনেই রাখা ভার !
কমলা বেচ্‌ছে ও পাড়ার নবীন !
গান গেয়ে পথে চলে যায় পর দিন !

খেলার বুক পেতে মাঠখানি আছে !
আরতির বাদ্য মন্দিরে বাজে !

সাঁঝের আলো, শাঁখ, মায়েদের হাতে !
আকাশ মিশে যায় মঠের সাথে !

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক হিন্দুস্থানীটী তার কোর্ত্তার ডান্ দিকের পকেটে হাত ঢুকাইয়া কয়েকটী জিনিষ বাহির করিয়া আনিল। এ জিনিষ-গুলির প্রথমটী একটী ছোট্ট চূণের কৌটা, আগন্তুক সেটী তাহার বাঁহাতে রাখিল; দ্বিতীয়টী একটুক্‌রা খৈনি পাতা, সেটীও চূণের কৌটার সঙ্গী হইল; কিন্তু তৃতীয় জিনিষটীর উপর চোখ পড়িতেই সে একেবারে থতমত খাইয়া চমকাইয়া গেল, তাড়াতাড়ি সাম্‌নের দরজার দিকে একটা সন্দেহের দৃষ্টি হানিয়া নিমেষের মধ্যে সেটীকে সে ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিল। স্পষ্ট বোঝা গেল, এ জিনিষটী বাহির করিতে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, খৈনি-পাতার সহিত জড়াইয়া হঠাৎ সেই সঙ্গে এটী বাহির হইয়া আসিয়াছে।

এই যে কাণ্ডটুকু ঘটিয়া গেল ইহাতে সময় কিন্তু বিশ-ত্রিশ সেকেণ্ডের বেশী লাগে নাই। আগন্তুকের হাতের কস্‌রৎ এবং চোখের সন্দেহ মাখানো দৃষ্টি কারোই নজরে পড়িতে পাইল পাইল না, এমন কি, যে হিন্দুস্থানীটী দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল তার পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অন্তর্য্যামী থাকিতে তবে অবশ্যই টের পাইতে যে, যে জিনিষটী এই মাত্র হিন্দুস্থানীর ট্যাঁকে আত্মগোপন করিল সেটী এক টুক্‌রা ভাঁজ করা কাগজ। কিন্তু বেশ একটু রহস্যময় সে কাগজটী; তাহার ভিতর ইংরাজীতে নিম্ন লিখিত কথা কয়টী লেখা ছিল -

বোটানীর প্রোফেসারকে কখন কোথায় পাইব

প্রাতে, ৬টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে, বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত বালীগঞ্জের ল্যাবোরেটারী ও কলেজে—কিন্তু সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর হইতে আবার বাড়ীতে।

আপাতঃ দৃষ্টিতে কাগজখানায় মারাত্মক কোন খবরই নাই, কিন্তু যেরূপ সংগোপনে হিন্দুস্থানী ভায়া সেটীকে লুকাইয়া ফেলিল সেটী বাস্তবিকই অস্বাভাবিক; তাই বলিতে ছিলাম ব্যাপারটী বেশ একটু রহস্যময়।

দরজা খুলিয়া যে দ্বিতীয় হিন্দুস্থানটী বাহির হইয়া আসিয়াছিল, অনুমানে বোধ বোধ হইল সে এ বাড়ীর চাকর হইবে, কিন্তু 'দেশ্‌ওয়ালী ভাই'কে সে যে চিনিতে পারিয়াছে এমন কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না; জিজ্ঞাসা করিল "কি চাই ?"

"বাবু বাড়ী আছে ?"

প্রশ্ন এবং পাল্‌টা প্রশ্ন দুই-ই অবশ্য হইল হিন্দুস্থানী ভাষায়। সে ভাষাটা বুঝিতে পারিলেও লিখিতে আমি তেমন পটু নই, কাজেই উভয়ের কথোপকথনটা আমি বাংলা ভাষাতেই তর্জ্জমা করিয়া দিব।

বাড়ীর চাকর উত্তর দিল, "আছে।"

জবাব শুনিয়া আমাদের আগন্তুক হিন্দুস্থানীটী একটু গা-মোড়া দিয়া সেই রোয়াকের উপরই বসিয়া পড়িল! বাড়ীর সাম্‌নেটাতে জায়গা বেশী না থাকিলেও সেই অল্প জায়গাটুকুই নানা রকম ফুলের গাছে ছাইয়া গিয়াছিল, এবং তাহাদের ফোটা ফুলের গন্ধে স্থানটীকে করিয়া তুলিয়াছিল বাস্তবিকই মনোরম। বোধ হয় সেই চমৎকার ফুলের গন্ধেই তাহার খৈনি-ক্ষুধাটা চাগিয়া উঠিল, খানিকটা খৈনি ডলিয়া সে সামান্য একটু নিজের জন্য রাখিল, বাকীটা হাত বাড়াইয়া দিল বাড়ীর চাকরটীকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিল, "আপনার ঘর কোথা, মুঙের জিলা ?"

খৈনি লইতে লইতে চাকর উত্তর দিল, "না, দ্বারভাঙ্গা জিলা !"

হাসিতে আগন্তুক হিন্দুস্থানীটীর দাঁত একেবারে বাহির হইয়া পড়িল, সে জানাইল তাহারও যে ঘর দ্বারভাঙ্গা জিলা! কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই সে আরও খানিকটা খৈনি তাহার স্বদেশ-বাসীর উদ্দেশ্যে আগাইয়া ধরিল।

এইবার সৌজন্যে গলিয়া পড়ার পালা এবাড়ীর চাকরটীর; একে আগন্তুক তার দেশের মানুষ, তার উপর আবার অকাতরে সে খৈনিরূপ মহাদ্রব্য দান করিয়া যাইতেছে, এতটুকু কৃপণতা করিতেছে না। মিনিট্ দশেকের মধ্যেই তাহাদের আলাপ এম্‌নি

গভীর ভাবে জমিয়া উঠিল যে বোধ করি একের নিকট অপরের ঘরের কোন কথাই আর অপ্রকাশ রহিল না।

সুযোগ বুঝিয়া এতক্ষণে আগন্তুক হিন্দুস্থানী আসল কথাটী পাড়িল, বলিল, সে আসিয়াছে একবার 'বাবুর' সহিত মোলাকাৎ করিবার জন্য। মাস দুই সে বেকার বসিয়া আছে, আর পারে না। শুনিয়াছে তার 'বাবু'র নাকি কলিকাতার অনেক 'পরফেসার' বাবুর সহিত জানা শুনা আছে, যদি একটা হিল্লে তিনি করিয়া দিতে পারেন। বলিয়া সে বড়ই করুণ ভাবে তাহার দেশ্‌ওয়ালী ভাইএর দিকে তাকাইল।

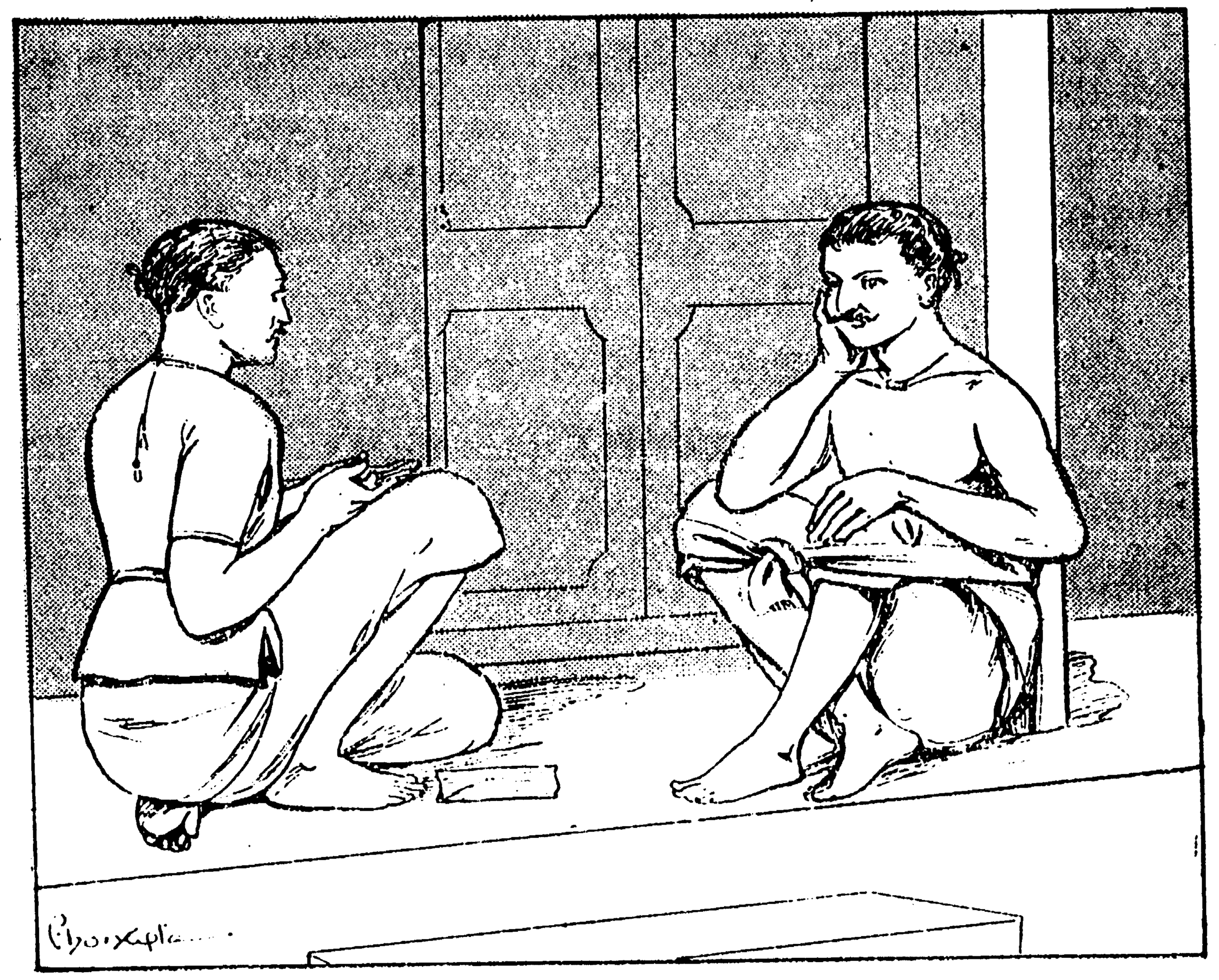

আলাপ জমিয়া উঠিল।

বেকারসমস্যা মিটাইতে দেশের গবর্ণমেণ্ট্ পর্য্যন্ত ঘোল খাইয়া যায়, কিন্তু 'দেশ্‌ওয়ালী ভাই'এর মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল এ যেন তাহারই মুঠোর ভিতর। এমনটী হইবার একটা কারণ ছিল। আজ দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের বাড়ীর বামুনটা চম্পট দিয়াছিল, এ পর্য্যন্ত নানা যায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়াও সে অপর একটী বামুন জোগাড় করিতে পারে নাই। কাজেই রাত গোটা আটেকের সময় ভগবান্ যখন তাহারই দেশের একটী তেওয়ারী বামুন আনিয়া একেবারে দরজার গোড়ায় পৌঁছাইয়া দিলেন এবং সে তেওয়ারী বামুন যখন নিজ হইতেই চাক্‌রীর উমেদারী

করিতেছে তখন এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার লোভ যদি 'দেশ্‌ওয়ালীভাই'এর হইয়া থাকে তো সে বড় দোষের কথা নয়। সে বলিল, "এ বাড়ীতে রসুইয়ের কাজ করতে পারবে ?"

অন্ধকারে আগন্তুক হিন্দুস্থানীর চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল, সারা মুখ দিয়া তার আনন্দের ভাব যেন উপ্‌চাইয়া পড়িল। বাহিরে কিন্তু সে এই গভীর আনন্দের শতাংশের একাংশ ভাগও প্রকাশ পাইতে দিল না, শুধু কহিল, "কেন পারবো না, জরুর !"

"আচ্ছা তবে ব'স একটু" বলিয়া তাহার দেশ্‌ওয়ালী ভাই বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল। একটু পরেই সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল, বাবু ডাকছেন, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্ত্তা কইবে।"

চাকরের পিছু পিছু তখন নবাগত হিন্দুস্থানী অন্দরের দিকে রওয়ানা হইল এবং তাহারই নির্দ্দেশ মত একটা ঘরের দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যে একজন ভদ্রলোক ইলেকট্রিক-ইস্ত্রির সাহায্যে একটা ওপেনব্রেস্ট্ কোট্ পালিশ করিতেছিলেন, সাড়া পাইয়া কাজ রাখিয়া তিনি দরজার দিকে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন, "কইহে, তুমিই নাকি রান্নার কাজ করতে চাও ?"

"জী হুজুর।"

"তা, তুমি থাক কোথা ? কেউ তোমায় জানে শোনে এখানে ?"

"হামি তো হুজুর আভি থাকে বালীগঞ্জ টিশন পর—একটা চাচা হামার লাগে, কুলিকা কাম করে—তেঁইখানে। এহিখানে একটা ভাতিজা আছে, তেনার বেমারি হয়েছেন, তেঁইজন্যে এসেছে।"

"রান্নাবান্নার কাজ সব জানা আছে তো, নাকি বাড়ীর মেয়েদের খাটিয়ে মারবে ?"

"না হুজুর, সোবি চীজ্ জানে ; বালীগঞ্জ বোটানী-বালা লেব্রেটারিমে সুরীন বাবু পরফেসার্ যো ছিল উনকো বাড়ীমে তো তিন বরিষ রসুই কিয়েছে !"

"আচ্ছা আজকের রাতটা রাঁধতো গিয়ে, কেমন কাজকর্ম্ম জানো পরখ্ করে কাল মাইনের কথাবার্ত্তা হবে' খুন" বলিয়া ভদ্রলোকটী তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

মিনিট্ কয়েক পরে নবাগত যখন রান্নাঘরের সমস্ত চার্জ্জ বুঝিয়া পাইল, মনের ভিতরটায় তখন তার আনন্দের বান ডাকিয়া যাইতেছিল! আমি জোর করিয়া বলিতে পারি সেই সময়ে যদি কেউ তার দুহাতে খান দুই হাজার টাকার নোট্ গুঁজিয়া দিত তাহা হইলেও এর চাইতে এতটুকু বেশী আনন্দ সে পাইত না।

রাত্রি এগারটার মধ্যেই খাওয়া-দাওয়ার সমস্ত পাট চুকিয়া গেল, এবং রাত বারোটার পর সে বাড়ীর আর একটী প্রাণীও জাগা রহিল না। শুধু ঘুম নাই বামুন ঠাকুরটীর চোখে! কি মৎলবে, কে বলিবে?

দেখিতে দেখিতে আরও ঘণ্টাখানেক সময় কাটিয়া গেল। এ সময়টা "বামুন-ঠাকুর" ভিতরে কি কাজে যে ব্যস্ত ছিল তা আমি বলিতে পারিব না; তবে এটা বেশ লক্ষ্যে আসিল যে ঢং করিয়া একটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গে অমাবস্যার সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে উঠানের উপর একটী ছায়ামূর্ত্তি নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে। উঠানের চারিপাশে পাঁচ-ছ হাত উঁচু ইটের প্রাচীর, তারপরেই সরু গলি। নিতান্ত অবলীলা-ক্রমে সে মূর্ত্তি সেই দেওয়ালটী টপ্‌কাইয়া গলির পথে নামিয়া আসিল। এইবার রাস্তার আলো তার মুখে আসিয়া পড়ায় স্পষ্ট বোঝা গেল, "বামুনঠাকুর" রাতারাতি গোপনে সে বাড়ী হইতে সট্‌কাইয়া পড়িতেছে। আরও বোঝা গেল তার মুখের ভাবে যে, যে উদ্দেশ্য লইয়া এ বাড়ীতে আজ সে আসিয়াছিল তাহা পূরামাত্রায় সিদ্ধ হইয়াছে। গলির পথ ধরিয়া "ঠাকুর" ক্রমে বড় রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। মিনিট্ পনেরো পথ চলিয়া শেষে রাস্তার ধারে যে ঘরটীর কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া পড়িল, মাথার উপরকার সাইন-বোর্ড দেখিলেই জানা যায় সেটী একটী নাপিতের দোকান—তবে হাল্‌-ফ্যাসানের।

দ্বারে বার দুই মৃদু করাঘাত করিতেই একটী লোক তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া খাটো গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর?"

"ভয়ানক রকম ভাল; তাড়াতাড়ি এখন একটু চায়ের জোগাড় দেখতো?"

সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া রণজিতের আক্ষেপের আর অবধি রহিল না। কেবলই তার মনে হইতে লাগিল একটা সুবর্ণসুযোগ আজ সে শুধু নিজের বুদ্ধির

দোষে হারাইয়াছে। এ রহস্যময় হিন্দুস্থানী ভূপেশ বাবুর ঘড়িচুরীর সহিত যে সংশ্লিষ্ট তাহাতে আর সন্দেহের বাষ্পটুকুও ছিল না, নতুবা গোপনে রণজিৎকে অনুসরণ করার আর কী অর্থ হইতে পারে? হুকা-কাশির মুখে শোনা ছিল যে—সেদিন ডাষ্টবিন্ হইতে পাঁচশো আঠারো নম্বরের ঘড়িটী উদ্ধারের পর ঘড়িচোর তাহাকে এবং হুকা-কাশিকে একত্র দেখিতে পাইয়াছে, অপরাধীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হুকা-কাশির সহিত সেও যে বদ্ধপরিকর তাহা টের পাইয়াছে। তাহাকে নানারূপ বিপদে ফেলিতে নিশ্চয়ই সে কোন চেষ্টারই কসুর করিবে না। গভীর কোন মৎলব মনে মনে আঁটিয়া সে তাহার অনুসরণ করিতেছিল, অথচ মূর্খ সে, সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও নিতান্ত আনাড়ির মত সমস্ত মাটী করিয়া ফেলিল। ওঃ, একবার যদি হুকা-কাশির খপ্পরে নিয়া ইহাকে ফেলা যাইত!

যাক্, যা ঘটিয়া গেছে তা তো আর ফিরাইবার নয়, তবে কাল সকালে যাইয়াই হুকা-কাশিকে সমস্ত কথা আগাগোড়া বলিতে হইবে।

পরদিন সকালে রণজিৎ যখন হুকা-কাশির বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল বেলা তখন বোধ করি আট্‌টা। বাড়ীর নিকটে যাইতে রাস্তা হইতেই নজরে আসিল, সাম্‌নের বসিবার ঘরটীতে তিনি আরও কার কার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। হুকা-কাশির বাড়ীতে রণজিতের লোকাচারের কোনই বালাই নাই, সে তাই সটান গিয়া ঘরটীতে ঢুকিয়া পড়িল। দেখিল, লোক নূতন কেহই নয়—বিমল ও বিরূপাক্ষ আচার্য্য। বিমলকে আজ যেন একটু অতিরিক্ত রকমের খোসমেজাজী দেখাইতে-ছিল। রণজিৎ ঘরে ঢুকিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে কিন্তু উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "আমি তবে এখন একটু উঠি বরং ঘণ্টাখানেক বাদে ফির্‌ব। আপনি এবং বিরূপাক্ষ বাবু ততক্ষণ এখানেই আমার জন্যে অপেক্ষা করুন।" তারপর রণজিতের দিকে ফিরিয়া কহিল, "একটী কথা শুনে খুব খুসী হবেন, রণজিৎবাবু, বাবার অবস্থাটা কাল রাত্তির থেকে হঠাৎ ভালোর দিকে টার্ণ্ নিয়েছে। ডাক্তারেরা দেখে খুব আশা পেয়েছেন, বল্‌ছেন এ রকম চল্‌লে মাসখানেকের ভেতরই তাঁকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তুল্‌তে পার্‌বেন। আচ্ছা চলি, নমস্কার!"

খবরটীতে বাস্তবিকই আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া রণজিৎ বিমলকে প্রতি-

নমস্কার করিল, তারপর তাহারই পরিত্যক্ত চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। হুকা-কাশি বলিলেন, "সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে এঁরা দু জন যাচ্ছিলেন, আমায় ঘরে বসে থাক্‌তে দেখে খবরটা দিতে ভেতরে এসে ঢুকেছেন। ডাক্তারদের নাকি এখন অনুমান হচ্ছে, প্রোফেসার গুপ্তের এই হঠাৎ পাগল হওয়ার ভেতর একটা কিছু রহস্য থাকারই খুব সম্ভব। বিরূপাক্ষ বাবুর নিজেরও তাই ধারণা,—এই মাত্র আমায় বল্‌ছিলেন এ রহস্য ভেদ কর্‌তে তিনি যদি আমাদের কোন উপকারে লাগেন, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌বেন। এঁর য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌টায় এঁকে খুবই কাবু করে ফেলেছে সন্দেহ নেই, তবে তাতেও পিছ্‌-পা ইনি নন। তারপর রণজিৎ বাবু, ভূপেশ বাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে আর দেখাটেখা হল? না না, ইতস্ততঃ কর্‌বার কোন হেতু নেই, কথাগুলো পাঁচ-সাত কাণ করা ঠিক নয় বটে, তবে এঁর সাম্‌নে অনায়াসেই সব কথা আপনি আমায় বল্‌তে পারেন!"

রণজিৎ দারুণ লজ্জা পাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "না তা নয়,...তবে কিনা আমারই একটা মস্ত বড় ত্রুটীর কথা এক্ষুণি আপনার কাছে স্বীকার কর্‌তে হবে, তাই আগে হতেই মাপ চেয়ে রাখ্‌ছি।...হয় ঘরি-চোর স্বয়ং, আর নয় তো তারই কোন অন্তরঙ্গ সাঁকরেদ্‌ একেবারে আমার মুঠোর ভেতর এসে পড়েছিল, শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে তাকে আমি আট্‌কে ফেল্‌তে পারিনি। কাল ঠিক সন্ধ্যের সময় এ ব্যাপারটী ঘটেছে।"

গভীর আগ্রহে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, বলেন কি, আমিও যে কাল ঠিক সন্ধ্যের পরেই সেই ঘড়ি-চোরকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। আপনার সে লোকটার কি রকম চেহারা বলুন তো, দেখি আমার লোকটার সাথে সে বর্ণনা মেলে কি না!"

রণজিতের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল "লোকটা কি হিন্দুস্থানী?"

দাঁত এবং জিভের সাহায্যে একটা শব্দ করিয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "এঃ যাঃ, মিল্‌ল না তো! আমি যার কথা বল্‌ছি সে যে বাঙ্গালী! তবে আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে সে পারে নি, দেখ্‌বেন তাকে?"

রণজিতের বুকটা আবার ধুক্‌ ধুক্‌ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "পারেন নাকি দেখাতে?"

"নিশ্চয়! এই দেখুন সেই ঘড়ি-চোর!" বলিয়া আঙ্গুল দিয়া হুকা-কাশি বিরূপাক্ষ আচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন।

বোধ হয় বিদ্যুতের স্পর্শ পাইলেও ঘরের বাকী দুইটী প্রাণী এর চাইতে বেশী চম্‌কাইয়া উঠিত না। রণজিৎ উত্তেজনায় একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু বিরূপাক্ষ মড়ার মত বিবর্ণমুখে সেই চেয়ারের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

এনাকোণ্ডা সাপ

(শ্রীমতী হেমলতা দেবী)

বড় চেহারার বোড়া জাতীয় যে কোন সাপকেই বাংলা ভাষায় আমরা "অজগর" বলিয়া ছাড়িয়া দিই—অজ অর্থাৎ, ছাগলকে যে গিলিতে পারে সেই অজগর। জীব-জন্তু লইয়া যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা কিন্তু এক অজগরের মধ্যেই আবার তিনটা আলাদা আলাদা জাত দেখেন। প্রথম পাইথন্‌; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এ জাতের সাপ তোমরা দেখিয়াছ। তারপর বোয়া-কন্‌ষ্ট্রিক্‌টর; বোয়া অর্থাৎ বোড়া জাতীয় সাপ, আর কনষ্ট্রিক্‌টর অর্থে যাহারা কাউকে জড়াইয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ্‌ কসে। ইহারা দ্বিতীয় জাতের অজগর। (শিকারের উপর প্যাঁচ্‌ কসিয়া কসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার অভ্যাস কিন্তু শুধু এই জাতেরই একলার নয়, অজগর মাত্রেরই সে অভ্যাস আছে।) আর সর্ব্বশেষে হইতেছে—এনাকোণ্ডা যাহার সমকক্ষ অজগর দুনিয়ায় আর নাই। নীচের ছবিখানা দেখিলেই বুঝিবে কী সর্ব্বনেশে চেহারা এ সাপের। পৃথিবীর ভিতর এনাকোণ্ডাই হইতেছে সর্পরাজ।

এই এনাকোণ্ডা সাপের চেহারা যে কি বিশাল সে সম্বন্ধে তোমাদের বোধ হয় কোন ধারণাই নাই। সাউথ্‌ আমেরিকার এক মিউজিয়ামে একটী এনাকোণ্ডার চামড়া আছে, সেটী হইতেছে ৭০ ফিট্‌। আসলে জ্যান্ত সাপটী হয় তো অতবড় নাও

নমস্কার করিল, তারপর তাহারই পরিত্যক্ত চেয়ারখানা টানিয়া লইয়া তাহাতে বসিয়া পড়িল। হুকা-কাশি বলিলেন, "সাম্‌নের রাস্তা দিয়ে এঁরা দু জন যাচ্ছিলেন, আমায় ঘরে বসে থাক্‌তে দেখে খবরটা দিতে ভেতরে এসে ঢুকেছেন। ডাক্তারদের নাকি এখন অনুমান হচ্ছে, প্রোফেসার গুপ্তের এই হঠাৎ পাগল হওয়ার ভেতর একটা কিছু রহস্য থাকারই খুব সম্ভব। বিরূপাক্ষ বাবুর নিজেরও তাই ধারণা,—এই মাত্র আমায় বল্‌ছিলেন এ রহস্য ভেদ কর্‌তে তিনি যদি আমাদের কোন উপকারে লাগেন, তবে নিজেকে কৃতার্থ মনে কর্‌বেন। এঁর য়্যাক্‌সিডেণ্ট্‌টায় এঁকে খুবই কাবু করে ফেলেছে সন্দেহ নেই, তবে তাতেও পিছ্‌-পা ইনি নন। তারপর রণজিৎ বাবু, ভূপেশ বাবুর সঙ্গে ইতিমধ্যে আর দেখাটেখা হল? না না, ইতস্ততঃ কর্‌বার কোন হেতু নেই, কথাগুলো পাঁচ-সাত কাণ করা ঠিক নয় বটে, তবে এঁর সাম্‌নে অনায়াসেই সব কথা আপনি আমায় বল্‌তে পারেন!"

রণজিৎ দারুণ লজ্জা পাইয়া ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "না তা নয়,...তবে কিনা আমারই একটা মস্ত বড় ত্রুটীর কথা এক্ষুণি আপনার কাছে স্বীকার কর্‌তে হবে, তাই আগে হতেই মাপ চেয়ে রাখ্‌ছি।...হয় ঘরি-চোর স্বয়ং, আর নয় তো তারই কোন অন্তরঙ্গ সাঁকরেদ্ একেবারে আমার মুঠোর ভেতর এসে পড়েছিল, শুধু নিজের বুদ্ধির দোষে তাকে আমি আট্‌কে ফেল্‌তে পারিনি। কাল ঠিক সন্ধ্যের সময় এ ব্যাপারটী ঘটেছে।"

গভীর আগ্রহে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য, বলেন কি, আমিও যে কাল ঠিক সন্ধ্যের পরেই সেই ঘড়ি-চোরকে আবিষ্কার করে ফেলেছি। আপনার সে লোকটার কি রকম চেহারা বলুন তো, দেখি আমার লোকটার সাথে সে বর্ণনা মেলে কি না!"

রণজিতের বুকের ভিতরটা দুরু দুরু করিতে লাগিল, রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল "লোকটা কি হিন্দুস্থানী?"

দাঁত এবং জিভের সাহায্যে একটা শব্দ করিয়া হুকা-কাশি বলিলেন, "এঃ যাঃ, মিল্‌ল না তো! আমি যার কথা বল্‌ছি সে যে বাঙ্গালী। তবে আমার চোখে ধূলো দিয়ে পালাতে সে পারে নি, দেখ্‌বেন তাকে?"

রণজিতের বুকটা আবার ধুক্ ধুক্ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "পারেন নাকি দেখাতে?"

"নিশ্চয়! এই দেখুন সেই ঘড়ি-চোর!" বলিয়া আঙ্গুল দিয়া হুকা-কাশি বিরূপাক্ষ আচার্য্যকে দেখাইয়া দিলেন।

বোধ হয় বিদ্যুতের স্পর্শ পাইলেও ঘরের বাকী দুইটী প্রাণী এর চাইতে বেশী চম্‌কাইয়া উঠিত না। রণজিৎ উত্তেজনায় একেবারে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, কিন্তু বিরূপাক্ষ মড়ার মত বিবর্ণমুখে সেই চেয়ারের উপরেই ঢলিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

এনাকোণ্ডা সাপ

(শ্রীমতী হেমলতা দেবী)

বড় চেহারার বোড়া জাতীয় যে কোন সাপকেই বাংলা ভাষায় আমরা "অজগর" বলিয়া ছাড়িয়া দিই—অজ অর্থাৎ, ছাগলকে যে গিলিতে পারে সেই অজগর। জীব-জন্তু লইয়া যাঁরা ঘাঁটাঘাঁটি করেন তাঁরা কিন্তু এক অজগরের মধ্যেই আবার তিনটা আলাদা আলাদা জাত দেখেন। প্রথম পাইথন্; আলিপুরের চিড়িয়াখানায় এ জাতের সাপ তোমরা দেখিয়াছ। তারপর বোয়া-কন্‌ষ্ট্রিক্‌টর; বোয়া অর্থাৎ বোড়া জাতীয় সাপ, আর কনষ্ট্রিক্‌টর অর্থে যাহারা কাউকে জড়াইয়া প্যাঁচের উপর প্যাঁচ্ কসে। ইহারা দ্বিতীয় জাতের অজগর। (শিকারের উপর প্যাঁচ্ কসিয়া কসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলার অভ্যাস কিন্তু শুধু এই জাতেরই একলার নয়, অজগর মাত্রেরই সে অভ্যাস আছে।) আর সর্ব্বশেষে হইতেছে—এনাকোণ্ডা যাহার সমকক্ষ অজগর দুনিয়ায় আর নাই। নীচের ছবিখানা দেখিলেই বুঝিবে কী সর্ব্বনেশে চেহারা এ সাপের। পৃথিবীর ভিতর এনাকোণ্ডাই হইতেছে সর্পরাজ।

এই এনাকোণ্ডা সাপের চেহারা যে কি বিশাল সে সম্বন্ধে তোমাদের বোধ হয় কোন ধারণাই নাই। সাউথ্ আমেরিকার এক মিউজিয়ামে একটী এনাকোণ্ডার চামড়া আছে, সেটী হইতেছে ৭০ ফিট্। আসলে জ্যান্ত সাপটী হয় তো অতবড় নাও

থাকিতে পারে, কেননা সাপের চামড়া অতি সহজেই বাড়িয়া যায়। তবে এ জাতের ত্রিশ-চল্লিশ ফিট্ লম্বা সাপ বনে-বাদাড়ে অনেক সময়েই চোখে পড়ে। শুধু লম্বায় নয়, চওড়ায়ও এ সাপ অন্যান্য অজগরের চেয়ে অনেক বড়। ১৫ ফিট্ লম্বা যে কোন এনাকোণ্ডা ২০।২২ ফিট্ লম্বা যে কোন পাইথন্‌কে চওড়ায় ছাড়াইয়া যাইবে।

এনাকোণ্ডা সাপ।

আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ানেরা এই এনাকোণ্ডা সাপকে যমের মত ভয় করে। তার কারণ ইহার প্রচণ্ড শক্তি আর দুর্দ্দম তেজ। চোখের পলক পড়িতে না পড়িতে ইহারা শিকারকে আক্রমণ করিয়া বসে। কী হইয়াছে বুঝিবার আগেই শিকারের ইতি হইয়া যায়। স্পেন দেশে একবার এক সার্কাস্‌ওয়ালা ছোট একটা পাইথন লইয়া খেলা দেখাইতেছিল। হঠাৎ সাপটা ভয় পাইয়া সার্কাসওয়ালার চারি পাশে পাঁচ্ কসাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটীতে পড়িয়া গেল। প্রথমে সকলে ভাবিয়াছিল, এ বুঝি সার্কাসেরই একটা অঙ্গ। কিন্তু একটু পরেই আসল ব্যাপারটা প্রকাশ পাইতেই তাহাকে বাহিরে লইয়া আসিলে ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখেন ঐটুকু সময়ের মধ্যেই বেচারার হাড় ভাঙ্গিয়া বিরাশী টুক্‌রা হইয়া গিয়াছে। ছোট্ট একটী পাইথনেরই

এই কীর্ত্তি। বড় এনাকোণ্ডার তবে কতখানি জোর একবার ভাবিয়া দেখ। জলের ভিতর এনাকোণ্ডা লোকজন সমেত নৌকা উল্টাইয়া দিয়াছে এমন কথা পর্য্যন্ত বইয়ে পড়িয়াছি। জলেই ইহারা বেশী ভাগ বাস করে, ডাঙ্গায় চলিতে ফিরিতে খুব বেশী সুবিধা পায় না। কিন্তু গাছে চড়িতে ইহারা ভারী ওস্তাদ—দিব্যি তরতর উঠিয়া যায় এতটুকু ফস্কায় না। আর তেমন ক্ষুধা পাইলে মানুষকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেও ইহাদের বড় আপত্তি নাই।

এনাকোণ্ডা কিন্তু ঠিক বোড়া জাতের সাপ নয়, একটু তফাৎ আছে।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

নব-বর্ষে

(শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য্য, বেহালা)

দীপ্ত অরুণ মধুর প্রভাতে
আসিল নূতন দিন।
নব-বরষের রাগিণীর সাথে
বাজিল সে নববীণ।
সারা ধরণীর হিয়ায় হিয়ায়
কুসুমের রাগে, লতায় পাতায়
নূতন দিনের পরশ জাগায়
বৈশাখী আশে আজ—

দিকে দিকে তাই রঙ্গের পুলকে
রাঙ্গায়ে বিশ্ব প্রাণ ভরা সুখে
আগমনী-সুর নিখিলের বুকে
বাজিল ধরণী মাঝে
সুরের আড়ালে নূতন বরষে
আসিল নূতন দিন,
ধরণীর বুকে পরম হরষে
বাজিল সে নব বীণ !

রামধনুকের দেশে

(শ্রীনীহার রঞ্জন চক্রবর্ত্তী, বাজিতপুর)

মাগো !
রামধনুকের দেশে,
সেথাও কি ভোরের বেলা সূয্যি উঠে হেসে ?
শুকতারা তখনও কি মিটি মিটি চায়,
সাজি হাতে মেয়েরা কি বাগান পানে ধায় ?
পাখীও কি জেগে উঠে গানটী ধরে তার,
অম্‌নি কি গো খসে পড়ে ফুলের ঘুম-ভার ?
সেথাওকি ভোর সন্ধ্যে ছেলেরা সব পড়ে ?
স্কুলে যেতে দুষ্টু ছেলের অশ্রু কিগো ঝরে ?
সেথাওকি আছে মাগো গাছের ডালে ফল,
নদী মাঝে এম্নি ধারা গভীর কালো জল ?
সন্ধ্যে হলে সেথাও কি মাকি বলে, 'ঘুমো'
আদর করে ছোট্ট গালে দেয় কি মিঠে চুমো ?
সন্ধ্যে হলে দিনের শেষে সূয্যি গেলে পাটে,
চাঁদ কি চলে আসে সেথা আকাশ বুড়ীর হাটে ?
তারাগুলো সেথাওকি ফোটে হেসে হেসে
এ সব কি গো ঘটে হ্যাঁ মা, রামধনুরি দেশে !

চায়ের স্তুতিগান

(শ্রীমতী অরুণা দেবী, বাঁকিপুর, পাটনা)

চারে ! পেয়ারে ! দোস্ত আমার,
আত্মার ফূর্ত্তিকারী !
গন্ধে বিভোর চিত্ত-চকোর
ঢল ঢল রূপধারী।
টোষ্ট বিস্কুটে মাখায়ে মাখন,
তদুপরি ঢালি' জ্যাম্ জেলী ঘন,
তারই সাথে হলে চা'র আস্বাদন
চিত্ত-মোহনকারী।
কচুরী কি লুচি, কি আলুর দম্,
কাটলেট্ চপ্, কোর্ম্মা গরম
খাই তার সাথে খুইয়ে ধরম্
চরম-গতি চা সবারি !
দিশি দিশি তব সুযশঃ আজ
স্তুতি করে সব সভ্য সমাজ
তপ্ত প্রাণের তৃপ্তি-ধারায় ক্ষিপ্ত যে নর-নারী।

কল্পনা-সাথী

(শ্রীভবেশানন্দ চক্রবর্ত্তী)

কুসুম যখন উঠ্‌বে ফুটি
আস্‌বে যখন গন্ধ তার
মলয় মৃদুল বইবে মিঠি,
আস্‌বে নিয়ে কল্পহার,
আস্‌বে ছুটি ভ্রমর অলি
আস্‌বে আবার চন্দনা,

গাইবে আবার কৃষ্ণ-কোকিল—
করতে তোমার বন্দনা
শিশির আবার পড়্‌বে ঝরে
উঠবে হেসে পলাশ ফুল,
উজল হবে বিশ্ব-গগন
উজল হবে বিশ্বকুল।
সেদিন আবার আস্‌বে তুমি
জাগ্‌বে হৃদি-কন্দরে,
আবার সেদিন ফুটবে আমার
স্বর্ণ-কমল অন্তরে!

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

অনুসন্ধানে

রাত তখন নটা বাজিয়া গেছে। সাম্‌নের টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া টম্ পরদিনকার ইস্কুলের টাস্ক্ তৈরী করিতেছিল এমনি সময় হঠাৎ কন্‌স্‌ট্যান্স্ সে ঘরে আসিয়া উৎকণ্ঠার সুরে জিজ্ঞাসা করিল, "টম্, চার্লি কোথায় বল্‌তে পার?"

"কোথায় তা বল্‌তে না পার্‌লেও, আমার পকেটের ভেতর যে নেই, তা অনায়াসেই বল্‌তে পারি।"

"ঠাট্টা নয় টম্, রাত নটা বেজে গেছে, এত রাত্তির পর্য্যন্ত না বলে কয়ে বাইরে থাকৃতে দেখেছ কখনো তাকে?"

অন্য সময় হইলে এ কথায় টম্ নিশ্চয়ই গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইত, কিন্তু আধ ঘণ্টাটেক আগে এমনই একটা ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে যেজন্য এ খবরে সে এতটুকু উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন দেখিল না। ব্যাপারটা এই—খানিক আগে কেচ্ আসিয়া 'সিনিয়র' হিসাবে টমের কাছে ইস্কুলের ছেলেদের নামে এক অভিযোগ জানাইয়া গিয়াছে। তাদের ত্যাঁদ্‌ড়ামি নাকি একেবারে সপ্তমে চড়িতে বসিয়াছে! আজ সন্ধ্যায় তারা মিথ্যা নিমন্ত্রণের অছিলায় কেচ্‌কে অন্যত্র পাঠাইয়া গীর্জ্জার হাতায় ঢুকিবার চাবি ফের সরাইয়াছে। কি ভাবে জেঙিন্সের নাম-স্বাক্ষরিত চিঠি খানা তাহার

হাতে আসে, সে কথা জানাইয়া সে বলিয়াছে, "মাংসের কালিয়া শুনে খাবার-দাবার ফেলে রেখে তক্ষুণি আমি বেরিয়ে পড়্‌লাম। জেঙ্কিন্সের বাড়ী গিয়ে দেখি সব নিঝুম। বাড়ীর ঝিকে নেমন্তন্নের কথা শুধোতে সে বল্লে, কই, তাতো কিছু সে জানে না, কর্ত্তা নাকি তার ব্যায়রামে পড়ে তখন কাৎরাচ্ছে। সে গিয়ে জেঙ্কিন্সের বৌটাকে ডেকে আন্‌লে। আমি শুধোলাম 'কই গো, নেমন্তন্ন যে করে এলে, বাড়ী দেখি একেবারে নিঃঝুম।' বৌটা বল্লে 'বলি, মদ গিলে এয়েছ ক' গ্যালন?' এই না বলে, মাষ্টার টম্, সেই মদ্দামেয়েটা আমার ঘাড় ধরে ঠেলে একেবারে রাস্তায় এনে ফেল্লে। তখনই আমি বুঝেছি ইস্কুলের ছেলেরা এর ভেতর না থেকে আর যায় না, নইলে খাম্‌কা আমায় ডেকে এনে এরা অপমান কর্‌তে যাবে কেন? বাড়ী ফিরে এসে দেখি, যা ভেবেছি তাই—গীর্জ্জের হাতায় ঢোক্‌বার চাবি আর সে তল্লাটেই নেই। তারপর সে চাবি মিল্‌ল কোথায় জান, মাষ্টার টম্, একেবারে হাতার দরজায়—তালার গায়ে লট্‌কানো। গেলাম সোজা হেড্‌মাষ্টার ম'শায়ের বাড়ী চলে। তিনি গেছেন পার্টিতে; মিষ্টার হান্ট্‌লির ছেলেকেও বাড়ী পেলাম না। তাই তোমার কাছে এয়েছি, মাষ্টার টম্! তুমি সেকেণ্ড্ সিনিয়র, সব শুনে রাখ্‌লে। কাল ইস্কুল বস্‌তে না বসতে হেড্‌মাষ্টারকে সব কথা জানাব।"

কেচ্ চলিয়া গেলে টম্ পূরা পাঁচ মিনিট্ ধরিয়া হাসিয়াছিল, বুঝিয়াছিল আজ আবার ছেলেরা বুড়ার বিরুদ্ধে একটা কিছু ষড়্‌যন্ত্র পাকাইয়াছে। কী যে ষড়্‌যন্ত্রটা সে সম্বন্ধে অবশ্য টমের কোনই ধারণা ছিল না, তবে এটা বুঝিতেছিল যে এ জন্যই চার্লির বাড়ী ফিরিতে আজ কিছু দেরী হইতেছে। তাই সে কন্স্‌ট্যান্সের কথায় কোনই উদ্বেগ প্রকাশ করিল না।

টমের ঘর হইতে বাহিরে আসিতেই কন্স্‌ট্যান্স্ লক্ষ্য করিল, জুডি একান্ত উদ্বিগ্নমুখে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া আছে। কন্স্‌ট্যান্স্‌কে দেখিয়াই সে বলিল, "হাঁগা, কন্স্‌ট্যান্স্, চার্লি এখনও ফির্‌ছে না কেন? কোনও দিনই তো বাছা এত দেরী করে না।"

"আমিও তো সেই কথাই ভাব্‌ছি জুডি! টম্ বল্লে গীর্জ্জের হাতাতে নাকি ছেলেরা কেচ্‌কে নিয়ে কি এক তামাসা করার মৎলবে আছে, তাই চার্লির আস্‌তে দেরী হচ্ছে। কিন্তু আমার মন যেন এ কথাতে সায় দিচ্ছে না; তা হলে চার্লি অন্ততঃ আমায় এ কথাটা বলে যেত যে, তার আস্‌তে একটু দেরী হবে।" বলিতে বলিতে কন্‌স্‌ট্যান্স্ বাড়ীর ফটকটার পানে আগাইয়া চলিল, যদি সেখান হইতে দূরে ছোট ভাইটীকে আসিতে দেখা যায়! জুডিও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

সেইখানে, সেই ফটকের সামনে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই তাহারা অনেক সময় পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিল; ক্রমে নটা হইতে সাড়ে নটা এবং শেষে দশটাও বাজিয়া গেল, কিন্তু চার্লির কোন খবরই নাই। এইবার ভয়ের স্পষ্ট রেখা কন্‌সট্যান্সের মুখে ফুটিয়া উঠিল; সে বুঝিল, এইবার হামিশকে খবর দেওয়া প্রয়োজন। আর এখন এইখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, বাড়ীর

বাহির হইয়া খোঁজ করার সময় আসিয়াছে। দ্রুতপদে তাই সে দোতালায় হামিশের ঘরের দিকে উঠিয়া গেল।

রোজকার মত আজও হামিশ ভিতর হইতে ঘরের দরজা আঁটিয়া ডেস্কের সাম্‌নে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের গোপনীয় কাজে ব্যস্ত ছিল, দরজায় ঘা পড়িতে তৎক্ষণাৎ সে দরজা খুলিয়া দিল না, কহিল, "দাঁড়াও একটু, খুল্‌ছি।" সঙ্গে সঙ্গে ভিতর হইতে একটা ড্রয়ার টানিয়া খোলার শব্দ আসিল, এবং একটু পরেই কন্‌স্‌ট্যান্স্ স্পষ্ট শুনিতে পাইল, দরজা খুলিবার আগে কি একটা জিনিষ হামিশ সেই ড্রয়ারে বন্ধ করিয়া রাখিল। তারপর দরজা খুলিতেই কন্‌স্‌ট্যান্স্ কটাক্ষে দেখিতে পাইল, হামিশের ডেস্কের উপর তার বাবার অফিসের হিসাবের খাতা খান। তখনও পড়িয়া আছে। কিন্তু এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা করার মত তখন তার মনের অবস্থা নয়, তাই সে এ সম্বন্ধে কোন কথাই উত্থাপন না করিয়া শুধু কহিল, "হাম্রিশ, রাত দশটা বেজে গেছে, অথচ চার্লি এখনও বাড়ী ফেরেনি—আজ পর্য্যন্ত কখনো তো এমন আর হয়নি!"

"এখনো ফেরেনি!" (বলিয়া হামিশ তাড়াতাড়ি ওয়েষ্ট্‌কোটের পকেট হইতে ঘড়িটি বাহির করিয়া দেখিল, রাত তখন দশটা বাজিয়া সতেরো মিনিট্ হইয়াছে।) তার মুখে ভাব্‌নার চিহ্ন দেখা দিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত পরেই সে ভাব কাটাইয়া সে বলিল, ("হয় তো কোন বন্ধু-টন্ধুর বাড়ী গিয়ে থাক্‌বে, গোড়াতে সময় মত আস্‌বে বলেই ঠিক্ ছিল, তাই বাড়ীতে কিছু বলে যায়নি; তারপর কোন অজানা কারণে আট্‌কে পড়ে গেছে! নইলে এ সহরে সে আর হারিয়ে যাবে কোথা?) (তা সে যাই হোক্,) এক্ষুণি খবর নিচ্ছি আমি," বলিয়া কন্‌স্‌ট্যান্সের সহিত একত্র সে নীচে নামিয়া আসিল।

নীচে আসিতেই আর্থারের সাক্ষাৎ মিলিল, এই মাত্র জুডির মুখে সমস্ত শুনিয়া সে চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া আছে টম্‌ও আসিয়া জুটিয়াছে। (সেও বুঝিয়াছে চার্লি যদিও বা কেচের বিরুদ্ধে সেই চক্রান্তে থাকিয়া থাকে, তবুও এত রাত পর্য্যন্ত গীর্জ্জার হাতায় কোন ছেলেই থাকিতে পারে না—সে অসম্ভব। তবে কেন চার্লি বাড়ী ফিরিতেছে না?)

তিন ভাই এবং জুডি তখন চার্লির খোঁজে সহরের ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাহির হইয়া পড়িল। (চার্লির বন্ধুদের বাড়ী বাড়ী গিয়া খোঁজ লইবার ভার লইল টম্—যার যার সঙ্গে চার্লির ঘনিষ্ঠতা ছিল একে একে প্রত্যেকের বাড়ী গিয়া টম্ দেখা করিল, কিন্তু কেহই চার্লির খবর বলিতে পারিল না। সে ভাবিয়াছিল, অন্ততঃ গীর্জ্জার হাতা-সংক্রান্ত ব্যাপারটার টড্ ইয়র্ক্ কিছু না কিছু খবর দিতে পারিবে, কিন্তু তাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে স্পষ্ট উত্তর দিল, বিন্দুবিসর্গ কিছুই তার জানা নাই।)

দেখিতে দেখিতে রাত বারোটা বাজিয়া গেল। (টমের মনে হইল হয়তো এবার বাড়ী গেলে শুনিতে পাইবে চার্লি ফিরিয়াছে। কিন্তু বাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াই সে বুঝিল এ আশা

কত দূর অদ্ভুত, কেমন) কন্‌স্‌ট্যান্স্ তখন পাগলের মত একবার ঘর আর একবার বাহির করিতেছে। ~~আবার সে বাহির হইয়া পড়িল।~~

(খানিকটা আগাইতেই জুডি আর হামিশের গলা তার কাণে আসিল, সে চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "জুডি, কোন খবর আছে?" এর উত্তর জুডির নিকট হইতে যা আসিল তাহাকে কান্না বলিব কি কথা বলিব, ভাবিয়া পাই না। কহিল, "না, বাছা—কী সর্ব্বনাশই হোল বাবা!")

"একি—টম্, জুডি, হামিশ তোমরা এত রাতে এখানে কি কর্‌ছ?"

উপরের কথাগুলি কহিলেন হেডমাষ্টার মিষ্টার পাই—একটা পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, সেখান হইতে তিনি বাড়ী ফিরিতেছেন। হেড্‌মাষ্টার মশাইকে চিনিতে পারিয়া টম্ সসম্ভ্রমে টুপি খুলিল। জুডি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "মাষ্টার মশাই, আমাদের বড় বিপদ্ হয়ে গেছে—চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"চার্লিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, সেকি?" বলিয়া তিনি হামিশ এবং টমের দিকে তাকাইলেন।

ঘাড় নাড়িয়া তাহারা উভয়েই সায় দিল। জুডি বলিল, "এই ঘণ্টা কয়েক হ'ল আপনার ইস্কুলের দ্বারোয়ান কেচ্ এসে টমের কাছে এই বলে নালিশ করে গেছে যে আজ নাকি ছেলেরা তাকে নিয়ে আরও কি এক মজা করেছে। মুখ-পোড়া দ্বারোয়ান হতচ্ছাড়ার বিরুদ্ধে আপনার কাছে আমি কিছু বল্‌তে চাইনে মাষ্টার মশাই, তবে সে যদি চার্লিকে কোথাও আট্‌কে রেখে থাকে, তাহলে কিন্তু…" হেড্‌মাষ্টার মশাই ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কহিলেন, "কেচ্ গিয়ে টমের কাছে নালিশ করে এসেছে? কি বলেছে হে টম্ তোমাকে?"

টম্ মহা মুস্কিলে পড়িল। ছেলেদের নিয়ম অনুসারে মাষ্টার মশায়দের কাছে একের নামে অপরের "লাগান" বারণ। কিন্তু টম একে সিনিয়র,—স্কুলের 'ডিসিপ্লিন্' রাখার ভার কতকটা তার উপর, তদুপরি আবার স্বয়ং হেড্‌মাষ্টার মশাই আদেশ করিতেছেন। এ ক্ষেত্রে তাহাকে বলিতেই হইবে। জুডির দিকে একটা ক্রুদ্ধ চাহনি হানিয়া সে তখন সমস্ত ঘটনা হেড্‌মাষ্টার মহাশয়কে খুলিয়া বলিল—জেঙ্কিন্সের বাড়ী কেচের নিমন্ত্রণের কথা, কেচের দুরবস্থার কথা, বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া গীর্জ্জার চাবি খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা—সমস্তই।

সব কথা শুনিয়া হেড্‌মাষ্টার ক্ষণকাল চুপ্ করিয়া রহিলেন, হঠাৎ তাঁর মাথার নূতন চিন্তা উঁকি দিয়া গেল, তিনি বলিলেন, "ওঃ বোঝা গেছে, গীর্জ্জার হাতাটা তোমরা খুঁজেছ?"

"না তো।"

"তবে সেইটেই এখন করা কর্ত্তব্য। ছেলেরা চার্লিকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে নিশ্চয়ই সেখানে ভুলিয়ে নিয়ে বন্ধ করেছে—যেমন একদিন কেচ্‌কে করেছিল। বোধ হয় তার ওপর কারো কারো মনের ঝাল রয়েছে, তাই"

তাঁর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই জুডি একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "মাষ্টার মশাই, তা হলে চার্লিকে আর আমরা ফিরে পাব না!"

হেডমাষ্টার ফিরিয়া দেখেন, শুধু জুডি নয়, হামিশ এবং টম্‌ও যেন কেমন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

ছেলে বেলায় দাসীর কুশিক্ষার ফলে কি ভাবে চালির অসম্ভব রকম ভূতের ভয় প্রশ্রয় পাইয়াছে, অন্ধকার রাত্রে সামান্ত একটা ছায়া দেখিলেই কি ভাবে ভয়ে তার দাঁত কপাটী লাগিয়া যায়, সমস্তই তখন হেড মাষ্টার মহাশয়কে বুঝাইয়া বলা হইল। শুনিয়া তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, "শীগ্‌গির চল কেচের কাছে। চাবি নিয়ে এক্ষুণি আমাদের গীর্জ্জের হাতায় ঢুকতে হবে।"

দ্রুতপদে সকলে কেচের ঘরের নিকট চলিয়া আসিলেন। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, "কেচ, শীগ্‌গির দরজা খোল।" ভিতর হইতে উত্তর আসিল, "খুল্‌ছি, তোমার শ্রাদ্ধটা আগে সেরে নিই।"

"আহা হা, গলার আওয়াজে বুঝ্‌ছ না আমি কে?"

"খুব বুঝেছি, তুমি লণ্ডন-জুর সেই হনুমানটা।"

মহা মুস্কিল, কেচ্ হেড্‌মাষ্টার মশায়ের গলার স্বর চিনিতে পারিতেছেনা। টম্ গিয়া দমাদম্ দরজার উপর ধাক্কা দিতে সুরু করিল, তখন অবশ্য কেচ্‌কে দরজা খুলিতেই হইল। খুলিয়াই দেখে স্বয়ং হেড্‌মাষ্টার!

ভীত সন্ত্রস্ত কেচের ক্ষমা প্রার্থনা শুনিবার জন্য হেডমাষ্টার এক মুহূর্ত্তও সেখানে দাঁড়াইলেন না। তাড়াতাড়ি চাবি লইয়া সদলবলে তিনি গীর্জ্জার হাতায় ছুটিলেন।

কিন্তু কোথায় চালি! সমস্ত হাতাটা চষিয়া বেড়ান হইল, উচ্চ কণ্ঠে তার নাম লইয়া বার বার ডাকা হইল, কিন্তু চালির কোন উদ্দেশ্যই মিলিল না। (ক্রমশঃ)

সবচেয়ে বড় থার্ম্মোমিটার

জার্ম্মেণীর মিউনিক্ সহরের নাম তোমরা সকলেই জান। সেখানকার মিউজিয়ামের টাওয়ারের উপর একটা সাড়ে একাত্তর ফিট উঁচু আর সাড়ে ছয় ফিট চওড়া থার্ম্মোমিটার বসান

আছে। পৃথিবীর আর কোথাও এত বড় থার্ম্মোমিটার আছে বলিয়া শুনা যায় নাই। বহু—বহুদূর হইতে এই থার্ম্মোমিটার দেখিয়া তাপ জানা যায়।

মজার মোটর হর্ণ

আমেরিকার একজন ভদ্রলোক মোটর গাড়ীর জন্য নতুন ধরণের একরকম হর্ণ বাহির করিয়াছেন। এই হর্ণের আওয়াজ আজকালকার প্রচলিত হর্ণের চাইতে ৫০ হাজার গুণ বেশী। দশ মাইল দূর হইতেও তার আওয়াজ শুনা যায় সাধারণ রাস্তা ঘাটে এই হর্ণ দিলে অবশ্য অনেকেরই কাণে তালা লাগিবার ভয় আছে, কিন্তু সময় সময় বিশেষতঃ বিপদ্ আপদের সময় এই হর্ণ যে দস্তুর মত কাজে লাগিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উই পোকার ডিম

গরম দেশে উই পোকার বড় উৎপাৎ। হইবে না কেন, এক একটি উই পোকা দিনের পর দিন কেমন ভাবে বাড়িয়া চলে তা ত আর জাননা! গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এক একটি উই পোকা রোজ গড়ে প্রায় সাড়ে ছিয়াশী হাজারটি ডিম পাড়ে।

নতুন ভাষা

ইয়োরোপের একদল লোক কিছুদিন হইল 'এসপারাণ্ট' নাম দিয়া একটা নতুন ভাষা তৈরী করিতেছে। পৃথিবীর নানা ভাষা হইতে নানা শব্দ যোগাড় করিয়া এই ভাষা তৈরী হইতেছে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে এই একটি ভাষার প্রচলনের জন্যই নাকি এই চেষ্টা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লেখাটি পড়িতে হইলে আগে প্রত্যেক কলমের নীচেকার ব্রাকেটের অংশটুকু পড়িয়া লইয়া পরে সোজাসুজি ভাবে (বাঁ হইতে ডাইনে) পড়িতে হইবে। উপরের প্রত্যেকটি শব্দের ঠিক আগে আগে নীচেকার এক একটি শব্দ বসিবে।:—

যাহা জান তাহাই বলিও না, কেননা বেশী যাহারা বলে তাহারাই যাহা জানে তাহার চেয়ে বেশী বলে।

যাহা শোন তাহাই রটাইওনা, কেননা বেশী যাহারা রটায় তাহারাই যাহা শোনে তাহার চেয়ে বেশী রটায়।

যাহা উপার্জ্জন কর তাহাই খরচ করিওনা, কেননা অনেক যাহারা খরচ করে তাহারাই যাহা উপার্জ্জন করে তাহার চেয়ে বেশী খরচ করে।

যাহা পার তাহাই খাইওনা, কেননা খুব যাহারা খায় তাহারাই যাহা তল্লম করে তাহার চেয়ে বেশী খায়।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (এণ্টালি, কলিকাতা), রঞ্জিৎ, রামরতি, পান্না, নীহার, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (কলিকাতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), মুরলী, মনোজ, আনন্দ, মনু, বাণী, বেলা, ছায়া (কটক), তরেন, অজিত, সুধীন ও দেবকী অধিকারী (তমলুক), সুজাতা, শেফালি, সবিতা, শিবু ও কুট্টিম (ইটামগরা), পরেশচন্দ্র বসু (গৌহাটী), অলকা সেন (সেনহাটী), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ল্যাটপ্যাট-সমিতির সভ্যগণ (কলিকাতা), জেবউন্নিসা বেগম (কুয়ারপাড়), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), সুজাতা দেবী (ভবানীপুর, কলিকাতা), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), বিনোদবিহারী, দাদা বাদল, দুলাল রেণু, গোরা, টনা (কানুনগোপাড়া, চট্টগ্রাম), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), ভোলা, গোবর্দ্ধন, গোপাল, শিবু, রাম, বলাই ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী), বীণা সেন, হিমাংশু মল্লিক (কলিকাতা), স্নেহ, মায়া, সুধা, সুনীতা, বুলু ও খোকন সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর, কলিকাতা)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন :—

মধুসূদন মৈত্রেয়, বিমল, অমল, নির্ম্মল ও তুষার (শিলং), মুরলী, ললিত, মাধব, রণজিৎ, সুজিৎ, বংশী, বাবলা, রেণু, রাণী, রমা, মণি, নন্দ, বীণা, দুর্গাদি ও অন্থদি।

নূতন ধাঁধা

(১)

এমন একটী নদীর তুমি নামটী কর ভাই,
তার নামেতে স্বনাম-খ্যাত অস্ত্র হওয়া চাই।
না পারিলে বুঝ্‌বো তুমি ভ্যাবা-গঙ্গারাম,
মিছামিছি রাখছ শুধু স্কুলে একটা নাম।

শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ।

(২)

সবারে দেখাই আমি সারা দুনিয়ায়,
নিজেরে দেখিতে পাই, একি মহা দায়!

শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত।

রামধনু—

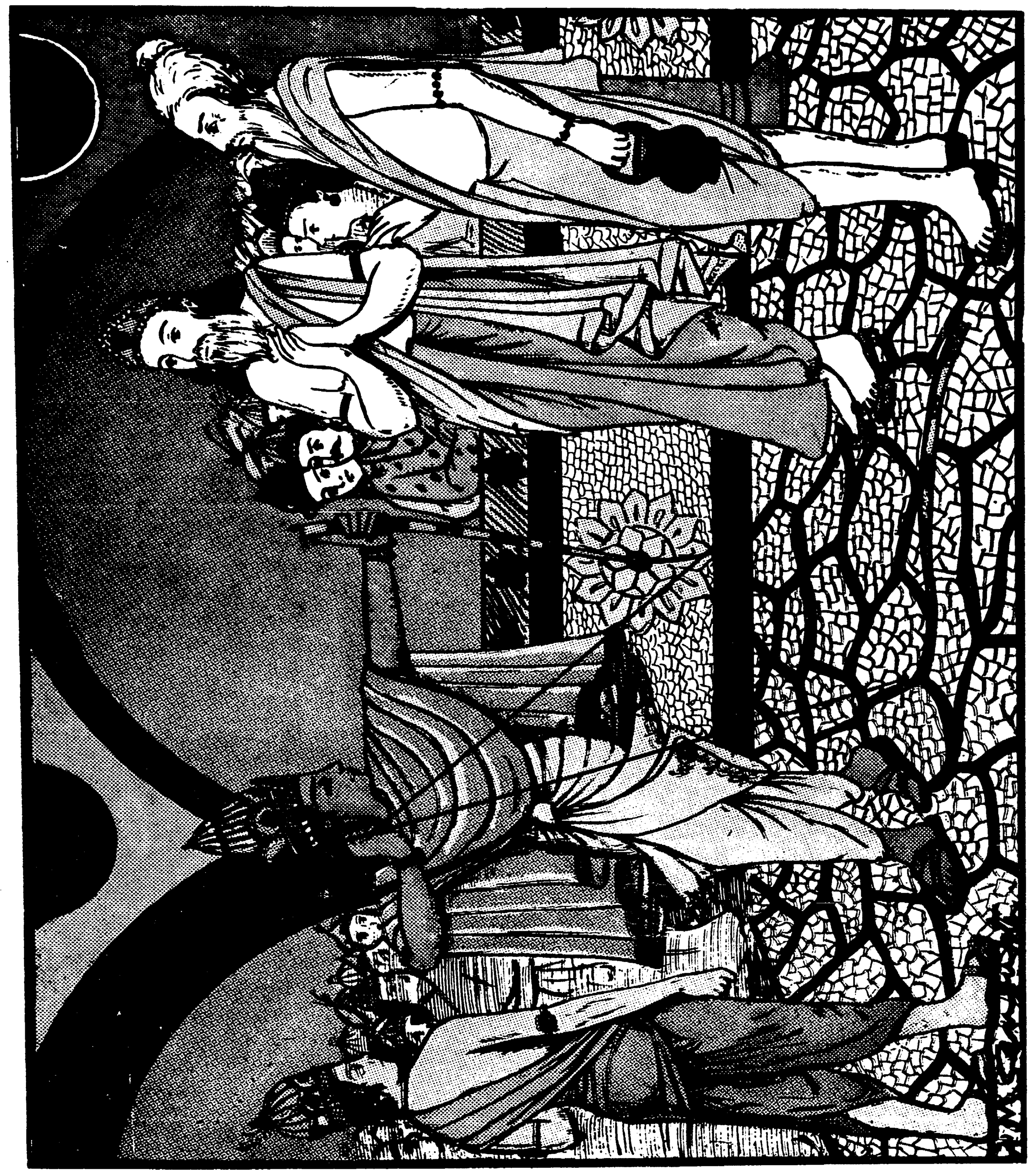

হরধনুর্ভঙ্গ।

[শিল্পী—শ্রীমনাগনাথ সেনগুপ্ত]

যাহা পায় তাহাই খাইওনা, কেননা খুব যাহারা খায় তাহারাই যাহা হজম করে তাহার চেয়ে বেশী খায়।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (এন্টালি, কলিকাতা), রঞ্জিৎ, রামরতি, পান্না, নীহার, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (কলিকাতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), মুরলী, মনোজ, আনন্দ, মনু, বাণী, বেলা, ছায়া (কটক), তরেন, অজিত, সুধীন ও দেবকী অধিকারী (তমলুক), সুজাতা, শেফালি, সবিতা, শিবু ও কুট্টিম (ইটামগরা), পরেশচন্দ্র বসু (গৌহাটী), অলকা সেন (সেনহাটী), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ল্যাটপ্যাট-সমিতির সভ্যগণ (কলিকাতা), জেবউন্নিসা বেগম (কুয়ারপাড়), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), সুজাতা দেবী (ভবানীপুর, কলিকাতা), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), বিনোদবিহারী, দাদা বাদল, দুলাল রেণু, গোরা, টনা (কাম্মনগোপাড়া, চট্টগ্রাম), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), ভোলা, গোবর্দ্ধন, গোপাল, শিবু, রাম, বলাই ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী), বীণা সেন, হিমাংশু মল্লিক (কলিকাতা), স্নেহ, মায়া, সুধা, সুনীতা, বুলু ও খোকন সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর, কলিকাতা)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন :—

মধুসূদন মৈত্রেয়, বিমল, অমল, নির্ম্মল ও তুষার (শিলং), মুরলী, ললিত, মাধব, রণজিৎ, সুজিৎ, বংশী, বাবলা, রেণু, রাণী, রমা, মণি, নন্দ, বীণা, দুর্গাদি ও অমুদি।

নূতন ধাঁধা

(১)

এমন একটী নদীর তুমি নামটী কর ভাই,
তার নামেতে স্বনাম-খ্যাত অস্ত্র হওয়া চাই।
না পারিলে বুঝবো তুমি ভ্যাবা-গঙ্গারাম,
মিছামিছি রাখছ শুধু স্কুলে একটা নাম।

শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ।

(২)

সবারে দেখাই আমি সারা দুনিয়ায়,
নিজেনা দেখিতে পাই, একি মহা দায়!

শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত।

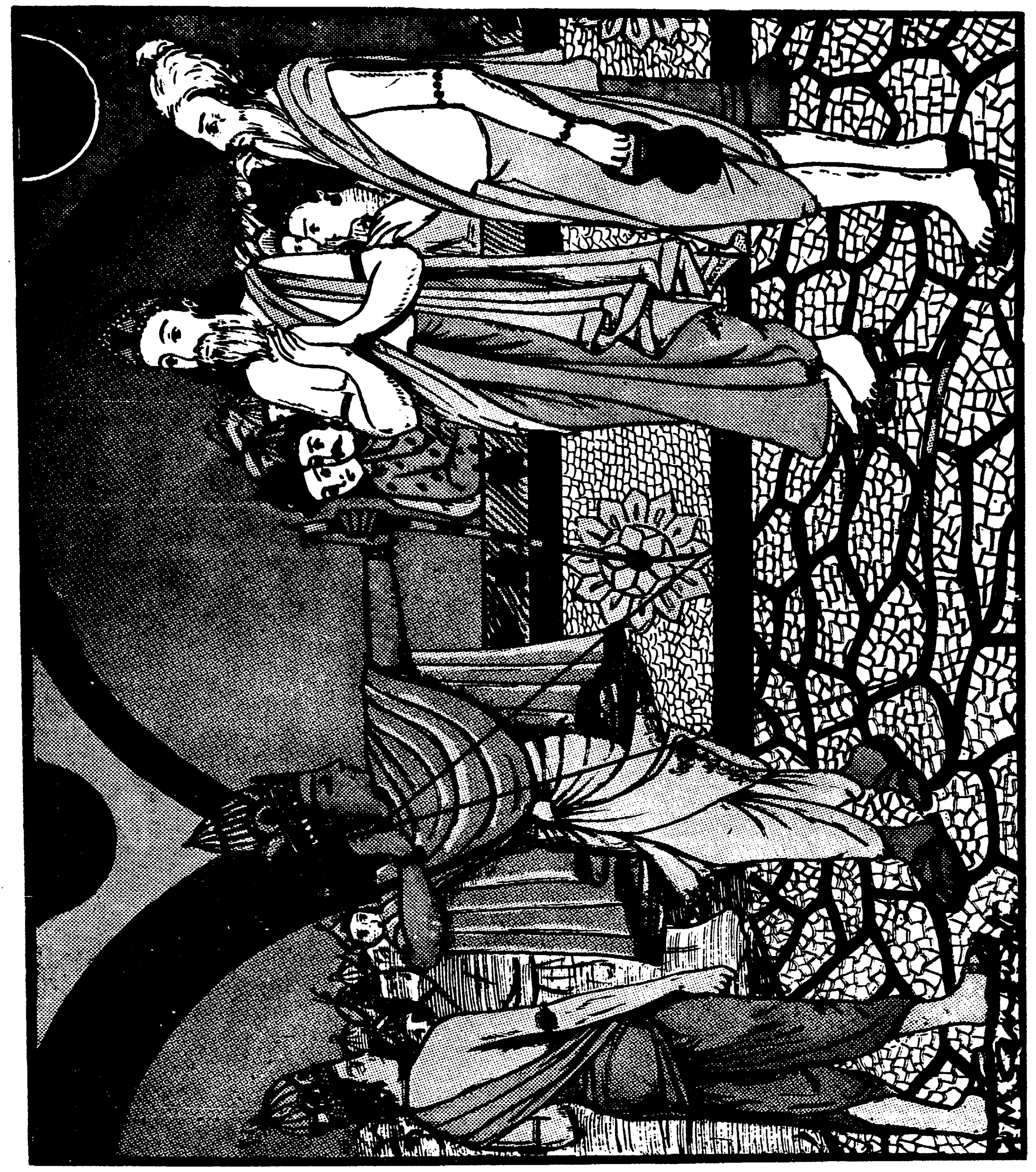

রামধনু—

হরধনুর্ভঙ্গ।

[শিল্পী—শ্রীননীলাল সেনগুপ্ত]

যাহা পার তাহাই খাইওনা, কেননা খুব যাহারা খায় তাহারাই যাহা হজম করে তাহার চেয়ে বেশী খায়।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন ঃ—

কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (এণ্টালি, কলিকাতা), রঞ্জিৎ, রামরতি, পান্না, নীহার, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (কলিকাতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), মুরলী, মনোজ, আনন্দ, মনু, বাণী, বেলা, ছায়া (কটক), তরেন, অজিত, সুধীন ও দেবকী অধিকারী (তমলুক), সুজাতা, শেফালি, সবিতা, শিবু ও কুট্টিম (ইটামগরা), পরেশচন্দ্র বসু (গৌহাটী), অলকা সেন (সেনহাটী), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ল্যাটপ্যাট-সমিতির সভ্যগণ (কলিকাতা), জেবউন্নিসা বেগম (কুয়ারপাড়), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), সুজাতা দেবী (ভবানীপুর, কলিকাতা), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), বিনোদবিহারী, দাদা বাদল, দুলাল রেণু, গোরা, টনা (কানুনগোপাড়া, চট্টগ্রাম), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), ভোলা, গোবর্দ্ধন, গোপাল, শিবু, রাম, বলাই ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী), বীণা সেন, হিমাংশু মল্লিক (কলিকাতা), স্নেহ, মায়া, সুধা, সুনীতা, বুলু ও খোকন সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর, কলিকাতা)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন ঃ—

মধুসূদন মৈত্রেয়, বিমল, অমল, নির্ম্মল ও তুষার (শিলং), মুরলী, ললিত, মাধব, রণজিৎ, সুজিৎ, বংশী, বাবলা, রেণু, রাণী, রমা, মণি, নন্দ, বীণা, দুর্গাদি ও অনুদি।

নূতন ধাঁধা

(১)

এমন একটী নদীর তুমি নামটী কর ভাই,
তার নামেতে স্বনাম-খ্যাত অস্ত্র হওয়া চাই।
না পারিলে বুঝ্‌বো তুমি ভ্যাবা-গঙ্গারাম,
মিছামিছি রাখছ শুধু স্কুলে একটা নাম।

শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ।

(২)

সবারে দেখাই আমি সারা দুনিয়ায়,
নিজেরা দেখিতে নাই, একি মহা দায়!

শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত।

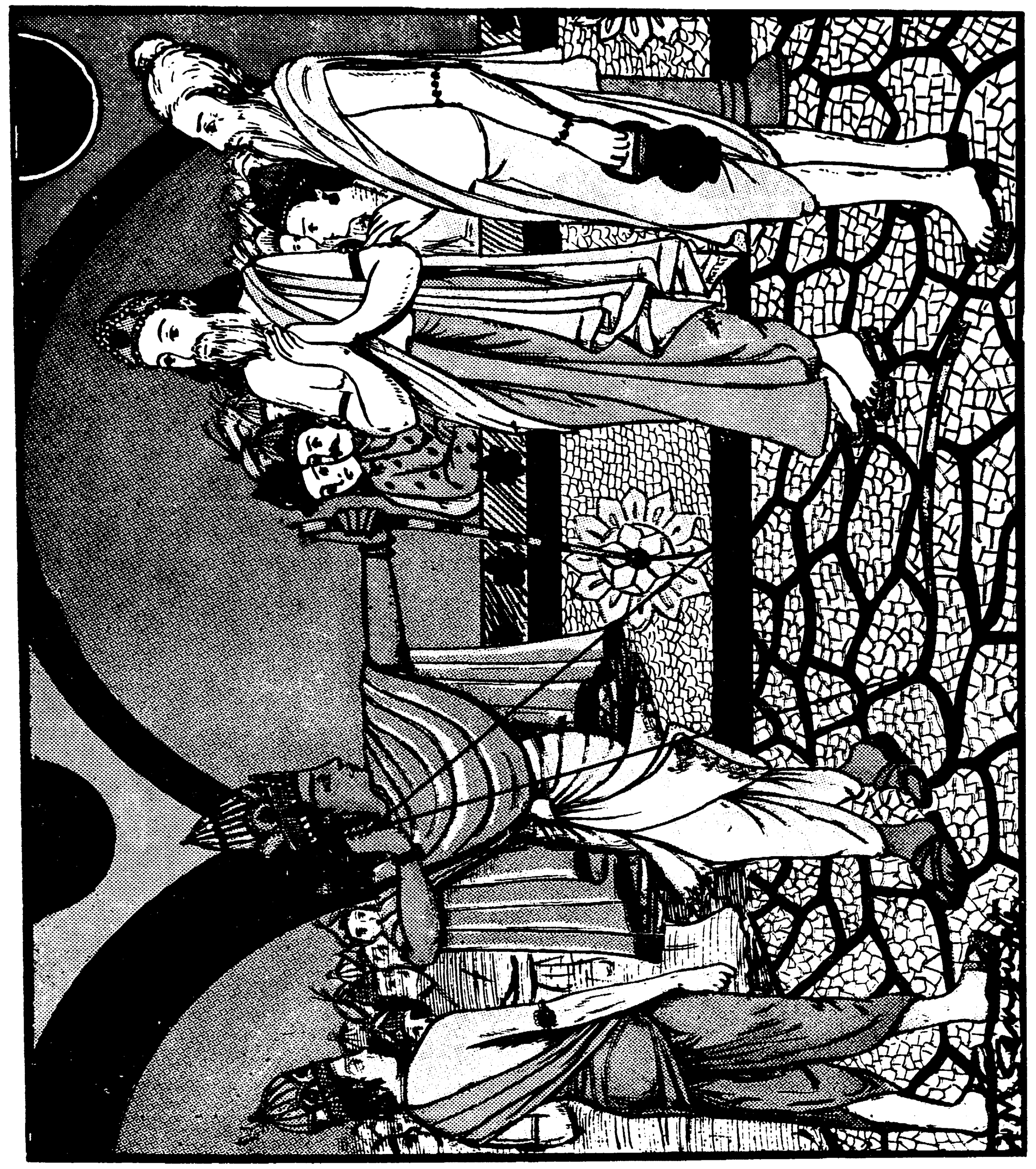

হরধনুর্ভঙ্গ।

[শিল্পী—শ্রীমন্মথনাথ সেনগুপ্ত]

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

৪র্থ বর্ষ } আষাঢ়, ১৩৩৮ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিধাতার দান

(শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র)

নিবিড় আঁধারে ঢাকা
বিশ্ব যখন,
পড়ি, বিপদ্-সাগরে মোরা ভাসি,
মুছা'তে চোখের জল
কি হলো সৃজন ?
জেনো শিশু,—মধুময় হাসি !

আঘাত দ্বিগুণ পাই
চিত্তে যখন,

ব্যথা শুধু বহি' একলা নিঝুম,
ভুলা'তে দুখের স্মৃতি
কি হলো সৃজন ?
জেনো শিশু,—সুখকর ঘুম !

জীবন-খেলায় মোরা
খেলিতে যখন,
দেখি সুখ-দুখ দিয়ে ঘর ছকা,
সে খেলায় সাথী হ'তে
কি হলো সৃজন ?
জেনো শিশু,—প্রাণ-প্রিয় সখা !

বহবঃ সন্তি শশকাঃ

(শ্রীমাঠব্য)

পণ্ডিত জগৎনারায়ণ মিশ্রের বিদ্বান্-মহলে ভারী নামডাক। অত বড় পণ্ডিত নাকি সচরাচর চোখেই পড়ে না। বেদ-বেদান্ত, দর্শন-উপনিষৎ ত্রিপিটক—সমস্তই নাকি একেবারে তাঁর ঠোঁটের আগে।

দূর দূরান্তরের লোকেদের মুখে পণ্ডিতজীর সুখ্যাতি আর ধরে না, অথচ মজা এই, বাড়ীর পাশের লোকেরা কেবল তাঁর বদ্‌নামই গাহিয়া বেড়ায়, বলে পণ্ডিতের পেটে বিদ্যা আছে ঢের, তা আমরা অস্বীকার করি না, – কিন্তু "জ্ঞান-গম্যি" তার বড়ই কম্। স্বাভাবিক বুদ্ধির যে তার কতখানি অভাব, তা কি আর আমরা জানি না ?

অপর সকলে যে এ কথা শুনিয়া চটিবে তাতে আর বিচিত্র কি ?—আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, ঢের হইয়াছে, রাখ ! নিজেদের তো সব ঘট উপুড়, জান খালি বিড়ি টানিতে আর পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা মারিয়া বেড়াইতে ! মগজের মধ্যে আছে তো কেবল ওই বিড়িরই ধোঁয়া ! একটা লোক দিবারাত্র পুঁথি-পত্তর ঘাঁটিয়া নিছক জ্ঞানের

চর্চ্চায় জীবনটা কাটাইয়া দিতেছে – আর সকলে আছ তোমরা কি ভাবে লোকের কাছে তার অপযশ গাহিয়া বেড়াইবে ! যত সব···!"

সে তল্লাটে জগৎনারায়ণের সব চাইতে বড় ভক্ত ছিল সেই গ্রামেরই জমিদার লছ্‌মীপ্রসাদ। পণ্ডিতকে ভারী সমীহ করিতেন :তিনি। গাঁয়ের ভিতর জগৎ-নারায়ণের পাকা বাড়ী, ক্ষেত-খামার সমস্তই হইয়াছিল এই জমিদারের দৌলতে। লছ্‌মীপ্রসাদ পাকা লোক ; দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে জমিদারী শাসন করিতেও যেমন তিনি ওস্তাদ, আবার সন্ধ্যার পর জগৎনারায়ণের কাছে নানা রকম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনিতেও তেম্‌নি তাঁর আগ্রহ। সর্ব্বদাই তিনি বলিতেন, পণ্ডিতজীর মত শাস্ত্রজ্ঞ লোক দুনিয়ায় লাখ করা একটীও মেলে কিনা সন্দেহ।

মাঝে মাঝে লছ্‌মীপ্রসাদের আবার শিকারের বাতিক চাপিত। তখন জগৎনারায়ণকে তাঁর সঙ্গে নেওয়া চাই-ই। শিকার তো শিকার—ঘুঘু, দোয়েল আর নয় তো বড় জোর খরগোস পর্য্যন্ত দৌড় ! এই রকমই একটা শিকারের ব্যাপারে সেবার যে মজাটা হইয়াছিল সেই গল্পটাই আজ তোমাদের বলিব মনে করিয়াছি।

সেবার জমিদারের কাছে খবর আসিল কোন্ একটা জঙ্গলে নাকি প্রচুর খরগোস দেখা গিয়াছে ! চুপি চুপি কোন রকমে সেখানে গিয়া একবার পেঁছিতে পারিলেই হইল, শিকারের আর কোন অভাবই হইবে না। শুনিয়া লছ্‌মীপ্রসাদের তো ভারী ফূর্ত্তি ! দলবল জোটাইয়া, পিঠে তীর ধনুক আঁটিয়া তিনি প্রস্তুত হইলেন, জগৎনারায়ণ পণ্ডিতকেও সঙ্গে লইতে ভুলিলেন না। তখনও এদেশে বন্দুকের ততটা রেওয়াজ হয় নাই, শিকার-টিকারে যাইতে হইলে লোকে তীর ধনুকই সঙ্গে লইত।

সকলে মিলিয়া জঙ্গলের ধারে আসিতেই দেখা গেল, যে লোক খবর দিয়া তাদের আনাইয়াছে সে বাস্তবিক ঠিক খবরই দিয়াছে—দলে দলে খরগোস গোটা জঙ্গলময় চরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিয়াই লছ্‌মীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি দলের সবাইকে চোখের ইসারায় পা টিপিয়া ধীরে ধীরে আগাইতে ইঙ্গিত করিলেন, নিজেও অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে সুরু করিলেন। তা না হইলে কি আর রক্ষা আছে ? যে

হুঁসিয়ার শিকার, টুঁ শব্দটী শুনিলেই অমনি লেজ তুলিয়া য়্যায়্সা ছুট দিবে যে তাদের টিকিরও আর নাগাল পাওয়া যাইবে না।

দলের আর আর সকলে পেছনে, সবার আগে চলিয়াছেন স্বয়ং লছ্মীপ্রসাদ, আর তাঁর ঠিক পাশেই পণ্ডিত জগৎনারায়ণ। চুপি চুপি আরও একটু আগাইতেই খরগোসের দলটা ক্রমে বেশ ভাল করিয়া নজরে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই হঠাৎ জগৎনারায়ণ এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন, হাত দুটি উঁচু করিয়া উচ্চকণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিলেন, "ভো ভো, বহবঃ সন্তি শশকাঃ!"

অনেকগুলি তীর চালাইয়া গেলেন...

যেমনই এই কথা বলা, আর অমনি সেখানে যেন একেবারে ভোজবাজীর ক্রিয়া হইয়া গেল—এক নিমেষের মধ্যে সেই খরগোসের দল কোন্‌টা কোথায় যে পালাইল কেহ তার কিনারাই করিতে পারিল না। লছ্মীপ্রসাদ তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া অনেকগুলি তীর চালাইয়া গেলেন, কিন্তু সবই বৃথা—না পারিলেন তিনি একটী খরগোসকে বিঁধিতে, না তাঁর দলের আর কেউ।

বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া সকলে তখন জিজ্ঞাসুভাবে জগৎনারায়ণের মুখের দিকে

তাকাইলেন। পণ্ডিতজী তখন ভারী অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন, আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কেবলই বলিতেছেন, "তাইতো, এ খরগোসগুলো যে আবার সংস্কৃত ভাষা বুঝ্‌তে পার্‌বে তাতো মনে করিনি...তাইতো!"

মুক্তা-চরিত

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

তোমাদের কারও কাছে যদি কয়েক টুক্‌রা হীরা কিংবা কয়েকটা বড় বড় মুক্তা থাকে তবে তোমার বরাত দেখিয়া অনেক লোকেরই চোখ টাটাইবে। হয়ত দূর হইতে তোমাকে দেখাইয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিবে—"ঐযে লোকটা যাচ্ছে—ওটি একটি টাকার কুমীর"।

কুমীর হওয়াটা যদিও খুব গৌরবের কথা নয়, কিন্তু আমি জানি তাহাতে তুমি একটুও চটিবে না; কেননা তখন যে তুমি দুনিয়ার সেরা রত্ন হীরা-মুক্তার মালিক, তোমাকে দেখিয়া লোকের হিংসা হইবে না ত কাকে দেখিয়া হইবে?

কিন্তু তা না করিয়া কেউ যদি আসিয়া বলে, "আরে, ছোঃ; ওর মধ্যে আছে কি?—খানিকটা কয়লা, নয় ত ময়লা ধূলো বালি, ওর আবার এত আদর!" তবে কেমন হয় বলত? তুমি হয়ত প্রথমটা চটিয়া যাইবে, তার পর অবাক্ হইবে, শেষে ভাবিবে লোকটা কি পাগল! আমি কিন্তু লোকটির কথায় খুব বেশী দোষ ধরিতে পারিব না। হীরা-মুক্তার জন্ম-কাহিনী শুনিলে এই রকম একটা কথাই মনে আসিতে পারে।

তোমাদের মধ্যে যারা কয়েক বছর আগেও রামধনু পড়িতে তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে—রামধনুতে একবার 'হীরার কথা' বাহির হইয়াছিল।* মাটীর তলায় শত শত হাত নীচে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ভিতর লক্ষ লক্ষ বছর ধরিয়া হাজার হাজার মণ পাথরের চাপ খাইতে খাইতে কালো, নোংরা কয়লা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে হীরায় গিয়া দাঁড়ায় সে গল্প সেদিন তোমাদের বলিয়াছিলাম। আজ আবার নতুন

* রামধনু—ভাদ্র ১৩৩৬

করিয়া সে কথা বলিয়া পুঁথি বাড়াইতে চাইনা, আজ তোমাদের শুধু মুক্তার গল্প বলিব।

ঝিণুক তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যাহারা পুরীতে কিংবা অন্য কোথাও সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে গিয়াছ তারাই দেখিয়াছ সমুদ্রের ধারে কত হাজার হাজার ঝিণুক পড়িয়া থাকে; তাদের এক একটার গায়ে আবার কত রকম কারিকুরি। এই ঝিণুকগুলি কিন্তু আসলে এক একটি জলের পোকা; পোকা বলিলে ঠিক হয় না—এগুলি সেই পোকার বর্ম্ম। কচ্ছপের শরীরে যেমন বর্ম্ম থাকে না, এও ঠিক সেই রকম। এই বর্ম্ম থাকে শরীরের দু ধারে দু'টি—ঠিক যেন বাক্স আর তার ডালা। ঝিণুক পোকা তার ভিতর নিরাপদে বাস করে। ইচ্ছা করিলে এই বাক্স সে খুলিয়া ফেলিতে পারে, আবার ইচ্ছা হইলে সে বাক্স বন্ধ করাও তার কাছে কিছু শক্ত ব্যাপার নয়।

ঝিণুক পোকা যখন জন্মায় তখন কিন্তু তার শরীরে কোনও বর্ম্মের চিহ্ন থাকে না, ঠিক যেন ছোট্ট একটুখানি জেলি (যা তোমরা পাঁউরুটীতে মাখিয়া খাও) আপন মনে সমুদ্রের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই আত্ম-রক্ষার দরকার হইয়া পড়ে—ঝিণুক পোকারও হয়। তখন তার শরীরের চারি ধারে ধীরে ধীরে এক যোড়া ঝিণুকের বর্ম্ম গড়িয়া উঠে।

দেহখানি ভারী হইয়া পড়িলে সাঁতার কাটার পক্ষে সেটা খুব সুবিধাজনক নয়। বর্ম্ম তৈরী হইবার সঙ্গে সঙ্গে এ বেচারাদেরও তাই দেহের ভারে সাঁতারের মায়া কাটাইয়া নীচে নামিয়া যাইতে হয়। কিন্তু তাতে তাদের আরামের বিশেষ কোনও ব্যাঘাত হয় না, বরঞ্চ সুবিধাই হয়। সমুদ্রের তলায় পাথরের ঢিপির অভাব নাই, মাটীও নেহাৎ মন্দ নয়। তারই এক কোণায় গিয়া বাবাজী নিরিবিলিতে তাঁর বাসা বাঁধেন। তারপর মনের সুখে নিজের বাক্সের ডালাটি খুলিয়া ধরেন। সমুদ্রের জল হু হু করিয়া ঝিণুকের বাক্সের ভিতর গিয়া ঢুকে। সেই জলের ভিতর খাবারও থাকে যথেষ্ট। ঝিণুকেরা তাই খাইয়া দিনে দিনে বাড়িতে থাকে।

কিন্তু সব জিনিষের মধ্যেই গলদ আছে। কাহাকেও নিরিবিলি থাকিতে দিবার পাত্র ভগবান্ নন। হঠাৎ হয় ত একদিন একটা ধূলা কি বালির দানা, মাছের ডিম কিংবা ঐ রকম ছোট্ট কোনও জলজন্তুর ভাঙ্গা কঙ্কালের একটু গুঁড়া জলের সাথে

ভাসিতে ভাসিতে ঝিণুক পোকার বাক্সের ভিতর গিয়া ঢুকে। সেই যে ঢুকে, আর সেটা বাহির হইতে চায় না। ঝিণুক পোকা অবশ্য তার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে কসুর করে না; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর তার ক্ষুদ্র শক্তিতে কুলাইয়া উঠে না। বেচারার তখন ভারী মুস্কিল। পিঠের তলায় যদি একটা প্রকাণ্ড (শরীরের তুলনায়) কাঁটার মত কিছু আট্‌কাইয়া থাকে তবে কার না অস্বোয়াস্তি লাগে? তখন তার একমাত্র চেষ্টা হয় কি করিয়া ঐ খস্ খসে্ জিনিষটাকে একটু মোলায়েম করা যায়।

এইবার এক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। ঝিণুক পোকার শরীর হইতে ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক রকম রস বাহির হইয়া আসে। সেই রস দিয়া সে সেই ময়লা খস্ খসে্ বালির দানা ঢাকিয়া ফেলে। ক্রমে সেই রস জমিয়া যায়—ঝিণুক পোকা তার উপর আবার নতুন রসের আস্তর লেপিয়া তাকে আরও মসৃণ করিয়া তোলে। ক্রমে এই আস্তরও জমিয়া কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এমনি ভাবে সেই ছোট্ট নোংরা বালির কণা, কিংবা হাড়ের গুঁড়াটি দিনের পর দিন ক্রমে ক্রমে বড় আর গোল হইতে থাকে। দেখিতেও হয় অতি চমৎকার। ইহাকেই আমরা বলি 'মুক্তা'।

এই ত গেল মুক্তার জন্ম কথা, এখন কথা হইতেছে—এই মুক্তা লোকে সংগ্রহ করে কেমন করিয়া। ঝিণুক বাবাজীরা এতটা পরোপকারী নন্ যে মুক্তা তৈরী করিয়া তোমাকে ডাঙ্গার উপর তুলিয়া দিয়া যাইবেন, কাজেই মুক্তা যোগাড় করিতে হইলে তোমাকেই সমুদ্রের তলায় যাইতে হইবে। কাজটি যে খুব সহজ তা যেন কেউ মনে করিও না, কিন্তু পয়সার লোভে মানুষ সবই করিয়া থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও সে পিছ্‌পা হয় নাই।

পৃথিবীর মধ্যে আমাদের সিংহলের কাছাকাছি জায়গাটা একটা নাম করা মুক্তার দেশ। অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, বোর্ণিও, ফিলিপাইন দ্বীপ প্রভৃতির কাছাকাছি সমুদ্রেও যথেষ্ট মুক্তা পাওয়া যায়। সিংহলের লোকেরা মুক্তা সংগ্রহের কাজে বেশ ওস্তাদ। যে রকম সাদাসিধা ভাবে ইহারা নিঃসঙ্কোচে সমুদ্রের তলায় নামিয়া যায় তাহা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। সাধারণ একটা লম্বা দড়ির এক দিকে একটা পাথর বাঁধিয়া তার উপর ডুবুরিকে (যাহারা জলের তলায় নামে তাদের ডুবুরি বলে) দাঁড় করাইয়া দেওয়া হয়।—তার নাকের ভিতর দু'টি শিং কিংবা কাঠের গুঁজি ভরিয়া দেওয়া হয় যাতে

নাকে জল না ঢোকে। আর কোমরে থাকে একটা ছোরা আত্মরক্ষার জন্য। একে সমুদ্রের তলায় হিংস্র জীবের অভাব নাই, তার উপর হাঙ্গর নামধারী মাছগুলি নাকি আবার মানুষের মাংসটা একটু বেশী রকম পছন্দ করে। ডুবুরি যতক্ষণ জলের ভিতর থাকে ততক্ষণ তাহাকে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকিতে হয়। কাজেই তার পক্ষে এক এক বার মিনিট খানেকের বেশী সময় জলের তলায় থাকা সম্ভব হয় না। ঐ সময়টুকুর মধ্যে সে যত পারে ঝিণুক সংগ্রহ করিয়া কোঁচড় ভর্ত্তি করে। তারপর

সমুদ্রের তলায় আধুনিক পোষাক পরা ডুবুরি।

উপরে নৌকা হইতে অন্যান্য ডুবুরিরা দড়ি ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলে। সব ঝিণুকের মধ্যে আর কিছু মুক্তা পাওয়া যায় না, কেননা ঝিণুক পোকারা মুক্তা তৈরী করে ঘটনাচক্রে পড়িয়া বাধ্য হইয়া, দরকার না হইলে সাধ করিয়া মুক্তা তৈরী করিতে যাইবে এমন বোকা তাহারা নয়। কাজেই মুক্তা পাওয়া যায় দৈবাৎ ২।১টার মধ্যে। তবে তেমন বড় ঐ ২।১টা পাইলেই যথেষ্ট।

একটু সভ্য ডুবুরিরা কিন্তু অমন প্রাণের মায়া ছাড়িয়া সাধাসিধা ভাবে জলে নামে না। জলে নামিবার জন্য তারা আলাদা ডুবুরির পোষাক পরিয়া লয়। এই

পোষাকের বাহাদুরী হইতেছে ইহাতে শরীর এবং মাথাটার সবটাই থাকে বর্ম্মে ঢাকা, চোখের সম্মুখটায় শুধু কাচ বসান—যাতে দেখিবার অসুবিধা না হয়, আর নাকের সঙ্গে লাগান থাকে একটা প্রকাণ্ড লম্বা নল। এই নলের অন্য দিক্ থাকে জলের উপর নৌকায়। অন্যান্য ডুবুরিরা তাহার ভিতর দিয়া বাতাস ছাড়িয়া দেয়, কাজেই ডুবুরির জলের তলায় নিঃশ্বাস লইতে কোনও কষ্ট হয় না। সমস্ত শরীর বর্ম্মে ঢাকা থাকায় জীবনের ভয়টাও বিশেষ থাকে না—সে যতক্ষণ খুসী জলের তলায় ঘুরিয়া ফিরিয়া ঝিণুক কুড়াইতে পারে। আজকাল আবার জলের তলায় বসিয়া জলের উপরের লোকেদের সাথে 'ওয়্যারলেসে' কথাবার্ত্তা বলারও ব্যবস্থা হইয়াছে যে যন্ত্রের সাহায্যে এটা সম্ভব হইয়াছে তাহারও একটা ছবি এখানে দিলাম। ইহার সাহাযে দু'মাইল নীচে গিয়াও কথাবার্ত্ত চালান যায়।

জলের তলায় বসিয়া উপরের লোকেদের সাথে কথাবার্ত্তা চালাইবার যন্ত্র।

সমুদ্রের তলায় যদি কোন ডুবুরি দৈবাৎ একটা জ্যান্ত ঝিণুক পোকা ডালা খোলা অবস্থায় দেখিতে পায় তবে সে ইচ্ছা করিলেই তাকে দিয়া মুক্তা তৈরী করাইয়া লইতে পারে। তবে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে নয়, তার জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে, আর সে মুক্তা শেষ পর্য্যন্ত সে ডুবুরিটির নিজের ভাগ্যে জুটিবে কিনা তাহাও বলা শক্ত। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছ বোধ হয়। ডালা খোলা ঝিণুকটার মধ্যে

ছোট্ট একটা কিছু ঢুকাইয়া রাখিয়া আসিলেই হইল, ঝিণুক যথাসময়ে তার উপর আস্তর লেপিতে সুরু করিবে। ঠিক এমনি ভাবে একবার কয়েকজন চীনা ডুবুরি সমুদ্রের তলায় কতকগুলি ঝিণুকের মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা পুতুল রাখিয়া আসিয়াছিল। বহু দিন পরে সে ঝিণুক তুলিয়া দেখা গেল তার মধ্যে কতকগুলি মুক্তার পুতুল তৈরী হইয়া আছে। এই মুক্তাগুলি এখনও লণ্ডনের সাউথ কেন্‌সিংটনের মিউজিয়মে সাজান আছে।

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

কঠিন ভাবে বিরূপাক্ষের মুখের দিকে তাকাইয়া হুকা-কাশি কহিলেন, "কী রেখেছিলেন ঘড়ির ভেতরে বলুন!"

মাটীর দিকে দুই চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বিরূপাক্ষ কোন মতে উত্তর করিল, "একটু খানি রেয়ার্ আর্থ্ মেটাল।"

জলন্ত অঙ্গারের মত হুকা-কাশির চোখ দুটী জ্বলিয়া উঠিল, স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "অকৃতজ্ঞ, নরাধম, তোমার উপযুক্ত শাস্তি ঐ।" দেয়ালের গায়ে একখানা চাবুক ঝুলিতেছিল, আঙ্গুল দিয়া হুকা-কাশি সেইটী দেখাইয়া দিলেন।

রণজিৎ বিমূঢ়ের মত শুধু একবার ইহার, আর একবার উহার মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল, কিছুই তার বোধগম্য হইতেছিল না। তার বিবেচনায় রহস্যটা যেন সরল হওয়া দূরে থাক্, আরও গভীর হইয়া উঠিতেছে।

ততক্ষণে কিন্তু হুকা-কাশি তাঁর সাময়িক উত্তেজনা সম্পূর্ণ দমন করিয়া ফেলিয়াছেন, একটু মৃদু হাসিয়া রণজিতের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "উ হু অমন হতভম্বের মত আর তাকাবেন না রণজিৎ বাবু, রহস্য ষোল আনাই ভেদ হয়ে গেছে, কোথাও এতটুকু ঠেকে নাই। মানুষ খোদ্ শয়তানের চেলা হয়েও ভাল মান্‌ষের

মুখোস পরে কেমন হেসে খেলে বেড়াতে পারে তারই গল্প আজ আপনাকে শোনাব। প্রোফেসার গুপ্ত, যাঁর দয়ায় এ হতভাগা আজ লোক-সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছে, দেখ্‌বেন নিজের ঘৃণ্য স্বার্থের কাছে তাঁকে বলি দিতে এর এতটুকু বাধেনি এমনই নিমক-হারাম এ। যে ভাবে আস্তে আস্তে এগোবার ফলে ধীরে ধীরে সমস্ত ব্যাপারটা আমার চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠেছে, ঠিক সেই ভাবেই আমি আমার গল্প বলে যাই, আপনি শুনুন, কেমন?—

"সেদিন ভূপেশ বাবু এসে তাঁর ঘড়ি-চুরীর যে বর্ণনা দিয়ে গেলেন তা বাস্তবিকই খুব বিস্ময়কর। সাধারণ শ্রেণীর কোন চোরের কাজ এ নয়, কেননা দেরাজের ভেতর তা হলে গয়নাগুলো কখনই পাওয়া যেত না। যদি বলেন, এ পাগলের কাণ্ড, তাও কেউ বিশ্বাস কর্‌তে রাজী হবে না, কেননা অতখানি হুঁসিয়ারির সঙ্গে কাজ হাসিল করা যে কোন পাগলেরই অসাধ্য। ঘড়িটার ওপর কারো আক্রোশ আছে এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া গেল না। ভূপেশ বাবু অবশ্য তাঁর নলকোপার শ্রীশ চাটুয্যের কথা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সেটাও সম্ভবপর নয়। ভেবে দেখুন, যে লোকটাকে আপনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন, সকলে মিলে তারই ছবি নিয়ে পূজো কর্‌ছে—এ দৃশ্য দেখ্‌লে পরে হঠাৎ হয়তো নিজেকে সাম্‌লাতে না পেরে ছুটে গিয়ে সেই ছবিখানার অপমান করা নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নয়। কিন্তু তাই বলে সে রাগটাকে আজন্মকাল পুষে রেখে তার মরার পঁয়ত্রিশ বছর পরে কোথায় কোন্ ঘড়ি না কি স্মৃতিচিহ্ন আছে, সেইটেকে চুপি চুপি সরিয়ে নষ্ট করে ফেলা—এ শুধু রণজিৎ বাবু, গল্প-উপন্যাসেই পড়া যায়—বাস্তব জগতে কখনো চোখে পড়ে না। আমার এ ধারণা যে অভ্রান্ত তার পরিচয়ও পরে পেয়েছেন আপনারা।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া হুকা-কাশি একটু থামিলেন. তারপর নস্যদানটা হইতে এক টিপ্ নস্য লইয়া পুনরায় বলিতে সুরু করিলেন, "ব্যাপারটা ক্রমে কেমন ঘোরাল হয়ে উঠ্‌ছে দেখ্‌ছেন! যতগুলো সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, খুঁটে দেখার ফলে সবগুলিই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। কোন অর্থ ই যেন এ চুরীর থাক্‌তে পারে বলে মনে হচ্ছে না। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা করে, বেশ করে তলিয়ে দেখ্‌লে পর আর একটী সম্ভাবনা ধীরে ধীরে মনের ভেতর উঁকি মার্‌তে আরম্ভ করে—এমনও তো হতে পারে যে ঘড়িটা নেওয়া

চোরের একেবারেই উদ্দেশ্য ছিল না, ঘড়ির ডালার নীচে আর "একটা কিছু" লুকানো ছিল, সেই ছিল চোরের আসল লক্ষ্য। সেটা উদ্ধারের পর ঘড়িতে আর তার কোনই প্রয়োজন ছিল না, তাই সে দূরে সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে।

"অন্যান্য সবগুলো সম্ভাবনাই যখন একে একে যুক্তি-তর্কে অচল হয়ে পড়্‌ল, এই সন্দেহটাই তখন একমাত্র সম্ভাবনা বলে স্বভাবতঃই মনে জেগে উঠ্‌ল। এত কষ্টে এবং এত সন্তর্পণে যে ঘড়ি হাতে এসেছে সেটাকে সঙ্গে না নিয়ে ফেলে রেখে যাওয়ায় সন্দেহটা আরও বেড়ে গেল বই কম্‌ল না। কি হবে আর ও ঘড়িতে, আসল জিনিষ যে সে পেয়ে গেছে!

"কিন্তু অনেক কিছু ভাব্‌বার আছে এর ভেতর। ঘড়িটা আজ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ভূপেশবাবুর নিজের কাছে সিন্দুকে রয়েছে, চাবি বরাবর তাঁর কাছে, তাঁর সম্পূর্ণ অজ্ঞানাতে অপর কোন লোক এ ঘড়ির ডালার নীচে কোন কিছু লুকিয়ে রাখ্‌বার সুযোগ-সুবিধে পেলে কি ভাবে? 'তাঁর অজ্ঞানাতে' বল্‌ছি এই জন্যে যে এ রকম একটা কিছু ঘটার কথা জান্‌লে অবশ্যই তা তিনি তখন আমায় বল্‌তেন। কাজেই বুঝ্‌লাম, আমার অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে দিন্‌ কয়েকের জন্য ঘড়িটা নিশ্চয়ই ভূপেশবাবুর হাত থেকে অন্য কারো হাতে গিয়েছিল। কিন্তু কার হাতে যেতে পারে? এমন একটা পুরানো বাতিল ঘড়িতে দরকার পড়্‌তে পারে কার? কারুর বলেই তো মনে হয় না। সুতরাং ঘড়ি যদি বাস্তবিকই এর ভেতর ভূপেশবাবুর হাত ছাড়া হয়ে থাকে তবে নিশ্চয়ই সেটা তিনি কোন ঘড়িওয়ালার দোকানে মেরামৎ করতে দিয়েছিলেন, এবং সেই সময়েতেই কেউ এর ডালার নীচে কোন জিনিষ লুকিয়েছে। ভূপেশবাবুকে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেই আমার এ ধারণা ঠিক কি বেঠিক, বোঝা যাবে।

গোড়াতেই কিন্তু তিনি বাস্তবিকই কোথাও ঘড়ি সারাতে দিয়েছিলেন কিনা সে প্রশ্ন না করে আর একটা প্রশ্ন কর্‌লাম, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, তাঁর বাগানটা কি একটানা ফুলেরই বাগান, না কি সেটাতে ফোয়ারা-টোয়ারাও আছে? এ প্রশ্নে তিনি অবাক্‌ হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলেন, বোধ হয় ভাব্‌লেন, ঘড়িচুরীর সঙ্গে এ কথার কি সম্বন্ধ থাক্‌তে পারে! শুধু তিনিই নন, আপনিও যে চোখ দুটোকে

একেবারে বহরমপুরী ছানাবড়া করে তুলেছিলেন সে কথা ভেবে এখনও আমার হাসি পাচ্ছে। প্রশ্নটা কিন্তু একেবারেই অবান্তর নয়। আপনার স্মরণ আছে, ভূপেশ বাবুর ছেলে ঘড়িটাকে ভাঙ্গা অবস্থায় তাদের বাগানের ভেতর কুড়িয়ে পেয়েছিল। এখন, ঘড়িচুরীর যে কারণটা আমি মনে মনে ঠাউরেছি সেটা যদি বাস্তবিকই ঠিক হয় তবে স্বভাবতঃই মনে দু দুটো প্রশ্ন উঠে—ঘড়িটা বাগানের ভেতরেই বা গেল কেন, আর ওটাকে ভাঙ্গা অবস্থাতেই বা দেখ্‌ছি কেন? ঘড়ির ডালার নীচে যদি কোন জিনিষ লুকোনো থাকে, তবে চোর তো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে এক নিমেষের মধ্যেই তা বার করে ফেল্‌তে পারে, বাগানের ভেতর তো ঢোক্‌বার তার কিছুমাত্র দরকার নেই! দ্বিতীয়তঃ, ঘড়ির ওপর চোরের তো রাগের কোনই কারণ নেই, সে কেন মিছেমিছি অত কষ্ট করে ওটাকে ভাঙ্গ্‌তে যাবে? এ দুটো প্রশ্নেরই শুধু একটী জবাব সম্ভব—ঘর থেকে চোর ঘড়িটী বার করে বাইরের বারান্দায় নিয়ে আসে; তার পর ডালা খুলে যেজন্যে তার আসা সে কাজটী হাসিল করে অপ্রয়োজনীয় বোধ ঘড়িটাকে বাগানের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কিন্তু বাগানের নরম নরম ঘাসের ওপর পড়্‌লে

বাগানের ভেতর ছুঁড়ে……।

ঘড়িটাতো ওভাবে ভেঙ্গে যাওয়া সম্ভব নয়; নিশ্চয়ই তা হলে কোন একটা শক্ত জিনিষের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে। ভূপেশ বাবু ধনী এবং সৌখীন, তাঁর বাগানের

ভেতর ইটের পাঁজা বা অন্য কোন বাজে শক্ত জিনিষ থাকার কথা নয়। বড়লোকের বাগানে শক্ত জিনিষের ভেতর শত করা সত্তর ভাগই থাকে জলের ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড় এই সব। অন্য জিনিষও যে না থাকে তা নয়, কিন্তু যেটা বেশীর ভাগ দেখা যায় সেইটাই আমাদের প্রথমে মনে করে নেওয়া কর্ত্তব্য ; সেটা যদি না মেলে তা হলে অবশ্য অন্য জিনিষ নিয়ে বিচার কর্‌তে হবে। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আচ্ছা ভূপেশ বাবু, আপনার বাগানে কি জলের ফোয়ারা বা কৃত্রিম পাহাড়—এ সব কিছু আছে ?'

"তিনি বল্লেন, 'ফোয়ারা আছে ; কিন্তু সে কথা কেন ?'

"একটা, না সারি সারি অনেকগুলো ?'

এ কথা জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য এই যে বাগানে যদি শুধু একটাই ফোয়ারা থাকে, তবে অন্য জায়গায় ঘড়িটা এসে না পড়ে ঠিক তারই গায়ে এসে পড়াটা যেন অনেকটা দৈবের ব্যাপার হয়ে পড়ে ! কিন্তু সারি সারি অনেকগুলো ফোয়ারা থাক্‌লে একটা-কি একটার গায়ে ঘড়িটা এসে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

"ভূপেশ বাবু জবাব দিলেন, 'না, নিতান্ত দুএকটীও নয়।'

"আপনি পরে হয়তো শুনে থাক্‌বেন, একটা ফোয়ারার কাছেই ঘড়িটাকে পাওয়া গেছ্‌ল। ভূপেশ বাবুর বাড়ী আমি দেখ্‌তে চেয়েছিলাম বাগানটা কোন্ দিকে শুধু তাই দেখ্‌বার জন্যে, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

"জবাবগুলো সবই আমার অনুমানের স্বপক্ষে হওয়ায় এইবার আচম্‌কা একেবারে সেরা প্রশ্নটী করে বস্‌লাম, 'আচ্ছা বলুন তো, চুরী যাবার ক'দিন আগে কোন্ দোকানে ঘড়িটাকে মেরামৎ কর্‌তে পাঠিয়েছিলেন ?' বেচারা ভূপেশ বাবু প্রশ্ন শুনে একেবারে হতভম্বের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'মেরামৎ কর্‌তে দিয়েছিলাম সে কথা জান্‌লেন কি করে আপনি ? এ পর্য্যন্ত তো সে কথা একবারও আপনাকে বলা হয় নি !' একটুখানি হেসে নিয়ে আমি শুধু বল্‌লাম 'শুধু কি মুখের কথা শুনেই সব কথা জান্‌তে হবে ভূপেশ বাবু ? তাছাড়াও আমাদের অনেক কিছু জান্‌তে আছে যে।' জবাব শুনে ভূপেশ বাবু যে ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাতে সুরু কর্‌লেন তা থেকে বেশ বুঝ্‌লাম, তিনি আমায় কোন এক জ্যোতির্ব্বিদ ঠাকুর ঠাউরে বসে আছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন, কিভাবে আমি

গোড়া থেকে সব জিনিষ ঠিক ঠিক এঁচে এসেছি সেটা ভেঙ্গে বুঝিয়ে বলার পর আর এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, বরং উল্টে মনে হচ্ছে এ সব কথা বুঝি আপনাদেরও মনে আসা উচিত ছিল। নয় কি ?

"তারপর প্রশ্ন উঠ্‌ল, ঘড়ির ভেতরে সেই মূল্যবান্ জিনিষটী কে পূর্‌লে। ঘড়িওয়ালা যে নয়, তা সুনিশ্চিত, কেননা তা হলে ভূপেশবাবুকে ঘড়ি ফিরিয়ে দেবার আগে নিশ্চয়ই সে সেটা বার করে রাখ্‌ত, বিপদ্ মাথায় করে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ী গিয়ে হানা দিত না। তবে এটাও ঠিক যে, যে মহাপ্রভু এ কাণ্ডটা করেছে, ঘড়িওয়ালার সে পরিচিত লোক—অপরিচিত লোক হলে দোকানদারের অসাক্ষাতে তার দোকানের ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার সুযোগ সে পেত না। ভাব্‌লাম, দেখা যাক্, ঘড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে, যদি তাতে করে একটু আলোর রেখা পাওয়া যায় !

"তারপর ঘড়িওয়ালার দোকানে ঢোক্‌বার পর, তার মুখ থেকে আরও একটা ষ্টোভার মার্কা ঘড়ি চুরী যাওয়ার কথা, অর্ডার বুকের পাতা ছেঁড়ার কথা, কিভাবে ভূপেশ বাবুর ঘড়িচোর আর দোকানের নতুন ঘড়িচোর একই লোক টের পেয়ে যাই—তার কথা এবং সর্ব্বশেষে ডাষ্ট্‌বিনে দু নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটীর সন্ধান পাওয়ার কথা—সমস্তই আপনি জানেন, তা নিয়ে আর বৃথা সময়ক্ষেপ করার আবশ্যক নেই। ঘড়িটা আমি হাতে করে না ধরে একটা কাঠির সাহায্যে তুলে ফেল্লাম। এ রকম কর্‌বার হেতু এই যে, যদি চোরের হাতের ছাপের কোন একটা হদিশ পাই। কিন্তু এরই থেকে যে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য আমার চোখের সাম্‌নে খুলে যাবে, সেকি তখন স্বপ্নেও ভেবেছি ?

"অপরাধীকে খোঁজার সুবিধার জন্যে যাঁরা হাতের ছাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকেন তাঁরা এক রকমের একটি গুঁড়ো ব্যবহার করেন, যেটা অস্পষ্ট ছাপের ওপর পড়ে তাকে স্পষ্ট করে তোলে। সময় বিশেষে কাজে লাগ্‌তে পারে ভেবে সেই রকমের খানিকটা গুঁড়ো আমিও নিজের কাছে রেখে থাকি। ঘড়ির ওপর সেই গুঁড়ো ছড়াতেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার আমার চোখে পড়্‌ল। ঘড়ির গায়ে যেখানে যেখানে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে ঠিক তারই পাশে পাশে ছোট এবং অস্পষ্ট রকমের

ভেতর ইটের পাঁজা বা অন্য কোন বাজে শক্ত জিনিষ থাকার কথা নয়। বড়লোকের বাগানে শক্ত জিনিষের ভেতর শত করা সত্তর ভাগই থাকে জলের ফোয়ারা, কৃত্রিম পাহাড় এই সব। অন্য জিনিষও যে না থাকে তা নয়, কিন্তু যেটা বেশীর ভাগ দেখা যায় সেইটাই আমাদের প্রথমে মনে করে নেওয়া কর্ত্তব্য; সেটা যদি না মেলে তা হলে অবশ্য অন্য জিনিষ নিয়ে বিচার কর্‌তে হবে। তাই জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'আচ্ছা ভূপেশ বাবু, আপনার বাগানে কি জলের ফোয়ারা বা কৃত্রিম পাহাড়—এ সব কিছু আছে?'

"তিনি বল্লেন, 'ফোয়ারা আছে; কিন্তু সে কথা কেন?'

"একটা, না সারি সারি অনেকগুলো?'

এ কথা জিজ্ঞাসা করার তাৎপর্য্য এই যে বাগানে যদি শুধু একটাই ফোয়ারা থাকে, তবে অন্য জায়গায় ঘড়িটা এসে না পড়ে ঠিক তারই গায়ে এসে পড়াটা যেন অনেকটা দৈবের ব্যাপার হয়ে পড়ে! কিন্তু সারি সারি অনেকগুলো ফোয়ারা থাক্‌লে একটা-কি একটার গায়ে ঘড়িটা এসে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

"ভূপেশ বাবু জবাব দিলেন, 'না, নিতান্ত দুএকটীও নয়।'

"আপনি পরে হয়তো শুনে থাক্‌বেন, একটা ফোয়ারার কাছেই ঘড়িটাকে পাওয়া গেছ্‌ল। ভূপেশ বাবুর বাড়ী আমি দেখ্‌তে চেয়েছিলাম বাগানটা কোন্ দিকে শুধু তাই দেখ্‌বার জন্যে, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

"জবাবগুলো সবই আমার অনুমানের স্বপক্ষে হওয়ায় এইবার আচম্‌কা একেবারে সেরা প্রশ্নটী করে বস্‌লাম, 'আচ্ছা বলুন তো, চুরী যাবার ক'দিন আগে কোন্ দোকানে ঘড়িটাকে মেরামৎ কর্‌তে পাঠিয়েছিলেন?' বেচারা ভূপেশ বাবু প্রশ্ন শুনে একেবারে হতভম্বের মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে আমার দিকে তাকিয়ে বল্লেন, 'মেরামৎ কর্‌তে দিয়েছিলাম সে কথা জান্‌লেম কি করে আপনি? এ পর্য্যন্ত তো সে কথা একবারও আপনাকে বলা হয় নি!' একটুখানি হেসে নিয়ে আমি শুধু বল্‌লাম 'শুধু কি মুখের কথা শুনেই সব কথা জান্‌তে হবে ভূপেশ বাবু? তাছাড়াও আমাদের অনেক কিছু জান্‌তে আছে যে।' জবাব শুনে ভূপেশ বাবু যে ভাবে আমার মুখের দিকে তাকাতে সুরু কর্‌লেন তা থেকে বেশ বুঝ্‌লাম, তিনি আমায় কোন এক জ্যোতির্ব্বিদ ঠাকুর ঠাউরে বসে আছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছেন, কিভাবে আমি

গোড়া থেকে সব জিনিষ ঠিক ঠিক এঁচে এসেছি সেটা ভেঙ্গে বুঝিয়ে বলার পর আর এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, বরং উল্টে মনে হচ্ছে এ সব কথা বুঝি আপনাদেরও মনে আসা উচিত ছিল। নয় কি?

"তারপর প্রশ্ন উঠ্‌ল, ঘড়ির ভেতরে সেই মূল্যবান্ জিনিষটী কে পূর্‌লে। ঘড়ি-ওয়ালা যে নয়, তা সুনিশ্চিত, কেননা তা হলে ভূপেশবাবুকে ঘড়ি ফিরিয়ে দেবার আগে নিশ্চয়ই সে সেটা বার করে রাখ্‌ত, বিপদ্ মাথায় করে রাতের অন্ধকারে তাঁর বাড়ী গিয়ে হানা দিত না। তবে এটাও ঠিক যে, যে মহাপ্রভু এ কাণ্ডটা করেছে, ঘড়ি-ওয়ালার সে পরিচিত লোক—অপরিচিত লোক হলে দোকানদারের অসাক্ষাতে তার দোকানের ঘড়ি নিয়ে নাড়াচাড়া কর্‌বার সুযোগ সে পেত না। ভাব্‌লাম, দেখা যাক্, ঘড়িওয়ালা লোকটার সঙ্গে একটু কথা-বার্ত্তা কয়ে, যদি তাতে করে একটু আলোর রেখা পাওয়া যায়!

"তারপর ঘড়িওয়ালার দোকানে ঢোক্‌বার পর, তার মুখ থেকে আরও একটা ষ্টোভার মার্কা ঘড়ি চুরী যাওয়ার কথা, অর্ডার বুকের পাতা ছেঁড়ার কথা, কিভাবে ভূপেশ বাবুর ঘড়িচোর আর দোকানের নতুন ঘড়িচোর একই লোক টের পেয়ে যাই—তার কথা এবং সর্ব্বশেষে ডাষ্ট্‌বিনে দু নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটীর সন্ধান পাওয়ার কথা—সমস্তই আপনি জানেন, তা নিয়ে আর বৃথা সময়ক্ষেপ করার আবশ্যক নেই। ঘড়িটা আমি হাতে করে না ধরে একটা কাঠির সাহায্যে তুলে ফেল্লাম। এ রকম কর্‌বার হেতু এই যে, যদি চোরের হাতের ছাপের কোন একটা হদিশ পাই। কিন্তু এরই থেকে যে এক অতি আশ্চর্য্য ব্যাপারের রহস্য আমার চোখের সাম্‌নে খুলে যাবে, সেকি তখন স্বপ্নেও ভেবেছি?

"অপরাধীকে খোঁজার সুবিধার জন্যে যাঁরা হাতের ছাপ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে থাকেন তাঁরা এক রকমের একটি গুঁড়ো ব্যবহার করেন, যেটা অস্পষ্ট ছাপের ওপর পড়ে তাকে স্পষ্ট করে তোলে। সময় বিশেষে কাজে লাগ্‌তে পারে ভেবে সেই রকমের খানিকটা গুঁড়ো আমিও নিজের কাছে রেখে থাকি। ঘড়ির ওপর সেই গুঁড়ো ছড়াতেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার আমার চোখে পড়্‌ল। ঘড়ির গায়ে যেখানে যেখানে হাতের বুড়ো আঙ্গুলের ছাপ পড়েছে ঠিক তারই পাশে পাশে ছোট এবং অস্পষ্ট রকমের

একটা দাগ বরাবর দেখা দিল। খুব ছোট এবং অস্পষ্ট হলেও সেটাকে আঙ্গুলের দাগ বলেই মনে হয়, অথচ মজা এই, বুড়ো আঙ্গুল অই অবস্থাতে থাক্‌লে অন্য কোন আঙ্গুল ওখানে ওভাবে আস্‌তেই পারে না। ব্যাপারটা আপনাকে দেখালাম, আপনি কিছুই ঠাওর করতে পার্‌লেন না। আসল ব্যাপারটা কিন্তু তখনই আমি এঁচে ফেলেছি। বলুনতো কিসের দাগ সেটা?" বলিয়া হুকা-কাশি স্মিতমুখে রণজিতের দিকে তাকাইলেন।

রণজিৎ বোকার মত একটু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "কিসের?"

"ষষ্ঠ আঙ্গুলের, অর্থাৎ ঘড়িচোরের হাতের আঙ্গুল পাঁচটা নয়, ছটা। বুড়ো আঙ্গুলের পাশে আরও একটী ছোট্ট আঙ্গুল আছে. তারই দাগ বরাবর বুড়ো আঙ্গুলটার পাশে পাশে সমানে উঠে এসেছে। কিন্তু তবুও একেবারে নিশ্চিত না হওয়া পর্য্যন্ত কারো কাছে কিছু প্রকাশ করা, অথবা শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোন, আমার সম্পূর্ণ স্বভাব-বিরুদ্ধ। তাই ঠিক কর্‌লাম আমার অনুমানটাকে আরও একটু যাচাই করে নিতে হবে।"

(ক্রমশঃ)

জন্তু-জানোয়ারের ভালবাসা

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

৺সুকুমার রায় লিখে গেছেন—

"মাসি গো মাসি, পাচ্ছে হাসি
নিম্ গাছেতে হচ্ছে শিম,
হাতীর মাথায় ব্যাঙের ছাতা,
কাগের বাসায় বগের ডিম!"

ভারী অসম্ভব কথা, নয়? কাকের মত চালাক পাখীর বাসায় আবার কিনা থাক্‌বে অন্য পাখীর ডিম! অথচ কাকের বাসায় বকের ডিম না থাক্‌লেও কোকিলের ডিম দেখ্‌তে পাওয়া যায় হামেশাই। পাখীদের মধ্যে এই কোকিলই হলো একটী

পাখী যে নাকি তার ছানার জন্যে কোন রকম কষ্ট কর্‌তে মোটেই রাজী নয়। কিন্তু তা বলে মনে করোনা যে কোকিল তার ডিমগুলির জন্য কিছু কম চিন্তা করে। আস্তে আস্তে কাকের বাসায় ঢুকে একটী ডিম পেড়ে কাকের একটী ডিম সে তুলে নিয়ে চলে আসে। মোট ডিম থাকে সমানই। কাক টেরও পায়না যে তার বাসায় চোর এসেছিল।

বাস্তবিকই জীব জগতের প্রত্যেক জন্তু-জানোয়ারই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তে চেষ্টা করে, তাদের দুঃখে, কষ্টে তারা তাদের বড় করে তুল্‌তে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কেবল কি তাই?—জন্তু-জানোয়ারদের বেশ ভালো করে যাদের দেখ্‌বার সুবিধে হয়েছে, তাঁরা বলেন যে মানুষবন্ধুদের উপরও জন্তু-জানোয়ারদের টানটা নেহাৎ কম নয়।

নাঃ, ভাবো কারবো না!

বাঁদরের বাচ্ছারা নিজেদের মধ্যে কেমন সুন্দর খেলে তা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। ছবিতে দেখ বড় ভাই কত সাধ্য-সাধনা করে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে সন্ধি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

এমন ধারা ছোট ছোট কয়েকটী ঘটনা থেকেই আমরা জান্‌তে পারি যে নিজের পরিবারের বা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে ভালবাসাটা কেবল মানুষেরই একচেটিয়া নয়।

সিংহ, বাঘ, হাতী, ক্যাঙারু থেকে আরম্ভ করে বিড়াল, পাখী, সাঁপ পর্য্যন্ত সকলেই নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের ও বন্ধু-বান্ধবদের যথেষ্ট ভালবাসে।

সেদিন কাগজে একটা সিংহীর কথা পড়েছিলুম। এক ভদ্রলোকের এক পোষা সিংহী ছিল। সিংহীটা সাহেবকে এত ভালবাস্‌ত যে ভদ্রলোক যদি তার চোখের বাইরে যেতেন, তা হ'লেই সে দস্তুর মত অস্থির হয়ে পড়্‌ত। একদিন ভদ্রলোক সিংহীটাকে বাইরে বেঁধে রেখে ঘুমুতে গেছেন, হঠাৎ শোনেন ভীষণ চীৎকার! সিংহীর কোন বিপদ্ হয়েছে ভেবে তিনি বন্দুক নিয়ে বাইরে এলেন। এসে দেখেন, সিংহীটা পাগলের মত ছটফট্ কর্‌ছে, আর তারই এই ভীষণ চীৎকার! ব্যাপার কি জান্‌বার জন্য যেই সিংহীর কাছে গেছেন, অম্‌নি সিংহী লাফিয়ে তাঁর ঘাড়ে পড়্‌ল, তার পর নানা রকমে আদর করে, তার সেই মস্ত মস্ত থাবা দিয়ে পিঠ্ চাপড়ে সাহেবকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌ল। সাহেবের মনে পড়ে গেল যে তিনি ঘুমুতে যাবার আগে তাঁর সিংহীকে আদর কর্‌তে ভুলে গেছেন, তাই এত কাণ্ড!

এম্‌নি ধারা মানুষের উপর ভালবাসার কাহিনী শত শত বল্‌তে পারা যায়। কয়েকদিন আগে শুনেছিলাম, এক ভদ্রলোক সারস জাতীয় একটা মস্ত বড় পাখী এনেছিলেন। সে নির্ব্বিঘ্নে তাঁর বাগানে ঘুরে বেড়াত; সেখানে আরও নানা জাতীয় পশুপক্ষী ছিল, তাদের কিন্তু কারও সাথে সে মিশ্‌ত না। তার খেলার সাথী ছিল বাগানের মালীর বছর খানেকের এক ছেলে, পাখীটা কেবল তারই আশে পাশে ঘুরে বেড়াত। কয়েকদিন পরে একটা ভারী আশ্চর্য্য কাণ্ড দেখ্‌তে পাওয়া গেল। ছেলেটীর কান্না শুন্‌তে পেয়ে সবাই বাইরে এসে দেখে যে সেই বিরাট্ পাখীটা, শিশুটীকে নিজের ডানার নীচে রেখে একটা মস্ত বড় সাপের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌ছে। নিজের ক্ষতের দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

ঠিক এ রকম ভাবে নিজের নিজের "আপনার জনের" জন্যও পশুপক্ষীরা যথেষ্ট ব্যস্ত হয়। ক্যাঙারুর কথাই ধরনা কেন, তাড়া করেছো কি, ছেলেকে পকেটে পূরে ভোঁ দৌড়, দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। যতক্ষণ না তুমি হাঁপিয়ে পড়্‌ছ, ততক্ষণ সেও থাম্‌বে না। কেবল কি তাই? তারা করে কি, ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটা মোড় ঘুরে হঠাৎ তোমার চোখের বাইরে চলে গিয়ে পথের পাশের একটা ঝোপে শিশুটীকে

ফেলে রেখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌বে, তুমিও পেছন পেছন ছুট্‌বে। নিজে মর্‌লেও শিশু ত' বাঁচ্‌লো!

গরিলারও তাই, লতাপাতা দিয়ে সুন্দর বাড়ী তৈরী করে, তা'তে স্ত্রীর ও সন্তানদের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করে থাকে। আর যদি কোন গরিলা-পরিবারের কাউকে কোন শিকারী মেরে ফেলে তবে আর তার রক্ষা নাই। সে দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, মুখ চোখ দিয়ে তার আগুন বেরুতে থাকে, রাগে সারা শরীর তার কাঁপ্‌তে থাকে—একেবারে মরিয়া হয়ে শীকারীর পেছন পেছন সে ছোটে। তারপর হয় তার নিজের আর নয়তো শীকারীর দফা নিকেশ।

দুজনায় ভারী ভাব।

হাতীদের বেলাতেও ওই একই কথা। তারা যে দল বেঁধে শীকারে বেরোয় তা বোধ হয় তোমরা জান। তখন কোন শীকারী কাছে এলেই হলো! সে যদি কোন রকমে হাতীর পালের সন্দেহ জাগিয়ে তোলে তবে আর তার নিস্তার নাই, তাকে শেষ না করে পুরুষ হাতীগুলি সেখান থেকে নড়্‌বেই না। তা ছাড়াও যখন এরা একা একা বেরোয় তখনও একজন অপরকে যথেষ্ট সাহায্য করে। একবার এক শিকারী একটা হাতীকে এমন ভাবে জখম কর্‌লেন, যে হাতীর নড়াচড়া অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ল। তিনি খুব খুসী হয়ে লোকজন ডাক্‌তে গেলেন, ইতিমধ্যে কিন্তু সেই আহত হাতী ভীষণ চীৎকার কর্‌তে লেগেছে।—সারা বন সেই আহত চীৎকারে ভরে উঠেছে। শিকারী ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে দেখেন, অন্য একটা হাতী আস্তে আস্তে শুঁড় দিয়ে সে হাতীটাকে তুল্‌বার চেষ্টা করছে।

তিনি কিছু বল্‌বার বা কর্‌বার আগেই সে তার সঙ্গীকে নিয়ে সরে পড়্‌ল।

সেবার আমাদের বাড়ীতে একটা বিড়ালের কয়েকটা বাচ্ছা হয়েছিল। সে তার বাচ্ছাগুলিকে নিয়ে দুপুর বেলা রোদ পোহাচ্ছে, এমন সময়ে একটা মস্ত বড় কুকুর এসে হাজির!—সে এক দারুণ কুকুর, আমরাই ভয়ে তার কাছে এগুতে সাহস কর্‌তাম না। বিড়াল কিন্তু মোটেই ভয় পেল না, সন্তানদের অমঙ্গল হবে এই ভাবনায় সে অস্থির হয়ে উঠ্‌ল। সারা শরীর ফুলিয়ে দাঁত মুখ বের করে এম্‌নি ভাবে সে কুকুরকে তাড়া কর্‌লো যে সে বেচারা পালাবার আর পথ খুঁজে পায় না। কুকুরকে তাড়িয়ে দিয়ে সে এসে আবার তার বাচ্ছাগুলিকে আদর কর্‌তে লাগ্‌ল।

সাপ যে সাপ সেও কিন্তু এ বিষয়ে নেহাৎ কম যায় না। কোন লোকের চোখে পড়লে সে চট্‌পট্‌ তার বাচ্ছাগুলিকে কোথায় যে লুকিয়ে ফেলে কেউ তার হদিস্‌ পায় না। দেখ্‌তেই পাওয়া যায় না ত' বাচ্ছার কোন রকম বিপদ্‌ ঘট্‌বে কি করে?

বাস্তবিকই এমন ভাবে ভবঘুরে কোকিল পাখী যদি বুদ্ধি খাটিয়ে কাকের বাড়ীতে ডিম পেড়ে না যেত, যদি পাখীরা নিজের নিজের বাচ্ছাদের জন্য খাবার জোগাড় না কর্‌তো, বাড়ী তৈরী না কর্‌তো, সাপেরা যদি ডিম পেড়ে বসে তা দিয়ে ডিম না ফুটাত, বিড়ালেরা বাচ্ছার চোখ না খোলা অবধি যদি তাদের খবরদারী না কর্‌তো, বাঘ সিংহেরা যদি তাদের বাচ্ছা হবার পরেই পালিয়ে যেত, ক্যাঙারুরা যদি তাদের থলিতে করে ছানাদের না নিয়ে বেড়াত তবে যে এই বাচ্ছাগুলির অবস্থা কি হতো বলা শক্ত।

তাই বল্‌ছিলাম, ভালো করে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, সমস্ত প্রানিজগৎটাই গড়ে উঠ্‌ছে এক স্নেহ মমতা এবং ভালবাসা দিয়ে।

ডাঃ সরকারের ডায়েরী

[গত মাসের "শয়তানের দ্বীপ" দ্রষ্টব্য]

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

ইচ্ছে ছিল ডাঃ সূর্য্যকান্ত সরকারের ডায়েরী একটু ধীরে সুস্থে, ভাল করে সাজিয়ে গুছিয়ে বার করা যাবে। সেবারের সেই ভয়ঙ্কর দ্বীপের অভিযান থেকে

ফিরে এসে সেই কাজেই মন দিয়েছিলাম। সাধারণ লোক হয়ত আমাদের কথা অবিশ্বাস করে হেসেই উড়িয়ে দেবে জেনেও আমি পেছপাও হইনি। দু'একজন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত লোককে আমাদের অভিজ্ঞতার কথা বলে, ও ডাঃ সরকারের ডায়েরী দেখিয়ে বুঝেছিলাম যে শুধু সাধারণ লোক নয়—বিদ্যাবুদ্ধি যাঁদের আছে তাঁরাও এমন আজগুবি ব্যাপার বিশ্বাস করতে বিশেষ উৎসুক নন। কিন্তু অবজ্ঞার হাসি ও উপেক্ষার লজ্জার ওপরেও যে জিনিষ আছে তাই আমায় এ কাজে জোর দিয়েছিল। আমি মনে মনে জান্‌তাম যে ডাঃ সরকারের কীর্ত্তিকে একদিন না একদিন লোকে স্বীকার করবেই—সেই কীর্ত্তিতে মানুষের উপকার হোক্‌ বা না হোক্‌।

অবশ্য এখানে মনে হতে পারে যে শয়তানের দ্বীপে ডাঃ সরকারের কীর্ত্তির চাক্ষুষ প্রমাণ থাক্‌তে আমার তা প্রতিষ্ঠা কর্‌বার জন্যে এত ভাবনার কি প্রয়োজন হয়েছিল! কিন্তু প্রমাণ থাক্‌লেই কি লোকে দেখতে চায়! সে চেষ্টা করতেও বাকী রাখিনি। ষ্ট্রেটস্‌ সেট্‌লমেণ্টের গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যে আমি নিজে অনেক অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা তাতে গা করেনি। এমন কি আমাদের এই অভিযানের সংবাদ পর্য্যন্ত অধিকাংশ কাগজে ছাপ্‌তে রাজী হয়নি গাঁজাখুরী গল্প বলে।

সেইজন্যে অন্য সব চেষ্টায় বিফল হয়ে অবশেষে আমি ঠিক করেছিলাম ডাঃ সরকারের ডায়েরীই আগে প্রকাশ কর্‌ব। যদি তা পড়ে কারও এ বিষয়ে অনুসন্ধান কর্‌বার আগ্রহ হয়!

সেই কাজ নিয়েই আছি এমন সময় মিঃ লঙের এক তার পেয়ে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। মিঃ লঙ্‌ ও মিঃ নোব্‌ল তাঁদের কাজ শেষ হলে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। যাবার আগে মিঃ লঙ্‌ এ ব্যাপারের গোড়া পর্য্যন্ত দেখবার জন্যে আয়োজন করবেনই বলে গিয়ে ছিলেন কিন্তু আমি তাঁর কথায় বিশেষ আস্থা স্থাপন করিনি—এ কথা স্বীকার করছি। সুদূর আমেরিকায় গিয়ে এ কথা তাঁর মনে থাকবে ও এই নিয়ে তিনি নিজেকে ব্যস্ত করবেন এ কথা আমার মনে হয়নি। কিন্তু কোন কিছু মৎলব করে গাফিলি করার জাত তারা নয়। পৃথিবীর নতুন নতুন জিনিষ জান্‌বার অক্লান্ত উৎসাহ না থাকলে আজ তারা এত শক্তিমান্‌ হয়ে উঠ্‌তে পারত না।

ডাঃ লঙের টেলিগ্রামে ছিল—শীগ্‌গির চার হাজার ডলার পাঠাচ্ছি। শয়তানের দ্বীপে দ্বিতীয় বার অভিযান করবার আয়োজন কর।

টাকা আসছে বুঝলাম, কিন্তু কিভাবে আয়োজন করতে হবে বুঝতে না পেরে একটু ফাঁফরে পড়লাম। অবশ্য কয়েকদিন বাদেই মিঃ লঙের লম্বা চিঠিতে সব পরিষ্কার ভাবে জানা গেল। আমেরিকার এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সমিতিকে আমাদের অভিযানের কথা জানিয়ে মিঃ লঙ এ বিষয়ে কৌতুহলী করে তুলেছেন। তাদের নামেই অভিযান হবে—টাকাও দিচ্ছে তারা। সেখান থেকে মিঃ লঙ্ পরের ষ্টীমারেই একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে সঙ্গে নিয়ে আসছেন;—তাঁর নাম ডাঃ পামার। আমায় এখান থেকে দুটি ভালো ছোট আকারের ষ্টীমার ও কয়েক জন বাছা বাছা খালাসী জোগাড় করতে হবে।

আমার এ সমস্ত জোগাড় করা শেষ হতে না হতেই একদিন মিঃ লঙ্ ও ডাঃ পামার জাহাজ থেকে এসে নামলেন। সঙ্গে তাঁদের এক বাক্স মালপত্র।

ডাঃ পামারকে আমার প্রথম দিন থেকেই ভারী ভাল লাগ্‌ল। ছোটখাট্ট মানুষটি, বয়স পঞ্চাশের ওপরে, কিন্তু ছেলেমানুষের মত উৎসাহ ও কাজ করবার ক্ষমতা। মুখে তাঁর হাসি লেগেই আছে। তাঁদের মালপত্র দেখে ত আমি অবাক্। তার ভেতরে শুধু দুটি জিনিষের নাম করছি—একটি মেশিনগান ও অপরটি একটি প্রকাণ্ড পিচকিরী। সে পিচকিরী দিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে কুড়ি হাত জমি একবারে ভিজিয়ে দেওয়া চলে। পিচকিরী দেখে ত আমি অবাক্। জিজ্ঞাসা করলাম—"এ আবার কি?" ডাঃ পামার উত্তরে একটু হাসলেন মাত্র—কোন কথা ভাঙ্গলেন না।

আমাদের ক'জনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ক'দিনের ভেতরেই সব আয়োজন শেষ হয়ে গেল ও একদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের দুটি ষ্টীমার নানা রকম অস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জামে বোঝাই হয়ে যাত্রা করল। সন্ধ্যাবেলা আমরা ইচ্ছে করেই যাত্রার সময় ঠিক করে ছিলাম, কারণ তাহলে পরের দিন ঠিক ভোর বেলা শয়তানের দ্বীপে পৌছোন যাবে।

এ ক'দিন ধরে ডাঃ সরকারের ডায়েরীতে আমি হাত দিতে পারিনি। ডাঃ পামার বা লঙ্ কেউ সে কথা তোলেনও নি। রাত্রে ষ্টীমারের ডেকে

তিন জনে মিলে বসে আছি এমন সময় ডাঃ পামার বল্লেন—"সেই ডায়েরীটা সঙ্গে এনেছেন ত?"

আমি "হাঁ" বলাতে তিনি বল্লেন, "আমাদের কিছু পড়িয়ে শোনান না।"

ডায়েরীটা আমার কেবিন থেকে নিয়ে এসে বল্লাম, "এর অধিকাংশতেই কি করে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পোকামাকড়ের আকার বৃদ্ধি করা যায় তার বর্ণনা আছে—সে আমিত ভাল করে বুঝতেও পারিনি!"

ডাঃ পামার তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে সেটা নিয়ে বল্লেন—"আছে নাকি? কই, এ কথা ত মিঃ লঙ্ আমায় বলেন নি।"

মিঃ লঙ্ বল্লেন—'আমি জানলে ত বলব!"

ডাঃ পামার অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "যাক্ আর কোন ভাবনা নেই। ডাঃ সরকারের কাজ আমি এই থেকেই বুঝে নিতে পারব। মাঝে মাঝে দেখ্‌ছি ইংরেজিও আছে। থাক্ এর জন্যে না হয় বাঙ্গলা আমি শিখে নেব।"

এই বয়সে ডাঃ পামারের এই উৎসাহ দেখে সত্যই অবাক্ হয়ে গেলাম। বল্লাম, "ডাঃ সরকারের ডায়েরীর শেষ পাতাগুলিই পড়ি শুমুন।"

মিঃ লঙ্ ও ডাঃ পামার চেয়ার দুটো আর একটু কাছে এগিয়ে নিয়ে এসে বস্‌লেন।—আমি ইংরাজিতে অনুবাদ করে পড়তে আরম্ভ করলাম।

* * * *

"রবিবার ১৩ই সেপ্টেম্বর, রাত্রি একটা।

"ঘুমোতে পারছি না। উৎকণ্ঠায় ঘুম কিছুতেই আস্‌ছে না। আজ দু সপ্তাহ হল মাকড়শার ছানাগুলি তাদের যে জায়গায় আটকে রেখেছিলাম তার লোহার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। তাদের কোন সন্ধান পাচ্ছি না। কাল আমার একান্ত বিশ্বাসী মগ চাকরকে পাহাড় থেকে তাদের সন্ধান পাওয়া যায় কি না জান্‌তে পাঠিয়েছিলাম। তারও কোন সন্ধান নেই। ব্যাপার কি!

"আমার পরীক্ষা সফল হয়েছে। যে কটি কীট নিয়ে আমি কাজ আরম্ভ করেছিলাম, তাদের ভেতর মারা গেছে অতি সামান্য; তাছাড়া বাকী সবগুলিই আকারে যে ভাবে বাড়্‌তে সুরু করেছে তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি! কিন্তু

তাদের যদি ধরে রাখ্‌তে না পারি, তাহলে তাদের এই বৃদ্ধির সকল অবস্থা বিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়ে জানা যাবে কেমন করে? এই সমস্ত বৃহদাকার কীটের শক্তি আমি যা অনুমান করেছিলাম তার চেয়েও এত বেড়ে গেছে যে তাদের ধরে রাখাই এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা। একটা জোয়ান বাঘকে যে খাঁচায় ধরে রাখা যায়—তার গরাদে এদের কেউ কেউ অনায়াসে বেঁকিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে।

"সোমবার, ১৪ই সেপ্টেম্বর।

"বন্দুক নিয়ে সারা রাত জেগে বসে আছি। বুঝ্‌তে পারছি আমার এ পরীক্ষার ফল সভ্যজগতে ফিরে গিয়ে আর জানান হবে না। এই জংলা জনহীন দ্বীপে আমার সাথেই তারা লোপ পাবে। আমি মরি তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু কোন রকমে যদি আমার এত দিনের গবেষণার ফলাফল কোনো জায়গায় সভ্যজগতে পৌঁছোন যেত! এখন মনে হচ্ছে, কেন সবাইকে লুকিয়ে এমন করে এই নির্জ্জন জঙ্গলময় দ্বীপে যন্ত্রপাতি নিয়ে পালিয়ে এসেছিলাম! এই দুর্ভেদ্য অরণ্যে ঢাকা দ্বীপে সভ্যমানুষের কোনদিন আসবার সম্ভাবনা নেই। আশপাশের জংলী মগেরা পাঁচ সাত বছরে এক আধবার এখানে কাঠ-টাঠ কাটতে আসে। তারা আমার কাগজ পত্র পেলেই বা কি বুঝবে! কিন্তু তখন অমন গোপনে না এলে আমার এ অদ্ভুত পরীক্ষায় কত বাধাই না জুট্‌ত। গভর্ণমেণ্ট এ রকম একটা দ্বীপে আমায় ছেড়ে দিত কি?

"কিন্তু এখনও কি আশা নেই। আমার যন্ত্রপাতি থাক। শুধু আমার এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা লেখা এই ডায়েরীটি নিয়ে কোন রকমে আমি এই জায়গা থেকে পালিয়ে যেতে পারি না কি?

"নাঃ, কোন উপায় নেই। জীবনে শুধু বিজ্ঞান-চর্চ্চাই শিখেছি, নৌকো যদি বা মেলে, চালান দূরের কথা কোন্‌ দিকে চালাতে হবে তাই ঠিক করতে পারব না। আর এই এরা আমায় এ দ্বীপ থেকে যেতে দেবে না, যে কোন মুহূর্ত্তে তারা এসে পড়্‌তে পারে। আমারই সৃষ্টি থেকে আমার সমস্ত বৈজ্ঞানিক সাধনার ধ্বংস হবে।

"এখনও আমার চাকরের মৃত্যুটা চোখের সামনে যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। দুদিন পাহাড়ে লুকিয়ে থেকে কোন রকমে সে আমার কাছে আসবার চেষ্টা করছিল। এসেও প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আমার চোখের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। আমি হাত তোল্‌বার অবসরও পেলাম না। মাকড়শাগুলো এই দুই সপ্তাহে যে এতখানি ঝেড়ে উঠ্‌তে পারে তা আমি কল্পনাও করিনি। হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় আছে কিন্তু এদের আমি কোন্‌ অস্ত্রে ঠেকাব?

"মঙ্গলবার, ১৫ই সেপ্টেম্বর

"আজ সারাদিন তারা আমার ঘরের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। এখনও তাদের হাল্কা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কেন যে সাহস করে তারা ভেতরে ঢোকেনি বুঝ্‌তে পারছি না। কিন্তু আমি কতক্ষণ এই ঘরে বন্দী হ'য়ে থাক্‌তে পারব? তৃষ্ণায় বুকের ভেতর পর্য্যন্ত শুকিয়ে আসছে। বাইরের কূয়া ছাড়া জল পাবার কোন উপায় নেই। কতক্ষণ আর তৃষ্ণার সঙ্গে যুঝ্‌বো—তিন দিন তিন রাত একটু ঘুমোতে সাহস করিনি। যে কোন মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জাগরণের ক্লান্তিতে বেহুঁস হয়ে পড়্‌তে পারি। তারপর কি হবে? এই এত দিনের সব সাধনা লুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের কোন কাজেই আমার এ জ্ঞান লাগ্‌বে না এইটেই সব চেয়ে বড় দুঃখ। যদি কাউকে আমার এই অজ্ঞাত বাসের কথা জানিয়ে আস্‌তাম!

"কিন্তু সব ভেবেছিলাম; আমার সৃষ্টি এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌বে যে তাকে আর বাগ মানান যাবে না, এ কথা কেমন করে জান্‌ব?

"না, তৃষ্ণা অসহ্য! সমস্ত রাত কি ওগুলো এম্‌নি করে আমার ঘর পাহারা দেবে? তার চেয়ে একেবারে ঘরে ঢুকে আমায় শেষ করে দিক, এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না।

জল আন্‌তেই হবে। অন্ধকারে হয় ত দেখ্‌তে নাও পেতে পারে..."

* * * *

পড়া শেষ হলে ডাঃ পামার খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—"ওই জল আন্‌তে যাবার পথেই ডাঃ সরকার মারা পড়েন, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু মাকড়শাগুলি ঘরে কেন ঢোকেনি বুঝ্‌তে পারলাম না।"

তার পর খানিক আরো কি ভেবে বল্লেন, "তা কেমন করেই বা জান্‌বেন! নইলে ডাঃ সরকার আরো অনেক নিরীহ কীট নিয়ে পরীক্ষা কর্‌লেই পারতেন।"

ভোর হতে না হতেই অদূরে দ্বীপের তীর দেখা গেল। আগের বারে যে দিকে আমরা নেমেছিলাম এ সে দিক নয়। এবার আমরা ইচ্ছে করেই দ্বীপের অপর প্রান্তে নাম্‌ব ঠিক করেছিলাম। এ দিকে কোন পাহাড় নেই। সমতল তীর শুধু। ষ্টীমার তীরে লাগাবার আগে আমরা দুরবীণ দিয়ে সবাই একবার সমস্ত তীরটা ভালো করে দেখে নিলাম। এদিকে জঙ্গলও খুব পাতলা, যত দূর দৃষ্টি গেল সমতল খোলা প্রান্তরের মাঝে মাঝে কয়েকটা নারকেল গাছের সার। তার ভেতর কোন প্রকার জন্তু-জানোয়ার দেখা গেল না। ঠিক হল এই তীরে জলের খুব কাছ ঘেঁসে আমাদের আস্তানা পাতা হবে। সে আস্তানা নানা দিক্ দিয়ে সুরক্ষিত কর্‌তেও আমরা প্রস্তুত হয়ে এসেছিলাম।

প্রথম দিন শুধু সেই আস্তানা পাত্‌তেই কেটে গেল। শেষ পর্য্যন্ত যা তৈয়ারী হল তা একটি ছোট-খাট দুর্গ বিশেষ। কাঁটা তারের বেড়া ও মোটা লোহার জাল দিয়ে ঢেকে তার ভেতরে নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র সাজিয়ে আমরা যতদূর সম্ভব তা নিরাপদ্ কর্‌তে ত্রুটী কর্‌লাম না।

দ্বিতীয় দিন আমরা তিনজন কয়েকজন খালাসী নিয়ে দ্বীপের অন্দি-সন্ধি জান্‌বার জন্যে বেরুলাম। আশ্চর্য্যের বিষয়, মাইল চারেক এগিয়েও কোন ছোটখাট জানোয়ারও আমরা দেখ্‌তে পেলাম না। অবশেষে একজন খালাসীকে একটা খুব উঁচু নারকেল গাছের ওপর উঠে দেখ্‌তে বলা হল। কিন্তু জঙ্গল এখান থেকে গভীর হবার জন্যেই হোক, বা যে কারণেই হোক, খালাসী নেমে এসে জানালে কোথাও সে কিছু দেখ্‌তে পায়নি। আশ্চর্য্য ব্যাপার। আরো এগুব না পেছুব ভাবছি এমন সময় নিকটেই কোথা থেকে একটা অদ্ভুত আওয়াজ শুনে আমরা চম্‌কে দাঁড়ালাম। আওয়াজটা বিশেষ জোর যে তা নয়—অনেকটা করাত দিয়ে কাঠ চেরার শব্দের মত।

একজন খালাসী বল্লে—আওয়াজটা সে অনেক আগেই ক'বার শুনেছে। আমরা বন্দুক বাগিয়ে সতর্ক হয়ে একটু এগিয়ে গেলাম। আমাদের সঙ্গে ঠেলা গাড়ীতে বসিয়ে সেই বিরাট্ পিচকিরীটা ডাক্তার পামার কেন এনেছিলেন জানিনা।

সেটাও তিনি এগিয়ে আন্‌তে বল্লেন। কিন্তু বেশী দূর আমাদের এগুতে হল না। কিছু দূরেই কয়েকটা গাছের আড়াল সরে যেতেই শব্দ কোথা থেকে আস্‌ছে স্পষ্ট বোঝা গেল।

শয়তানের দ্বীপে আগের বারে আমরা যা দেখেছি তার চেয়ে অনেক বড় একটি মাকড়শা! আমি দেখ্‌বামাত্র গুলি কর্‌তে যাচ্ছিলাম, ডাঃ পামার বাধা দিয়ে বল্লেন—"দাঁড়ান একটু দেখি, গুলি করবেন না।"

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বল্লাম—"এ জীবটিকে ত আর চেনেন না! একটু দেখ্‌তে গিয়ে জীবনের মত দেখার সাধ মিটে যাবে। বিদ্যুতের মত ওর গতি।"

কিন্তু কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে বন্দুক নামালাম। ব্যাপার কি? বিদ্যুতের মত যে জানোয়ারের গতি সে অতি কষ্টে ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে এক-পা এক-পা করে এগুচ্ছে কেন? শুধু তাই নয়, সেই এক-পা যেতেই তার পা গুলো যেন মাঝে মাঝে ভেঙে পড়্‌ছে। আমাদের দেখে আক্রমণ করা দূরে থাক একটু তাড়াতাড়ি নড়বার চেষ্টাও তার নেই। অথচ আকারে সে মাকড়শার প্রায় দ্বিগুণ একে বলা যেতে পারে। সাহস করে আমরা এবার তার অত্যন্ত কাছে এগিয়ে গেলাম, একজন খালাসী একটা ঢিল পর্য্যন্ত তার গায়ে ছুঁড়ে মার্‌ল, কিন্তু সেই করাতের মত শব্দ করে অতিকষ্টে এগোবার চেষ্টা ছাড়া আর সে কিছু কর্‌লে না।

ডাঃ পামার বল্লেন—"না মিঃ বোস্, দাও ওর ভব-যন্ত্রণা শেষ করে। কোন রকমে সাঙ্ঘাতিক জখম হয়েছে বোধ হয়।" কিন্তু আমি বন্দুক তোলবার আগেই বল্লেন—"দাঁড়াও দাঁড়াও, আস্ত শরীরটা পেতে চাই, গুলি করলে নষ্ট হয়ে যাবে।" তার পর তাঁর পিচকিরীর মুখ খুলে আস্তে আস্তে একটু তার হাতলে চাপ দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের মত খানিকটা কি জলীয় জিনিষ বেরিয়ে পড়ে মাকড়শাটার গা ময় ভিজে গেল। জলীয় জিনিষটার গন্ধটা কেমন যেন অদ্ভুত। আশ্চর্য্যের কথা এই যে পিচকিরী ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাকড়শাটা একেবারে নেতিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তার পর দুচার বার দু'একটা পা একটু নাড়বার পরই বোঝা গেল তার প্রাণ আর নাই।

মাকড়শাটাকে সযত্নে ঠেলা গাড়ীতে তুলে নিয়ে নিজেদের আস্তানায় ফিরে যেতে যেতে ডাঃ পামারকে পিচকিরীতে কি ছিল জিজ্ঞাসা কর্‌লাম। তিনি একটু

হেসে বল্লেন—"বিশেষ কিছু নয়, মশামাছি পোকা-মাকড় মার্‌বার জন্যে যে জিনিষ আমরা ব্যবহার করি তারই একটু কড়া মিক্‌শ্চার। মিঃ লণ্ডের কাছে সকল কথা শুনে আমি তখনি এ জিনিষ তৈয়ারি কর্‌তে অর্ডার দিই। আমি ঠিক জানতাম যে পোকা যত বড়ই হোক, পোকাই থাক্‌বে। গুলি তাকে তাগ করে মারা শক্ত হতে পারে, কিন্তু এ বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একবার নাকে ঢুক্‌লেই ওদের মৃত্যু!"

তার পর খানিক চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর তা আপনারা ভেবে দেখেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি শুধু বিজ্ঞানের নতুন কথা জান্‌বার জন্যে নয়, মানুষের এ থেকে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হতে পারে সব ভালো করে ভেবে এবং তা এড়াবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে এসেছি।"

আমাদের অবাক্ হতে দেখে তিনি আবার বল্লেন, "পৃথিবীতে অমনি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। মানুষ অনেক যুগ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করে অনেক কষ্টে অনেক প্রাণ দিয়ে আজ পৃথিবীকে অনেকটা মানুষের বাসের যোগ্য করে তুলেছে। নগর বসিয়েছে, গ্রাম গড়ে তুলেছে, নির্ভয়ে শান্তিতে বসবাস কর্‌বার আয়োজন করেছে। এই সময়ে ধরুন যদি এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারের বংশ ধীরে ধীরে এই দ্বীপ থেকে ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষ, এসিয়া প্রভৃতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। একেই এদের মারা কি রকম শক্ত তাত দেখেছেন, তার পরে এই দ্বীপটুকু ছাড়িয়ে বড় জায়গায় ছড়িয়ে পড়্‌লে তাদের খুঁজে খুঁজে মারা এক রকম যে অসম্ভব এ বোধ হয় আপনাদের বোঝাতে হবে না। আর এই বেলা এই দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে থাক্‌তে এদের সমূলে না মার্‌লে পৃথিবীময় এদের ছড়িয়ে পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তখন এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে যুঝ্‌তে পৃথিবীর কত গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে, কত বসতি লোপ পাবে তা কি ভেবেছেন, ডাঃ সরকারের বৈজ্ঞানিক সাধনার কি ভয়ঙ্কর পরিণামই তাহলে হবে বলুন দেখি! সুতরাং যে কোন উপায়ে এই দ্বীপ থেকে এদের বংশ আমাদের নির্ম্মূল করতেই হবে। আমরা যদি এ কাজ পারি, তাহলে পৃথিবীর লোক জানুক বা না জানুক আমরা তাদের এত বড় উপকার করে যাবো পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নেই।

এই জন্যেই আমাদের বৈজ্ঞানিক সমিতির দেওয়া টাকা ছাড়া আমার যা কিছু আছে আমি এই কাজে ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

সত্যি এভাবে আমরা কেউ এ ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। ডাঃ পামার যেভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এঁকে দেখালেন তাতে গা শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু এই দ্বীপের ভেতরই যত এই জাতের জানোয়ার আছে তাকি আমাদের দ্বারা মারা সম্ভব? আমার মন কেমন হতাশ হয়ে গেছ্‌ল তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম এই মহৎহৃদয় বৈজ্ঞানিককে প্রাণ দিয়ে আমি সাহায্য কর্‌ব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আমাদের অভিযান যে এভাবে শেষ হবে তা কে জান্‌ত!

তার পর দুদিন উপ্‌রোউপ্‌রি আমরা দ্বীপের আমাদের দিকের অর্দ্ধেক অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু গুটি কয়েক মরা ও কয়েকটি মুমূর্ষু মাকড়শা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। এতগুলি মাকড়শা কি করে একসঙ্গে এত জখম হল তাও আমরা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

তৃতীয় দিন আমাদের সাহস বেড়ে গেল। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আমরা পশ্চিম দিকের পাহাড় পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বীপটা খুঁজে বেড়াতে বেরুলাম। সন্ধ্যাবেলা যখন সবাই আস্তানায় ফিরে এলাম তখন সকল দলের মুখেই সেই এক কাহিনী—দ্বীপময় নানা জায়গায় শুধু মরা ও মুমূর্ষু মাকড়শা পড়ে আছে। আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম আকারে তারা তার চেয়ে ঢের বড় কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে জানিনা ওই অতবড় হিংস্র জানোয়ারগুলির একটিও সারা দ্বীপে সজীব ও সতেজ নেই। দ্বীপে অন্যান্য জানোয়ার কয়েকটা পাওয়া গিয়েছে। একদল একটি হরিণ ও আর একদল একটি চিতা মেরে এনেছিল; কিন্তু সে রাক্ষুসে মাকড়শা কোথাও কাউকে আক্রমণ করেনি।

ডাঃ পামার একধারে এতক্ষণ চুপ করে বসে কি ভাব্‌ছিলেন। এইবার উঠে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করা যাবে, ডাঃ পামার!"

তিনি একটু হেসে বল্লেন,—"কি আর করা যাবে—সটান বাড়ী ফিরে যাওয়া।"

হেসে বল্লেন—"বিশেষ কিছু নয়, মশামাছি পোকা-মাকড় মার্‌বার জন্যে যে জিনিষ আমরা ব্যবহার করি তারই একটু কড়া মিক্‌শ্চার। মিঃ লণ্ডের কাছে সকল কথা শুনে আমি তখনি এ জিনিষ তৈয়ারি কর্‌তে অর্ডার দিই। আমি ঠিক জানতাম যে পোকা যত বড়ই হোক, পোকাই থাক্‌বে। গুলি তাকে তাগ করে মারা শক্ত হতে পারে, কিন্তু এ বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একবার নাকে ঢুক্‌লেই ওদের মৃত্যু!"

তার পর খানিক চুপ করে থেকে আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ব্যাপার যে কি রকম গুরুতর তা আপনারা ভেবে দেখেছেন কিনা জানিনা। কিন্তু আমি শুধু বিজ্ঞানের নতুন কথা জান্‌বার জন্যে নয়, মানুষের এ থেকে কি ভয়ঙ্কর সর্ব্বনাশ হতে পারে সব ভালো করে ভেবে এবং তা এড়াবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে এসেছি।"

আমাদের অবাক্ হতে দেখে তিনি আবার বল্লেন, "পৃথিবীতে অমনি হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নেই। মানুষ অনেক যুগ ধরে তাদের সঙ্গে লড়াই করে অনেক কষ্টে অনেক প্রাণ দিয়ে আজ পৃথিবীকে অনেকটা মানুষের বাসের যোগ্য করে তুলেছে। নগর বসিয়েছে, গ্রাম গড়ে তুলেছে, নির্ভয়ে শান্তিতে বসবাস কর্‌বার আয়োজন করেছে। এই সময়ে ধরুন যদি এই ভয়ঙ্কর জানোয়ারের বংশ ধীরে ধীরে এই দ্বীপ থেকে ব্রহ্মদেশ, ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতবর্ষ, এসিয়া প্রভৃতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার হবে। একেই এদের মারা কি রকম শক্ত তাত দেখেছেন, তার পরে এই দ্বীপটুকু ছাড়িয়ে বড় জায়গায় ছড়িয়ে পড়্‌লে তাদের খুঁজে খুঁজে মারা এক রকম যে অসম্ভব এ বোধ হয় আপনাদের বোঝাতে হবে না। আর এই বেলা এই দ্বীপের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে থাক্‌তে এদের সমূলে না মার্‌লে পৃথিবীময় এদের ছড়িয়ে পড়া কিছুই আশ্চর্য্য নয়। তখন এই হিংস্র জানোয়ারের সঙ্গে যুঝ্‌তে পৃথিবীর কত গ্রাম শ্মশান হয়ে যাবে, কত বসতি লোপ পাবে তা কি ভেবেছেন, ডাঃ সরকারের বৈজ্ঞানিক সাধনার কি ভয়ঙ্কর পরিণামই তাহলে হবে বলুন দেখি! সুতরাং যে কোন উপায়ে এই দ্বীপ থেকে এদের বংশ আমাদের নির্ম্মূল করতেই হবে। আমরা যদি এ কাজ পারি, তাহলে পৃথিবীর লোক জানুক বা না জানুক আমরা তাদের এত বড় উপকার করে যাবো পৃথিবীর ইতিহাসে যার তুলনা নেই।

এই জন্যেই আমাদের বৈজ্ঞানিক সমিতির দেওয়া টাকা ছাড়া আমার যা কিছু আছে আমি এই কাজে ব্যয় কর্‌তে প্রস্তুত হয়ে এসেছি।"

সত্যি এভাবে আমরা কেউ এ ব্যাপারটা ভেবে দেখিনি। ডাঃ পামার যেভাবে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ এঁকে দেখালেন তাতে গা শিউরে উঠ্‌ল। কিন্তু এই দ্বীপের ভেতরই যত এই জাতের জানোয়ার আছে তাকি আমাদের দ্বারা মারা সম্ভব? আমার মন কেমন হতাশ হয়ে গেছ্‌ল তবু মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম এই মহৎহৃদয় বৈজ্ঞানিককে প্রাণ দিয়ে আমি সাহায্য কর্‌ব।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। আমাদের অভিযান যে এভাবে শেষ হবে তা কে জান্‌ত!

তার পর দুদিন উপ্‌রোউপ্‌রি আমরা দ্বীপের আমাদের দিকের অর্দ্ধেক অংশ তন্নতন্ন করে খুঁজে বেড়ালাম। কিন্তু গুটি কয়েক মরা ও কয়েকটি মুমূর্ষু মাকড়শা ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। এতগুলি মাকড়শা কি করে একসঙ্গে এত জখম হল তাও আমরা বুঝে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।

তৃতীয় দিন আমাদের সাহস বেড়ে গেল। কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে আমরা পশ্চিম দিকের পাহাড় পর্য্যন্ত সমস্ত দ্বীপটা খুঁজে বেড়াতে বেরুলাম। সন্ধ্যাবেলা যখন সবাই আস্তানায় ফিরে এলাম তখন সকল দলের মুখেই সেই এক কাহিনী—দ্বীপময় নানা জায়গায় শুধু মরা ও মুমূর্ষু মাকড়শা পড়ে আছে। আমরা যা দেখে গিয়েছিলাম আকারে তারা তার চেয়ে ঢের বড় কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে জানিনা ওই অতবড় হিংস্র জানোয়ারগুলির একটিও সারা দ্বীপে সজীব ও সতেজ নেই। দ্বীপে অন্যান্য জানোয়ার কয়েকটা পাওয়া গিয়েছে। একদল একটি হরিণ ও আর একদল একটি চিতা মেরে এনেছিল; কিন্তু সে রাক্ষুসে মাকড়শা কোথাও কাউকে আক্রমণ করেনি।

ডাঃ পামার একধারে এতক্ষণ চুপ করে বসে কি ভাব্‌ছিলেন। এইবার উঠে আমাদের কাছে এসে দাঁড়াতে জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কি করা যাবে, ডাঃ পামার!"

তিনি একটু হেসে বল্লেন,—"কি আর করা যাবে—সটান বাড়ী ফিরে যাওয়া।"

"সে কি, এত আয়োজন উদ্যোগ করে, এই জানোয়ারের বংশ নির্ম্মূল না করেই যাব? আপনিই ত সমস্ত পৃথিবীর ভয়ঙ্কর পরিণামের কথা বলে সেদিন ভয় দেখিয়েছেন!"

ডাক্তার পামার বল্লেন,—"না, আর আমাদের কিছু কর্‌বার নাই। প্রকৃতি নিজেই আমাদের কাজ সেরে নিয়েছে। ডাঃ সরকার বৈজ্ঞানিক উপায়ে ছোট কীটকে বড় করে ছিলেন, কিন্তু আর কিছু করবার সাধ্য তাঁর ছিল না। ওদের বাড়ই ওদের কাল হয়েছে। ওদের দেহের আকার বৃদ্ধির সঙ্গে ওদের প্রাণশক্তি পাল্লা রাখ্‌তে না পারায় ওরা ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে ধীরে ধীরে সব মারা পড়েছে। যাই হোক, ডাঃ সরকারের সাধনা নিষ্ফল হবে না। এই থেকে মানুষ একদিন কিছু না কিছু উপকার পাবেই।"

ঘুড়ীর শক্তি

গত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'রামধনু'তে সুবিনয় বাবুর 'অমাবস্যার রাতে' গল্পটী পড়িয়া কোন কোন পাঠক একটু আশ্চর্য্য হইয়াই আমাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঘুড়ীর কি এত জোর থাকে যে সে একটা ছোট ছেলেকে লইয়া অক্লেশে উড়িবে?

ছোট ছেলে তো ছেলে, এমন ঘুড়ীও মানুষে তৈরী করিয়াছে যা একটী বয়স্ক লোককেও বহিয়া অনায়াসে স্বচ্ছন্দে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে পারে। এ রকম একটী ঘুড়ীর ছবি আজ তোমাদের উপহার দিলাম।

এ ঘুড়ীটী তৈরী করিয়াছিলেন লেফ্‌টেনাণ্ট্‌ কমাণ্ডার বার্ড সাহেব; মজাসে ঘুড়ী উড়াইবার জন্য নয়, কাজের জন্য—মেরুর দেশে যাত্রাকালে এটী তাঁর সঙ্গী হইবে বলিয়া। কি জন্য? বলিতেছি।

কলিকাতায় যারা থাক তারা অবশ্যই জান বেতারের (Wireless) কথাবার্ত্তা ধরিবার জন্য খুঁটির (aerial) আবশ্যক হয়। তা ভিন্ন বেতারের কথা ধরা সম্ভব নয়। এখন মেরুর দেশে আবিষ্কারের জন্য যে লোক যাইতেছে সে তো আর এক জায়গায়

বসিয়া থাকিবে না—সর্ব্বদাই সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইবে। জনমানবহীন দেশ সেটা, চারিদিকে শুধু ধূধূ করিতেছে বরফ। সে রকম জায়গায় কি আর 'নিত্যি নতুন' এরিয়াল গাঁড়া সম্ভব? তাতো নয়! কাজেই সাহেব প্রকাণ্ড ঘুড়ী তৈরী করিয়া তার ভিতর এরিয়েল বসাইয়া লইলেন। তিনি যেখানেই যান্ না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সেটীও চলিবে। আর যদি এরিয়েলের কোথাও কিছু বিগ্‌ড়াইয়া যায় তাহা হইলে সেটা পরীক্ষা বা মেরামতের জন্যে যাহাতে একটী লোককে এরোপ্লেনের সাহায্য ব্যতিরেকেও একেবারে ঘুড়ীর উপর তোলা যায়, তারও বন্দোবস্ত করিলেন।

ঘুড়ীতে মানুষ তুলিতেছে।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

পরের দিনকার সকালবেলার ঘটনা।

স্কুলের ঘণ্টা তখনও বাজে নাই, যে কয়টী ছেলে চার্লিকে লইয়া 'রগড়' করিয়াছিল, একটা কোণে বসিয়া তারা খুব জটলা পাকাইতেছে—"ওঃ ছোঁড়াকে কাল কি ঘুঘুটাই না দেখিয়েছি—ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত দৌড়! দৌড়!"

হর্‌রা হাসি পূরাদমে চলিতেছে, এমন সময়ে দেখা গেল তাদেরই দলের অপর একটী বালক—তার নাম সিম্‌স্—নবমীর পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে স্কুলে ঢুকিতেছে। বেচারা পাড়া গাঁ হইতে নতুন আম্‌দানী, সর্ব্বদাই তার মুখে কেমন একটা ভয়-ভয় ভাব মাখান। কিন্তু যে চেহারা লইয়া এখন সে আসিতেছে তাতে মনে হয়, চার্লির নয়, তারই বুঝি এই মাত্র কোন ব্রহ্মদৈত্যের সাথে দেখা হইয়া গেছে মুখ ফ্যাঁকাশে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, চোখ খোঁড়লে ঢুকিয়াছে। তার উপর নজর পড়িতেই পিয়ার্স্ দাঁত কড়্‌মড়্ করিয়া বলিল, "দেখ্‌ছ ছোকরার সাহস, কাল থেকে যখন ও চার্লির হয়ে মাঝে মাঝে কাঁদুনি গাইছিল, এক এক বার মনে হচ্ছিল আমার দিই ছোঁড়ার ঘাড় ধরে দল থেকে বার করে—হতচ্ছাড়া ভীরু কোথাকার! আরে এই যে সিম্‌স্, বলি কবর-খানা থেকে উঠে আস্‌ছ নাকি ?"

সিম্‌স্ ততক্ষণে নিকটে আসিয়া পড়িয়াছিল, ধরা গলায় কহিল, "না, নদীঘাটা থেকে। বিস্তর লোক জমে গেছে সেখানে। কি হয়েছে জান, আমাদেরই ইস্কুলের কোন্ এক ছাত্র নাকি কাল রাতে নদীতে ডুবে মরেছে—নিশ্চয়ই চার্লি! কাল অত করে বারণ কর্‌লাম তোমাদের, শুন্‌লে না। এখন ঝোল সবশুদ্ধ ফাঁসির কাঠে—উঃ হু হু হুঃ" বেচারা একেবারে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার জো করিল।

কোথায় গেল বীরবরদের হাসির ছটা, আর কোথায় গেল তাদের আস্ফালন! —সিম্‌সের কাছে খবর শুনিয়া সকলের মুখই এক সঙ্গে একেবারে আম্‌সী হইয়া গেল, বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। কেউ কেউ তো গলায় হাত দিয়া দেখিয়াই লইল, গলাটা তখন পর্য্যন্ত ঠিক জায়গায় আছে, নাকি ইতিমধ্যেই কেউ ফাঁসির মঞ্চে লট্‌কাইয়া দিয়াছে। সামান্য একটু 'রগড়' করিতে গিয়াছিল তারা, একি হইল ভগবান্!

কারোই গলার স্বর আর তখন স্বাভাবিক নাই, তবুও কোন মতে সে কথা লইয়াই তারা ফিস্ ফিস্ করিয়া আলোচনা আরম্ভ করিল। "ভূতের" তাড়া খাইয়া চার্লি চোখ কাণ বুজিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়াছে, এই পর্য্যন্তই তারা খবর রাখে, তারপর কোন্ দিকে যে সে গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। টড্ ইয়র্ক্ মুখে খানিকটা সাহস টানিয়া আনিয়া বলিল—"ইস্কুলের একজন ছাত্র ডুবেছে, এই সবে জানা গেছে, সে যে চার্লিই হতে হবে তার অর্থ কি ? অন্য কেউও তো হতে পারে!" এ কথার মুখে কেউ

জবাব দিল না বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেই বুঝিল যে এ চার্লি ব্যতীত অপর কেউ হইতেই পারে না।

ঠিক এই সময় ঢং ঢং করিয়া স্কুলের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিতেই সকলে গা-মোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পিয়ার্স্ বলিল, "যাক্ যা হবার তো হয়েছে, এখন উপস্থিত আমাদের কর্ত্তব্য হচ্ছে এক দম্ চুপ্ মেরে যাওয়া; সবাই এক সঙ্গে স্রেফ্ অস্বীকার করে বস্‌ব, বল্‌ব, কিছুই জানিনে আমরা!"

রোল্ কল্ হইয়া গেছে, এমন সময় টম্ চ্যানিং ধীরে ধীরে আসিয়া ক্লাশে ঢুকিল; আজ সে লেট্। হেড্ মাষ্টার ইসারায় তাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "টম্, চার্লিকে খুঁজে পাওয়া গেছে ?"

"আজ্ঞে না স্যর! সারারাত ধরে খুঁজ্‌তে কোথাও আমরা বাকী রখিনি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে, তারাও খোঁজ স্বরু করেছে।" বলিয়া টম্ থামিল। সে নদী-ঘাটার দিক্ হইতে আসে নাই, আসিলে অন্য রকম খবর দিত।

হেড্‌মাষ্টার কি একটা উত্তর দিতে যাইতে ছিলেন, কিন্তু সবিস্ময়ে দেখিলেন ঠিক সেই মুহূর্ত্তে হামিশ ঘরে আসিয়া ঢুকিতেছে; আর দুনিয়ার বিরক্তি মুখে ফুটাইয়া তারই পিছন পিছন আসিতেছে স্বয়ং দ্বারোয়ান্ মিষ্টার কেচ্।

হেড্‌মাষ্টারকে অভিবাদন করিয়া হামিশ কহিল, "আপনার সময় বোধ করি একটু নষ্ট কর্‌ছি, মিষ্টার পাই, মাপ্ কর্‌বেন। কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আপনার কাছে আস্‌তে হয়েছে আমাকে। চার্লিকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেচ্ বল্‌ছে কাল রাত্রে ক'টী ছেলে নাকি গীর্জ্জার হাতায় ঢুকে কি একটু মজা-টজা কর্‌ছিল (হামিশের ঠোঁটের আগায় সামান্য একটু হাসি জাগিয়া আবার তখনই নিভিয়া গেল) হ্যাঁহে কেচ্, ব্যাপারটা হেড্‌মাষ্টার মশাইকে বলতো!"

কেচ্ দাঁত কড়্‌মড়্ করিয়া সমস্ত ক্লাশটার পানে কঠিন ভাবে একবার তাকাইল, বাঘ যেমন শিকারের পানে তাকায়। যে আনন্দ হামিশ আজ তাহাকে দিল এত খানি আনন্দ সারা জীবনে বোধ করি আর সে কখনো পায় নাই। সাড়ম্বরে গত রাত্রির সমস্ত ঘটনা সে পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিল, মাংসের কালিয়া লইয়া ছেলেরা যে কি পরিমাণ তার কচি প্রাণে ব্যথা দিয়াছে, বার বার সে কথা জানাইতেও ভুলিল না।

কেচ্ থামিলে পর হামিশ হেড্মাষ্টার মশা'য়ের দিকে তাকাইয়া কহিল, "আপনি যদি দয়া করে একটু অনুসন্ধান করে বার করেন কে কে সে দলের ভেতর ছিল, মিষ্টার পাই, তা হলে বড়ই উপকার হয়। একটা কথা বলে রাখা দরকার—সে ছেলেদের ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই, বা তাদের কেউ যে শাস্তি পায় তা আমি একেবারেই চাই না। আমি শুধু তাদের কাছ থেকে এইটুকু জান্তে চাই যে চার্লি সে দলের ভেতর ছিল কিনা, এবং বর্ত্তমানে সে কোথায় তার খবর কেউ দিতে পারে কিনা!"

সরল এবং প্রশান্ত ভাবে হামিশ কথাগুলি বলিয়া গেল, এবং এ কথার পর অনেকেই হয় তো আগাইয়া আসিয়া নিজের নিজের দোষ স্বীকার করিত, যদি না একটু আগেই সিম্‌স্ নদীঘাটা হইতে সেই সর্ব্বনেশে খবরটী লইয়া আসিত। সে খবর শোনার পর কি আর দোষ-স্বীকার সম্ভব? বাব্বাঃ!

ফলে কেহই উচ্চ বাচ্য করিল না; দেখিয়া হেড্মাষ্টার মশায় দারুণ চটিলেন, হাতের বেত খানা বার কয়েক টেবিলের উপর আছড়াইয়া বলিলেন, "কথাগুলো ঢুক্‌লো তোমাদের কাণে, না কি? খাসা সব ছাত্র তৈরী হচ্ছে আজকাল আমার ইস্কুলে! এগিয়ে এসে নিজের দোষ স্বীকার করে এমন বুকের পাটা একটারও নেই!"

এই অপবাদেও কিন্তু কোন ফল হইল না। সিনিয়রেরা কোন খবরই রাখিত না, তাহারা চুপ করিয়া রহিল, বাকী ছাত্রের দল মাথা নীচু করিয়া পাথরের মুর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল। কেবল মাত্র সিম্‌স্ ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এবং তার মুখ দিয়াও একটা আর্ত্তনাদ প্রায় বাহির হইতে হইতে পাশের ছেলেটীর গোপন-লাথি খাইয়া কোন মতে থামিয়া গেল।

হেড্মাষ্টার মশায় এবার জবাফুলের মত চোখ দুইটী লাল করিয়া ক্লাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "কোথায় চার্লি? কোথায় রেখেছ তাকে তোমরা? চুপ্ করে থাক্‌লে চল্‌বে না, জবাব আমি চাই-ই।"

তাঁর এই দৃঢ়-গম্ভীর স্বরে এবার একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল, সিম্‌স্ ছোক্‌রা একেবারে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের উপর ধড়াস্ করিয়া উপুড় হইয়া পড়িল, গোঙাইতে গোঙাইতে বলিল, "আমি নই, স্যর, আমি নই; আগাগোড়া আমি নিষেধ

করে এসেছি স্যর! চার্লি যদি মরে গিয়ে থাকে তবে সেজন্যে আমি দায়ী নই স্যর, আমি দায়ী নই—ইহিঃ হিঃ হিঃ..."

উপস্থিত সকলেই প্রায় অবাক্ হইয়া সিম্‌সের দিকে চাহিল। হেড্মাষ্টার কহিলেন, "সিম্‌স্ এদিকে এগিয়ে এস।"

কাঁদিতে কাঁদিতে সিম্‌স্ হেড্মাষ্টারের দিকে আগাইয়া গেল। স্থান-কাল-পাত্র তখন সে সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে। তার নিজের কি গতি হইবে, স্কুলের ছেলেদের নিকট তার অবস্থাটা কি রকম দাঁড়াইবে—কিছুই তার মনে আসিল না। হেড্মাষ্টার মশায়ের জেরায় সে গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত কি ভাবে চার্লিকে ভয় দেখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছিল, চক্রান্তের ভিতর কে কে ছিল সমস্তই খুলিয়া বলিল। তবে নদীঘাটার গুজবের কোন উল্লেখ করিল না।

শুনিয়া অনেকেই আশ্চর্য্য হইল। হেড্মাষ্টার মশায় কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, দেখিতে দেখিতে তাঁর মুখ অমাবস্যার রাত্রির মত কালো হইয়া উঠিল; জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভূত সেজেছিলেন কিনি?"

"আজ্ঞে পিয়ার্স।"

"হুঁ, আমিও মনে মনে সেই রকমই অনুমান কর্‌ছিলাম বটে! পিয়ার্স উঠে এস এদিকে।" হামিশকে চুপি চুপি বলিলেন, "চার্লি ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছে, আজ নিশ্চয়ই বাড়ী ফির্‌বে।"

পিয়ার্স্ মুখ নীচু করিয়া হেড্মাষ্টারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইতেই তিনি বলিলেন, "এ রকম আচম্‌কা ভয় দেখালে মানুষের বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, এমন কি, মানুষ চির দিনের মত পাগলও হয়ে যেতে পারে, তা জানো?" পিয়ার্স্ এ কথার কোনই জবাব না দিয়া ঠায় দাঁড়াইয়া রহিল। হেড্মাষ্টার মশায়ের মুখ ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিল, জলদ-গম্ভীর স্বরে তিনি হাঁকিলেন, "জেরাল্ড্!"

সমস্ত ক্লাশ কাঁপিয়া উঠিল, কেননা এ কণ্ঠস্বরকে তাহারা খুব ভাল করিয়াই চিনিত—পিয়ার্স্‌কে আজ বেত মারা হইবে। জেরাল্ড্ ইয়র্ক্‌কে ডাকিবার উদ্দেশ্য এই যে, গোটা স্কুলের মধ্যে সেই সব চাইতে লম্বা-চওড়া—কোন বড় ছেলেকে বেত মারিবার প্রয়োজন হইলে তাহাকে সোজা ভাবে ধরিয়া দাঁড় করানর ভার পড়িত

জেরাল্ডের উপর ; তারপর খালি পিঠের উপর হেড্মাষ্টার মশায় দমাদম্ প্রহার করিয়া যাইতেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানই ঠিক হইয়া গেছে, হেড্মাষ্টার বেত উঁচাইবেন, এমন সময় তাঁহার নজরে পড়িল বাইওয়াটার একেবারে তাঁর নিকটে আসিয়া কি যেন বলিতেছে। তাহার দিকে ফিরিতেই সে বলিল, "স্তর, পিয়ার্স্কে ছেড়ে দেন, বেত মার্তে হয় আমায় মারুন।"

"কেন ?"

"ও ভূত সেজেছিল আমারই কথায়, দলের পাণ্ডা আমি।"

হেড্ মাষ্টার মশায় রুমালে মুখখানা একবার মুছিয়া ফেলিলেন। তারপর কাহাকে আগে বেত মারা উচিত এই কথাই তিনি ভাবিতেছেন অকস্মাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ডে সমস্ত স্কুলটা যেন একেবারে নাড়াচাড়া খাইয়া উঠিল। নদীঘাটা হইতে একটী লোক একেবারে সটান ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল "মাষ্টার মশাই, বড় দুঃসংবাদ বয়ে আন্ছি আমি! আপনাদের ছাত্র চার্লি চ্যানিং কাল রাতে নদীতে ডুবে মারা গেছে—এই তার টুপি, জলের ভেতর পাওয়া গেছে"—বলিয়া স্কুলের ছেলেরা যে টুপি মাথায় দেয় সেই রকম একটা টুপি সে আগাইয়া ধরিল। তার উপর স্পষ্ট অক্ষরে সূঁচ-সূতায় লেখা—চার্লি চ্যানিং। বোধ করি স্কুলের গোটা বাড়ীখানা ধ্বসিয়া পড়িলেও কেউ এর চাইতে বেশী স্তম্ভিত হইত না। হামিশের পায়ের তলাকার মাটী দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল; বুকের ভিতরটা হিম হইয়া আসিল, কিন্তু তবুও প্রাণপণ শক্তিতে মুখে সে উৎকণ্ঠার ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ পাইতে দিল না। হেড্ মাষ্টার মশায় কিন্তু অতটাও পারিলেন না, মুখ ঢাকিয়া ধপ্ করিয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, তাঁর মুখ দিয়া বাহির হইল, "আহা হাঃ, বেচারা চার্লি!"

সেই মুহূর্ত্তেই, সেদিনকার মত বিদ্যালয় ছুটী হইয়া গেল এবং গোটা কলেজিয়েট স্কুল্টাই—মাষ্টার মশায় এবং ছাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বাচ্চা চাকরটা পর্য্যন্ত—উর্দ্ধশ্বাসে এক সঙ্গে একেবারে নদীঘাটার দিকে বাহির হইয়া পড়িল। যে লোকটা খবর আনিয়া স্কুলে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, পথে চলিতে চলিতে সমস্ত ব্যাপারটাই সে খুলিয়া বলিল। নদীঘাটার ঠিক উপরেই সে থাকে, সংসারে এক বুড়ী মা আর ছোট্ট

একটী মেয়ে ছাড়া তার আর কেউ নাই। বুড়া মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া আছে, নিজে এ পাশ হইতে ও পাশ পর্য্যন্ত ফিরিয়া শুইতে পারে না। কথাও বলে অতি কষ্টে চিঁ চিঁ করিয়া। কাল আগ্ রাত্তিরে সে বা তাহার মেয়ে কেউই বাড়ী ছিল না। বুড়ী ঘরের ভিতর একা শুইয়াছিল, হঠাৎ তার মনে হইল কে যেন প্রাণপণে নদীর দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। পায়ের শব্দে মনে হইল অল্পবয়সী কোন ছেলে-ছোক্রাই সে হইবে। একটু পরেই ঝপ্ করিয়া নদীর ভিতর হইতে একটা শব্দ আসিল বেশ বোঝা গেল ছেলেটী নদীর ভিতর পড়িয়াছে। গলা ফাটাইয়া বুড়ী চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু একে তার ঐ গলা, তাতে আবার স্থানটী তখন একেবারে নির্জ্জন। কোনই ফল হইল না। এদিকে ছেলেটী তখন জলের হাত হইতে পার পাইবার জন্য দারুণ হুটোপটি খাইতেছে! বুড়ী আর সহ্য করিতে পারিল না, দুই হাতে কাণ ঢাকিয়া কোন মতে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল—নহিলে ওই "কচি বাছার" মৃত্যু সময়কার চীৎকার মানুষে সহ্য করিতে পারে? খানিক বাদে সে বাড়ী ফিরিলে তার মা তাকে সব কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু সে রাতে তার মদটা খাওয়া

টুপি ও জামা ছিট্কাইয়া ফেলিয়া…

হইয়াছিল কিছু বেশী, সুতরাং কোন কথাই তার মগজে ঢোকে নাই। আজ ভোরে নেশা ছুটিয়া যাওয়ার পর সব শুনিয়াই সে খোঁজ লইয়াছে ফলে জলের ভিতর ঐ টুপিটী পাওয়া গেছে। আর তা ছাড়া নদীর পারেও ছোট ছেলের জুতার দাগ বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

ক্রমে সকলে নদীঘাটায় আসিয়া পৌঁছিল, বিস্তর লোক তখন সেখানে জমায়েৎ হইয়াছে। পুলিশের লোকেরা বেড়াজাল দিয়া নদীটী ছাঁকিবার যোগাড় করিতেছে—যদি তাহাতে মৃতের কোন সন্ধান মেলে!

সকলে উদ্‌গ্রীব হইয়া নদীর পাড়ে দাঁড়াইয়া, হঠাৎ দেখা গেল সাধারণ মানুষের প্রায় আড়াইগুণ বড় পা ফেলিতে ফেলিতে একটী লোক তীরের মত এদিকে ছুটিয়া আসিতেছে। প্রথমেই হামিশের সহিত তার চোখোচোখি হইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "চার্লি নাকি নদীতে ডুবে গেছে?"

হামিশ মাথা নাড়িয়া "হাঁ" বলিতেই লোকটা এক টানে তার টুপি ও জামা ছিট্‌কাইয়া ফেলিয়া একেবারে নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, হামিশ চীৎকার করিল, "আহা হা, কর কি রোল্যাণ্ড্, থাম, থাম, নদীতে বেড়া-জাল ফেলেছে, তুমি এক্ষুণি আট্‌কে পড়্‌বে।"

আর থাম, রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক ততক্ষণে একেবারে মাঝ-নদীতে।

(ক্রমশঃ)

দ্রষ্টব্য ঃ—এবারকার রামধনুর ২৬১ পৃষ্ঠায় ফুটনোটে 'ভাদ্র ১৩৩৬' এর স্থানে 'আশ্বিন, ১৩৩৫' হইবে।

চোর-ধরা

(শ্রীমতী হেমলতা দেবী)

১

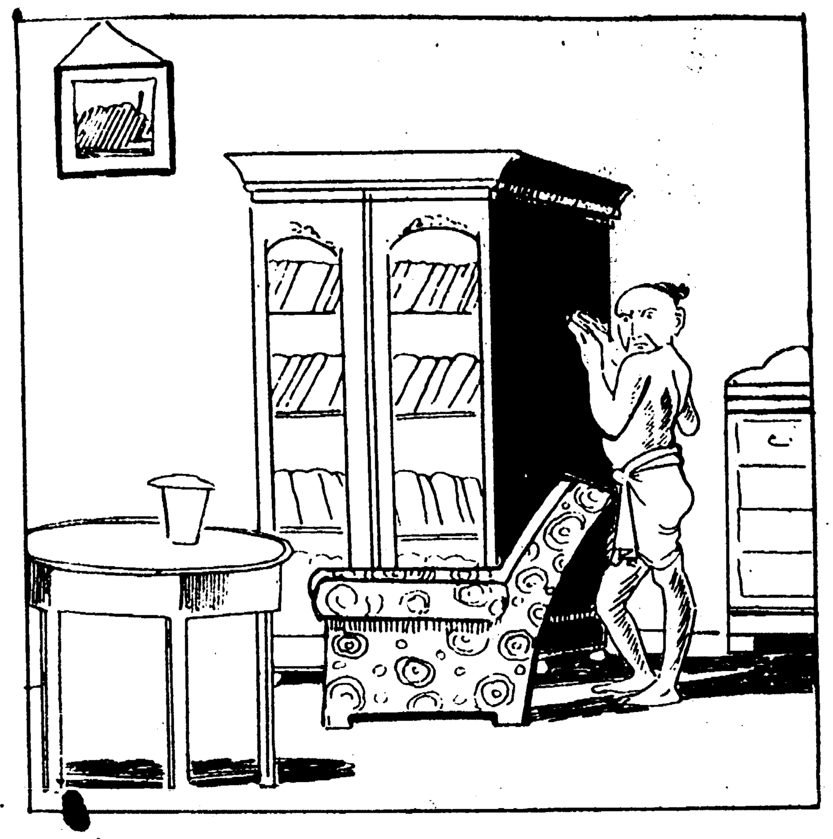

বাবুর লেগে মিছ্‌রি-পানা রোজ রেখে যাই রাত্তিরে,
চোট্টাবেটার নোলাখানার দেখ্‌ছি যে খুব বাড়্‌তিরে!
সবুর কর, গোবর-গোলা ভর্‌তি করে গ্লাশ্‌টাতে,
লুকিয়ে রবে শর্ম্মারাম এ, আল্‌মারীর এ পাশ টাতে!

২

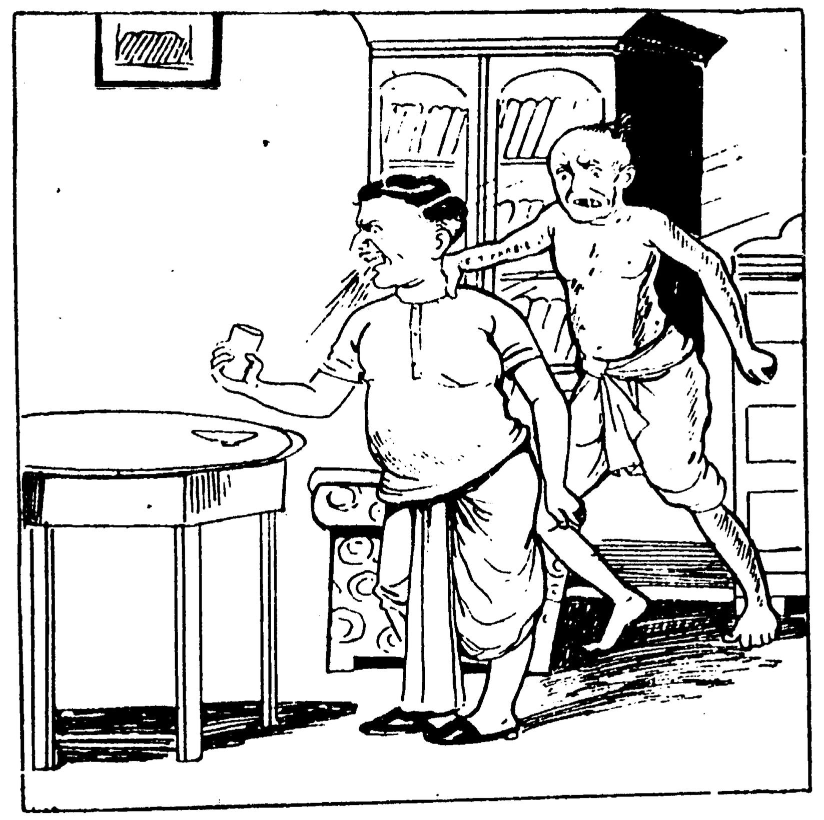

ঠিক এয়েছ? বাঃ রে বাঃ, মালুম হবে সুখটুকু,
গোবর-গোলার স্বোয়াদ খানা টের পেয়ে নাও একটুকু!
তারপরেতে বুঝ্‌বে বাছা, কেমন মজার কারখানা!
ঘপাৎ করে শর্ম্মারাম এ, ধর্‌বে যখন ঘাড়খানা!

৩.

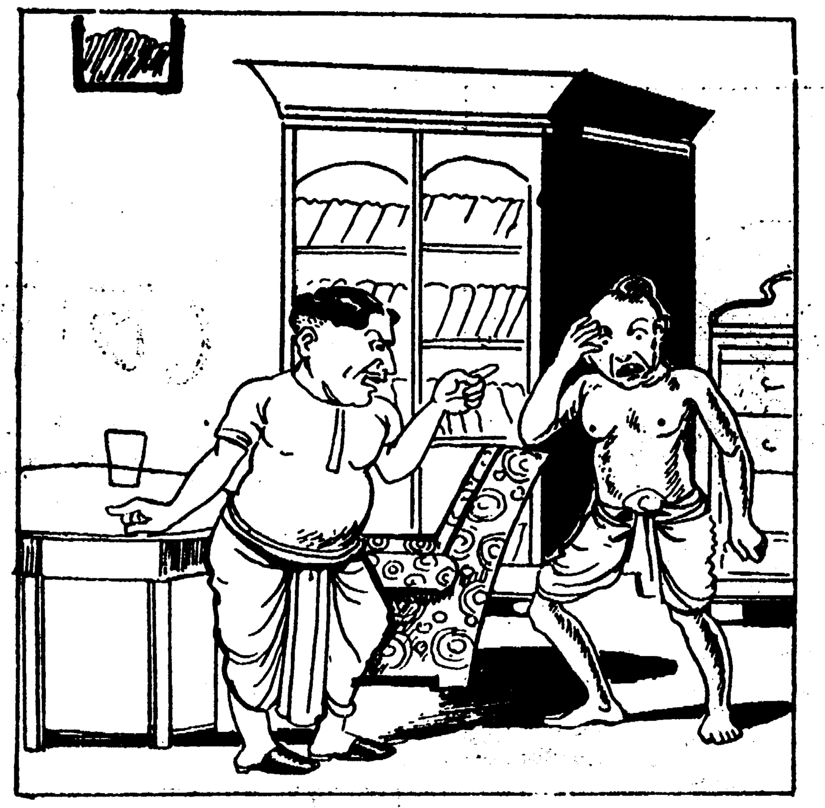

আঃ ছি ছিঃ, কপাল আমার কোথায় পোড়া মুখ ঢাকি ?
চোট্টা ভেবে ধর্‌নু শেষে কর্ত্তাবাবুর ঘাড়টা কি ?
কর্ত্তাবাবুর পেটের ভেতর গোবর-গোলা উথ্‌লালো !
(ভালই হোল, মুর্‌গী-খাওয়া দোষটা এবার শুধ্‌রালো !)

তোরা দেখ্‌বি যদি আয় ! *

(শ্রীচাঁদমল)

(তোরা)   দেখ্‌বি যদি আয়,
(ওই)   মত্ত মাদল
বাজিয়ে পাগল
সাঁওতাল-দল যায়,
(তোরা)   দেখ্‌বি যদি আয় !

* এই কবিতার লেখক চাঁদমল বাঙ্গালী নহেন. কিন্তু বাংলা ভাষার উপর তাঁর খুব টান্‌। নিজের চেষ্টায় বাংলা শিখিয়া ইনি আজকাল কবিতা লিখিতেছেন।

(ওই)   বনদেবীর স্নিগ্ধ বুকে ফুট্‌ল কত ফুল,
(ওই)   ফুল গুঁজে সব কাণের পাশে নাচেতে মসগুল !
(ওই)   মুখে হাসি
বাজিয়ে বাঁশী
বন্য বালক যায়,
(তোরা)   দেখ্‌বি যদি আয় !
(ওই)   ঝুমুর নাচে মত্ত সবাই সাঁওতালিনী বালা,
(ওই)   সরল কালো মুখে তাদের স্নিগ্ধ হাসি ঢালা !
(ওই)   নাচে দোলা
ছন্দে ভোলা
নূপুর বেজে যায়,
(তোরা)   দেখ্‌বি যদি আয় !

বিবিধ ঃ রামধনু পাইতে দেরী রামধনু সাধারণতঃ পূর্ব্বমাসের শেষ দিন কলিকাতা হইতে গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের নিকট পাঠান হয় ; কখনো কখনো মাসের পয়লা তারিখও হইয়া যায়। গত পূজার বন্ধের পরের সংখ্যা খানা ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত গ্রাহকগ্রাহিকার নিকট মাসের পয়লা তারিখের পর কখনও রামধনু পাঠান হয় নাই। কলিকাতা হইতে গ্রাহক-গ্রাহিকারা যেখানে থাকেন সেখানে চিঠি পত্র যাইতে কত সময় লাগে তাহা মনে মনে হিসাব করিলেই, রামধনু কবে তাঁহাদের হস্তগত হওয়া উচিত তাহা বুঝিতে পারিবেন। ইহা অপেক্ষা বেশী সময় লইলেই বুঝিতে হইবে ডাকঘরের কোথাও গোলমাল হইতেছে।

প্রায় প্রত্যেক মাসেই কোন না কোন গ্রাহকের নিকট হইতে অভিযোগ আসে যে 'রামধনু' তাঁহারা পান নাই। অথচ প্রত্যেক কাগজ মিলাইয়া তবে ডাকে দেওয়া হয়। ইহা হইতে মনে হয়, রামধনু পথে খোয়া যায়। মাসিকপত্রিকা চুরীর অপরাধে ডাক বিভাগের কোন কোন কর্ম্মচারীর জেল পর্য্যন্ত হইয়া গেছে, কিন্তু দেখিতেছি গলদ এখনও চুকে নাই। যাঁহারা কাগজ সময় মত পান না তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কার্য্যাধ্যক্ষের নামে সেই মর্ম্মে চিঠি দিবেন, আমরা সেই চিঠি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করিব।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকের চুরীর কথা আগামী বারে আলোচনা করিব।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

কি ভালো লাগে বল্

(শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, অমরদহ হাওড়া)

গগন যখন সুনীল নিরমল,
শ্যামল যবে বিপুল ধরাতল,
তটিনী যবে, বহেগো ছল ছল,
কি ভালো লাগে বল !
দখিণা বায়ু, যখন বহে ধীর,
তরুর পাতা কাঁপিছে ঝিরি ঝির,
নিদাঘ শেষে, ধরণী অতি থির,
নাহিক কোলাহল।
কি ভালো লাগে বল !
বরষ শেষে, ধরণী মধু হেসে,
সাজিয়া ওঠে, নবীনতর নবীনতর বেশে,
বাতাসে আসে সুবাস ভেসে ভেসে,
ফোটে গো ফুলদল,
কি ভালো লাগে বল !

নিদাঘে যবে না বহে বায়ু হায়,
শরণী বাহি পথিক নাহি যায়,
ভরিয়া ওঠে শীতল যবে ছায়
সকল তরুতল,
কি ভালো লাগে বল্ !
শ্রাবণে যবে আকাশ মেঘময়,
তড়িৎ-হাসি দেখিয়া জাগে ভয়,
বিশ্ব সারা বুঝিবা করে লয়,
এম্‌নি ঝরে জল,
কি ভালো লাগে বল্ !
শারদ রাতে চাঁদের মধু কর,
ছড়ায়ে যবে পড়ে গো ধরাপর
হৃদয় যবে মধুতে:ভর ভর
মনের নাহি তল
কি ভালো লাগে বল্ !
সাঁঝের বেলা পছিমে যবে চাহি
দেখিরে আহা ! শোভার সীমা নাহি,
মনের মাঝে জাগে সে উৎসাহী
ভাবনা অবিরল,
কি ভালো লাগে বল্ ?
কি ভালো লাগে যখন জাগে ধরণী রাতি শেষ,
পূরবে রবি আঁকে গো ছবি দুখের নাহি লেশ,
পাখীর গানে স্বপন আনে নাচিয়া ওঠে প্রাণ,—
হৃদয় মাঝে মধুর সাজে আসেন ভগবান্,
কি ভালো লাগে, কি অনুরাগে
ওরে ও শিশুদল
কি ভালো লাগে বল ?

সাঁঝের মায়া

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ হালদার, কলিকাতা)

পশ্চিমে ওই ডুব্‌ল রবি, সন্ধ্যা নামে নামে,
মেঘ-বালারা ওই চলেছে রূপকথারি ধামে।
কোন্ সে দেশের বার্তা নিয়ে মলয় বয়ে এল ?
হাস্নু হানার মিষ্টি সুবাস ছড়িয়ে হঠাৎ প'ল।
সাঁঝের নদী কুলু কুলু কোন্ সে গীতি গায় ?
আপন মনে উধাও হয়ে কোন্ সে দেশে ধায় ?
সাঁঝের আকাশ রঙাল কে উজল অরুণ রঙে ?
মেঘ পরীরা খেল্‌ছে হোলি লাল আবিরের রঙে ?
সান্ধ্য গীতি ঐ পাখী গায়, দিবস গেল চলে ;
হুকাহুয়া, শিয়াল গুলি গাইছে কলরোলে ;
ঐ মাঝি দেখ্ শেষ পাড়ি দেয় ক্লান্ত অতিশয় ;
আব্‌ছা আঁধার ছড়ায় ধীরে ক্লান্ত ধরাময়।
লাঙ্গল কাঁধে ক্লান্ত দেহে কৃষক ফেরে ঘরে
জোনাক-আলো জ্বলতে সুরু গাছের শিরে শিরে।
কোন্ সে দূরে রাখাল বসি' গাইছে বাঁশীর গান,
সে সুর আসি' হাওয়ায় ভাসি' মাতাল করে প্রাণ।
সাঁঝ-লগনে গৃহে গৃহে শঙ্খ উঠে বাজি' ;
তুলসী তলায় প্রদীপ দেখায় মায়েরা সব সাজি'।
সাঁঝের তারা উঠ্‌ল ফুটে সন্ধ্যা-গগনে ;
নদীর বুকে লহর তুলে চল্‌ছে পবনে।
মন্দিরে হয় সন্ধ্যারতি, বাদ্য উঠে বাজি'
সাঁঝের-মায়ার দোলায় আমার পরাণ উঠে নাচি'
সাঁঝের ছবি আঁকেন যিনি, প্রাণ-মাতান, মরি !
ভক্তি ভরে শিল্পি-বরে আজকে প্রণাম করি।

বরষা আগমনে

(কুমারী বীণা দেবী মেমিও, ব্রহ্মদেশ)

বাদল মেঘে মাদল শুনে
উঠলো কেঁপে মন,
বাদ্‌লা দিনের হাওয়া পেয়ে
মাত্‌লো কেয়া-বন।

প্রজাপতি ফুলবনে আজ
পথ করেছে ভুল,
মৌমাছি সব কদমবনে
লাগায় হুলু-স্থূল।

বাদল মেঘে মাদল ও ভাই
বাজায় তালে তালে,
বাদল রাণী নাচ্‌ছে হেলে
ছড়িয়ে অলক ভালে।

পরাণ আমার উতল হলো
কেয়ার মধুর বাসে
মন্‌টা আবার উঠ্‌লো নেচে
নীপ তরুর হাসে।

আকাশ ছেয়ে ইল্‌সেগুঁড়ি
পড়্‌ছে থাকি থাকি,
বল্‌ছে কবি, 'বর্ষা তুমি
এবার দিলে ফাঁকি !'

বছর পরে বর্ষা ওগো
আবার ফিরে এলো
ধরার বুকে শ্যামল আভা
আবার ছেয়ে গেল ॥

হাস্য-কৌতুক

(শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত, শিবসাগর)

এক দিন রাম বাবু তাহার চাকর শ্যামাকে বল্‌লেন "ওরে শ্যামা! বাজার থেকে এক পয়সার পান আর এক পয়সার সুপারি নিয়ে আয়।" শ্যামা ত তখনি চলে গেল। কিছু পরে সে খালি হাতে ফিরে এসে বল্‌ল "কোন্ পয়সা দিয়ে পান আর কোন্ পয়সা দিয়ে সুপারি আন্‌তে হবে তা'ত বলেন নি বাবু।"

আশায়

(শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়)

ছোট্ট ছেলে ছোট্ট মোরা,
ছোট্ট মোদের আশা,
তোমার তরে আছে ঠাকুর
ব'ক্ষে ভালবাসা;
কেমন ক'রে জানাই তাহা,
হৃদ-মাঝারে গুমরে যাহা;
তুমিই প্রভু জানিয়ে দেবে
এইটি ছোট আশা।

নাইকো মোদের কোন কিছু
আমরা গরীব অতি,
জগৎ ভ'রি তুমিই আছ
এইটা জানি পতি!
তোমার জিনিষ তোমার পাশে,
সাজাই ডালা মনের আশে—
তুমিই তাহা মানিয়ে নেবে
এইগো পদে নতি।

বৈদ্যুতিক জুতা

হাঙ্গেরীর এক জুতাওয়ালা কিছু দিন হইল ভারী মজার এক রকম নূতন ধরণের জুতা তৈরী করিতেছে। এই জুতার সোলের ভিতর একটি করিয়া ব্যাটারি বসান। তারই সাহায্যে যথন খুসী সে জুতা গরম রাখা চলে। ইয়োরোপের মত ঠাণ্ডা দেশে এ জুতার খুবই কদর হইবে সন্দেহ নাই—বিশেষতঃ শীতকালে, যখন পা গরম রাখিতে পারিলে লোকে আর কিছু চায় না।

গাছের ছালের নোট

তোমাদের যেমন অনেকের নানা দেশের টিকিট সংগ্রহ করিবার বাতিক আছে, তেমনি কেন্‌সিংটনে ফ্রেড কাটরিং নামে এক ভদ্রলোকের বাতিক আছে নানা দেশের দুষ্প্রাপ্য নোট সংগ্রহ করা। সম্প্রতি তিনি ভারী অদ্ভুত রকমের একখানি নোট যোগাড় করিয়াছেন। নোট খানা তুঁত গাছের ছাল দিয়া তৈরী, লেখাগুলি সোণার মত। নোটখানি ৬০০ বছরের পুরানো। মালিক মহাশয় বলিতেছেন এটি আগে ছিল চীন সম্রাট্‌দের।

পোকার বৈজ্ঞানিক লড়াই

গেল মহাযুদ্ধে যে সব ভয়ানক ভয়ানক অস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছিল তার মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস একটি। দূর হইতে শত্রুপক্ষের ভিতর এই গ্যাস ছাড়িয়া দেওয়া হইত, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা মারা পড়িত। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা অনেক মাথা খাটাইয়া এই গ্যাসের ব্যবহার আবিষ্কার করেন। জিনিষটা এই বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষের হাতে গড়া বলিয়াই লোকে জানিত—কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে এক শ্রেণীর ছোট্ট পোকা এ বিদ্যায় মানুষের সাথে টক্কর দিতেছে। যুদ্ধে হারিলে ইহারাও শরীরের পিছন দিক্ দিয়া এক রকম বিষাক্ত গ্যাস ছাড়িয়া দিয়া পালাইয়া যায়—আর সেই গ্যাসের ছোঁয়াচ্ লাগিলে বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু অনিবার্য্য।

ঘুরপাক খাওয়া বাড়ী

ফ্রান্সের Aikles Bains সহরে ভারী অদ্ভুত রকমের একখানা বাড়ী তৈরী হইয়াছে। বাড়ীটি একটি স্বাস্থ্য-নিবাস। এই বাড়ীর নীচের তালাটা অনেকটা মোটা থামের মত দেখিতে। তার উপরকার দোতালাটা ইচ্ছামত ঘুরাইয়া দেওয়া যায়। ফলে দিনের বেলা সূর্য্য আকাশের যে দিকেই

থাকুক না কেন, দরজা জানালাগুলি সর্ব্বদাই সেদিকে ফিরাইয়া রাখা চলে। রোগীরাও সব সময়েই বিছানায় শুইয়া শুইয়া রোদ পোহাইতে পারে।

কোন্ গ্রহ কত দূর ?

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মাইল দূরে বলিয়া আমরা ছোটবেলা হইতে শুনিয়া আসিয়াছি—কিন্তু সে দূরত্বটা যে কতখানি তা কল্পনা করিতেও আমাদের বেশ একটু কষ্ট হয়। তোমরা, যারা বম্বে মেল্ পাঞ্জাব মেলে চড়িয়া দূরে বেড়াইতে গিয়াছ তারাই জান সে গুলি কি রকম জোরে যায়। ঘণ্টায় ৬০ মাইল অর্থাৎ মিনিটে মিনিটে এক এক মাইল যাওয়াও তাদের কাছে বিশেষ কিছু নয়। এই রকম একখানা ট্রেণে চড়িয়া (ঘণ্টায় ৬০ মাইল্ বেগে) তুমি যদি পৃথিবী হইতে যাত্রা কর এবং পথে কোথাও মুহূর্ত্তের জন্যও না দাঁড়াও, তবে কোন্ গ্রহে যাইতে তোমার কত সময় লাগিবে তাহার একটা ফর্দ্দ নীচে দেওয়া গেল।

চাঁদে যাইতে—১৬৬ দিন
মঙ্গল গ্রহে যাইতে—৭৬ বছর
বুধ গ্রহে যাইতে—১১০ বছর
সূর্য্যে যাইতে—১৭৭ বছর
বৃহস্পতি গ্রহে যাইতে ৭৪০ বছর
শনি গ্রহে যাইতে—১৪৭০ বছর
ইউরেনসে যাইতে—৩১৬০ বছর
নেপচুনে যাইতে—৫০৫৫ বছর
সব চাইতে কাছের তারায় যাইতে—৪ কোটি বছর।

সহরের বহর

সম্মিলনী পত্রিকা বলিতেছেন,—

"লণ্ডন সহরে মোট এক হাজার স্কুল আছে, ইহার ছাত্র সংখ্যা ৭ লক্ষ, এবং শিক্ষক সংখ্যা ১৭ হাজার। এই সকল স্কুলে প্রতি বৎসর ১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড্ খরচ হয়।

"লণ্ডন সহরের পিকাডিলির কোন একটী বিখ্যাত রেষ্টুরেণ্টকে বাৎসরিক ১১ হাজার পাউণ্ড্ (মোটামুটি দেড় লক্ষ টাকা) ঘর ভাড়া ও ৩ হাজার ৫ শত পাউণ্ড্ টেক্স দিতে হয়।

"গত বৎসর এক নিউইয়র্ক সহরে ২৫ হাজার লোক হারাইয়া গিয়াছে।"

কথাগুলি শুনিয়া যদি কারো মুখ ইঞ্চি খানেক হাঁ না হয় তবে সে বাহাদুর বটে।

আশ্চর্য্য বাজনা

নিউ ইয়র্ক্ সহরের ডক্টর মেইন্ উড্ নামে এক ভদ্রলোক বহু পরিশ্রমের পর এক অদ্ভুত বাজনা তৈরী করিয়াছেন। এই বাজনার মধ্যে একই সাথে পিয়ানো, মেণ্ডোলিন বাঁশী এই তিন রকম বাজনা বসান আছে। কল টিপিয়া দিলে পর পর তিনটিই বাজিয়া উঠে। যন্ত্রটি দেখিতেও মোটেই বড় নয়—বড় জোর একটা বেহালার মত হইবে। কোলের উপর রাখিয়াই সেটা বাজান চলে।

এই যন্ত্র তৈরী করিতে নাকি ভদ্রলোকের অর্দ্ধেক জীবন কাটিয়া গিয়াছে।

সময় নষ্ট করিও না

আমেরিকার লোকেরা সময়কে খুবই মূল্যবান্ মনে করে, বাজে কাজে তাহা যে নষ্ট হইবে তাহাতে তারা মোটেই রাজী নয়। চট্‌পট্ সারিবার জন্য তাই আজকাল কত রকম কলই না আবিষ্কার হইতেছে। তাস খেলিতে বসিলে তাস গুছাইতে এবং কাটিয়া দিতে নাকি অনেকটা সময় অনর্থক নষ্ট হয়। তাই আজকাল তাস গুছাইবার এবং কাটিবার জন্যও একটা কল বাহির হইয়াছে। এই কলে সতের সেকেণ্ডের মধ্যে সমস্ত কাজ নিখুঁৎ ভাবে শেষ হইয়া যায়।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

যার কাছে পাঁচখানা রুটী ছিল সে পাইবে সাত পয়সা, যার কাছে তিন খানা ছিল সে পাইবে এক পয়সা।

উত্তরদাতাদের নাম

শিশিরকুমার ও শক্তি নাগ (ঢাকা), কালিদাসী সাহা (বাটিকামারি, ফরিদপুর), বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগো পাড়া, চট্টগ্রাম), সুকুমার ও করুণা (বেড়া, পাবনা), অতীন্দ্রনাথ পাল (উল্টাডাঙ্গা, কলিকাতা), বিমল, প্রবোধ চোখা ও ইন্দুবিকাশ দত্ত (শিবসাগর) বীরেন্দ্রনাথ হালদার (বাগবাজার, কলিকাতা), নিরুপম লাহিড়ী (মাহিগঞ্জ), দেবকীনন্দন অধিকারী (তমলুক), সুজাতা, শেফালি, সবিতা, নেপালী ও শিবু (ইটামগরা), চামেলী, শেফালি, নীলিমা (কলিকাতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), পণ্টু, মিণ্টু, মাণিক ও শণ্টু (ঢাকা), গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জী (দিল্লী), অজয়কুমার দাস, আশীষকণা (বালিগঞ্জ, কলিকাতা), কেলে, অমু, খোকন. ধীরেন, জলধি, টেবি, নসু, মমতা, গঁদু (দেশরি), পূর্ণিমা ও উমা (নাগপুর), বীণাপাণি বসু (বেতিয়া), বনা, মনা, ধনা, ক্ষিতীশ (নাগপুর), শৈলেশকুমার বসু, নিখিলনাথ চাটার্জ্জী (ভবানীপুর, কলিকাতা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), জয়ন্তকুমার দাঁ (পুরুলিয়া), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), কালিপদ রুদ্র (হাতুয়া), প্রসাদদাস সেনগুপ্ত (কলিকাতা), রমা, পূর্ণিমা, কালিপদ ও প্রতিমা সেন (হাজারিবাগ), হিমাংশু মল্লিক (কলিকাতা),

রমাপ্রসাদ চৌধুরী ও মেজদা (কলিকাতা), গোয়াল পাড়া বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (গোয়াল পাড়া), গোকুলানন্দ দাস (নিমুসরাই), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), নিরুপমা দেবী (জলপাইগুড়ী), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী), লক্ষ্মী, গোবর্দ্ধন, গোপাল, শিবু, রাম; অমিয়, ভোলা, শ্রীপতি, অজিত, বলাই, পুনাই, চক্রধর বিজু, বেচু ও ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী), দীনবন্ধুপ্রসাদ মিত্র (বেনারস), তারাকুমার সান্ন্যাল (কলিকাতা), পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া)।

নূতন ধাঁধা

নীচে ব্রাকেটগুলির জায়গায় এক একটি অর্থ বসাইয়া যাও—দেখিবে একটি চিঠির অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

(কাপালিকের পূজার অঙ্গ) ও (রোজ খুসী), এ তো(প্রহার) কে চিত্ত) (গাছের গুঁড়ি) ! সেই (ভাঙ্গা দরজায়) (নিঃশব্দ)(অর্দ্ধবৃত্ত) বসে আছ, বাড়ী(এক রকম তরল পদার্থ) বাই ত মিল) নায় (হাড়)র।

ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের প্রতি

এই আষাঢ় সংখ্যায় রামধনুর চতুর্থ বর্ষের প্রথম ছয়মাস শেষ হইয়া গেল। শ্রাবণ হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে। ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া আগামী ছয়মাসের মূল্য ১৷৵০ মণি অর্ডারে পাঠাইয়া দিবেন ; কেননা তাহা হইলে খরচ ভিঃ পিঃ হইতে কম পড়িবে, পত্রিকা পাইতেও কোন দেরী হইবে না।

আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা এ ছয়মাস কাগজ লইয়াছেন, আগামী ছয়মাসও তাঁহারা সকলেই গ্রাহক থাকিবেন। যদি বিশেষ কারণে কাহারও গ্রাহক থাকিতে আপত্তি থাকে তবে তিনি যেন আগামী ২৫শে আষাঢ় তারিখের মধ্যে আমাদের একখানি চিঠি লিখিয়া জানান, কেননা চিঠি না পাইলে আমরা সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহককেই ভি, পিতে কাগজ পাঠাইব। আর সে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতি। গ্রাহক-গ্রাহিকারা স্মরণ রাখিবেন, আজকাল পোষ্ট অফিসে ভি, পি, আসিলে তিন দিনের মধ্যে ছাড়াইতে হয় ; পূর্ব্বের ন্যায় সাত দিন ভিঃ পিঃ রাখা হয় না।

ইতি—কার্য্যাধ্যক্ষ।

"মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো" —৺সত্যেন্দ্রনাথ

[সবে কিছু দিন হইল জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন গেল—কলিকাতায় সে উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদি হইয়াছিল]

রমাপ্রসাদ চৌধুরী ও মেজদা (কলিকাতা), গোয়াল পাড়া বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (গোয়াল পাড়া), গোকুলানন্দ দাস (নিমুসরাই), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), নিরুপমা দেবী (জলপাইগুড়ী), শৈলেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (জলপাইগুড়ী), লক্ষ্মী, গোবর্দ্ধন, গোপাল, শিবু, রাম; অমিয়, ভোলা, শ্রীপতি, অজিত, বলাই, পুনাই, চক্রধর বিজু, বেচু ও ভবানীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়া, হুগলী), দীনবন্ধুপ্রসাদ মিত্র (বেনারস), তারাকুমার সান্ন্যাল (কলিকাতা), পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া) ।

নূতন ধাঁধা

নীচে ব্রাকেটগুলির জায়গায় এক একটি অর্থ বসাইয়া যাও—দেখিবে একটি চিঠির অংশ বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

(কাপালিকের পূজার অঙ্গ) ও (রোজ খুসী), এ তো(প্রহার) কে চিত্ত) (গাছের গুঁড়ি) ! সেই (ভাঙ্গা দরজায়) (নিঃশব্দ)(অর্দ্ধবৃত্ত) বসে আছ, বাড়ী(এক রকম তরল পদার্থ) বাই ত মিল) নায় (হাড়)র।

ষাণ্মাসিক গ্রাহকদের প্রতি

এই আষাঢ় সংখ্যায় রামধনুর চতুর্থ বর্ষের প্রথম ছয়মাস শেষ হইয়া গেল। শ্রাবণ হইতে দ্বিতীয় খণ্ড আরম্ভ হইবে। ষাণ্মাসিক গ্রাহকেরা অনুগ্রহ করিয়া আগামী ছয়মাসের মূল্য ১৵০ মণি অর্ডারে পাঠাইয়া দিবেন ; কেননা তাহা হইলে খরচ ভিঃ পিঃ হইতে কম পড়িবে, পত্রিকা পাইতেও কোন দেরী হইবে না।

আমাদের বিশ্বাস যাঁহারা এ ছয়মাস কাগজ লইয়াছেন, আগামী ছয়মাসও তাঁহারা সকলেই গ্রাহক থাকিবেন। যদি বিশেষ কারণে কাহারও গ্রাহক থাকিতে আপত্তি থাকে তবে তিনি যেন আগামী ২৫শে আষাঢ় তারিখের মধ্যে আমাদের একখানি চিঠি লিখিয়া জানান, কেননা চিঠি না পাইলে আমরা সকল ষাণ্মাসিক গ্রাহককেই ভি, পিতে কাগজ পাঠাইব। আর সে ভিঃ পিঃ ফেরৎ আসিলে আমাদের অযথা ক্ষতি। গ্রাহক-গ্রাহিকারা স্মরণ রাখিবেন, আজকাল পোষ্ট অফিসে ভি, পি, আসিলে তিন দিনের মধ্যে ছাড়াইতে হয় ; পূর্ব্বের ন্যায় সাত দিন ভিঃ পিঃ রাখা হয় না।

ইতি—কার্য্যাধ্যক্ষ।

"মরমী তুমি চরম-খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে মরম তাহা বুঝেছ গো" —৺সত্যেন্দ্রনাথ

[... জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন গেল—কলিকাতায় সে উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানাদি হইয়াছিল]

INTENTIONAL DUPLICATE EXPOSURE.

৪র্থ বর্ষ } জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ { ৫ম সংখ্যা

বিশ্রী !

(শ্রীমুরারিমোহন সেন, বি-এ)

কাঁকড়া ভায়া যাচ্ছিল পথ বেয়ে,
দূরে কাচপোকা এক দেখ্‌ছিল তাই চেয়ে
বল্লে তারে—"হাস্‌চি দেখে ভাই—
পা দুটি তোর এক্কেবারে ছাই !
যা চলে, তুই যাঃ,
তোর বিশ্রী দুটো পা !"
কাঁক্‌ড়া কথা শুন্‌লে নাকো তার,
—নিন্দে শুনে মুখ হোলোনা ভার !

...... কাচপোকা ফের আস্তে তারে কয়—
"অমন সুশ্রী চরণ কেমন কোরে হয় ?
দোল্‌না-দোলা চল্‌ন্‌ কেন তোর ?
লম্বা পায়ের এতই কি গুমোর ?
—অমন চরণ—ছিঃ
আমি অনেক দেখেছি !"
কাচপোকা হায় দাঁড়িয়ে পথে ঠায়
মিটির্‌ মিটির্‌ কাঁক্‌ড়া-পানে চায় !

কাঁক্‌ড়া তখন তারে—
ধর্‌লো এসে ঘাড়ে !
এম্‌নি কোরে
ঠ্যাং তুলিয়ে,
চ্যাং দোলাতে
চমকে দিয়ে,
সেই বিশ্রী ছুটো পা—
জড়িয়ে দিল, বাঃ !
শেষে গলায় দিয়ে ফাঁস,
তার ঘটায় সর্ব্বনাশ !
কাচপোকারো মুখেতে নেই রা—
ফের চল্লো পথে বিশ্রী ছুটো পা !

বিলাতী ডাক

(শ্রীহিরণ্ময় ঘোষাল)

হ্যালো চিনু-বিনু এবং তোমাদের বন্ধুবান্ধব,

তোমাদের খবর পাই নি, সে এক যুগ—এর মধ্যে তোমরা যে দিব্যি ডাগরটি হ'য়ে উঠেছ, তা প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিলাম।

আজ সকালে এখানে ভারী চমৎকার রোদ উঠেছে, যেন আমাদের পৃথিবীটিকে কে আদর ক'রে একখানি বাসন্তী রঙের শাড়ী পরিয়ে দিয়েছে। হাস্‌ছ নিশ্চয়, ভাব্‌ছো, তোমাদের দেশে রোদ ত সকাল হলেই ওঠে, আবার সন্ধ্যে হ'লে সে যায় ফিরে—তার কুটীরের দরজাটি বন্ধ ক'রে সে সারা রাত ঘুমোয়, আবার সকাল হ'লে একগাল হেসে সে দরজাটি খুলে বেরিয়ে আসে।—এর মধ্যে আবার কবিত্ব কী ! কবিত্ব কী তা বুঝ্‌তে যদি একবার এদেশে আস্‌তে ! তোমরা যা'কে বলো বিলেত সে দেশটি যেন আত্নুরে খোকা, দিন নেই রাত নেই, কাঁতুনে ছেলের মতন সে ঠোঁট ফুলিয়েই আছে, আর যখন তখন তার কান্না ! যখন কোনো কোনো দিন ভুলেও সে হেসে ফেলে, তখন এদেশে উৎসবের দিন। পার্কে পার্কে দলে দলে লোক, ছেলেরা রঙিন ফানুস নিয়ে ছুটোছুটি কর্‌ছে—রাস্তার মোড়ে মোড়ে চকোলেট-ওয়ালারা গলায়-ঝোলানো ডালা সাজিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে ফির্‌ছে। যার সঙ্গে দেখা হয় সেই বলে, হ্যালো, কী সুন্দর দিন !

যাক্‌, এখন আমাদের গল্প হবে নাকি ? বিলেতে পৌঁছেছি, নয় ?—ইতিপূর্ব্বের ঘটনা তোমরা নিশ্চয় সব শুনেছ।

লণ্ডন। মনে মনে যে লণ্ডনের ছবি এতদিন এঁকেছিলাম, তার সঙ্গে আসল লণ্ডনের কোনোই মিল খুঁজে পেলাম না। ভিক্‌টোরিয়া ষ্টেশন থেকে মালপত্র নিয়ে যখন ট্যাক্সিতে চাপিয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন, ঈশপের গল্পের সেই গ্রাম্য ইঁত্নরের সহরে-ইঁত্নরের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে আসার মত অবস্থা আমাদের। পথের ত্ন'দিকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, ধোঁয়ায় আর ধূলোয় কালো, প্যাচ্‌পেচে রাস্তা,

টিপ্‌টিপিয়ে বৃষ্টি পড়্‌ছে, তার সঙ্গে কুয়াসা, এবং চারিদিকে যেন একটা বিরাট হৈহৈ শব্দ চলেছে—চেঁচামেচি, মোটরের ভোঁক্‌, ট্রামের ঘড়্‌ঘড়ানি,—তার ওপর শীত! তখন ঠিক কী মনে হয়েছিল, ভুলে গেছি, তবে ভারী আশ্চর্য্য লেগেছিল। হঠাৎ দেখি এক প্রকাণ্ড বাড়ীর সাম্‌নে আমাদের গাড়ী থেমেছে। এটা ভারতীয়দের একটি আড্ডা—২১ নং ক্রমোয়েল রোড্‌।

এত বড় বাড়ী দেখে সত্যিই মাথা ঘুরে যায়, তার ওপর আবার এর মধ্যে

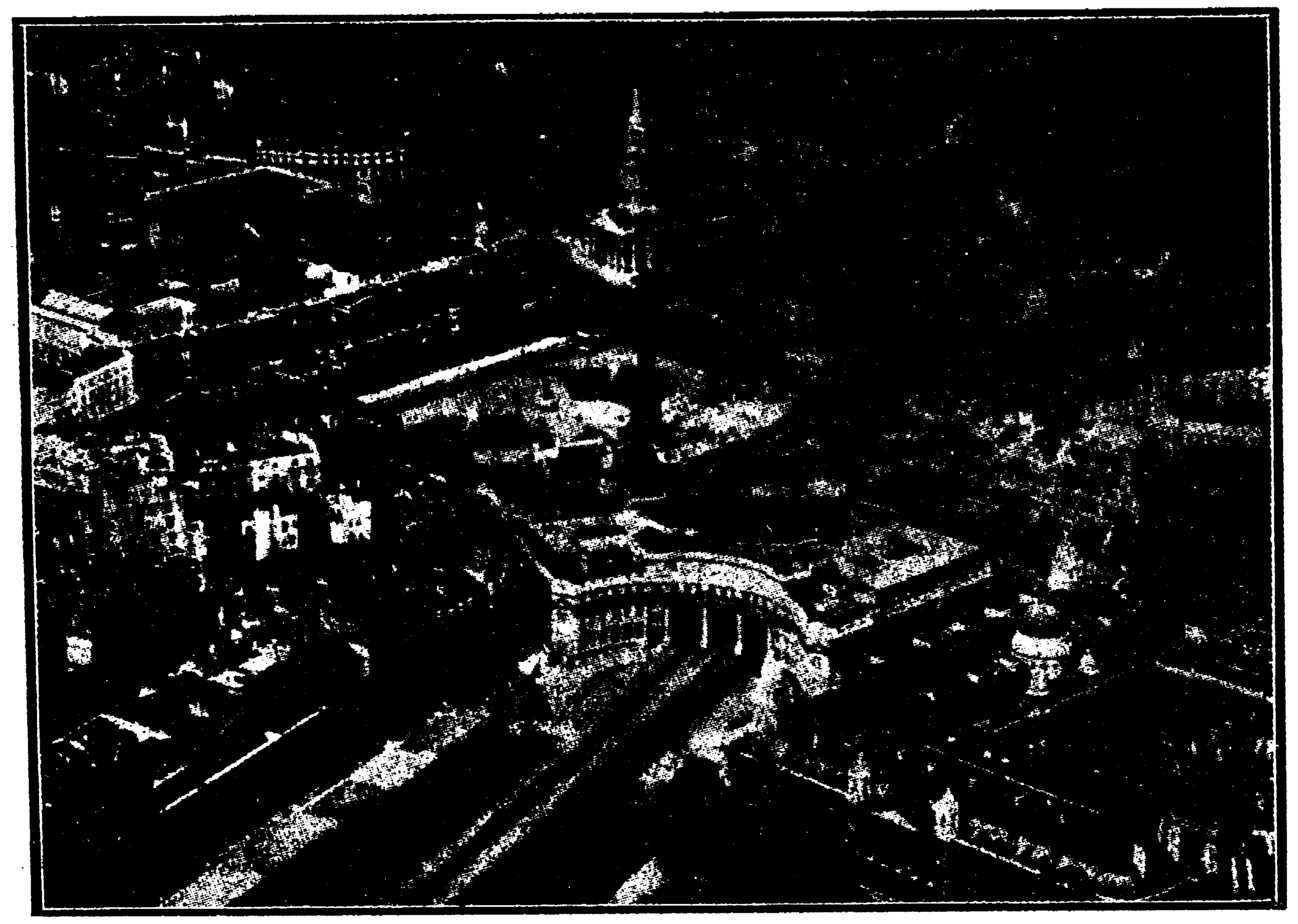

এরোপ্লেন থেকে লণ্ডনের দৃশ্য—ঐ উচু স্তম্ভটা নেল্‌সন্স্‌ কলম্‌।

থাক্‌তে হবে; গেছি আর কী! দরজা খুলে এক ইংরেজ দরওয়ান্‌ বেরিয়ে এসে আমাদের মালপত্র সব ভেতরে নিয়ে গেল। তাকে দেখে দুঃখ হয়, বেচারার জাত-ভাই সব কী মজায় আমাদের দেশে বড়সাহেবী কর্‌ছে, আর এর ভাগ্যে মোট-বওয়া—তায় আবার ভারতীয়দের মোট বওয়া! আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, বোধ হয় লোকটা মনে মনে আপনার কপালকে যা গালাগালিটা দিচ্ছে! কিন্তু পরে আমার সে ভুল ভেঙেছিল। এদেশ থেকে যারা কখনও বাইরে যায় নি, কিংবা যাদের

আত্মীয়স্বজনও কখনও বাইরে যায়নি, তারা জানেই না, কাকে বলে শাদা আর কাকে বলে কালো। তাদের দরওয়ানীতে কোনো ত্রুটিই থাকে না, আমাদের দেশের মত এরাও ঠিক, "হাঁ হুজুর, জো হুকুম" টি বজায় রাখে। তবে তফাৎ এই যে, আমাদের কেষ্টা চাকর, এবং মাধো সিং দরওয়ান উঠ্‌তে বস্‌তে, খেতে শুতে সেই কেষ্টা চাকর আর সেই মাধো সিং দরওয়ানই থাকে, এরা কিন্তু কাজটি হ'য়ে গেলে একেবারে—পূরোপূরি বড়বাবু, কারো তোয়াক্কা রাখে না, তা সে চাকরই কি, আর মনিবই কি। তার ওপর তাদের তুমি হুকুমটি কর্‌তে পার্‌বে না, "এই, ইধার আও" কি, "বর্ত্তন্‌ মলো"! বলেছ কি, তারা বল্‌বে, "এই নাও বাপু তোমার তল্পিতল্পা—হাম্‌ নেহি রহেগা!" বল্‌তে হবে খুব মিষ্টি ক'রে মিহি গলায় "ত্যাখো, তোমায় একবার দরকার আছে, তুমি আস্‌তে পার্‌বে কি, এক মিনিটের জন্যে?" সে বল্‌বে, "হাঁ হুজুর।" তোমায় ব'ল্‌তে হবে, "তুমি দয়া করে একখানা ট্যাক্সি ডাক্‌তে পার্‌বে কি?—ধন্যবাদ।" 'ধন্যবাদ'টি দিতে যেন কক্ষণো ভুল না হয়। বল্‌বে, দেখেছ লোকটা কি চাষা!

যাই হোক্‌, লণ্ডনে এসে অবধি, কয়েকটা নূতুন জিনিষ শিখ্‌তে হয়েছে!—সকাল ৭॥০ টার সময় সব ঘরে ঘরে দুম্‌ দুম্‌ ক'রে ধাক্কা; তাড়াতাড়ি উঠে দরজার সাম্‌নে রাখা গরম জলের জগ্‌টি ভেতরে এনে দাড়ী কামানো (তোমাদের অবশ্য সে বালাই নেই), তারপর ঘরের এককোণে মুখ ধোবার টেবিল, তাতে, কাচের গাম্‌লার ভেতর মুখ ধোওয়া, এবং পড়ি-ত-মরি ক'রে পোষাক প'রে নেওয়া। আগের রাতে জুতো দরজার বাইরে রেখে শুয়েছ, সকালে উঠে দেখ্‌বে, তা একেবারে ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌ছে—যেন সব পরীদের কাণ্ড! পূরোপূরি সব পোষাক না প'রে ঘরের বাইরে পা'টি দিয়েছ কি, এবং তোমার বাড়ীর কোনো মেয়ে বা ঝি দেখেছে কি, বাড়ীশুদ্ধ "জল আন্‌, জল আন্‌, ডাক্তার ডাক," শব্দ প'ড়ে যাবে। তবে মজা এই, যে গলায় টাই, পায়ে মোজা এবং পরনে ট্রাউজারস্‌ থাক্‌লে কোনো ক্ষতি নেই। তবে খাবার টেবিলে আস্‌তে হ'লে, কোনো খুঁত থাক্‌লে চ'ল্‌বে না। এদের কাছে শেখ্‌বার জিনিষ অনেক আছে। অবিশ্যি অতটা ভালো নয়, তবে আমাদের যেমন খালি গায় বাজারে চলেছি, সেটাও যেন কেমন কেমন! এদের খাওয়া-দাওয়া সব

ঘড়ি ধরা। সকাল আট্‌টায় ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌, একটায় লাঞ্চ, বিকাল চারটায় চা, এবং সন্ধ্যা ৭॥০ কি ৮ টায় ডিনার। সকাল হলে সব পরিষ্কার হয়ে সেজেগুজে, বাবা, মা, ভাই বোন্, একসঙ্গে এক টেবিলে ব'সে গল্প ক'র্‌তে ক'র্‌তে ব্রেক্‌ফাষ্ট্‌ সেরে যে যার কাজে চলে গেল। বাবা গেলেন আফিসে, ছেলেরা গেল ইস্কুলে, মাও হয়তো আফিসে গেলেন, আর না হয় তাঁর ঘর-সংসারের কাজে সারাদিন ব্যস্ত রইলেন। আর আমাদের কেউ খেলে ৯টায়, কেউ ১০টায়, কেউ ১২টায়, কেউ ১টায়, আর বাড়ীর মা, পিসিমা, কাকীমা, বেচারীদের হাঁড়ি কোলে ক'রে ব'সে থাক্‌তে হ'লো সেই বেলা ৩টা পর্য্যন্ত! জানি না এতে কোন পুণ্যি আছে কিনা, তবে এদেশের মেয়েদের যে অমন অটুট স্বাস্থ্য, তার কারণ এদের অমন কোন পুণ্যের বালাই নেই। তোমরা যদি এক কাজ কর ত ঠিক হয়। সবাই একসঙ্গে জিদ্‌ ধরো, মার সঙ্গে না হ'লে কিছু খাবো না,—দাদার খাওয়া হ'লে তবে তার পাতে ব'স্‌বে ছোট বোন্, ওসব বুজ্‌রুকী চ'ল্‌বে না, সবাই একস্‌ঙ্গে ব'সে খাবো, তা না হলে একেবারে "হাঙ্গার ষ্ট্রাইক"! সত্যি, ধর্ম্মের নামে আমরা কী অবিচারটাই চালাই বেচারা মেয়েদের ওপর! গোটা ভারতবর্ষটা যেন আধখানা বেঁচে রয়েছে। যে মায়ের দুধ খেয়ে ছেলেরা মানুষ হবে, তাদের স্বাস্থ্য অমন হলে চল্‌বে কেন?

যাই হোক্, এদেশের খাবার গুলোর একবার নাম ক'রবো নাকি? সকালে সাধারণ ইংরেজ তার ব্রেক্‌ফাষ্টে খায় দু'টো ডিম, দু' স্লাইস্‌ বেকন, একখণ্ড ভাজা. দু'কাপ চা, খান ৪।৫ টোষ্ট্‌, মাখন, জ্যাম, বা মার্ম্মালেড্‌ (জ্যামের মাস্‌তুতো ভাই)। লাঞ্চে খায়, আলু-সিদ্ধ, কপি-সিদ্ধ, মাংস, পুডিং, কফি বা চীজ্‌। চায়ে খায়, চা কেক্। রাতে খায়, মাছ. মাংস কোনো মিষ্টি, (সাধারণতঃ পুডিং) কফি বা চীজ্‌। মোট হিসেব ক'রে দেখ্‌লে, আমরা যা খাই— ডাল, ভাত, চচ্চড়ি—তাতে যা সার আছে এদের খাবারের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। কল্‌কাতার রাস্তা দিয়ে একটা ইংরেজ যখন দুম্ দুম্ ক'রে হেঁটে যায় তখন আমাদের কেউ কেউ বলে থাকেন, "হুঁঃ, এরা কি আর সাধে রাজা হয়েছে!" অথচ কিসের জোরে যে এরা রাজা সে কথাটা আমরা একেবারেই ভুলে যাই। এদের রান্নায় কোনো হাঙ্গামা নেই, খানিকটা বাট্‌না, তেল, ঘি, দিয়ে যে স্বাদ হয়, তার কাছে খাবারের সারটুকু বলি দিতে এরা চায় না। খেতে

হয়তো তত ভালো হয় না, কিন্তু স্বাদের বদলে এরা পায় অটুট স্বাস্থ্য। তার ওপর আমাদের দারিদ্র্য। তার জন্যে অবশ্য আমরা কতকটা দায়ী হলেও পূ্রোপুরি দায়ী নই। আমি জোর ক'রে বল্‌তে পারি, তোমাদের যে কোন পালোয়ান্‌কে এদের যে কোনো পট্‌কা দেবে হারিয়ে! কেন? এরাও কি তোমাদের মত মানুষ নয়? তার কারণ, এদের বাবা-মা সব চেয়ে আগে দেখেন, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য। আমাদের বাবা মারা দেখেন, ছেলে কেলাসে ফাস্‌টো হ'লো কিনা। অথচ ছেলে কিসের জোরে ফাস্‌টো হবে, তার দিকে কারো নজর নেই। সকালে উঠে কেউ বা প্রাণপণে পড়্‌লো, কেউ বা ক'সে কাস্‌লে বিছানায় শুয়ে, এবং সাবু খাবো না, বলে আব্দার ধর্‌লে, এবং কেউ বা সারা সকালটা ভাই বোনেদের সঙ্গে ধুন্‌সুটি ক'রে পড়ার ভান ক'রে সময় কাটিয়ে ইস্কুলে গিয়ে হয় বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে রইলে, আর না হয়, হলের মাঝখানে "নিলডাউন্‌" হ'য়ে রইলে। বিকালে বাড়ী এসে ভালো ছেলেরা পড়্‌তে বস্‌লো। যে ছিল বিছানায় শুয়ে, সে তেমনি খক্‌খকিয়ে কাস্‌তে লাগ্‌লো, আর দুষ্টু ছেলেরা ধূলো মাখামাখি ক'রে পথে পথে দুষ্টুমি ক'রে বেড়ালে। আর মেয়েরা, যারা ইস্কুলে যায় তারা বাড়ীতে এসে বস্‌লো পুতুল খেল্‌তে! আর যারা ইস্কুলে যায় না, তাদের কিবা রাত আর কিবা দিন। সেই শোবার ঘর আর রান্নাঘর, আর বড় জোর এক টুক্‌রো ছাদ!

এদের ছেলেরা কি করে শুন্‌বে? সকালটি হয়, হাত-মুখ ধুয়ে সেজেগুজে, খেয়েদেয়ে হৈ হৈ ক'র্‌তে ক'র্‌তে যায় ইস্কুলে, যেন বা বায়স্কোপ বা সার্কাসেই চলেছে! সকাল ৯॥০ টায় এদের ইস্কুল। বেলা ১১টা পর্য্যন্ত এরা পড়্‌লো ক'সে, তখন আর কোনো দিকে মন নয়। ১১ টার সময় খেল্‌বার ছুটি, সব দলে দলে ছেলেমেয়ে বল নিয়ে ছুটোছুটী খেলা; আবার ১২টা থেকে একটা পর্য্যন্ত ক্লাস। একটার সময় লাঞ্চের ছুটি-দু'টো পর্য্যন্ত। আবার দুটো থেকে ক্লাস, বিকাল সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত। মোট দিনে এদের ক্লাস ৫ ঘণ্টা, আমাদেরও ত তাই। অথচ এদের কী সুন্দর বন্দোবস্ত! আর এরা কাজটাই বা কী করে! বিকালে এরা যায় পার্কে খেলা কর্‌তে, সন্ধ্যা ঠিক হবে, আর সবাই বাড়ী ফি'র্‌বে, এদের বাবার কাছে দেরী হবার জন্যে জবাব-দিহি ক'র্‌তে হয় না। আপনার চাড়ে এরা সব করে। পরের দিনের জন্যে যা কাজ

দিয়েছেন মাষ্টার মশাই সেগুলি সব করা চাই, এমনকি রাত জেগে। অথচ এদের মাষ্টার মশাই বেত নিয়ে ক্লাসে ঢোকেন না। পরের দিনের কাজগুলি সব বুঝিয়ে দিতে না পার্‌লে যে লজ্জাটি হ'বে, আর সবাই চেয়ে দেখ্‌বে, তার চেয়ে মরণও ভালো! আমাদের দেশ, বল্‌বে গরম! বেশ, তাই যদি হয়, তবে অন্য রকম বন্দোবস্ত করো! গরম কালে সকাল ৬৷৷॰ টায় ইস্কুল বসাও, ৬৷৷॰টা থেকে আট্‌টা পর্য্যন্ত চলুক ক্লাস্‌, তারপর ৮টা থেকে ৯৷৷॰টা পর্য্যন্ত কিছু খাওয়া আর খেলাধূলা হো'ক, তারপর আবার ক্লাস ১২টা পর্য্যন্ত। ১২ টার সময় ছেলেদের দাও খেতে; ১২টা থেকে তিনটে পর্য্যন্ত তাদের দাও ছুটি, অবশ্য ইস্কুলেরই মধ্যে. তাদের জন্যে বড় বড় পড়ার ঘর, লাইব্রেরী, খেলার মাঠ খুলে দাও। ৩টা থেকে আবার ৫টা পর্য্যন্ত ক্লাস ক'রে তাদের কিছু খেতে দিয়ে, নিয়ে যাও খেলার মাঠে; খুব ক'সে তারা খেলা করুক। তারপর পরের দিনের জন্যে তার কাজ দিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। এ সবের জন্যে অবশ্য কতকগুলো অভ্যাস একেবারে আগাগোড়া বদলে নিতে হবে। প্রথমতঃ, তাদের খাওয়া দাওয়ার কাজটা চলুক ইস্কুলেই, এক সন্ধ্যার খাওয়া ছাড়া। এক সঙ্গে ভাইবোনে হাত ধরাধরি করে বড় হওয়া, এক সঙ্গে খাওয়া দাওয়া, এর চেয়ে কি আর আনন্দ আছে! আদুরে ছেলেকে বেশী কিছু খাওয়াতে হ'লে তা অনায়াসে তাকে সন্ধার সময় মা খাওয়াতে পারেন। ইস্কুলে কোনো ফারাক্‌ হবে না, তা রাজার ছেলেই হোক্‌, আর উজিরের ছেলেই হোক্‌, আর ভিখারীর ছেলেই হোক্‌। অবশ্য স্বীকার করি, এই ধরণের ইস্কুল করতে হলে টাকা চাই অনেক। কিন্তু ধীরে সুস্থে হোক্‌, এমন তাড়াতাড়িই বা কি? বড় হয়ে যারা একদিন জাতকে সজীব করে তুল্‌বে সেই ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় কিছু টাকা ঢাল্‌তে হবে বই কি? কত হাজারো দিকে তো কত অপব্যয় হচ্ছে, সেগুলো কমিয়ে ফেল্লেই ক্রমে ক্রমে দেদার টাকা জুটে যাবে।

আজ তবে আসি।

দাদা।

আকাশপথের রাজা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

জলে কুমীর আছে, হাঙ্গর আছে, অক্টোপাস্‌ আছে; ডাঙ্গায় বাঘ, ভালুক, 'সিঙ্গি মামারা' আছেন; গাছেও সাপ থাকিতে পারে, কিন্তু আকাশের খোলা ময়দান একেবারে নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট। সেখানে একবার যাইতে পারিলে কেউ আর তোমাকে বাধা দিতে আসিবে না।

এয়ারোপ্লেন্‌ আক্রমণ করিল।

কিছুদিন আগেও লোকের এ বিশ্বাসটা ছিল। কিন্তু আকাশেও যে সব সময়ে নিস্তার নাই তা সেদিন এক সাহেব বাবাজী ঠেকিয়া শিখিয়াছেন।

খোস্‌ মেজাজে শিষ দিতে দিতে তিনি তাঁর সখের এয়ারোপ্লেন্‌ খানায় চাপিয়া একটু মেঘের রাজ্যে বেড়াইতেছিলেন—হঠাৎ কোথা হইতে শোঁ শোঁ শব্দে ঝড়ের মত আকাশ কাঁপাইয়া কে যেন তাঁহার পথ রুধিয়া দাঁড়াইল। সাহেব চম্‌কাইয়া দেখেন—এক বিরাট্‌ পাখী। কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা! যেমনি প্রকাণ্ড তার ডানা দু'টি, তেমনি ভীষণ তার নখ, আর তেমনি ধারাল তার ঠোঁট।

পাখার ঝাপ্‌টায়, নখের আঁচড়ে, ঠোঁটের ঠোকরে দেখিতে দেখিতে সেই 'সর্ব্বনেশে' পাখী এয়ারোপ্লেনের কল-কব্জা ভাঙ্গিয়া 'তছ্‌ নছ্‌' করিয়া ফেলিল। সাহেব কোন রকমে আধমরা অবস্থায় রক্তাক্ত দেহে প্যারাসুট লইয়া লাফাইয়া পড়িয়া প্রাণে বাঁচিলেন।

এই পাখী আর কেউ নয়, পাখীর রাজা ঈগল।

ঈগল পাখী তোমরা কেহই দেখ নাই, দেখা সম্ভবও নয়; কেননা পথে ঘাটে ত আর তাদের দেখা মেলেনা। তাদের দেখিতে হইলে তোমাকে যাইতে হইবে সেই উত্তরে—সমুদ্রের ধারে, গভীর জঙ্গলে কিংবা জন-মানবহীন পাহাড়ের চূড়ায়। সেখানে তাদেরই রাজত্ব,—আর কোনও জীবজন্তুর বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না।

ঈগল পাখী আবার নানা জাতের আছে। তার মধ্যে সামুদ্রিক ঈগলই বোধ হয় সব চাইতে বড়। ইহাদের এক একটার পাখাই হয় লম্বায় ৮।১০ ফিট। ইহারা সাঁতার কাটিতে পারেনা,—সমুদ্রের ধারে থাকে বলিয়া এই নাম। মাছ খাইতে ইহারা খুব ভালবাসে। মাছরাঙ্গার মত ছোঁ মারিয়া জলের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মাছ তুলিয়া লয়।

আর এক রকম ঈগল আছে—"সোণার ঈগল"। এগুলি দেখিতে ভারী চমৎকার, কিন্তু ভারী হিংস্র। সহজে ইহাদের সাক্ষাৎ পাইবার যো নাই। গভীর জঙ্গলের আড়ালে উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় ইহারা বাসা বাঁধে; শুধু শিকার-সংগ্রহের সময় নীচে নামিয়া আসে। ঈগলের শিকার বড় যে সে শিকার নয়। আমরা ছেলেবেলায় পড়িতাম—

"ইঁদুর ছানা ভয়ে মরে
ঈগল পাখী পাছে ধরে।"

কিন্তু ইঁদুর ছানা ত' ছার, বড় বড় ছাগল, ভেড়া, হরিণ পর্য্যন্ত ইহাদের হাত হইতে নিস্তার পায় না। কোন্‌ দূর আকাশ হইতে নিঃশব্দে লক্ষ্য করিতে করিতে বিদ্যুতের মত আসিয়া ইহারা শিকারের পিঠের ভিতর নখ বসাইয়া দেয় তারপর তাকে অনায়াসে তুলিয়া লইয়া নিরাপদ জায়গায় গিয়া দারুণ ঠোঁটের কামড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলে। বড় বড় হরিণ, ভেড়ার পাল আক্রমণ করিতেও তাদের কিছু মাত্র বাধে না। তবে সেখানে সুবিধা পাইলেই ইহারা কৌশলে কাজ আদায় করে।

সমস্ত পালের সাথে যুদ্ধ না করিয়া পাখার ঝাপ্‌টা মারিয়া মারিয়া ইহারা দলের একটা হরিণকে দল ছাড়া করিতে চেষ্টা করে। হরিণও ভয় পাইয়া দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞান হারাইয়া ছুটিতে ছুটিতে শীঘ্রই দল হইতে আলাদা হইয়া যায়। তখন আর ঈগলকে পায় কে?—কেননা দল ছাড়া একটা হরিণকে মারা তার কাছে কিছুই নয়।

কিন্তু এর চাইতেও বেশী বুদ্ধি খরচ করিয়া শিকার কাবু করিতে ঈগলকে দেখা গিয়াছে। একবার এক সাহেব শিকারী পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে শিকার করিতে গিয়াছেন। ঘুরিতে ঘুরিতে দূরবীণ দিয়া তিনি দেখিতে পাইলেন কিছু দূরে এক পাল হরিণ নির্ভাবনায় চরিয়া বেড়াইতেছে। সাহেব বন্দুক ঠিক করিয়া আগাইয়া যাইবেন কিনা ভাবিতেছেন—হঠাৎ দেখিলেন, হরিণগুলি খুব ভয় পাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ভেড়ার পালে ঈগল।

সাহেব ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, হরিণ গুলির উপর একটা বড় ঈগল পাখী নামিয়া আসিতেছে। ঈগলটা কাহাকেও আক্রমণ করিতেছে না, কিন্তু ঠিক মাথার উপর আসিয়া পাখার ঝাপটার তাড়া করিয়া

চলিয়াছে। সাহেব ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিলেন। একটু পরেই হরিণগুলি ছুটিতে ছুটিতে পাহাড়ের চূড়ার উপর একটা সংকীর্ণ পথের ভিতর আসিয়া পড়িল ;—পথটা এত সরু যে পাশাপাশি দু'টা হরিণ যাইবার উপায় নাই। যেই একটা হরিণ এই পথের ভিতর আসিয়া পড়িল, অমনি ঈগলটা তাহাকে আক্রমণ করিল। হরিণটা নিজেকে ছাড়াইবার জন্য লাফালাফি করিতে গেল, অমনি চূড়া হইতে ফস্কাইয়া ঢালু পাহাড়ের গা বাহিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া চুরমার। এ ব্যাপার যে ঘটিবে ঈগল তাহা আগেই জানিত। সে তখন নির্ঝঞ্ঝাটে নামিয়া আসিয়া শিকার তুলিয়া লইয়া চম্পট দিল।

ঈগল যে শুধু শিকারী হিসাবেই মস্ত বড় তা নয়, তার অদ্ভুত লক্ষ্য, শিকার তুলিয়া লইবার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা শুনিলেও অবাক্ হইতে হয়। তুমি হয়ত বন্দুক দিয়া একটা পাখী শিকার করিলে, পাখীটা আকাশ হইতে মাটীতে পড়িতেছে—কোন ঈগল যদি সেটা দেখিতে পায়, তবে পথের মধ্য হইতেই সেটা লুফিয়া লইয়া সে পালাইয়া যাইবে। উড়িতে উড়িতে পায়ের থাবা, কিংবা মুখ হইতে খাবার পড়িয়া গেলে প্রায় ঈগলেরই কিছু ক্ষতি হয় না ; সে খাবার মাটীতে পড়িবার আগেই সে বিদ্যুৎ-বেগে নীচে নামিয়া শূন্যে থাকিতে থাকিতেই সেটা আবার লুফিয়া লইতে পারে।

ঈগলের মত পেটুক পাখী বোধ হয় খুব কমই আছে। ক্ষুধা যেন তার বিশ্বগ্রাসী। বাচ্চা ঈগলগুলি—উড়িবার ক্ষমতাটুকু পর্য্যন্ত যাদের হয় নাই—তাদের পর্য্যন্ত নিত্যি ইঁদুর, খরগোস, পাখীর ছানা না হইলে পেট ভরেনা। আবার সে ক্ষুধাও জাগিয়া উঠে যখন তখন। সেই জন্য প্রায় সব ঈগলেরই বাসার কাছে একটা ভাঁড়ার থাকে। মা-ঈগল নানারকম শিকার সংগ্রহ করিয়া তার মধ্যে রাখিয়া যায়। মায়ের অনুপস্থিতিতে বাচ্চারা সেখানে গিয়া ইচ্ছা হইলেই পরিপাটী করিয়া জলযোগ করে।

ফ্র্যাঙ্ক্ বাক্‌ল্যাণ্ড্ নামে এক ভদ্রলোকের একটি পোষা ঈগল ছিল। সেটি সুবিধা পাইলে অনেক কিছুই ধরিয়া ধরিয়া মুখে পূরিত। একদিন সে সাহেবের একটি কুকুরকে ধরিয়া খাইতে সুরু করিল। আর একদিন দেখা গেল—সাহেবের পোষা বানরটিকেও সে খাইয়া শেষ করিয়াছে। বিড়াল যে সে কতগুলি খাইয়াছিল তার বোধ হয় হিসাব দেওয়াও কঠিন। একদিন লণ্ডন সহরে এই ঈগলটি কেমন করিয়া

বাঁধন কাটিয়া পালাইল ; কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করিয়া তারপর আকাশের কোথায় যে সে মিলাইয়া গেল—আর তার পাত্তা নাই। বাক্‌ল্যাণ্ড্ সাহেব কিন্তু তাঁর এই পেটুক পাখীটিকে চিনিতে ভুল করেন নাই। তিনি আর কিছু না করিয়া একটা মুরগী আনিয়া সেই ঈগলের থাকিবার ঘরটায় বাঁধিয়া রাখিলেন। যা ভাবা তাই, পেটুক ঈগল মুরগী দেখিয়া কি আর ঠিক থাকিতে পারে ? পরদিন সকালেই দেখা গেল সে আসিয়া চুপি চুপি মুরগীটিকে লইয়া সরিয়া পড়িবার মতলব করিতেছে। সাহেবও চালাক লোক—তিনি আগেই তৈরী ছিলেন, ঈগল আসামাত্র তাকে আট্‌কাইয়া ফেলিলেন। তারপর তাকে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

কিন্তু হিংস্রই হোক্, আর যাই হোক্, স্বজাতির প্রতি ভালবাসায় ঈগল পাখীর যুড়ি কমই আছে। একবার একদল লোক শেয়াল ধরিবার জন্য একটা ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। পরদিন দেখা গেল একটা ঈগল পাখী তার মধ্যে মরিয়া পড়িয়া আছে। ঈগলটার যে কোন রকম আঘাত লাগিয়াছিল তা নয়, না খাইয়াও সে মরে নাই, ফাঁদে আট্‌কাইয়া মনের দুঃখেই বোধ হয় তার মৃত্যু হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই—মরা ঈগলটার আশে পাশে অনেকগুলি খরগোস, পাখী প্রভৃতি খাবার ছড়ান। বন্ধুকে বিপদে পড়িতে দেখিয়া অন্যান্য ঈগলেরা প্রথমটা তাকে উদ্ধারের চেষ্টা করে, শেষে না পারিয়া তার খাওয়ার জন্য এগুলি দিয়া গিয়াছে।

শয়তানের-দ্বীপ

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

পেনাঙের সরকারী কীটতত্ত্ববিদ্ ডাঃ সূর্য্যকান্ত সরকারের রহস্যজনক অন্তর্ধানের কথা শোনে নি এমন লোক তখন সেখানে কেউ ছিল না। আমরা তখন ছোট, তবু আমাদের মনে আছে, কি গণ্ডগোলই না এই ব্যাপার নিয়ে হয়।

ডাঃ সরকার সাধারণ লোক হলে এতটা হৈ চৈ হয়ত নাও হতে পারত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবে তাঁর নাম তখন ইউরোপে পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেছে, কীট-পতঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর অদ্ভুত গবেষণা ও মতামত বিদেশের বড় বড় বৈজ্ঞানিককে বিস্মিত করে দিয়েছে।

সেই অসাধারণ লোকটি হঠাৎ এক রাত্রের মধ্যে একেবারে পৃথিবী থেকে যেন মুছে গেলেন! এ ব্যাপারে কে না স্তম্ভিত হয়!

অনেক রকম কথাই তখন এই ব্যাপার সম্বন্ধে শোনা গেছ্‌ল। পুলিশের লোক এ রহস্যের কিনারা কর্‌বার চেষ্টাও কম করেনি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ সরকারের কোন সন্ধানই কেউ পায়নি। ডাঃ সরকার অত্যন্ত সাদাসিধে লোক ছিলেন, বিজ্ঞানই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান, বাইরের লোকের সঙ্গে তিনি বড় মিশতেন না। সুতরাং তাঁর কোন শত্রু ছিল, এমন কথা মনে কর্‌বার কোন কারণ নেই।

সহরের প্রান্তে ছোট একটি বাড়ীতে নিজের পরীক্ষাগারে রাতদিন তিনি কাজ করতেন। যেদিন সকালবেলা জানা যায় যে ডাঃ সরকারের পাত্তা নেই, তার আগের রাত্রে পর্য্যন্ত তাঁর চাকর তাঁকে তাঁর লাবরেটরীতে কাজ কর্‌তে দেখেছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাঃ সরকারের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাগারের অধিকাংশ জিনিষও কেমন করে লোপাট হয়ে যায়। এই সূত্রটুকু ধরে পুলিশ অনেক দিকে অনুসন্ধান চালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু ডাঃ সরকারের সঙ্গে তাঁর পরীক্ষাগারের জিনিষ ও কাগজপত্র সরান'তে কার স্বার্থ থাক্‌তে পারে কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারে নি।

এই ব্যাপার নিয়ে যাঁরা তখন নিজেদের মতামত দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কীটতত্ত্বের অন্যতম পণ্ডিত প্রফেসার রসের কথাই একটু বিস্ময়কর। তিনি বলেন যে কিছুদিন থেকে ডাঃ সরকারের ভেতর উন্মাদ হবার লক্ষণ তিনি টের পেয়েছিলেন। ডাঃ সরকার নাকি এমন একটি অদ্ভুত মত সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেষ্টা করছিলেন, যা পাগল না হলে কেউ করেনা! সেই মত যে সত্য তাই করতেই তিনি ইদানীং ব্যস্ত ছিলেন। রস বলেন যে সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ডাঃ সরকার উন্মাদ অবস্থায় তাঁর সমস্ত ল্যাবরেটারির জিনিষ-পত্র নিয়ে জলে ডুবে বা ওই রকম কোন উপায়ে আত্মহত্যা করেছেন বলে তাঁর মনে হয়। ডাঃ সরকারের প্রতি তাঁর খ্যাতির জন্য প্রফেসর রসের একটু ঈর্ষ্যা ছিল জেনে লোকে এ মত অবশ্য হেসেই উড়িয়ে দেয়, কিন্তু তবুও পুলিশ ক'দিন কাছাকাছি নদীতে খোঁজাখুঁজি করে। অবশ্য তাতে কোন ফলই হয়নি। ডাঃ সরকার তাঁর অন্তর্ধানের আগে কি পরীক্ষা নিয়ে

ব্যস্ত ছিলেন তা জিজ্ঞাসা করায় রস্ কিন্তু বিশেষ কিছু বল্‌তে পারেন নি। ভাসা ভাসা ভাবে তিনি যা বলেন তাতে শুধু এইটুকু বোঝা যায় যে কীটদের শক্তি যে তাদের দেহের অনুপাতে মানুষ ও অন্যান্য যে কোন প্রাণীর চেয়ে বহুগুণ বেশী —এই তত্ত্বটুকু ধরে তিনি নাকি কি অসাধ্য-সাধন করতে চেষ্টা করছিলেন। রস্ এর বেশী আর কিছুই বলেন নি, বা বল্‌তে চান নি; এবং তার পর বহু বৎসর কেটে গেলেও ডাঃ সরকারের এ অন্তর্ধান-রহস্যের কোন সমাধানই হ'য় নি।

ডাঃ সরকারের সেই রহস্যজনক অন্তর্ধানের সঙ্গে আমার জীবনের খানিকটা অংশ জড়িয়ে আছে, তাই তাঁর কথা একটু বিশদ করে লিখ্‌লাম। যে কাহিনী আজ বল্‌তে চলেছি তা বিশ্বাস কর্‌বার সাহস বেশী লোকের আছে বলে আমার মনে হয় না। অনেক বার তাই লিখি লিখি করেও এ কাহিনী লিখ্‌তে সাহস করিনি। মানুষের অবজ্ঞার চেয়ে মানুষের উপহাসকেই আমার ভয় বেশী। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত উপহাস বিদ্রূপ উপেক্ষা করে এ কাহিনী লেখা উচিত বলেই আমি স্থির করেছি। ডাঃ সরকারের মহা সাধনার সামান্য একটু পরিচয় দেবার জন্য হাস্যাস্পদ হবার ভয় তুচ্ছ করা যায়।

সেবার আমেরিকার এক ফিল্ম কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা লাভের একটা কাজ পেয়ে গেছ্‌লাম। ব্রহ্মদেশের বনে জঙ্গলে ঘুরে অনেক জায়গায় আমি শিকার করে ফিরেছি। বুঝি তার জন্যে শিকারী হিসাবে একটু নামও ছিল। আমেরিক্যান্ কোম্পানী একেবারে খাস্ জঙ্গলের ভেতর গিয়ে সেখানকার জন্তুজানোয়ারের ছবি নিতে চান। তাই জন্যেই তাঁরা আমার সাহায্য চেয়ে ছিলেন।

ছোট একটি ষ্টিম লঞ্চে যাত্রী আমরা খালাসী সারেঙ বাদে মাত্র তিনজন। ফিল্ম কোম্পানীর ক্যামেরাম্যান, কোম্পানীর একজন প্রতিনিধি,—তিনিই ফিল্মের পরিচালক, আর আমি। চলেছিলাম সরু একটি নদী-পথ দিয়ে। সাধারণতঃ এ পথে ষ্টিম লঞ্চ চলে না। ষ্টিম লঞ্চ দূরে থাক, দেশী নৌকোও সে পথে ক্বচিৎ দেখা যায়। চারি ধারে ঘন জঙ্গল। সেখানে মানুষ বাস কর্‌তে পারে না।

ইতিমধ্যে দু এক জায়গায় আমরা নেমে ছবি তুলেছি, কিন্তু তেমন সফল-কাম হতে পারিনি। শিকার করা আর বুনো জানোয়ারের ফিল্ম তোলা এক কথা নয়।

কোন রকমে লুকিয়ে চুরিয়ে থেকে একটা তাগ করে গুলি কর্‌তে পারলেই শিকার সার্থক, কিন্তু ফিল্ম তুল্‌তে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হয়। জানোয়ারকে মারা চলবে না, এমন কি তাকে জান্‌তে দিলেও চল্‌বে না যে তার গতিবিধি কেউ লক্ষ্য করছে!—এ রকমটি হওয়া বড় শক্ত।

ছোট নদীটি ক্রমশঃ সমুদ্রের কাছে এগিয়ে যেতে যেতে চওড়া হয়ে আস্‌ছিল। খানিক বাদেই দেখা গেল বিশাল এক গাঙ্গের সঙ্গে সে গিয়ে মিলেছে। সমুদ্র তখনও দূরে কিন্তু পারাপারহীন জলের বহর দেখে সমুদ্র বলেই ভ্রম হয়। সেই কূল-হীন পারাবারের ভেতর মাঝে মাঝে এক একটি দ্বীপ—ঘন জঙ্গলে একেবারে আচ্ছন্ন। দ্বীপগুলিকে নেহাৎ ছোট বলা ঠিক নয়। লম্বায় চওড়ায় কোন কোনটা পাঁচ ছ' ক্রোশেরও ওপর। এম্‌নি একটি দ্বীপে আমরা লঞ্চ নোঙর করে সেখানে ছবি তুলব ঠিক করেছিলাম। দ্বীপগুলির সুবিধা অনেক। জন্তু-জানোয়ারের সেখানে অভাব নেই, অথচ চারিধার জলে ঘেরা হওয়ার দরুণ তাদের বাগে পাওয়ার সুবিধা হয়।

আমাদের ডান দিকে একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ দেখা গেল। দ্বীপটির গড়ন একটু অদ্ভুত। মানুষকে প্রবেশ কর্‌তে না দেবার জন্যই সে যেন পাহাড়ের দেয়াল তুলে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। দুদিকে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে ছোট একটি নদীর মত জলস্রোত দ্বীপের ভেতর গেছে। আমাদের ডিরেক্টার মিঃ নোব্‌ল ত দ্বীপটি দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠলেন। এই দ্বীপেই তিনি ছবি তুল্‌বেন তৎক্ষণাৎ ঠিক করে ফেল্‌লেন। সারেঙকে ডেকে তৎক্ষণাৎ সেই দ্বীপের মাঝেকার জলপথ দিয়ে লঞ্চ্ চালাতে তিনি আদেশ দিলেন।

কিন্তু সারেঙ আদেশ পেয়েও নড়ে না। আমরা আশ্চর্য্য হয়ে দেখ্‌লাম তার মুখ ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—"কি ব্যাপার হে?"

সে মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌লে—"আজ্ঞে ও শয়তানের দ্বীপে আমরা যেতে পারব না।"

এদেশের লোকেদের অনেক রকম কুসংস্কার ও ভূতুরে ভয়ের কথা

জানি কিন্তু গোটা একটা দ্বীপের প্রতি এমন ভয়ের কথা কখনও শুনিনি। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"শয়তানের দ্বীপ কি রকম?"

"আজ্ঞে গত দশ বছর ধরে এদেশের লোক ও দ্বীপের কাছে ঘেঁসে না—ওখানে শয়তান আছে!"

আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। বল্লাম "তা, থাক্, আমরা তাকেই খুঁজছি!"

কিন্তু সে নড়্‌ল না। ভীত মুখে বল্লে—"হাস্‌বেন না সাহেব; ওখানে যারা যায় কেউ ফেরে না।"

এবার মিঃ নোব্‌ল এই ছেলেমানুষী ভয়ে বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"ও সব বাজে কথা রাখ। লঞ্চ ওইখানেই নিয়ে যেতে হবে। আমার আদেশের ওপর কথা চলবে না।"

সারেঙ শুক্‌নো মুখে চলে গেল। কিন্তু তার খালাসীদের ভাব-গতিক দেখে মনে হল জীবনের আশা তারা এক রকম ত্যাগ করেই দিয়েছে। দু'ধারে খাড়া পাহাড়, তার মাঝখান দিয়ে খানিক দূর ষ্টীম-লঞ্চ চালিয়েই দেখা গেল পাহাড় ঢালু হয়ে এসেছে। সাম্‌নে সমতল দ্বীপ একেবারে দুর্ভেদ্য জঙ্গলে ঢাকা। সুবিধে মত একটা জায়গায় নেমে আমরা তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করে ফেল্‌লাম। তখনও সন্ধ্যা হতে ঘণ্টা খানেক বাকী আছে। আমাদের ক্যামেরা-ম্যান্ মিঃ লঙ্ বল্লেন "চলুন পাহাড়ে উঠে দ্বীপটা কত বড় দেখে আসি।" তাঁর প্রস্তাবে রাজী হয়ে বন্দুকটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়টি নিতান্ত কম উঁচু নয়, তবে ঢালু হওয়ায় উঠ্‌তে বেশী কষ্ট হল না। পাহাড়ের একেবারে উপরে উঠে দেখলাম যে দ্বীপটিকে সাম্‌নে থেকে যতখানি মনে করেছিলাম তার চেয়ে সেটা অনেক বড়। অত উঁচু পাহাড়ের ওপর থেকেও দ্বীপের অপর প্রান্ত ভালো করে দেখা গেল না। মেরগুই দ্বীপপুঞ্জের এইটি অন্যতম বড় দ্বীপ।

নেমে আস্‌তে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। সঙ্গে ভুল করে টর্চ্চ আনিনি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে অন্ধকার হয়ে গেলে পথ চিন্‌তে বিশেষ কষ্ট হবে বুঝে তাড়াতাড়ি চলেছি। এমন সময় মিঃ লঙ্ থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে বল্লেন—"ওকি!"

আমি তাঁর পেছন পেছন যাচ্ছিলাম, কিছু লক্ষ্য করিনি বল্লাম—"কি ?" মিঃ লঙ্ উদ্বিগ্ন মুখে বল্লেন—"আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমার মনে হল ওই দূরের ঝোপটার কাছ দিয়ে বিদ্যুৎ-বেগে একটা জানোয়ার চলে গেল।"

আমি এবার হেসে উঠে বল্লাম—"সারেঙের কথায় আপনিও দেখ্ছি ভড়্কে গেছেন ! জানোয়ার যাওয়া আর আশ্চর্য্য কি ! এ দ্বীপে একেবারে কোন জানোয়ার নেই ভেবেছিলেন নাকি ?"

মিঃ লঙ্ একটু অধৈর্য্য হয়ে বল্লেন—"না না, জানোয়ার শুধু নয়, অদ্ভুত রকমের জানোয়ার। এ রকম জানোয়ার আর কখনও দেখিনি।"

এবার আমি মনে মনে মিঃ লঙএর ভয়ে হাসলাম। তিনি লজ্জিত হবেন ভেবে মুখে শুধু বল্লাম—"আব্ছা আলোয় ভুল দেখেছেন।"

আবার আমরা এগিয়ে চল্লাম।

কিন্তু বিপদ্ সেদিন আমাদের ভাগ্যে ছিল। খানিক দূর যেতেই একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য্য অস্ত যাওয়ার দরুণ একটু আগে থাক্তেই যে এখানে অন্ধকার হয়ে যাবে, এ খেয়াল আমাদের হয়নি। শুধু অন্ধকার নয়, মনে হল পথও আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এই নতুন জায়গায় জঙ্গলের মাঝে পথ হারিয়ে ফেলা বিশেষ ভয়ের কথা।

মিঃ লঙ্ ভীত মুখে বল্লেন—"আমার কিন্তু ভালো ঠেক্ছে না। অজানা জঙ্গলে বেঘোরে প্রাণটা যাবে নাকি ?"

আমি তাঁকে কি সাহস দেব বুঝতে পারলাম না। তাঁবুতে খবর জানাবার জন্যে দুবার বন্দুকের আওয়াজ কর্লাম। কিন্তু এই অন্ধকার রাত্রে শুধু সে আওয়াজ ধরে আমাদের খোঁজ করা অসাধ্য। তা ছাড়া এ বন্দুকের আওয়াজকে বিপদের ইঙ্গিত বলে তারা নাও ভাব্তে পারেন ! আব্ছা অন্ধকারে কোন রকমে দিক্ নির্ণয় করবার চেষ্টা করে যেতে লাগ্লাম।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে আমি পড়ে গেলাম। পড়ে গিয়ে অবাক্ হয়ে দেখ্লাম, আমার সামনে লোহার তারের বেড়া। বেড়া অনেক জায়গাতেই ধূলিসাৎ হয়েছে; এ দ্বীপে লোহার তারের বেড়া এল কোথা থেকে কিছুই বুঝ্তে পার্লাম না। সামনে

চেয়ে অন্ধকারে ঠাহর করে দেখে আরো আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। অত্যন্ত জীর্ণ একটি কাঠের বাড়ী কোন রকমে খাড়া হয়ে আছে দেখা গেল।

মিঃ লঙ্ বল্লেন "এ দ্বীপে ত জনমনিষ্যি থাকে না, তা হলে এ কাঠের বাড়ী এল কোথা থেকে।'

বল্লাম "যেখান থেকেই আসুক, আপাততঃ ভগবানের দান বলে গ্রহণ কর্তে আপত্তি নেই। এই অন্ধকারে তাঁবুতে ফিরে যাবার বৃথা চেষ্টা না করে এইখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্। অনেকটা নিরাপদ্ হওয়া যাবে।"

তারের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা সেই জীর্ণ বাড়ীটিতে গেলাম। বাড়ী বল্তে তার আর কিছুই নেই, তবু বন্য শ্বাপদের আক্রমণ থেকে রাতের মত আত্মরক্ষা করবার জন্যে এর চেয়ে ভাল আশ্রয় মেলা ভার। ঠিক হল পালা করে আমরা সারা রাত জাগ্ব। ছড়ানো কাঠ-কুঠরো জোগাড় করে আগুনও জ্বালাবার বন্দোবস্ত করা গেল। ঠিক ছিল, প্রথমে মিঃ লঙ্ অর্দ্ধেক রাত পাহারা দেবেন এবং বাকী রাত পাহারা দেব আমি। কিন্তু আলো জ্বেলে যা দেখ্লাম তাতে আর চোখে ঘুম কারো রইল না। কাঠের ঘরটি প্রকাণ্ড। আমরা তার যে কোণে আশ্রয় নিয়েছিলাম সে কোণ থেকে আমাদের অগ্নিকুণ্ডের সামান্য আলোয় সমস্ত ঘর ভালো করে দেখা যায় না, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে তবু বুঝতে পারলাম সাধারণ ঘর এটি নয়। অত্যন্ত ভগ্ন হলেও সে ঘরটির চারিধারে বড় বড় তাক, এক ধারে একটি বড় টেবিল। তাক ও টেবিলের ওপর অসংখ্য যন্ত্রপাতি আর কাচের শিশি-বোতল ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম। অবাক্ হয়ে তাই দেখ্ছি এমন সময়ে মিঃ লঙ্ একদিকের কাগজ-পত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটি চমৎকার বাঁধান খাতা বার করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন—"দেখুন ত, এর ভেতর থেকে এ বাড়ীর রহস্যের কোন সন্ধান পাওয়া যায় কিনা ! কোন্ দেশী ভাষায় লেখা বলে মনে হচ্ছে ?"

খাতাটির ওপর বড় বড় অক্ষরে একটি নাম লেখা। সে লেখা দেখে স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাংলা হরফে পড়লাম "ডায়েরি—সূর্য্যকান্ত সরকার।"

প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাট্লে অধীর আগ্রহে খাতাটা খুলে ফেল্লাম। কিন্তু পড়া আর হল না। দরজার কাছে সহসা যে হুঙ্কার শুনলাম তাতে বুকের রক্ত পর্য্যন্ত

হিম হয়ে গেল। দরজায় বিশাল আকারের একটি কেঁদো বাঘ। বাঘেরা এই রকম পুরাতন ভাঙ্গা বাড়ীতে আস্তানা কখন কখন পেতে থাকে জানতাম, কিন্তু এই বিশেষ বাড়ীটি যে কোন একটি ব্যাঘ্রের বর্ত্তমান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছে তা ভাবিনি। বাঘের গর্জ্জন শুনে বোঝা গেল তাঁর গৃহে অনধিকার প্রবেশ তিনি মোটেই পছন্দ করেন নি।

কোন দিকে পালাবার পথ নেই। বন্দুক দুটোও যেখানে শোবার বন্দোবস্ত করেছিলাম সেখানে রেখে এসেছি। এ বিপদ্ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায়ই দেখ্‌তে পেলেম না। একেবারে নিরুপায় হয়ে বাঘের হাতে প্রাণ দিতে হবে জেনে ভয়ের চেয়ে আফশোষই হচ্ছিল বেশী। আর বেশী দেরী নেই, বাঘ আমাদের ওপর লাফ দিল বলে।

এমন সময়ে এক নিমেষের মধ্যে এমন একটি কাণ্ড ঘটে গেল যা ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। বাঘের হাত থেকে আমরা রক্ষা পেলাম, কিন্তু যে ভাবে রক্ষা পেলাম তাতে আতঙ্ক আমাদের দশগুণ বেড়ে গেল বই কম্‌ল না।

বাঘের হুঙ্কার শুনেছি, আহত বাঘের ক্রুদ্ধ চীৎকার শুনেছি, কিন্তু বাঘের গলা থেকে যে ভীত আর্ত্তনাদের মত আওয়াজ বেরুতে পারে এ কখনও কল্পনাও করিনি। আশ্চর্য্য ব্যাপার। দরজা থেকে বাঘটা অদ্ভুত এক ভয়ের শব্দ করে হঠাৎ মনে হল যেন পালাবার চেষ্টা করছে।

পর মুহূর্ত্তেই যে ব্যাপারটি ঘট্‌ল, অতি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নেও তেমন ব্যাপার বোধ হয় কেউ দেখেনি। বাইরে কোথা থেকে অদ্ভুত আকারের একটা হিংস্র জানোয়ার বাঘটার ঘাড়ের ওপর লাফ দিয়ে এসে পড়ল। সে জানোয়ারের ভীষণ হিংস্রমূর্ত্তি বর্ণনার অতীত। তখন গোণবার সময় নয়, তবু আন্দাজে মনে হল গোটা আষ্টেক তার পা হবে, আর তার কুৎসিৎ বিপুল দেহের সামনে প্রকাণ্ড একটি হিংস্র মুখ। চোখ-গুলো তার মাথার ওপর বড় বড় দুটো ইলেকট্রিক বাল্‌বের মত জ্বলছে। মনে হল সে চোখে কুটিল হিংসার যে রূপ দেখ্‌লাম পৃথিবীর কোন পশুতে তা সম্ভব ভাবিনি। সব চেয়ে আশ্চর্য্য সে জানোয়ারের শক্তি। অতবড় একটা বিশাল বাঘকে ঠিক ইঁদুর-ছানার মত সে ঝাঁকুনি দিয়ে মুখে তুলে নিল। তারপর চক্ষের নিমেষে আমাদের স্তম্ভিত

দৃষ্টির সাম্‌নে এক লাফে তাকে অতি সহজে বয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বাঘটার কাতর চীৎকার তখনও শোনা যাচ্ছে। কতক্ষণ যে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম বল্‌তে

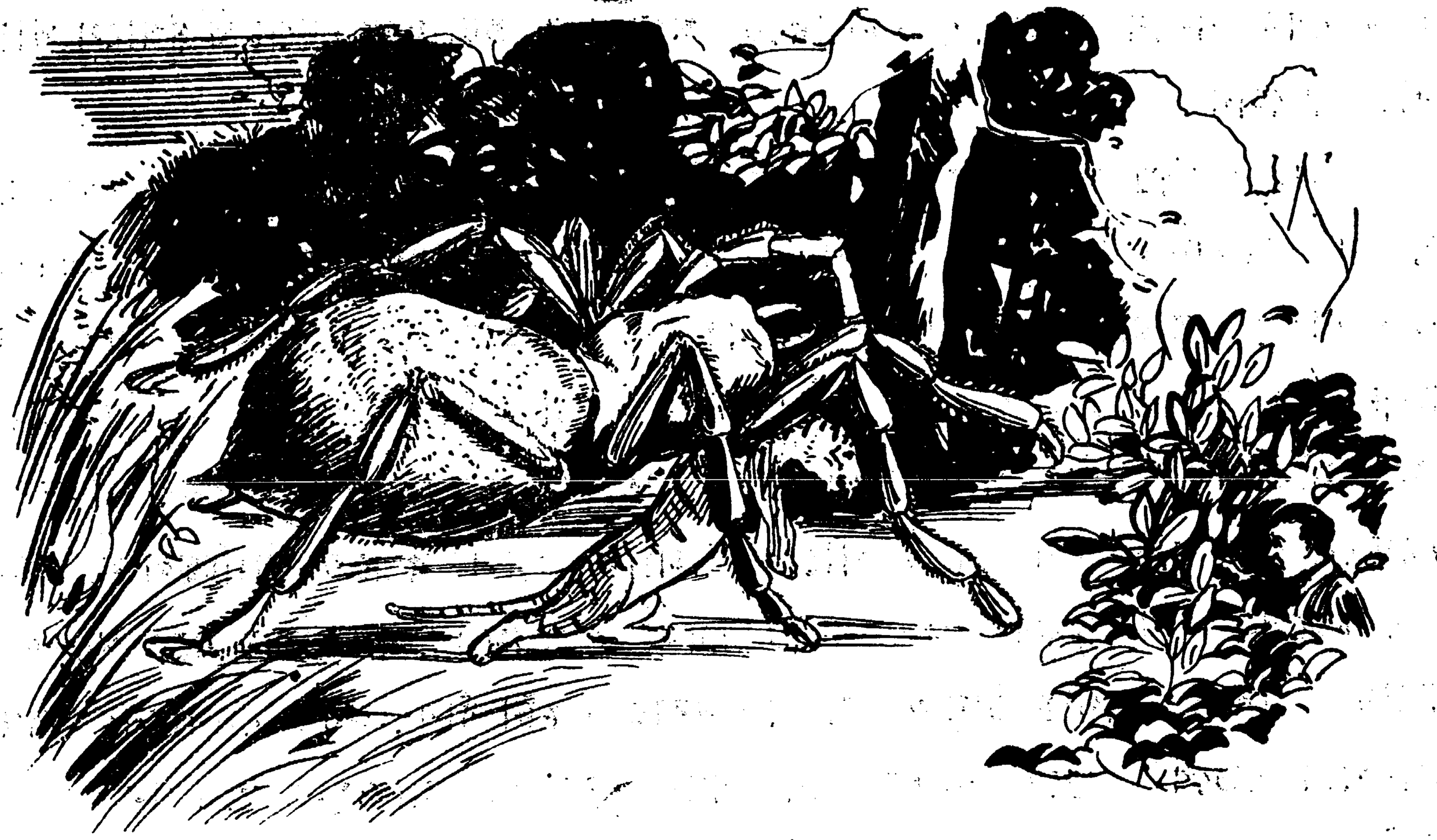

বাঘের ওপর…পড়্‌ল।

পারি না। সচেতন হয়ে দেখ্‌লাম মিঃ লঙ্‌ মূর্চ্ছা গেছেন। অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান ফেরালাম।

তারপর সে রাত যে কি কষ্টে কাটিয়েছি বলতে পারি না। এই ভয়ঙ্কর দ্বীপে দীর্ঘরাতের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি মনে হচ্ছিল আর কাটবে না।

ভোর হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কোন রকমে আমাদের তাঁবুতে না পোঁছোতে পার্‌লে আর উপায় নেই। সেখানেও সকলকে এই ভয়ঙ্কর জানোয়ার সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া দরকার। তাঁবু কোন্ দিকে হবে ঠিক জানি না, তবু দক্ষিণ দিকে সোজা গেলে নদীটি মিল্‌বে এবং নদী ধরে গেলে তাঁবু পাওয়া শক্ত হবে না জেনে সেই দিকেই চল্লাম। চলা অবশ্য সোজা নয়। গভীর জঙ্গলের প্রতি পদে বাধা। দিনের আলোতেও তার অধিকাংশ জায়গা অন্ধকার। সেই জানোয়ারের কথা মনে করে চারিদিকে চোখ রেখে অতি সাবধানে এগুতে হচ্ছিল। একটা ব্যাপার কাল থেকে আমার মনে হয়েছে। এ দ্বীপে এ পর্য্যন্ত ঐ বাঘ ছাড়া

সাধারণ কোন জানোয়ার এ পর্য্যন্ত চোখে পড়েনি ; এ ভারী আশ্চর্য্যের কথা। এমন কি একটা পাখীর গলাও ভোরের বেলা শুনতে পাইনি। লঙ্‌কে সেই কথাটা বল্‌ছি এমন সময়ে তিনি হেঁচকা দিয়ে আমার হাতটা ধরে টেনে ঊর্দ্ধশ্বাসে খানিকটা দৌড়ে গেলেন।

অবাক্ হয়ে বল্লাম—"ব্যাপার কি ?" তিনি বল্লেন "দেখুন"। এইবার দেখ্‌তে পেলাম। ছোটখাট একটি পিপের মত মোটা ও হাত দশেক লম্বা একটি অদ্ভুত জানোয়ার ! সারা গায়ে তার সজারুর মত বড় বড় তীক্ষ্ণ কাঁটা। আর একটু হলেই আমি সে জানোয়ারটার গায়ের ওপর গিয়ে পড়েছিলাম। অতি নিঃশব্দ তার চলা, এবং সৌভাগ্যের বিষয় গতি তার মৃদু। তার চল্‌বার ভঙ্গী অনেকটা কেন্নো বা শুঁয়োপোকার মত বলা যেতে পারে। আমি গুলি করতে যাচ্ছিলাম, মিঃ লঙ বারণ করলেন। কিছুক্ষণ বাদে নদীর দেখা পেলাম। সে নদী ধরে অনেক দূরও গেলাম। কিন্তু কোথায় তাঁবু ? সামনে নদীর একটা বাঁক, হয়ত সেখানেই সঙ্গীদের দেখা পাব ভেবে এগুতে যাচ্ছি এমন সময় বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। একটা-আধটা নয়, অনেকগুলি বন্দুকের একসঙ্গে অবিশ্রান্ত আওয়াজ। কি ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। এ ত রীতিমত যুদ্ধের বন্দুক ছোঁড়া বলে মনে হচ্ছে ! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম।

নদীর বাঁক ফির্‌তেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে নিজেদের চোখকে প্রথমতঃ বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হল না। আমাদের তাঁবুগুলির ওপর প্রচণ্ড তুফান বয়ে গেলেও বোধ হয় তাদের অত দুর্দ্দশা হত না। সেগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে আছে, আর সেই জায়গায় একটি দুটি নয়, গোটা দশেক সেই হিংস্র জানোয়ার উন্মত্ত হয়ে সাম্‌নের দিকে একবার এগিয়ে যাচ্ছে, আবার গুলির শব্দে অসম্ভব লাফ দিয়ে পেছিয়ে আস্‌ছে। অতবড় একটা জানোয়ারের পক্ষে যে ওরকম লাফ দেওয়া সম্ভব চোখে না দেখ্‌লে তা বিশ্বাস করা কঠিন। নদীর ধারেই একটা উঁচু পাথরের ঢিবি। তারই কাছে আমাদের ষ্টিম লঞ্চের সবাই দেখ্‌লাম জড় হয়ে কোন রকমে বন্দুক ছুঁড়ে আত্মরক্ষা কর্‌ছে, কিন্তু বেশীক্ষণ তারা তা পার্‌বে বলে মনে হল না ! হিংস্র জানোয়ারদের গতি বিদ্যুতের মত দ্রুত। তাদের তাগ্ করে গুলি করা কঠিন।

আমাদের লোকেদের কাছে যা গুলি-বারুদ আছে তা ফুরিয়ে যেতে আর কতক্ষণ ? তার পরে কি যে হবে কল্পনায় বুঝে শিউরে উঠলাম। কোন উপায়ই কি আমাদের রক্ষা পাবার নেই ? ষ্টিম লঞ্চটা নদীতে নোঙর ফেলা আছে। তাতে পৌঁছোলে হয়ত রক্ষা পাওয়া যায় কিন্তু ওই জানোয়ারদের ভেতর দিয়ে কে সেখানে যাবে ! মরিয়া হয়ে একবার ঠিক করলাম যে পেছন থেকে ওই জানোয়ারগুলোকে গুলি করবার চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে কি ফলই বা হবে ? গুলি আমাদের নিজেদের লোকের গায়ও তো লাগতে পারে ! হঠাৎ মনে হল একটি মাত্র উপায় এখনো আছে। তাতে ফল হবে কিনা বলা যায় না কিন্তু শেষ চেষ্টা একবার করা উচিত। মিঃ লঙ্‌কে ইঙ্গিত করে আমি সন্তর্পণে নদীর ধারে গিয়ে নামলাম। মিঃ লঙ অবাক হয়ে হয়ে বল্লেন, "কি করছেন কি ?" বল্লাম—"কথা বলবেন না, বন্দুকটা এক হাতে তুলে ধরে সাঁতরে আমাদের ষ্টিম লঞ্চ ধরতে হবে।" মিঃ লঙ বুঝলেন কিনা জানিনা কিন্তু নীরবে জলে নামলেন। যতদূর নিঃশব্দে পারা যায় সাঁতরে গিয়ে আমরা লঞ্চের কাছি ধরলাম। তারপর সন্তর্পণে ওপরে উঠে বল্লাম—"চালাতে জানেন মিঃ লঙ ?"

বিপদের ওপর বিপদ মিঃ লঙ বল্লেন—"জানি একটু আধটু কিন্তু আগে আগুন দিয়ে ষ্টিম তৈরী করতে হবে যে এ কথাটা আমার খেয়ালেই আসেনি। বল্লাম, "কতক্ষণ লাগবে।" লঙ বল্লেন "ঘণ্টাখানেকের কম ত নয়।"

ঘণ্টা খানেক অনেক দীর্ঘ সময়। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের লোকেরা বুঝতে পার'বে কিনা জানিনা। কিন্তু তখন ও ছাড়া আর উপায় নেই।

সেদিন যে ভাবে কাজ করেছি এখনও মনে পড়লে ভয় হয়। ষ্টিম লঞ্চটি একেবারে নদীর ধারে বাঁধা। যে কোন মুহূর্ত্তে একটা জানোয়ার এসে ওপরে উঠতে পারে। ওদিকে প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের লোকেদের গুলি বারুদ ফুরিয়ে আসছে !

কতক্ষণ বাদে যে ষ্টিম তৈয়ারী হল বলতে পারি না। কিন্তু তখন আগুনের তাতে অনভ্যস্ত কাজে আমাদের সমস্ত শরীর পুড়ে যাচ্ছে মনে হচ্ছিল। মিঃ লঙ লঞ্চটি চালিয়ে দিয়েই ভোঁ দিলেন। আমি ওপরে এসে একটা নিশান দুলিয়ে

চেঁচিয়ে বল্লাম—"তৈরী থাক সবাই; আমরা লঞ্চ নিয়ে যাবামাত্র লাফিয়ে উঠতে হবে।"

আমাদের লোকেরা প্রথম ষ্টিম লঞ্চের ভোঁ শুনে ত অবাক্। তারপর সবাই উল্লাসে চীৎকার করে উঠল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই একটা জানোয়ার একেবারে তাদের মাঝে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। মিঃ নোব্ল দেখলাম বন্দুক ছুঁড়লেন। কিন্তু জানোয়ারটা এলিয়ে মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে লোকটিকে সে ধরেছিল সেও মাটিতে লতিয়ে পড়েছে—এমনি ও জানোয়ারের কামড়ের জোর! এ ব্যাপারে বোঝা গেল বিপদ আমাদের এখনো শেষ হয়নি।

ষ্টিম লঞ্চ তাদের কাছে নিয়ে ভেড়াতেই খালাসীর দল ত একেবারে উন্মাদের মত এসে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। আশ্চর্য্য মিঃ নোব্লের মহত্ত্ব। শিকার পালায় দেখে জানোয়ার গুলো তখন মরিয়া হয়ে চারিদিকে অতি কাছে এসে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তাদের এক্‌টা না একটা লাফিয়ে আমাদের লোকেদের ওপর পড়বার চেষ্টা করছিল ও শুধু বন্দুকের আওয়াজেই ভয় পেয়ে ফিরে যাচ্ছিল। মিঃ নোবল কিন্তু সকলে না উঠা পর্য্যন্ত সমানে দাঁড়িয়ে তাদের রুখলেন।

তার পর সকলে উঠার পর লাফিয়ে এসে ষ্টিমারে উঠে বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে বল্লেন—"গুলি শেষ হয়ে গেছে, আর এক মিনিট দেরী হলে আমরা কেউ বাঁচতাম না!" ষ্টীমার তখন পুরো দমে নদীর মাঝে এগিয়ে চলেছে। জানোরগুলো তীরের কাছে এসে ভীড় করে দাঁড়িয়ে। এখনো তাদের সেই হিংস্র দৃষ্টি মনে করলে আমার আতঙ্ক হয়। বিপদ তখনও কিন্তু শেষ হয়নি। হঠাৎ একটি জানোয়ার উন্মত্ত হয়ে লাফিয়ে একেবারে আমাদের লঞ্চের ওপর এসে পড়ল এবং চক্ষের নিমেষে একটি খালাসীকে তুলে নিয়ে ষ্টীমার থেকে নদীর পাড়ের সেই প্রায় ত্রিশ গজ ব্যবধান অনায়াসে লাফিয়ে চলে গেল। বন্দুক তোলবার অবসর পর্য্যন্ত আমি পেলাম না।

দু'দুজন খালাসীকে সেবার এমনি করে হারিয়ে আমরা পরিত্রাণ পেলাম।

আমাদের প্রথম কথাবার্ত্তা হল সে দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যখন আমরা বহু দূরে

নদীতে গিয়ে পড়েছি। জান্‌তে পার্‌লাম যে ভোর বেলাই এই অদ্ভুত জানোয়ার আমাদের তাঁবু আক্রমণ করে, এবং একটিকে ঠেকাতে না ঠেকাতে দশটি এসে জড় হয়। তার পরে কিভাবে সবাই লঞ্চে না যেতে পেরে ওই পাথরের ঢিবির কাছে আশ্রয় নেয় সে কথাও শুন্‌লাম। মিঃ নোব্‌ল এবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—"কিন্তু ওকি জানোয়ার বল্‌তে পার মিঃ বোস্? পৃথিবীর কোন শিকারীর কাছে এ জানোয়ারের কথা ত শোনা যায় নি!"

হঠাৎ মিঃ লঙ্‌ তাঁর পকেট থেকে একটা খাতা বার করে বল্লেন—"বোধ হয় এই খাতায় এ রহস্যের সমাধান হতে পারে।"

দেখলাম এই সেই 'সূর্য্যকান্ত সরকারের ডায়েরি' এতক্ষণের উত্তেজনায় এ খাতার কথা ভুলেই গেছ্‌লাম। তাড়াতাড়ি সে খাতা লঙের হাত থেকে টেনে নিয়ে সেইখানেই পড়্‌তে সুরু কর্‌লাম। সে বৃহৎ খাতার সব কথা জানাবার এ জায়গা নয়। হয়ত কোনদিন সে লেখা আমি প্রকাশ করতেও পারি। শুধু যে অদ্ভুত কথা সেই খাতা থেকে প্রথম আমরা জান্‌তে পারলাম সেই টুকুই জানাব।

পৃথিবীর যে হিংস্রতম জানোয়ারের হাত থেকে আমরা সবে পরিত্রাণ পেয়ে এসেছি তা অসম্ভব আকারের মাকড়শা।

ডাঃ সরকারের অন্তর্ধান রহস্যও সেই খাতার দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি নিজের ইচ্ছাতেই তাঁর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সুবিধা হবে বলে একদিন গোপনে একটি লঞ্চ ভাড়া করে তাঁর সমস্ত লেবরেটারির জিনিষপত্র সমেত এই নির্জ্জন দ্বীপে অজ্ঞাত-বাস করতে আসেন। নিজের পরীক্ষা সমাপ্ত করে একদিন আবার লোকালয়ে তাঁর ফিরে যাবার ইচ্ছে ছিল। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়নি। যে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা তিনি কর্‌তে চেয়েছিলেন তা সফল হওয়ার দরুণই তিনি প্রাণ হারিয়েছেন।

কীট-পতঙ্গের অসাধারণ শক্তি লক্ষ্য করে তাঁর মনে হয় যে এই কীট-পতঙ্গকে কোন উপায়ে আকারে বৃহৎ কর্‌তে পারলে, মানুষ অন্যান্য পালিত পশুদের কাছ থেকে যা কাজ পায় তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ পেতে পারে। তাদের আকার বাড়াবার গোপন উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। ওই দ্বীপের যে রাক্ষুসে মাকড়শা ও শুঁয়োপোকা আমরা দেখেছি সে তাঁরই সৃষ্টি। এ ছাড়া আরও অনেকগুলি

কীট নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেন। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যের বিষয় আমরা সে দ্বীপে তাদের দেখা পাইনি। ওই বৃহদাকারের হিংস্র মাকড়শার হাতেই শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রাণ যায়। বিজ্ঞানের সাধনায় যাঁরা নিস্বার্থ ভাবে নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের ভেতর ডাঃ সরকারের নামও অমর হয়ে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

এদেশের মহাপণ্ডিত

কোন দেশের লোকেদের মধ্যে বিদ্যায় সব চাইতে সেরা কে, এমন একটা প্রশ্ন করিয়া বসিলে ধাঁ করিয়া তার জবাব দেওয়া খুবই শক্ত, অনেক বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া তবে উত্তর করিতে হয়। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় বল দেখি, ভারতবর্ষের মধ্যে সব চাইতে কে বড় বিদ্বান্, তবে কিন্তু সে কথার উত্তর দিতে এতটুকু ভাবনার দরকার হয় না, কেননা এদেশে এম্‌নি একটী অদ্ভুত রকমের পণ্ডিত আছেন, যাঁর পাশে অপর কেহই দাঁড়াইতে পারেন না। শুধু ভারতবর্ষ কেন, এমন সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত পৃথিবীর আর কোন দেশেও আছে কিনা, তাও বেশ একটু সন্দেহের কথা। থাকিলেও দু'চার জনের বেশী যে নাই, এ কথা সুনিশ্চিত। এ কথাটা লিখিতে আমাদের আরও গর্ব্ব হইতেছে এই বলিয়া যে আমাদের মত তিনিও এই বাংলা দেশেরই ছেলে! কার কথা বলিতেছি বুঝিলে কি?—স্তর ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কথা।

কোন একটা বিশেষ বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য আছে এমন লোক অনেক সময়েই দেখা যায়, কিন্তু সব বিদ্যাতেই সমান ধুরন্ধর, এহেন "বাঘা" লোক চোখে পড়ে কমই। আমাদের ব্রজেন্দ্রনাথ এই ধরণেরই পণ্ডিত। যে কোন বিষয় নিয়া তাঁর সঙ্গে গিয়া যে কেউ আলাপে বসুক—ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস, দর্শন, অঙ্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, প্রত্নতত্ব, কলাবিদ্যা, নৃতত্ত্ব—দেখিতে পাইবে তিনি যেন একটী জীবন্ত সমুদ্র, জ্ঞানের তাঁর কোন কূল-কিনারাই যেন নাই। ফরাসী, জার্ম্মাণ, ল্যাটিন, আরবি, ফারসী সমস্ত ভাষাতেই তিনি ব্যুৎপন্ন।

আজ আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কয়েকটী ছোট ছোট গল্প তোমাদের বলিব, সেগুলি শুনিয়া তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে, সাধারণ পণ্ডিতে এবং ব্রজেন্দ্রনাথ শীলে কোথায় তফাৎ, এবং কত খানি তফাৎ!

'রামধনু'র পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে অনেকে হয় তো ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাশে পড়। কেউ কেউ হয়তো লেখাপড়ায় বেশ ভাল, ক্লাশে বরাবর ফার্ষ্ট্ থাক। ঠিক তোমাদেরই মত এই বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ কতখানি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তা নীচের গল্পটী হইতে টের পাইবে। তোমাদের এই বয়সে যত খানি জানা আছে, সেই সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের এই বয়সে যত খানি জানা ছিল, মনে মনে দুইয়ের একটা তুলনা করিয়া দেখ দেখি!

গল্পটা এই—বাংলা দেশের এখনকার একজন নাম-জাদা পণ্ডিত তাঁর নিজের ছাত্রাবস্থায় একবার ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। আলাপ-পরিচয় চলিতে চলিতে ক্রমে ছেলেদের কী ভাবে পড়াশুনা করা উচিত, সেই কথা উঠিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমার পড়ার নিয়ম ছিল, এক একটা বিষয় ধর্‌তাম, আর সে বিষয়ে যত কিছু জান্‌বার আছে, যত কিছু বই আছে, সব পড়ে শেষ করে দিয়ে তারপর সেটা রেখে অন্য আর একটা বিষয় ধর্‌তাম্। ইস্কুলের ফার্ষ্ট্ ক্লাশে যখন পড়ি তখনই এম্‌নি ভাবে ইংরাজী আর অঙ্কের শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে ও দুটো বিদ্যে সারা করে দিয়েছিলাম।"

শুনিলে একবার কথা খানা! ইস্কুলে থাকিতেই ভদ্রলোক কিনা ইংরাজী আর অঙ্ক মানুষের যতখানি জানার—বোধ করি এম-এর পাঠ্যেরও উপরে—পড়িয়া শুনিয়া সাবাড় করিয়া দিয়াদিলেন। মাথাটার মধ্যে কি আছে দেখিতে ইচ্ছা করে না?

দুনিয়া শুদ্ধ লোক যে যে বিষয়টা ভাল জানে সেই বিষয়েই এম্-এ পরীক্ষা দেয়—এই তো তোমাদের জানা আছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এম-এ দিলেন দর্শন-শাস্ত্রে। তার মানে এ নয় যে অন্যান্য বিষয় তিনি দর্শন-শাস্ত্র অপেক্ষা কিছু কম জানিতেন। আসল কারণ, আর আর সমস্ত বিষয় তিনি তখন পড়িয়া শুনিয়া সাবাড় করিয়া দিয়াছেন। এম্-এ পড়ার সময় চর্চ্চা করিতে ছিলেন দর্শন-শাস্ত্রটার। একটা বিষয়ে এম-এ দিতে হইবে, কাজেই সে বিষয়টাতেই দিয়া দিলেন। পরীক্ষায় কত হইয়া-

ছিলেন? তাঁর মত ছাত্র কোন পরীক্ষায় কখনো প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইবে এ কথা কি কেউ মনে আনিতে পারে?

"নিজের বিষয়" বলিতে আমরা যা বুঝি সে হিসাবে অঙ্ক তাঁর নিজের বিষয় নয়। তবুও হঠাৎ একবার খেয়াল চাপায় তিনি উচ্চ অঙ্ক-শাস্ত্র সম্বন্ধে এমনই একখানা গবেষণামূলক বই লিখিয়া ফেলিলেন, যে তা দেখিয়া স্যর আশুতোষ, যাঁর সমকক্ষ অঙ্কের পণ্ডিত (শুধু অঙ্ক নয়, অন্যান্য বিষয়ের পণ্ডিতও) সচরাচর খুব কমই মেলে, তিনি পর্য্যন্ত নির্ব্বিচারে মত দিলেন যে সে সব অঙ্ক বুঝিবার মত লোক ভারতবর্ষে তো দূরের কথা পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও খুব কমই আছে।

এইবার রসায়ণ-শাস্ত্রে এই অদ্ভুত লোকটীর কি পরিমাণ জ্ঞান, শোন। প্রাচীন হিন্দুরা রসায়ণে কতখানি উন্নতি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একখানা অতি চমৎকার বই লিখিয়াছেন। নানা দেশে সে বইখানার খুব আদর হইয়াছে। আচার্য্যদেবের এ বইখানার সব চাইতে ভাল এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ অংশটুকু কিন্তু লিখিয়া দিয়াছেন স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

ব্রজেন্দ্রনাথ তখন লণ্ডনে, একদিন তাঁর 'ইষ্ট্-এণ্ড্' দেখিবার সখ্ হইল। সহরের পূব দিক্‌টার নাম ইষ্ট্ এণ্ড। লণ্ডন সহরটা কলিকাতার মত এ কালের সহর নয়, বহু দিনকার পুরানো, তার রাস্তা-ঘাট, পুরানো বাড়ী, প্রভৃতির সাথে ইতিহাসের অনেক ঘটনা জড়িত। কাজেই লণ্ডনটাকে ভাল ভাবে বুঝিয়া দেখিতে হইলে সঙ্গে একজন পাকা গাইড্ থাকা দরকার। 'গাইড্' মানে আমাদের দেশের ছাতু মার্কা পাণ্ডার মাসতুতো ভাই নয়,—পরম বিজ্ঞ লোক, ইতিহাসের প্রত্যেক খুঁটিনাটি ঘটনা যাঁর নখদর্পণে আছে। একজন নাম জাদা ইংরাজ পণ্ডিতের লণ্ডন সহর সম্বন্ধে খুব জানা-শোনা আছে বলিয়া খ্যাতি ছিল, তিনি সাগ্রহে ব্রজেন্দ্রনাথের গাইড্ হইতে রাজী হইলেন। লণ্ডনের ইষ্ট্ এণ্ড জায়গাটী বড় সুবিধার নয়, যত রাজ্যের বিলাতী গুণ্ডাদের আড্ডা সেখানে। ব্রজেন্দ্রনাথের মত একজন দাড়িওয়ালা 'কালা আদ্‌মিকে' রাস্তায় পাইলে নানাভাবে তাঁকে নাস্তানাবুদ করা আদবেই আশ্চর্য্য নয়; কাজেই গাইড্ সাহেব আগে হইতেই বলিয়া রাখিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ সেখানে গাড়ী হইতে নামিতে পাইবেন না, গাড়ীর জানালা খোলা থাকিবে, আর তিনি দুদিকের সমস্ত দৃশ্য দেখাইতে দেখাইতে সে সবের

পরিচয় দিয়া যাইবেন। তাই ঠিক হইল, দুজনে রওয়ানা হইয়া পড়িলেন। সাহেব আঙ্গুল দিয়া এক একটা জায়গা দেখাইয়া দেন, আর ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন, ওঃ, অমুক জায়গা? এ সম্বন্ধে তো অমুক বইয়ে অমুক অমুক কথা পড়িয়াছি! সাহেব সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, তিনি এত দিন লণ্ডনে থাকিয়া জায়গাগুলির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যত না জানিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রনাথ তিন হাজার মাইল দূরে বাংলা দেশে বসিয়া বসিয়া বই পড়িয়াই সে সব জানিয়া লইয়াছেন। অনেক বিষয় আবার তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের কাছেই নতুন নতুন কথা শুনিতে পাইলেন।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে তাঁরা লণ্ডনের টাওয়ারে আসিয়া পৌঁছিলেন। লণ্ডন-টাওয়ার একটী প্রসিদ্ধ পুরানো জিনিষ। সেকালের বিলাতী রাজাদের এটা ছিল একাধারে দুর্গ, প্রাসাদ এবং বন্দীশালা। বোধ করি এর প্রত্যেকটী ঘর-বারান্দার সঙ্গেও প্রচুর ইতিহাসের কথা জড়ানো। এখানে আসিয়াই মজা একেবারে চরমে উঠিল—দর্শক ব্রজেন্দ্রনাথ হইয়া গেলেন 'গাইড্' আর গাইড্ নিজে বনিয়া গেলেন দর্শক। সাহেব সামান্য একটু ধরাইয়া দেন—এটী অমুক ঘর, আর ব্রজেন্দ্রনাথ অমনি সে সম্বন্ধে অনর্গল ঝুড়ি ঝুড়ি তথ্য বলিয়া চলেন! অত বড় পণ্ডিত গাইড্ তার সিকি ভাগ খবরও রাখেন না।

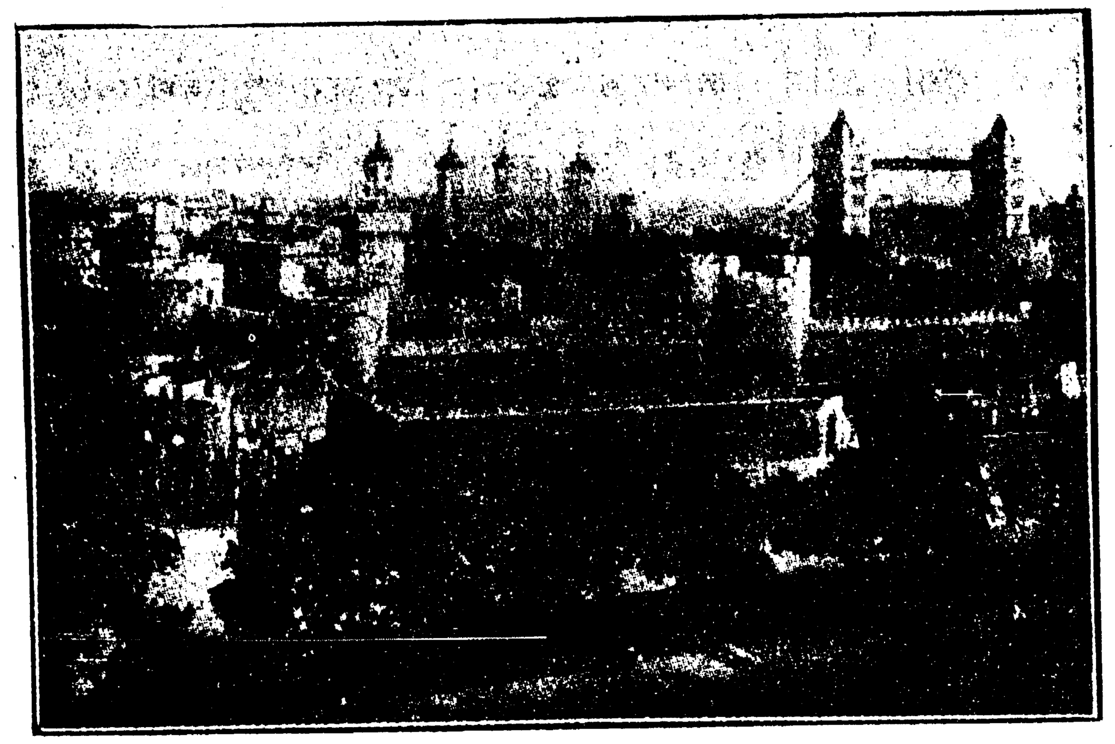
লণ্ডন টাওয়ার।

রোম নগরে একবার পৃথিবীর সেরা সেরা প্রাচ্য বিদ্যার পণ্ডিতদের (Orientalists) একটী বিরাট্ সভা বসিবে ঠিক হয়। ব্রজেন্দ্রনাথেরও সেখানে নিমন্ত্রণ হইল, ঠিক রহিল, তিনি সেখানে একটী প্রবন্ধ পড়িবেন। এই তাঁর প্রথম য়ুরোপ যাত্রা। যাত্রার তখনও

দেরী আছে, ব্রজেন্দ্রনাথ ভাবিলেন, তাড়াহুড়ায় দরকার নাই, বেশ ধীরে সুস্থে পড়াশুনা করিয়া প্রবন্ধটী লিখিবেন। কিন্তু হঠাৎ জাহাজ সম্বন্ধীয় ব্যাপারে এমনই একটা গোলমাল ঘটিল যে তাঁকে রোমে পৌঁছিতে হইলে একেবারে দু'চার দিনের মধ্যেই রওয়ানা হইয়া পড়িতে হয়। অথচ তাঁর প্রবন্ধের জন্য তখন না হইয়াছে পড়াশুনা, না হইয়াছে একটী লাইন লেখা। খাতা কলম লইয়া তখনই গিয়া তিনি তাঁর লাইব্রেরি-ঘরে ঢুকিলেন, বাড়ীর লোকেদের বলিয়া দিলেন, কেউ যেন তাঁকে কোন কাজে বাহিরে না ডাকে। খাওয়ার জন্যও তিনি বাহিরে আসিতে পারিবেন না, ওই খানেই যা হোক্ দুটী দিয়া আসিতে হইবে। আহার-নিদ্রা বন্ধ করিয়া প্রবন্ধ তো লেখা হইল. কিন্তু তবু তাঁর মনের ভিতরটা কেমন খচ্ খচ্ করিতে লাগিল ; ভাল ভাল বইগুলি একবার নাড়াচাড়া করিতে পারিলেন না, সমস্তই তো প্রায় লিখিতে হইল নিজের স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া! দারুণ সব সংস্কৃতের পণ্ডিতেরা আসিবেন, কি বলিবেন তাঁরা প্রবন্ধ শুনিয়া কে জানে? কিন্তু শেষটায় হইল কি জান? রোম নগরে সে প্রবন্ধ পড়ার পর অনেক পণ্ডিত আসিয়া তাঁকে বলিলেন, "আপনি যে সংস্কৃত শ্লোকগুলো দিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর অনুবাদ দিয়ে গেলে বড়ই সুবিধে হ'ত। আমরা তো ছাই শ্লোক গুলোর অনেক জায়গার মানেই কর্‌তে পার্‌লাম না!" ব্রজেন্দ্রনাথ তো অবাক্! যে সমস্ত শ্লোক তাঁর নখদর্পণে, সেগুলির মানেই নাকি এই মহা পণ্ডিতদের কাছে দুর্ব্বোধ্য!

নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানে ব্রজেন্দ্রনাথের কতখানি দখল তা শুধু এইটুকু হইতেই বুঝা যাইবে যে ১৯১১ সনে লণ্ডনে যখন বিশ্ব-জাতি কংগ্রেসের (Universal races Congress) প্রথম অধিবেশন হয় তখন ইনি তাঁর সভাপতি মনোনীত হন।

ব্রজেন্দ্রনাথ নিজে বই বড় বেশী কিছু লেখেন নাই, কিন্তু কথাবার্ত্তায় অনেককে এমন অনেক বিষয় মুখে বলিয়া দিয়াছেন যে পরে তাঁরা সে সম্বন্ধে আরও কিছু পড়াশুনা করিয়া বহু নামজাদা নামজাদা বই লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এমন অনেক ঘটনা আমাদের জানা আছে।

সংস্কৃতে একটা বচন আছে—'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি', অর্থাৎ, বিদ্যা লোককে বিনয়ী করে ; ব্রজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এটী খুবই খাটে। তাঁর বিনয় সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। বেশী কি, এই প্রবন্ধটী লেখার সময় আমরা তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে 'রামধনু'তে ছাপিবার জন্য তিনি ব্রজেন্দ্রনাথের একখানা ফটো আমাদের দিতে পারেন কিনা। তার জবাবে শুনিলাম, কোথাও কোন কাগজে তাঁর ছবি ওঠে এটা ব্রজেন্দ্রনাথ চান না। প্রধানতঃ এই জন্যই আমরা আর তাঁর ছবির কোন খোঁজ করি নাই।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের দেশের এই মূর্ত্ত গৌরবটিকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখুন।

অমাবস্যার রাতে

(শ্রীসুবিনয় রায়)

অমাবস্যার রাত, চারদিকে ঘোর অন্ধকার। ছাতে ব'সে আমি আর অরুণ গল্প কর্‌ছি, এমন সময় 'ভ্—র—র্—র' ক'রে একটা আওয়াজ শুন্‌তে পেলাম। প্রথমে খুব দূরে আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল ; ক্রমে আওয়াজটা ঠিক মাথার উপরে এল। খানিকক্ষণ ঐ ভাবে থেকে আবার আওয়াজ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। দু'তিন বার এই ভাবে আওয়াজ এল আর মিলিয়ে গেল। আকাশ এত অন্ধকারে ঢাকা ছিল যে ব্যাপারখানা কিছু বোঝা গেল না।

আমাদের বাড়ীটা ছিল ছোট গলির মধ্যে ; সেখানে রাস্তার আলোও টিম্ টিম্ ক'রে জ্বলে। গলির বাড়ীগুলোর প্রায় কোনটাতেই তখনও ইলেট্রিক্ লাইট হয়নি। দু' একটি বাড়ীতে গ্যাসের আলো জ্বলে ; অন্যগুলিতে কেরোসিনের লণ্ঠন, ল্যাম্প্ কিম্বা কুপির ব্যবস্থা। কাজেই অমাবস্যার মেঘাচ্ছন্ন রাতে সে পাড়ায় কি রকম অন্ধকার থাকে বুঝ্‌তেই পার। যাক্!—

আমরা তো আওয়াজের মর্ম্ম কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না ; মনে কৌতূহল থেকেই গেল। তখনও এরোপ্লেনের দিন আসে নি ; কাজেই, এরোপ্লেনের কথা মনে হ'লো না।

এই সময় আর একটি ঘটনা ঘট্‌ল, তাতে আমাদের কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। যে রাত্রে আমরা ঐ অদ্ভুত আওয়াজ শুন্‌লাম, সেই রাত্রেই মিত্তিরদের রান্না

ঘর থেকে এক হাঁড়ি মাংস চুরি গেল, আর তা'র পাশের বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী থেকে এক হাঁড়ি পোলাও উধাও হোল। দুই বাড়ীতেই মিষ্টি মিঠাই কিছু কিছু কেনা ছিল; তা'ও চুরি গেল। অথচ, চুরিটা বড় অদ্ভুত রকমে ঘট্‌ল। মিত্তিরদের রান্না ঘরের বাইরের দরজা বন্ধ ছিল; দরজা খোলা হয় নি, অথচ জিনিষ চুরি গেছে। ভেতর দিক্ দিয়ে চুরি কর্‌তে হ'লে শোবার ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়; সে ঘরে স্বয়ং মেজ বাবু তাঁর তিন চারিটি ছেলেপিলে নিয়ে গপ্পগাছা কর্‌ছিলেনে। সেখান দিয়ে যায় কা'র সাধ্যি? ইঁদুর গেলেও ধরা প'ড়ে যেতো। বাঁড়ুয্যেদের বাড়ীতেও চুরি করা বেশ একটু মুস্কিল। অথচ দুই দুই জায়গায় চোখে ধূলো দিয়ে চোর নির্ব্বিবাদে রান্নাঘর থেকে খাবার জিনিষ নিয়ে চম্পট দিল!

পুলিশে খবর দিয়ে কোন লাভ হ'লো না। দারোগা বাবু তো কোনই কিনারা কর্‌তে পার্‌লেন না। সেই অদ্ভুত আওয়াজের কথা বলাতে তিনি হো হো ক'রে হেসে উঠে বল্‌লেন, "তোমারই কাণ বোধ হয় তখন ভোঁ ভোঁ কর্‌ছিল, তাই ও রকম আওয়াজ শুনেছিলে।" আমি চুপ ক'রে রইলাম। প্রতিবাদ ক'রে তো আর কোন লাভ নেই! অরুণ আমার কাণে কাণে বল্‌ল, "চালিয়াতের কাছে ওসব কথা ব'লে কি হবে? ওর কি মুরদ আছে চোর ধর্‌বার? চেহারাটা দেখ না; যেন একটা আস্ত ঈডিয়ট্!"—আমরা আস্তে আস্তে বাড়ী ফিরে এলাম।

তা'র পর প্রায় মাস খানেক হ'য়ে গেছে; চুরির কথা আমরা ভুলেই গেছি। সেদিনও অমাবস্যার রাতে আমরা দু'জন ছাতে ব'সে গল্প কর্‌ছি, এমন সময় সেই 'ভ্-র্-র্-র্' আওয়াজটা শোনা গেল। আমি আর অরুণ তখনই তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠ্‌লাম আর আকাশের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। অরুণ একটু বাদেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "ঐ-ঐ——ঐ দেখ একটা পাখীর মত কি যেন জিনিষ আকাশে উড়্‌ছে।" চেয়ে দেখ্‌লাম, বাস্তবিকই একটা মস্ত বড় জিনিষ আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারে তা'র আকারটা ভাল ক'রে বোঝা যাচ্ছে না।

জিনিষটাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেটা আস্তে আস্তে নীচের দিকে নাম্‌তে লাগ্‌ল; তার পর একটা চূড়াওয়ালা বাড়ীর ছাতে নেমে পড়্‌ল। ছাতে আলো ছিল, তা'ই বাড়ীটা চিন্‌তে পারা গেল।

আমি আর অরুণ তাড়াতাড়ি ছাত থেকে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। চূড়াওয়ালা বাড়ীটা আমাদের চেনা ছিল। সে বাড়ীটাতে থাক্‌তো ছিল এক হিন্দুস্থানী —নাম রামভজন পাঁড়ে। লোকটি বেজায় কুঁড়ে, তাই দিন দিন মোটাই হচ্ছিল। কারো সঙ্গে তার বিশেষ আলাপ ছিল না; শুধু দু' একটি ছোট ছেলে সেখানে যাতায়াত কর্‌ত। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে সেই বাড়ীর দিকেই রওয়ানা হ'লাম। হঠাৎ অরুণ উপরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল, "দেখ! দেখ!"—চেয়ে দেখি, ছোট্ট একটি ছেলে আকাশে ঝুল্‌ছে আর তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছে। একবার ঘোষেদের বাড়ীর ছাতের পাঁচিলে সে নেমে পড়্‌ল, আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে আকাশে উঠে পড়্‌ল। সেই "ভ্-র্ র্-র্" আওয়াজটা তখনও শোনা যাচ্ছে। ব্যাপারটা কিছু বোঝা গেল না!

আকাশে ঝুল্‌ছে।

আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে সেই চূড়াওয়ালা বাড়ীর দিকে ছুটে চল্‌লাম। পথে রমেশ আর বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো; তাদেরও সঙ্গে নিয়ে চল্‌লাম। যেতে যেতে সংক্ষেপে তা'দের সব কথা ব'লে দিলাম। তা'রাও উৎসাহের সঙ্গে আমাদের দলে জুট্‌ল।

সে বাড়ীটাতে পৌঁছে দেখি নীচটা ঘুটঘুটে অন্ধকার; সিঁড়িতে একটা পিদ্দিম টিম্-টিম ক'রে জ্বল্‌ছে। সদর দরজা ভেজান ছিল; আমরা পা টিপে টিপে ঢুকে পড়্‌লাম। একটু একটু ভয়ও কর্‌ছিল; কিন্তু কেউ আর পিছ্-পা হ'লাম না। বাড়ীর ছাতে আলো ছিল তা' আমরা আগেই দেখেছিলাম; কাজেই বুঝ্‌তে বাকি রইল না যে ছাতে লোক আছে।

আস্তে আস্তে উঠান পার হ'য়ে দোতালার সিঁড়িতে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। উঠ্‌ছি আর চারিদিকে তাকিয়ে দেখ্‌ছি—পাছে কেউ পেছন থেকে বা সাম্‌নে থেকে আক্রমণ করে বসে!

দোতালায় উঠে একবার চারিদিক্ দেখে নিলাম—কেউ আছে ব'লে মনে হ'লো না। কাজেই, আস্তে আস্তে তেতালায় উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌লাম। তেতালার চিলের ছাতের নীচে পোঁছে দেখ্‌লাম ছাতের দরজা অর্দ্ধেক ভেজান। দরজার ফাঁক দিয়ে অল্প অল্প আলো আস্‌ছে।

ধরা পড়্‌বার ভয়ে আমরা দরজার আড়ালে রইলাম; শুধু অরুণ আস্তে আস্তে মাথাটা বের ক'রে একবার ছাতে উঁকি মেরে দেখ্‌ল। তারপর আমাদের হাত দিয়ে ইসারা ক'রে একেবারে ছাতে উঠে পড়্‌ল। সকলেই তার পেছনে পেছনে ছাতে পোঁছে গেলাম।

গিয়ে যা' দেখ্‌লাম তা'তে আর হাসি চাপা গেল না। দেখি মোট্‌কা রামভজন স্বয়ং একটা অতিকায় লাটাই হাতে একটা ধাউস্ ঘুড়ি ওড়াচ্ছেন। ঘুড়ির সূতো প্রায় দড়ির মত মোটা। সূতো থেকে একটি ছোট ছেলে ঝুল্‌ছে; তা'র ঝুল্‌বার জন্য একটি কপি-কল গোছের ব্যবস্থা। ইচ্ছা কর্‌লে সে সূতোর সাহায্যে কয়েক হাত ওঠা-নামা করতে পারে। ছেলেটি তখন ছাতের কাছে পোঁছে গেছে—পাঁড়ে মশাইও লাটাইএর সূতো গুটাচ্ছেন। ছেলের হাতে একটি হাঁড়ি; সেটি রমেশদের বাড়ীর। সেদিন রমেশদের বাড়ীতে মাংস রাঁধা হচ্ছিল।

আমাদের দেখে পাঁড়েজি যা' চম্‌কালেন, কি আর বল্‌ব! তাড়াতাড়ি লাটাইএর সূতা গুটিয়ে ঘুড়িটা নামিয়ে ফেল্‌লেন; ছেলেটিও হাঁড়িটা রেখে দুই পকেট

ভর্ত্তি সন্দেশ বের করতে লাগ্‌ল। তখন আর কারো বুঝ্‌তে বাকি রইল না, সেই 'ভ্—র্—র্—র' আওয়াজটাই বা কিসের, আর খাবার চুরিই বা হ'তো কি ক'রে। মছ্‌লি-খোর 'বংগালী বাবুর' কাছে একেবারে মাংস শুদ্ধ ধরা পড়া। পাঁড়েজি আমাদের কাছে অনেক মাপ চেয়ে নির্ব্বিবাদে রমেশদের হাঁড়িটা মাংসশুদ্ধ ফেরৎ দিলেন। বেচারার মুখ এত কাঁচু-মাচু হয়েছিল যে আমরা আর কিছু বল্‌তে না পেরে অনেক কষ্টে হাসি চেপে বাড়ী রওয়ানা হলাম।

সবই ভুল্

(শ্রীমাঠব্য)

'কল্‌কাতা ভুলে ভরা' * শোনা ছিল ভাইরে,
আমি দেখি ভুলে ভরা গোটা দুনিয়াইরে।

*　　*　　*　　*

মুখে মোর রোচে নাকো আম-জাম-লিচুগো,
হেন কালে পাই যদি জলপাই কিছুগো!
ভোম্বল বলে, 'চল জলপাইগুড়িতে
যত চাই জলপাই, ভরে দেব ঝুড়িতে।
সেথা গিয়ে একি শুনি, হায় হায়, হায়রে,
সে মুলুকে শুধু নাকি, 'চা'-ই পাওয়া যায়রে,
জলপাই না মিলিয়া মেলে যদি শুধু চা,
তবে কেন 'চা-গুড়ি' নাম তার হল না?

অতি কাছে রংপুর ভরা নানা রঙ্গে—
রং-চটা বাক্সটা ছিল মোর সঙ্গে,

* প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের "কলিকাতা ভুলে ভরা" গান দ্রষ্টব্য

এই ফাঁকে সেইটাকে কোরে নেব লাল্‌চে,
সেথা গিয়ে বুঝিলাম পোড়া এ কপাল যে,
ভরা গোটা সহরটা ভাঙে আর তামাকে,
ডাবা হুঁকো এনে বলে টান দিতে আমাকে !

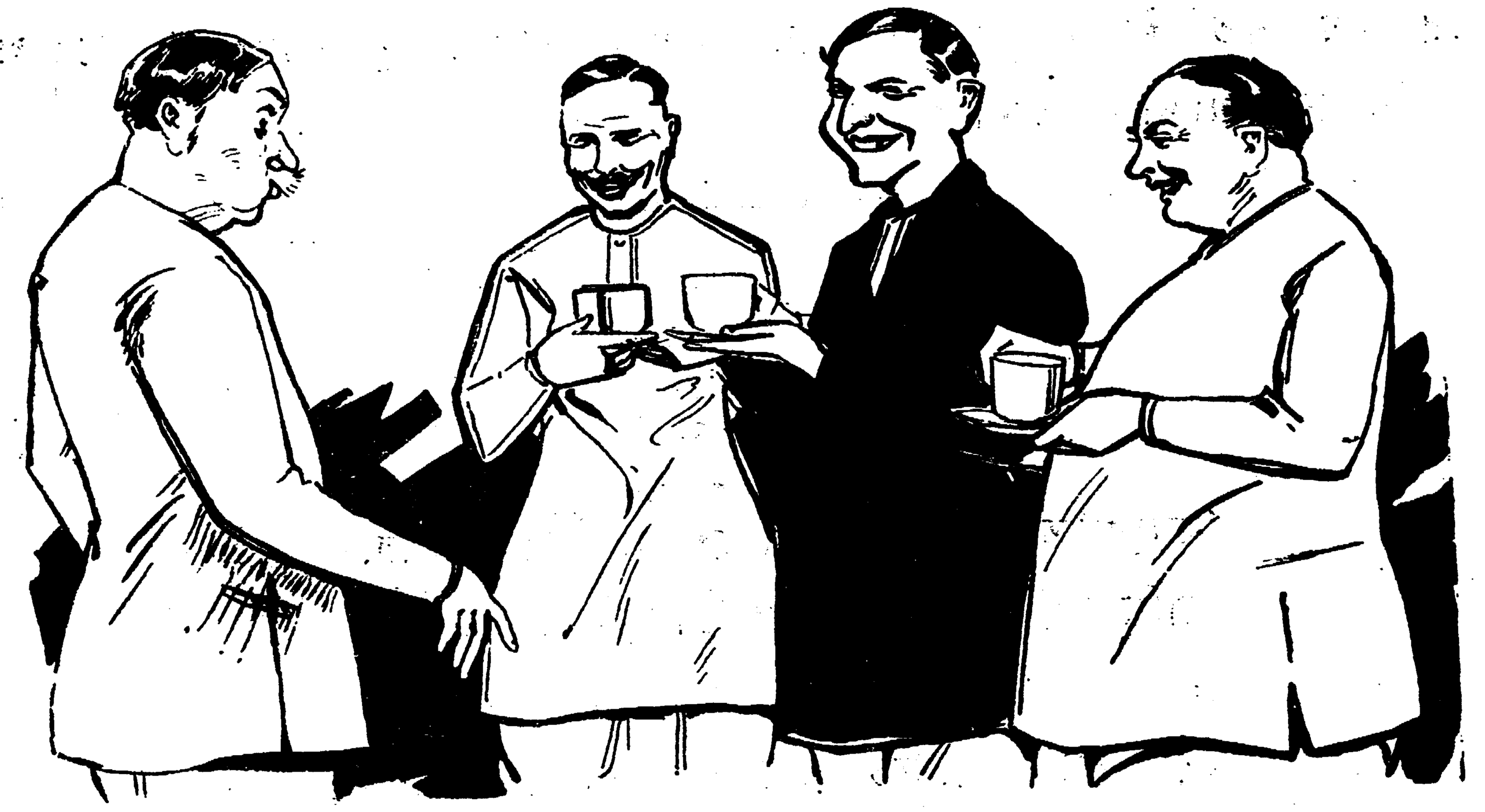

এক ফোঁটা রং নাই, বেরঙা এ সহরে,
কোন্ গরু রংপুর নাম দিল কহরে !

বিস্তর বর্ণিলে বেড়ে যাবে পুঁথিটা,
সংক্ষেপে জেনে রাখ শুধু মোটামুটিটা,
ভেবেছিনু ঢাকা বুঝি ঢাক্‌নিতে ঢাকাগো,
গিয়ে দেখি সহরটী বিল্‌কুল ফাঁকা গো !
ধানবাদে ধান নাই, নিয়ে এই ধারণা
কি ঠকাটা ঠকেছিনু ভাবিতেও পার না—

জানা ছিল, বড়া বুঝি দেখে নাই হাব্‌ড়া
আফ্‌শোষে ফোঁসে তাই,—"হা-বড়া, হা-বড়া !"

সেই দিন পার হয়ে গঙ্গার পুলটা
একেবারে ভেঙ্গে গেছে আমার সে ভুলটা।
'টিশনে'র কিনারায় যত ছাতুমূর্ত্তি
বড়া ভাজা খেয়ে করে উদরটী পূর্ত্তি !

বর্দ্ধমানের নামে—ভাবিনু, এ সহরে
লোকগুলি রোজই বুঝি বাড়িতেছে বহরে,
গিয়ে দেখি, যে ছিলগো তিন হাত আমারি,
দেড় হাতে নামিয়েছে ম্যালেরিয়া বেমারি !

পুরীধামে প্রসাদটী পুরী নয়, তা জানো ?
সাদা ভাত— থালা ভরে থরে থরে সাজানো !
"ভাত কেন, পুরী আন" বলেছিল কুণ্ডু,
পাণ্ডা রাগিয়া বলে, "তুস্তর মুণ্ডু !"

মনে মনে ছিল মোর অতি বড় ভাবনা,
পাব্‌নাকে খুঁজে বুঝি কোন দিনই পাব না !
রবিবারে শ্যাল্‌দায় চড়ি রেল গাড়ীতে,
—সোমবারে একেবারে পাব্‌নার বাড়ীতে !

সূর্য্যঠাকুরের মণি

[পৌরাণিক]

(শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, বি-এ, এম্-আর্-এ-এস্)

যদুবংশে সত্রাজিত নামে একটী লোক ছিলেন। তাঁহার সূর্য্যের সঙ্গে খুব খাতির ছিল। একদিন তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব আসিয়া একেবারে তাঁহার

নিকট হাজির। কিন্তু সূর্য্যের দিকে চক্ষু রাখিয়া তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখে এমন ক্ষমতা কার? সত্রাজিতের ভ্যাবাচ্যাকা লাগিয়া গেল; তিনি সে কথা সূর্য্যকে জানাইলেন। সূর্য্যদেব তৎক্ষণাৎ নিজের গলা হইতে একটা মণি খুলিয়া রাখিলেন, আর অমনি তাঁহার তেজ কমিয়া গেল, সত্রাজিত তাঁহাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইলেন। সূর্য্য বলিলেন, "তুমি আমার কাছে বর লও"। সত্রাজিত সেই মণিটী চাহিয়া বসিলেন।

সূর্য্য সত্রাজিতকে বর চাহিতে বলিয়াছিলেন—দ্বিরুক্তি না করিয়া মণিটী দিলেন। সত্রাজিত সেই মণি গলায় দিয়া সূর্য্যের মত ঝল্‌মল করিতে লাগিলেন। তিনি যখন দ্বারকায় প্রবেশ করিলেন, তখন লোকে ভাবিল সূর্য্যই আসিতেছেন। তাহারা গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে বলিল, সূর্য্যঠাকুর আপনাকে (ভগবান্‌কে) দেখিতে আসিতেছেন। কৃষ্ণ শুনিয়া হাসিলেন, তাহার পর বলিলেন—"নাহে, এ সূর্য্য নয়, এ সত্রাজিত, সূর্য্যের স্যমন্তক মণি পাইয়া ইহার এত তেজ, তোমরা বেশ করিয়া ইহাকে দেখ।" লোকজন ব্যাপার বুঝিয়া চলিয়া গেল।

সত্রাজিত মণি ঘরে রাখিলেন। সে মণির কী গুণ? রোজ তাহা হইতে অনেকটা করিয়া সোণা বাহির হইতে লাগিল এবং দেশের যত অমঙ্গল সেই মণির মহিমায় নষ্ট হইয়া গেল—অনাবৃষ্টি, আগুন, চুরীচামারি, এ সব কোথায় চলিয়া গেল।

শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, এমন যে রত্ন তাহা রাজারই শোভা পায়; তাঁহার ইচ্ছা হইল, মণিটা আনিয়া তাঁহাদের রাজা উগ্রসেনকে দেন। কিন্তু তাহা করিতে গেলেই ঘরে ঘরে ঝগড়া লাগে.—তিনি মণিটা আনিলেন না। সত্রাজিত কিন্তু বুঝিলেন যে কৃষ্ণের দৃষ্টি পড়িয়াছে মণিটার উপর। তিনি ভয় খাইয়া মণিটা নিজের ভাই প্রসেনকে দান করিলেন।

প্রসেন মণিটা গলায় ঝুলাইয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একদিন মৃগয়ায় বাহির হইলেন। সেখানে এক সিংহের হাতে তাঁহাকে প্রাণ দিতে হইল। কিন্তু সে মণি সিংহেরও ভোগে আসিল না। ভালুকের রাজা জাম্ববান্ সিংহকে মারিয়া মণিটী কাড়িয়া লইলেন; তাহার পর নিজের গর্ত্তে ঢুকিয়া নিজের পুত্র সুকুমারকে তাহা খেলার জন্য দিলেন।

এদিকে প্রসেন ঘরে আসেন না দেখিয়া সকলে কাণাকাণি করিতে লাগিল যে তিনি বনে মারা গিয়াছেন। কে তাঁহাকে মারিল? তাহারা ঠিক করিল—কৃষ্ণের মণির উপর দৃষ্টি ছিল, তাঁহারই এই কর্ম্ম—"কেষ্টাবেটাই চোর"। কথাটা শ্রীকৃষ্ণেরও কাণে পৌঁছিল, তিনি দেখিলেন মিথ্যামিথ্যি তাঁহার উপর একটা মস্ত বড় দোষ চাপান হইতেছে, এ কলঙ্কটা যাহাতে যায় তাহাই করা উচিত। তিনি দলবল সঙ্গে লইয়া প্রসেনের খোঁজে বাহির হইলেন। গিয়া দেখিলেন, প্রসেন ও তাঁহার ঘোড়াকে কোন সিংহ মারিয়া রাখিয়াছে; সকলেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। তখন কৃষ্ণ সিংহের পায়ের চিহ্ন ধরিয়া আগাইয়া দেখিলেন, সিংহও মারা গিয়াছে এক ভালুকের হাতে। তিনি তখন ভালুকের পায়ের চিহ্ন ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহার লোকজন এক পর্ব্বতের নিকট থাকিল আর তিনি চিহ্ন ধরিয়া ভালুকের গর্ত্তে ঢুকিলেন। সেই সময় এক ধাত্রী জাম্ববানের ছেলেটীকে আদর করিতেছিল। সে বলিতেছিল—"প্রসেনকে মারিয়াছে সিংহ আর সিংহকে মারিয়াছেন জাম্ববান,এখন এই স্যমন্তক মণি ত তোমারই, তুমি কাঁদিও না।" মণিটা ধাত্রীর হাতে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতেছিল। ধাত্রী গর্ত্তের মধ্যে মানুষ দেখিতে পাইয়াই চেঁচাইয়া উঠিল। জাম্ববান্ ধাত্রীর চীৎকার শুনিয়া সেখানে আসিলেন। তিনি রাগিয়া গিয়া কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাইয়া দিলেন। সে কী ভীষণ যুদ্ধ! ২১ দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ চলিল। শ্রীকৃষ্ণের লোকজন ৭।৮ দিন তাঁহার জন্য দেরী করিয়াছিল। তিনি আসেন না দেখিয়া তাহারা দ্বারকায় ফিরিয়া গিয়া রটাইয়া দিল যে তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া গেল। সেই শ্রাদ্ধের জোরে শ্রীকৃষ্ণের বল বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু জাম্ববান্ মার খাইয়া কাহিল হইয়া পড়িলেন। ভালুকরাজ আর পারিলেন না, হারিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তুষ্ট হইয়া জাম্ববানের গায়ে হাত বুলাইয়া দিয়া তাঁহার যুদ্ধের সমস্ত কষ্ট দূর করিয়া দিলেন। জাম্ববান্ নিজের কন্যা জাম্ববতীকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিলেন এবং স্যমন্তক মণিটিও শ্রীকৃষ্ণকে দিয়া দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া স্যমন্তক মণি সত্রাজিতকে ফিরাইয়া দিলেন। জাম্ববতী শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে স্থান পাইলেন।

সত্রাজিত কৃষ্ণের মিথ্যা অখ্যাতি রটাইয়াছিলেন, তাঁহার এখন ভয় হইল।

তিনি কৃষ্ণকে খুসী রাখার জন্য নিজকন্যা সত্যভামাকে আনিয়া কৃষ্ণের সহিত বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ লইয়া আবার বিষম ব্যাপার বাধিল। পূর্ব্বে সত্যভামাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন আরও তিন জন—অক্রূর, কৃতবর্ম্মা, শতধন্বা। ইঁহাদের কাহারও সত্যভামালাভ ঘটিল না দেখিয়া ইঁহারা সত্রাজিতের উপর চটিয়া গিয়া তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। অক্রূর, কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি শতধন্বাকে বলিলেন—"এই সত্রাজিত বড়ই দুষ্ট, মেয়েটাকে আমরা চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমাদের কাউকে না দিয়া কৃষ্ণকে দিল, উহাকে মারিয়া মণিটী কাড়িয়া লউন, কৃষ্ণ বিপক্ষ হইলে আমরা আপনার সাহায্য করিব।" শতধন্বা তাহাই স্বীকার করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধন পাণ্ডবদের মারিয়া ফেলিবার জন্য বারণাবতের জতুগৃহ পোড়াইয়া দিলে শ্রীকৃষ্ণ একবার বারণাবতে ঘুরিয়া আসিতে গেলেন। এই সুযোগে, যখন সত্রাজিত ঘুমে, সেই সময়ে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিয়া শতধন্বা মণিটী লইয়া চম্পট! কিন্তু শ্রীকৃষ্ণই অনুপস্থিত, সত্যভামা ত দ্বারকায় ছিলেন! তিনি পিতাকে মারার খবর পাইয়া রথে চড়িয়া একেবারে বারণাবতে আসিয়া উপস্থিত। কৃষ্ণ সকল কথা শুনিয়া বলিলেন,—"আমি এ অপমান কখনই সহ্য করিব না; এর শোধ লইব।" শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় চলিয়া আসিয়া বলরামকে বলিলেন "দেখুন. প্রসেনকে মারিয়াছে এক সিংহ আর সত্রাজিতকে মারিল শতধন্বা; মণির এখন ওয়ারিস নাই. ওটা এখন আমাদেরই দুজনার; রথে চড়িয়া চলুন, আমরা শতধন্বাকে মারি।" বলরাম তাহাই স্বীকার করিলেন। শতধন্বা ভয় পাইয়া প্রথমে কৃতবর্ম্মার নিকট, পরে অক্রূরের নিকট সাহায্য চাহিলেন। তাঁহারা দুজনাই বলিলেন, কৃষ্ণ-বলরামের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন এমন ক্ষমতা তাঁহাদের নাই। শতধন্বা দেখিলেন মহা বিপদ্, তিনি অগত্যা অক্রূরকে বলিলেন "যদি আমাকে বাঁচাইতে না পারেন, তবে এই মণিটীই আপনার কাছে রাখিয়া দিন।" অক্রূর বলিলেন—"তা রাখিতে পারি যদি আমার কাছে যে মণিটা থাকিল এ সংবাদ কাউকে না দেন—এমনকি মারিলেও না দেন।" শতধন্বা তাহাই স্বীকার করিলেন। মণিটা অক্রূরের কাছে আসিল, আর শতধন্বা এক ঘুঁড়ীর উপর চড়িয়া একেবারে লম্বা দিলেন। তখন কৃষ্ণ ও বলরাম এক চার ঘোড়ার রথে চড়িয়া তাঁহার পেছন লইলেন। শতধন্বার ঘুঁড়ী খুবই দৌড়াইল, কিন্তু বেচারী আর কত পারে? শেষে

মিথিলার বনের কাছে আসিয়া সে মরিয়া গেল। শতধন্বা বেগতিক দেখিয়া পায়ে হাঁটিয়াই পলাইতে লাগিলেন। তখন কৃষ্ণ বলরামকে রথে রাখিয়া নিজেও পায়ে হাঁটিয়া শতধন্বার খোঁজে চলিলেন। দুই ক্রোশ পথ গিয়াই তিনি শতধন্বাকে দেখিতে পাইয়া চক্র ছুড়িয়া মারিলেন। চক্রের ঘায়ে শতধন্বার মাথাটা কাটিয়া গেল। কিন্তু শতধন্বার শরীর ও কাপড়চোপড় বেশ করিয়া খুঁজিয়াও কৃষ্ণ মণিটী পাইলেন না, ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে ঐ কথা বলিলে বলরাম কথাটা বিশ্বাস করিলেন না—বলিলেন—"তুমি ভারী ধনের লোভী, তাই বলিয়াই তোমাকে মাপ করিলাম; তোমাকে বা বন্ধুদের আমার কোনই দরকার নাই।" বলরাম রাগ করিয়া বিদেহপুরীতে চলিয়া গেলেন। সেখানে তিনি তিন বৎসর ছিলেন, ঐ সময়েই দুর্য্যোধন আসিয়া তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। তিন বৎসর পর যদু বংশের অনেক বড় বড় লোক আসিয়া অনেক সাধ্য-সাধনার পর বলরামকে দ্বারকায় ফিরাইয়া লইয়া যান।

এদিকে অক্রূর সেই মণি পাওয়ার পর ভাবিলেন, এই মণি হইতে ত বিস্তর সোণা বাহির হয়, এই সোণা দিয়া কি করা যায়? ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি অনেক যাগ-যজ্ঞ করিতে লাগিলেন। দীক্ষা লইয়া যজ্ঞ করিলে কৃষ্ণ তাঁহাকে সে সময়ে মারিতে পারিবেন না, কারণ তাহা হইলে কৃষ্ণের ব্রহ্মহত্যা পাপ হইবে—এইরূপ ভাবিয়া অক্রূর ৬২ বৎসর ধরিয়া যজ্ঞই করিলেন। ইহাতে দ্বারকায় দুর্ভিক্ষ, মড়কাদি দেখা দিতে পারিল না। ইহার পর অক্রূর পক্ষের লোক শত্রুঘ্ন নামক রাজবংশীয় একজনকে খুন করিয়া দ্বারকা হইতে পলাইল। অক্রূরও সঙ্গে সঙ্গে পলাইলেন। আর অমনি দ্বারকায় মড়কাদি দেখা দিল। তখন যদুবংশের প্রধান প্রধান লোক ইহার কারণ ঠিক করিবার জন্য পরামর্শে বসিলেন। এক বৃদ্ধ, অক্রূরের পিতামাতার বৃত্তান্ত বলিয়া দিয়া মত প্রকাশ করিলেন যে অক্রূর চলিয়া যাওয়াতেই এই সব উপদ্রব ঘটিতেছে। অক্রূরকে অনেক বুঝাইয়া আবার দ্বারকায় আনা হইল। ফলে, তিনি আসিবামাত্র সমস্ত উপদ্রব থামিল। কৃষ্ণ তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিলেন যে ইহা স্যমন্তক মণির গুণ, উহা অক্রূরের নিকটই আছে। তিনি আগে কিছু প্রকাশ না করিয়া নিজ বাড়ীতে এক সভা বসাইলেন। যাদবেরা সব সেখানে আসিয়া বসিলে তিনি অক্রূরকে বলিলেন—"দেখুন, আমরা সবাই জানি যে শতধন্বা আপনাকে স্যমন্তক মণি

দিয়াছে ; তা বেশ ত, আমরা সকলেই ত সেই মণি হইতে উপকার পাইতেছি, মণি আপনার কাছেই থাক্। তবে কিনা, বলরাম মনে ভাবিয়াছেন মণিটা বুঝি আমার কাছে, আপনি একবার সেই মণিটা তাঁহাকে দেখান।" অক্রূর ভাবিলেন অস্বীকার করিলে ইহারা তল্লাসী করিয়া মণি বাহির করিবে, তাহাতে বড় সুবিধা হইবে না, বরং দেখানই ভাল। তিনি মণিটী একটা ছোট কৌটা হইতে বাহির করিলেন—মণির তেজে সভা দপ্‌ দপ্‌ করিয়া উঠিল। অক্রূর কৃষ্ণকে বলিলেন "আপনি এটা চাহিয়া লইবেন মনে করিয়া এতদিন আমি কোন মতে ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছি, এখন আপনি ইহা লউন এবং যাহাকে ইচ্ছা দিন।" বলরাম মণি দেখিয়া ভাবিলেন, কৃষ্ণের ও আমার ইহা ভোগ করার সমান অধিকার। সত্যভামার পিতার ধন বলিয়া তাঁহারও মণির উপর লোভ লাগিল। কৃষ্ণ তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই সমস্ত বুঝিয়া লইলেন, তখন অক্রূরকে বলিলেন—"আমার কলঙ্কটা কাটিয়া গেল, বলরামের ও আমার এই মণিতে সমান দাবী ; আর এটা সত্যভামার পিতার সম্পত্তি ; আর কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। কিন্তু এই মণি সব সময়েই শুদ্ধভাবে ব্রহ্মচারীর মত পরিতে হয়, অশুদ্ধ অবস্থায় পরিলে মারা পড়িতে হয় ; আমার ষোল হাজার স্ত্রী, সুতরাং এই মণি পরা আমার কাজ নহে ; আর সত্যভামাই বা এ অবস্থায় ইহা কিভাবে পরেন ? আর বলরাম ? তিনি কি এই মণির জন্য মদ খাওয়াটা ছাড়িবেন ? এই সব গোলমাল যখন রহিয়াছে তখন আমরা বলি, মণিটা আপনিই পরুন ; আপনার কাছে থাকিলে রাজ্যের সকলেরই উপকার হইবে"। তাহাই হইল, অক্রূর সেই জ্বল্ জ্বলে মণি পরিয়া সব জায়গায় ঘুরিতে লাগিলেন।

লেখক শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, রামধনুর প্রথম সম্পাদক।

ঘুমপাড়ানী গান

(শ্রীঅখিল নিয়োগী)

ডেন্ মার্ক

ঘুমোও ঘুমোও—ঘুমোও আমার খোকন মণিটুক্
চোখের পাতায় লাগ্‌ল ঘুমের ঘোর,
স্বর্গ থেকে ঈশের আশিস্ ভর্‌বে মাথা, বুক—
রক্ষা নিজেই কর্‌বে তোমার দোর।

পাঠিয়ে দেবেন স্বর্গ-পরী শয্যা-কিনারায়
দোল্‌না তোমার দুল্‌বে যেথায় ঠিক !

চক্ষু মুদে শান্তিতে তাই ঘুমাও বিছানায়,
ঈশের আঁখিই জাগ্‌বে অনিমিখ্‌ !

ভ্রম-সংশোধন :—এবারের গোড়ার দিকে ২০৬ পৃষ্ঠা হইতে ২২০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উপরের হেডিংএ ‘জ্যৈষ্ঠের’ স্থানে ভুলে বৈশাখ ছাপা হইয়া গিয়াছে। গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া হাতে বৈশাখ কাটিয়া জ্যৈষ্ঠ বসাইয়া লইবেন।

এবারের কয়েকটী রচনা খুব বেশী বড় হইয়া পড়ায় স্থান সঙ্কুলান হয় নাই, তাই ক্রমশঃ প্রকাশ্য গল্প দুইটী এ মাসে দেওয়া গেল না—আষাঢ় হইতে আবার সেগুলি যাইবে।— সম্পাদক।

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

দর্পচূর্ণ

(শ্রীসুধেন্দুপ্রকাশ সোম চৌধুরী এবং দুর্গাপদ ঘোষ, খুলনা)

সে ছিল এক দেশ—সে দেশের রাজপুত্রের শিকারে খুব সখ ছিল। তাই সে তার সাথীদের নিয়ে বনে শিকার কর্‌তে যেত। সে ছিল আবার সবার সেরা শিকারী। তার দোষের মধ্যে ছিল বড় অহঙ্কার, সে ভাবৃত তার মত শিকারী বুঝি আর কেউ নেই। শেষে রাজকুমার দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন—দেখতে যে তার মত শিকারী আর আছে কিনা। কত বন, প্রান্তর মরুভূমিতে তিনি বেরিয়ে বেড়ালেন। কত ব্যাধের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। কিন্তু কোথাও তার সমান শিকারী দেখতে পেলেন না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দেশে দেশে তাঁর অদ্ভুত শিকারের কথা প্রচার হয়ে পড়ল।

তার পর অনেক দেশ ঘুরতে ঘুরতে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে তিনি এক নূতন দেশে উপস্থিত হলেন।

দুই

সে দেশটা বড় অদ্ভুত। সে দেশের বাড়ী ঘর সমস্তই চামড়া দিয়া সাজান। সে দেশের ছেলে বুড়ো সবাই শিকারী। হাতে তাদের তীর ধনুক, গায়ে তাদের বড় বড় জন্তুর চামড়া, মাথায় তাদের পাখীর পালক ; যেন তারা নিজেরাই এক একটী শিকার সেজে বসে আছে। রাজকুমার তাদের দেশের রাজধানীতে এসেই দেখ্‌লেন যে দলে দলে লোক একটা বনের দিকে যাচ্ছে আর অনেক জন্তু শিকার করে রাজবাড়ীর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপার দেখে তিনি বেশ চম্‌কে গেলেন, এর কারণ জান্‌বার জন্য বেশ ব্যস্ত হ'লেন। অনেক কষ্টে তিনি এক সর্দ্দারের সঙ্গে দেখা করলেন। সর্দ্দার একজন বড় শিকারী পেয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলো। সে রাজকুমারকে বল্‌লো "কাল রাত্রে আমাদের রাজার মৃত্যু হয়েছে। এ দেশের নিয়মমত তার

মৃতদেহকে একলক্ষ পশুর রক্ত দিয়ে স্নান না করালে তাঁর আত্মার সদগতি হ'বে না। এক লক্ষের আর পঁচিশ হাজার বাকী; কাজেই আপনি যখন বড় শিকারী তখন আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিন।"

তিন

রাজকুমারের গর্ব্বে একটুখানি ঘা লাগ্‌ল—তিনি ভাবলেন যাঁর উদ্দেশ্যে লক্ষ পশু নিহত হয়, না জানি তিনি কত বড় বীর! কিন্তু রাজকুমার এমনি অহঙ্কারী ছিলেন যে তিনি সে রাজাকে বড় বলে মনে করতে পারলেন না। তাই তিনি সর্দ্দারকে বললেন, "আমি রাজার মৃতদেহটা দেখ্‌তে চাই।" সর্দ্দার তাঁকে সঙ্গে করে রাজবাড়ীতে নিয়ে গেল। ফটকের সামনে এসেই তিনি চম্‌কে উঠলেন, দেখলেন যে প্রকাণ্ড দুটী সিংহ দুই পাশে বাঁধা আছে। সর্দ্দার বল্‌লো, "এই আমাদের রাজার প্রথম শিকার।" রাজকুমার মনে মনে একটু আশ্চর্য্য বোধ করলো—কারণ তাঁর নিজের প্রথম শিকার ছিল মাত্র দুটী ঘুঘু পাখী। তাহ'লেও সে পরাজয় স্বীকার করলো না। বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখে অসংখ্য গণ্ডার, হাতী, বাঘ, প্রভৃতি বাঁধা রয়েছে। যে ঘরে রাজার মৃতদেহ সেই ঘরে গিয়ে দেখলো যে অসংখ্য তীরের ফলার উপর রাজার মৃতদেহটা রাখা হয়েছে। তাঁরই শিয়রে তাঁর নামাঙ্কিত তীর ও ধনুক। ঐ সব দেখেও রাজকুমারের দম্ভ চূর্ণ হ'লনা। সে মনে মনে বল্‌লো, "বেঁচে থাকলে পরিচয় নেবার মত লোক হতেন তা'তে কোন সন্দেহ নেই।" তিনি সর্দ্দারকে বল্‌লেন "তাহলে চল আমরা এখন শিকার কর্‌তে যাই। রাজকুমারের মনে ভরসা ছিল যে বন্দুকের কাছে তীর-ধনুক কিছুই না। সর্দ্দার রাজকুমারকে একজন বড় শিকারী মনে করে খুবই আনন্দিত হ'ল।

চার

তার পর তারা একটা নিবিড় বনে প্রবেশ করলো। একটা গাছের মাথায় একটা বসবার পাটাতন তৈরী করে রাজকুমার তার দলবল সহ বস্‌ল আর সর্দ্দার তার দলবল সহ শিকার তাড়িয়ে আন্‌তে চললো। একটু পরেই রাজকুমার দেখ্‌লেন, একদল বিরাটকায় সিংহ গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে এসে সেই গাছের তলে এসে উপস্থিত হ'ল। রাজকুমার আর কখনও এত বড় সিংহ দেখেনি, কাজেই তার ভয় হ'বারই কথা। আর তার অনুচরদের তো কথাই নেই—অনেকে জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। তখন তাদের মুখের অবস্থা এত খারাপ হ'য়েছিল সে শক্তিশেল বুকে পড়বার সময় বোধ হয় লক্ষ্মণেরও সেরূপ অবস্থা হয়নি। ঝরা পাতার মত তাদের হাত থেকে বন্দুক-গুলি খসে পড়ে গেল।

রাজকুমারের জ্ঞান একটু থাক্‌লেও কর্ম্মশক্তি ছিল না। কিন্তু একটী বিষয় লক্ষ্য করে তার সাহস ফিরে এল, সে দেখ্‌ল যে সিংহটাই লাফাতে চেষ্টা করছে সেটাই চীৎ হয়ে মাটীতে পড়ে যাচ্ছে।

আর একটু ভাল করে দেখ্‌ল এক একটা তীর তা'দের উপর আর নীচের ঠোঁট এমন ভাবে গেঁথে দিয়েছে যে তাদের আর 'হাঁ' করবার জো নাই। আর দুটো তীর তাদের পাগুলো দুটো দুটো করে গেঁথে ফেলেছে। তাঁর মনে হ'ল এ কাজ মানুষের সম্ভবপর নয়, এ নিশ্চয়ই ভূতের কাজ। আর তা মনে না করার তো কোন কারণও নেই, কেননা কাছে কোন লোক জন নাই। ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুটে এসে লাগছে আর জানোয়ারগুলি পড়ে যাচ্ছে। এর পর একদল বাঘ এল তাদেরও সেই অবস্থা। ক্রমে ক্রমে আরও জানোয়ার এল সবারই ঐ এক দশা হ'ল। দলে দলে পশু রাশীকৃত হয়ে পড়ে রইল। ক্রমে রাজার লোকেরা এসে উপস্থিত। তারা দুই একটা তীর খুলে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগ্‌ল ও অবাক্ হয়ে রাজকুমারের মুখের দিকে তাকাতে লাগ্‌ল। সে তীরে রাজার নামাঙ্কিত ছিল। তা'রা তখন মনে কবুল রাজার মৃত্যু হয়নি, তিনি এই বনে অশরীরী মূর্ত্তি ধরে আছেন। তখন তারা সবাই ডাকল্, রাজা! "রাজা!! রাজা!!!" হঠাৎ বনের মধ্যে একটা ভীষণ শব্দ হল। তারপরই একটা দৈববাণী, "রাজকুমার, যা কিছু দেখ্‌লে সবই ভৌতিক ব্যাপার নয়। আমি জীবদ্দশায় ঐ ভাবেই শিকার কর্‌তাম, তারই নিদর্শন তোমায় দেখালাম। সর্দ্দারগণ! এখনও আমার আত্মার সদগতি হয়নি। বাকী জন্তু দিয়ে তর্পন কর।" রাজকুমারের জ্ঞান সম্পূর্ণ ফিরে এল। সে হাত যোড় করে সেই মৃত শিকারিশ্রেষ্ঠের উদ্দেশ্যে একটু বড় রকম নমস্কার করে, তাঁর ঈপ্সিত জয়টীকা তাঁরই পাদমূলে অর্ঘ্য দিয়ে বাড়ী ফিরে এল। কিন্তু আমরা যতদূর জানি তারপর থেকে আর কখনও তাকে বল্‌তে শুনিনি যে আমি বড় শিকারী।

রঙ্গ-কণা

(শ্রীদেবকীনন্দন অধিকারী, তমলুক)

ছোট নদীটী বড় গভীর। একটী লোক নদীর টানে পড়িয়া স্রোতের টানে ডুবুডুবু, পারে একটী সাহেব দাঁড়াইয়া ছিল। লোকটা সাহস পাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল; "ওগো! আমায় রক্ষা কর!" সাহেব বলিল—"বাঃ! বেড়ে Scenery একটু থামো! আগে ফটোটা তুলে নি!"

আবার চুরি ঃ—'ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠকে' আবার দুইটী চোরাই মাল গ্রাহক-গ্রাহিকারা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। যে লেখকদের নামে অভিযোগ তাহাদিগকে আমরা পত্র দিয়াছি। তাহাদের বক্তব্য কি শুনিয়া আগামী মাসে তাহাদের নাম-ধাম বাহির করিয়া দিব।

—সম্পাদক।

লোহার ঘর

বড় বড় ব্যাঙ্কে অনেক সময় বিস্তর টাকা পয়সা গচ্ছিত থাকে, কাজেই সেখানে চুরি ডাকাতির ভয়ও অনেকখানি। লণ্ডন সহরে মিডল্যাণ্ড্ ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক সেজন্য আজকাল একটা খুব নিরাপদ ঘর তৈরী হইয়াছে। এই ঘরটির দেয়াল, ছাদ, মেঝে আগাগোড়া শক্ত লোহায় তৈরী। সে সব ভাঙ্গিয়া সহজে আর সে ঘরে ঢুকিবার উপায় নাই। লোকে তাদের দামী দামী জিনিষ-পত্র নির্ব্বিঘ্নে ইহার মধ্যে রাখিয়া যাইতেছে।

ইলেক্ট্রিক বাল্বের মধ্যে যীশুর মূর্ত্তি

আমেরিকার এক ওস্তাদ্ কারিগর একটা ইলেক্ট্রিক্ বাল্বের মধ্যে তার দিয়া যীশুখীষ্টের একটি মূর্ত্তি গড়িয়াছে—লোকটির বাহাদুরী এই যে মূর্ত্তির মালমশলা সে বাল্বের ভিতর ঢুকাইয়াছে অতি ছোট্ট একটা ছিদ্রের ভিতর দিয়া। সে ছিদ্র এত ছোট যে একটা তারই শুধু তার মধ্য দিয়া ঢুকিতে পারে, আর কিছু যায় না। অদ্ভুত কৌশলের সহিত ঐ তার জড়াইয়া সে এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি তৈরী করিয়াছে। এই কাজ শেষ করিতে তার সময় লাগিয়াছে আড়াই বছর।

মেঘের পরাজয়

ইয়োরোপের কোনও একটা জায়গায় অনেক দিন ধরিয়া বৃষ্টি না হওয়ায় লোকজনের বড় ক্ষতি হইতেছিল। দুইজন ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক ইহায় একটা বিহিত করিবার জন্য এয়ারোপ্লেন লইয়া আকাশে চলিলেন—ইচ্ছাটা মেঘের সাথে একটা বুঝাপড়া করিবেন। তার পর দেখা গেল—সেই অনাবৃষ্টির দেশে প্রায় দুই মাইল জায়গা যুড়িয়া অবিরল ধারায় বৃষ্টি শুরু হইয়াছে। মেঘের উপর বরফ ফেলিয়া মেঘ জমাইয়া বৈজ্ঞানিকেরা এই অসম্ভব কাণ্ডটি সম্ভব করিয়াছেন।

বয়স্কাউট রক্‌ফেলার

পৃথিবীবিখ্যাত ধনী, কোটি কোটি টাকার মালিক জন্ ডি রক্‌ফেলারের নাম তোমরা নিশ্চয়ই সকলে জান। তাঁর বয়স ৯০ বছর, কিন্তু এখনও তিনি ছেলেদের সাথে সমানে পাল্লা দিয়া মিশিতে ভালবাসেন। সম্প্রতি ইনি আবার বয়স্কাউট্‌দের দলেও নাম লিখাইয়াছেন।

সবচেয়ে বড় বাইবেল—

ষ্টক্‌হল্‌ম্ সহরের ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে একখানি বাইবেল আছে—সেটাই নাকি পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে বড় বাইবেল। চওড়ায় সেটা ১ ফুট ৮ ইঞ্চি আর উঁচুতে ৩ ফিট।

কাগজের নৌকায় সমুদ্রযাত্রা

টমাস্ গ্রেড্ আমেরিকান্ নাবিক। অদ্ভুত কারিগর বলিয়াও তার যথেষ্ট নাম আছে। সম্প্রতি সে একটি কাগজের নৌকা তৈরী করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া তাহাতে চড়িয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রায় তিন মাইল বেড়াইয়া আসিয়াছে। ঐ নৌকা সে তৈরী করিয়াছে শক্ত পেষ্ট্‌বোর্ড্ দিয়া। আর তলায় যে সব জায়গায় জল লাগিতে পারে সে সব অয়েল পেপার দিয়া ঢাকা। নিরাপদ করিবার জন্য অয়েল পেপারের উপর অন্য একটা মশলাও সে লাগাইয়াছে—সেটাও তার নিজেরই আবিষ্কৃত।

নাচের পাল্লা

এ ব্যাপারটিও আমেরিকায় ঘটিয়াছে। দু'টি স্কুলের মেয়ে বাজী রাখিয়া কে কতক্ষণ নাচিতে পারে তাহারই পাল্লা দিয়াছিল। মজা দেখিবার জন্য লোকও জুটিয়াছিল যথেষ্ট। ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক শেষ হইল না। ৩৫ ঘণ্টা নাচিবার পর মেয়ে দু'টির একজন অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। অপরটি তবুও নাচ বন্ধ করিল না। কিন্তু খানিক পরেই ডাক্তারেরা তার শরীরের অবস্থা দেখিয়া জোর করিয়া নাচ বন্ধ করিয়া দিলেন।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৭০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষ্যে বোলপুর শান্তিনিকেতনে এই ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে! সেইদিন সকালে তাঁহাকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া মন্ত্রপাঠাদি করা হয়, ও অভিনন্দন ও অর্ঘ্য দেওয়া হয়। সুদূর চীন-জাপান দেশের বড় বড় লোকেরাও অভিনন্দন পাঠ করেন। কলিকাতায় আর কিছুদিন পরেই একটু বিশেষভাবে ঐ অনুষ্ঠান করা হইবে, এ বিষয়ে স্থানান্তরে একটী বিজ্ঞপ্তি দেওয়া গেল।

মিষ্টিপাতা

অষ্ট্রেলিয়ার কাছাকাছি একটা দ্বীপে এক রকম অদ্ভুত ধরণের গাছ আছে। সে দেশের লোকেরা তাকে বলে 'কো য়া' গাছ। এই গাছের পাতা নাকি আশ্চর্য্য রকম মিষ্টি। এই

গাছের পাতা হইতে চিনি তৈরী করা যায় কিনা তাই লইয়া আজকাল পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাইতেছেন।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। অসি ২। চশমা

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

অঞ্জলিকুমার বসু (হাজারিবাগ), রেণুকা সিংহ (ভবানীপুর) অনিল, প্রফুল্ল, সুনীল, সুধাংশু, হাসি, মণ্টু (বাঁকিপুর) মুরলী, ললিত, রণজিৎ, রেণু, বাণী, নন্দ, মণি, কানাই, অম্বু, দুর্গা, রবি (কলিকাতা), অশোকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য (কাশী), কমল পীণ্টু, সুকু, বকু, কাণু, বিনু, শক্তি (ঢাকা), রামরতি চক্রবর্ত্তী (কালিঘাট), সুজাতা দেবী (ভবানীপুর), ইন্দুবিকাশ, অমিয়, শান্তি, প্রবোধ, মৃণাল, পঙ্কজ, নীলু, বি, বত্ত (শিবসাগর), সুকুমার ও করুণা (বেড়া, পাবনা), রুবি ও ছবি দত্ত (ফরিদপুর), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), ইয়ংস্ লাইব্রেরীর সভ্যগণ (গঙ্গারামপুর), দেবকীনন্দন অধিকারী (তমলুক), নিরুপম লাহিড়ী (মাহিগঞ্জ)।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন—

শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা), এণাক্ষি ও প্রবোধ (কলিকাতা), প্রতিভা ও মনোরমা দেবী (ভবানীপুর), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), গোপাল (কাঁথি), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী (কানুনগো পাড়া), গোবর্দ্ধন, রাম, গোপাল, শিবু, শান্ত, বলাই, লক্ষ্মী, বিভূতি, অজিত, ভোলা ও ভবানী (বড়া, হুগলী) বড়দি, মেজদি, সেজদি, সন্ধ্যা দে (দেমারি), পূর্ণিমা সেন ও উমা সেন (নাগপুর) কল্যাণ, কুশল, মানু, জনী, কুমুদ, লুথী, মীরা ও মণি (পাটনা), বিমল, অমল, নির্ম্মল, কমল, তুষার (শিলং), সুব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, নরেশ ও সুনীতি (ভাগলপুর), বীণাপাণি বসু (বেতিয়া), ভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরী (ভবানীপুর, কলিকাতা), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা)।

নূতন ধাঁধা

দু'টি লোক গাছের তলায় খেতে বসেছে। একজনের কাছে আছে পাঁচ খানা রুটী, আর একজনের কাছে তিনখানা। তারা খেতে আরম্ভ করবে—এমন সময় সেখানে আর একজন পথিক এসে হাজির হল। তারও বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, সঙ্গে পয়সাও আছে কিন্তু খাবার পাচ্ছেনা। লোক দু'টি বল্লে, "আচ্ছা, তুমি বস, আমাদের খাবার আমরা তিন জনে ভাগ করে নিচ্ছি।" পথিক রাজী হল। তার পর সেই আট খানা রুটী তিন জনে সমান ভাগ করে নিয়ে খেল। যাবার সময় পথিক তাদের রুটীর দাম বাবদ আটটা পয়সা দিয়ে চলে গেল।

এখন গোল বাধল পয়সার ভাগ নিয়ে। যে লোকটির কাছে পাঁচ খানা রুটী ছিল সে বল্ল, "আমি পাঁচ পয়সা নেব, তুমি তিন পয়সা নাও।" অপর লোকটি কিন্তু তাতে রাজী নয়, সে অর্দ্ধেক দাবী করে। মহা সমস্যা। মারামারি বাধে আর কি! তোমরা বল দেখি কার ক' পয়সা পাওয়া উচিত।

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

সপ্ততিতম জন্মোৎসব

কলিকাতা, ১৩৩৮

অদ্য ২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮ (শুক্রবার, ৮ই মে, ১৯৩১) কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম সপ্ততি বৎসর পূর্ণ হইল। আমরা মনে করি যে, এই শুভঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া, সমগ্র দেশবাসীর পক্ষ হইতে, কলিকাতা নগরীতে, তাঁহার যথোচিত সংবর্দ্ধনা এবং একটি আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

ঐ সংবর্দ্ধনা ও তাহার আনুষঙ্গিক উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য, আগামী ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮ (শনিবার, ১৬ই মে, ১৯৩১) সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময়, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্ গৃহে একটী পরামর্শ সভার অধিবেশন হইবে।

সকলের যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু	ফস্, কলিকাতার লর্ড বিশপ	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়	আর্থার মুর	চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন্

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকামিনী রায়
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন-গুপ্ত
বাসন্তী দেবী
শ্রীঅবলা বসু
শ্রীসরলা রায়
শ্রীনীলরতন সরকার
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
আবুল কালাম্ আজাদ্
ঘনশ্যামদাস বিরলা
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল
শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
সুচারু দেবী (ময়ূরভঞ্জ)
শ্রীমন্মথনাথ রায় চৌধুরী (সন্তোষ)
শ্রীচারুচন্দ্র ঘোষ
শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ সরকার
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু
শ্রীবিজয়প্রসাদ সিংহ রায়
খাহ্‌জা নাজিমউদ্দিন
শ্রীযদুনাথ সরকার
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
গগনবিহারী এল্ মেহতা
শিবানন্দ (বেলুড়)
ডেভিড এজ্‌রা

শ্রীদেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী
শ্রীহৃষীকেশ লাহা
শ্রীশ্রীশচন্দ্র নন্দী (কাশিমবাজার)
ডব্‌লু এস্ আরকুহার্ট্
শ্রীজ্ঞানরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীহেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
এ কে ফজলুল হক্
এইচ্ এ গিড্‌নী
শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন
শ্রীজলধর সেন
মুজীবর রহমান্
শ্রীনরেশচন্দ্র সেন-গুপ্ত
আনন্দ্‌জী হরিদাস
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত
এস্ খোদা বক্স্
শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় (নাটোর)
সরলা দেবী
মাল্লুক সিং বেদী
হরিরাম গোয়েঙ্কা
পদমরাজ জৈন
শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র

হাসন সুরাবর্দ্দী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু
শ্রীবিধানচন্দ্র রায়
শ্রীপ্রফুল্লনাথ ঠাকুর
মোহাম্মদ আকরম খাঁ
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত
সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্
শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মল্লিক
শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু
শ্রীদুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
ই সি বেন্‌থল্
শ্রীপ্রসন্নকুমার রায়
শ্রীশরৎকুমার রায় (দিঘাপাতিয়া)
শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার
নন্দলাল পুরী
ওঙ্কার মল্ জাতিয়া
জাহাঙ্গীর কয়াজী
শ্রীসরোজিনী দে
গুরদিৎ সিং
এ এফ্ এম্ আবদুল আলি

২৫শে বৈশাখ, ১৩৩৮।

আল্পস্ লঙ্ঘনে নেপোলিয়ান্

শিল্পী—জ্যাক্ লুই ডেভিড্।

৪র্থ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৮ { ৭ম সংখ্যা।

বড়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

মনে ভাবি পৃথ্বী বড়
ইহার বড় নাই।
স্থলের চেয়ে জল যে বেশী,
বড় সাগরটাই।
সমুদ্রকে বড় আবার
বলি কেমন করে ?
অগস্ত্য তা পান করিল
গণ্ডূষেতে ধরে !

আল্পস্ লঙ্ঘনে নেপোলিয়ান

শিল্পী—[illegible]

৪র্থ বর্ষ } শ্রাবণ, ১৩৩৮ { ৭ম সংখ্যা

বড়

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

মনে ভাবি পৃথ্বী বড়
ইহার বড় নাই।
স্থলের চেয়ে জল যে বেশী,
বড় সাগরটাই।
সমুদ্রকে বড় আবার
বলি কেমন করে ?
অগস্ত্য তা পান করিল
গণ্ডূষেতে ধরে !

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

তবে কি অগস্ত্য বড় ?
তাই কি বলা যায় ?
আকাশে নক্ষত্র সে ও
খদ্যোতেরি প্রায় !
তবে আকাশ সবার বড়
সন্দেহ নাই আর,
বামন যে তায় এক পদেতে
কর্‌লে অধিকার !
দেখ্‌ছি বড় বামনরূপী
স্বয়ং ভগবান্,
কিন্তু তাতে কোনো ক্রমেই
সায় দিলে না প্রাণ।
এমন বিরাট্ ভগবানে
বক্ষে ধরে যে,
ভক্ত—তাঁরেই প্রণাম করি
সবার বড় সে। *

মেরুর আলো

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

পৃথিবীতে দেখিবার জিনিষের অভাব নাই। বন জঙ্গলের বাহার দেখিতে চাও আফ্রিকার গহন অরণ্য পড়িয়া আছে ; মরুভূমির ধারণা করিতে চাও আরব আছে, সাহারা আছে ; পাহাড় পর্ব্বতের শোভা দেখিতে সাধ যায়, সুইট্জারল্যাণ্ডে যাইতে পার, ঘরের কাছে কাশ্মীরও চমৎকার !

আমাকে কিন্তু কোথাও যাইতে বলিলে আমি আগে বাছিয়া লইব মেরুর দেশ।

* সংস্কৃত হইতে অনূদিত

চারিদিকে ধূ ধূ করিতেছে সীমাহীন বরফ—মাঝে মাঝে দু' একটা বরফের ঘর এদিক্ ওদিক্ ছড়ান। গাছপালা, লোকজন, হাটবাজার কিছুরই কোন বালাই নাই ; সব নিঃঝুম, চুপ্‌চাপ্। ক্বচিৎ কখনও হয়ত দু' একটা শাদা ভালুক কিংবা বড় হরিণ গুটি গুটি পা ফেলিয়া ভারিক্কি মেজাজে চলিয়াছে। কিংবা বরাত ভাল থাকিলে হয়ত দু' একজন এস্কিমোরও দেখা মিলিতে পারে—সারা গায়ে ভালুকের মত পোষাক আঁটিয়া বর্ষা হাতে সীল শিকার করিতে যাইতেছে। রাত্রি যখন আসিল তখন ছ'মাস ধরিয়া রাতই চলিল, আবার যখন দিন তখন—একটানা ছ' মাসই দিন। ভারী মজার দেশ, না ! আশ্চর্য্য হইবার মতই বটে।

মেরুর দেশ।

কিন্তু এ সবার চাইতেও আশ্চর্য্য ব্যাপার চোখে পড়িবে যখন একদিন শীতের রাতে আকাশের গায়ে মেরুর আলোর দেখা পাইব,—যাকে সাহেবেরা বলে 'অরোরা বোরিয়ালিস্'।

অরোরা বোরিয়ালিস্ নাম পড়িয়াই যেন তোমরা বই বন্ধ করিও না। নামটা খুবই খটমট স্বীকার করি ; মুখে উচ্চারণ করিতে তোমাদের বোধ হয় একটু কষ্টও হইতেছে ; কিন্তু জিনিষটি একবার চোখে দেখিলে সে কষ্টের কথা যে আর তোমাদের মনে আসিবে না তা আমি হলফ্ করিয়া বলিতে পারি। শীতকালের রাত্রিতে মেরুর আকাশের চারিদিকে কয়েক শ' মাইল ঘিরিয়া এই আশ্চর্য্য আলোর খেলা চলিতে

থাকে। এ আলোর সাথে তুলনা দেওয়া যায় এমন আলো পৃথিবীতে নাই। দিনের উজ্জ্বল আলোর ভিতরেও সাদা আকাশের গায়ে রামধনুর ছায়া দেখিয়া আমাদের তাক্ লাগিয়া যায়, আর যদি রামধনুর মত লাল, নীল, সবুজ, বেগুণী রংএর অনেকখানি আলো—তার চাইতেও অনেক সুন্দর, অনেক স্নিগ্ধ, অনেক বড়—সে যদি অন্ধকার আকাশের কালো পর্দ্দার বুকে ঘুরিয়া বেড়ায়, তবে সে রং কেমন খোলে বল দেখি! সূর্য্যের আলো, চাঁদের আলো, তারার আলো—এগুলি সবই স্থির, আকাশের একটি ধারে চুপটি করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু মেরুর এ আলো সে রকম মোটেই নয়,—সারা আকাশময় যেন সে চর্কী বাজির মত ঘুরিয়া বেড়ায়। নানা রকম কসরৎ দেখানই যেন তার একমাত্র কাজ। এই হয়ত রংচংএ পর্দ্দার মত আলোটি আকাশের গায়ে ঝুলিতেছিল, হঠাৎ বহুরূপীর মত রং বদ্‌লাইয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তার পর এক লাফে উপরে উঠিয়া গেল; আবার একটু পরেই হয়ত দেখিবে সে আলো নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে; কখনও হয়ত ঘুর্ণি-পাকের মত ঘুরপাক খাইতেছে, আবার কখনও হয়ত টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া পিচ্‌কারির মত সারা আকাশময় ছড়াইয়া পড়িতেছে।

মেরুর দেশে কি রকম বরফ তারই একটু নমুনা।

বছর বছর কত দূর দূরান্তর হইতে সাহসী লোকেরা শুধু এই আলোর খেলা দেখিবার জন্য নরওয়ের উত্তরে আসিয়া হাজির হয়। সেই দুরন্ত শীতের রাত্রি তুচ্ছ করিয়া অন্ধকার রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই অদ্ভুত আলোর

দিকে চাহিয়া কাটাইয়া দেয়,—এ দৃশ্যের কাছে কোন কষ্টই যেন তাদের গায়ে লাগে না।

আমি জানি এইবার তোমরা মনে মনে কি ভাবিতেছ! তোমরা ভাবিতেছ—এমন চমৎকার যে আলো, এ আসিল কোথা হইতে? আর যদি আসিলই তবে এত জায়গা থাকিতে শুধু ঐ হতচ্ছাড়া মেরুর দেশটাতেই রহিয়া গেল কেন? অন্য দেশ হইলে তবুও হয় ত একবার জিনিষটা চোখে দেখিয়া চোখ সার্থক করা যাইত, কিন্তু ওই মেরুর দেশে যাওয়া ত আর চারটি খানি কথা নয়!

সেকালকার লোকেরা এই অদ্ভুত ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিতেন না—তাঁরা জিনিষটাকে একটা ভূতুড়ে কাণ্ড মনে করিতেন কিন্তু আজকালকার পণ্ডিতেরা নাছোড়বান্দা; এই অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ তাঁরা না বাহির করিয়া ছাড়েন নাই, আর শুধু বাহির করা নয়, ঠিক্ ঐ উপায়ে ঘরের মধ্যেও তাঁরা নকল মেরুর আলো তৈরী করিয়াছেন।

মেরুর আলো—অরোরা বোরিয়ালিস্।

একটা বোতলের ভিতর হইতে বাতাস পাম্প্ করিয়া লইয়া তার মধ্যে যদি খানিকটা বিদ্যুৎ চালাইয়া দেওয়া যায় তবে ঐ ফাঁকা বোতলের মধ্যে নানা রকম রঙ্গিন আলোর খেলা দেখা যায়। পণ্ডিতেরা বলেন মেরুর যে অদ্ভুত আলো সেও হয়, ঠিক এম্‌নি

করিয়া। সুদূর আকাশের গায়ে নয়—এই পৃথিবীরই বাতাসের উপর তার জন্ম। বাতাসের উপরের দিক্‌টা সেখানে ভয়ানক হাল্কা, তারই উপর বিদ্যুৎকণা পড়িয়া এই আশ্চর্য্য রং বেরংএর আলো জ্বলিয়া উঠে। আমাদের এই সূর্য্যটা আসলে একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুৎ-শক্তির গোলা। মাঝে মাঝে এই প্রকাণ্ড গোলাটির মধ্যে কোন একটা গোলমাল পাকাইয়া উঠে, সূর্য্যের গায়ে ঘূর্ণির মত দাগ দেখা দেয়, আর তারই ফলে তার শরীর হইতে নানা রকম আলো আর বিদ্যুৎ-কণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। পণ্ডিতেরা তাকে বলেন ইলেক্ট্রন্। এই ইলেক্ট্রনের খানিকটা আবার ভীম বেগে ছুটিতে ছুটিতে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল পথ পার হইয়া আমাদের পৃথিবীর উপর আসিয়া পড়ে। আর সেই ইলেক্ট্রন্‌ই বাতাসের হাল্কা চূড়ার উপর পড়িয়া মেরুর দেশের ঐ আশ্চর্য্য রঙ্গিন আলোর সৃষ্টি করে।

এইবার তোমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটির জবাব দিই। এত জায়গা থাকিতে এই অরোরা বোরিয়ালিস্ শুধু মেরুর দেশেই কেন দেখা দেয়?

তোমরা সকলেই বোধ হয় চুম্বক দেখিয়াছ এবং চুম্বক জিনিষটা কি তাহাও জান। কোন একটা চুম্বকের কাছে খানিকটা লোহার গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে দেখিবে লোহাগুলি চুম্বকের দুই মাথার দিকে চলিয়া গিয়াছে, আর সেখানে তারা কেমন বাঁকা ভাবে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আমাদের এই পৃথিবীটাও একটা প্রকাণ্ড চুম্বকের গোলা—আর তার দুই মাথা হইতেছে দুই মেরুর দেশ—উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। কাজেই সূর্য্য হইতে ইলেক্ট্রন্‌গুলি আসিয়া যখন পৃথিবীর উপরে পড়ে তখন পৃথিবীও ঠিক তাদের সাথে ঐ ছোট্ট চুম্বকটির মতই ব্যবহার করে। ইলেক্ট্রন্‌গুলি এই বিরাট্ চুম্বকের দুই মাথা—দুই মেরুর দিকে চলিয়া যায়, আর সেই সময় মেরুর কাছাকাছি হাল্কা বাতাসের চূড়ার উপর পড়িয়া সেখানে ঐ অদ্ভুত আলোর সৃষ্টি করে।

ভুতুড়ে পাহাড়

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

বর্ষাকালে কবি দ্বিজু রায়ের নাকি সব চাইতে ভাল লাগিত—"মুড়ি দিয়ে ফুলুরি খেতে কুপ্‌কাপ্!" পুরা কবি না হইলেও বিবাহের প্রীতি উপহার টুপহার দু'পাঁচটা লিখিয়াছি তো, তাই সেদিন বর্ষায় আমরাও ফুলুরি খাইতেছিলাম, তবে মুড়ি দিয়া নয় চা দিয়া।

"ভোজ"টা চলিতেছিল দার্জ্জিলিংয়ের লুইস্ জুবিলি স্যানিটেরিয়ামে বসিয়া। নানা রকমের গপ্প হইতে হইতে শেষটায় একেবারে সেরা গপ্পে আসিয়া পৌঁছিল—ভূতের গপ্পে। আমরা সবাই কলিকাতায় থাকি, পূজার ছুটীতে দিন কয়েকের জন্য হাওয়া বদ্‌লাইতে আসিয়াছি মাত্র। কিন্তু কানাই বাবু দার্জ্জিলিংএর বরাবরকার বাসিন্দা; তিনিই আসর জম্‌কাইয়া তুলিলেন প্রশ্ন করিয়া—"মশাইরা ভূত মানেন?"

দেখিলাম সবাই মানে, শুধু এই পরম পাপী আমি ছাড়া। শুধু মানা নয়, সকলেই নাকি এক এক বার করিয়া ভূতের খপ্পরে পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল, বহু কষ্টে পার পাইয়াছে। অবিনাশ তো নাকি সাবাড়ই হইয়া যাইত, যদি না তাদের উড়ে বামুনের টিকিটা চাপিয়া ধরিতে পাইত। তবু ভূত তাকে শাসাইয়া রাখিয়াছে—"বাঁগেঁ পাঁবঁরে এঁক দিঁন পাঁবোঁ!"

ঘাড় বাঁকাইয়া একটু হাসিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু অবিনাশের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেল না। সে রাগিয়া বলিল, "কিষ্কিন্ধ্যার মর্কট্ তুমি, হাস্‌বেই তো বাবা! তবে এও বলে রাখ্‌ছি যে প্রভুরা যদি বাস্তবিকই কৃপা একবার করেন তো তোমার সুগ্রীব-অঙ্গদের ঠাকুর্দ্দা এলেও ঠেকাতে পারবে না!"

অবিনাশের স্বভাবই এই; কথার প্রতিবাদ করিলেই রাগিয়া যায়, আর রাগিয়া গেলেই আমাকে "কিষ্কিন্ধ্যার মর্কট্" বলিয়া গাল পাড়ে! তার কারণ, বাল্যকালটা আমার কাটিয়াছিল বরাবরই মান্দ্রাজে, এবং পণ্ডিতেরা নাকি অনেক গবেষণা করিয়া

ঠিক করিয়াছেন যে পৌরাণিক আমলের কিষ্কিন্ধ্যা সহরটী ছিল আজকালকার মান্দ্রাজ সহরের কাছাকাছি কোন একটা জায়গায়। অতএব……"

অবিনাশের কথার আমি কোনই প্রত্যুত্তর করিলাম না, কেননা তাহাতে কোনই লাভ নাই, উপরন্তু আরও কিছু গালি খাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কথাগুলি যে তার আমি নিতান্তই তাচ্ছল্যের সহিত লইতেছি, কানাই বাবু সেটী বুঝিলেন; আমার মুখের দিকে একটুকাল চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বোধ করি ওসব দুর্ব্বলতা আদৌ নেই বিজয় বাবু, ভূত-টূত বোধ করি কুসংস্কার বলেই মনে করেন।"

"আপনি ঠিক ধরেছেন কানাইবাবু, ওবিষয়ে অবিনাশ ভায়ার মত ঠিক অতখানি উঁচুতে এখনও উঠ্‌তে পারিনি।"

"আচ্ছা সন্ধ্যের পর একা একা একবার রোংরু পাহাড়টা ঘুরে আস্‌তে পারেন?"

"পারি যদি, যে পাহাড়টার নাম কর্‌লেন সেটা অতিমাত্রায় দুর্গম না হয়, আর সেখানে যাবার পথটা বাৎলে দেন।"

কানাইবাবু কহিলেন, "না না, দুর্গম তেমন কিছু নয়—সহর থেকে মাইল চারেকের ভেতরেই জায়গাটা। তবে লোকজনের চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় রাস্তা-ঘাট জংলা হয়ে গেছে সে কথা সত্যি। শীতকালে শোনা যায় কখনো কখনো ভালুক টালুকও দু একটা বার হয়, তবে এ দিনে সে ভয় কিছুমাত্র নেই। দূর গাঁয়ের পাহাড়ীরা ক্বচিৎ কখনো কখনো ওপথ দিয়ে সহরে এসে থাকে বটে, তবে সে দিনমানে। সন্ধ্যার পর রোংরু পাহাড়ে পা দিতে পারে এমন সাহসী পুরুষ এ তল্লাট খুঁজে একটীও পাবেন না।"

"কেন?"

"ওখানে একটী সাহেব ভূত আছে!"

সাহেব মরিয়া ভূত হইলেই তাকে 'সাহেবভূত' বলা হয় এ কথা জানিতাম। আরও জানিতাম, লোকের ধারণা অপর ভূতের চাইতে সাহেব ভূতেরা ঢের বেশী হিংস্র—মানুষের দেখা পাইলে তার রক্ত পান করা তাদের চাই-ই চাই। তাই সমস্ত ব্যাপারটা জানিবার জন্য ভারী কৌতূহল হইল, কানাই বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ত

সহর থেকে অত দূরে অমন নিরালা পাহাড়ে গিয়ে সাহেব ভূত তার আড্ডা গাড়্‌লে কেন?"

কানাই বাবু বলিলেন, "সে এক ইতিহাস মশাই। বোধ করি আট দশ বছর

সে এক ইতিহাস মশাই…

আগেকার কথা, এক খ্রীষ্টান পাদ্রী সাহেব গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে অল্প কিছু জায়গা ইজারা নিয়ে নিজের থাক্‌বার জন্যে রোংরু পাহাড়ে ছোট্ট একটা কুঠি বানাল। সাহেবের মৎলবটা বোধ করি ছিল ওখানে একটা স্থায়ীমত আড্ডা গেড়ে আশ-পাশের গাঁ গুলোতে ধর্ম্ম-প্রচার করে বেড়াবে। সহরের বাইরে একটু নিরিবিলিও হবে, আবার যখন খুসী ঘোড়ায় চড়ে সহরে এসে পৌঁছাতে কোন বেগও পেতে হবে না। তার অভিপ্রায় কিন্তু পূর্ণ হতে পেলে না। কুঠি তৈরী হবার সঙ্গে সঙ্গেই একদিন বাগানের হাতায় তাকে সাপে কাট্‌লে, সাহেবকে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হ'ল। অপঘাতে মরার দরুণ ভূত হয়ে সে তার কুঠি আগ্‌লে বসে আছে, তার দাপটে রোংরু পাহাড়ের ত্রিসীমানায়ও কারো ঘেঁষ্‌বার জো নেই। কতবার কত পাহাড়ীর কাছে সেই বীভৎস প্রেতাত্মার কথা শোনা গেছে—অমন ভয়ানক মূর্ত্তি নাকি কল্পনাতেই আনা যায় না। মুখ হাত গুলো আগুনে পোড়া অঙ্গারের মত কালো হয়ে গেছে; সেই

কালো মুখে ইয়া বড় বড় আগুনের গোলার মত টক্‌টকে লাল দুটো চোখ। ক্রমাগত সে দুটো ঘুর্‌ছে। মিশনারি সাহেবদের মত আলখাল্লা গোছের একটা পোষক পরে কুঠির আশ্‌পাশে প্রেতাত্মা ঘুরে বেড়ায়, মানুষ দেখ্‌লেই বিকট হুঙ্কার করে ধেয়ে আসে।”

কানাই বাবু বর্ণনা শেষ করিয়া থামিলেন; সকলেই স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। আমি কহিলাম, “ভূতের তো মশাই অধ্যবসায় আছে খুব! এই দশ বছর ধরে সমানে সে কুঠি আগ্‌লে বসে আছে, অত্যাচার তার একটুও কমেনি?”

কানাই বাবু বলিলেন, “ছাই কমেছে। বরং কিছুকাল হোল নতুন উৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে। এত দিন শুধু সাহেব ভূতের বেরিয়ে বেড়ানর কথাই শুনে আস্‌ছিলাম, কিন্তু কিছু দিন থেকে শুন্‌ছি রাত একটু গভীর হলেই নাকি আজকাল প্রকাণ্ড একটা আলোর ভাঁটাকে কুঠির চার পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা যাচ্ছে। মস্ত ভাঁটাটি, চারদিক্ থেকে নাকি তার তীব্র সবুজ আলো ঠিক্‌রে বার হয়। কথাটাকে গোড়াতে যে গাঁজাখুঁরি বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা না হয়েছিল তা মনে কর্‌বেন না, কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণের বাড়া তো আর প্রমাণ নেই! সেই চাক্ষুষ প্রমাণই পাওয়া গেছে। বার্চ্চ হিলের ওপর থেকে নীচে রোংরু পাহাড়ের কুঠিটা দিব্যি চোখে পড়ে, কাল রাত্রে আমরা ক’ বন্ধুতে স্পষ্ট সেই ভূতুড়ে আলোর ভাঁটাকে কুঠির চারপাশে ঘুর্‌তে দেখেছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সহরের এত কাছে ব্যাপারটা ঘট্‌ছে, আর পুলিশ একবার তদ্বির করাটাও আবশ্যক বোধ কর্‌ছে না?”

জিব্ এবং তালুর সাহায্যে একটা শব্দ উচ্চারণ করিয়া কানাই বাবু বলিলেন, “আরে মশাই পুলিশ! স্বয়ং ডেপুটী কমিশনারের কাণে কথাটা তোলা হয়েছিল, তা তিনি ত হেসেই অস্থির, বল্লেন, ‘খুব বীরপুরুষ তোমরা, বোঝা গেছে! এখন যার যার নিজের নিজের বাড়ী যাও, আলোর ভাঁটা যখন তোমাদের বাড়ী গিয়ে পৌঁছোবে তখন ফের এসে খবর কর।’

অবিনাশ রাগিয়া বলিল, “হুঁ, দরদ তো উপ্‌চে পড়্‌বেই, সাহেব ভূত কিনা!”

সে রাত্রে আমায় গিয়া অবিনাশকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিতে হইল। ভূত যে তাহাকে শাসাইয়া রাখিয়াছে—যদি বাগে সত্যই পায়!

পরদিন ভোর হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়া সুরু হইয়াছিল, ঠিক করিলাম সে সকালটায় আর বেড়াইতে বাহির হইব না। কেন জানি না, বরাবর দেখিয়াছি বাদ্‌লার দিনে আমার ছোট বেলাকার কথা মনে পড়িয়া যায়। শৈশবে মান্দ্রাজী সহপাঠিদের সাথে কি সুখেই না দিন গুলি কাটিয়াছে! বড় হইয়া সে সব বন্ধুরা কে কোথায় ছড়াইয়া পড়িয়াছে কে জানে! দিন কয়েক আগে মান্দ্রাজের এক বন্ধুর কাছ হইতে একখানা গ্রুপ্ ফটো উপহার পাইয়াছিলাম, স্যুট্‌কেশ্ খুলিয়া সেখানা বাহির করিয়া আনিলাম। অশেষাদ্রি চার্লু, লক্ষ্মণ স্বামী আয়েঙ্গার, বেঙ্কট রাঘবম্ সকলেই সে ছবিতে আছে। কিন্তু তবুও যেন তৃপ্তি হইল না—এ তাদের বড় হইয়া তোলা ফটো, ছোট বেলার সেই কচিমুখ গুলি এর মধ্যে নাই। কেবল ভেঙ্কট রাঘরমের চেহারাটায় আগের মত ছেলেমি ভাবই রহিয়া গেছে। দেখিতে ছোট হইলেও সেই ছিল আমাদের মধ্যে সব চাইতে বুদ্ধিমান্। বড় হইয়া সে নাকি কোথায় প্রোফেসারির চাক্‌রী লইয়াছে—অনেক বইও নাকি লিখিয়াছে!

মশ্‌গুল্ হইয়া পুরানো দিনের কথাগুলি ভাবিতেছি, এমন সময় কে যেন ঠক্ ঠক্ করিয়া দুয়ারে আসিয়া ঘা মারিল। উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিতেই দেখি পদম্ বাহাদুর একেবারে মিলিটারী চালে ঘরে ঢুকিতেছে। লোকটা এখানেই কোন্ সরকারী অপিসে চাক্‌রী করে—ভারী শিকারের সখ। কবে নাকি তাকে কথা দিয়াছি তার সাথে শিকারে যাইব, আজ রবিবার দেখিয়া সেই কথাটী স্মরণ করাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তার এ আগমন।

বাদ্‌লার দোহাই, আলস্যের ওজর—কিছুতেই যখন সে নাছোড়বান্দা লোকটার হাত হইতে পার পাওয়া গেল না, অগত্যা তখন বলিলাম, বেশী দূর বাপু যাইতে পারিব না, মেহন্নৎও বেশী করিতে পারিব না—সাদা কথায় পাখী শিকারে যদি তার আপত্তি না থাকে তবে বেলা সাড়ে তিনটায় হাতিয়ার সংগ্রহ করিয়া সে আসে যেন—দেখা যাইবে।

বহুকাল পরে আবার ঘোড়ার উপর। ছেলেবেলায় ঘোড়া চালাইতে খুবই মজ্‌বুৎ ছিলাম, বিনা জিনেও কত চালাইয়াছি, কিন্তু এতদিন কলিকাতায় থাকার ফলে ভুঁড়িটী বেশ একটু নেয়াপাতি গোছের হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ঘোড়ার পিঠে নাচিতে আর রাজী হয় না। কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। ওদিকে সহরের সীমানার ধারে আসিয়াই পদম্ বাহাদুরের ঘোড়া উচ্চৈঃশ্রবার মাসতুতো ভাইয়ের মত এমনই ছুট্ দিল যে আমার সাধ্যেই কুলাইল না তার সাথে সমানে তাল রাখি। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, সময় বুঝিয়াই বোধ করি, জোরে এক পশ্‌লা বৃষ্টি আসিয়া সাম্‌নের দিক্‌টা এমনই ঝাপ্‌সা করিয়া দিল যে কিছুই আর নজরে আসে না। বাঁ দিকে প্রকাণ্ড উঁচু পাহাড়, ডান দিকে পাঁচশো ফিট্ নীচু ঢালু, তার মাঝ্‌খানটা দিয়া ঘোড়া হাঁকাইবার রাস্তা। বৃষ্টিতে এবং কুয়াশায় সাম্‌নে দৃষ্টি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। গোপনে সত্যি কথাটা চুপি চুপি স্বীকার করিয়াই ফেলি—আমার মশায়, সে অবস্থায় ঘোড়া চালাইতে আর সাহসে কুলাইল না। ঘোড়া হইতে নামিয়া জল থামিবার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

এই খানেই বোধ করি একটা ভুল করিয়া ফেলিলাম, কেননা মিনিট্ পঞ্চাশেক পরে জল যখন থামিল তখন আর পদম্ বাহাদুরের টিকি-লেজেরও সাক্ষাৎ নাই। বরাবর আমি সমানে তাহারই পিছনে পিছনে আসিতেছি এই ধারণা লইয়া এতটা সময় সে ঘোড়া হাঁকাইয়া কোথায় কোন্ পথে যে চলিয়া গিয়াছে কে বলিবে! শিকার মাথায় উঠিল, এখন পদম্ বাহাদুরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে হয়!

নিতান্ত দুই এক মিনিট্ নয়, পূরা দেড় ঘণ্টাকাল সেই নির্জ্জন পাহাড়ের অলিতে গলিতে আমি পদম্ বাহাদুরের সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলাম, চীৎকারে গলা ফাটাইয়া ফেলিবার উপক্রম করিলাম, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা! একে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, তায় আবার বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, দেখিতে দেখিতে চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। ভারী পরিশ্রম বোধ হইতেছিল, গাছ-গাছ্‌ড়ায় ভরা একটু খানি ফাঁকা জায়গা পাইয়া জিরাইবার উদ্দেশ্যে সেখানেই ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িলাম। ঘোড়াটাকে ছাড়িয়া দিলাম,—এদিক্ ওদিক্ ফিরিয়া একটু কচি ঘাস খাইয়া লউক্।

গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া বসিয়া ছিলাম, বোধ করি আয়েসে চোখ দুটাও অল্প একটু বুজিয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ যে দৃশ্য দেখিলাম তা ভুলিবার নয়। দুটী ভুটিয়া—তাদের একটী প্রৌঢ় ও অপরটী ছোকরা-বয়সী—দুই টাট্টুতে চাপিয়া টগাবগ্ টগাবগ্ শব্দে সহরের দিকে চলিয়াছে। এতে অবশ্য আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কিন্তু যদি সেই লোক দুইটীর মুখের পানে কেউ চাহিত তবে স্তম্ভিত না হইয়া কিছুতেই সে থাকিতে পারিত না। মড়ার মুখের মত মুখ তাদের বিবর্ণ,—একটা অজ্ঞাত আতঙ্ক চোখ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কোন একটা ভীষণ কিছুর হাত হইতে পরিত্রাহি ভাবে তারা যেন ছুটিয়া প্রাণ বাঁচাইবার চেষ্টায় আছে।

হঠাৎ আমার উপর চোখ পড়িতেই সেই প্রৌঢ় পাহাড়িয়া এক বিকট আর্ত্তনাদ করিয়া ঘোড়ার একধারে হেলিয়া পড়িল। মানুষের উপর হিংস্র বাঘ লাফাইয়া পড়িলে মুখে চোখে তার যে অসহায় ভাব ফুটিয়া ওঠে বইয়ের ভাষাতেই এতদিন তাহার বর্ণনা পড়িয়াছিলাম, এইবার চোখে দেখিলাম। বিদ্যুদ্বেগে লাফাইয়া আমি গিয়া তার টাট্টুর রাশ চাপিয়া ধরিলাম, নহিলে নিশ্চয় সে মাটীতে গড়াইয়া পড়িত। কণ্ঠস্বরটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম্ করিয়া যথাবিদ্যা হিন্দি ভাষায় বলিলাম, "বুড়া বাবা, এত ভয় পাইয়াছ কেন?" ততক্ষণে কিন্তু ছোক্‌রা বয়সী ভুটিয়াটীও ঘোড়ার রাশ টানিয়া একেবারে থামিয়া পড়িয়াছে। চাহিয়া দেখি বিস্ময়-বিস্ফারিত দুই চোখে সে যেন আমায় গিলিতেছে। তারপর ছানাবড়ার মত চোখ দুইটী আমার মুখের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া সে ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল, "বাবুজি, এ সময়ে আপনি এখানে?"

আমি যে কোথায়, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই ছিল না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? সহর থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়েছি নাকি?"

"সহর? সহর এখানে কোথা বাবুজি? চার মাইলের ভেতর এখানে জন-প্রাণীর চিহ্নও নাই, শুধু বন আর পাহাড়—বন আর পাহাড়!"

চারিদিকে, চাহিয়া দেখি, নিবিড় অন্ধকার গম্ গম্ করিতেছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটা কোন্ জায়গা?"

"রোংরু পাহাড়!" ছেলেটার গলার স্বর যেন একটু কাঁপিয়া উঠিল।

রোংরু পাহাড়! কানাই বাবুর কথা বিদ্যুতের মত আমার মনের মধ্য দিয়া খেলিয়া গেল, সমস্ত শরীরে আমার কাঁটা দিয়া উঠিল। এই বলিষ্ঠ নির্ভীক ভুটিয়া ছেলেটা পর্য্যন্ত যে পাহাড়ের নাম করিতে মনে মনে কাঁপিয়া উঠে, না জানি সে কী ভীষণ স্থান!

আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ছেলেটি কহিল, "বাবুজি, ভাব্‌বেন না, আপনি আমার ঘোড়ায় উঠে পড়ুন, আমি ওর লেজ ধরে ধরে দৌড়োব।"

অবাক্ হইয়া যুবক-বীরের মুখের দিকে তাকাইলাম! বাঃ, এইতো মরদের বাচ্চা! প্রকাশ্যে হাসিয়া শুধু বলিলাম, "তার প্রয়োজন নাই, তোমরা রওনা হও, আমার ঘোড়া কাছেই আছে, আমি তাতেই যেতে পার্‌ব।"

দেখিতে দেখিতে ভুটিয়াদ্বয় রাস্তার বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নির্জ্জন হইতেই স্থানটা যে কী ভীষণ ভয়াবহ তাহা যেন নূতন করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই মনে হইতে লাগিল নিবিড় অন্ধকার যেন বীভৎস দৈত্যের মূর্ত্তি নিয়া আমার টুঁটিটি চাপিয়া ধরিতে অগ্রসর হইতেছে। কানাই বাবুর সেই প্রেতাত্মার গল্প বার বার মনে আসিতে লাগিল, আর বুকের ভিতরটা আমার হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তবুও দৃঢ়ভাবে বন্দুকটীকে চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে বলিলাম, নাঃ, ভগবান্ নিজেই যখন এ সুযোগ আমায় দিয়াছেন তখন পেছ-পাও হইব না কিছুতেই, রোংরু পাহাড়ের প্রেতাত্মার সহিত আজ আমার বোঝাপড়া করিতেই হইবে।

হঠাৎ পাশের বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল সাধারণ মানুষের ছয় সাতটার সমান ওজনের একটা প্রাণী অন্ধকারে জঙ্গল ভেদ করিয়া বিদ্যুদ্বেগে আমার পানে ছুটিয়া আসিতেছে। আমার পায়ের তলাকার মাটী কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল বন্দুক বুঝি এখনই বা হাত হইতে খসিয়া পড়ে। তবুও প্রাণপণ বলে সেটীকে উঁচাইয়া ধরিলাম।

মুহূর্ত্ত পরেই যে জীবটী আমার সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল সাশ্চর্য্যে দেখিলাম সেটী আমারই ঘোড়া। কিন্তু এ কী চেহারা তার? সমস্ত শরীর অবিরত কাঁপিতেছে, নিদারুণ ভয় মুখেচোখে যেন উপ্‌চাইয়া পড়িতেছে, অসহায়ভাবে আমার

গা ঘেঁষিয়া সে দাঁড়াইল। ইতর জীবের মুখেও যে ঠিক মানুষেরই মত ব্যাকুল ভয়-কাতর ভাব ফুটিয়া উঠিতে পারে তা সেদিন প্রথম লক্ষ্য করিলাম। সে মুখ যেন অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিবার জন্য আমাকে ব্যগ্র ইঙ্গিত জানাইতে ছিল।

একবার ভাবিলাম, আর নয়, এবার সরিয়া পড়াই মঙ্গল। যে জায়গায় দুর্দ্ধর্ষ ভুটিয়া পাহাড়িয়া আচম্‌কা মানুষ দেখিয়াই ঘোড়ার গায়ে এলাইয়া পড়ে, যে স্থানে আসিয়া নিঃশঙ্ক পাহাড়িয়া ঘোড়া ভয়ে দিশাহারা হইয়া যায়, না জানি কী ভীষণ সে স্থান! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার মন বলিয়া উঠিল, "কী! মরণের ভয় এতই বড় হইল? কালামুখ লইয়া ফিরিবে কোন্ লজ্জায়! যে জিনিষ বিশ্বাস কর না বলিয়া লোকের কাছে বুক ঠুকিয়া বেড়াও, আজ তারই হাত হইতে পালাইয়া পোড়া প্রাণটা বাঁচাইতে হইবে? কেন, এমন প্রাণ না বাঁচাইলেই নয়?

তড়াক্ করিয়া ঘোড়ার পিঠে লাফাইয়া উঠিলাম, যেদিক্ হইতে ভয় পাইয়া ঘোড়াটী দৌড়িয়া আসিয়াছিল, সেই দিকে রাশ ফিরাইয়া ঘোড়ার পেটে পায়ের চাপ দিলাম। কিন্তু বৃথা, ঘোড়া সেদিকে আর এক পাও নড়িতে চাহিল না। অসম্মত ঘোড়াকে সাম্‌নে চালাইয়া লইবার যত রকম কৌশলে জানা ছিল সবগুলিই যখন ব্যর্থ হইল, তখন

এক পাও নড়িতে চাহিল না।

অগত্যা ঘোড়া হইতে নামিয়া সেটীকে একটা গাছের ডালের সহিত বাঁধিলাম; তারপর বন্দুক হাতে একাই সাম্‌নে অগ্রসর হইতে সুরু করিলাম।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া খানিকটা আগাইতেই যা দেখিলাম তাতে আমার সমস্ত শরীরে বারবার কাঁটা দিয়া উঠিল—দূরে বাস্তবিকই একটা কুঠির মত দেখা যাইতেছে আর তার সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা আলোর গোলা পড়িয়া ; তীব্র সবুজ আলো চারিদিকে ঠিক্‌রাইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, পেরেক দিয়া কে আমার পা যেন মাটীর সহিত গাঁথিয়া দিয়াছে—কোন মতেই আর সাম্‌নে চলা সম্ভব নয়। তবুও মাতালের মত টলিতে টলিতে আগাইয়া একেবারে কুঠির সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিলাম। ওঃ বাবাঃ, দেওয়ালের আড়ালে ধ্বক্ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছে কি ও দুটী ? জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুটী চোখ, সাধারণ মানুষের চোখের প্রায় চার পাঁচ গুণ বড়। দয়াময়, তুমি কোথায়,—এ কি দেখিতেছি ; শুধু তো দুটী চোখ নয়—এ যে ছায়া মূর্ত্তি—পাদ্রী সাহেবদেরই মত সাদা আলখাল্লায় সমস্ত শরীর আচ্ছাদিত ! কানাইবাবু !!

মূর্ত্তি ফিরিয়া তাকাইল—সেই ভাঁটা দুটীর দৃষ্টি একেবারে আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিকট গর্জ্জন করিয়া মূর্ত্তি আমার দিকে লাফাইয়া আসিল। মনে হইল, আমার বুকের ভিতর দিয়া যেন বিদ্যুতের প্রবাহ চলিয়া গেল—আমি সেই কুঠির ধারেই ঘাসের উপর আচ্ছন্ন হইয়া ঢলিয়া পড়িলাম।

* * * *

জ্ঞান হইলে পর চাহিয়া দেখি, তখনও রাত্রি—ছোট্ট একটা ঘরে ক্যাম্প খাটের উপর শুইয়া আছি আর পাশে চেয়ারের উপর বসিয়া আমার মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে আমারই বাল্যবন্ধু ভেঙ্কট রাঘবম্। আমায় চোখ মেলিতে দেখিয়া সে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কেমন বোধ কর্‌ছ বিজয় ?"

সমস্ত মাথাটা ঘুরিতে লাগিল, ভাবিলাম আমিই বা কোথায় আর মান্দ্রাজ হইতে রাঘবম্‌ই বা এখানে আসিয়া মিলিল কি করিয়া ? জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ আমি কোথায় রাঘবম্ ?"

"রোংরু পাহাড়ে।"

পাহাড়ের নামটা শুনিয়াই আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল ; দেখিয়া রাঘবম্ হাসিয়া কহিল, "ভয় নাই গো ভয় নাই, আমিই আজকাল এ রোংরু পাহাড়ের ভূত—অবশ্য আসল 'ভূত' নই তা বোধ করি টের পাচ্ছ ! সমস্ত ব্যাপারই তোমায়

ভেঙ্গে বল্‌ছি, কিন্তু তার আগে চোঁ করে এক বাটী গরম দুধ খেয়ে নিতে হবে—দাঁড়াও আমার চাকরকে সে ফরমাস্‌টা করে নি।"

চাকরের হাত হইতে গরম দুধের বাটীটী আমি নিঃশেষ করিলে পর রাঘবম্ বলিতে আরম্ভ করিল,... "বোধ হয় খবর রাখ যে আজকাল আমি গভর্ণমেণ্টের কলেজে প্রাণিতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপক হয়েছি। ছোটবেলা থেকেই নানা রকম পোকা-মাকড়ের অনুসন্ধান করা এবং তাদের স্বভাব-চরিত্র লক্ষ্য করার বাতিক আমায় পেয়ে বসেছিল। বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা কমা দূরে থাক্, হাজার গুণ বেড়ে গেছে। কাজেই কর্ম্মজীবনেও এদিক্‌টাই বেছে নিয়েছি। কলেজের দু'চার ঘণ্টা লেক্‌চার দেওয়া ছাড়া সারা দিন আমি পোকা-মাকড় নিয়ে ল্যাবোরেটারীতেই পড়ে থাক্‌তাম, তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা প্রণালী দেখে উৎসাহে ও আনন্দে অধীর হয়ে উঠ্‌তাম। কিছুদিন বাদে পোকা-মাকড়ের ওপর আমার একখানা বই বার হল, বিলাতের বৈজ্ঞানিকেরা চিঠি লিখে আমায় জানালেন, সেখানা নাকি ভয়ানক রকম ভাল হয়েছে, আমি নাকি চেষ্টা এবং পরিশ্রম কর্‌লে এ বিষয়ে পৃথিবীর ভেতর সেরা পণ্ডিত হতে পার্‌ব।

ঢলিয়া পড়িলাম।

"পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতদের এই উৎসাহ-বাক্য আমায় যেন চাড়া দিয়ে

তুল্‌ল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম এই জ্ঞানের প্রসারের জন্য আমার জীবন উৎসর্গ কর্‌ব, কোন রকম সুখের প্রত্যাশা রাখ্‌ব না, কোন রকম বিপদ্‌কেই গ্রাহ্যের ভেতর আন্‌ব না।

"ভারতবর্ষে সব চাইতে বড় বিধাতার আশীর্ব্বাদ হচ্ছে হিমালয় পর্ব্বতটা। কত রকম গাছ-গাছ্‌ড়া এবং জীবে যে এ পর্ব্বতটা ভর্‌তি তা আর কী বল্‌ব! ঠিক কর্‌লাম এই হিমালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কীট-পতঙ্গ নিয়েই আমার গবেষণা সুরু কর্‌তে হবে।

"এক বছরের ছুটী নিয়ে দার্জ্জিলিং চলে এলাম। লোকালয়ের বাইরে নির্জ্জন একটা জায়গা পেলে আমার গবেষণার কাজে সব চাইতে সুবিধে হয়—তেমন জায়গা এখানে কোথায় পাওয়া যায়? ডেপুটী কমিশনারের সাথে একদিন এবিষয়ে আলাপ হতেই তিনি বল্লেন, রোংরু পাহাড়ে একটা পড়ো বাড়ী আছে, সবার ধারণা সেখানে এক পাদ্রী মরে ভূত হয়ে আছে, যদি আমার ভয় না হয় তবে তিনি সেখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিতে পারেন। ভূত জিনিষটা কোনকালেই মানি না, কাজেই তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম।

সেই থেকে আমার বিশ্বাসী চাকর রাম পিল্লাই আর আমি এই রোংরু পাহাড়ের অধিবাসী। শেয়াল প্রভৃতি বুনো জানোয়ারের উপদ্রব থেকে রেহাই পাবার জন্যে ইলেক্‌ট্রিকের তারে সমস্ত কুঠিটা ঘিরে নিয়েছি, তারে তাদের গা লাগ্‌লেই দারুণ 'শক্‌' খাবে। অবশ্য এটা আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম যে রাত-বেরাতে আমায় দেখে অনেকেরই সেই মরা পাদ্রীর কথা মনে পড়ে যাবে, কেননা আমাদের গবেষণার কাজে প্যাণ্টালুনের ওপরে যে 'এপ্রন'টা পরে নিতে হয় তাতে করে আমাদের অনেকটা আলখাল্লাধারী পাদ্রী বলেই মনে হয়। অনেক রকম গ্যাস্‌-ট্যাস্‌ নিয়ে কাজকর্ম্ম কর্‌ছি, তাই পরীক্ষার সময় চোখে লাল বিকট গগ্‌ল-চশ্‌মা আর নাকে মুখে ঢাক্‌নিও দিয়ে থাকি—ভূতের চেহারা অনেকখানিই ওই রকমটা, নয় কি? আশেপাশের গ্রামে অনেকেই যে আমায় পাদ্রীর প্রেতাত্মা ঠাওরাচ্ছে, তা বেশ বুঝি, কিন্তু তাতে আমার লাভ বই লোকসান নেই, কেননা জায়গাটা যত নির্জ্জন হবে, আমার গবেষণার কাজও ততই ভাল ভাবে চল্‌বে।" একটু থামিয়া

রাঘবম্‌ বলিল "এইতো একটু আগেই দুই ভুটিয়া টাট্টু চেপে পাহাড় পার হচ্ছিল—অন্ধকার হয়ে গেছে দেখে ভয়ে তাদের মুখ কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে দেখ্‌তে পেলাম। সে কেবল এই আমারই ভয়ে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু ওই সবুজ আলো? ওটা কোত্থেকে আস্‌ছে?"

"ওঃ," বলিয়া রাঘবম্‌ একটু হাসিয়া কহিল, "এক রকম পোকা আছে যারা রাত্রে ছাড়া বারই হয় না। ওই তীব্র আলো তাদের ওপর ফেল্লে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করা এবং সময় বিশেষে বোতলে পোরা খুবই সোজা হয়ে পড়ে। কাজেই রাত্রে প্রায়ই ওটা হাতে আমি ঘুরে বেড়াই। দূরের লোকে বোধ করি আলোটাই শুধু দেখ্‌তে পায়, আমায় লক্ষ্য করে না। নিশ্চয়ই ভাবে কোন ভৌতিক আলো কুঠির চারপাশে ঘুরপাক্‌ খেয়ে বেড়াচ্ছে।...আজ সন্ধ্যের পর হঠাৎ কোথা থেকে জিন-পরা এক ঘোড়া ঘাস্‌ খেতে খেতে কুঠির কাছে এসে পড়্‌ল। তারে গা লাগ্‌তেই বিদ্যুতের দারুণ শক্‌ খেলে। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে চোঁচা দৌড়! ঘোড়া যখন এসেছে তখন সওয়ারও নিশ্চয়ই কাছেই কোথাও আছে ভেবে নিয়ে আমার একটু খোঁজ করা উচিত ছিল, কিন্তু আলস্য করে তা আর করিনি। খানিক বাদেই তুমি এলে। মিলিটারী বেশে অতদূর থেকে তোমায় অবশ্যি চিন্‌তে পারিনি, কিন্তু চীৎকার করে বল্লাম, 'খবর্দ্দার তারে গা ঠেকিও না, শক্‌ খাবে'। বলেই দৌড়ে তোমার দিকে আস্‌ছিলাম। এর মধ্যেই কিন্তু তার ছুঁয়ে 'শক্‌' খেয়ে তুমি মাটীতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেলে। আমি আর রাম পিল্লাই ধরাধরি করে এই ক্যাম্প্‌খাটে তোমায় এনেছি।

পরদিন স্যানিটারিয়ামে ফিরিয়া বন্ধুদের যখন বলিলাম যে কাল সারা রাত আমি রোংরু পাহাড়ের কুঠিটায় কাটাইয়া আসিয়াছি অথচ ভূত প্রত্যক্ষ করি নাই তখন অবিনাশ সকলের সাম্‌নেই আমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া গালি দিল।

বাদ্‌শাই স্বপ্ন

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ)

এক বাদ্‌শা। এক দিন দুদিন তিনদিন—ফি-রাতেই বাদ্‌শা স্বপ্ন দেখেন—তাঁর সিংহাসনের চার পাশে খেঁকশেয়ালীর মুণ্ড ঝুল্‌চে! চার দিনের দিন বাদ্‌শা দরবারে ব'সে সকলকে বল্‌লেন—'কে বল্‌তে পার, বল তো—আমার এ স্বপ্নের অর্থ কি?' উজীর, নাজীর, আমীর ওমরা, দরবারের সবাই ভেবে অস্থির—স্বপ্নের মাথামুণ্ডু কেউ বুঝ্‌তে পারেন না। বাদ্‌শা তখন কোটালকে হুকুম দিলেন—'রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দাও, যে এ স্বপ্নের অর্থ বল্‌তে পার্‌বে, তাকে এক লাখ টাকা বক্‌শিশ দেবো।'

তিনশো ঢুলি ঢ্যাঁড়া নিয়ে রাজ্যের চারদিকে ছুট্‌ল। রাজ্যের সবাই বাদ্‌শার হুকুম শুন্‌ল। কিন্তু,—সিংহাসনের চারপাশে খেঁকশেয়ালীর মুণ্ড ঝুল্‌চে!—এ কি বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন! কেউ সে স্বপ্নের মানে বুঝ্‌তে পার্‌লে না।

বাদ্‌শার রাজ্যের এক সীমানায় ছিল এক বুড়ো নাপিত, আর তার গাঁয়ের কাছে ছিল এক হুতোম্ পেঁচা। লোকে বল্‌ত হুতোম পেঁচা মা-ষষ্টীর মাসীর বাহন—স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল—ত্রিভুবনের কোন খবরই তার অজানা নেই। বাদ্‌শার ঢ্যাঁড়া শুনে বুড়ো নাপিত ভাব্‌লে যাওয়া যাক্ দেখি হুতোম পেঁচার কাছে। তার কাছে বাদ্‌শার স্বপ্নের অর্থ জানা যায় তো লাখ টাকার মালিক আমি!…কিন্তু, মা-ষষ্টীর মাসীর বাহন ঐ হুতোম্ পেঁচা,—কিছু মানত না কর্‌লে সে-ই বা স্বপ্নের অর্থ বল্‌বে কেন?' বুড়ো নাপিত হুতোম পেঁচার কাছে গিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগ্‌ল—মা-ষষ্টীর মাসীর বাহন, বাবা হুতোম পেঁচা, বাদ্‌শার স্বপ্নের অর্থ টা আমাকে ব'লে দাও—আমি যে লাখ টাকা বক্‌শিশ পাব তার অর্দ্ধেক খরচ ক'রে তোমায় সিন্নি দেবো।'

বুড়ো নাপিতের প্রার্থনা শুনে হুতোম পেঁচার দয়া হ'লো। সে বের হ'য়ে বল্‌লে, 'বাদশার স্বপ্নের অর্থ—তাঁর সিংহাসনের আশে পাশে যারা, তারা সবাই খেঁকশেয়ালীর

মত দুষ্টু আর অবিশ্বাসী! নিজেদের স্বার্থের জন্যে বাদ্‌শার সর্ব্বনাশ করার ফিকির খুঁজ্‌চে—বাদ্‌শা যেন হুঁসিয়ার থাকেন।'

স্বপ্নের অর্থ জান্‌তে পেরে বুড়ো নাপিত মহা আনন্দে বাড়ী ফির্‌ল। আর তক্ষুণি সেজেগুজে বাদ্‌শার দরবারে চল্‌ল।

দরবারে গিয়ে বুড়ো নাপিত বাদ্‌শাকে বল্‌লে—'জঁাহাপনা, আমি আপনার স্বপ্নের অর্থ জানি। অভয় দেন তো, আপনাকে গোপনে তা বল্‌তে পারি।'

বাদ্‌শা তখুনি দরবার ছেড়ে উঠ্‌লেন; তারপর নাপিতকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—'বল, আমার স্বপ্নের অর্থ কি?'

বুড়ো নাপিত চুপে চুপে বাদ্‌শাকে স্বপ্নের অর্থ খুলে বল্‌ল। নাপিতের কথা শুনে বাদ্‌শা খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে বসে রইলেন। তারপর নাপিতকে বিদায় দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'তোমার কথা আমার মনে রইলো। সাতদিন বাদে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তোমার কথা সত্যি হয় তো লাখ টাকা বক্‌শিশ তোমার।'

বাদ্‌শা সাত দিন ধ'রে গোপনে খোঁজ খবর ক'রে জান্‌লেন—সত্যিই তাঁর আশে পাশে খেঁকশেয়ালীর মত দুষ্টু লোকের দল। আর সে দলে কারা?—না, তাঁরই উজীর, নাজীর, আমীর ওমরা, যাদের নিয়ে তাঁর দিনরাত দরবার! বাদ্‌শা হাতে-নাতে দলকে দল ধর্‌তে পেরে সবার গর্দ্দান নিলেন।

সাত দিন পর বুড়ো নাপিত সেজেগুজে বাদ্‌শার দরবারে হাজির হ'লো। বাদ্‌শা খুসী হ'য়ে নাপিতকে এক লাখ টাকা বক্‌শিশ দিলেন।

টাকার তোড়া পেয়ে নাপিতের আর হুতোম পেঁচার কথা মনেই রইল না। লাখ টাকার অর্দ্ধেক খরচ ক'রে সিন্নি দেবে কি?—সে তখন হ'তে হুতোম পেঁচার ছায়াও মাড়ায় না!

* * * *

বছর খানেক যায়। তারপর বাদ্‌শা ফের আবার ক'দিন ধ'রে রাতে স্বপ্ন দেখেন তাঁর মাথার ওপর একখানা তরোয়াল ঝুল্‌চে, আর সেই তরোয়ালের গা বেয়ে টস্ টস্ ক'রে রক্ত ঝর্‌চে! স্বপ্ন দেখেই বাদ্‌শা দুপুর রাতে তড়াক্ ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেন, আর ভয়ে ভয়ে সারা রাত দু চোখ বুজ্‌তে পারেন না।

তিনদিনের পর বাদ্‌শা দরবারে ব'সে সবাইকে স্বপ্নের কথা ব'লে শুধোলেন—'এ স্বপ্নের অর্থ কি ?' উজীর-নাজীর, আমীর-ওমরা, দরবারের সবাই ভেবে অস্থির—স্বপ্নের অর্থ কেউ বুঝ্‌তে পারেন না। বাদ্‌শা তখন আগেরই মতন কোটালকে ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে দিতে বল্‌লেন—যে স্বপ্নের অর্থ বল্‌তে পার্‌বে, তার দু' লাখ টাকা বক্‌শিশ মিল্‌বে।

তিন শো ঢুলি আবার রাজ্যের চারদিকে ছুট্‌ল, আর ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে রাজ্যের সবাইকে বাদ্‌শার স্বপ্নের কথা বল্‌তে লাগ্‌ল; সঙ্গে সঙ্গে সবাই জান্‌তে পেলে, যে স্বপ্নের অর্থ বল্‌তে পার্‌বে তার দু'লাখ টাকা বক্‌শিশ মিল্‌বে।

এক লাখ টাকার মালিক হ'য়ে বুড়ো নাপিত দিব্যি নিশ্চিন্দি হ'য়ে বসে ছিল। এর পরে যে বাদ্‌শা আবার আর একটা স্বপ্ন দেখ্‌বেন, আর তার অর্থ কর্‌তে পার্‌লে বক্‌শিশ মিল্‌বে দু'লাখ টাকা কে তা ভেবেছিল? হুতোম পেঁচার সঙ্গে নাপিতেরও তাই আর কোন সম্পর্ক ছিল না! কিন্তু এবারে যে ডবল বক্‌শিশ!—বরাত খোলে তো এক চোটে দু'লাখ! নাপিতের মন বাগ্‌ মান্‌ছিল না। 'যা থাকে কপালে! মা দুগ্‌গো ব'লে যাওয়া যাক্ সেই হুতোম পেঁচারই কাছে। সেই কবে কি হয়েচে, আজও কি আর ছাই হুতোম পেঁচার তাই মনে আছে!'—এই না ভেবে বুড়ো নাপিত হুতোম পেঁচার কাছে চল্‌ল। আর সেখানে গিয়ে মাটীতে উপুড় হ'য়ে পড়ে প্রার্থনা জানাতে লাগ্‌ল—'মা-ষষ্টির মাসীর বাহন, বাবা হুতোম পেঁচা, দোহাই তোমার; একবার দয়া ক'রে স্বপ্নের অর্থটা ক'রে দাও—আমার দু'লাখ টাকা বক্‌শিশ্ মিলুক, তোমাকে এক লাখ টাকা খরচ করে সিন্নি দেবো।'

নাপিতের প্রার্থনা শুনে হুতোম পেঁচার দয়া হলো, সে বের হ'য়ে বল্‌লে—'বাদ্‌শার স্বপ্নের অর্থ বড় ভয়ঙ্কর—যে তরোয়াল তিনি স্বপ্নে দেখেছেন তা তাঁর নিজের ছেলেরই হাতে—বাদশাইর জন্যে বাদ্‌শাজাদা তাঁকে মেরে ফেলার ফিকির খুঁজ্‌চে—বাদ্‌শা যেন হুঁসিয়ার থাকেন।'

স্বপ্নের অর্থ জান্‌তে পেরে বুড়ো নাপিত মহা আহ্লাদে বাড়ী ফির্‌ল। আর তক্ষুণি সেজেগুজে বাদ্‌শার দরবারে চল্‌ল।

দরবারে গিয়ে বুড়ো নাপিত বাদ্‌শাকে বল্‌লে—'জাঁহাপনা, আমি

আপনার স্বপ্নের অর্থ জানি। অভয় দেন তো, আপনাকে গোপনে তা বল্‌তে পারি।'

বাদ্‌শা তক্ষুণি দরবার ছেড়ে উঠ্‌লেন; তারপর নাপিতকে কাছে ডেকে বল্‌লেন—'বল, আমার স্বপ্নের অর্থ কি?'

বুড়ো নাপিত বাদ্‌শার কানে কানে স্বপ্নের অর্থ খুলে বল্‌ল। নাপিতের কথা শুনে বাদ্‌শা খানিকক্ষণ গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন। তারপর নাপিতকে বিদায় দিতে গিয়ে বল্‌লেন—'তোমার কথা আমার মনে রইলো। সাতদিন বাদে আমার সঙ্গে দেখা ক'রো। তোমার কথা সত্যি হয় তো, দু'লাখ টাকা বক্‌শিশ তোমার।'

বাদ্‌শা সাতদিন ধ'রে গোপনে খোঁজ খবর ক'রে জান্‌লেন, সত্যিই তাঁকে মেরে ফেলার জন্যে ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র চল্‌চে। আর সে ষড়্‌যন্ত্রের মূলে কে?—না, তাঁর নিজেরই ছেলে—বাদ্‌শাজাদা! বাদ্‌শা হাতে-নাতে বাদ্‌শাজাদাকে ধর্‌তে পেরে ঠাণ্ডা গারদে পূর্‌লেন।

সাতদিনের পর বুড়ো নাপিত সেজেগুজে বাদ্‌শার দরবারে হাজির হ'লো। বাদ্‌শা খুসী হয়ে নাপিতকে দু'লাখ টাকা বক্‌শিশ দিলেন, আর তার সঙ্গে খেলতে দিলেন তাঁর নিজের হাতের তরোয়াল।

টাকার তোড়া নিয়ে বুড়ো নাপিত বাড়ীর দিকে ফির্‌চে, গাঁয়ের মোড় ফির্‌তেই দেখে—সাম্‌নের বটগাছের ডালে সেই হুতোম পেঁচা!

হুতোম পেঁচাকে দেখেই বুড়ো নাপিত মুখ খিঁচিয়ে উঠ্‌ল—'ব্যাটার যেন তর সইছে না। লাখ টাকার সিন্নি খাওয়ার লোভে এগিয়ে এসে হাঁ ক'রে বসে আছে!'

কিন্তু হুতোম পেঁচাকে না তাড়াতে পার্‌লেও তো নিশ্চিন্দি নেই! বুড়ো নাপিত আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ কোমরের তরোয়াল খুলে হুতোম পেঁচার দিকে ছুঁড়ে মার্‌ল। হুতোম পেঁচাও নাপিতের ফন্দী বুঝ্‌তে পেরে তক্ষুণি ফুরুৎ ক'রে উড়ে গেল।

নিশ্চিন্দি হ'য়ে টাকার তোড়া নিয়ে বুড়ো নাপিত বাড়ী ফির্‌ল।

* * * *

এর পর আর এক বছর গেল। নতুন বছরের গোড়াতেই বাদ্‌শা ফের স্বপ্ন

দেখ্‌লেন, —আর এক দিন, দু'দিন, তিন দিন, রোজ রাতেই সেই একই স্বপ্ন—বাদ্‌শার সিংহাসনের গোড়ায় এক লক্ষ্মী-পেঁচা।

তিনদিন পরে বাদ্‌শা দরবারে ব'সে সবাইকে সে স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস কর্‌লেন। উজীর-নাজীর, আমীর-ওমরা, দরবারের কেউই স্বপ্নের অর্থ বুঝ্‌তে পারেন না। বাদ্‌শা তখন কোটালকে ডেকে হুকুম দিলেন—'দু দু'বার যে বুড়ো আমার স্বপ্নের অর্থ করে দিয়েচে তাকে শীঘ্র দরবারে হাজির কর—এবারের স্বপ্নের অর্থও সে ক'রে দিক্‌।'

লোকজন নিয়ে কোটাল বুড়ো নাপিতের বাড়ীর দিকে ছুট্‌ল।

কোটালের মুখে বাদ্‌শার হুকুম শুনে বুড়ো নাপিতের চক্ষুস্থির! দু'দুবার স্বপ্নের অর্থ ক'রে দিয়েচে ব'লেই যেন সেই বড় চুরির দায়ে ধরা পড়েচে! আর হলোই বা তাঁর দায়—হুকুমের সঙ্গে আগের মত মোহরের তোড়া কই? কোন্‌ মুখে সে এখন ফের হুতোম পেঁচার কাছে যায়?—আর কি দিয়েই বা তাকে সিন্নি কর্‌বায়!

কিন্তু বাদ্‌শার হুকুম—এড়াবার তো জো নেই!—বুড়ো নাপিত কোটালকে ব'লে ক'য়ে একদিনের সময় নিল। তারপর স্বপ্নের অর্থের জন্যে নিশুতি রাতে চুপে চুপে হুতোম্‌ পেঁচার কাছে গেল।

এবার আর হুতোম্‌ পেঁচার খোসামোদের দরকার হ'ল না। হুতোম পেঁচা জেগেই ব'সে ছিল। বুড়ো নাপিতকে দেখ্‌তে পেয়েই সেধে বল্‌লে—'কি ভায়া, কি মনে ক'রে? এবারও আবার কোনো স্বপ্ন-টপ্নের অর্থ করা চাই নাকি?'

বুড়ো নাপিত 'হ্যাঁ' ব'লে হুতোম্‌ পেঁচার কাছে বাদ্‌শার স্বপ্নের কথা খুলে বল্‌ল।

হুতোম্‌ পেঁচা বল্‌লে—'যাও, বাদ্‌শাকে বল গিয়ে তাঁর সমস্ত ফাঁড়া কেটে গিয়েচে। এখন তাঁর রাজ্যে শান্তির দিন আস্‌চে—লক্ষ্মীর বাহন লক্ষ্মী-পেঁচা তাই তাঁর সিংহাসনের তলায়।'

মহা আহ্লাদে বুড়ো নাপিত বাদ্‌শার দরবারে ছুটে গিয়ে বাদ্‌শাকে স্বপ্নের অর্থ বল্‌ল।

বাদ্‌শা রাজ্যের চারদিকে লোক পাঠিয়ে জান্‌লেন—বুড়ো নাপিতের কথা

ঠিকই—প্রজাদের মনে-মুখে ফূর্ত্তির অভাব নেই, আর রাজ্যের ঘরে ঘরে দিনরাত তাঁর জয়-জয়কার!

খুশী হয়ে বাদ্‌শা বুড়ো নাপিতকে চার লাখ টাকা বক্‌শিশ্‌ দিলেন।

* * *

টাকার তোড়া সঙ্গে নিয়ে পথে যেতে যেতে বুড়ো নাপিতের মনে কি হ'লো—বাড়ী না গিয়ে আগেই সে হুতোম্‌ পেঁচার কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। তারপর তার সামনে ঝন্‌ ঝন্‌ ক'রে চার লাখ টাকা সমস্তই ঢেলে দিয়ে বল্‌লে—'মা-ষষ্ঠীর মাসীর বাহন, বাবা হুতোম্‌ পেঁচা, আমার সমস্ত দোষ মাপ কর। দু-দুবার তোমায় আমি ঠকিয়েছি, এই তার পেরাচিত্তি (প্রায়শ্চিত্ত)। তোমার দয়ার দান এই টাকা,—এ সমস্তই তোমার সিন্নির খরচা।'

বুড়ো নাপিতের কাণ্ড দেখে হুতোম্‌ পেঁচা বল্‌ল—'আরে ও করচ কি! তুমি আবার দোষ করেচ কিসের, আর পেরাচিত্তিই বা করবে কেন? এর আগে দু'দুবার যা তুমি করেচ তাই তো ছিল তখনকার লোকের ধর্ম্ম! বাদ্‌শা আগেই তো তা স্বপ্নে দেখেছিলেন। প্রথম বারে বাদ্‌শার হোমরা-চোমরা প্রজারা যা করতে চেয়েছিল, বাদ্‌শার প্রজা তুমি,—তুমিই বা তা করবে না কেন? তার পরের বারে বাপের বুকে ছুরী মারতে চেয়েছিল ছেলে; তুমিও তো সেই রাজ্যেরই লোক,—সে সময়ের ধর্ম্ম এড়াবে কিসে? আর এখন বাদ্‌শার সিংহাসনের তলায় লক্ষ্মী-পেঁচা—রাজ্যের সকল জায়গায় মহাশান্তি, তোমার মনেও কালের ধর্ম্ম সাড়া দিয়েচে। বাদ্‌শার স্বপ্নের অর্থ—ভেবে দেখ্‌লে—নিজেই নিজের মনের ভাবে আগে টের পেতে;—আমার কাছে নতুন কিছু শোননি। এখন যাও, বাপু, টাকা নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। আমি তোমার টাকা চাই না।'—এই না ব'লে হুতোম্‌ পেঁচা ফুরুৎ ক'রে উড়ে গেল।

হুতোম্‌ পেঁচার কথায় বুড়ো নাপিতের বুদ্ধি খুলে গেল। কিন্তু বাদ্‌শা তারপর আর কোনো স্বপ্ন-টপ্ন দেখেন না, নাপিতেরও তারপর হতে স্বপ্নের অর্থ বলার ঝঞ্ঝাট্‌ নেই।

চোরের উপদ্রব

(শ্রীসুবিনয় রায়)

আজকাল চারি দিকে চোরের উপদ্রবের কথা শোনা যায়। অনেকে বেকার ব'সে থেকে খাবার-পর্‌বার পয়সার অভাবে শেষটায় চুরি করা আরম্ভ করে। এই শ্রেণীর চোরের সংখ্যা আজকাল খুবই বেশী, কারণ, পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই লক্ষ লক্ষ লোক বেকার ব'সে আছে। কিন্তু, এ ছাড়া আর এক শ্রেণীর চোর আছে, চুরি করাই যা'দের ব্যবসা; নানা রকম বুদ্ধি খাটিয়ে, যন্ত্রপাতির সাহায্যে যা'রা রীতিমত চুরির কারবার করে। এদের মধ্যে কেউ হয় পকেট-মার (Pick-pocket), কেউ হয় ছ্যাঁচ্‌ড়া-চোর, কেউ হয় সিঁদেল (অর্থাৎ, যা'রা সিঁদ কেটে চুরি করে)।

এদের মধ্যে যা'রা সর্দ্দার, তা'দের কেউ কেউ বলে, "চুরি যদি কর্‌বেই বাপু, ভাল ক'রে শিখে নিয়ে কর না কেন?" কাজেই, তারা চোরদের শেখাবার জন্য ইস্কুল খুলে বসেছে। জাপানে নাকি অনেক কাল থেকেই ঐ রকমের ইস্কুল আছে। অবিশ্যি, সে সব ইস্কুলের নাম-ধাম, ঠিকানা বাইরের কোন লোকই জানে না; জান্‌লেই তো ইস্কুলের দফা শেষ; মাষ্টারেরও দফা শেষ! চুপি-চাপি, সহরের বাইরে অথবা গলি-ঘুঁচির অন্ধকারের মধ্যে তা'রা ইস্কুলের ক্লাস বসায়। এদের ছাত্র ছোট ছেলে নয়,—বড় বড় চোর।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে যা' কিছু হয় প্রায় সবই একটু বড় রকমের। সেখানকার বাড়ী ৫০।৬০ তলা উঁচু—যেন আকাশ ফুঁড়ে চ'লেছে; তাই তার নামও 'Sky-scraper' অর্থাৎ 'আকাশ-চাঁচা'। সেখানকার লোকেদের মধ্যে ধনীও খুব বড়;—কোটি কোটি টাকার মালিক অনেকেই। সে দেশের মিস্ত্রীরা মোটরে চ'ড়ে বাড়ী বানাতে যায়; ফোর্ডের মোটর-কারখানার মজুরেরা ২৫০৲।৩০০৲ টাকা মাইনে পায় মাসে।

যে দেশের এই অবস্থা সে দেশের চোরদের চুরি করার লোভটাও খুব বেশী সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? তাই, সে দেশের এক সর্দ্দার চোর চুরি বিদ্যার

স্কুল খুলে তাদের সাক্‌রেদ্ সাঙ্গ-পাঙ্গদের সব রকমের চুরি বিদ্যা আর তার আনুষঙ্গিক কাজকর্ম্ম শেখায়। পকেট মারা, সিন্দুক ভাঙা, দরজার তালা খোলা, বাক্স ভেঙ্গে জিনিষ চুরি করা, এ সবই তাদের ভাল ক'রে শেখান হয়। সে দেশের চুরি বিদ্যা যেমন উঁচুদরের, পুলিশও তেম্‌নি ওস্তাদ। তাই চোরদের আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক, পিস্তলের ব্যবহারও ভাল ক'রে শিখ্‌তে হয়।

পকেট মারার কাজ শিখবার ব্যবস্থা।

কিন্তু, এত ক'রেও তাদের বিদ্যাটা বেশী 'বড়' হ'তে পারে নি। কথায় বলে, "চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা"। এ কথা ঠাট্টা ক'রেই বলা হয়। চোর মনে করে খুব বড় কাজ কর্‌লাম—বাহাদুরীটা হ'লো খুব;—যেদিন ধরা পড়ে সেদিন বাহাদুরীটা বেরিয়ে যায়।

যুক্তরাজ্যের এক ডিটেক্টিভ সাহেব সেখানকার এই 'চোরাই স্কুল' দেখে এসে তার কথা যা' বলেছেন তা' শুন্‌লে চোরেরা কিছু খুসী হবে না; কিন্তু, বাইরের লোকে অনেকটা সাবধান হবে।

সেখানকার 'ইস্কুলে' নাকি বড় বড় ওস্তাদ মাষ্টারেরা কাজ শেখায়। কেউ দরজা, তালা ইত্যাদি খুল্‌তে বা ভাঙ্‌তে শেখায়, কেউ সিন্দুক ভাঙ্‌তে শেখায়, কেউ 'আত্মরক্ষা' শেখায়। ডিটেক্টিভ্ সাহেব সবই দেখে এসেছেন! তার ফলে চোরদের

কি অসুবিধা হয়েছে তা' জানি না ; তবে, তাদের ওস্তাদীর উপর টেক্কা দেওয়া বেশ ভাল রকম চলে এটা বেশ বোঝা গেছে।

পকেট মারার কাজ শেখাবার জন্য সেই ইস্কুলের ঘরে একটা কাঠের কাঠামের উপর একটা কোট পরিয়ে রাখা হয়েছে। কোটের হাতে, গায়ে সব ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলান রয়েছে। পকেট মারার ছাত্র কোটের পকেট থেকে একটি রুমাল বা কোন ছোট জিনিষ উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু, হাত যদি একটু এদিক্-ওদিক্ যায়, তা' হ'লেই সর্ব্বনাশ—অম্‌নি একটা না একটা ঘণ্টা টুং টুং করে বেজে উঠ্‌বেই। যতক্ষণ না সে ঘণ্টা না বাজিয়ে পকেটের জিনিষ নিতে পার্‌বে, ততক্ষণ সে 'পাশ' হ'তে পার্‌বে না।

সেই ইস্কুলে সিন্দুক ভাঙার ক্লাশে নানা রকম প্রণালীতে সিন্দুক খুল্‌তে

চোর-'ছাত্রেরা' আগুনের সাহায্যে সিন্দুক খুল্‌তে শিখ্‌ছে।

শেখান হয়। আজকালকার সিন্দুক ভেঙে খোলাটা চোরের অসাধ্য, তাই আগুনের সাহায্যে সিন্দুক খোলার প্রণালী সেখানে ভাল ক'রে শেখায়। আধুনিক অনেক সিন্দুক আবার আগুনের সাহায্যেও খোলা যায় না ; তা' ছাড়া, চোরদের পক্ষে সব চেয়ে অসুবিধার কথা এই যে, আধুনিক এক আবিষ্কারের ফলে, অন্ধকার ঘরে তারা দেওয়ালের এ পাশে থাক্‌লেও ও পাশ থেকে দেখা যাবে যে তারা এসেছে—যদিও তারা কিছুই টের পাবে না যে কেউ তাদের দেখ্‌তে পাচ্ছে।

চুরি করাটা ক্রমেই এত কঠিন হয়ে পড়্‌ছে যে চোরেরা এখন ডাকাতির আশ্রয়

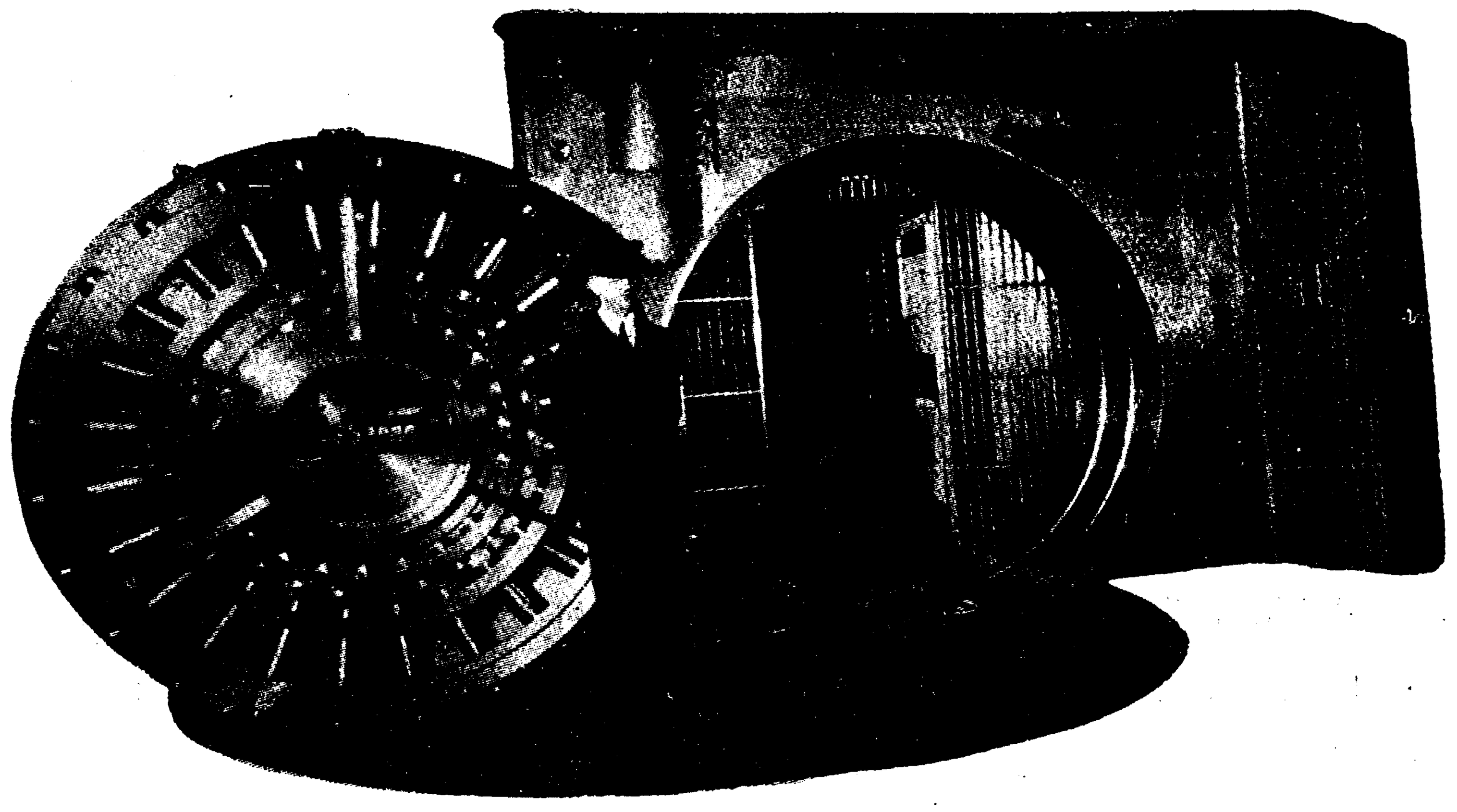

বড় ব্যাঙ্কের টাকা রাখার ঘরের দরজা। এর ওজন প্রায় ৩০০ মণ!

নিতে আরম্ভ করেছে। তাই বড় বড় ব্যাঙ্কের যেখানে টাকা রাখা হয় সে সব ঘরের দরজা এত মজ্‌বুত করা হয় যে, চুরি ডাকাতি কিছুতেই দরজা খোলা সম্ভব হয় না। এক্ একটা দরজার ওজনই বা কত! দরজা খোলার সঙ্কেতও চোরের জানা সম্ভব নয়। ক্রমে ডাকাতি করাটাও চোরের পক্ষে দায় হয়ে উঠ্‌বে। এখনই এমন যন্ত্র বেরিয়েছে যার সাহায্যে ডাকাত পড়্‌বার সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীর ঘরে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌বে—ডাকাত ঘুণাক্ষরে তার কিছু জান্‌তে পার্‌বে না। এই সব কাণ্ড কারখানা দেখে শুনেও কোন দিন পৃথিবীর চোর-ডাকাতদের চৈতন্য হ'তে পারে—তারা তাদের সর্ব্বনেশে ব্যবসা ছেড়ে হয় তো সেদিন থেকে কোন ভাল ব্যবসা কিম্বা চাক্‌রী কর্‌বে। শান্তিপ্রিয় লোকেরাও সেদিন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্‌বে।

বেজায় সৌখীন

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

পূর্ব্বকালে অঙ্গ প্রদেশে এক পুণ্যাত্মা ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণের নাম বিষ্ণুভামী। ব্রাহ্মণ যোগ্যপত্নী লাভ করিয়াছিলেন ; স্বামীর মত তিনিও পুণ্যশীলা, নিষ্ঠাবতী ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণের কিছু পৈতৃক নিষ্কর চাক্‌রাণ জমী ছিল, তাহাতেই তাঁহার কোন রকমে দিন গুজরাণ হইত। দিবাভাগের বেশীর ভাগ সময় তিনি ধ্যান, হোম্‌ ও যাগযজ্ঞ করিয়া কাটাইতেন। নির্লোভ দরিদ্র হইলেও ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর মনে কোন অশান্তি নাই ; নির্লোভ, স্বল্পতুষ্ট মনে তাঁহারা বেশ সুখেই দিন কাটাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ছেলেগুলি বড় হইলে পর তাহাদের বায়নার আর অন্ত ছিল না। শেষে এম্‌নি দাঁড়াইল যে ছেলে তিনটি কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না। গরীবের ছেলে তাহারা, কিন্তু আচার-ব্যবহার রকম-সকম রাজা মহারাজদেরও হার মানায়। ক্রমে ক্রমে ছেলে তিনটী বড় হইয়া উঠিল।

এক দিন ব্রাহ্মণ কি এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ; তাহাতে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে একটি কচ্ছপেরও আবশ্যক। পাশেই নদীতে অনেক কচ্ছপ পাওয়া যায়। তাই ব্রাহ্মণ ছেলে তিনটিকে নদী হইতে একটি কচ্ছপ আনিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনজনে নদীর ধারে গিয়া দেখে একটি মাঝারি রকমের কচ্ছপ নদীর পার হইতে একটু দূরে ডাঙ্গার উপর দিব্য ঘুমাইতেছে। যাহাতে নদীতে না পালায় সেই জন্য তিন ভাই কচ্ছপটিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কচ্ছপ বেচারা ভয়ে মুখ গুটাইয়া পড়িয়া রহিল। এখন, কচ্ছপটিকে কে লইয়া যাইবে ?—কচ্ছপের গায়ে হাত দিতে সকলেরই ঘৃণা করে। বড় ভাই বলিল, "তোমাদের মধ্যে একজন ইহাকে লইয়া চল, কারণ আমি যে ইহাকে ছুঁইতে পারিব না, তা তোমরা জানো, ইহার গায়ে যেম্‌নি লালা আর তেম্‌নি হর্‌হরানি, দেখিলে ঘৃণা হয়।" বড় ভাইএর কথা শুনিয়া ছোট দুই ভাই বলিল, "তুমি যদি না লইতে পার তবে আমরাই বা লইব

কেন ?" বড় ভাই উত্তর করিল, "দেখ, আমার মত তোমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা সৌখীন নও। সুতরাং ইহা লইয়া যাইতে তোমরা বাধ্য।" মেজ ভাই উত্তর করিল, "কেন, আমরাই বা শুধু লইয়া যাইতে বাধ্য কেন ? তোমারও সে রকম ভাবা উচিত।" বড় ভাই বলিল, "দেখ, মিছা তর্ক করিও না, আমি যে বিশেষ সৌখীন তা তোমরা জানো ; কারণ আমি যা তা জিনিষ খাইতে পারি না ; খাবার মধ্যে যদি কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে সে খাবার ছোঁয়াও আমার অসাধ্য হইয়া উঠে।"

মেজ ভাই বলিল, "আর আমিই বা কি কম ? আমার মত দোষদর্শী আর কয়জন আছে ? তুমি যেমন খাবার বিষয়ে দোষ ধরিতে পটু, আমিও তেম্‌নি রূপ সম্বন্ধে খুঁৎ ধরিতে ওস্তাদ্‌। স্ত্রীলোক যতই সুন্দরী হউক না কেন, আমার চোখে তার কিছু না কিছু খুঁৎ বাহির হইবেই। অতএব তোমার চেয়ে আমি সৌখীন কম নই।"

তখন ছোট ভাই বলিল, "আর আমিই বা তোমাদের চেয়ে কোন্‌ অংশে ছোট ? বড়দা যেমন খাবার বিষয়ে সৌখীন, মেজদা যেমন রূপ সম্বন্ধে সৌখীন, আমিও তেম্‌নি শয়ন সম্বন্ধে সৌখীন। শুধু সৌখীন কেন ?—অতিরিক্ত সূক্ষ্ম-বিচারী। অতি চমৎকার দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যাতে শয়ন করিলেও আমার গায়ে ব্যথা হয়। অতএব আমি বয়সে তোমাদের চেয়ে ছোট হইলেও সূক্ষ্মবিচারে কোন অংশে কম নই। সুতরাং আমি কচ্ছপ ছুঁইতে পারিব না।"

এইরূপে তিন ভাই তর্ক করিতে লাগিল ও শেষে মুখোমুখি হইতে হাতাহাতি আরম্ভ হইল। মারামারি করিয়া তিন জনেই রাজদরবারে নালিশ করিতে উপস্থিত হইল। সেই দেশের রাজার নাম প্রসেনজিৎ। তিনি বিচার করিবেন কি, তাঁহাদের কথা ও তর্কের কারণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। তিনজনেই বলিল, "মহারাজ, প্রথমে বিচার করুন আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা সৌখীন ও সূক্ষ্মবিচারী। সেই বিচার মত আমরা আমাদের একজনের অধীনতা স্বীকার করিয়া তাহার আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইব।"

রাজা বলিলেন, "আচ্ছা, তোমাদের বিচার আমি করিব, কিন্তু এ বেলা নহে ও বেলা।"

তখন তাহারা সেই কথায় রাজী হইল। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে রাজা এক

জাঁকাল ভোজের ব্যবস্থা করিলেন ও সেই ভোজে তিন ভাইকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। ভোজে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় প্রভৃতি নানা রকম উৎকৃষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা ছিল। প্রথমে সুগন্ধি মশ্‌লাযুক্ত পোলাও পাতে পরিবেষণ করা হইল। তাহার সুমিষ্ট সৌরভে চারদিক্ আমোদিত হইতেছিল। ছোট দুই ভাই পরম তৃপ্তি সহকারে আহারে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু বড় ভাই হাত গুটাইয়া বসিয়া রহিল।

রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি খাইতেছ না কেন?" তখন সে ম্লান মুখে উত্তর দিল, "মহারাজ, খাইব কি, পোলাওতে মড়ার গন্ধ ছাড়িতেছে!"

—"মড়ার গন্ধ!"—"হাঁ মহারাজ, মড়ার গন্ধ।"

"সে কি, রাজ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট চাল হইতে পোলাও তৈয়ারী হইয়াছে, আর তুমি বলিতেছ ইহাতে মড়ার গন্ধ!"

"হাঁ মহারাজ, এখনি এ থালা সরাইয়া লইতে বলুন, কারণ দুর্গন্ধে আমার বমি আসিতেছে।"

তখন রাজা মন্ত্রীকে ডাকিলেন। মন্ত্রী খোঁজ লইয়া জানিতে পারিলেন যে পোলাওর চাল আসিয়াছে অমুক গ্রামের অমুক মাঠের ধান হইতে। মাঠটীর পাশেই শ্মশান; মড়া পোড়ানর ধোঁয়া হয় ত ধান গাছে লাগিয়াছে। রাজা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। আনন্দে ও বিস্ময়ে রাজা বলিলেন, "হাঁ, তুমি খাওয়া সম্বন্ধে সৌখীন বটে। কিন্তু তোমার খাওয়া হইল না, তুমি আর কিছু খাও।"

তখনি রূপার থালায় গরম মাংস ও কাচের পেয়ালায় উৎকৃষ্ট পানীয় আসিল। রাজা বলিলেন, "মাংসটুকু খাইয়া ফেল।" রাজার কথামত বড় ভাই এক গ্রাস মাংস মুখের কাছে লইয়া গিয়া থু থু করিয়া ফেলিয়া দিল। রাজা বিস্ময়াভিভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল, মাংস খাইতে খারাপ হইয়াছে?"

"মহারাজ, গরীব বলিয়া কি কুকুরের মাংস খাইতে দিয়াছেন?"

"কুকুরের মাংস! বল কি?"

"হাঁ মহারাজ, ও কুকুরের মাংস!"

"সে কি, আমার সাম্‌নে যে ভেড়া কাটা হইল; সেই ভেড়ার মাংসই ত রান্না হইয়াছে।"

"জানি না, মহারাজ; মাংসে কিন্তু কুকুরের গন্ধ।" তখনি আবার মন্ত্রীর ডাক পড়িল। মন্ত্রী খোঁজ লইয়া জানিলেন যে ঐ ভেড়াটির মা তাহাকে নেহাৎ বাচ্ছা রাখিয়া মারা যায়; এই রাখালের একটা কুকুরের দুধ খাইয়া ভেড়াটি বড় হইয়াছে। রাজা বুঝিলেন কেন মাংসে কুকুরের গন্ধ কহিতেছে। লোকটি চূড়ান্ত সৌখীন বটে! কহিলেন, "আচ্ছা, পানীয়টুকু খাইয়া ফেল।" রাজার কথামত লোকটি পানীয়ের পেয়ালা যেমন ঠোঁটের কাছে তুলিয়াছে অমনি "বাপ্" বলিয়া সেটী মেঝেতে ফেলিয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?"

"মহারাজ, এ কি আমাকে খাইতে দিয়াছেন? এ যে নররক্ত!"

"নররক্ত! বল কি?"

"হাঁ মহারাজ, বিট্‌কেল নররক্তের গন্ধ!" তখনি খোঁজ পড়িল কোথা হইতে পানীয় আসিয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গেল যে, দোকানদার পানীয় তৈরী করিয়া বোতলে ছিঁপি আঁটিতে গিয়া হাত কাটিয়া ফেলিয়াছিল,তারই হয়ত দুই এক ফোঁটা রক্ত বোতলের ভিতরে পড়িয়াছে।" রাজা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। তখনি ত লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ওকি ওকি, উঠিয়া পড়িলে কেন? আর কিছু খাও।"

"না মহারাজ, আর আমার খাদ্যে রুচি নাই। আমার বমি আসিতেছে। বমি আসার ত কোন দোষ নাই, মড়া, কুকুরের মাংস, নররক্ত খাইতে দিলে আর কি খাদ্যে রুচি থাকে?"

"আচ্ছা, বেশ, একটু খানি রাজবাড়ীর তৈরী সরবৎ খাইয়া যাও।"

"দিন। না খাইলে আপনি হয়ত রাগ করিবেন।"

তখনি উৎকৃষ্ট ঘোলের সরবৎ আসিল। শীতল, শুভ্র, সুমিষ্ট, সুগন্ধ, সরবৎ—গন্ধে শরীর স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। লোকটি কিন্তু সরবৎএর গ্লাস হাতে লইয়াই ফেলিয়া দিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইল?"

"মহারাজ, এ কিসের সরবৎ?"

"কেন, উৎকৃষ্ট দইএর সরবৎ!"

"কিসের দই, মহারাজ?"

"কেন, গরুর দুধের দই!"

"না, মহারাজ, এতে ছোট ছেলের মুখের দুধের গন্ধ কহিতেছে।" তখনি খোঁজ পড়িল কোথায় কোন্ গোয়ালার ঘরে দই তৈরী হইয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গেল, অমুক গোয়ালার স্ত্রী দই পাতিয়াছে। গরীবের সংসার, ছেলে কোলে করিয়া সব কাজকর্ম্ম করিতে হয়। দই পাতিবার সময় কোলের ছেলে মায়ের দুধ খাইতেছিল। তারই ঈষৎ একটু কোন রকমে ছিট্‌কাইয়া দইয়ে পড়িয়াছে।

তখন রাজা আর তাহাকে খাইবার জন্য জোর্‌জার্ করিলেন না। বড় ভাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। এইবার মেজ ভাইএর পালা। মেজ ভাই বলিয়াছে—সেও সৌখীন, কারণ পরমা সুন্দরী রমণীও তাহার চোখে কুৎসিৎ ঠেকে। এ জগতে এমন নারী নাই যে তাহার চোখে সুন্দরী বলিয়া গণ্য হয়। রাজা বলিলেন—"আচ্ছা, আমি এমন একটি কন্যার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব যে তোমাকে ঠকিতে হইবে। এখন মেয়ে দেখিবে চল।" রাজা তখন মেজ ভাইকে পরম রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কন্যার কাছে লইয়া গেলেন। মেয়েটি যেমন সুন্দরী তেমনি সর্ব্বসুলক্ষণা, যেমন গায়ের রং, তেমনি মুখের অপূর্ব্ব শ্রী। মেয়েটিকে সুন্দর সাজগোজ করাইয়া, আতর, অগুরু, গোলাপ-জল, গন্ধ-তৈল মাখাইয়া, আল্‌তা চন্দন, টিপ্, সূর্ম্মা পরাইয়া মেজ ভাইএর সম্মুখে আনা হইল। বাস্তবিক মেয়েটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। আতর, গোলাপ-জলের গন্ধে ঘরটি সুবাসিত, সুরভিত হইয়া উঠিল। কিন্তু হইলে কি হয়, মেয়েটিকে দেখিয়া মেজ ভাইএর মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম হইল। দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "মহারাজ, লইয়া যান, শীঘ্র লইয়া যান। এ উৎকট দুর্গন্ধে আমি মূর্চ্ছা যাইব।" মহারাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে কি, কিসের দুর্গন্ধ? আমরা ত সুন্দর খোস্‌বাই পাইতেছি।"

"মহারাজ, আমার নাকে কি রকম এক উৎকট বীভৎস ছাগলের গন্ধ আসিতেছে।"

"ছাগলের গন্ধ! সে কি?"

"হাঁ মহারাজ; ঐ কন্যার গা হইতে বিশ্রী ছাগলের গন্ধ আসিতেছে।"

তখন অনেক অনুসন্ধান লইয়া জানা গেল যে মেয়েটি শৈশবে মাতৃহীনা হইলে

ছাগদুগ্ধে পালিত হয়। সেইজন্য তাহার গা হইতে ছাগগন্ধ আসিতেছে! তখন মহারাজ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে মেজ ভাইও কম সৌখীন নয়—বাস্তবিকই সে অতিমাত্রায় সূক্ষ্মবিচারী।

এইবার ছোট ভাইএর পালা। ছোট ভাই বলিয়াছে, সে শয্যা ও শয়ন বিষয়ে সৌখীন। পরম রমণীয় সুকোমল শয্যাতেও তাহার ঘুম হয় না, উপরন্তু সর্ব্বাঙ্গে বেদনা বোধ হয়। রাজার হুকুম মত একটি সুন্দর খাটের উপর নরম নরম সাতটি গদী রাখা হইল, তাহার উপর সাতখানি সুকোমল তোষক পাতা হইল; সব উপরে একখানি বহুমূল্য মখ্‌মলের লুই। তার উপর তুষার-শুভ্র রেশমের চাদর পাতা হইল। বিছানা প্রস্তুত হইলে ছোট ভাই সে বিছানায় শয়ন করিতে গেল।

পরদিন ভোরে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, কাল রাত্রে ভালো ঘুম হইয়াছিল তো?"

"না, মহারাজ, আমার বাম পাঁজরে ভীষণ ব্যথা হইয়াছে। এই দেখুন কিসের স্পষ্ট দাগ পড়িয়াছে, ও চারিদিকে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে।"

"এ কি, তোষকের তলায় কেউ কি শাবল বা বেত রাখিয়াছিল? এ যে ভীষণ ফুলিয়া উঠিয়াছে!"

তখনই বিছানার সমস্ত তোষক ও গদি একে একে তোলা হইতে লাগিল। সব নীচেকার গদির তলায় বাম দিকে একগাছি চুল বাহির হইল। ছোট ভাই বলিল—"ঐ দেখুন, ঐ চুলেরই জন্য আমার বাম পাঁজরে ব্যথা হইয়াছে, তাই রাত্রে ভালো নিদ্রা হয় নাই।"

তখন রাজা বলিলেন, "তোমরা তিন ভাই সমান সৌখীন, কেউ কাহারও অপেক্ষা ছোট নও। তোমাদের প্রত্যেককে আমি তিন হাজার করিয়া টাকা পুরস্কার দিতেছি। তোমাদের মত লোকের মূল্য আছে। আজ হইতে তোমরা আমার প্রাসাদে বাস করিবে ও আমার সভা উজ্জ্বল করিবে।" সেই হইতে তিন ভাই রাজার বাড়ীতেই রহিয়া গেল ও চরম সৌখীনতার ব্যবস্থা করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

ভূমিকম্প

(শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়)

বেশী দিনের কথা নয়, এখনও গোটা বছর পূরিয়াছে কিনা সন্দেহ, রাত্রে রাজসাহীর বাড়ীতে শুইয়া আছি, হঠাৎ মনে হইল এক বিরাট্ দৈত্য বুঝি খাটের তলায় ঢুকিয়া বিপুল ঝাঁকুনিতে খাটখানাকে পাড়িয়া ফেলার মৎলবে আছে। তড়াক্ করিয়া উঠিয়াই শুনিতে পাইলাম পাড়াময় মেয়েরা কষিয়া শাঁখ ফুঁকিতেছে। নিমেষের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া "ভূমিকম্প ভূমিকম্প" বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে একেবারে উঠানে নামিয়া আসিলাম।

এর আগে ছোট বেলায় আরও ভূমিকম্প দেখিয়াছি, তবে এতটা জোরাল নয় নিশ্চিত। তখন ঠাকুমা ছিলেন আমার এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা। তাঁকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "হ্যাঁ ঠাক্‌মা, ভূমিকম্পটা হয় কেন?" একটু কৃপার হাসি হাসিয়া তিনি কহিলেন "তাও জানিস্ না বোকা ছেলে! আমাদের এ পৃথিবীটা সাপের রাজা বাসুকীর ফণার ওপর রয়েছে। পৃথিবীর পাপের ভার যখন খুব বেশী হয়ে পড়ে বাবা বাসুকী তখন আর সইতে পারেন না, মাথা নেড়ে ওঠেন। কাজেই ঘরবাড়ী দোর সব কাঁপ্‌তে থাকে!" ভূমিকম্প সম্বন্ধে এই নতুন জ্ঞান লাভ করিয়া পাড়ার ছেলেদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতেছিলাম, এমন সময় আমাদের সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ মাণিক দাদা বলিলেন, "দূর গোমূর্খ, ও মেয়েলি শাস্ত্র শিখ্‌লি কার কাছে? ও বাসুকী-ফাসুকী কিছু নয়, আসলে আমাদের দেশের পাহাড়গুলো দিনকে দিন আগ্নেয় পাহাড় হয়ে যাচ্ছে। একটা করে পাহাড় আগ্নেয় পাহাড় হয়, আর এক একটা করে ভূমিকম্প হয়।"

এখন বড় হইয়া বই-টই পড়িয়া বুঝিতে পারিতেছি যে ঠাকুমা ভুল করিয়াছিলেন সত্যিই, কিন্তু আমাদের অমন বিজ্ঞ মাণিক দাদাও একেবারে ফেল্ মারিয়াছিলেন। ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে তিনি যা বলিয়াছিলেন তাও ডাঁহা ভুল!—পাছে ছোট ভাইদের কাছে তোমরাও মাণিকদার মত ফেল্ মারিয়া বস, তাই ভূমিকম্পটা কেন হয় খুব

সোজা করিয়া তা বুঝাইয়া দিতেছি। সব কথা বড় না হইয়া তোমরা বুঝিতে পারিবে না,—তবে মোটামুটি বড় বড় কথাগুলি বুঝিবে নিশ্চয়ই।

পণ্ডিতেরা বলেন, ভূমিকম্প অনেক কারণেই হইতে পারে। সবগুলি কারণ তোমাদের এখন জানিবার দরকার নাই, শুধু প্রধান প্রধান গোটা দুই কারণ জানিয়া রাখিলেই চলিবে। একটা কারণের সঙ্গে আগ্নেয় গিরির বেশ খানিকটা সম্পর্ক আছে, যদিও সে সম্পর্কটা ঠিক মাণিকদার 'থিওরির' সঙ্গে খাপ্ খায় না। দুই নম্বর কারণটার সাথে কিন্তু আগ্নেয় গিরির কোন সম্পর্কই নাই-এ ভূমিকম্প হয় শুধু জোর বৃষ্টির ফলে।

আগে এই দুই নম্বর কারণটার কথাই বলিব, কেননা আমাদের দেশের ভূমিকম্পগুলির বেশীর ভাগই হয় এই দুই নম্বর কারণের ফলে। জোর বৃষ্টি! ভারী গোলমেলে জিনিষ তো রে মশায়! জোর বৃষ্টির ফলে না হয় মানিলাম দারুণ বন্যা হইল, কিন্তু মাটী কেন কাঁপিতে যাইবে?—নিশ্চয়ই এই ধরণের চিন্তা তোমাদের মাথায় আসিতেছে! ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিলে কিন্তু বলিবে, "বাঃ, ভারী সোজা তো!"

মনে কর, একটা জলপূর্ণ পাত্রে দুইখানি কাঠ পাশাপাশি ভাসিতেছে। কাঠ দুইখানি একেবারে আল্‌গা নয়, এবং তারা এম্‌নি ভাবে আছে যে জলের উপর সবটা জায়গা একেবারে খাপে খাপে জুড়িয়া গেছে। এখন যদি একটা কাঠের উপর হইতে খানিক্‌টা অংশ চাঁছিয়া দ্বিতীয় কাঠটার উপর ফেলা যায়, তবে কি হইবে বলত? একটা কাঠ বেশী ভারী হইয়া নীচু হইয়া পড়িবে, আর যে কাঠটা হইতে খানিকটা অংশ চাঁছিয়াছ সেটা হাল্কা হইয়া উপরে উঠিবে। ফলে সমস্ত কাঠখানাই নড়িতে থাকিবে, এবং ভারসাম্য না হওয়া পর্য্যন্ত সে নড়া বন্ধ হইবে না। ভূমিকম্পও হয় অনেকটা এই ভাবেই। মাটী ছ্যাঁদা করিয়া যদি ভিতরে ঢুকিতে পার তবে দেখিবে, পৃথিবীর উপরটাই শুধু শক্ত, ভিতরে নরম গোছের পদার্থ। তারই উপরে, উপরকার শক্ত জমি অনেকটা যেন পুকুরের উপর কাঠের মতই ভাসিতেছে। কোন কারণে যদি উপরকার এই শক্ত জমির এক দিকে অপর দিকের চাইতে বেশী চাপ পড়ে তবেই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

এখন, হঠাৎ মাটীর একদিকে বেশী ভার কি ভাবে পড়িতে পারে বলিতেছি। আমাদের বাংলা দেশটার কথাই ধরা যাক্। বাংলা দেশের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, আর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। তোমরা জান কিনা জানি না, হিমালয় পর্ব্বতের উপর বৃষ্টি পড়িয়া প্রতি বৎসর পাহাড় ক্ষয়িয়া লক্ষ লক্ষ মণ মাটী নদীর জলের সঙ্গে বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়িতেছে। ফলে হিমালয় পাহাড়ের দিকে ভার কম হইয়া সেই ভার আসিয়া পড়িতেছে সমুদ্রের দিকে। কাজেই হিমালয় আর সমুদ্রের ভিতরকার মাটী নিশ্চয়ই নড়িয়া উঠিবে আর ভারসাম্য না হওয়া পর্য্যন্ত সে নড়া চলিতেই থাকিবে। অবশ্য সাধারণ বৃষ্টিতে যে পরিমাণ মাটী বঙ্গোপসাগরে আসিয়া পড়ে তাতে যে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়, তা আমাদের মালুমই হয় না, শুধু বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রেই তা ধরা পড়ে। কিন্তু জোর বৃষ্টি অবিরত হইতে থাকিলেই মুস্কিল।

এই তো গেল দুই নম্বর কারণ। এবার প্রথম যে কারণটার কথা বলিয়াছিলাম সেটী শোন।

আগেই বলিয়াছি যে পৃথিবী ফুঁড়িয়া নীচের দিকে ক্রমাগত নামিতে থাকিলে বরাবরই উপরকার মত এমন শক্ত মাটী পাইবে না। আমাদের বুড়া পৃথিবীর উপরের খোলসটা অনেকটা শক্ত হইয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু ভিতরে এখনও নানা রকমের নরম পদার্থ প্রভৃতি রহিয়াছে। উত্তাপের এবং চাপের (heat and pressure) দরুণ সেগুলি অবিরত ঠেলাঠেলি করিতেছে, মাটী ফুঁড়িয়া ঠেলিয়া উঠিতে পারিলে যেন তারা শান্তি পায়। একবার যদি তারা কোন গতিকে মাটী ফুঁড়িয়া বাহির হইল তো অমনি সেখানকার জমি ভীষণ ভাবে কাঁপিয়া উঠিয়া ভূমিকম্পের সৃষ্টি হইল। পৃথিবীর গায়ে স্থানে স্থানে এমন কতগুলি যায়গা আছে যেখান দিয়া ভিতরকার এই সব বাষ্প এবং তরল পদার্থ অতি সহজেই ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। পণ্ডিতেরা এই জায়গাগুলির নাম দিয়াছেন 'দুর্ব্বল স্থান' (line of weakness)। 'দুর্ব্বল স্থান'গুলি গোটা দুনিয়াময়ই ছড়াইয়া আছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আগ্নেয় পাহাড়ে এবং তাহার ধারেই এগুলিকে খুব বেশী দেখা যায়। কাজেই যে অঞ্চলে আগ্নেয়-পাহাড় যত বেশী, ভূমিকম্পের রেওয়াজও সেখানেই তত বেশী হইবে।

আগ্নেয় পাহাড়ের মধ্য দিয়া এ যুগে যতগুলি ভূমিকম্প হইয়াছে তার মধ্যে

ক্রাকাতোয়ার ভূমিকম্পের বোধ করি তুলনা নাই। ক্রাকাতোয়া একটী দ্বীপ—জাভার কাছে সুণ্ডা প্রণালীর মধ্যে দ্বীপটী। এখানে একটা আগ্নেয় পাহাড় ছিল, দ্বীপের নামানুসারে সেটীকেও ক্রাকাতোয়া পাহাড় বলা হইত। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মাটীর তলা হইতে গলিত ধাতব পদার্থ উঠিয়া যে কাণ্ড বাধাইল পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ করি সেটী স্মরণীয় ব্যাপার হইয়া থাকিবে—অনবরত গরম ধূলা ছাই আর পাথর ছিটাইতে ছিটাইতে পাহাড় ফুঁড়িয়া সাত মাইল উঁচু একটী স্তম্ভের সৃষ্টি হইল এবং পরিশেষে একদিন হাজার হাজার কামানের মত ভয়ঙ্কর আওয়াজের সঙ্গে প্রকাণ্ড পাহাড়টা আকাশে উড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পাহাড় উড়িবার সেই দারুণ শব্দ দেড়শো মাইল দূরের লোকেরা পর্য্যন্ত শুনিতে পাইয়াছিল। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ভূমিকম্প গভীর সমুদ্রকে এমনি তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল যে সাগরের জল পাহাড়ের সমান উঁচু হইয়া তীরের গায়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া গ্রাম, বাড়ী সহর সব ভাসাইয়া লইয়া যায়। একখানা জাহাজকে নাকি জল হইতে তিন মাইল দূরের ডাঙ্গার উপর পাওয়া গিয়াছিল।

ভূমিকম্প সব চাইতে বেশী হয় প্রশান্ত মহাসাগরের চারদিক্‌কার উপকূলে। জাপানী ভায়ারা ভূমিকম্পের প্রকোপে ফি বছরই বড় কষ্ট পায়। সেখানে নাকি ১৮৮৫ হইতে ১৮৯২ পর্য্যন্ত গড়ে বছরে ১০০০টী ভূমিকম্প হইয়াছে। অবশ্য তার অধিকাংশই ছোট ছোট। বেচারারা এতদিন বড় বড় সহরে পর্য্যন্ত ইটের পাকা বাড়ী করিতে সাহস পাইত না, কাঠের বাড়ীতে থাকিত। এখন অবশ্য এঞ্জিনিয়ারেরা আগের চাইতে সেয়ানা হইয়াছে, ভূমিকম্প সহিতে পারে এমন ফ্রেম্‌ওয়ালা পাকা বাড়ীও তৈরী করিতে শিখিয়াছে।

আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় ভূমিকম্প হইয়াছিল ১৮৯৭ সনের ১২ই জুন। উত্তর বঙ্গ এবং পূর্ব্ব বঙ্গের কত বাড়ী যে এই চোটে ভূমিসাৎ হইয়াছিল, বলা যায় না। অনেক নদীর গতি পর্য্যন্ত ফিরিয়া গিয়াছিল। তারপর ১৯০৫ সনের ভূমিকম্পটাও নেহাৎ নিরীহ গোবেচারা নয়।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

গ্যাল্‌ওয়ের বিস্ময়

কিন্তু সমস্তই বৃথা। রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক্ ডুব সাঁতারে সমস্ত নদীটা চষিয়া বেড়াইতে লাগিল, বেড়াজাল যারা ফেলিয়াছিল তারাও চেষ্টার এতটুকু কসুর করিল না, কিন্তু তবুও চার্লির কোন উদ্দেশ নাই। (অথচ নিতান্ত ছোটখাট জিনিষ—বহু পূর্ব্বে যা নদীতে পড়িয়াছিল সেগুলি পর্য্যন্ত জালে বাধিয়া উঠিয়া আসিতে লাগিল। দেখিয়া ফল সম্বন্ধে সকলেই নিরাশ হইলেন, একে একে বাড়ীর পথে রওয়ানা হইতে লাগিলেন। শুধু ছেলের দল সারাটাক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিল।)

চেষ্টার কসুর করিল না।

রোল্যাণ্ড্ জল হইতে উঠিয়া ভিজা কাপড় নিংড়াইতেছিল, হঠাৎ পরিচিত কণ্ঠের স্বর কাণে আসিতেই মুখ ফিরাইয়া দেখে রেভারেণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্ক্ উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কি হোল, পাওয়া গেল চার্লিকে ?"

মিষ্টার ইয়র্কের উপর রোল্যাণ্ড্ হাড়ে চটা। আর্থার চ্যানিংয়ের নামে চুরীর অপবাদ উঠিয়াছে শুনিয়া যেদিন তিনি কন্‌স্ট্যান্সের সহিত নিজের বিবাহের সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন সেদিন হইতেই রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক্ মুখখানাকে হাঁড়িপানা করিয়া থাকে, কাটা-কাটা কথা শুনাইতেও কসুর করে না। আজও সে ছাড়িল না, ঠোক্কর মারিয়া কহিল, "জোর বরাত দেখ্‌ছি চ্যানিংদের—খোঁজটা তবু নিলে! আমি ভেবেছিলাম বুঝি কন্‌স্ট্যান্সের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভাঙ্গার পর......"

"আঃ, তোমায় আমি হাজার বার বারণ করেছি রোল্যাণ্ড্, মিস্ চ্যানিংয়ের প্রসঙ্গ আমার কাছে আর উত্থাপন করো না!"

"ভা—রী বয়ে গেল তাতে, মিস্ চ্যানিংয়ের। বলি খবর রাখ? শীগ্‌গিরই এমন একজন লোকের সাথে তার বিয়ে হচ্ছে যে তোমার-আমার মত লোককে গোমস্তা রাখ্‌তে পারে!" বলিয়া সগর্ব্বে রোল্যাণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্কের মুখের দিকে তাকাইল।

ব্যাপারটা একটু বুঝাইয়া বলা দরকার। রোল্যাণ্ডের মামা, বুড়া লর্ড্ ক্যারিক্ যে কন্‌স্ট্যান্সের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তা রোল্যাণ্ড্ জানিত; আরও জানিত, যে কন্‌স্ট্যান্স্ সে প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় ব্যাপারটা সেখানেই চুকিয়া বুকিয়া গিয়াছে। কিন্তু যাক্ চুকিয়া, এ খবরটী দিয়া মিষ্টার ইয়র্কের থোঁতা মুখ ভোঁতা করিতে তো সে পারিবে! সেইটাই রোল্যাণ্ডের মহা লাভ!

কথাটা শুনিয়াই মিষ্টার ইয়র্কের মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, "কে সে লোকটী, শুন্‌তে পাই?"

"স্বচ্ছন্দে—আমারই মাতুল মশাই তিনি—লর্ড্ ক্যারিক্।"

"বাজে খবর দিচ্ছ তুমি।"

"বাজে খবর! বেশ, লেডি ক্যারিক্ হয়ে কন্‌স্ট্যান্স যখন গীর্জ্জে থেকে বেরিয়ে আস্‌বে তখন বুঝ্‌বে বাজে খবর কি কাজের খবর!"

এ 'অর্ব্বাচীনের' সহিত কথা বলিয়া নিজেকে তিনি আর অপদস্থ করিবেন না ভাবিয়া মিষ্টার ইয়র্ক রোল্যাণ্ডকে প্রাণ ভরিয়া খুসী হইবার অবসর দিয়া সেখান হইতে বিদায় হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের ভিতর খচ্ খচ্ করিতে লাগিল। রোল্যাণ্ড যা

বলিল, তা কি সত্যি? সত্যিই কি কন্‌স্ট্যান্সের সহিত চিরকালের জন্য তাঁর ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে! এ কথা তো তিনি একদিনও ভাবেন নাই।

এক পা দু' পা করিয়া সেখান হইতে তিনি চ্যানিংদের বাড়ীর পানে রওয়ানা হইলেন। (বিপদের বাড়ী, তাই নিতান্ত পরিচিত যাঁরা তাঁরা দাসী-চাকরের মুখে খবর না পাঠাইয়া একেবারে সরাসর ভিতরেই চলিয়া যাইতেছেন।) বড় হল ঘরটায় সকলে বসিয়া চার্লির কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছিল, বাহিরের দু'চারজন বন্ধুস্থানীয় লোক—মিষ্টার হান্টলি, মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন।

(শোকের প্রথম ধাক্কাটা কাটিয়াছে, এখন মিষ্টার এবং মিসেস্ চ্যানিংয়ের কাছে কি ভাবে চার্লির সংবাদটা পাঠান যায় সেইটাই হইল আলোচনার বিষয়। চিঠিতে খবর পাঠান হামিশের মত নয়, তাহাতে মা-বাবাকে বড় বেশী পরিমাণে ব্যস্ত করিয়া তোলা হইবে। চিঠি পাওয়া মাত্র এমন হাজারো প্রশ্ন তাঁদের মনে উঠিবে যার জবাব না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই তাঁরা শান্ত হইতে পারিবেন না। অথচ সে চিঠির উত্তর পাইতে যেমন তেমন করিয়াও চার পাঁচ দিন তো লাগিবেই। তার চাইতে আর্থারের কাজকর্ম্ম কম, সে-ই খবর দিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মেনী রওনা হইয়া পড়ুক। খরচ কিছু পড়িবে, কিন্তু সেজন্য কি আর করা!

প্রস্তাবটা ভালই, অনেকেই তাহাতে সায় দিল, শুধু মিষ্টার হান্ট্‌লি চিন্তিত মুখে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া কন্‌স্ট্যান্স জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এটা কেমন পরামর্শ মনে করেন, মিষ্টার হান্ট্‌লি?"

"আমি? আমি ভাব্‌ছি, আপাততঃ তোমাদের মা-বাবাকে কোন খবর দিয়েই দরকার নেই। চার্লি যে সত্যি সত্যিই মারা গেছে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ তো তোমরা এখনও পাওনি, কন্‌স্ট্যান্স!"

কন্‌স্ট্যান্সের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, "কিন্তু…কিন্তু, সত্যিই কি এখনও কোন আশা আছে, মিষ্টার হান্ট্‌লি—চার্লি বেঁচে আছে এ কথা কি আপনি বিশ্বাস করেন?")

("না, মা, তাকে ফিরে পাবার আশা বাস্তবিকই বড় কম। কিন্তু তবুও) যতক্ষণ না একেবারে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে, কী দরকার ততক্ষণ তাঁদের উতলা করে?

মিষ্টার চ্যানিং ক্রমেই আরামের পথে এগিয়ে আস্‌ছেন, হয় তো খুব শীগ্‌গিরই আবার পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে তোমাদের মাঝে ফিরে আসবেন। এখন এমন একটা খবর কানে গেলে আবার তিনি ভেঙ্গে পড়্‌বেন, যেটুকু উপকার হয়েছে তার তিনগুণ অপকার হবে; এত খরচ পত্র করে চেঞ্জে যাওয়া সবই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

"ঠিক পরামর্শই দিয়েছেন মিষ্টার হান্ট্‌লি, আপাততঃ খবর দিয়ে কাজ নেই।" কণ্ঠস্বরে চম্‌কাইয়া ঘাড় ফিরাইতেই কনস্ট্যান্স দেখিল, বক্তা রেভারেণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্ক্। আলোচনার মধ্যে কোন্ ফাঁকে তিনি যে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন সে তা খেয়ালই করে নাই।

তখন ঠিক হইল মিষ্টার হান্ট্‌লির যুক্তি মতই কাজ হইবে। সকলে উঠিবার উদ্যোগ করিতেই মিষ্টার ইয়র্ক্ কন্‌স্ট্যান্সকে জানাইলেন যে কাল প্রাতে সে যদি বাড়ী থাকে তো তিনি বড়ই সুখী হইবেন, কেননা তাহার সহিত তাঁর একটু প্রয়োজন আছে। কন্‌স্ট্যান্স্ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁর দিকে তাকাইল কিন্তু মিষ্টার ইয়র্ক্ আর কোন কথা না বলিয়া অপর সকলের সহিত ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

মিষ্টার ইয়র্ক্‌কে আপাততঃ ছাড়িয়া পাঠক পাঠিকাগণকে আমার সহিত একবার এটর্ণী গ্যাল্‌ওয়ের অফিসে ঢুকিতে হইবে—অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়, দিন কয়েক পরে রোল্যাণ্ডের মুখের অবস্থাটা দেখিবার জন্য। অফিসে পা দিয়াই সেদিন সে শুনিল জেঙ্কিন্স্ একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে, বেশ কিছু দিন এখন সে কাজে আসিতে পারিবে না। গত কয় মাস হইতেই বেচারা বিশ্রী একটা কাসে ভুগিয়া ভুগিয়া দিন দিন রোগা আর ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছিল, কিন্তু লোকটা অসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ, তাই একদিনের তরেও কাজে কামাই দেয় নাই। কিন্তু আজ সে একেবারেই অচল হইয়া পড়িয়াছে। ভোরে দুই দুই বার মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হওয়া সত্ত্বেও সে অফিসে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, তার স্ত্রী তাই তাহার সমস্ত কাপড়-চোপড় জুতা প্রভৃতি লইয়া পাশের কামরায় তালা লাগাইয়া দিয়াছে। কাজেই বাধ্য হইয়া তাকে বিছানায় আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

খবর শুনিয়া রোল্যাণ্ডের মুখ দুই ইঞ্চি লম্বা হইয়া পড়িল, চোখ দুটী একেবারে

গোল হইয়া গেল। ঘ্যাঁ, এরা বলে কি? সমস্ত অফিসের কাজ তাকে একলা চালাইতে হইবে? একেই তো আর্থারকে বিতাড়িত করার পর তিন জনের কাজ তাকে আর জেঙ্কিন্স্‌কে চালাইতে হইতেছে, এখন কি গ্যাল্‌ওয়ের মৎলব খানা সমস্ত কাজই তার একার ঘাড়ে চাপান নাকি? সখ যে "বাবুর" দিন দিনই বাড়িতেছে দেখিতেছি। কোন্ দিন হয় তো হুকুম হইবে, এই সঙ্গে আমার বাড়ীর বাজারটাও করিয়া দাও! রোল্যাণ্ড্ রাগে গড়্ গড়্ করিতে লাগিল।

মেঝের উপর রাশীকৃত দলীল পড়িয়া ছিল, সেগুলি সমস্তই নকল হইবে। রোল্যাণ্ড বুটের এক ঠোক্করে সেই অচেতন "বেচারা" গুলির উপরেই উপস্থিত মনের ঝালটা ঝাড়িয়া নিয়া জানালার পাশে আগাইয়া গেল; দেখিল, সাম্‌নের রাস্তা দিয়া আর্থার বাড়ীর পানে যাইতেছে। দেখিয়াই উচ্চকণ্ঠে নাম ধরিয়া ডাকিয়া রোল্যাণ্ড্ তাকে নিকটে আসিতে বলিল।

আর্থার ভিতরে আসিল। বিতাড়িত হইবার পর আজ এই প্রথম সে এটর্ণী অফিসে ঢুকিতেছে মনে পড়ায় তার মুখ ক্ষণেকের জন্য লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই রোল্যাণ্ড ইয়র্কের দিকে চাহিয়া সে প্রশ্ন করিল, "একি রোল্যাণ্ড্, তোমার অসুখ করেছে নাকি?"

"আর অসুখ! দু'দিন বাদে যখন আমায় কবর দেবার জন্যে মা তোমাদের ডেকে পাঠাবেন তখনই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে" বলিয়া রোল্যাণ্ড একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

আর্থার ভয় পাইয়া বলিল, "সেকি? কি হয়েছে তোমার?"

"কি হয়েছে? রাত বারটা পর্য্যন্ত রোজ যদি কারো সমানে খাট্‌তে হয় তো তিন দিনেই তার ব্রেন ফিবার, আর চার দিনের দিন অক্কা" বলিয়া তার দুঃখের কাহিনী সবিস্তারে আর্থারের নিকট বর্ণনা করিয়া সে কহিল, "আঃ পোর্ট নেটাল থেকে একটা ভাল খবর পাই তো যাই সব ছেড়ে ছুড়ে সেখানে চলে! অন্ততঃ এ মুট্‌কো গ্যাল্‌ওয়ের হাত হতে তো রেহাই পাওয়া যাবে!"

"মুট্‌কো গ্যাল্‌ওয়ে বড়ই মন্দ, নয়? যে হেতু সে জেঙ্কিন্সের অসুখটা থামাতে পারেনি! তা বাপু, কাজটা যখন তুল্‌তেই হবে, তখন ওখানে ওই জানলার কাছে টেঁড়িতে হাওয়া লাগাবার চাইতে ডেস্কের সাম্‌নে বস্‌লেই যেন একটু ভাল হয়!"

কথাগুলি বলিলেন মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে স্বয়ং; কখন তিনি রোল্যাণ্ডের অলক্ষ্যে ঘরে আসিয়া ঢুকিয়াছেন সে তা টের পায় নাই। আর্থারের দিকে নজর পড়িতে মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে বলিলেন, "এই যে আর্থার, ভাল?"

"এই এক রকম; ধন্যবাদ।" তারপর একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আপনার এখানে বড়ই কাজের চাপ দেখ্‌ছি, রোল্যাণ্ড বোধ হয় পেরে উঠ্‌বে না। যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে তবে কতগুলো দলীল আমি বাড়ী নিয়ে যেতে পারি, নকল করে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।"

"এত সময় পাবে কোথা তুমি?"

"আমার সময়? তা আছে মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে। আপনার এখান থেকে বিদেয় হবার পরে হেল্‌ষ্টনলি সহরে তো কেউ আমাকে বিশ্বাস করে কোন কাজে ভর্ত্তি করেনি!"

মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে ভাবিলেন, সুনাম এমনই বটে, হারাইতে সময় লাগে না এতটুকু, কিন্তু একবার হারাইলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। প্রকাশ্যে কহিলেন, "তা বাড়ী নিয়ে দরকার নেই, তুমি এখানে বসেই কাজ কর্‌তে পার।"

"আজ্ঞে সে হয় না, বাড়ীতেই যেতে হবে আমাকে।"

গ্যাল্‌ওয়ে আর আপত্তি করিলেন না, ফলতঃ তিনি আরামের নিঃশ্বাসই ছাড়িলেন। আর রোল্যাণ্ড্? গ্যাল্‌ওয়ে উপস্থিত না থাকিলে সে আর্থারকে কোলে লইয়া নিশ্চয়ই নাচিত। তা যখন সম্ভব হইল না তখন আর্থার অন্তর্হিত হইলেই সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল "বেচারা!......জানেন স্যর, সহরে এক নতুন গুজবের ধোঁয়া উঠেছে, কেউ কেউ বল্‌তে সুরু করেছে যে টাকা আর কেউ নেয়নি, আপনার ভাই-ই নাকি তা পেয়েও অস্বীকার কর্‌ছেন্!"

গ্যাল্‌ওয়ে ভীষণ চটিয়া টেবিলের উপর ঘুঁষি মারিয়া কহিলেন, "বটে? কিনি এ গুজোব রটাচ্ছেন শুনি? তুমিও সে দলের একজন নাকি?"

"আমি কেন হতে যাব? আমি বরাবর এক কথাই বলে আস্‌ছি — এ পোষ্ট অফিসেরই কর্ম্ম।"

গ্যাল্‌ওয়ে মুখ লাল করিয়া নিজের খাস্ কামরায় চলিয়া গেলেন, বলিয়া গেলেন এ গুজবের মূলে কে আছে জানিতে পারিলে তার নামে তিনি মাম্‌লা আনিবেন।

বেলা তিনটা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া গ্যাল্‌ওয়ে একবার বাহিরে গেলেন, রোল্যাণ্ড্ ও কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চেয়ারে ঠেসান দিয়া শুইবার উপক্রম করিল। এই সময় ডাকের পিয়ন দুইখানা চিঠি আনিয়া দিল। কাজের মত রোল্যাণ্ডের কৌতূহলের কিন্তু কম্‌তি নাই, সে সে দুখানা নানা ভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, কে কোথা হইতে লিখিয়াছে তাহাই বুঝার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারিয়া শেষটায় টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। খানিকটা বাদে মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ের চাকর বাড়ী হইতে আরও একখানা চিঠি দিয়া গেল, কর্ত্তা নাকি তাহাকে বলিয়া আসিয়াছেন, চিঠিপত্র আসিলে সে যেন তা অফিসে লইয়া আসে। এখানাও রোল্যাণ্ড নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে কসুর করিল না। শেষে তিনখানা চিঠিই একত্র করিয়া সে গ্যাল্‌ওয়ের খাস্ কামরায় টেবিলের উপর চাপা দিয়া রাখিয়া আসিল।

ঘণ্টা দুই বাদে গ্যাল্‌ওয়ে ফিরিয়া আসিয়া চিঠি পত্র কিছু আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সমস্ত চিঠি তাঁর টেবিলের উপর আছে শুনিয়া ঘরে ঢুকিয়া এক একখানা করিয়া সেগুলি তিনি খু লয়া ফেলিলেন। শেষ চিঠিখানা খুলিয়াই কিন্তু তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন—সে চিঠির মধ্যে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ এবং সেই সঙ্গে এক টুকরা কাগজে সম্পূর্ণ অপরিচিত হস্তে লেখা—"আমার জন্য নিরপরাধ লোক মিছামিছি গঞ্জনা পাইতেছে; আপনার নোটখানা তাই ফেরৎ পাঠাইলাম।"

স্তম্ভিত গ্যাল্‌ওয়ে ভাবিতে লাগিলেন, একি ব্যাপার! রোল্যাণ্ড্ ইয়র্কে থিওরি মাঠে মারা গেল, কেননা পোষ্ট অফিসে খোয়া গেলে টাকা কিছুতেই ফেরৎ আসিত না। আর তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে কুচক্রী লোকগুলা যে গুজব রটাইতেছিল তাহাও বিলকুল মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইল, যেহেতু তাঁর ভাই আর্থারের সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও কোন খবর রাখিত না। তবে এ কি আর্থারের নিজেরই কাজ? সেই কি নিজের দোষ ক্ষালনের জন্য টাকা পাঠাইয়াছে? কিন্তু আর্থারই বা এত টাকা কোথায় পাইবে?

(ক্রমশঃ)

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা।

"রামধনু"

(শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ধূলগ্রাম - খুলনা)

গান

("ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা" অবলম্বনে—ঐ সুর)

নানা পত্রিকাতে ঠাসা
আমাদের এই বঙ্গভাষা,
তাহার মাঝে আছে সে এক সব কাগজের সেরা
প্রাণ মাতান গল্পেতে আর— কবিতাতে ঘেরা ॥

কোরাস্

এমন কাগজ পড়্‌লে পরে—নৃত্য করে তনু,
সব কাগজের সেরা সে যে মোদেরই "রামধনু" ॥

এমন ভাল লেখা কাহার?
কাহার এমন ছবির বাহার?
কোন্ কাগজের গল্প এমন প্রাণ মাতিয়ে তোলে,
কোন্ কাগজের নামেই শিশু সকল কাজই ভোলে!

(কোরাস্) এমন কাগজ পড়্‌লে পরে............

পাতায় পাতায় ভরা ছবি,
কুমুদ থেকে সকল কবি,

প্রাণ-মাতান কবিতাতে চমক্ লাগায় প্রাণে—
বক্ষখানি নৃত্য করে শিশু কবির গানে ॥
(কোরাস) এমন কাগজ পড়্‌লে পরে·········
"রঙ্গকণা," "রং তামাসা"
পুষ্ট করে বঙ্গভাষা
"সন্দেশেতে" খবর পেয়ে শিশু-পরাণ দোলে,
মজার মজার "ধাঁধার" কথায় প্রাণ মাতিয়ে তোলে ॥
(কোরাস্) এমন কাগজ পড়্‌লে পরে············
কত ভাল লেখায় গাঁথা
"ভাবীসাহিত্যিকের" পাতা,
খোকা-খুকুর আপন-করা প্রাণমাতান সাথী !
"রামধনু"গো ! তোমায় পেলে আনন্দেতে মাতি ॥
(কোরাস্) এমন কাগজ পড়লে পরে············
প্রণাম করি বিভুর পায়ে,
সরল মনে শির নোয়ায়ে,
এই কাগজের সঙ্গে যেন নামটি মোদের থাকে,
করতে পারি বাণীর সেবা লেখাপড়ার ফাঁকে ॥
(কোরাস্) এমন কাগজ পড়্‌লে পরে নৃত্য করে তনু,
সব কাগজের সেরা - সে যে মোদেরি "রামধনু ॥"

আমার ঘর

(শ্রীরামরতি চক্রবর্ত্তী, মনোহর পুকুর, কলিকাতা)

সেই গাঁয়ে মোর ঘর —
(যেথা শ্যামার শিষে স্বপন টোটে স্নিগ্ধ ঘুমের পর।
ঊষার আলোক ফোটার আগে
যেথায় নর ও নারী জাগে,
যায়গো চলে আপন কাজে সারা দিনের তর—
সেই গাঁয়ে মোর ঘর।

সেই গাঁয়ে মোর বাস—
(যেথা) তরুণ-অরুণ-অরুণিমায় মুক্তা সাজে ঘাস।
স্তব্ধ দীঘির অতল জলে
তাল তমালে শাখা মেলে,
শান্তিদেবী বিরাজ করেন যেথায় বার মাস—
সেই গাঁয়ে মোর বাস।

সেই গাঁয়ে মোর ঘর—
(যেথা) প্রতিবেশীর স্নেহ-প্রীতি ভোলায় আপন-পর।
পিকের মোহন মধুর স্বরে
মুখর করে দিগন্তরে
সাঁঝের বেলায় ফেরে যেথায় শ্রান্ত কৃষক ঘর—
সেই গাঁয়ে মোর ঘর

সেই গাঁয়ে মোর বাস—
(যেথা) সুবাস-মাখা স্নিগ্ধ সমীর ক্লান্তি করে নাশ
শাদ্বলে'ও শস্যক্ষেতে
পাগ্‌লা হাওয়া দোলায় মাতে –
ছড়ায় পাতে যেথায় তাজা শিউলি ফুলের রাশ—
সেই গাঁয়ে মোর বাস

সেই গাঁয়ে মোর ঘর—
(যেথা কুটিলতার নাইকো ছায়া সরল গেহের 'পর।
সরল প্রাণের অবাধ হাসি
ভাসিয়ে দে' যায় চিন্তারাশি—
যেথায় বহে সবার প্রাণে স্ফূর্ত্তি নিরন্তর—
সেই গাঁয়ে মোর ঘর

সাড়ে আট দিনে পৃথিবী প্রদক্ষিণ

ফরাসী ঔপন্যাসিক জুলে ভার্ণে একখানি বই লিখিয়াছিলেন—"আশী দিনে ভূপ্রদক্ষিণ"। সেই ব্যাপারটাই তখনকার লোকেদের কাছে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া মনে হইত। আর আজ? উপন্যাসে নয়, সত্যিসত্যিই মানুষ সাড়ে আট দিনে পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। এই কাজ হাঁসিল করিয়াছেন আমেরিকার দুটি ভদ্রলোক—উইলি পোষ্ট ও হেরল্ড গেটি। গত ২৩শে জুন তাঁরা তাঁদের এরোপ্লেন লইয়া বাহির হইয়াছিলেন, তারপর গোটা পৃথিবী চক্র দিয়া ১লা জুলাই আবার যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন: সবশুদ্ধ তাঁদের সময় লাগিয়াছে আটদিন পনের ঘণ্টা, পনের মিনিট। ইহার মধ্যে এরোপ্লেন চালান, হইয়াছিল সব সমেত চারদিন দশ ঘণ্টা আট মিনিট।

ইতিপূর্ব্বে আরও দুইবার এইভাবে পৃথিবী চক্র দেওয়া হইয়াছিল। [প্র]থম ১৯২৪ সনে। সেবার সময় লাগিয়াছিল ৬ মাস ২০ দিন। তারপর ১৯২৯ সনে গ্রাফ জেপেলিন ২০ দিনে পৃথিবী ঘুরিয়াছিল;—সে গল্প তোমরা রামধনুতেই পড়িয়াছ।

যমজের ক্লাব

আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ায় একটা ক্লাব আছে তার নাম 'যমজ ক্লাব'। এই ক্লাবের সভ্য হইবার নিয়ম ভারী মজার। একজন লোক একা গেলে এই ক্লাবের সভ্য হইতে পারে না। সভ্য হইতে হইলে তোমার একটি যমজ ভাই থাকা চাই,—আর যাইতে হইবে একসঙ্গে সেই দু'জনকে। তবে অবশ্য আর একটা উপায় আছে। যদি তোমার সাথে হুবহু চেহারার মিল আছে এমন কোনও লোককে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পার তবেও তুমি সভ্য হইতে পারিবে।

এই ক্লাবের সভ্য-সংখ্যা কয়েক হাজার।

গাছের গুঁড়ির গ্যারেজ

ইহাও ক্যালিফোর্ণিয়ার ব্যাপার। একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝড়ে পড়িয়া যায়। গাছের মালিক গাছটিকে না সরাইয়া তার গুঁড়ির ভিতরটা ফাঁপা করিয়া লইয়াছে। সে গুঁড়িটা এত বড় যে তার মধ্যে ২ খানি মোটরকার পর পর ভরিয়া রাখা যায়। ফলে সেটা এখন চমৎকার এক গ্যারেজে দাঁড়াইয়াছে।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীমতী পুষ্পলতা গোস্বামী)

রাজা রাণীর কথার মিল আর কখনও হ'ল না। একজন যা' বল্‌বে আর একজন ঠিক তার উল্টো বল্‌বে। এ বলে তোমার কথা ঠিক নয়, ও বলে তুমি ভুল বল্‌ছ।

রাজা বল্লেন, "পাখী উড়ে গেছে।"
রাণী বল্লেন, "কই, পাখী ত' জানলার উপর রয়েছে!"
রাজা বলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লাম, পাখী উড়ে গেল";
রাণী বলেন, "আমিও স্বচক্ষে দেখ্‌ছি পাখী জানলার উপর।"

রাজা আবার বল্লেন, "বেঙ নর্দ্দমা দিয়ে পালিয়ে গেছে।"
রাণী বল্লেন, "কোথায় যাবে? বেঙ ত' ঐ দরজার কোণায় রয়েছে!"
রাজা বলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখলাম—"
রাণী বলেন, "আমিও স্বচক্ষে দেখ্‌ছি।"
মহা মুস্কিল! তোমরা বল ত কার কথা ঠিক?

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে চুরী

এ সম্বন্ধে গ্রাহক-গ্রাহিকাদিগকে একটা কথা মনে রাখিতে বলি। কতগুলি জিনিষ আছে যেগুলিকে ঠিক চুরী বলা যায় না, যেমন, পুরাতন প্রচলিত গল্প-প্রভৃতি, যাহা লোকের মুখে চলিয়া আসিয়াছে সেগুলি যদি কেউ আবার গুছাইয়া লেখে তবে সেটা চুরী নয়—কেননা সে গল্পগুলি কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তবে আর কেউ যদি ইতিপূর্ব্বে সেগুলি লিখিয়া থাকে আর সেই লেখার সহিত নূতন লেখা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া যায় তবে সেটা চুরী। তেমনি কোন কবিতার সহিত অপর কোন কবিতার অক্ষরে অক্ষরে মিল থাকিলে পরের কবিতাটী ডাঁহা চুরী। এই শেষোক্ত ধরণের লেখাকেই আমরা চোরাই মাল বলিয়া 'রামধনুতে' লেখকের নাম ধাম প্রকাশ করিয়া দিই। দুঃখের বিষয় এ রকম চুরী আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই। লিখিতে না পারাটা লজ্জার কথা নয়—কিন্তু এ রকমের চুরী নিদারুণ লজ্জা এবং ঘৃণার কথা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

চিঠির অংশটি এইরূপ হইবে—

বলি ও নিত্যানন্দ, এ তোমার কেমন কাণ্ড? সেই দ্বারভাঙ্গায় চুপ্‌চাপ বসে আছ, বাড়ীর সবাই ত ভাবনায় অস্থির।

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন :—

শিশিরকুমার রায় (বসির হাট), তারা লাহিড়ী (কলিকাতা), অরুণা দেবী (পাটনা), পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া), রাধারমণ দে (মজঃফরপুর), নির্ম্মলেন্দু সর্ব্বাধিকারী ও মায়া, স্থধী, সন্ধি, অমি, বুলু, মণু, খোকন (ভবানীপুর), পূর্ণিমা মিত্র (কালীঘাট), সরোজমোহন চট্টোপাধ্যায় (এলাহাবাদ), ঢেলামামা, হ্যাকাদা, নান্নু, আশা, মাকুম, ডিকে (লক্ষ্ণৌ), এন্ বস্থ (মুজঃফরপুর), শচীন্দ্র সেন (কলিকাতা), প্রভাত ও রঞ্জিত মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল (পাটনা), কুমকুম ঘোষ (জামসেদপুর), হিমাংশুকুমার মল্লিক (কলিকাতা), দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (চন্দননগর), অলকা সেন (সেনহাটী), গোয়ালপাড়ার বালক সমিতির সভ্যবৃন্দ (গোয়ালপাড়া), শোভারাম রায়, জগদীশ দাস, স্থরেশচন্দ্র সাউ, শরৎচন্দ্র জানা, অনন্তকুমার গিরি; যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘ (ধামরাই, ঢাকা), স্থচারু, খোকা ও মণি (গেণ্ডারিয়া), নিখিলনাথ চাটার্জ্জী (ভবানীপুর), মুরলী, ললিত, বংশী, মাণিক, মুকুল, বাবলা, বেণু, দুর্গাদি, অনুদি বীণাদি ও কানাইদা (বেলেঘাটা, কলিকাতা), কীর্ত্তিনারায়ণ রায় (উলপুর), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), জয়ন্ত ও রামগোপাল (পুরুলিয়া), বেলারাণী মিত্র (কলিকাতা), কনককুমার সরকার (কিরকেন্দ কলিয়ারী), স্থনীল-কুমার গোস্বামী, মলিনা, তুফান, রেণু (পাটনা), স্থরমা, প্রতিমা, নীলিমা ও মেজ বৌদি (হাওড়া), পীযূষকুমার সেন ও ছোকু (হেনজাদা, বর্ম্মা) স্থনীতি, স্থব্রতা, অমিয়া, ইন্দিরা, বুবু, রেখা, ভুতো, নরেশ ও ছোট্ট (ভাগলপুর), সমর (আমদা) অমল, প্রতিভা, স্থপ্রভা ও সাবিত্রী সেন (এলাহাবাদ), স্থজাতা দেবী (কলিকাতা), রণেশকুমার চট্টোপাধ্যায় (প্রোম), উষারাণী দেবী, স্নেহলতা দত্ত, মনোরমা দেবী (ফরিদপুর), মোছাম্মাৎ জোবেদা খাতুন (মানবাজার, মানভূম), কার্ত্তিকচন্দ্র বস্থ (মুঙ্গের কেল্লা), স্থকুমার, করুণা (বেড়া, পাবনা), বীণাপাণি বস্থ (বেতিয়া)।

যাঁহারা আংশিক উত্তর দিয়াছেন :—

ধীরেন্দ্রনাথ হালদার (কলিকাতা), হুকাকাশি, লীলা ও শক্তি নাগ (ঢাকা), বীরেন্দ্র, ভবতোষ ও রামকৃষ্ণ সেন (পুষা), রণেন্দ্রকুমার মিত্র (পাটনা), মনোরমা দেবী (ভবানীপুর), কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, (হাজারিবাগ), পূর্ণিমা ও উমা সেন (নাগপুর) সানু, নীলু, কুমুদ, গুলু, মীরা, মণি, শৈল, কল্যাণ, কুশল, বোঁচা, দাণী, লুসে ও কুচে (পাটনা) গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), বনা, মণা, ধনা (নাগপুর) এণাক্ষি, প্রবোধ, বাণী রায় (খিদিরপুর), বিনোদ বিহারী চক্রবর্ত্তী, রেণু, দুলালী, বাদল (কানুনগোপাড়া), আভা, বিশ্বনাথ, স্থনীল, শ্যামলী (ভবানীপুর), মুরলী, নিমাই, অনিন্দ্য, মঞ্জু বাণী, বেলা ও স্থনীল (কটক), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), অঞ্জলিকুমার বস্থ (হাজারীবাগ), অজিত, স্থধীন, বঙ্কিম, আদিত্য, ভোলা ও দেবকী অধিকারী (তমলুক)। মুগবেরিয়া ম্যাগাজিন লাইব্রেরির সভ্যদের চিঠিতে লেখা ছিল সেইসঙ্গে ধাঁধার উত্তর পাঠান হইল, কিন্তু চিঠিতে তাহা পাওয়া যায় নাই।

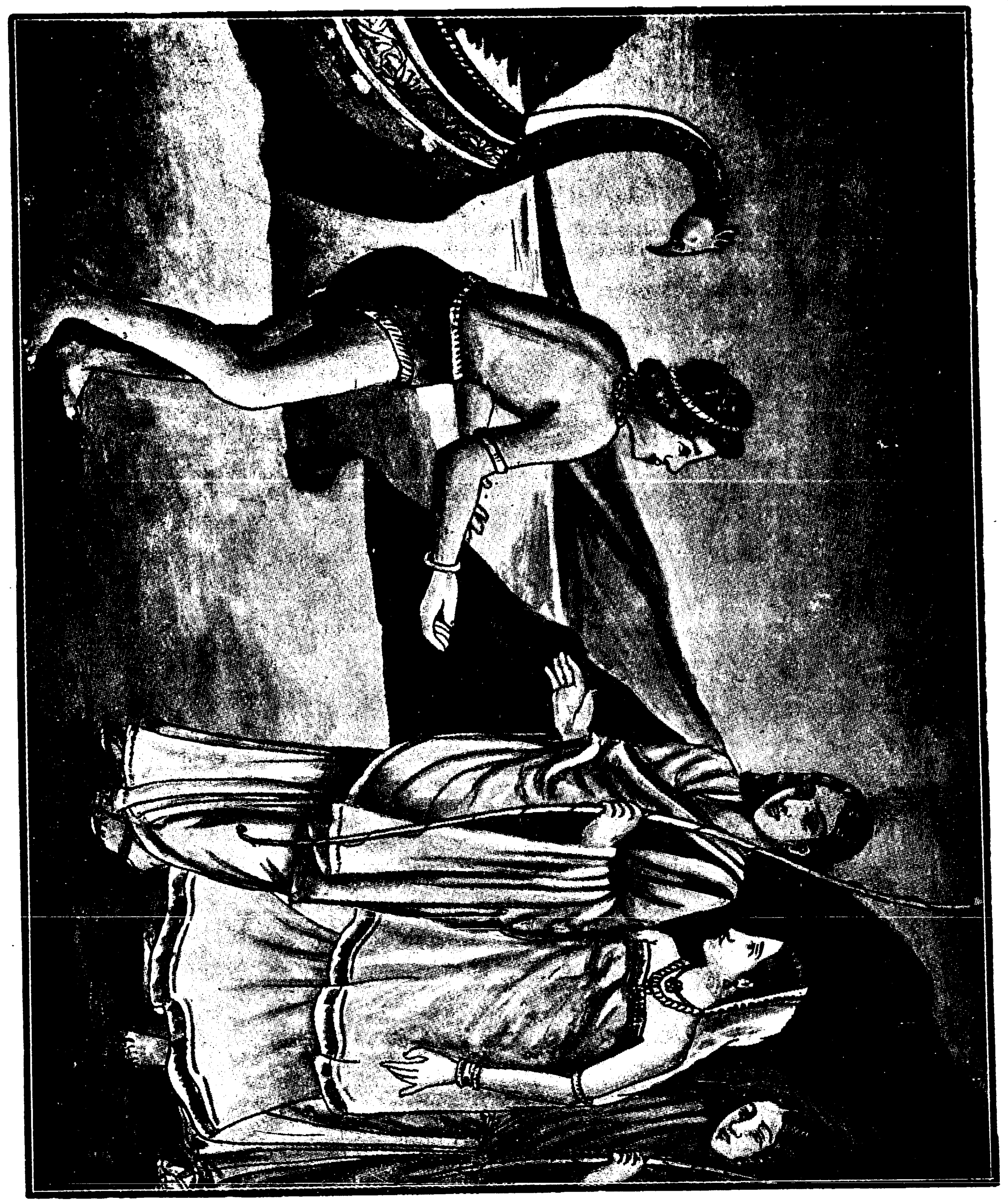

গুহক মিতা

[শিল্পী—শ্রীমন্মথ নাথ সেনগুপ্ত]

৪র্থ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৮ { ৮ম সংখ্যা

রামের ধনু

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

রামের ধনু, রামের ধনু—তোমায় নমস্কার—
তোমায় পেয়ে ধন্য বুঝি শ্রীরাম অবতার !
করলে তুমি তাড়কা বধ ;
মুনি ঋষির ঘুচ্‌লো আপদ,
বিরাট্‌ বিরাধ রাক্ষসেরে হান্‌লে পুনর্ব্বার,—
রামের ধনু, রামের ধনু,—তোমায় নমস্কার।

তোমার দাপে ভুবন কাঁপে,—সবাই যে পায় ভয়,—
মায়ামৃগের মারীচ হোলো তোমার হাতে লয় ;

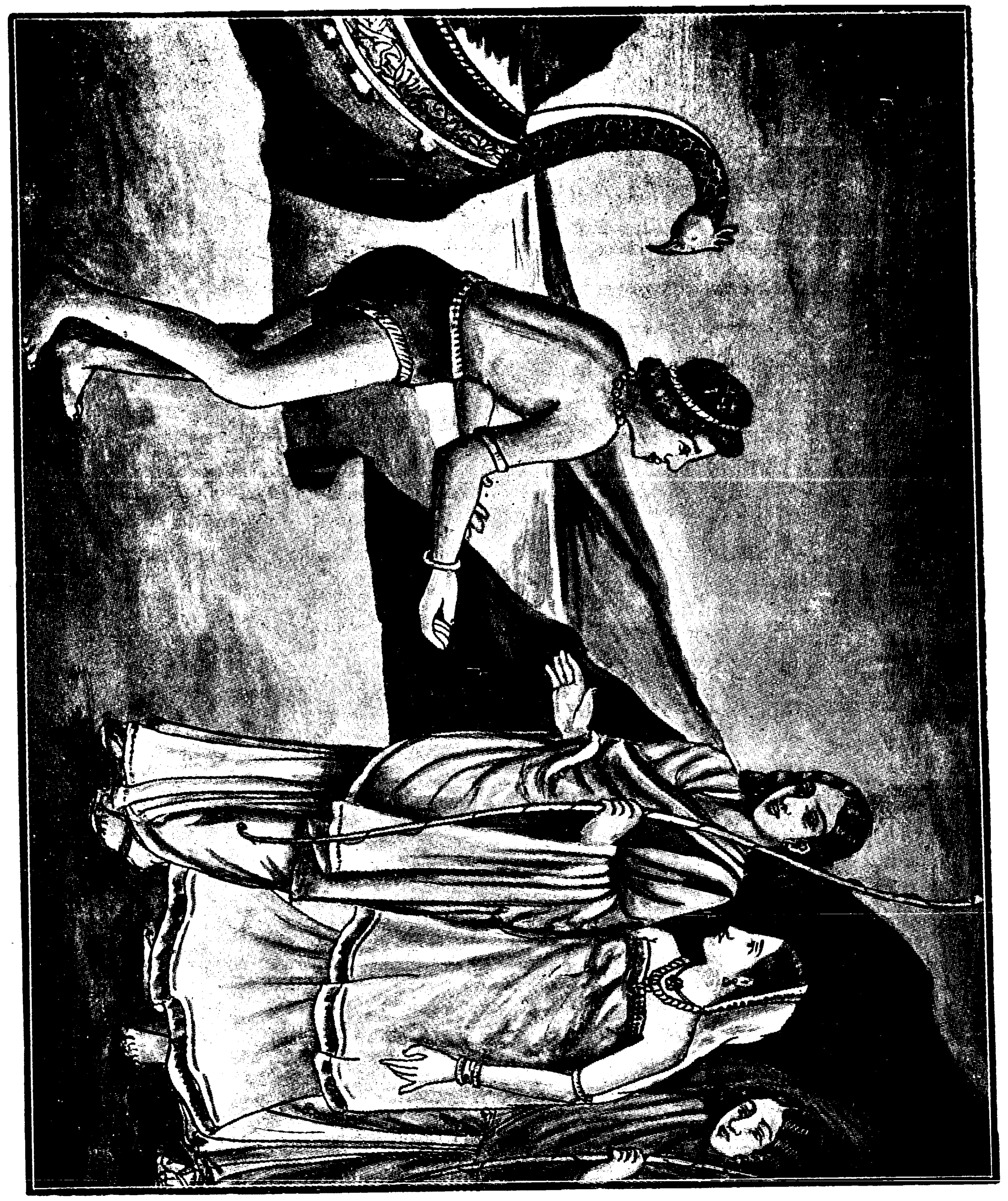

গুহক মিতা

শিল্পী—শ্রীমন্মথ নাথ সেনগুপ্ত]

৪র্থ বর্ষ } ভাদ্র, ১৩৩৮ { ৮ম সংখ্যা

রামের ধনু

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

রামের ধনু, রামের ধনু—তোমায় নমস্কার—
তোমায় পেয়ে ধন্য বুঝি শ্রীরাম অবতার !
করলে তুমি তাড়কা বধ ;
মুনি ঋষির ঘুচ্‌লো আপদ,
বিরাট্ বিরাধ রাক্ষসেরে হান্‌লে পুনর্ব্বার,—
রামের ধনু, রামের ধনু,— তোমায় নমস্কার।

তোমার দাপে ভুবন কাঁপে,—সবাই যে পায় ভয়,—
মায়ামৃগের মারীচ হোলো তোমার হাতে লয় ;

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE

স্কন্ধকাটা কবন্ধটার
করলে তুমি প্রাণ-সংহার,
সুগ্রীবেরে বাঁচাও তুমি, বালীর ভাঙ্গো ঘাড়,
রামের ধনু, রামের ধনু—তোমায় নমস্কার।

বনবাসের পথে পথে সময় অসময়,
রামের তনু রক্ষা করে' রামের ধনু রয়।
রামের ধনু, প্রণাম করি,
রামের সাথে তোমায় স্মরি,
ভয় দেখিয়ে বাঁধ্‌লে তুমি অকূল পারাবার,—
রামের ধনু, রামের ধনু, তোমায় নমস্কার।

রামের সাথে চল্লে তুমি রাবণ রাজার দেশ,
হাজার হাজার রাক্ষসেরে ভয় দেখালে বেশ,
তোমার নিঠুর বাণে বাণে
রাক্ষসেরা মর্‌ল প্রাণে.
কুম্ভকর্ণে মার্‌লে তুমি, ভাঙ্‌লে অহঙ্কার,
রামের ধনু, রামের ধনু—তোমায় নমস্কার।

রাবণ রাজার দশটি মাথা কাট্‌লে তুমি ভাই,
রামের সাথে সাথে হোলো তোমারো জয় তাই,
সীতা মায়ে সঙ্গে করে'
আবার ফিরে আস্‌লে ঘরে;
অলক্ষ্যেতে আশিস্ পেলে সকল দেবতার,—
রামের ধনু, রামের ধনু. তোমায় নমস্কার।

রামের ধনু, রামের ধনু—তোমায় নমস্কার,—
তোমার স্মৃতি আজো মনে জাগ্‌ছে অনিবার।
রোদ্-বাদলে আকাশ-তলে
আজো তোমার চাউনী ঝলে,—
রামের ধনুর রঙ্গীন্ তনু, কেমন চমৎকার,—
রামের ধনু, রামের ধনু, তোমায় নমস্কার।

কালাপাণির অতলে

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

তোমাদের যদি বলি আর বছরের গোড়ার দিকে আলিপুরের ছাওয়া আফিসের ভূকম্পন-মান যন্ত্রে, শ তিনেক মাইল দূরের পৃথিবীর মাটির ওপরে নয়, বঙ্গোপসাগরের জলের নীচে এমন একটা দারুণ ভূমিকম্প ধরা পড়ে, যাতে সমুদ্র তোলপাড় হয়ে গেছ্‌ল এবং তারই সাথে যদি বলি চাটগাঁয়ের কক্সবাজারের শুঁটকি মাছের বাজার বছরের মাঝামাঝি অত্যন্ত চড়ে যায়, এবং এই দুই অসংলগ্ন কথার সঙ্গে যদি জুড়ে দিই যে জল ঝড় নেই—পৌষ মাসের শেষাশেষি একদিন কক্সবাজারের জেলে নৌকার এক বিরাট্ বহর আশ্চর্য্য ভাবে সমুদ্রের মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়—তাদের কারও কোন পাত্তাই পাওয়া যায় না,—তাহলে তোমরা এই তিনটি ছাড়াছাড়া ব্যাপারের মধ্যে কোন সম্বন্ধ না পেয়ে নিশ্চয়ই আমায় পাগল ভাব্‌বে।

কিন্তু এই তিনটি পৃথক্ ব্যাপারের ভেতর কি ভয়ঙ্কর সম্বন্ধ যে আছে তাই তোমাদের আ:্ন বলতে বসেছি।

সেবার চট্টগ্রামে বেড়াতে গিয়ে রমানাথ বাবুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার আলাপ হয়। রমান.থ বাজপেয়ীর নাম তোমরাও হয়ত কেউ কেউ শুনেছ। যারা শোনোনি তাদের জন্যে তাঁর একটু পরিচয় দিচ্ছি। রমানাথ বাবু বাঙ্গালী হয়েও নেপ্‌ল্‌সের বিখ্যাত 'য়্যাকোয়েরিয়ামের' তিন বছর প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। নেপ্‌ল্‌সের 'য়্যাকোয়েরিয়ামের' মত আশ্চর্য্য জিনিষ পৃথিবীতে আর নেই। চিড়িয়াখানায় যেমন

পৃথিবীর জীবজন্তু ধরা থাকে এই 'য়্যাকোয়েরিয়ামে' তেমনি সমুদ্রের যত অদ্ভুত জীবন্ত প্রাণী সাধারণের দেখ্‌বার জন্যে ধরে রাখা আছে। এই জলচর-নিবাসের অধ্যক্ষের পদ যে সে লোক পায় না। বাজপেয়ী মশাইএর মত সামুদ্রিকপ্রাণি-তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ইউরোপেও খুব কম আছে বলেই তাঁকে এ পদ দেওয়া হয়।

আপাততঃ তিনি সে কাজ ছেড়ে দিয়ে বিলাতের এক বৈজ্ঞানিক সভার অনুরোধে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক প্রাণী সম্বন্ধে গবেষণা কর্‌বার ভার নিয়ে চট্টগ্রামে আস্তানা পেতেছিলেন—সেইখানেই তাঁর সঙ্গে আলাপ।

অত্যন্ত অমায়িক লোক। আমি তাঁর কাছে অত্যন্ত নগণ্য ব্যক্তি হলেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আমাদের দেশের সামুদ্রিক জীবজন্তু সম্বন্ধে কিছু কিছু গবেষণা করবার চেষ্টা করেছি শুনে তিনি অত্যন্ত আদর করে ডেকে আমার সঙ্গে এসব বিষয়ে নিজে থেকে আলাপ করতেন। তাঁর সব কথা বুঝ্‌তাম এমন গর্ব্ব করতে পারি না, কিন্তু তাঁর কাছে যে অনেক কিছু শিখেছি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কক্সবাজারের জেলে-নৌকোর বহর যখন আশ্চর্য্য ভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার কিছুদিন আগের কথা বল্‌ছি।

সকাল বেলা তাঁর বাইরের ঘরে বসে আছি। তিনি শীঘ্রই সমুদ্রে তাঁর গবেষণার জন্যে সামুদ্রিক প্রাণি-শিকারে যাবেন ঠিক হয়েছে। তার জন্যে ইতিমধ্যে একটি মাঝারি আকারের মোটর লঞ্চও জোগাড় করা হয়েছিল, আপাততঃ তাতে জাল ফেলার সরঞ্জাম খাটিয়ে কয়েকজন ভাল জেলে সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। জেলেদের একজন সর্দ্দারকে ডাকিয়ে তিনি তার সঙ্গে কথা কইছিলেন। আমি তাঁর লেখা একখানি বইএর পাতা ওল্টাচ্ছিলুম।

হঠাৎ তিনি আমায় ডেকে বল্লেন—"শুন্‌ছ সুধীর! সমুদ্রে যাদের চোদ্দ পুরুষ একরকম ঘর-বাড়ী করে বাস করেছে তাদেরও সমুদ্র সম্বন্ধে কিরকম কুসংস্কার এখনও আছে শুনলে?"

আমি তাঁদের কথাবার্ত্তা এতক্ষণ অনুসরণ করিনি। জিজ্ঞেস করলাম—"কি বল্‌ছে?"

"বল্‌ছে, সমুদ্রে মাছটাছ আজকাল ভয়ানক দুষ্প্রাপ্য হয়েছে, জেলেদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তা সত্ত্বেও অনেকে আজকাল কাজে বেরুতে চায় না—ওদের বিশ্বাস সমুদ্রে দানো জেগেছে।"

জিজ্ঞেস করলাম "সে আবার কি!"

এবার জেলে-সর্দ্দার নিজেই উত্তর দিলে এবং সে যা বল্‌লে তার মর্ম্ম বুঝে অবাক্ হয়ে গেলুম। জেলেরা নাকি মিছে মিছে ভয় পায়নি। যেখানে মাছের ভারে সেদিন পর্য্যন্ত জাল ছিঁড়ে পড়্‌ত সেখানে একটি মাছও যে পড়ে না এটাই ত একটা ভয়ের ব্যাপার; কিন্তু এছাড়া তাদের অনেকে স্বচক্ষে এমন জিনিষ দেখেছে যা বল্লে লোকে বিশ্বাস করবে না।

সর্দ্দারকে আবার প্রশ্ন করায় সে যা বল্লে তা সত্যই অদ্ভুত। মাছ ধরে ফির্‌তে অনেক সময়ে তাদের রাত হয়ে যায়। আজকাল মাছ পাওয়া যায় না বলে অনেক সময়ে তারা রাত পর্য্যন্ত না ঘুরে ফির্‌তেই পারে না। কয়েকদিম ধরে রাতে ফেরবার সময় তাদের অনেকে দেখেছে, দূরে সমুদ্রের জল থেকে আশ্চর্য্য রকমের রোশনাই উঠছে—সে আলো নাকি এমন তীব্র যে মনে হয়, সমুদ্রে কে বিজলী বাতির সার জ্বেলে রেখেছে।

হেসে বাজপেয়ী মশাইকে ইংরাজীতে বল্লাম—"এসব সর্দ্দারের মাইনে বাড়াবার ফিকির নয় ত?"

বাজপেয়ী মশাই বল্লেন—"না; এর ভেতর কিছু সত্য আছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। কক্সবাজারের সমুদ্রে মাছ দুষ্প্রাপ্য হওয়াটা ত আর ওর বানানো নয়—এটাই ত আশ্চর্য্য।"

সেদিন সর্দ্দারের সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত কয়েকজন জেলে যোগাড় করে দেবার চুক্তি বিনা গোলমালে হয়ে গেল। সমুদ্রের অদ্ভুত আলোর কথাও সেই সঙ্গে আমরা ভুলে গেলাম।

কিন্তু কয়েকদিন বাদেই যখন জেলে-নৌকার বহর হারিয়ে গেছে সংবাদ এল এবং জল ঝড় না থাকা সত্ত্বেও দুদিন ধরে তাদের কোন পাত্তা পাওয়া গেল না তখন বাজপেয়ী মশাই হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

সকালে আমি যেতেই বল্লেন, "কালকের খবর শুনেছ ত ?"

বল্লুম "জেলে-নৌকোর কথা ত ? শুনেছি।"

তিনি তাড়াতাড়ি বল্লেন "না হে না, শুধু ওই নয়। যে ক'জন লোক কাল ওদের খোঁজ করতে দুখানা নৌকো নিয়ে বেরোয় তাদেরও পাত্তা নেই!"

আশ্চর্য্য হয়ে বল্লাম "না এ কথা ত শুনিনি! একি ব্যাপার!"

তিনি বল্লেন—"আমিও ত তাই ভাব্‌ছি।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বল্লেন—"দেখ আমার আগেকার প্ল্যান আমি বদ্‌লালাম। আমি আজই লঞ্চ নিয়ে বেরুব। এ ব্যাপারের একটু তদন্ত তাড়াতাড়ি করা দরকার। তুমি আস্‌তে পারবে ত ?"

না আসবার কোন কারণ ছিল না। আমি সানন্দে রাজী হয়ে গেলাম।

* * * *

দুপুর বেলা কক্সবাজারের জেটি থেকে আমাদের লঞ্চ ছাড়ল। লঞ্চের সারেঙ খালাসী ও কয়েকজন জেলে ছাড়া আরোহী মাত্র আমরা দুজন।

লঞ্চটি যেমন মজবুত তেমনি বেগবান্। দেখতে দেখতে কক্সবাজার ছাড়িয়ে আমরা অকূল সমুদ্রে এসে পড়লাম! কক্সবাজারের পূবে মহিষখালি দ্বীপ। তারই কাছে কাছে সাধারণতঃ এই সব জেলেরা নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়। সেই দিকেই আমাদের লঞ্চ চল্‌ছিল। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌঁছে আমরা হারানো জেলেদের কোন চিহ্নই দেখ্‌তে পেলাম না।

এবার কি ভেবে জানিনা, বাজপেয়ী মশাই লঞ্চের মুখ আরো দক্ষিণে ফিরিয়ে চালাতে বল্লেন। জিজ্ঞাসা করতে জানালেন "কয়েক দিন এদিকে মাছ না পেয়ে নতুন জলের সন্ধানে জেলেদের দক্ষিণদিকে এগিয়ে যাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়।"

তাঁর অনুমান যে সত্য কিছুক্ষণ বাদেই তার ভয়ঙ্কর প্রমাণ আমরা পেলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে আমরা এগিয়েছি; হঠাৎ একজন জেলে চীৎকার করে বল্লে—"ওই দেখুন বাবু!"

ততক্ষণে আমাদের সকলের দৃষ্টি সেদিকে গেছে। দেখ্‌লাম উল্টো হয়ে জেলেদের একটি নৌকা ভাসছে। আমাদের লঞ্চ তার কাছে গিয়ে থাম্‌ল। খালাসী

জেলেরা সবাই রেলিঙের ধারে এসে ভীড় করে দেখতে এল। কিন্তু এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোন কারণ আমরা খুঁজে পেলাম না। জেলেদের নৌকাগুলি দস্তুর মত মজবুত এবং ঝড়ের ভেতরেও সহজে তা জলে ডোবে না; তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকে সমুদ্রে থাকার দরুণ নৌকো চালানতে তাদের জুড়ি পাওয়া ভার। সুতরাং তাদের নৌকো অকারণে এমন উল্টে যাওয়া আশ্চর্য্য নয় কি? নৌকোর আশেপাশে আমরা কিছুই দেখ্‌তে পেলাম না।

খানিক বাদে আবার লঞ্চ ছাড়া হ'ল। এবারে আমরা যতই এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম, ততই এক এক করে হারানো বহরের নৌকো একটি একটি করে দেখা দিতে গেল। সবগুলিই তাদের কোন অজানা কারণে একই ভাবে উল্টে গেছে এবং কোথাও জেলেদের একটি চিহ্নও নেই।

সত্যই এবার আমার ভয় করছিল। আগের দিন হারানো জেলেদের খোঁজ করতে যারা এসেছিল তাদেরও কি পরিণাম হয়েছে স্মরণ করে বুকের ভেতরটা কেমন শিউরে উঠ্‌ছিল। খালাসী ও জেলেদের সবার মুখেই দেখ্‌লাম ভয়ের ছায়া; শুধু বাজপেয়ী মশাই সমস্ত ভয়ের ওপরে থেকে অত্যন্ত তন্ময় ভাবে কি চিন্তা করতে করতে ডেকের ওপর পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন।

ভাব্‌ছিলাম বাজপেয়ী মশাইকে লঞ্চ ফেরাবার আদেশ দিতে অনুরোধ করব কিনা, এমন সময় সমুদ্রের দিকে চেয়ে রমানাথ বাবু অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বল্লেন "সুধীর শীগ্‌গির আমার দুরবীণটা দাও।" দুরবীণটা তাঁর হাতে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি যা দেখেছেন তাও চোখে পড়ল।

আশ্চর্য্য ব্যাপার! কিছু দূরে সমুদ্রের কালো জলে মনে হল কে যেন মোটা একটা সবুজ পেন্সিল দিয়ে প্রকাণ্ড একটা লাইন টেনে দিয়েছে। দুঃখের বিষয় রমানাথ বাবু দুরবীণ হাতে করতে না করতেই সে লাইন মিলিয়ে গেল। তিনি হতাশ হয়ে দুরবীণ নামিয়ে বল্লেন—"দেখেছ ত ?"

বল্লাম—"হ্যাঁ! ওই দেখুন, ডানদিকে আবার সেই রকম দেখা যাচ্ছে।"

এবার আমাদের লঞ্চের ডানদিকে অতি অল্প দূরেই লাইনের মত নয়, খানিকটা ধাবড়ার মত ওই সবুজ রঙ দেখা গেল। ঠিক যেন খুব খানিকটা সবুজ কালী কে

সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের চারি ধারেই এবার এইরকম সবুজ রং দেখা দিতে লাগল।

রমানাথ বাবু লঞ্চ থামাতে বল্লেন। দূর্‌বীণ চোখে নিয়ে সেই সবুজ ছোপ দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর মুখ কেন জানিনা, অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গেল। কিন্তু তাঁর তন্ময়তা দেখে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস করলাম না।

লঞ্চ কয়েক মিনিট মাত্র থেমেছে, এমন সময় হঠাৎ সেটা অত্যন্ত দুলে উঠ্‌ল এবং বেশ টের পেলাম, হঠাৎ লঞ্চ একদিকে হেল্‌ছে। সেই মুহূর্ত্তেই সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে দেখলাম।

লঞ্চ হেলে পড়ায় সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে সমুদ্রের পানে চেয়েছিলাম। মনে হল ঠিক আমাদের ডেকের কাছে সমুদ্রের জলের কিছু নীচেই অমনি খানিকটা সবুজ রঙ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ সেই সবুজ রঙ আরো স্পষ্ট হয়ে এল এবং তারপর যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকেই প্রথমতঃ বিশ্বাস করা শক্ত হয়ে পড়ল। দেখলাম ছোট খাট শুশুকের মত একটি সবুজ জীব; কিন্তু তা শুশুক ত নয়ই—সমুদ্রের যত প্রাণী মানুষের চোখে এ পর্য্যন্ত পড়েছে তার কোনটির সঙ্গেই তার মিল নেই। পেছনের দিকে খানিকটা শুশুকের মত হলেও সামনে তার অনেকটা অক্টোপাসের মত গুটি চারেক নুলো বেরিয়েছে। সবচেয়ে ভীষণ সে জীবটির দাঁতালো প্রকাণ্ড মুখ, আর সাপের মত নিষ্ঠুর চোখ। দেখতে দেখতে সেটা ডুবে গেল কিন্তু তারপরেই দেখলাম আমাদের লঞ্চের চারিধারে ক্ষুধিত নেকড়ের পালের মত অসঙ্খ্য এই জাতীয় জীব ঘিরে এসেছে। আমাদের চারিধারের জল সবুজ হয়ে গেছে তাদের ভীড়ে।

লঞ্চের সবাই এখন বিস্ময়বিমূঢ় ভাবে সেই দিকে চেয়েছিল। সারেঙ একটা বাল্টিতে খানিকটা নোংরা ইঞ্জিনের তেল বাইরে ফেলতে এসে বল্লে—"লঞ্চ ভয়ানক হেল্‌ছে কেন বুঝতে পারছিনা বাবু!"

লঞ্চ যে হেল্‌ছে এটা আমরা সবাই বুঝ্‌তে পারছিলুম কিন্তু তাতে বিশেষ ভয়ের কিছু আছে এতক্ষণ আমাদের মনে হয় নি। সারেঙের কথায় আমরা চম্‌কে উঠলাম। লঞ্চ হেলার সঙ্গে এই জীবগুলির কোন সম্বন্ধ নেই ত! আর সকলের কথা জানিনা, আমার মনে ওই রকমই একটা সন্দেহ হচ্ছিল।

রমানাথ বাবুর ধ্যান তখনও ভাঙেনি। ডেকের নীচেই যেখানে সারেঙের ফেলা ময়লা তেলটা ভাস্‌ছিল সেইদিকে চেয়ে তিনি তখনও একমনে কি ভাব্‌ছিলেন। লঞ্চ তখন এতটা হেলে পড়েছে যে আমরা ভয়ে ভয়ে অপর দিকে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছি। জেলেদের মুখ দেখলাম শুকিয়ে গিয়েছে একেবারে। সর্দ্দার আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। জাতে সে মঘ—শুক্‌নো মুখে "ফয়ার" নাম করে সে বল্লে "আজ আর নিস্তার নেই বাবু, জেলের বহরের যে দশা হয়েছে আমাদেরও তাই হবে। সমুদ্রের দানো উঠেছে আমি ত আগেই বলেছিলাম।"

তার কথার উত্তর দিলাম না। সাম্‌নের দিকে তখন দেখ্‌ছিলাম কালো সমুদ্র সবুজ করে বহু দূর থেকে এই সামুদ্রিক নেকড়ের পাল আস্‌ছে। তাদের আসা সম্বন্ধে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে ঠিক শিক্ষিত সৈন্যের মত সার বেঁধে ছাড়া তারা চলে না। মাছের ঝাঁক অনেক সময়ে এক সঙ্গে চলে, কিন্তু তাদের ভেতর এমন শৃঙ্খলা নেই। এদের প্রত্যেক সারে একটির বেশী দুটি প্রাণী পাশাপাশি নেই। কেউ কাউকে এগিয়েও যায় না। দূর থেকে দেখ্‌লে মনে হয় ঠিক যেন প্রকাণ্ড একটা সাপ সমুদ্রের ভেতর দিয়ে আস্‌ছে; তবে এঁকে বেঁকে নয়, একেবারে তীরের মত সোজা।

এর মধ্যে লঞ্চ ক্রমশঃ এতটা হেলেছে যে আরেকটু বাদেই সমুদ্রের জল ডেকের ওপর উঠ্‌বে। সারেঙ ভীত হয়ে রমানাথ বাবুর আদেশ না নিয়েই লঞ্চ চালাবার চেষ্টা কর্‌লে, কিন্তু নীচের স্ক্রু তখন ভাল করে আর জল পায় না, লঞ্চ কাৎ হয়ে এগুতে গিয়ে আরো বেশী জল ডেকে উঠে পড়বার সম্ভাবনা হল।

আমি ভয়ে একরকম উন্মত্ত হয়ে রমানাথ বাবুর কাছে গিয়ে চীৎকার করে বল্লাম—"লঞ্চ যে ডোবে তা দেখ্‌তে পাচ্ছেন?"

ভয়ে আমার বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছিল। এমন কি এই বিপদের ভেতর আন্‌বার জন্যে রমানাথ বাবুর ওপর রাগই হচ্ছিল। তিনি কিন্তু অবিচলিত ভাবে আমার দিকে ফিরে জলের একদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লেন—"দেখ্‌তে পেয়েছ!"

সারেঙের ফেলা তেলটা ভাস্‌ছে ছাড়া আর কিছুই কিন্তু আমি দেখতে

পেলাম না। বিরক্ত হয়ে বল্লাম, "আপনি পাগল হয়ে গেছেন। লঞ্চ ডুবছে তা খেয়াল আছে ?"

রমানাথ বাবু এবার বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মত চমকে উঠে ডাকলেন "সারেঙ"!

সারেঙ কাছেই ছিল। শুকনো মুখে বল্লে—"আর আশা নেই বাবু।"

সে কথায় কাণ না দিয়ে রমানাথ বাবু পাগলের মত জিজ্ঞেস করলেন—"কত পেট্রোল আছে ষ্টোর রুমে।"

সারেঙ আমারি মত অবাক্ হলেও উত্তর দিলে—"তা অনেক আছে বাবু, দুদিনের আসা যাওয়ার মত তেল কেনা হয়েছিল।"

"শীগ্‌গির সব বার করে নিয়ে এসে লঞ্চের চার ধারে ঢাল। শুধু ফিরে যাবার মত তেল থাকলেই চলবে।"

রমানাথ বাবুর কথা বুঝতে না পেরে অবাক্ হয়ে তাঁর দিকে চাইতেই তিনি আবার জলের দিকে আমাকে তাকাতে বলে বল্লেন—"এখনও বুঝতে পারনি? আমাদের চারিধারে সব জল সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ওখানটায় কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ?" সত্যিই সমস্ত জায়গা সেই প্রাণীর ভীড়ে সবুজ হয়ে গেলেও সেই তেলটুকু যতখানি স্থান জুড়ে ভাসছিল তার ত্রিসীমানায় সবুজ রঙের আভাস ছিল না।

লঞ্চ তখন একেবারে হেলে পড়ে এক দিকের ডেক জলের প্রায় সমান সমান হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি আমি রমানাথ বাবুকে টেনে না নিলে একটি জানোয়ার নুলো বাড়িয়ে আর একটু হলে তাঁকে ধরে ফেলেছিল আর কি! খালাসীরা রমানাথ বাবুর আদেশের তাৎপর্য্য না বুঝলেও ইতিমধ্যে চার ধারে পেট্রোল ঢাল্‌তে সুরু করেছে। কিন্তু তাতে যে কিছু হবে আমার আশা ছিল না। পরমুহূর্ত্তেই আমাদের চোখের উপর যে ব্যাপার ঘট্‌ল তাতে আশা হারানো অস্বাভাবিকও নয়। একজন জেলে তেল ঢাল্‌বার জন্যে রেলিঙের একটু বেশী রকম কাছে এগিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তার চীৎকার শুনে দেখি দু'তিনটে জানোয়ার তাদের চাবুকের মত নুলো দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে। আমরা তার সাহায্যে যেতে না যেতেই তারা তাকে

চক্ষের নিমেষে টেনে একেবারে জলের তলায় নিয়ে গেল। লোকটা একবারের বেশী চীৎকার কর্‌বার অবসরও পেল না। কিছুক্ষণ বাদে আমাদের সকলেরই ওই দশা

জলের তলায় নিয়ে গেল।

হবে জেনে গভীর হতাশায় আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলাম।

* * * *

কিন্তু সেদিন প্রাণ নিয়ে অক্ষত শরীরে কক্সবাজারে ফিরেছিলাম। না ফিরলে এই গল্প তোমাদের শোনাতে পার্‌তাম না। সেদিন বেঁচে ছিলাম শুধু রমানাথ বাবুরই বুদ্ধিতে সে কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার কর্‌ছি। চারি ধারে পেট্রোল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রের মত কি করে যে সেই ভীষণ সামুদ্রিক নেক্‌ড়ের পাল সরে গেল তখন তা বুঝতে পারি নি। ষ্টীমার একটু সোজা হতেই সারেঙ সেদিন প্রাণপণে ইঞ্জিন চালিয়ে প্রাণ বাঁচায়।

রমানাথ বাবু নিজে পরিত্রাণ পেয়ে ফিরে এসেই অবশ্য নিশ্চিন্ত হন নি। তাঁরই চেষ্টায় ও পরামর্শে অনেক গড়িমসির পর শেষ পর্য্যন্ত কক্স বাজারের পুলিশ

রাজী হয়ে কয়েকটি জলে তেল ছড়াবার ষ্টীমার পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ঝড়ের সময় যেমন করে কোন কোন জাহাজ চারি ধারে তেল ছড়ায় তেম্‌নি করে ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীর বিচরণ-ক্ষেত্র জুড়ে কয়েক দিন ধরে তেল ছড়ান চলে। তার ফলে আশ্চর্য্য ভাবে কয়েক দিনের ভেতর তারা অন্তর্ধান করেছে। কক্স বাজারে এখনও সামুদ্রিক মাছ দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু আশা করা যায় আর বছরের ভেতর আবার আগেকার দিন ফিরে আসবে।

কয়েক দিন বাদে রমানাথ বাবুকে এই অদ্ভুত সামুদ্রিক প্রাণীর রহস্য পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল্‌বার জন্যে অনুরোধ কর্‌লাম। তিনি বল্লেন "ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু সমুদ্র নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁরা অনেক দিন আগেই এমন ঘটা যে সম্ভব তা অনুমান করে রেখেছেন। সামুদ্রিক যে সব জীবজন্তুর মানুষ এ পর্য্যন্ত সন্ধান পেয়েছে সেগুলি সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত ওপরের স্তরের। কিন্তু সমুদ্রের গভীর তলায় যে কি আছে মানুষ তার কিছুই জানে না। সমুদ্রের তলা ত বড় কম কথা নয়! হিমালয়ের সব চেয়ে উঁচু শৃঙ্গটিকে উল্টো করে যদি জলে ডুবিয়ে দেওয়া যায় তা'হলেও তল পাওয়া যায় না—এমন গভীর সমুদ্রও আছে। সেখানে মানুষের কোন জালই পৌঁছোয় না। আর যদি বা পৌঁছোত তা হলেই বা হত কি? সমুদ্রের এ পর্য্যন্ত মানুষ কত টুকু আর খুঁজে দেখেছে। বৈজ্ঞানিকেরা তাই অনেক-দিন আগেই অনুমান কচ্ছেন সমুদ্রের গভীর স্তরে আমাদের অজানা অনেক অদ্ভুত জীব থাকা সম্ভব। এ ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের অনুমান যে সত্যি তাই প্রমাণ হয়ে গেল। যে সামুদ্রিক জীব আমরা দেখেছি, সমুদ্রের কোন গভীর স্তরে এদের বাস। এরা এত দিন ওপরে ওঠেনি বলেই মানুষ এদের পরিচয় পায় নি। এদের সম্বন্ধে সব চেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে এদের বুদ্ধি আর শৃঙ্খলা।

"সমুদ্রের তলায় কোন প্রাণী যে এতখানি বুদ্ধি, এ রকম দলবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা দেখাতে পারে এ কথা কেউ ভাবে নি। জেলেদের নৌকা উল্টানোর ব্যাপার থেকেই এদের অসামান্য বুদ্ধির আমি প্রমাণ পাই। সার বেঁধে আক্রমণ করার শৃঙ্খলা ত তুমিও দেখেছ।"

বল্‌লাম "আমাদের লঞ্চও ত উল্টোতে বসেছিল, কিন্তু কি করে তা এখনও বুঝ্‌তে পারিনি।"

"এমন কিছু শক্ত কাজ ত নয়, শুধু একটা সামুদ্রিক প্রাণীর মাথায় এসেছে এইটেই আশ্চর্য্য। নৌকো ও আমাদের লাঞ্চের তলার মেরুদণ্ডে নুলো জড়িয়ে এদের গোটা কতক প্রাণী এক দিকে টান্‌বার চেষ্টা কর্‌লেই ত কাৎ হয়ে পড়্‌বে। কাৎ হবার পর সামনে থেকে নুলো জড়িয়েও নীচে টানা যায়! একটু কাৎ হলেই জল উঠে উল্টোতে কতক্ষণ? অবশ্য এতে ভীষণ শক্তিরও দরকার।"

জিজ্ঞাসা কর্‌লাম "কিন্তু এরা হঠাৎ নীচের স্তর ছেড়ে ওপরেই বা উঠ্‌ল কেন?"

রমানাথ বাবু বল্‌লেন "প্রথমে আমিও তা ভেবে ঠিক কর্‌তে পারিনি। তার পরেই মনে পড়ে গেল যে কিছুদিন আগে কাছাকাছি সমুদ্রের তলায় এক জায়গায় ভীষণ ভূমিকম্প হয়ে গেছে। সেই আলোড়নেই হয় ত কেন, নিশ্চয়ই, এরা স্থানচ্যুত হয়ে ছিট্‌কে এদিকে এসে পড়েছে। এসে প্রথমতঃ এদিকের সমুদ্রের মাছ অর্দ্ধেক খেয়ে সাবাড় করেছে। বাকি অর্দ্ধেক এদের ভয়ে এ তল্লাট ছেড়ে পালিয়েছে। মাছের যখন অভাব তখন ক্ষিদের জ্বালায় এদের নজর গেছে মানুষের ওপর এবং তার জন্যে বুদ্ধি যা খাটিয়েছে তা অপূর্ব্ব। দৈব পথ না দেখালে এত দিনে আমরাও তাদের পেটে হজম হয়ে যেতাম। সারেঙ যদি সেই সময় জলে ময়লা তেল না ফেল্‌ত, আমার যদি সেই দিকে চোখ না পড়্‌ত তা'হলে আমরা ত মারা যেতামই আরো কি সর্ব্বনাশ মানুষের যে ওই জীব থেকে হত কে জানে? সামান্য পেট্রোলের তেল কেন যে ওদের অসহ্য তা এখনও ভাল করে বুঝি না, এবং দৈব সহায় না হলে শুধু বিজ্ঞানের সাহায্যে এ ওষুধের সন্ধান কখনো পেতাম কি না সন্দেহ।"

আমি বল্লাম "এ সব ত বুঝ্‌লাম কিন্তু জেলেদের সর্দ্দার রাত্রে সমুদ্রে যে আলোর কথা বলেছিল সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যা!"

রমানাথ বাবু হেসে বল্লেন—"সেটা সম্পূর্ণ সত্যি। রাত্রে যে আলো জেলেরা দেখেছিল সে এই প্রাণীগুলিরই গায়ের আলো এবং এরা যে সমুদ্রের গভীর স্তরের জীব এই আলোই তার আর একটা প্রমাণ। সমুদ্রের গভীর তলায় একেবারে অমাবস্যার রাতের মত অন্ধকার। সূর্য্যের আলো জলের রাশি ভেদ করে অত দূর পৌঁছোতে পারে না। সেখানে যে সব প্রাণী থাকে, প্রকৃতির আশীর্ব্বাদে তাই তাদের আলো তারা নিজেদের দেহ থেকেই বার কর্‌বার ক্ষমতা পেয়েছে।"

খানিক চুপ করে থেকে রমানাথ বাবু আবার বল্লেন—"আমরা এই দেখেই আশ্চর্য্য হচ্ছি, কিন্তু এই অসীম অতল সমুদ্রের ভেতর আরো কত রহস্যময় প্রাণী আছে কে জানে! পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ স্থলে যদি মানুষের মত বুদ্ধিমান্ জীবের উদ্ভব সম্ভব হয়, তা'হলে এই বিশাল জলের জগতে নতুন ধরণের বুদ্ধিমান্ কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হবে না কে বলতে পারে!"

রামসুক তেওয়ারী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

এসেছিল এই দেশে রামসুক তেওয়ারী
অধিবাসী হবে বুঝি 'বুন্দী' কি 'রেওয়া'রি!
বুক ছিল কি দরাজ, কি গভীর পেট্‌টী!
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টী।
আধসের চানা খেত, চিবাইয়া দন্তে,
সিদ্ধির সরবৎ কুস্তির অন্তে।
বাঙলায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা,
রামসুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা।
প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত।
কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার;
ভুঁড়ি তার কমে গেছে, বেড়ে গেছে নাক তার।
খায় দাদখানি চাল, ডুমুরের ছেঁচ্‌কী,
তবু উঠে উদ্গার, কভু উঠে হেঁচ্‌কী।
বড়া বড়ি ট্যাবলেট্, পর্প টী, চূর্ণ;
অনুপান অবলেহে ঘর তার পূর্ণ।

ভাঁজিবার মুদ্গর—শৌর্য্যের উৎস
দূরে পড়ে; খোঁজে আজ মদ্গুর মৎস্য।
ভাবেনি সে হবে তার এত বড় 'চেঞ্জ'ই
পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া,
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া;
করে দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ।
বে-ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ।

খানিক চুপ করে থেকে রমানাথ বাবু আবার বল্লেন—"আমরা এই দেখেই আশ্চর্য্য হচ্ছি, কিন্তু এই অসীম অতল সমুদ্রের ভেতর আরো কত রহস্যময় প্রাণী আছে কে জানে! পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ স্থলে যদি মানুষের মত বুদ্ধিমান্ জীবের উদ্ভব সম্ভব হয়, তা'হলে এই বিশাল জলের জগতে নতুন ধরণের বুদ্ধিমান্ কোন জীবের সৃষ্টি সম্ভব হবে না কে বল্‌তে পারে!"

রামস্থুক তেওয়ারী

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

এসেছিল এই দেশে রামস্থুক তেওয়ারী
অধিবাসী হবে বুঝি 'বুন্দী' কি 'রেওয়া'রি!
বুক ছিল কি দরাজ, কি গভীর পেট্‌টী!
ভুট্টার ছাতু খেত, সের দুই লেট্টী।
আধসের চানা খেত, চিবাইয়া দন্তে,
সিদ্ধির সরবৎ কুস্তির অন্তে।
বাঙলায় কাটাইয়া গোটা দুই বর্ষা,
রামস্থুক তেওয়ারীর পরকাল ফর্সা।
প্রাতে আর সন্ধ্যায় চা ধরেছে নিত্য,
আজ বাড়ে অম্বল, কাল বাড়ে পিত্ত।
কবিরাজ লেগে আছে, লেগে আছে ডাক্তার;
ভুঁড়ি তার কমে গেছে, বেড়ে গেছে নাক তার।
খায় দাদখানি চাল, ডুমুরের ছেঁচ্‌কী,
তবু উঠে উদ্গার, কভু উঠে হেঁচ্‌কী।
বড়া বড়ি ট্যাবলেট্, পর্প টী, চূর্ণ;
অনুপান অবলেহে ঘর তার পূর্ণ।

ভাঁজিবার মুদ্গর—শৌর্য্যের উৎস
দূরে পড়ে; খোঁজে আজ মদ্‌গুর মৎস্য।
ভাবেনি সে হবে তার এত বড় 'চেঞ্জ'ই
পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

পাঞ্জাবী হ'ল তার পুরাতন গেঞ্জি।

অবশেষে অসুখের সংবাদ পাইয়া,
দেশ থেকে ধেয়ে এলো দেশোয়ালী ভাইয়া;
করে দিলে প্রথমেই চা খাওয়াটা বন্ধ।
বে-ভাষায় বল্লে সে কত কি যে মন্দ।

ভোরে ঘোরে খোলা মাঠে রামসুক সাথে সে,
তুলসীর রামায়ণ পাঠ করে রাতে সে।
চা ছাড়িয়া রামসুক উঠ্‌লো যে মুটিয়ে,
অর্হরের ডাল খায়, জোয়ারের রুটী হে।
চা খেলেই তাড়া করে, করে নাক কেয়ারই,
খাসা আছে সুখে আছে রামসুক তেওয়ারী।

উটপাখী

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

আলিপুরের চিড়িয়াখানায় তোমরা সবাই উটপাখা দেখিয়াছ। চেহারার দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উটপাখীই এখন পাখীর রাজা। এক একটা উটপাখী লম্বায় যে কোন লম্বা মানুষের চাইতেও ঢের বড়। ৭।৮ ফুট লম্বা উটপাখী ত প্রায় সব সময়েই দেখা যায়। শুধু বহরেই উটপাখী বড় নয়, শরীরেও তাদের অমানুষিক শক্তি। লম্বা লম্বা মোটা মোটা ঠ্যাং; তার একটা লাথি খাইলে বড় বড় পালোয়ানেরও হাড় গুঁড়া হইয়া যায়। সেই ঠ্যাংএর মধ্যে আবার তারই যুড়িদার বড় বড় নখ। সেই নখ দিয়া সে মাটী হইতে বড় বড় পাথর খুঁড়িয়া বাহির করিতে পারে;—আঁচড় দিলে ত' রক্ষাই নাই। পিঠের উপর মোটা মোটা জনা ২।৩ লোক বসাইয়া দাও, দেখিবে—বেচারার তাতে কোনও কষ্ট হওয়া দূরে থাক, সে দিব্যি ঘোড়ার মত লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়াছে।

কিন্তু পাখীর রাজা হইলে কি হইবে, সাধারণ পাখীদের সাথে উটপাখীর গোড়াতেই মস্ত তফাৎ। বেচারার উড়িবার ক্ষমতা নাই। পাখা অবশ্য তার এক যোড়াই আছে, কিন্তু সেগুলি এত ছোট যে তার উপর ভরসা করিয়া আর আকাশে উঠা চলে না,—কোন রকমে শরীরের ভার ঠিক রাখিয়াই সে দু'টি খালাস। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন—হাজার হাজার বছর আগে উটপাখীর এ দশা ছিল না, অন্যান্য পাখীদের মত তখনকার উটপাখীদেরও উড়িবার ক্ষমতা ছিল; কিন্তু ঠিক মত

পাখার ব্যবহার না করায় আস্তে আস্তে সে ক্ষমতা চলিয়া গিয়াছে। পাখীদের ডানার দরকার সাধারণতঃ দু'টি কাজের জন্য—এক খাবার সংগ্রহ করা, আর দ্বিতীয় আত্মরক্ষা করা। সেকালকার উটপাখী যে সব অঞ্চলে বাস করিত সেখানে এই দু'দিক্ দিয়াই ছিল খুব সুবিধা। উটপাখীর প্রয়োজন মত খাবার কাছাকাছি মাটীতেই পাওয়া যাইত, আর সেখানে হিংস্র জানোয়ারদেরও উৎপাতের কোন বালাই ছিল না। এর ফল দাঁড়াইল এই, যে ডাঙ্গার উপরেই যখন সব কিছু মিলিয়া যাইতেছে তখন তারা আর কষ্ট করিয়া উড়িতে যাইবে কেন? এমনি করিয়া যুগের পর যুগ চলিল। উটপাখী আর ডানার ব্যবহার করে না, কাজেই অব্যবহারে আস্তে আস্তে সে দু'টি ছোট হইতে লাগিল—এবং অবশেষে একদিন তার উড়িবার ক্ষমতাই চলিয়া গেল। পূর্ব্বপুরুষদের এই আরাম-প্রিয়তা ও কুঁড়েমির জন্য এখনকার উটপাখীদের আর ইচ্ছা থাকিলেও উড়িবার উপায় নাই।

উটপাখী।

কিন্তু উড়িবার ক্ষমতা না থাকিলেও উটপাখীর দুঃখ করিবার বিশেষ কিছু নাই; কেননা ডানার অভাব সে পূরাইয়া লইয়াছে ঠ্যাং দিয়া। ঠ্যাং ত' নয়, যাকে বলে 'রাম ঠ্যাং'। কি দারুণ তার দৌড়াইবার ক্ষমতা। এক একটা উটপাখী যখন খোস্ মেজাজে ছুটিতে আরম্ভ করে তখন কোথায় লাগে পাঞ্জাব মেল আর দিল্লী এক্সপ্রেস্!

ঘণ্টায় ৫০ মাইল ৬০ মাইল বেগে ছোটা ? তার কাছে তা ত' নিতান্ত ছেলে খেলা। একবার এক সাহেব মোটরে করিয়া এক উটপাখীর পেছনে ছুটিয়াছিলেন। ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে গাড়ী ছুটাইয়াও তিনি তার নাগাল পাইলেন না; চোখের পলকে কোথায় সে উধাও হইয়া গেল। তবে একটা কথা, উটপাখী প্রায়ই সোজা রাস্তা ধরিয়া ছোটে না, আঁকিয়া বাঁকিয়া গলি ঘুঁজি ঘুরিয়া সে শত্রুকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার ফলে ফাঁদে পড়ে নিজেই। শিকারী ব্যাপার বুঝিয়া অন্য সোজা পথে কম রাস্তা পার হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে ধরিয়া ফেলে।

যে পাখী নিজে এই রকম, তার ডিম কিংবা ছানা কি রকম হইবে তা ত' আন্দাজেই বুঝিতে পার। একটা উটপাখীর ডিম পাইলে তুমি তোমার গুটি ২৫।৩০ বন্ধুকে নির্ভাবনায় চায়ের নিমন্ত্রণ করিতে পার। কেননা ওই একটি ডিমের মামলেট খাইলেই তাদের সকলের পেট ভরিয়া যাইবে। এক একটি ডিমের ওজন ২।৩ সেরের কম হইবে না।

উটপাখীর সন্তান-স্নেহ একটা দেখিবার জিনিষ। যেমন মায়েদের, তেমনি বাপেদের। ডিমে তা দিবার সময় তারা যে কি ভাবে কাটায় তা' যদি দেখিতে! এক একটা উটপাখী একসঙ্গে প্রায় ১৫।১৬টি ডিম পাড়ে। ডিম পাড়িবার আগে পুরুষেরা মাটী খুঁড়িয়া তার মধ্যে বড় বড় গর্ত্ত করিয়া ফেলে। ডিম পাড়ে তারই মধ্যে। তার পর ডিমে তা দিবার পালা। এই সময় তারা ডিম ছাড়িয়া বড় একটা উঠেনা; যদি দৈবাৎ দরকার পড়ে তবে অতি সামান্য ক্ষণের জন্য। যাইবার আগে তারা বালি দিয়া ভাল করিয়া ডিমগুলি ঢাকিয়া রাখিয়া যায় যাতে সূর্য্যের আলোয় সেগুলির কোনও অনিষ্ট না হয়। পুরুষ আর স্ত্রী পাখীরা পালা করিয়া এই কাজ করে। মা পাখীরা দিনের বেলায়, বাপেরা রাত্রে। ৪২ দিন ধরিয়া এমনি সতর্কতার সাথে তারা কাজ করে। তারপর ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়।

সে ছানাও যাকে বলে "বাপ্ কা বেটা"! দেখিতে দেখিতে সে আকারে বাড়িয়া উঠে, আর জন্মের তিন দিন বাদেই কি খাইতে সুরু করে জান? ইট, পাটকেল, পাথরের টুক্‌রা আর ভাঙ্গা কাচ। বড় হইলে ত' কথাই নাই। তখন তারা না খায় এমন জিনিষ নাই। একবার এক উটপাখীর পেটে সাতটি পেরেক, ১৩টা তামার

পয়সা, একটি আস্ত টাকা, ২টি চাবি, আধখানি রুমাল আর অসংখ্য ছোট বড় পাথর পাওয়া গিয়াছিল। এ সব খাইয়াও সে বেশ আরামেই বাঁচিয়াছিল।

উটপাখীর আসল বাড়ী আফ্রিকা আর আরব দেশে। রুষিয়া আর ভারতবর্ষেও এক সময়ে উটপাখী ছিল বলিয়া পণ্ডিতদের বিশ্বাস। কিন্তু বাড়ী যেখানেই হোক্, আজকাল পৃথিবীর নানা যায়গায় উটপাখী পোষা হয় বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে আর ক্যালিফোর্ণিয়ায়। উটপাখীর পালক দেখিতে ভারী চমৎকার, আর তেমনি দামী। সৌখীন লোকেদের কাছে তার ভয়ানক কদর। এই পালকের জন্যই উটপাখী পোষা হয়। বছরে একবার করিয়া তাদের পালক কাটা হয়। এক একটা পাখী এক একবার ১৫০।২০০ টাকার পালক দিতে পারে আর যত দিন বাঁচিয়া থাকে (অর্থাৎ ৫০।৬০ বছর) তত দিন এম্‌নি পালক দেয়। কাজেই কেমন লাভের ব্যবসা বুঝিতেই পারিতেছ! অনেক জায়গায় আবার উটপাখীকে গাড়ীতেও যোতা হয়। যে পাখীর গায়ে অমন জোর, আর যে অমন ছুটিতে পারে, সে যে গাড়ী টানিতেও ওস্তাদ্ হইবে তার আর সন্দেহ কি?

উটপাখীর নাম করিতে আজ আর একটা পাখীর কথা মনে পড়িতেছে। এই পাখীর নাম মোয়া। ২।৩শ বছর আগে পৃথিবীর মধ্যে এরাই নাকি ছিল সব চাইতে বড় পাখী। লম্বায় এদের এক একটা হাতীর চাইতেও বড় হইত। উঁচুতে ১৪ ফিট ১৫ ফিটও ছাড়াইয়া যাইত; আর ঠ্যাংগুলিও ছিল এক একটা হাতীর মত। নিউজিল্যাণ্ড্ আর অষ্ট্রেলিয়ায় এরা বাস করিত, কিন্তু এখন আর নাই। সে দেশের লোকেরা শিকার করিয়া করিয়া তাদের দফা শেষ করিয়া দিয়াছে। মাত্র শ' দুই বছর আগেও ইহাদের দেখা পাওয়া যাইত। এই অল্প কয়েক দিন হইল এই পাখী পৃথিবী হইতে লোপ পাইয়াছে।

রাজকুমারী

(শ্রীযতীন সাহা)

—এক—

মস্ত বড় এক রাজ্য—নাম তা'র অবন্তী।

রাজ্যের প্রজারা দুঃখ কা'কে বলে জান্‌ত না; কিন্তু রাজার মনে সুখ ছিল না মোটেই।

অবন্তী থেকে সাত দিনের পথে শ্রাবন্তীপুর।

সেও এক বিশাল রাজ্য। সেখানকার লোকেরাও দুঃখের নাম শোনে নাই কোনো দিন—কিন্তু রাজার মুখে হাসি নেই—মনে তাঁর অশান্তি।

সে অনেক দিন আগের কথা, তখন অবন্তীর রাজা আর শ্রাবন্তীপুরের রাজা ছিলেন ছেলে মানুষ। খুব বড় এক পণ্ডিতের টোলে তাঁরা বিদ্যাশিক্ষা কর্‌তেন। তখন থেকেই তাঁদের দু'জনের খুব ভাব। এক দিন তাঁরা প্রতিজ্ঞা কর্‌লেন বড় হ'য়ে তাঁদের ছেলে মেয়ে হ'লে তা'দের বিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় কর্‌বেন।

ভগবানের কি ইচ্ছা কে জানে?

দিনের পর দিন গড়িয়ে সেদিনকার সেই তরুণ রাজকুমারেরা বুড়ো হ'তে চল্‌লেন; কিন্তু তাঁদের কারও কোন সন্তান হ'ল না।

কালের অবিশ্রান্ত গতিতে গা ভাসিয়ে দিয়ে দুই রাজাই বার্দ্ধক্যে পা দিয়েছেন; এত দিনে বুঝি ভগবান্ তাঁদের দিকে মুখ তুলে চাইলেন।

অবন্তীরাজের হ'ল এক অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে আর শ্রাবন্তীপুরের রাজার হ'ল এক ছেলে—ঠিক যেন দেব-শিশু।

—দুই—

বছরের পর বছর কেটে চল্‌লো—দুই রাজ্যের রাজকুমার আর রাজকুমারীও ক্রমে বড় হ'তে লাগ্‌লো—আর দুই বন্ধু শুধু চেয়ে রইলেন সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষায়।

এক দিন ভোর হবার সাথে সাথেই শ্রাবন্তীপুরের রাজপথ ফুলে ফুলে সজ্জিত হ'য়ে উঠ্‌লো—তোরণে তোরণে রসুন-চৌকির মিষ্টি সুর বেজে উঠ্‌লো; কুল-লক্ষ্মীরা গীত গাইলেন।

রাজকুমারের বিয়ে।

ক'নে আন্‌তে চল্‌লো হাজার লোক—সোণার পাল্‌কী নিয়ে।

এদিকে অবন্তীর তোরণে মঙ্গল ঘট বস্‌লো। আম্র পল্লব আর রঙিণ্ পতাকায় সুসজ্জিত হয়ে পুরী যেন খল্ খল্ ক'রে হেসে উঠ্‌লো। রাজা নিজ হাতে অজস্র ধনরাশি বিলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন—রাজ্যের যত সব গরীব দুঃখীদের।

সাত দিন পর নব বসন্তের এক প্রাতে সোণার পাল্‌কী এসে পৌঁছুলো অবন্তীতে।

রাণী আপন হাতে অগুরু-চন্দনে রাজকুমারী চম্পাকে মনের মত ক'রে সাজিয়ে দিলেন। রাজা হাস্‌তে হাস্‌তে এসে তাকে সোণার পাল্‌কীতে তুলে দিতে গেলেন; কিন্তু রাজকুমারী জেদ্ ধরে বস্‌লো, সে কিছুতেই পাল্‌কীতে যাবে না।

রাজা কত বোঝালেন, রাণী কত সাধ্‌লেন; কিন্তু রাজকুমারীর সেই একই কথা—সে যাবে শুধু রাজার সাদা ঘোড়া তুষারের পিঠে চড়ে; সঙ্গে তার কেউ যাবে না।

কি আর করেন রাজা, ঘোড়া সাজিয়ে আন্‌তে আদেশ কর্‌লেন। রাণী চম্পার হাত ধরে অনেক বলে কইয়ে রাজী করালেন—তার সাথে যাবে শুধু তার দাসী রূপসী।

সোণার সাজে তুষারকে সাজিয়ে আনা হ'ল, আর তারই সাথে এলো আর একটা কালো ঘোড়া—দাসীর জন্যে।

রাণী তাঁর মাথা থেকে এক গোছা চুল কেটে চম্পার ওড়নায় বেঁধে দিয়ে বল্‌লেন—"মা! পথে কোন বিপদে পড়্‌লে এই চুলের আঁচলের দিকে চাইলেই সে বিপদ্ আমি জান্‌তে পার্‌বো।"

রাজা আশীর্ব্বাদ করলেন, রাণী আশীর্ব্বাদ করলেন; চম্পা তাঁদের পায়ের ধূলো নিয়ে ঘোড়ায় উঠ্‌লো। তারপর একবার স্থির শান্ত দৃষ্টিতে মা-বাবার মুখের পানে চেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সোজা পূবের দিকে—রূপসীর ঘোড়াও ছুটে চল্‌লো তার পিছু পিছু।

যত দূর দু'চোখ যায় রাজা-রাণী নির্ণিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন।

—তিন—

দু'দিন একটানা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজকুমারী চম্পার ভারী তেষ্টা পেয়ে গেল। ঘোড়া থামিয়ে চম্পা রূপসীকে একটু জল এনে দিতে বল্‌লো; কিন্তু রূপসী তার ঘাড়টা বাঁকিয়ে বল্‌লো—"আমি কি তোমার দাসী?—যে জল এনে দেবো?"

রূপসীর কথা শুনে চম্পার মনে ভারী দুঃখ হ'ল। রূপসীকে আর কিছু না বলে, কাছের একটা ঝর্ণা থেকে জল খেয়ে চম্পা আবার ঘোড়া চালালো।

মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে দুই ঘোড়া তীরবেগে ছুটে চল্‌লো। চল্‌তে চল্‌তে আবার চম্পার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। লাগামটা কষে ধরে চম্পা রূপসীকে ডেকে বল্‌লো—"রূপসী! আমায় একটু জল এনে দেবে ভাই?"

রূপসী তার ঠোঁট দু'টো ফুলিয়ে বল্‌লো—"আমি কি তোমার চাকরাণী?"

মনের দুঃখে চম্পা কেঁদে ফেল্‌লো—তবুও রূপসীকে মুখ ফুটে একটি কথাও কইল না। হঠাৎ চম্পার মনে পড়্‌লো তার মায়ের দেওয়া সেই চুল গোছার কথা। ওড়নার গাঁট থেকে চুল গোছা খুল্‌তে গিয়ে চম্পা ভাব্‌লো—"না. সামান্য একটা অপরাধের জন্য সে তার খেলার সাথী দাসীকে শাস্তি দিতে পার্‌বে না।"

চম্পা জল খেতে গেল গাঁয়ের ধারের ছোট্ট নদীটাতে—ওড়নাটা তার পরে রইল তুষারের পিঠের ওপর।

জল খেয়ে ফিরে আস্‌তেই চম্পা দেখ্‌লো, রূপসী তুষারের পিঠে চড়ে বসে রয়েছে। আর একটু কাছে যেতেই রূপসী চোখ রাঙিয়ে বলে উঠ্‌লো—"রাজকুমারী! যদি নিজের মঙ্গল চাও তবে তোমার কনের পোষাক খুলে আমায় দাও; আর আমার পোষাক পরে তুমি দাসী সেজে ঐ কালো ঘোড়ায় চড়।"

হঠাৎ রূপসীর এরূপ ব্যবহারে চম্পা রেগে বল্‌লো—"রূপসী, জান?—মা আমায় তাঁর মাথার যে চুল গোছা দিয়েছেন তা' দিয়ে এই দণ্ডে আমি তোমার কি করতে পারি?"

তুষারের পিঠে চড়ে বসেছে।

বিদ্রূপের হাসি হেসে রূপসী বল্‌লো—"ছাই কর্‌তে পার তুমি।"

"ছাই কর্‌তে পারি?"

চম্পা তার ওড়্‌নাখানার দিকে চাইতেই রূপসী ওড়্‌নাখানা তার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে বল্‌লো—"এই নাও তোমার ওড়্‌না—চুল আমি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছি।" চম্পার মাথাটা বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে লাগ্‌লো ওড়্‌নাটা তার পায়ের কাছেই পড়ে রইল, সে শুধু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে রূপসীর মুখের পানে চেয়ে রইল।

চম্পা বল্‌লো—"রাজকুমারী তুমি দেখ্‌ছ কি, যদি বাঁচ্‌তে চাও তো তোমার পোষাক খুলে আমায় দাও। আজ থেকে তুমি আমার দাসী রূপসী, আর আমি রাজকুমারী চম্পা—শ্রাবস্তীপুরে গিয়ে এই পরিচয়ই তোমাকে দিতে হবে। আর এক কথা; যদি কাউকে ঘুণাক্ষরেও জান্‌তে দাও যে তুমিই রাজকুমারী, তাহলে মরণ তোমার আমার হাতে নিশ্চয় জেনো।"

—চার—

রূপসী রাজকুমারী চম্পার পোষাক পরে সাদা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো আর চম্পা

রূপসীর পোষাক পরে কালো ঘোড়াটায় চড়ে চল্‌লো তা'র পিছু পিছু। পথে কেবলই তার মনে হ'ল কেন সে তা'র মা-বাবার কথা না শুনে এসেছিল।

চল্‌তে চল্‌তে তারা একদিন এসে শ্রাবস্তীপুরে পৌঁছাল। পুরী জুড়ে আনন্দের বান ডাক্‌লো।

সেইদিনই রাজকুমারের সাথে 'ছদ্মবেশী রাজকুমারী' রূপসীর বিয়ে হয়ে গেল। পরদিন ভোর হ'তেই রূপসী রাজকুমারকে বল্‌লো—"রাজকুমার, আমি যে সাদা ঘোড়াটায় চড়ে এসেছি ওটাকে কেটে ফেল্‌তে আদেশ কর— কারণ, পথে ও আমায় তিন তিন বার পিঠ থেকে ফেলে দিয়েছিল—মৃত্যুই ওর উপযুক্ত শাস্তি। আর আমার সাথে যে দাসী এসেছে তা'কে একটা কাজ বাৎলে দাও—কুড়েমি সে মোটেই পছন্দ করে না।"

রাজকুমারের হুকুমে তুষারের গলা কেটে ফেলা হ'ল, আর মালীর মেয়েকে ডেকে বলে দেওয়া হ'ল এবার থেকে রাজকুমারীর নতুন দাসী রূপসীও তার সাথে বাগানে থাক্‌বে এবং রোজ রোজ মালা গেঁথে এনে রাজকুমারীকে দিয়ে যাবে।

দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে ;—মালীর মেয়ের সাথে চম্পার ভাব হয়ে গেছে বেশ। কাউকে ছেড়ে কেউ থাক্‌তে পারে না। মালীর মেয়ে আদর করে চম্পার চুলে বেণী পাকিয়ে দেয়, মাথায় ফুল গুঁজে দেয়, ফুলের গয়না পরিয়ে তাকে সাজায় ; কিন্তু চম্পার মনে সুখ নেই ; শুধুই বসে বসে ভাবে তা'র মা-বাপ এ খবর পেলে কি করে বেঁচে থাক্‌বেন ?

মালীর মেয়ে এর কিছুই জানে না, সে শুধু চম্পার গলাটা দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদর করে বলে—"সই ! তুই অম্‌নি করে বসে বসে শুধু রাতদিন ভাবিস্ কি আমায় বল্ না ?" হঠাৎ রূপসী চম্‌কে উঠে বলে—"কই—না !"

একদিন গভীর রা'তে মালীর মেয়ের ঘুম ভেঙ্গে যেতেই তা'র কাণে এলো কার' ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ। পাশ ফিরে দেখ্‌লো চম্পা নেই। জানালাটা খুলে বাইরের দিকে চাইতেই দেখ্‌লো একটা ফুলগাছের তলায় বসে চম্পা যেন কার সাথে কথা কইছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে।

দোর খুলে সে ডাক্‌লো, "সই ! ও সই !" ধীরে ধীরে চম্পা ঘরে এলো।

মালীর মেয়ে কতবার জিজ্ঞেস কর্‌লো সে কার সাথে কথা কইছিল আর কেনই বা কাঁদ্‌ছিল ; কিন্তু চম্পা তার কোন জবাবই দিল না, শুধু মালীর মেয়ের বুকের মাঝে মুখ গুঁজে শুয়ে রইলো।

একদিন দু'দিন ক্রমে আরো ক'দিন মালীর মেয়ে শুন্‌লো চম্পা যেন কার সাথে কথা কয়, কিন্তু অনেক করেও তার অর্থ বুঝ্‌তে পার্‌লো না। শেষে একদিন চুপি চুপি গিয়ে রাজকুমারকে সব খুলে বল্‌লো।

রাজকুমার সেই দিনই লুকিয়ে গিয়ে বাগানের একটা গাছে চড়ে রইল। তা'র পর অনেক রাতে শুন্‌লো চম্পা কার সাথে কথা কইছে, কিন্তু কাউকে দেখ্‌তে পেলে না।

পরদিন মালা নিয়ে এলে রাজকুমার চম্পাকে নিরিবিলি ডেকে বল্‌লো—"রূপসী, তুমি রোজ রাত্রে কার সাথে কথা কও ?"

চম্পা হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লো—বল্‌লো "কই, না !"

"মিথ্যে কথা ! আমি কাল নিজে কাণে শুনেছি। কার সাথে কথা কইছিলে বল।"

নিরুপায় হয়ে চম্পা হাত জোর করে বল্‌লো—"মাপ কর্‌বেন রাজকুমার, আমি কিছুতেই সে কথা বল্‌তে পার্‌বো না—সে কথা বল্‌লে এখনই আমার জীবন যাবে।"

রাজকুমার বল্‌লো—"আমার রাজ্যে এমন কেউ নেই যে নাকি তোমার কিছু কর্‌তে পারে। আমি অভয় দিচ্ছি তুমি বল।"

ধীরে ধীরে চম্পা সেদিনকার পথের সব কথা খুলে বল্‌লো। সব শুনে রাজকুমার দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লো "আচ্ছা, আজই আমি দরবার বসাচ্ছি—সমস্ত রাজ্যের লোকের সমক্ষে তোমাকে সব বল্‌তে হবে, পার্‌বে তো ?"

চম্পা শুধু তার মাথাটা নত করে রইল।

—পাঁচ—

পরদিন রাজ-দরবার বসে গেল, বিচার কর্‌বে স্বয়ং রাজকুমার। মন্ত্রী, কোটাল, পাত্র মিত্র সবাই অবাক্ হয়ে বসে ভাব্‌লেন এ দরবার আজ কিসের জন্যে। সবাই চুপ—কপালে তাদের চিন্তার রেখা কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌লো।

রাজকুমার রাজার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লো—“মহারাজ! আপনার রাজ্যের নিভৃত অন্তরে যে শোকের অশ্রু বান ডেকেছে সে খবর রাখেন কি? আজ তারই বিচার হ’বে; আর দণ্ড দিতে হবে তার আপনাকেই।”

সভার সকলেই চুপ্ কারও মুখে কথা নেই, শুধু ভাব্‌ছেন ব্যাপার কি? রাজকুমার প্রহরীকে আদেশ কর্‌লো—“প্রহরী, রাজকুমারীর সাথে অবন্তী থেকে যে দাসী এসেছে তা’কে সভায় নিয়ে এসো।”

কিয়ৎক্ষণ পরই সভার মাঝে এসে দাঁড়ালো—

চম্পা—শরৎ-প্রাতের ঝরা শিউলীর মতই সুন্দর—হাতে তার ফুলের মালায় সুসজ্জিত দুধের মত ধব্‌ধবে সাদা একটা ঘোড়ার মুণ্ডু।

শান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে সে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—“মহারাজ, এ সভায় আগমনের জন্যে কি আপনিই আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?”

রাজা তা’র উত্তর দেবার পূর্ব্বেই রাজকুমার বল্‌লো—“না রূপসী! আমিই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি—তোমার নিভৃত অন্তরের বেদনাটুকু আজ রাজ-দরবারে নিবেদন কর্‌বার জন্যে।”

সভাশুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে শুধু সেই কুমারীর পানে চেয়ে রইল। চম্পা ধীরে ধীরে ঘোড়ার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বল্‌লো—“রাজকুমার! এ সভায় আমার বল্‌বার কিছুই নেই; এই তুষারের মুণ্ডুকে জিজ্ঞেস করুন, তার কিছু বল্‌বার আছে কিনা।”

“রাজকুমার বল্‌লো তুষার তোমার কিছু বল্‌বার আছে?”

সমস্ত সভার লোককে অবাক্ করে দিয়ে ঘোড়ার মুণ্ডু রাজকুমারী চম্পার বাড়ী হ’তে রওনা হবার পর থেকে যা’ যা’ ঘটেছে, একে একে সব খুলে বল্‌লো। তারপর রাজার মুখের দিকে চেয়ে ঘোড়ার মুণ্ডু বল্‌লো—“মহারাজ, আমি অভিশপ্ত রাজকুমার—তাই এত দিন ঘোড়া হয়ে ছিলাম। আজ আমার আত্মার চির মুক্তি হ’ল।” বল্‌তে বল্‌তে তুষারের চোখ দু’টো ঝিমিয়ে এলো, আর চোখ মেলে সে চাইলো না।

রাজা দাঁতে দাঁত ঘসে হুকুম্ কর্‌লেন, “এখনই নিয়ে এসো সেই পাপিষ্ঠাকে—শাস্তি তার প্রাণদণ্ড।”

চম্পা করজোড়ে বল্‌লো—“মহারাজ, আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে; রূপসী একদিন আমার জীবন দান করেছে, নইলে সে দিনই দীঘির জলে আমি হারিয়ে যেতাম্; আজ তাই আমি শুধু তার প্রাণ ভিক্ষা কর্‌ছি।”

তেম্‌নি ভাবে রাজা বল্‌লেন, “তবে তাই হোক্! প্রহরী, এখনই পাপিষ্ঠাকে রাজ্য থেকে দূর করে দাও, আর যেন এ রাজ্যে কেউ ওর মুখ দেখ্‌তে না পায়।”

পর দিন আবার রাজকুমারের সাথে রাজকুমারী চম্পার ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। রাজ্যের লোকে শত শত মূল্যবান্ উপহার দিল রাজকুমারী চম্পার হাতে—কিন্তু চম্পার সব চাইতে ভাল লাগ্‌লো মালীর মেয়ের দেওয়া সেই বনফুলের মালা খানি।

রাজকুমারী মালীর মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বল্‌লো—“আজ থেকে তোর স্থান আর বাগানে নয় সই! এইখানে—এই রাজপ্রাসাদে!”

রজব মিয়া *

[কবিতায় গল্প]

(কাদের নওয়াজ, বি-এ)

নাম ছিল তার ন্যাংড়া রজব্
ফার্‌সী দেশে বাড়ী,
ছোট্ট মাথা, কিন্তু ছিল
লম্বা দু’হাত দাড়ী;
মস্ত ভুঁড়ি, শীর্ণ দেহ
হ্যাংচা ফ্যাচাং ঠ্যাং
হাঁট্‌ত যখন লাগ্‌ত দেখি
আস্ত কোলা ব্যাঙ্;

* ফার্‌সী গল্পের অনুবাদ—ফার্‌সী গ্রন্থ হেয়াকেৎ দ্রষ্টব্য।

রাজকুমার রাজার দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বল্‌লো—"মহারাজ! আপনার রাজ্যের নিভৃত অন্তরে যে শোকের অশ্রু বান ডেকেছে সে খবর রাখেন কি? আজ তারই বিচার হ'বে; আর দণ্ড দিতে হবে তার আপনাকেই।"

সভার সকলেই চুপ্ কারও মুখে কথা নেই, শুধু ভাব্‌ছেন ব্যাপার কি? রাজকুমার প্রহরীকে আদেশ কর্‌লো—"প্রহরী, রাজকুমারীর সাথে অবন্তী থেকে যে দাসী এসেছে তা'কে সভায় নিয়ে এসো।"

কিয়ৎক্ষণ পরই সভার মাঝে এসে দাঁড়ালো—

চম্পা—শরৎ প্রাতের ঝরা শিউলীর মতই সুন্দর—হাতে তার ফুলের মালায় সুসজ্জিত দুধের মত ধব্‌ধবে সাদা একটা ঘোড়ার মুণ্ডু।

শান্ত সকরুণ দৃষ্টিতে সে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্‌লো—"মহারাজ, এ সভায় আগমনের জন্যে কি আপনিই আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন?"

রাজা তা'র উত্তর দেবার পূর্ব্বেই রাজকুমার বল্‌লো—"না রূপসী! আমিই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি—তোমার নিভৃত অন্তরের বেদনাটুকু আজ রাজ-দরবারে নিবেদন কর্‌বার জন্যে।"

সভাশুদ্ধ লোক অবাক্ হয়ে শুধু সেই কুমারীর পানে চেয়ে রইল। চম্পা ধীরে ধীরে ঘোড়ার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে রেখে বল্‌লো—"রাজকুমার! এ সভায় আমার বল্‌বার কিছুই নেই; এই তুষারের মুণ্ডুকে জিজ্ঞেস করুন, তার কিছু বল্‌বার আছে কিনা।"

"রাজকুমার বল্‌লো তুষার তোমার কিছু বল্‌বার আছে?"

সমস্ত সভার লোককে অবাক্ করে দিয়ে ঘোড়ার মুণ্ডু রাজকুমারী চম্পার বাড়ী হ'তে রওনা হবার পর থেকে যা' যা' ঘটেছে, একে একে সব খুলে বল্‌লো। তারপর রাজার মুখের দিকে চেয়ে ঘোড়ার মুণ্ডু বল্‌লো—"মহারাজ, আমি অভিশপ্ত রাজকুমার—তাই এত দিন ঘোড়া হয়ে ছিলাম। আজ আমার আত্মার চির মুক্তি হ'ল।" বল্‌তে বল্‌তে তুষারের চোখ দু'টো ঝিমিয়ে এলো, আর চোখ মেলে সে চাইলো না।

রাজা দাঁতে দাঁত ঘসে হুকুম্ কর্‌লেন, "এখনই নিয়ে এসো সেই পাপিষ্ঠাকে — শাস্তি তার প্রাণদণ্ড।"

চম্পা করজোড়ে বল্‌লো—"মহারাজ, আমার একটি মাত্র নিবেদন আছে; রূপসী একদিন আমার জীবন দান করেছে, নইলে সে দিনই দীঘির জলে আমি হারিয়ে যেতাম্; আজ তাই আমি শুধু তার প্রাণ ভিক্ষা কর্‌ছি।"

তেম্‌নি ভাবে রাজা বল্‌লেন, "তবে তাই হোক্! প্রহরী. এখনই পাপিষ্ঠাকে রাজ্য থেকে দূর করে দাও, আর যেন এ রাজ্যে কেউ ওর মুখ দেখ্‌তে না পায়।"

পর দিন আবার রাজকুমারের সাথে রাজকুমারী চম্পার ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল। রাজ্যের লোকে শত শত মূল্যবান্ উপহার দিল রাজকুমারী চম্পার হাতে—কিন্তু চম্পার সব চাইতে ভাল লাগ্‌লো মালীর মেয়ের দেওয়া সেই বনফুলের মালা খানি।

রাজকুমারী মালীর মেয়েকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে বল্‌লো—"আজ থেকে তোর স্থান আর বাগানে নয় সই! এইখানে—এই রাজপ্রাসাদে!"

রজব মিয়া *

[কবিতায় গল্প]

(কাদের নওয়াজ, বি-এ)

নাম ছিল তার ন্যাংড়া রজব্
        ফার্‌সী দেশে বাড়ী,
ছোট্ট মাথা, কিন্তু ছিল
        লম্বা দু'হাত দাড়ী;
মস্ত ভুঁড়ি, শীর্ণ দেহ
        হ্যাংচা ফ্যাচাং ঠ্যাং
হাঁট্‌ত যখন লাগ্‌ত দেখি
        আস্ত কোলা ব্যাঙ্;

* ফার্‌সী গল্পের অনুবাদ—ফার্‌সী গ্রন্থ হেয়াকেৎ দ্রষ্টব্য।

দপ্তরেতে থাক্‌ত বাঁধা
একটী পুঁথি তার,
প'ড়্‌তে বসি' নিত্য সাঁঝে
ঝ'র্‌ত আঁখি ধার ;
বল্‌ত লোকে বিশ্বে কোথাও
নেইক' এমন জন,
ধার্ম্মিকেরি শ্রেষ্ঠ 'রজব্‌'
ধরায় অতুলন ;
সেদিন সে এক বাদল রাতে
হঠাৎ গিয়ে বাড়ী,
আন্‌ল রজব্‌ দেরাজ্‌ থেকে
একটি কেতাব পাড়ি' ।
প'ড়্‌তে গিয়ে দেখ্‌ল সেথা
স্পষ্ট লেখা আছে—
"ছোট্ট মাথা, লম্বা দাড়ী
দেখ্‌বে যাহার কাছে,
পরিয়ে দিয়ে তার ললাটে
নাগ মনসার কাঁটা,
বল্‌বে তুমি নির্ভয়ে সে
আস্ত বোকা পাঁঠা ।"
এই না পড়ি' 'রজব্‌' সেখের
লাগ্‌ল মনে ধোকা,
ভাব্‌ল সে আজ তবে কি হায়
সত্যি আমি বোকা ?
পাশেই ছিল দর্পণ এক
হস্তে তাহা ধরি

ভাব্‌ল 'রজব্‌' ছোট্ট মাথা
বাড়াই কেমন করি ?
নেই কোন আশ এদিক্‌ থেকে
বিফল চির তরে,
তার চাইতে গোঁফ্‌ দাড়ী মোর
দেই না ছোট ক'রে !
তবেই পাব রক্ষা আমি
ঘুচ্‌বে বোকা নাম,
নইলে সবার ঘৃণ্য হ'য়ে
কাট্‌বে দিবা যাম !
এই না বলি' 'রজব্‌' মিয়া
খোঁজেন শুধুই কাঁচি,
বলেন "আজি কাট্‌ব দাড়ী
নইলে নাহি বাঁচি ;
ছাঁট্‌ব দাড়ী, কাট্‌ব দাড়ী
যেমন ক'রেই হোক্‌,
নইলে পরে প্রভাত হ'লে
টের পাবে সব লোক্‌ ।"
মিল্‌ল নাক' কাঁচি কিন্তু
হাজার ঢুঁড়েও ঘরে,
রজব্‌ মিয়া বলেন তখন
প্রদীপ ল'য়ে করে—
"এক হাতে মোর মাপ্‌ব দাড়ী
মাথার সমান করি',
অন্য হাতে রাখ্‌ব উজ্জল
দীপ শিখাটী ধরি'

তার পরেতে পুড়িয়ে দিব
বাড়্‌তি যত দাড়ী,
যেম্‌নি কথা তেম্‌নি রে কাজ
এতই তাড়াতাড়ি !
তুলায় আগুন ধরার মতই
হঠাৎ তড়িৎ বেগে,
রজব্‌ মিয়ার সব দাড়ী আজ
পুড়্‌ল আগুন লেগে !
সেই সাথে তাঁর পুড়্‌ল রে মুখ
বীর হনুমান্‌ সম
রজব্‌ মিয়া বলেন কাঁদি—
"আল্লা আমায় ক্ষম
শিক্ষা পেলাম্‌ আজকে হ'তে
ঘুচ্‌ল মনের ধোকা
মিথ্যা নহে, রজব্‌ মিয়া
বাস্তবিকই বোকা !"

হ্রদের কথা

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

তোমরা ভূগোলে অনেক হ্রদ ও নদনদীর নাম পড়িয়াছ ; স্কুলের ও পরীক্ষার তাড়ায় সে সব নদনদী ও হ্রদের বিদ্‌ঘুটে নাম মনে রাখিতে অনেক কষ্টও পাইয়াছ। তার পর হয় ত উপরের ক্লাশে উঠিয়া ভূগোলের ধার দিয়াও যাও নাই ; সঙ্গে সঙ্গে এই সব নদনদীর নাম তোমাদের মন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। তোমাদের মধ্যে সকলেই যে এমন ধারা তাহা বলিতেছি না। অনেক ছেলে আবার ভূগোলের নানা তত্ত্ব খুঁটিয়া নাটিয়া জানিতে ইচ্ছা করে। আমার মনে আছে, আমি যখন ইস্কুলের পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম তখন আমার ভূগোল পড়িতে বড়ই ভালো লাগিত ;

তাহাতে যে আমি কত আনন্দ পাইতাম তাহা লিখিয়া বলিতে পারিব না। পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভূগোলের কি-ই বা ক্লাশে পড়ানো হইত, হয়ত বাংলা দেশ, না হয় বড় জোর ভারতবর্ষটুকু পড়িতেই ক্লাশের বছর কাটিয়া যাইত। কিন্তু আমি সেই সময়েই পৃথিবীর যাবতীয় দেশের সমস্ত খুঁটিনাটি কথা মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম। জানালার পাশে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া এট্‌লাস্‌ খুলিয়া বসিয়া থাকিতাম। পৃথিবীর ছোট বড় সমস্ত নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, হ্রদ, সমুদ্র, সহর গ্রাম সমস্তই আমার মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, এট্‌লাস্‌ চোখের সামনে খুলিয়া সেই বাল্য বয়সে কত কথাই না ভাবিতাম ; হয়ত আফ্রিকার ম্যাপ খুলিয়া নিগার নদী দেখিতেছি ; তুই পাশে কত গ্রামের নাম লেখা রহিয়াছে ; বসিয়া বসিয়া ভাবিতাম এই সব গ্রামের লোকেরা এখন কি করিতেছে ! সেই সব গ্রাম নদ-নদী দেখিবার জন্য আমার একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা হইত। সেই সব গ্রাম ও নদীর উপর আঙ্গুল বুলাইয়া মনে মনে যে কি এক অননুভূত আনন্দ পাইতাম তাহা বলিতে পারি না। মাদাগাস্কারে লোক আছে, ট্যাস্‌ম্যানিয়াতেও লোক আছে আর Tierra del fuegoতেও লোক আছে ; তারাও আমার মত মানুষ, আর আমি আজ তাদের কথা ভাবিতেছি, তাহাদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কত ইচ্ছুক হইয়াছি—এই সব কথা ভাবিতাম আর ম্যাপে সেই সব দ্বীপের আকৃতি একান্ত মনোযোগের সহিত দেখিতাম। জীবনে হ্রদ কখনো দেখি নাই। কিন্তু মনে মনে হ্রদের একটা কল্পনা করিয়া লইয়াছিলাম, আর ভাবিতাম, না জানি হ্রদ কতই না সুন্দর ! Caspian seaকে একটা বড় গোছের পুকুর ভাবিয়া লইয়া মনে মনে কত খেলাই না করিতাম ; নৌকা করিয়া মনে মনে সেই সব অতিকায় পুকুর পার হইতাম ; কখনো বা সাইকেল করিয়া এক দমে পুকুরটাকে ঘুরিয়া আসিতাম ; পথে কত লোকের সঙ্গে দেখা হইত। যদি ভল্‌গা বা উরাল নদী পথে পড়িত, নৌকা করিয়া তার জলে না বেড়াইয়া শান্ত হইতাম না। বোর্ণিও দ্বীপে বড় বড় কলাগাছের জঙ্গল, সেই সব জঙ্গলে ঘুরিয়া পেট ভরিয়া কলা খাইতাম, হয়তো পূর্ব্বপুরুষ ওরাং ওটাং ভায়াদের সঙ্গেই দোস্ত পাতাইতাম। কখনো বা কালো কম্বলে সর্ব্বাঙ্গ মুড়ি দিয়া মহা আরামে গ্রেট্‌ সাইবেরিয়ান্‌ রেলওয়ে করিয়া সাইবেরিয়া দেশটাই অতিক্রম করিতাম।

এত বড় পৃথিবীর অগুণ্‌তি হ্রদ ও নদনদীর মধ্যে যে কত রহস্য, কত সৌন্দর্য্য আছে তা তোমরা কিছুই জান না। তোমাদের ভূগোলে সে সব কথা কিছুই লেখা নাই ; শুধু কতকগুলি নীরস কঠোর নাম মুখস্থ করিতে হয়, তাহাতে আর কতটুকুই বা আনন্দ পাওয়া যায়। আজ আমি তোমাদের কাছে হ্রদ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি নূতন কথা বলিব যাহা পড়িয়া তোমরা নিশ্চয় আনন্দ ও শিক্ষা পাইবে। পরে ভবিষ্যতে একদিন পৃথিবীর নদনদী সম্বন্ধে বলা যাইবে। একটা কথা—এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার সময় একখানি এট্‌লাস্‌ সাম্‌নে খুলিয়া রাখিও।

তোমরা ভূগোলে পড়িয়াছ যে স্থলবেষ্টিত জলরাশিকে হ্রদ বলে। পৃথিবীর মাটীর উপরটাতে যেখানে যেখানে জমি অত্যন্ত নীচু, সেইখানেই জল জমিয়া হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই সব হ্রদের সঙ্গে প্রায় অনেক নদীর যোগ থাকে। নদীর জল আসিয়া এই সব হ্রদে পড়ে, যেমন বাড়ীর সংলগ্ন নর্দ্দমা দিয়া জল গিয়া বাহিরের খানায় পড়ে। অনেক সময় একটা নদীর মাঝে মাঝে অনেক হ্রদের সৃষ্টি হয়, যেমন আয়ার্ল্যাণ্ডের শ্যানন নদী। পৃথিবীর নানা হ্রদ নানা ভাবে তৈরী হইয়াছে। কোনটা পুরান কালের (অধুনা-লুপ্ত) আগ্নেয়পাহাড়ের মুখগহ্বর; কোনটা হইয়াছে মাটি বসিয়া যাওয়ার দরুণ, কোনটা বা বসিয়া-যাওয়া পর্ব্বত-গহ্বর, আবার কোনটা বা ভূমিকম্পের দরুণ উপত্যকা প্রভৃতির স্থানচ্যুতির ফল। নরওয়ে সুইডেনে যে সমস্ত হ্রদ (Fiords) দেখিতে পাই তাহা সমস্তই গ্লেসিয়ার বা বরফ-নদী হইতে তৈরী হইয়াছে। আবার Albert Edward Nyanzaর মত হ্রদগুলি ভূমিকম্পের দরুণ মাটির অবনমনে সৃষ্টি হইয়াছে। এই হ্রদটি যে কত বড়, ইহার মধ্যে সঞ্চিত জলরাশির পরিমাণ যে কতখানি তাহা তোমরা সহজে বুঝিতে পারিবে না। নীল নদের জল এই হ্রদ হইতে বাহির হইয়াছে; প্রতি বছর বর্ষার সময়ে নীল নদের দুই দিকের শত শত মাইলব্যাপী বালুময় জমি বন্যার দরুণ ডুবিয়া যায়। সে ব্যাপারটীও সম্ভব হয় এই হ্রদের জল আছে বলিয়াই।

ভূমিকম্পে যেমন পৃথিবীর অনেক জায়গা উঁচু হইয়া ওঠে আবার তেম্নি অনেক জায়গা বসিয়াও যায়। এই বসিয়া যাওয়া জায়গাগুলি পরে কখনো কখনো হ্রদ হইয়া ওঠে। ভারতবর্ষের মানচিত্রে তোমরা Rann of Cutchএর নাম দেখিয়াছ; ইহা একটি আভ্যন্তরীন (inland sea) সমুদ্র। পূর্ব্বে কিন্তু এখানে কোন সমুদ্র ছিল না। একবার এক ভীষণ ভূমিকম্পে সিন্ধু নদীর ব-দ্বীপ (delta) ভাঙিয়া বসিয়া যায়, তাহাতেই এই Rann of Cutchএর সৃষ্টি। আমেরিকার বিখ্যাত মিসিসিপি

নীল নদ।

নদীর দুই পাড়ের বিশাল ভূভাগ বসিয়া গিয়াও অনেকগুলি হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। জাপানে যেখানে সহর ও গ্রাম ছিল এই ধরণের কোন কোন জায়গা ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পের দরুণ বসিয়া গিয়া অনেকগুলি হ্রদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আবার অনেক সময় ভূমিকম্পের দরুণ অনেক জায়গা উঁচু হইয়া হ্রদের সৃষ্টি করে। সুইট্জারল্যাণ্ডে Blegno নামে একটি নদী ছিল। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে পাহাড়ের গা হইতে মাটী ধ্বসিয়া পড়িয়া (ল্যাণ্ড্ স্লিপ্) নদীর পথ ও স্রোত বন্ধ করিয়া দেয়; পরে নদীটি হ্রদ হইয়া দাঁড়ায় আল্প্স্ পর্ব্বতের নিকট Oisan নামে একটা গ্রাম আছে; গ্রামের অধিবাসীরা শিকার করিয়া ও ভেড়া চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত; এমন সময় একদিন অনেকখানি জমি বসিয়া গিয়া হ্রদ হইয়া গেল; গ্রামের লোকেরা শিকার ও ভেড়া চরানো ছাড়িয়া সেইদিন হইতে মাছ ধরিয়া জীবন ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয় যে বাতাসেও অনেক সময় হ্রদের সৃষ্টি করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে (United States) এই রকম অনেকগুলি হ্রদ আছে। সাহারা মরুভূমিতে অনেক জায়গা বাতাসের দরুণ বালি উঠিয়া গিয়া এত বেশী নীচু হইয়া গিয়াছে যে মনে হয় পরে এই সব জায়গাও হ্রদে পরিণত হইবে।

বল দেখি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কোন্ হ্রদটি বড়? কোন্ হ্রদ পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত? কোন্ হ্রদ পৃথিবীর সর্ব্বনিম্ন স্থানে অবস্থিত? বল দেখি, পৃথিবীর মধ্যে কোন্ হ্রদটি সর্ব্বাপেক্ষা গভীর? কোন্ হ্রদের জল সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট? কোন্ হ্রদে বড় লবণাক্ত—এত লবণাক্ত যে তোমায় ছুঁড়িয়া ফেলিলে তুমি সাঁতার না জানিলেও ডুবিয়া যাইবে না, ভাসিতে থাকিবে?

পৃথিবীর মধ্যে ক্যাস্পিয়ান সাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ। খুব বড় বলিয়া ইহাকে সাগর বলে। ইহার পরিমাণ ১৭০,০০০ হাজার বর্গ মাইল। প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিৎ মিল্স্ সাহেব অনেক গভীর গবেষণা করিয়া পৃথিবীর প্রসিদ্ধ হ্রদগুলির নিম্ন লিখিত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

নাম	অবস্থিতি স্থান	সমুদ্রের কত উপরে	পরিমাণ	গভীরতা
ক্যাস্পিয়ান সাগর	ইউরেসিয়া	৯০ ফুট	১,৭০,০০০ বর্গ মাইল	৩,০০০ ফুট
লেক্ সুপিরিয়র	উত্তর আমেরিকা	৬০০ ...	৩১,২০০ ...	১,০০৮ ...
হুরণ্	উত্তর আমেরিকা	৫৮০ ...	২৩,৮০০ ...	৭০২ ...
মিসিগান	উত্তর আমেরিকা	৫৮০ ...	২২,৪০০ ...	৮৭০ ...
ভিক্টোরিয়া	আফ্রিকা	৩,৩০০ ...	২৬,৯০০ ...	গভীরতা পাওয়া যায় নাই
আরল হ্রদ	এসিয়া	১৫০ ...	২৬,২০০ ...	২২২ ...

তির্ব্বতের Ascal chin হ্রদই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সাগরতল (sea level) হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ১৬.৬০০ ফুট। প্যালেষ্টাইনের ডেড্ সি (মরুসাগর) সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থানে অবস্থিত ; ইহা সমতল ভূমি হইতে প্রায় ১২৯০ ফুট নিম্নদেশে। সর্ব্বাপেক্ষা গভীর হ্রদ কোন্‌টি জান? এসিয়ার বৈকাল হ্রদ। ইহার গভীরতা প্রায় ৪,৮০০ ফুট, অর্থাৎ প্রায় ১ মাইল। এই হ্রদে কি তোমাদের সাঁতার কাটিতে ইচ্ছা করে না?

কোন কোন হ্রদের জল পুকুরের জলের মতই শান্তশিষ্ট. যেমন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের হ্রদগুলি ; আবার কোন কোন হ্রদের উপর ঝড় ও বড় বড় ঢেউ লাগিয়াই আছে। লেক্ সুপিরিয়র ও ক্যাস্পিয়ান সাগরে যে ঝড় ঝঞ্ঝায় কত জাহাজ ষ্টিমার ডুবি হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

কাশ্মীরী ক্ষুদে হ্রদ।

সমুদ্রের মত হ্রদগুলিও দেশের আবহাওয়ার উপর অনেক প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া দেশের উপকারও কম করে না। বর্ষার সময় নদীর জলরাশি প্রচণ্ডবেগে এই সব হ্রদে আসিয়া পড়ে, আবার প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় যখন খালবিল নদ নদী সব শুকাইয়া যায় তখন এই সব হ্রদের সঞ্চিত জলরাশি সেই সব নদ নদী পরিপূর্ণ করিয়া তুলে।

হ্রদগুলিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যায়—লবণাক্ত (Salt) ও সুস্বাদ (fresh-water)। লবণাক্ত হ্রদগুলি আবার দুই রকমের ; কতকগুলির সমুদ্রের সঙ্গে বহুপূর্ব্বে যোগ ছিল, সেই জন্য এখন তাহারা লবণাক্ত,—যেমন, ক্যাস্পিয়ান সাগর। এই সুবিশাল হ্রদটি পূর্ব্বে সমুদ্রের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল, এখন অনেক তফাতে আসিয়া পড়িয়াছে। তাই এই ক্যাস্পিয়ান হ্রদের জল সমুদ্রের জলের মতই তীব্র লবণাক্ত। আবার কতকগুলি লবণাক্ত হ্রদ আশপাশের জমি হইতে লবণ শুষিয়া লয়, যেমন ডেড্ সি। প্রধানতঃ যে সব হ্রদের বহির্গমনের পথ আছে সেইগুলিই সুস্বাদ, আর যাহার তাহা নাই তাহারাই লবণাক্ত। কিন্তু এই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটে না।

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সুস্বাদ হ্রদ আমেরিকার লেক্ সুপিরিয়র। ইহার পরিমাণ ৩১,২০০ বর্গ মাইল। দ্বিতীয় হইতেছে আফ্রিকার লেক্ ভিক্টোরিয়া নায়ানজা। ইহার পরিমাণ ২৬,৯০০ বর্গ মাইল। তৃতীয় হইতেছে এসিয়ার লেক্ আরল ; ইহার পরিমাণ ২৬,২০০ বর্গ মাইল।

চতুর্থ লেক্ হুরন ; ইহার পরিমাণ ২৩,৮০০ বর্গ মাইল। পঞ্চম, লেক্ মিসিগান্, ইহার পরিমাণ- ২২,৪০০ বর্গ মাইল। উত্তর আমেরিকায় সব চাইতে পাঁচটি বড় হ্রদ—সুপিরিয়র, মিসিগান, হুরন, ইরিস্‌ও অণ্টারিও। ইহাদের আয়তন একত্রে প্রায় ইংলণ্ডের সমান। বহুকাল পূর্ব্বে উত্তর আমেরিকায় ইহা অপেক্ষা আরো বড় একটি হ্রদ ছিল, দৈর্ঘ্যে তাহা ৭০০ মাইল ও পরিমাণ ১,১০,০০০ বর্গ মাইল। এই অতিকায় হ্রদটি এখন লোপ পাইয়া গেছে ; ইহার নাম ছিল আগাসিজ হ্রদ। পূর্ব্বে সুপিরিয়র ও হুরণ আকারে ও গভীরতায় আরো বড় ছিল, এখন ঢের ছোট হইয়া গেছে।

ক্যাস্পিয়ান সাগর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ ; এই হ্রদটি লেক্ সুপিরিয়রের ছয়গুণ বড়। শুধু আকারেই নয়, ইহার গভীরতা ৩০০০ ফুট, অর্থাৎ সুপিরিয়র হ্রদের অপেক্ষা তিনগুণ। এক সময়ে এই হ্রদটি কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ; এখনও এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণাক্ত হ্রদ ও জলাভূমি (Marsh) দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয়, ক্যাস্পিয়ান্ হ্রদের শামুক, গেঁড়ি কৃষ্ণ শামুক-গেঁড়িরই মত। আবার কোন কোন ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এমন কথাও বলেন যে বহুকাল পূর্ব্বে ক্যাস্পিয়ান হ্রদটি অতি প্রকাণ্ড ছিল, তখন তাহা রাশিয়া ও সাইবেরিয়ার উপর দিয়া উত্তর মহাসাগরে গিয়া পড়িয়াছিল। এই কথাটি আমরা একেবারে গাঁজাখুরি বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না ; কারণ এমনটি যে ছিল তাহার বহু প্রমাণ এখনো আমরা দেখিতে পাই। ক্যাস্পিয়ান সাগর হইতে উত্তর মহাসাগর পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ প্রদেশের মধ্যে মধে৷ অনেক লবণাক্ত হ্রদ ও জলাভূমি এখনো দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নয় ; শুনিলে, তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে উত্তর মহাসাগরে যেমন শীল মৎস্য (Seal) দেখিতে পাওয়া যায় ক্যাস্পিয়ান সাগরেও তেমনি প্রচুর শীল আছে। ক্যাস্পিয়ান হ্রদের শীল শিকার করিয়া হাজার হাজার ধীবর জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পূর্ব্বে ক্যাস্পিয়ান হ্রদ আরল হ্রদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।

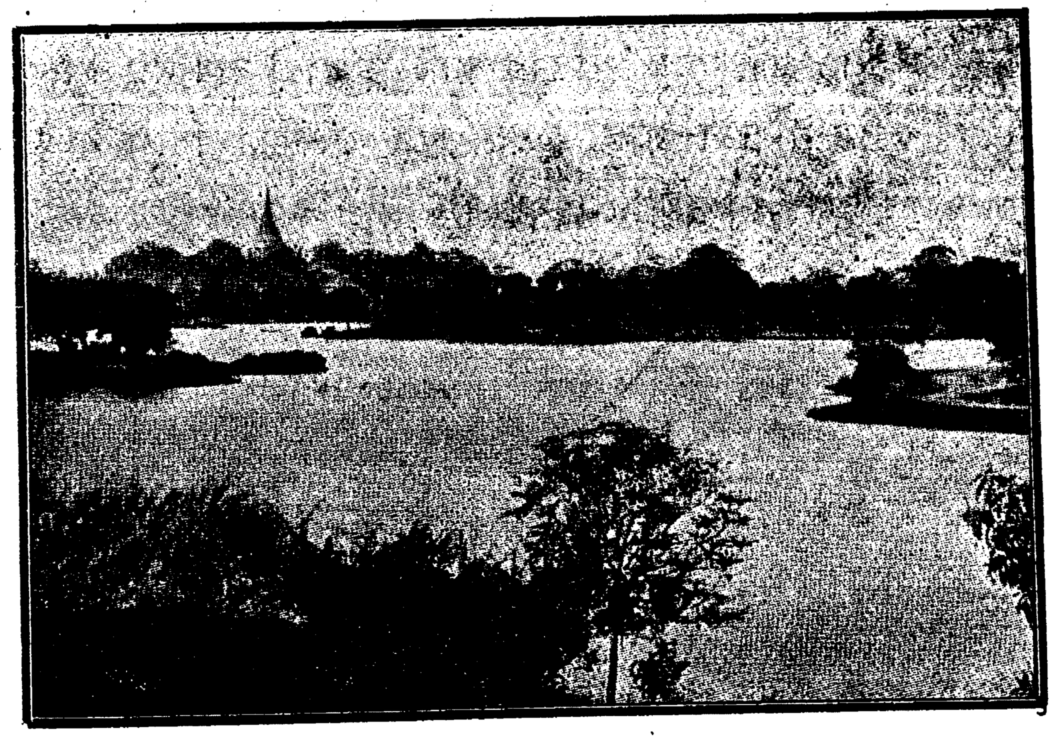
ব্রহ্মদেশীয় ক্ষুদে হ্রদ।

লবণাক্ত হ্রদের নাম করিতে গেলে Caspian sea র পরেই Dead sea র নাম করিতে হয়।

যদিও ক্যাস্পিয়ানের তুলনায় ইহা একটি লিলিপুট (Liliput) বিশেষ, তথাপি ইহাও একটি বিখ্যাত হ্রদ। প্রথম কারণ, এই হ্রদের জল অতি লবণাক্ত; ইহার নিকট ক্যাস্পিয়ান হ্রদের জলকেও অতি মিষ্ট বলিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্থিত হ্রদ। এই হ্রদে বিখ্যাত জর্ড্ডান নদী (Jordan আসিয়া পড়িয়াছে; আমাদের যেমন গঙ্গা ক্রীশ্চানদের নিকট জর্ড্ডান তেম্‌নি পবিত্র। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে পূর্ব্বে Dead sea (মরুসাগর) ও Red sea (লোহিতসাগর) সঙ্গে যোগাযোগ ছিল।

হ্রদের নাম Dead sea; 'মৃত'ই বটে। ইহার জল এত বেশী লবণাক্ত যে এ পর্য্যন্ত এই হ্রদের মধ্যে একটা মাছও দেখিতে পাওয়া যায় নাই; এমন কি ইহার তীরভূমির উপর বহুদুর পর্য্যন্ত একটা ঘাস বা আগাছার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। সমুদ্রের জল যত লবণাক্ত তাহার নয় গুণ বেশী লবণাক্ত এই হ্রদের জল। এই হ্রদে সাঁতার কাটিতে পারা যায় না, কারণ, গা কিছুতেই জলে ডোবে না। যে সাঁতার জানে না তাহাকেও এই হ্রদে ফেলিয়া দিলে না ডুবিয়া ভাসিতে থাকিবে। হাত পা ছড়াইয়া জলের উপর বেশ ঘুমানো যায়।

ডেড্‌সি বা মরুসাগরের জলের উপর শুইয়া ছাতা মাথায় দিয়া লোকটী দিব্যি বই পড়িতেছে।

ক্যাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম ভাগে এলট্ হ্রদ। ইহাও একটি বিখ্যাত লবণাক্ত হ্রদ। এই হ্রদের জলের তলায় বালি নাই; আছে শুধু লবণের স্তর। এই স্তর বছরের পর বছর কেবল পুরু হইয়া উঠিতেছে। গ্রীষ্মকালে যখন সূর্য্যের উত্তাপে হ্রদের জল হু হু করিয়া কমিয়া যায় তখন হ্রদের

কিনারায় চারিদিকে লবণের পাহাড় বাহির হইয়া পড়ে। বছর বছর লক্ষ লক্ষ টন লবণ এই হ্রদ হইতে টানিয়া তোলা হয়, তবুও লবণের অংশ এতটুকু কমে না।

লবণাক্ত হ্রদের নাম করিতে গেলে আর একটি হ্রদের নাম না করিলে বিবরণ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। এই হ্রদটি লোণায় সকলকে ছাড়াইয়া গেছে। ইহা আমেরিকার বিখ্যাত Great Salt Lake। পরিধিতে ইহা ২৪৬ মাইল, অথচ গভীরতায় মোটে ৬ ফুট মাত্র।

আর একটি হ্রদের নাম করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ইহার নাম Lake Tchad বা চাঁদ হ্রদ। এই হ্রদটি আফ্রিকায় অবস্থিত। ইহার চারিদিকে এত জলা ভূমি যে ইহার পরিমাণ এখনো ঠিক করা যায় নাই। এই জলাভূমিগুলি (bogs) বড় ভয়ঙ্কর; চারিদিকের জমি কেবলই ভাঙিয়া পড়িতেছে; এমনভাবে যে কত গ্রাম নষ্ট হয় তাহার ঠিক নাই। এই গরুবাছুর লোকজন-পূর্ণ একখানি গ্রাম রহিয়াছে, আর পর মুহূর্ত্তেই হয়তো তাহা অদৃশ্য হইয়া গেল।

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্)

"ধীরে সুস্থে ঘড়িটা তুলে রাখ্‌লাম, স্বপ্নেও কিন্তু তখন ভাব্‌তে পারিনি যে সেটীর জন্যে সেই রাত্রিতেই আমার বাড়ীর ওপর আক্রমণ হবে। এখন অবশ্য বুঝ্‌তে পার্‌ছি এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না, কেননা ঘড়ি-চোরের, অর্থাৎ এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের, সদাসর্ব্বদাই সেইখানটাতে—প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীতে—যাতায়াত ছিল, ডাষ্ট্‌বিন্ থেকে আমাকে একটা ঘড়ি তুলে নিতে দেখা তার কিছুই বিচিত্র নয়, বরং স্বাভাবিকই। আমার মত একটা সর্ব্বনেশে লোককে ডাষ্ট্‌বিন্ থেকে কাঠির সাহায্যে ঘড়িটা তুলে নিতে দেখে নিশ্চয়ই সে যার পর নাই ভেব্‌ড়ে গিয়েছিল, ভেবেছিল এ ভাবে আল্‌গোছে ঘড়িটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের একটা গূঢ় কারণ আছে। তাই সে চুপি চুপি সেখান থেকেই আমাদের পেছু নিয়েছিল, সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে আমরা তার কিছুই টের পাইনি।

"আমরা ঘরে এসে ঢোকার পর পরস্পরের সঙ্গে যে সব কথাবার্ত্তা বলেছি আড়ি পেতে বারান্দায় লুকিয়ে লুকিয়ে চোর সে সমস্তই শুনেছে; বুড়ো আঙ্গুলের পাশে পাশে বরাবর সমানে যে দাগটা দেখা যাচ্ছে তার যখন উল্লেখ আমি কর্‌লাম তখন বেচারা নিশ্চয়ই ভয়ে নীল হয়ে গেছ্‌ল, কেননা সেটা যে বাস্তবিকই একটা বাড়্‌তি আঙ্গুলের দাগ সে খবর সঠিক জানা গেলে

বেশ একটু তার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই সে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মনে মনে দু দুটো জিনিষ ঠিক করে ফেল্লে—প্রথম, রাতারাতি যে করেই হোক্, দু নম্বরের ষ্টোভার ঘড়িটা আমার কাছ থেকে সরিয়ে ফেল্‌বে, আর দ্বিতীয়তঃ, তার ডান হাতে যে ছটা আঙ্গুল সে খবরটাও আপাততঃ কিছুদিনের জন্যে আমার চোখ থেকে লুকিয়ে রাখ্‌বে—সবে এক দিন মিনিট কয়েকের জন্যে তো তার সঙ্গে আমার আলাপ, কাজেই বুড়ো আঙ্গুলের পাশের অত ছোট্ট আঙ্গুলটী আমার লক্ষ্যে না পড়ারই কথা—আর বাস্তবিক তখন তা পড়েওনি। তাই সে সে রাত্রিতেই কনুই থেকে আরম্ভ করে সমস্ত হাতটা ন্যাক্‌ড়ার ব্যাণ্ডেজে ঢেকে ফেল্লে, একটা কাঠের ফ্রেম্ তার চার দিকে আঁট্‌লে, আর বলে বেড়াতে লাগল চল্‌তি বাস্ থেকে পড়ে তার হাত একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। আসলে এ সব মিথ্যে কথা, শুধু আমার চোখ থেকে বাড়্‌তি আঙ্গুলটা ঢাকবার জন্যে সে এ চাতুরী খেলেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই আমি তা বুঝ্‌তে পারিনি, বুঝেছি পরে, এবং কি করে তাও ক্রমশঃ বল্‌ছি। আমার এ কথাগুলি যে একেবারেই অভ্রান্ত তার প্রমাণ দেখ্‌বেন?” বলিতে বলিতে হুকা-কাশি বিরূপাক্ষের হাতের ন্যাকড়ার ফালিগুলি খুলিয়া ফেলিলেন—বিরূপাক্ষ বাধা দিল না, নির্জ্জীবের মত চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরেই রণজিৎ দেখিল, বিরূপাক্ষের হাত দিব্যি অক্ষতভাবেই রহিয়াছে, তাহাতে কোথাও এতটুকু আঁচড়ের দাগও নাই, এবং বুড়ো আঙ্গুলের পার্শ্বে বাস্তবিকই আরও একটী ক্ষুদে আঙ্গুল বিরাজ করিতেছে নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে শুধু সে একবার হুকা-কাশির দিকে তাকাইল:

একটু হাসিয়া হুকা-কাশি আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “হ্যাঁ, যা বল্‌ছিলাম—বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চোর ফন্দি দুটো এঁটে ফেল্লে। কল্‌কাতা সহরে টাকা ছড়াতে পার্‌লে ভাড়াটে গুণ্ডার অভাব হয় না, তারই কয়েকটী সংগ্রহ করে দুপুর রাতে আমার বাড়ীতে এসে এ মহা উৎপাৎ বাধাল; কিন্তু ঘড়িটী সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে না। এদিকে বেশী সময় সে থাক্‌তেও পারে না, কেননা যদি কোন গতিকে আমি তাকে একবার চিনে ফেলি তা হলেই সর্ব্বনাশ; আর তা ছাড়া ভোরে গিয়েই যে আবার তাকে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী হাজরে দিতে হবে! আমায় নিয়ে কোথাও লুকিয়ে রাখাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কেননা ভাড়াটে গুণ্ডাদ্বারা ওকাজটী হয় না।

“কিছু বেলা হলে পর আপনি এসে আমাদের মুক্তি দিয়ে ভূপেশ বাবুর চিঠিখানা দেখালেন। চিঠি পড়েই কিন্তু বেশ বুঝ্‌লাম ভূপেশ বাবু ভুল করেছেন—আসল চোরের উদ্দেশ তিনি পাননি, অন্য কাউকে সন্দেহক্রমে আটক করেছেন। সাদা কথায় সমস্ত ব্যাপারটা কি?—একটা দোকানে ভূপেশ বাবু তাঁর একটা পুরানো ঘড়ি সারাতে দিয়েছিলেন; ইতি মধ্যে কোন লোক সেই ঘড়ির ডালার নীচে অতি সঙ্গোপনে খুব দামী অথচ গোপনীয় একটী জিনিষ লুকিয়ে রাখল। পরে

সেটাকে বার করে নেবার আগেই কিন্তু ঘড়ি দোকান থেকে মালিকের কাছে চলে গেল। তাই সে সন্ধান নিয়ে নিয়ে গভীর রাতে মালিকের বাড়ী উপস্থিত হয়ে ঘড়ির ভেতর থেকে সেই লুকানো জিনিষটা বার করে বাগানের ভেতর ঘড়িটা ফেলে দিয়ে গেছে—এই তো? এ যদি হয়, তবে ঘড়ি-চোর এর পরে কি জন্যে আর ভূপেশ বাবুর বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়াতে যাবে? সেখানে আর তার কোন্ কাজ? কাজেই বুঝলাম, ভূপেশ বাবু সন্দেহক্রমে অপর কাউকে পাক্‌ড়ে আমাদের খবর দিয়েছেন। কিন্তু তবু তাঁর কাছে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনায় দুজনে সেখানে গেলাম। আমার অনুমান যে সত্যি তা নলকোপার শ্রীশ চাটুয্যেকে সেখানে দেখেই টের পাওয়া গেল।

ভূপেশ বাবুর ওখান থেকে বার হয়ে আপনাকে বাড়ী ফির্‌তে বলে আমি সোজা ভবানীপুরের বাস্ ধর্‌লাম—বোটানীর অধ্যাপক মশায়ের বাড়ী যাব বলে। এ অধ্যাপক মশায়টী আপনাকে দেখ্‌ছি বড়ই ভাবিয়ে তুলেছেন, এ বিষয়টাতে কি ভাবে যে তিনি আমায় সাহায্য কর্‌তে পারেন, তা ভেবে ভেবে আপনি কোনই কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। আসলে ব্যাপারটী এই যে এ ভদ্র-লোকটী দিবারাত্র নানা রকমের যন্ত্র-পাতি নিয়ে গাছের পাতায় কোথায় কোন্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখা আছে শুধু তারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন। এমন্ চমৎকার চমৎকার যন্ত্র এঁর কাছে রয়েছে যাতে করে পিঁপ্‌ড়েটিকেও হাতীর মত বড় করে তোলা চলে। কাজেই ভাব্‌লাম, ডাষ্টবিনে কুড়িয়ে পাওয়া ঘড়িটার ওপর যে অস্পষ্ট দাগ উঠেছে সেটা বাস্তবিকই চোরের ডান হাতের বাড়্‌তি আঙ্গুলের দাগ কিনা তা যাচাই কর্‌বার পক্ষে এমন লোক আর পাব না। অবশ্য গোটা কল্‌কাতা সহরে এ বিষয়ে আমায় সাহায্য কর্‌তে যে আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি নাই এমন কথা আমি একবারও বল্‌ছি না, তবে আমার পরিচিতের ভেতর যে তেমন ধারা কেউ নেই তা নিঃসন্দেহ। তবে জানেন বোধ করি, অপরিচিত বা অর্দ্ধপরিচিত কারো সঙ্গে কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা দূরে থাক্, সে সম্বন্ধে কথাটী পর্য্যন্ত বলা আমার স্বভাব নয়।

রওনা হতেই দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই ভদ্রলোককে গিয়ে আর বাড়ী পাওয়া গেল না; তবু তাঁর ভাইকে জিজ্ঞাসা করে কখন তিনি কোথায় থাকেন একটা কাগজের টুকরায় তা বেশ করে টুকে নিলাম—প্রাতে ৬টা থেকে ১০টা পর্য্যন্ত বাড়ীতে, ১১টা থেকে চারটে পর্য্যন্ত বালীগঞ্জের ল্যাবোরেটারীতে বা কলেজে, সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার পর আবার বাড়ীতে—ইত্যাদি। এগারটার কিছু পরেই বালীগঞ্জে গিয়ে তাঁকে পাকড়াও করা গেল—তখন ল্যাবোরেটারীতে আর কোন তৃতীয় প্রাণী নেই। আধঘণ্টা বাদে যখন সেখান থেকে বেরোলাম তখন অবিসম্বাদিত ভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আমার ধারণাই অভ্রান্ত, অর্থাৎ সে দাগগুলি বাস্তবিকই কোন লোকের বাড়্‌তি ক্ষুদে আঙ্গুলের দাগ।

"ব্যাপারটা তা'হলে দাঁড়াল এই—ভূপেশ বাবুর ঘড়িটী যখন দোকানে মেরামৎ হতে এসেছে তখন এক ছ'আঙ্গুলে লোক খুব গোপনে ছোট্ট একটী দামী জিনিষ ঘড়ির ডালার নীচে পূরে

ডালার নীচে বন্ধ করে...

সেটাকে বন্ধ করে রেখে ছিল। 'কেন' সে কথা পরে হবে। বটে তো? আচ্ছা, একটা কথা আপনার মনে জাগ্ছে কি? ঘড়ির দোকানে ঢুকে কোন ঘড়ির ডালার নীচে অপরের অলক্ষ্যে কোন জিনিষ লুকিয়ে রাখ্বার সুযোগ মানুষে কখন পায়? নিতান্ত অপরিচিত হলে এমন সুযোগ পায় কি? অপরিচিত লোককে তার খুসী মত মেরামতের ঘড়ি নাড়াচাড়া করতে দেবে কেন? কাজেই সে ছ'আঙ্গুলে লোকটা নিশ্চয়ই ঘড়িওয়ালার পরিচিত—কেমন, যুক্তিতর্কে তাই মনে হয় না?"

রণজিৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হয়।"

"তা হলে ব্যাপারটা আরো অনেকখানি সোজা হয়ে দাঁড়াল এই যে, ঘড়ি চোরের শুধু ডান হাতেই ছটা আঙ্গুল নয়, সে ঘড়িওয়ালার পরিচিত লোকও বটে। আচ্ছা রণজিৎ বাবু, আপনার জানাশুনো ছ'আঙ্গুলে মানুষ কটা আছে?"

রণজিৎ একটু ভাবিয়া কহিল "কই, একজনাকেও তো মনে কর্তে পার্ছি না!"

হুকা-কাশি হাসিয়া বলিলেন, "হুঁ; শুধু আপনি বলে নন, ঘড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা কর্লে দেখ্বেন সেও এই জবাবই দেবে যে তার জানাশোনার ভেতরেও এহেন লোক নিতান্ত দু'একজন ছাড়া নেই। কি করে থাক্বে বলুন, ডান হাতে ছটা আঙ্গুল নিয়ে মানুষ তো আর কিছু ঝাঁকে ঝাঁকে জন্মায় না, অল্প সংখ্যক লোকই সে রকমের থাকে।

"বাড়ী ফিরে এসে খাওয়াদাওয়ার পাট সেরে দিব্যি চোস্ত একটী হিন্দুস্থানীর ছদ্মবেশ পরে ফেলা গেল—ময়লা কাপড়ের ওপর আন্কোরা মের্জাই, রেড়ির তেলে ভেজানো রাম-নাগরা, গলায় হাতে ঘুন্সি তাগা—কিছুই বাদ পড়্ল না। আর্শিতে চেহারা দেখে গেছি আর কি! কে বলে মুঙের জিলার ভডাস্ ডার্হীতে আমার মুলুক নয়। কপালে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়ে নিলাম, যেন এই সবে কালীঘাট থেকে ফির্ছি। তার পর ধীরে ধীরে ঘড়িওয়ালার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হতে আর কতক্ষণ? ঘড়িওয়ালা লোকটার আর যাই থাক্ বুদ্ধি জিনিষটা যে রাশি রাশি নেই তা বোধ হয় প্রথম দিনেই আপনি টের পেয়েছেন। দেড় টাকা দামের ঘড়ি মেলে কিনা সেই প্রশ্ন কর্তে দোকানে উঠে ক্রমে তার সঙ্গে দুনিয়ার গল্প ফেঁদে বস্লাম। যখন দেখ্লাম গল্পে সে বেশ একটু মজেছে তখন বল্লাম, 'আজ বড় বাজারে এক সাধু একটা মাদুলী দিয়েছে, সাধু বাবার আদেশ কোন ছ'আঙ্গুলে লোককে দিয়ে সে মাদুলী পরাতে হবে; তা আমি কল্কাতায় নয়া লোক, সে রকম ধারা কোন লোকের সন্ধান তো রাখিনে। বাবুজী যদি মেহেরবাণি করে সে রকম কারো নাম বলে দেন তো...।'

ঘড়িওয়ালা একটু ভ্রূ কুঁচ্কে জবাব দিলে, 'আছে তো বাপু সে রকম আমারই জানা লোক একজন, আমার দোকানে হর্দম্ যাওয়া আসাও আছে তার, কিন্তু সে যে ভদ্দর লোক—তোমার সুবিধে হবে কি সেখানে?' আমি বল্লাম, 'হোক ভদ্দর লোক, গিয়ে পা জড়িয়ে ধর্লেই রাজী হয়ে যাবে।' লোকটা তখন রাস্তায় নেমে এসে আঙ্গুল দিয়ে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীটা দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ওই বাড়ীতে গেলেই পাবে তাকে। নাম বিরূপাক্ষ বাবু—রোজ বারাকপুর থেকে কাজের জন্যে এইখানে আসা যাওয়া করেন।'

ঘড়িওয়ালার কথা শুনে প্রথমটা আমি যে স্তম্ভিত হয়ে গেছ্লাম সে কথা অস্বীকার কর্ব না, কিন্তু তার পরেই যেন ধীরে ধীরে আমার চোখের সমুখ থেকে পর্দা খুলে যেতে লাগ্ল—বুঝ্লাম কেন য়্যাক্সিডেন্টের নাম করে এ ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধে ডান হাতটা আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে। প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ীর দিকে খানিক তাকিয়ে থাক্তেই দেখি আপনি বার হয়ে আস্ছেন। ঘড়িওয়ালা বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে তার দোকানে ফিরে গিয়েছিল। চট্ করে আমার মাথায় একটা ফন্দি চেপে গেল, ভাব্লাম বিরূপাক্ষ আচার্য্যের পেছনে লাগ্বার আগে আপনাকে দিয়েই আমার ছদ্মবেশটা পরীক্ষা করে নেব—এম্নি ভাবে আপনার পেছু নেব যাতে করে আপনার মনে আমার সম্বন্ধে

সন্দেহ জেগে ওঠে। যদি দেখি খুব খুঁটিয়ে দেখার ফলে আপনি আমায় চিনে ফেলেছেন তবে এ বেশ চলবে না, চেহারা আর একটু বদ্‌লে নিতে হবে। আর যদি চিন্‌তে না পারেন, তাহলে অক্লেশে এ পোষাকেই আমার আসল কাজটী হাসিল করতে পারব।

(ক্রমশঃ)

শিল্পী রামকুমার

সেদিন কলিকাতার একটা সভায় ভারী মজার এক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। একজন ভদ্রলোক 'ছদ্মবেশ ধারণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন। বক্তৃতা দিতে দিতে হঠাৎ তিনি পাশের পর্দ্দার আড়ালে চলিয়া গেলেন। খানিক বাদে সভার লোক বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া দেখিল, বক্তৃতা মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া পরলোকগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তখন, বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা কাটিলে বুঝা গেল যিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া 'ছদ্মবেশ' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন, তিনিই এই ফাঁকে দেশবন্ধুর চেহারা লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

দেশবন্ধু।

এই অদ্ভুত শিল্পীটীর নাম রামকুমার, বাড়ী মান্দ্রাজ অঞ্চলে। অপরের চেহারার নকল করিতে ইঁহার সমকক্ষ শিল্পী ভারতবর্ষে তো নাই-ই, সারা পৃথিবীতেও খুব কমই আছে। জার্ম্মেনীতে অনেকদিন থাকিয়া তিনি এই বিদ্যায় পাকা হইয়াছেন। বায়োস্কোপের বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান অভিনেতা এমিল্ জেনিংস্‌এর নাম হয়তো তোমরা অনেকেই শুনিয়াছ। রামকুমারের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া এমিল্ জেনিংস্‌এর

খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁকে নিজের দলে টানিয়া নেন, কিন্তু রামকুমার সে অনুরোধ কাটাইয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছেন।

কিছুদিন হইল ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ পত্রিকায় রামকুমার ভিন্ন ভিন্ন ছদ্মবেশে কেমন সাফল্য লাভ করিয়াছেন তার কতগুলি ছবি বাহির হইয়াছিল। সেগুলি দেখিলেই বুঝা যায় কী উঁচুদরের শিল্পী এই লোকটী। শিকাগো সহরের গুণ্ডারূপে তিনি ফটো তুলিয়াছেন, দেখিলে মনে হয় গুণ্ডামী ভিন্ন বুঝি জীবনে আর তিনি কিছু করেনই নাই। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির ছদ্মবেশ ধরিয়া ইনি সবাইকে তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। এই কলিকাতা সহরেই একবার এক মেয়ের ছদ্মবেশ ধরিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিনেমা দেখিয়া আসিলেন, এত লোক তাঁর সম্মুখ দিয়া আসিল গেল, তাঁর পাশে বসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইল, কিন্তু আসলে তিনি যে মেয়ে নন্, পুরুষ, এ খবরটী টের পাওয়া কারো সাধ্যেই কুলাইল না।

আমাদের মনে হয় সব চাইতে রামকুমার কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন ডাঃ কাজিন্‌সের ছদ্মবেশে। ডাক্তার কাজিন্‌স্ একজন নামজাদা শিল্প-বিশারদ্—রোগাটে পানা লোকটী। এদিকে রামকুমার ঈশ্বরের ইচ্ছায় বেশ একটু হৃষ্টপুষ্ট। অথচ এম্‌নি কৌশলে তিনি এই রোগা লোকটীর ছদ্মবেশ ধরিয়াছেন যে, কে বলিবে তিনিই ডাক্তার কাজিন্‌স্ নন! ডাঃ কাজিন্‌স্‌কে আমরা দেখিয়াছি, নিঃসন্দেহে বলিতে পারি রামকুমারের ওই ছদ্মবেশ দেখিলে আমরা স্রেফ্ ফেল্ মারিতাম্।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

রোল্যাণ্ডের নৃত্য

গ্যাল্‌ওয়ের মনে হইল জীবনে বোধ করি এর চাইতে বড় সমস্যায় তিনি আর কখনো পড়েন নাই। চিঠিখানার উপরে লণ্ডন পোষ্ট অফিসের সীল রহিয়াছে। বাস্তবিকই এখানা কি কেউ লণ্ডন হইতেই পাঠাইল, না কি আর্থারই কোন লোক দিয়া লণ্ডনের ডাক বাক্সে এখানাকে ফেলিয়াছে? এ কি আর্থারেরই কারসাজি না চোর

"রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক ? না স্যার, সে সাচ্চা মানুষ ; জগতের আর সবাই রোল্যাণ্ডের মত সাচ্চা হলে দুনিয়াটা ঢের ভাল জায়গা হয়ে দাঁড়াত।"

রোল্যাণ্ডের পক্ষে টাকা নেওয়া যে সম্ভব নয় সে কথা মিষ্টার গ্যাল্ওয়ে নিজেও বেশ জানিতেন, তবু কথাটা জিজ্ঞাসা করিলেন এইজন্য যে আর্থারের সঙ্গে তার বড় বেশী ভাব। আর্থার আবার বলিল, "ব্যাপারটাকে এইখানেই চাপা দিন স্যর, টাকাটা তো খোয়া গেল না,—ফিরেই যখন পাওয়া গেল।"

"টাকা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু যে সময়, যে মেহনৎ, এর পেছনে নষ্ট হয়েছে তাতো ফিরে পাওয়া যায়নি, তার দাম দেয় কে ?"

"আর আমার দিকে তাকান দেখি একবার স্যর ! আমার সময়-মেহনৎ তো গেছেই, সঙ্গে সঙ্গে চাক্‌রীটী, এবং তার চাইতেও বড় জিনিষ সুনামটী পর্য্যন্ত গেছে।"

"কিন্তু গেছে কার দোষে ? অক্লেশেই তুমি তোমার নির্দ্দোষিতা সবার সাম্‌নে প্রমাণ কর্‌তে পার্‌তে ?"

ইহার একটু পরে মিষ্টার গ্যাল্ওয়ের ঘর হইতে আর্থার বাহির হইবামাত্র রোল্যাণ্ড্ তাহাকে পাকড়াও করিল। কর্ত্তা হঠাৎ আর্থারকে ডাকাইয়া আনিয়া নিজের ঘরে নিয়া দরজা বন্ধ করিলেন—ব্যাপার কি ? কৌতূহলের বশে রোল্যাণ্ড্ এতক্ষণ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল, এইবার আর্থারকে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি কথা কইছিল হে মুট্‌কো এতক্ষণ তোমার সঙ্গে ?"

"আরে ভাই, সে অনেক ব্যাপার ! যে চোর কর্ত্তার টাকা চুরি করেছিল সে নাকি সমস্ত টাকাটা ওঁকে ফেরৎ পাঠিয়েছে।"

রোল্যাণ্ড্ প্রথমটা হাঁ করিয়া আর্থারের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ এক খানা হাত আর্থারের কাঁধের উপর তুলিয়া দিয়া, এবং অপর হাতটীতে তার পিঠ্‌টি জড়াইয়া ধরিয়া সেই টেবিল চেয়ারের জঙ্গলের ভিতরেই নৃত্য জুড়িয়া দিল।

আর্থার বিপন্ন হইয়া কহিল, "আরে থামো থামো, নাচ রাখ।"

"না ভাই থাম্‌ব না আজ, আমি নাচ্‌ব, আমায় নাচে পেয়েছে। অতি মহৎ চোর।"

আর্থার আবার বলিল, "কিন্তু কর্ত্তার সন্দেহ এখনো আমার ওপর থেকে যায়নি !"

এক মুহূর্ত্তে রোল্যাণ্ডের নাচ বন্ধ হইয়া গেল, সে বলিল, "এখনো সন্দেহ যায়নি ! অতি ছুঁচো লোক রে মশাই, অতি ছুঁচো লোক ! চল আর্থার, আমরা দুজনা একত্রে এ ছুঁচোর রাজ্যি ছেড়ে পোর্ট-নেটালে চলে যাই। দেশটার ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।"

কিন্তু আর্থারের আপাততঃ আফ্রিকার অন্তর্গত পোর্ট-নেটালে যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না, সে ধীরে ধীরে রোল্যাণ্ডের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ীর পথে রওনা হইল।

এই ঘটনারই দিন কয়েক আগের কথা। রেভারেণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্ক্ সেই যে সেদিন কন্‌স্‌ট্যান্সকে বলিয়াছিলেন যে তার সহিত তাঁহার বিশেষ একটা কথা আছে, সেই হইতে নানা কাজের মধ্যেও কন্‌স্‌ট্যান্সের মনে থাকিয়া থাকিয়া শুধু এই কথাটাই উঁকি দিতেছিল যে আজ হঠাৎ এতদিন বাদে তার সহিত মিষ্টার ইয়র্কের এমন কি দরকার পড়িল ! সেদিন প্রাতে সাম্‌নের বারান্দায় বসিয়া এই কথাটাই সে ভাবিতে-ছিল, এমন সময় দেখা গেল টুপি হাতে লইয়া রেভারেণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্ক তাহারই দিকে আসিতেছেন।

কন্‌স্‌ট্যান্স্ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মিষ্টার ইয়র্ক বার দুই ঢোঁক্ গিলিয়া বলিলেন, "তোমার মনের অবস্থা এখন যে খুবই খারাপ তা আমি জানি, কন্‌স্‌ট্যান্স্, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা খবর তোমায় জিজ্ঞাসা না করে আমি থাক্‌তে পার্‌ছি না…শুন্‌লাম… (মিষ্টার ইয়র্কের ঢোঁক গেলা এইখানে চার গুণ বাড়িয়া গেল) "—শুন্‌লাম নাকি লর্ড্ ক্যারিকের সঙ্গে তোমার বিয়ের পাকাপাকি কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে ?"

চার্লির দুর্ঘটনার দরুণ মনের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় না হইলে কন্‌স্‌ট্যান্স্ বোধ করি এ কথার পর আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কিন্তু সে হাসিল না, গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, তাই কি ?"

"কিন্তু…কিন্তু কন্‌স্‌ট্যান্স্, লর্ড্ ক্যারিকের সঙ্গে তোমার বিয়ে তো হতে পারে না !"

"আমায় মাপ কর্‌বেন মিষ্টার ইয়র্ক্, আমার বিবেচনায় এ সম্বন্ধে কিছু বলার

আপনার কোনই অধিকার নেই। আমার সঙ্গে আপনার কি শুধু এই একটাই কথা বল্‌বার ছিল, না আরো কিছু আছে?" (পূর্ব্বের ঘনিষ্টতা না থাকায় কন্‌স্ট্যান্স্ 'আপনি' বলিল)

"আছে। আমি চাই মাস কয়েক আগে যেমনটী ছিল, আবার তাই হোক্— সে সময় তুমি আমার স্ত্রী হতে সম্মত ছিলে, কন্‌স্ট্যান্স্, এখনও রাজী হও"

"কিন্তু তা তো হয় না, মিষ্টার ইয়র্ক্, যতদিন আমার ভাইয়ের মাথার ওপর এ কলঙ্কের বোঝা চাপান রয়েছে, যতদিন না তার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হচ্ছে, ততদিন সমাজে আপনার মাথা নীচু হয়ে থাক্‌বে আমারই জন্যে—এতে কি করে আমি রাজী হই বলুন!"

"তুমি বুঝ্‌ছ না, কন্‌স্ট্যান্স্, এমনও তো হতে পারে যে আর্থারের নির্দ্দোষিতা এ জীবনে আর প্রমাণিতই হবে না।"

দুঃখে কন্‌স্ট্যান্সের চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল, কোন মতে সে তাহা সাম্‌লাইয়া বলিল "তা হলে এ জীবনে আমাদের আলাদা হয়েই থাক্‌তে হবে, মিষ্টার ইয়র্ক্।"

মিষ্টার ইয়র্ক্ অনির্দ্দিষ্ট ভাবে কিছুকাল শূন্যের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে টুপিটি হাতে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

কাঠের বিজ্ঞাপন

যুক্তরাষ্ট্রের এক কাঠের কোম্পানী তাঁদের কাঠের ভারী অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দিতেছেন। কাঠের বিজ্ঞাপন—তাই তা লেখাও হইতেছে কাঠের কাগজে কাঠের অক্ষরে। কাঠ চিরিয়া পাৎলা কাগজের মত করিয়া তার উপর সেই কাঠের বিজ্ঞাপন লেখা হইতেছে। এই কাঠের কাগজ এত পাৎলা যে পর পর আশী খানা একত্র সাজাইলে তবে তা' এক ইঞ্চি পুরু হয়।

কাঠের যীশু-জীবনী

গ্রীস্ দেশের এক পাদ্রী সাহেব পনের বছর ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া একখানা কাঠের উপর যীশু খ্রীষ্টের জীবনের সমস্ত বড় বড় ঘটনা খোদিত করিয়াছেন। এই ছবিখানা কিনিবার জন্য অনেকে ৬ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পাদ্রী তাহা লইতে রাজী হন নাই।

সুগন্ধি প্রজাপতি

কীটপতঙ্গদের মধ্যে দেখিতে বোধ হয় প্রজাপতিই সব চাইতে বেশী সুন্দর;—ঠিক যেন একরাশ ফুল, নয় কি? তোমরা শুনিলে অবাক্ হইবে সত্যি সত্যিই কোন কোন জাতের প্রজাপতি ফুলের মত চমৎকার গন্ধ ছড়াইতে পারে। এই প্রজাপতি যেখানে আসিয়া বসে সেখানেই তার গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া যায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই প্রজাপতি খুব বেশী চোখে পড়ে। আমাদের দেশে সিংহল ও আসাম অঞ্চলেও মাঝে মাঝে ইহাদের দেখা পাওয়া যায়।

কাণের দূরবীণ

দূরের জিনিষ দেখিবার জন্য যেমন আমরা দূরবীণ ব্যবহার করি, তেমনি দূরের শব্দ শুনিবার জন্য কিছুদিন হইল এক অদ্ভুত নতুন ধরণের যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমেরিকার একজন বৈজ্ঞানিক ইহা বাহির করিয়াছেন। এই যন্ত্র কাণে লাগাইয়া রাখিলে অনেক দূরের কথাবার্ত্তাও বেশ স্পষ্টভাবে এবং জোরে শোনা যায়।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

[গ্রাহকগ্রাহিকাদিগকে একটী কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে বলি—লেখার সহিত **গ্রাহক নম্বর** লিখিতে ভুল হইলে সে লেখা কখনো ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠকে উঠে না,—আমরা ভাবিয়া লই লেখক গ্রাহক নন্]

বাঁশীর সুর

(শ্রীঅনিলকুমার সরকার, হাওড়া)

সন্ধ্যাবেলায় শুন্‌তে পেলাম মোহন বাঁশরী
স্তব্ধ মাঠে মধুর পুলক লাগ্‌ল আমার-ই।

চল্‌ছিল মেঘ ভেসে ভেসে,
বাঁশীর সুরে থাম্‌ল এসে ;—
আপনাকে হায়, সন্ধ্যাবেলায় গেলাম পাশরি।

বাজতেছে গো বন-নিরালায় মুক্তি ভরা সুর,
অন্ধকারে বাঁশের ঝাড়ে তুতুর্‌ তু আ তুর্‌।
কোন্‌ উদাসী বাজায় বাঁশী,
মনের সাধে একলা আসি ;
কর্‌লে আমার পথশ্রান্তি, ক্লান্তি যত দূর।

মিহি নূসুরে ঝিম্‌ লাগায়ে বাজছে বাঁশী হায়,
শুন্‌ছি আমি, পথেই থামি বিভোর আপনায়।
নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে,
রোশ্‌নায়ের-ই ফুল ফুটেছে,—
হঠাৎ বাঁশীর কান্না হাসি সকল থেমে যায়—
(আমার) পা চলে না, মন সরে না, নয়ন উথলায়॥

রামধনু

(শ্রীশ্রীগোপাল মিত্র, বারদ্রোণ—২৪ পরগণা)

ছুটো ছোট্ট মেঘের মেয়ে
এলো আনন্দেতে ধেয়ে,
নীল আকাশপথ বেয়ে
তারা আলোধারায় নেয়ে।
তাদের মুক্ত কেশ পাশ ;
ছুটে পশ্চিমে বাতাস
দিল উড়ায়ে চারিদিকে

তাদের কালো চুলগুলিকে।
হ'তে আকাশের দুধার
তারা ছুটল পরস্পর ;
তারা ছুটল এত বেগে,
তাদের মাথা মাথায় লেগে
বসে পড়্‌ল সেথা তারা
ব'লে নয়নে জল-ধারা।

তখন আকাশের ওধার
বসে সূর্য্যিমামা তার
ঢেলে দি'ছিল আলো করা
সারা ধরা-উজল-করা।

দেখে কাঁদতে তাদের কে
ডেকে বল্‌লে দুজনকে—
"আহা কান্না কেন আর
দোষ বল'ত আর কার ?
এখন চুপ ক'রত বাছা,
নয়ত পেতেই হ'বে সাজা।
দিই ডেকে পরীর দল
তারা মুছিয়ে দেবে জল।"
এল প্রথম এক পরী
তার বেগুণে বেশ পরি',
একটি নীল পোষাকে সেজে
এল আনন্দেতে নেচে।
এল লাল সবুজ পীতে

এল গোলাপী আদিতে ;
এমনি সাত রঙের বেশে
এল সাতটি পরী হেসে।
তখন সেই পরীর দল
মুছায়ে দিল চোখের জল।
কাপড় ভিজে চোখের জল
দিল আকাশ 'পরে মেলে
সূর্য্য কিরণ রেখা 'পরে
তারা একটি সার ধরে।

হেথা ধরার মেয়ে ছেলে
বল খাবার খেলা ফেলে ;
দেখে আকাশে রংখেলা
তারা জুটলে এসে মেলা।
একটি শুধাল তার মায়,—
"ওকি বল্‌না মা আমায় ?"
হেসে বললে মা "ও মনু,
ওরে বলে যে 'রামধনু'।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রাজা ও রাণী দু'জনের কথাই ঠিক। রাজা জ্যান্ত পাখী আর জ্যান্ত বেঙের কথা বলেছেন ; রাণী বলেছেন—জান্‌লার খড়খড়ির পাখী আর দরজার বেঙের কথা।

উত্তরদাতাদের নাম

বীরেন্দ্রনাথ হালদার (কলিকাতা), শান্তিলতা ঘোষ (কলিকাতা), নিরুপম লাহিড়ী (মাহিগঞ্জ), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), প্রভাত, শিশির, মমতা, ধীরেন্দ্র, জলধি, প্রীতি, আরতি, সন্ধ্যা দে (দেশরি), বীণাপাণি, মহাদেব, ভূদেব চৌধুরী (পাবনা), অরুণ, প্রফুল্ল, সুনীল, সুধাংশু, হাসি, মণ্টু (পাটনা) প্রমথ, প্রমোদ, মাণিক, শিবু, জগদীশ, রমেশ, গুপী, নিমাই (নবদ্বীপ), কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের), আড়াই হাজার যুবক-

সঙ্ঘের সভ্যগণ (আড়াই হাজার, ঢাকা), প্রসাদদাস সেনগুপ্ত (কলিকাতা), অঞ্জলিকুমার বসু (হাজারিবাগ), সুকুমার সেনগুপ্ত (মুঙ্গের), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), সমরনাথ দাস (আমদা), মুগবেড়িয়া ম্যাগাজিন ক্লাব (মুগবেড়িয়া), অনিলচন্দ্র সরকার (লক্ষ্ণৌ), মনীষা সেন (গৌহাটী), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), হিমাংশুকুমার মল্লিক (কলিকাতা), প্রতিমা, রমা ও তারাপদ সেন (হাজারিবাগ), সুনীলকান্তি ও শান্তিরাণী পাল (কলিকাতা), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), অজয়, অজিত ও সুজিত পুরকায়স্থ (শিলচর), অমরনাথ চৌধুরী (শ্যামবাজার), এন্, বসু (মজঃফরপুর), আশা বসু (লক্ষ্ণৌ), বনা, মনা, ধনা (নাগপুর), সুকুমার ও করুণা (বেড়া), শৈলেশকুমার বসু (কলিকাতা), বীণাপাণি বসু (বেতিয়া), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গোপাড়া, ঢাকা), স্মৃতিকণা, "পীণ্টু শক্তি নাগ (ঢাকা), বিমল, অমল, নির্ম্মল, কমল ও তুষার (শিলং), স্নেহ, সুধা, মায়া, শিব, সমি ও অমি সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর), সুরমারাণী রায় (ওয়ালটেয়ার), দুলালচন্দ্র দত্ত (শিবপুর), সুষমা দেবী (ভবানীপুর), অমল, প্রতিভা, সুপ্রভা, সাবিত্রী সেন (এলাহাবাদ), আনয়ার-হুসেন, জেবুন্নিসা ও ফয়জন্নেছা (কুয়ার পাড়, শ্রীহট্ট), বেলারাণী মিত্র (শ্যামপুকুর), পরেশনাথ রায় চৌধুরী (বিষ্ণুপুর), অমিয়কুমার বরাট (পাটনা), সুশীল, সলিল, সমরেন্দ্র, রামদাস, কালিদাস, শ্যামসুন্দর, ভবেশ হৃষীকেশ (করিমগঞ্জ), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর), যশোমাধব সাহিত্য সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), ভবেশচন্দ্র রায় (তাহিরপুর, রাজসাহী)।

নূতন ধাঁধা

(শ্রীঅতনুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সে জিনিষটি খেতে মোটেই মিষ্টি নয়; কিন্তু গোড়াটুকু ফেলে দিয়ে খাও, দেখ্‌বে ভারী মিষ্টি লাগ্‌ছে। বল ত কি সে জিনিষ ?

পুস্তক-পরিচয়

(শ্রীন———)

যাদুকর ঃ ছোট গল্পের বই। শ্রীযতীন সাহা প্রণীত, প্রাপ্তিস্থান এম, সি, সরকার। দাম আট আনা।

যাঁরা ছোটদের কাগজগুলি প্রতি মাসে দু'একবার করে উল্টেপাল্টে দেখেন, তাঁদের কারও কাছে যতীন বাবুর নাম অজানা নয়। শ্রদ্ধেয় মণিলালের কলম বন্ধ হবার পর, এমন ভূতের গল্প আর পড়িনি। বেশ মনে আছে বইখানা পড়ে লেখক মহাশয়কে বলেছিলাম, "আপনাদের দিকে বুঝি খুব ভূত পাওয়া যায়!—না?"—কল্পনাকে যে এমন ভাবে বাস্তবের মূর্ত্তি দিতে পেরেছেন, এটা যতীন বাবুর বাহাদুরী বল্‌তে হবে। লিখ্‌তে বসে, এখনও আমার চোখের সাম্‌নে 'মায়ের পূজার' মা কালীকে দেখ্‌ছি, 'নূপুরওয়ালা ভূতের নূপুরের আওয়াজ শুন্‌ছি! যাদুকর বাস্তবিকই শিশুদের চোখে 'যাদু' বলেই মনে হবে।

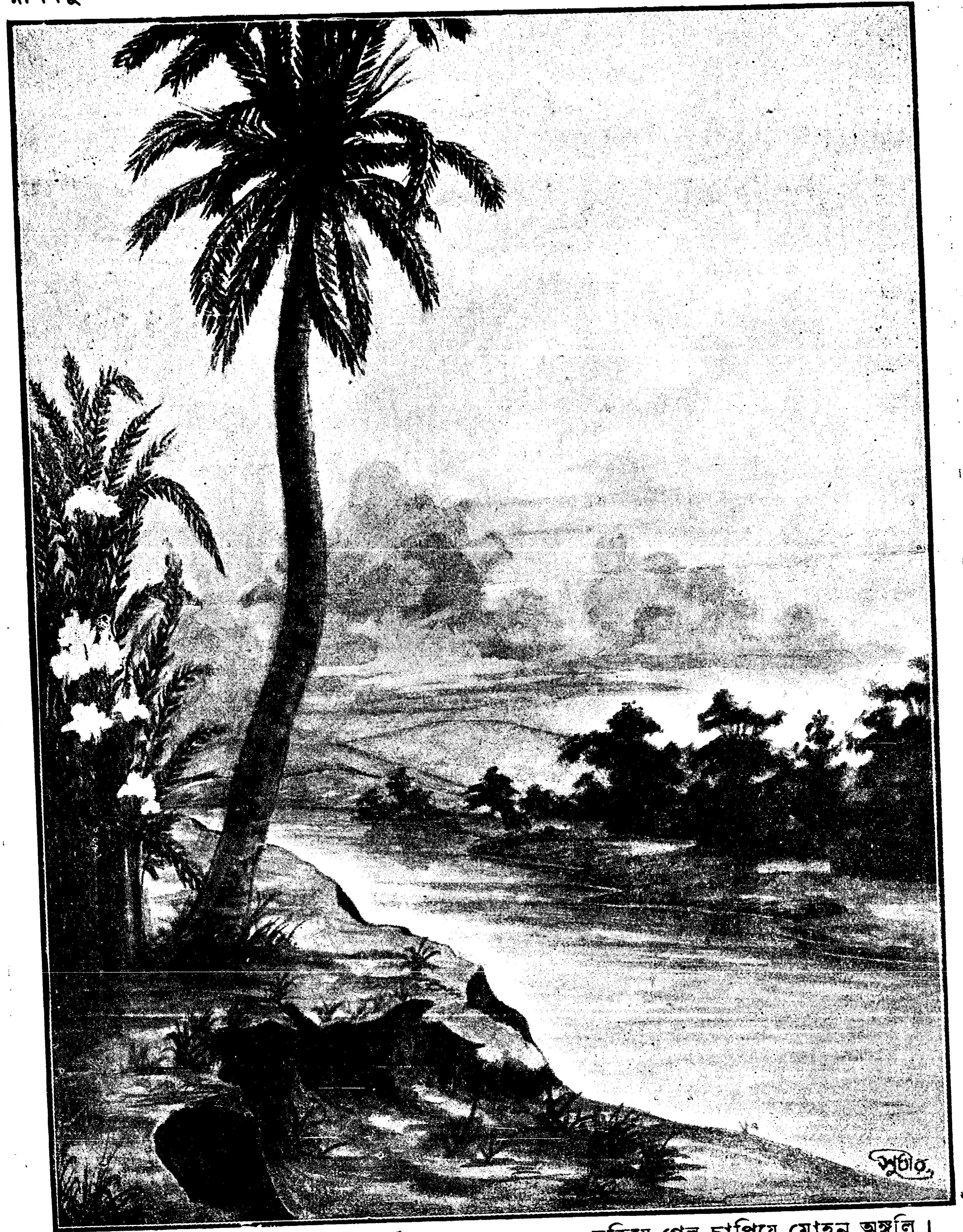

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি,
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।
—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

৪র্থ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৮ { ৯ম সংখ্যা

'রায়বেঁশে' দল

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

(এখন ইহারা বিবাহের মিছিলের সঙ্গে নৃত্য করে, কিন্তু একদিন উহাদেরি ভয়ে বড় বড় বীর যোদ্ধাদের পর্য্যন্ত থরহরি কম্প উপস্থিত হইত। উহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব-ব্যঞ্জক নৃত্য বাঙ্গলার গৌরব ও নিজস্ব সম্পদ্। বীরভূমের সাহিত্যিক-কালেক্টর মিঃ গুরুসদয় দত্তের অক্লান্ত চেষ্টায়.এই রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়াম স্কুলে স্কুলে প্রচলিত ও সমাদৃত হইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই নৃত্যের পক্ষপাতী।—লেখক)

ওরাই রাঢ়ের রায়বেঁশে দল, নিত্য বিয়ের সঙ্গে নাচে,
দেখায় বীরের চাতুর্য্য সে, দীনের মত পয়সা যাচে,
নূপুর পায়ে, ঘাঘ্‌রা পরে, নাচে কভু নারীর মত,
কভু আবার লাঠির ঘায়ে দেখায় তাহার শৌর্য্য কত!

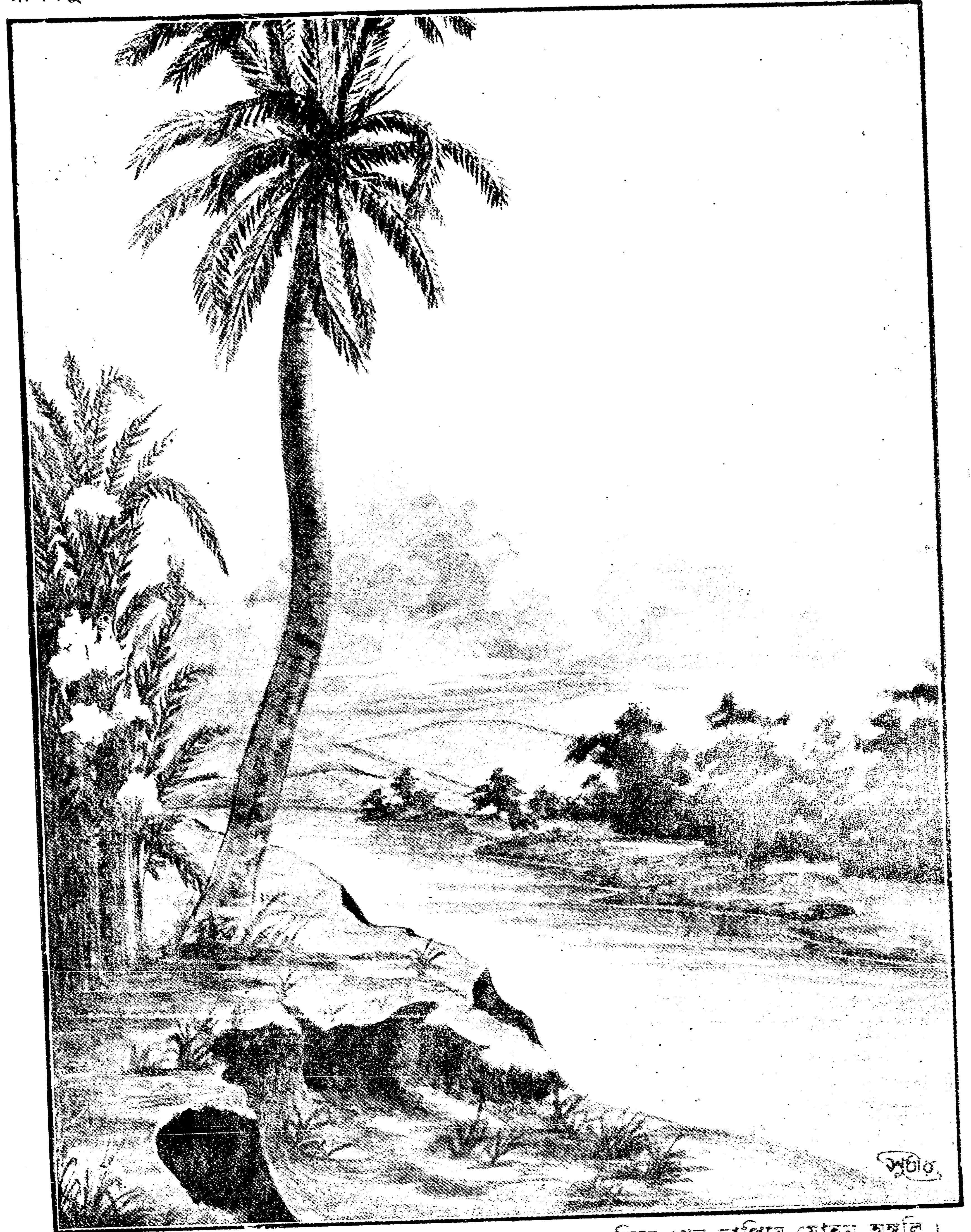

শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি, ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

—রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ]

৪র্থ বর্ষ } আশ্বিন, ১৩৩৮ { ৯ম সংখ্যা

‘রায়বেঁশে’ দল

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

(এখন ইহারা বিবাহের মিছিলের সঙ্গে নৃত্য করে, কিন্তু একদিন উহাদেরি ভয়ে বড় বড় বীর যোদ্ধাদের পর্য্যন্ত থরহরি কম্প উপস্থিত হইত। উহাদের অপূর্ব্ব বীরত্ব-ব্যঞ্জক নৃত্য বাঙ্গলার গৌরব ও নিজস্ব সম্পদ্। বীরভূমের সাহিত্যিক-কালেক্টর মিঃ গুরুসদয় দত্তের অক্লান্ত চেষ্টায়, এই রায়বেঁশে নৃত্য ও ব্যায়াম স্কুলে স্কুলে প্রচলিত ও সমাদৃত হইতেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এই নৃত্যের পক্ষপাতী।—লেখক)

ওরাই রাঢ়ের রায়বেঁশে দল, নিত্য বিয়ের সঙ্গে নাচে,
দেখায় বীরের চাতুর্য্য সে, দীনের মত পয়সা যাচে,
নূপুর পায়ে, ঘাঘ্‌রা পরে, নাচে কভু নারীর মত,
কভু আবার লাঠির ঘায়ে দেখায় তাহার শৌর্য্য কত!

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

বাঙলা দেশের বৃহন্নলা, বিজ্ঞ লোকে বল্‌ছে তারে,
নৃত্য শেখায়, নৃত্য দেখায়, শত্রু সেনায় রুধ্‌তে পারে।

(২)

বঙ্গভূমির সিংহ ছিল, ডরতো ওদের সেকেন্দারও,
ও শির ওদের উচ্চ ছিল, করতো নাকো কেয়ার কারও।
ভাগ্যহত, ছন্নছাড়া, লক্ষ্মীহারা, আজ্‌কে ওরা,
বাঙলা দেশের ছেলেমেয়ে আদর ওদের কর্‌বি তোরা।
ওরাই ভাবিস্‌ ভস্মাবশেষ পাণ্ডব এবং কৌরবেরি,
ভগ্নাবশেষ বঙ্গ-সেনার, ছিন্ন কেতন গৌরবেরি।

(৩)

আজও ওদের গৌরবময় শৌর্য্য ভরা নৃত্য হেরি,
কাণে তোদের পশ্‌বে সাড়া, সুদূর রণ-দুন্দুভিরি।
মুক্ত হাওয়ায়, মুক্ত বুকে, নাচ্‌রে ওদের নাচের তালে,
বঙ্গ পরাক্‌ বিজয়-টিকা, নূতন করে তোদের ভালে।
ওদের অফুট রক্ত কমল ফুটুক্‌ তোদের আলোর চায়ে,
কবি যে সেই নূতন যুগের অরুণ উদয় দেখ্‌তে চাহে।

সীতারাম! সীতারাম!

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ, বি-এল্‌)

এক

শশাঙ্কের মনে বড়ই দুঃখ। বেচারা জামাই সাজিয়া যতবার শ্বশুর-বাড়ী গেছে ততবারই নাকাল হইয়াছে।

অবশ্য 'জামাই বাবু' হইয়া শ্বশুর-বাড়ী গেছে অথচ ঠকে নাই, এমন কথা বুক ঠুকিয়া ক'জন বলিতে পারে? সৃষ্টিছাড়া একটা কথা আমিই বা বলিতে যাইব কেন,

আর বলিলে তোমরাই বা তা কোন্‌ বিশ্বাস করিবে! কিন্তু তবুও!......লোকে যেমন দু পাঁচবার ঠকে, তেমনি আবার দু'য়েক বার ঠকায়ওতো! এই ঠকানোটাই আজ পর্য্যন্ত শশাঙ্ককে দিয়া আর হইয়া উঠিল না।

যদি জিজ্ঞাসা কর শ্বশুর-বাড়ীতে এমন 'মারাত্মক' লোকটা কে আসিল, তবে তার জবাব মারাত্মক লোক একটী নয়, একেবারে পাঁচ-পাঁচজন—অমল, নির্ম্মল, কমল, ইলা, লীলা। এক কথায় বাড়ীর লোকে তাদের বলে "অমল ব্যাটেলিয়ান্‌।" কথাটা শুনিয়া বেশ একটু চাপা হাসি ঠোঁটের আগে চাপিয়া ফেলিলে যে! বাপুহে, পরিচয় তো পাও নাই, তাই জান না অমল-ব্যাটেলিয়ান কি চীজ! মাঘ মাসে আমাদের দেশে যে বেশ কিছু শীত পড়ে সেটাতো মানো! সেই দারুণ শীতের মধ্যেও এই ব্যাটেলিয়ান্‌ শশাঙ্ককে বার বার ঘামাইয়া ছাড়িয়াছে। সে সব কাণ্ড যদি দেখিতে তবে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে না যে শশাঙ্ক বি-এ ক্লাশের ছাত্র, আর অমল-নির্ম্মল এই জানুয়ারী মাসে সবে ফাষ্ট্‌ ক্লাশে উঠিবে।

অবশ্য পাল্‌টা জবাব দিতে শশাঙ্ক যে কিছুমাত্র কসুর করিয়াছে তা যেন ঠাওরাইও না। কিন্তু তার বি-এ-পড়া অতখানি বুদ্ধি আজ পর্য্যন্ত একবার যদি সে কাজে লাগাইতে পারিল! 'কাজ'করা চুলায় যাক্‌, একবার সে যে এক দারুণ 'অ-কাজ' করিয়া বসিয়াছিল ভাগ্যিস্‌ সেকথা ব্যাটেলিয়ানের কাণে আজ পর্য্যন্ত যায় নাই, গেলে বোধ করি বেচারাকে শ্বশুর-বাড়ী যাওয়াই বন্ধ করিতে হইত! ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই—কিছুতেই যখন অমলদের উপর শশাঙ্ক টেক্কা দিতে পারিল না, তখন এক অতি পুরাণো লজ্‌ঝোড়্‌ তামাসার কথা তার মনে আসিল; আমাদের দেশে একটা ওঁচা রসিকতা আছে না খাবারের মধ্যে কোন রকম অখাদ্য মিশাইয়া দেওয়া—তাই। শশাঙ্করা থাকে কলিকাতায়, আর তার শ্বশুর-বাড়ী খড়দ'য়; ক'মিনিটের বা পথ, দিনে বোধ করি পনের বার আসা-যাওয়া করা যায়। একদিন ভোরে শশাঙ্ক গিয়া ময়রা-দোকানে এক চাঙ্গারি সিঙাড়ার ফরমাস্‌ দিয়া আসিল, গরমা-গরম তোফা সিঙাড়া! কিন্তু দুটী সিঙাড়ার ভিতর শশাঙ্ক পূর দেওয়াইল ক্যাষ্টর অয়েলে ডুবানো আলু, উদ্দেশ্য কোন রকমে অমল-নির্ম্মল, নিদেন পক্ষে ইলাকে সেদুটী গিলাইয়া দিবে। শশাঙ্কদের হিন্দুস্থানী বাচ্চা চাকর লখিয়া তার বড়ই পেয়ারের, সেই তার

দাদাবাবুর সঙ্গে শেয়ালদায় সিঙাড়ার চাঙ্গারি এবং আরও কয়টা জিনিষ উঠাইয়া দিতে গেল। ষ্টেশনে ঢুকিয়া যদি একবার শশাঙ্ক গাড়ীর ভিতরে উঠিতে পারে, অমনি পেছন হইতে বীভৎস শব্দ "ওয়াক্, ওয়াক্"। ফিরিয়া তো শশাঙ্কের চক্ষু স্থির! আজ সারা-দিনের পরিশ্রমে বেচারা যে ফন্দি আঁটিয়াছে হতচ্ছাড়া লখিয়া তা একেবারেই ভেস্তাইয়া দিয়াছে। হতভাগা! খাইলিই যদি চুরী করিয়া তো গোটা দুই ভাল দেখিয়া নিতে পারিলি না, বাছিয়া বাছিয়া ঠিক ওই দুইটাই নিলি?

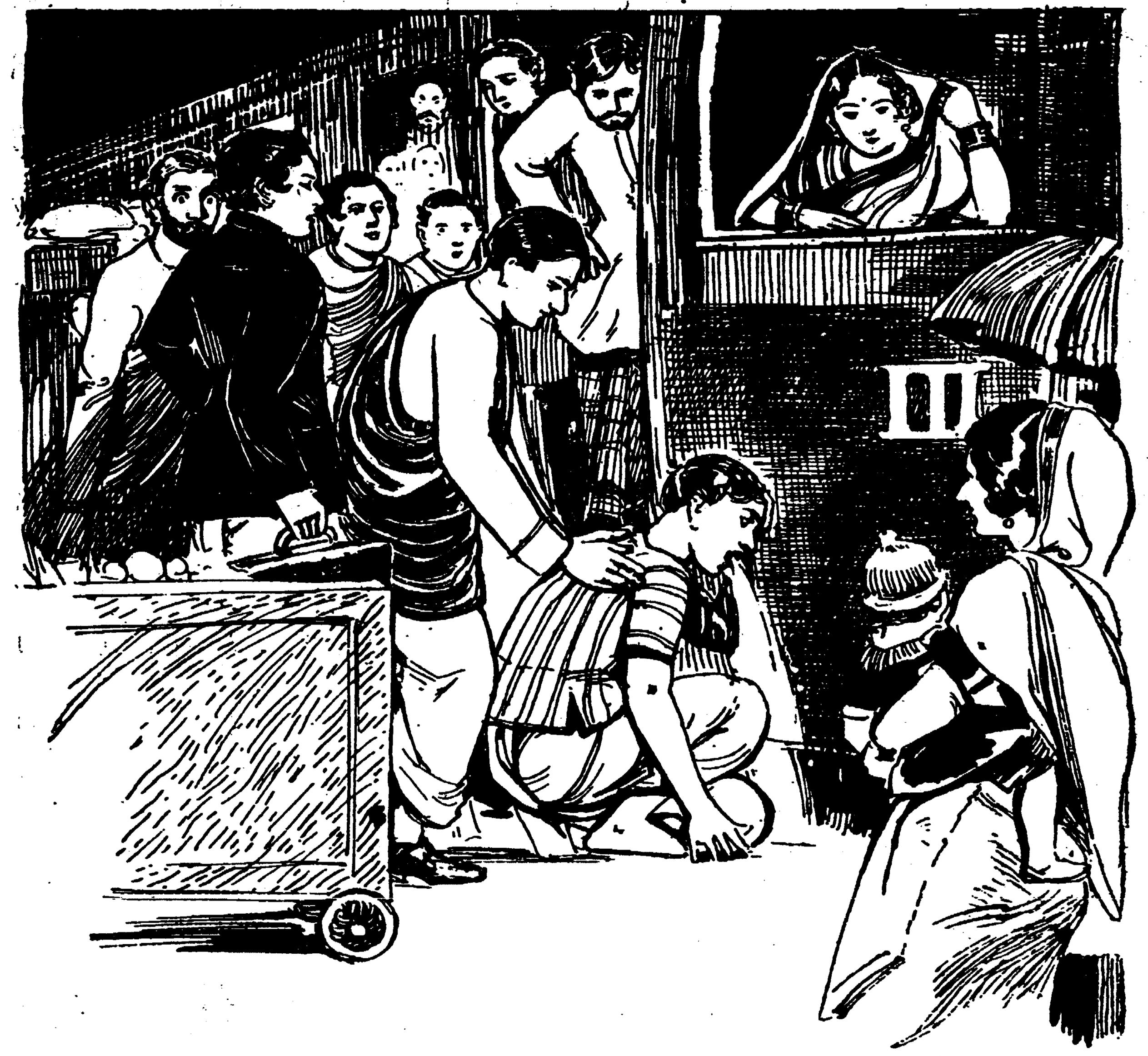
ওয়াক্, ওয়াক!

ঘণ্টাখানেক বাদে অমল-নির্ম্মল সিঙাড়া খাইয়া প্রচুর তারিফ্ করিল, কিন্তু শশাঙ্কের যে তাতে খুব বেশী আনন্দ হইল না, তা বোধ করি না বলিয়া দিলেও চলে।

সেদিন শনিবার, গোটা তিনেকের সময় শশাঙ্ক বাড়ী ফিরিল। আরও ঘণ্টা দেড়েক আগে অনায়াসেই সে ফিরিতে পারিত যদি না কলেজ-ফের্ত্তা হোষ্টেলে গিয়া এক ভূতের তর্কে সে জমিয়া যাইত। আর যাই হোক্, শশাঙ্কের সাহসটা ছিল বরাবরই, ভূতে সে কোন কালেই বিশ্বাস করিত না। "ভূত-আছে-দলের" চাঁই ভূপতিকে তো সে স্পষ্ট মুখের উপরই বলিয়া দিল, "হ্যাঁ গো খুব আছে, তোমার মত ভূতের অন্তই নাই।"

বাড়ী ফিরিয়া নিজের ঘরটীতে ঢুকিতেই শশাঙ্ক লক্ষ্য করিল, টেবিল চাপার নীচে তারই নামের একখানা খামের চিঠি। হাতের লেখা দেখিয়াই সে বুঝিল সেখানা আসিয়াছে খড়দ' হইতে—তারই ছোট শ্যালক বিমল লিখিয়াছে। সারা শ্বশুর-বাড়ীর মধ্যে এই বিমল ছেলেটীই শশাঙ্কের ভারী বাধ্য, তার ব্যথার ব্যথী। কতবার সে আগে হইতে সাবধান করিয়া শশাঙ্ককে অমল-ব্যাটেলিয়ানের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে! শশাঙ্ককেও অকৃতজ্ঞ বলা যায় না, বিমলের ঘুড়ির সূতায় সে মাঞ্জা দিয়া দেয়, মাঝে মাঝে আবার কলিকাতায় আনিয়া তাকে বায়স্কোপ পর্য্যন্ত দেখায়।

খাম ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শশাঙ্ক চিঠিখানা পড়িল, পড়িয়া তার ভারী আমোদ বোধ হইল। বিমল লিখিয়াছে:—

শ্রীশ্রীদুর্গা

খড়দহ

শ্রীচরণেষু,

শুক্রবার—

সেজ জামাই বাবু,

পূরো দেড় মাস হয়ে গেল, আপনি একবারটীও এলেন না; মানে কি? আমার সে কালো ঘুড়িখানা ব্যোমকেশের সঙ্গে প্যাঁচ্ দিতে গিয়ে কেটে গেছে। সূতোগুলো ঢিলে হয়ে এসেছে, ফের মাঞ্জা দিতে হবে।

পুরী থেকে মা বাবা এখনোও ফেরেন নি; বাড়ী কিন্তু তবুও এখন ভর্‌তি। কেষ্‌নগর থেকে বড়দি-বড় জামাই বাবুরা এয়েছেন, দুপুরের গাড়ীতে মেজদি-মেজ জামাইবাবুও চুয়াডাঙ্গা থেকে এসে পৌঁছুবেন। আপনি কিন্তু কাল অবিশ্যি অবিশ্যি অবিশ্যি আস্‌বেন। ইলাদি বলেছে কাল রাত্রে মেটের দো-পেঁয়াজি রাঁধ্‌বে।

'একটা কথা, সন্ধ্যের অনেকখানি আগেই খড়দ' গাঁয়ে এসে পৌঁছুবেন, খবরদার খবরদার, রাত্রি কর্‌বেন না। কথাটা ভুল্‌বেন না যেন। গাঁয়ে ক'দিন হল ভয়ানক রকমের ভূতের ভয় দেখা দিয়েছে, রাতের বেলায় হর্‌দম্ লোক ভয় পেয়ে মূর্চ্ছা যাচ্ছে। সন্ধ্যের পর আমাদের বাড়ীর—শুধু আমাদের বাড়ীর নয়, সমস্ত বাড়ীরই—লোকেরা আর কেউ রাস্তায় বেরোতে ভরসা করে না। প্রায় তিন চার দিন ধরে এ রকম চল্‌ছে।

চারটে চৌত্রিশের ট্রেনেই যেন এসে পৌঁছুতে পারেন, তার দেরী না হয়।

বিমল।

চিঠিখানা শশাঙ্ক বার দুই বেশ—বেশ করিয়া পড়িল। তারপর সেখানাকে ডান হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া সে ঘন ঘন ঘরময় পাইচারি করিতে লাগিল। হঠাৎ তার মুখখানা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, পাইচারি বন্ধ করিয়া ইজি চেয়ারের উপর চোখ বুজিয়া সে খানিকক্ষণ পড়িয়া রহিল। তারপর তাড়াতাড়ি হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়াই দেরাজ হইতে গোটা দুই টাকা নিয়া সে পকেটে পূরিল, এবং পর মুহূর্ত্তেই একেবারে রাস্তায়।

দুই

বিমল চিঠিতে এতটুকু বাড়াইয়া লেখে নাই, যা লিখিয়াছে সমস্তই অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। বাস্তবিকই খড়দ' গাঁয়ে এক বিষম ত্রাসের সৃষ্টি হইয়াছে। একটু রাত হইলেই লোকে আর ঘরের বার হইতে সাহস পায় না। রোজই শোনা যাইতেছে, অমুক লোক রাত্রি অতটার সময় বাড়ী ফিরিতেছিল, রাস্তায় কি দেখিয়া একেবারে 'বাবাগো' বলিয়াই লুটাইয়া পড়িয়াছে। সূর্য্য বাবুর নতুন দরওয়ানটার বাড়ী ভোজপুরে, ইয়া জোয়ান মরদ। দিনে সে একশোটা ডন আর দু'শোটা বৈঠক দেয়, চোঁ করিয়া লোটা লোটা সিদ্ধির সরবৎ উজাড় করে, দু' বেলায় সের দুই 'ছাতুয়া' উড়ায়। ধরিতে গেলে সারাদিন এই তার কাজ। সেদিন রাত আটটায় ছাতু কিনিয়া ফিরিবার পথে সেই লাশ-ই নাকি একেবারে "ইয়ে বাপ্‌রে বাপ! জান্ মারা, সীতারাম সীতারাম" বলিতে বলিতে রাস্তার পাশে খানার ভিতরে ধরাস্ এবং মূর্চ্ছা। এক দল কৃষাণ বাড়ী ফিরিতেছিল, তারাই অনেক কষ্টে সেই বিরাট্ ভুঁড়ি কাঁধে করিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে সূর্য্য বাবুর বৈঠকখানায় আনিয়া ফেলে। পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া সেই ভোজপুরীকে আর খড়দয় দেখা যায় নাই, তবে ষ্টেশনের কুলিরা বলে খুব ভোরেই নাকি এক দামাল পালোয়ানকে লোটা কম্বল নিয়া তারা কলিকাতার গাড়ীতে চাপিতে দেখিয়াছে। সে নাকি এক ভীষণ পালোয়ান।

এই রকম ব্যাপারে যে গ্রামে খুবই হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে তাতে আর কথা কি? কেউ বলিল, দস্তুর মত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবে, কোন অজানা কারণে হয় তো

অপদেবতা চটিয়াছেন, তাঁকে খুসী করিতে না পারিলে আর মঙ্গল নাই। সেদিনই খুব ঘটা করিয়া শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু রাত্রেই দেখা গেল অপদেবতা খুসী তো হনই নাই, বরং অত্যাচার তাঁর আরও বাড়িয়া গেছে। পরদিন একদল বৈরাগী গাঁ ময় খুব একচোট সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইল, এত জোরে তারা খোল পিটাইল যে পরম বৈষ্ণব সূর্য্য বাবুর পর্য্যন্ত মাথা ধরিয়া গেল; অপদেবতা কিন্তু তবুও নির্ব্বিকার, সন্ধ্যার পর সে আবার রোজকার মতই গাঁয়ের পথে টহল দিতে বাহির হইল। ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া শেষে ছেলে-ছোকরাও এক মিটিং বসাইল।

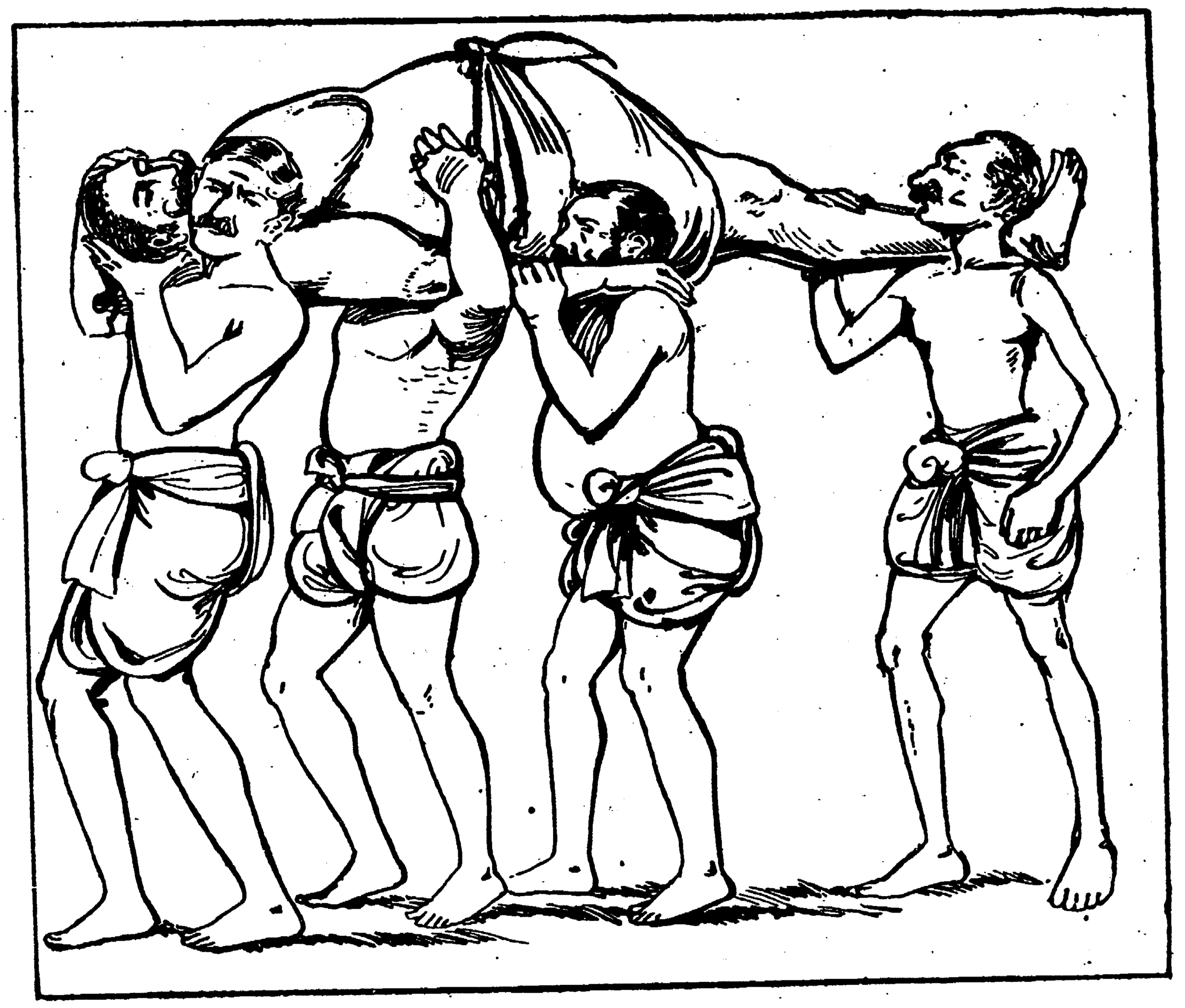

ভোজপুরী পালোয়ান।

ছেলের দল আসিয়া জুটিয়াছে, ভূতের কথা নিয়া আলোচনা সুরু হইয়াছে। ভূতটী একটু যেন অদ্ভুত ধরণের—সব চাইতে প্রথমে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বিষ্টু ঘোষের বাড়ীতে। তার পরদিনই দেখা গেল সে বাড়ীর দুটী হাঁস পাওয়া যাইতেছে না। পরদিন বাছের শেখের বাড়ীতে প্রেতাত্মার ছায়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে তার দিব্যি পুরুষ্টু পাঁঠাটি কোথায় উধাও হইয়া গেল। গত কল্য হারাধন চক্কোত্তি মশাই তাঁর বাগানের পাশ দিয়া গাড়ু হাতে যাইতেছিলেন, দেখিলেন কলা গাছের আড়ালে বিকট মূর্ত্তি। গাড়ু ফেলিয়া দিয়া তিনি তো 'রাম রাম' করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে একেবারে ঘরের দাওয়ায়, কিন্তু পরদিন প্রাতেই দেখা গেল চক্কোত্তি মশায়ের কাঁচা মাথাটি

ঘাড়ের উপর থাকিলেও তাঁর বাগানের সেরা পাকা কলার কাঁদিটি উড়িয়া গিয়াছে।

মিটিংএ গয়ারাম নামে একটী ছেলে ছিল, সে যেমন বোকা তেম্‌নি গোঁয়ার। লোকে তাই তাকে আড়ালে 'বোকারাম' বলিয়া ডাকিত, তবে গোঁয়ার বলিয়া সাম্‌না সাম্‌নি সে নামে ডাকিতে কেউ সাহস পাইত না। সমস্ত শুনিয়া সে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁঃ, যেমন হাঁদা তোরা, ভূত না আরো কিছু। এ কোন্‌ চোরের কারসাজি। তোদের সব পাঁঠা পেয়ে আরাম্‌সে মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে খাচ্ছে।"

'বোকারামের কথা শুনিয়া ছেলেরা কেমন যেন একটু সজাগ হইয়া উঠিল, ছোঁড়া কথাটাতো মন্দ বলে নাই। হইতেও তো পারে এ কোন চোরেই চাল—ভূত সাজিয়া খুসীমত চুরী করিয়া বেড়াইতেছে। নইলে যেখানেই ভূত, সেখান হইতেই গৃহস্থের জিনিষপত্র উধাও হয় কেন? নিশ্চয়ই চোর এ বেটা।

গয়ারাম আবার বলিল, "দেখ্‌বি তবে পরখ্‌ করে আমার কথা সত্যি কি মিথ্যে? বেশ, আজ রাত্রে ক'জন তোরা আমার সঙ্গে চোর ধর্‌তে রাজী আছিস্‌?"

প্রায় পনেরো কুড়ি জন ছেলে রাজী হইয়া গেল। ঠিক হইল অন্ধকার হইলেই তারা গা-ঢাকা দিয়া গাছ-টাছের আড়ালে লুকাইয়া থাকিবে। প্রত্যেকের হাতে একটী করিয়া সিটি থাকিবে, সেই সিটি বাজাইলেই বুঝিতে হইবে ভূতবেশী চোরের দেখা পাওয়া গেছে। সকলে তখন সেই শব্দ ধরিয়া ছুটিয়া আসিয়া চোরের পো কে শায়েস্তা করিয়া দিবে।

মিটিং ছাড়িয়া ছেলের দল তখন যে যার বাড়ী চলিয়া গেল। যে জায়গাটায় তাদের মিটিং বসিয়াছিল তারই খুব কাছে একটা গাছের তলায় ছেঁড়া কাপড় পরা একজন লোক এতক্ষণ ঘুমের ভাণ করিয়া পড়িয়া ছিল, সকলে চলিয়া যাইতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর খুব জোরে পা চালাইয়া গ্রামের এক নিরালা কোণে ছোট্ট একটা কুঁড়ে ঘরের সাম্‌নে আসিয়া দরজায় সে আস্তে আস্তে গোটা কয়েক ঘা দিল। বন্ধ ঘরের মধ্যে আর একজন লোক আয়না সাম্‌নে রাখিয়া মুখে একটা সাদা রং মাখাইতেছিল—মেঝের উপর আরো হরেক রকমের রংয়ের শিশি পড়িয়া। সে তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল, "খবর কি ফটিক, নীলু ঠাকুরের

বক্‌না গাইটা ঠিক্‌ জায়গামত রাত্রে থাক্‌বে তো? রাতারাতিই কিন্তু সেটাকে বারাক্‌-পুরে নিয়ে ফেল্‌তে হবে। হাঁস, পাঁঠা কলা বেচে মজুরী পোষায় না, গাই বেচ্‌লে দাঁও মারা যাবে।"

প্রথম লোকটাই ফটিক, সে বলিল, "আরে ভাই, এ গাঁয়ের অন্ন উঠ্‌ল। ছেলেরা টের পেয়ে গেছে যে ভূত-টুত সব মিথ্যে, চুরীর মৎলবে আমরাই ভূত সেজে বেড়াচ্ছি। আজ তারা রাত্রে চোর ধর্‌তে বেরোবে। কতগুলো ছেলেকে জট্‌লা পাকাতে দেখে গোপনে আড়ি পেতে আমি তাদের কথা সব শুনে নিয়েছি। এ গাঁয়ে আর কিছু জুট্‌বে না, তার চাইতে চল গাঁট্‌রি-বোঁচ্‌কা বেঁধে রাতারাতি অন্য কোন গাঁয়ে গিয়ে জোটা যাক্‌!"

দুই চোরে তখন তল্পিতল্পা বাঁধিতে সুরু করিল।

তিন

শশাঙ্ক বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছিল আমরা জানি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কিন্তু সে ফিরিল—হগ্‌ সাহেবের বাজার হইতে। তার বগলের নীচে ছোট্ট একটা কাগজের বাক্স লুকানো, কাউকে কিছু না জানাইয়া সে সটান তার তেতালার ঘরটীতে আসিয়াই দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর ষ্টিল-ট্রাঙ্ক খুলিয়া একটা পুরানো লেপের ওয়াড় বাহির করিয়া আনিল; কাঁচি দিয়া সেটার তলার দিক্‌টা কাটিয়া ফেলিয়া তারই ভিতর সে তার নিজের সমস্তটা শরীর ঢুকাইয়া দিল। সবশেষে হগ্‌সাহেবের বাজার হইতে আনা সেই কাগজের বাক্সটা হইতে এক অতি কিম্ভূত-কিমাকার মুখোস বাহির করিয়া যখন সে বড় আর্শির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া সেটাকে মুখে আঁটিতে গেল তখন নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেই সে হাসিয়া আকুল। সে চেহারা দিনমানে দেখিলেও তোমরা আঁৎকাইয়া উঠিতে।

শশাঙ্ক ভারী খুসী—ঠিক হইয়াছে। খড়দ' গাঁ এখন ভূতের ভয়ে অস্থির, এই সময় এ চেহারা লইয়া চুপি চুপি বাগান পার হইয়া রান্না ঘরের পেছনের জানালাটায় দাঁড়াইলেই মজা হইবে। সে ঘরে নিশ্চয়ই ইলা-লীলা থাকিবে, ঘরের দুয়ারে প্রেতাত্মা দেখিয়া দুই জনে মিলিয়াও একটার বেশী দুইটা চীৎকার দিতে পারিবে না। সে চীৎকারে অমল-নির্ম্মলও ছুটিয়া আসিবে, বুঝা যাইবে তখন

বীরবরদের কতখানি বীরত্ব! বীর ব্যাটেলিয়ান যখন মাটীর উপর গড়াগড়ি দিতে থাকিবে তখন মুখোস ফেলিয়া সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইলেই চলিবে। বাড়ীতে তাদের বড় জামাই বাবু মেজ জামাই বাবু সবাই উপস্থিত, এ ব্যাপারের পর আর তারা তাঁদের কাছে মুখ দেখাইবে কোন্ লজ্জায়? হুঁ হুঁ, স্যাকড়ার ঠুক্ ঠাক্, কামারের এক ঘা! 'ব্যাটেলিয়ান্' এতদিন ঠুক্ ঠাক্ করিয়া তাকে বড়ই জ্বালাইয়াছে, শশাঙ্ক এবার এক ঘায় তার সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিবে। ভগবান্ যেন সমস্তই ঠিক ঠিক মিলাইয়া দিয়াছেন, নইলে শ্বশুর-বাড়ীর গুরুজন বলিতে যাঁরা তাঁরা এত সময় থাকিতে এ সময়েই বা পুরী যাইবেন কেন?

রাত সাড়ে সাতটার পর কলিকাতা হইতে যে গাড়ীখানা খড়দ'য় আসিয়া থামিল, তারই একখানা কামরা হইতে শশাঙ্ক নামিল, এবং অপর একটা কামরায় উঠিয়া পড়িল সেই দুই চোর।

শশাঙ্কের মনে ফূর্ত্তি যেন আজ ধরিতেছে না, মুখখানা হাসি-হাসি, নিজের মনেই আস্তে আস্তে সে একটা গানের শিস্ দিতেছিল।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গাঁয়ের ভিতর ঢুকিতেই শশাঙ্ক বুঝিল ভূতের ভয় খড়দ'কে কি পরিমাণে পাইয়া বসিয়াছে। সমস্ত রাস্তাঘাট নির্জ্জন, জন প্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই, যেন কোন শ্মশানের মধ্যে সে আসিয়া পড়িয়াছে। গাঁয়ের দোকানগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ। শশাঙ্ক মনে মনে হাসিল, ভাবিল তা এ ভালই হইয়াছে। সারা গাঁয়ে এতখানি যখন ভয় ঢুকিয়াছে তখন ভূত দেখিবার পর শালা-শালীদের চীৎকারটা খুলিবে ভাল।

সদর রাস্তা ছাড়িয়া সে মেঠো পথ ধরিল, কি জানি যদি কারো সাথে ইতি-পূর্ব্বেই দেখা হইয়া যায়। মাঠের উপর দিয়া সে একেবারে রায় বাড়ীর (শশাঙ্কের শ্বশুর-বাড়ীর নাম) বাগানে পৌঁছিবে, অবশ্য বাগানে ঢুকিবার আগেই চেহারাটাকে সে 'ভৌতিক' করিয়া লইবে। তারপর বাগান বহিয়া গুটি গুটি রান্না ঘরের পেছনে জানালার সাম্‌নে গিয়া একটা গালভরা 'হুম্'। ব্যস্!

রায় বাড়ীর বাগানের সীমানায় আসিয়া পৌঁছিতে সময় বেশী লাগিল না, আর একটু সময় গেল সাজটা পরিয়া নিতে, ব্যস্ তারপরেই জামাই বাবু শশাঙ্ক শেখর ভূত

হইয়া গুটি গুটি বাগানের ভিতর দিয়া আগাইতে লাগিল। ঐ তো সম্মুখে রান্নাঘর, ভিতর হইতে স্পষ্ট আলোর রেখা আসিতেছে! ঐখানেই তো, ইলা লীলা! তারা কি স্বপ্নেও ভাবিতেছে যে আর একটু বাদেই কী চীৎকারটা তাদের দিতে হইবে? আচ্ছা, কি বলিয়া ওরা চেঁচাইবে?

কিন্তু সে প্রশ্নের মীমাংসা আর হইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে শশাঙ্ক নিজেই "বাবাগো" বলিয়া একেবারে মাটীর উপর। পেছন হইতে কে যেন ভীষণ জোরে তার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে। শশাঙ্ক তাকে অনায়াসেই ছাড়াইয়া উঠিতে পারিত, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে আরও একজন আসিয়া বিপুল জোরে তার ঘাড় ঠাসিয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে দুই দুইটা সিঁটি বাজিয়া উঠিল। ঘাড় যে ঠাসিয়া ধরিয়াছিল, শশাঙ্ক শুনিল সেই চেঁচাইতেছে, "গয়ারাম, গয়ারাম, এদিকে!"

ঘাড়ে উপর···

সর্ব্বনাশ! এ যে অমলের গলা! হায়রে কপাল, শেষে কি হইতে কি হইল? কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রায় পনেরো ষোল জন ছেলে আসিয়া একত্রে শশাঙ্কের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই গয়ারাম গাঁট্টার পর গাঁট্টা মারিয়া শশাঙ্কের মাথাটাকে প্রায় ডবল করিয়া দিল। মাথা চৌচির হইবার

যোগাড়, অথচ মুখ ফুটিয়া আওয়াজটী করিবার উপায় নাই। এই ছেলের দলে যদি একবার প্রকাশ পায় সে কে, তবে কি আর শ্বশুর বাড়ীতে সে এক মিনিটও তিষ্ঠিতে পারিবে ? ক্ষ্যাপাইয়া সবাই তাকে পাগল করিয়া ছাড়িবে না ?

অনেক মারেও যখন শশাঙ্ক শব্দ করে না, তখন গয়ারাম বলিয়া উঠিল, "এটা মানুষ তো ? মুখে যে রা-ই নেই একদম্ !"

যে ছেলেটা সবার আগে শশাঙ্কের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছিল সে কহিল, "আলবৎ মানুষ, মাটীতে পড়েই 'বাবাগো' বলে ডাক ছেড়েছে।"

নির্ম্মল বলিল, "চল্, উঠানের দিকে টেনে নিয়ে চল্, হল্লা শুনে সবাই সেখানে এসে জুটেছে, খুব আমোদ পাবে' খন।"

এই নতুন প্রস্তাবে শশাঙ্কের মাথা ঘুরিতে লাগিল, সাম্‌নেই ছিল একটা শুপারি গাছ, বেচারা প্রাণপণ জোরে সেইটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল, কিছুতেই সে নড়িবে না। কিন্তু না নড়িলেই বা ছাড়ে কে ? ছেলেরা হেঁচ্‌কা টানে তাকে ছাড়াইয়া তো লইলই, উপরন্তু লভ্য হইল গয়ারামের কড়া হাতের আরো কয়েকটা গাঁট্টা।

এদিকে উঠানে তখন রীতিমত ভীড় জমিয়া গেছে। অমল-নির্ম্মলের দিদিরা, বড় জামাই বাবু, ইলা, লীলা, বিমল সকলেই সেখানে। কমল আগে আগে দৌড়াইয়া আসিয়া খবর দিল, এ ক'দিন যে তারা ভূতের ভয় পাইয়াছে সব ভূয়া, এক পাকা সিঁদেল চোর ভূত সাজিয়া বাড়ী বাড়ী চুরী করিয়া বেড়াইতেছিল। হতভাগা আজ তাদেরই বাগানে চুরীর মৎলবে ঢুকিয়াছিল, পাড়ার ছেলেরা ধরিয়া ফেলিয়াছে। কথাটা শুনিয়া সকলে গা-মোড়া দিয়া দাঁড়াইল।

একটু পরেই 'চোর'কে আনিয়া ছেলেরা একেবারে উঠানের মধ্যে হাজির করিল ; আলোর ভিতরে আনিতেই দেখা গেল কি বিকট চেহারা তার। সে চেহারা দেখিয়া অত লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়াও ইলা-লীলার গা ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। বাড়ীর চাকর রামভজন ইতিমধ্যেই তার বাঁশের লাঠিটি বাহিরে আনিয়াছিল, সে বার বার বলিতে লাগিল, 'চোট্টা'কে একবার তার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হউক, সে এর খুব ভাল 'দাওয়াই' জানে।

কিন্তু বর্ত্তমানে বাড়ীতে মুরুব্বি অমল-নির্ম্মলের বড় জামাই বাবু, তিনি বলিলেন, "এর মুখোসটা আগে খুলে ফেল দেখি তোমরা !"

এইখানেই চরম মুস্কিল বাধিল ; 'চোর' কিছুতেই মুখোস্ খুলিতে দিবে না। মাটীর উপর মুখ গুঁজিয়া দুই হাতে সে মাথা চাপিয়া রহিল।

অনেকেই আগাইয়া যাইতেছিল, কিন্তু সবার আগে রামভজন গিয়া বাঁ হাতে 'চোরে'র মুখ তুলিয়া ডান হাতের এক টানে মুখোস্ নামাইয়া ফেলিল। ঠিক সেই সময়েই আলো আসিয়া 'চোরের' মুখের উপর পড়িতেই কিন্তু রামভজন একেবারে পাঁচ হাত পিছাইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, "সীতারাম, সীতারাম ! চোট্টা কাঁহা ? এতো জামাই বাবু হোবে।"

"য়্যাঁ, কে ? কে ?" প্রায় পনেরো জন এক সঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল। রামভজন বলিল, "জামাই বাবু আছেন, কলকাত্তা-বালা জামাই বাবু।" সকলে চাহিয়া দেখে শশাঙ্ক।

তখন সেই উঠানের উপর যে ব্যাপারটা ঘটিল, তার হুবহু বর্ণনা দিবার ক্ষমতা আমার কলমে নাই। জনাপনেরো কুড়ি ছেলে, মায় গয়ারাম, হাসিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল, ইলা-লীলা পাঁজর চাপিয়া ধরিয়া হাসিতে লাগিল, হাসিতে হাসিতে তাদের দিদিদের চোখে জল আসিয়া পড়িল, এমন কি রামভজন ছাতুটা পর্য্যন্ত রান্নাঘরের কাছে গিয়া দাঁত বাহির করিল। অমল নির্ম্মলের বড় জামাই বাবু হাসি চাপিতে গেলেন, ফলে তাঁর ভুঁড়িটা কেবল ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া উঠিল।

* * * *

তারপর ক্রমে আসল ব্যাপারটা ধীরে ধীরে শশাঙ্কের মুখ হইতেই প্রকাশ পাইল। ইলা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "হুঁ, আপনার ওই মন-গড়া গপ্প বিশ্বাস কর্‌লাম আর কি ? আসলে নিজেই চুরী করে বেড়াচ্ছিলেন, এখন ধরা পড়ে ভারী সাধু সাজ্‌ছেন ! এক্স-রে লাগালে এখনো পেটের ভেতর কলার খোসা, হাঁসের পাখা আর পাঁঠার ক্ষুর পাওয়া যাবে।"

লীলা ফোড়ণ দিল, "আর পাঁঠার লেজটা ?"

ইলা বলিল, "সেটা আগেই তুলে রেখেছিলেন, ভবিষ্যতে কাজে আস্‌বে বলে।"

কয়েকটি অদ্ভুত মাছ

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

মাছের কথা লিখিতেছি শুনিয়া আমার একটি বন্ধুর জিভ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িয়াছিল। তোমরা যেন হাসিয়া বন্ধুটিকে লজ্জা দিও না, কেননা আমি জানি বাংলাদেশে এমন আরও বহু বহু লোক আছে যাদের আমার বন্ধুটির মতই এক বেলা মাছ না হইলে মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। বেশী খোঁজ করিতে হইবে না, সে রকম লোক তোমাদের মধ্যেই অনেক জুটিয়া যাইবে।

তা, ইহাতে লজ্জার আর কি আছে? বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্যই ত ধরিতে গেলে মাছ। বাংলা দেশটা—বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গ সবটাই প্রায় নদী, খাল, বিল পুকুরে ভর্ত্তি। মাছও সেখানে পাওয়া যায় দেদার। এখানকার লোকেরা মাছ ভালবাসিবে না, ত কি মরুভূমির লোকেরা বাসিবে?

কিন্তু যাই বল, খাল বিল কিংবা নদীতে তেমন অদ্ভুত ধরণের মাছ বড় একটা চোখে পড়ে না। চিংড়ি মাছটার চেহারা অবশ্য খুবই অদ্ভুত স্বীকার করি, কিন্তু সেখানে গোড়াতেই গলদ। চিংড়ি আসলে মাছ নয়, এক রকম জলের পোকা। পোকা বলিলে লোকের খাইতে ঘেন্না হইতে পারে, তাই বোধ হয় তাকে মাছ বলা হয়। আর অদ্ভুত চেহারা হইতেছে বাণ মাছের। বাণ মাছ তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ—ঠিক যেন একটা সাপ। চেহারা দেখিলে আর তাকে খাইতে প্রবৃত্তি হইবে না।

কিন্তু নদী ছাড়িয়া একবার সমুদ্রে চল, দেখিবে অদ্ভুত মাছের যেন সেখানে আর অন্ত নাই। যেমন তাদের এক একটার চেহারা, তেম্‌নি চালচলন। আজ তারই দু' চারটির কথা তোমাদের বলিব।

সাধারণতঃ যে সব মাছ আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি সবই নেহাৎ নিরীহ

প্রকৃতির। কিন্তু মাছও যে কি রকম হিংস্র হইতে পারে তার একটি নমুনা হাঙ্গর। হাঙ্গর নামটা তোমরা অনেকেই জান, কিন্তু জীবটীর সঙ্গে বোধ হয় তোমাদের সবাইকার পরিচয় নাই। বাহির হইতে দেখিলে হাঙ্গরের সাথে আর সাধারণ একটা পুকুরের মাছের সাথে একটুও তফাৎ নাই (অবশ্য হাঙ্গর গুলি আকারে এক একটা ১০।১২ হাত পর্য্যন্ত হয়)—কিন্তু তফাৎ আছে স্বভাবে। হাঙ্গরের মত রক্তপিপাসু জানোয়ার বোধ হয় কমই আছে। মানুষের মাংসটা যেন তারা একটু বেশী পছন্দ করে।

আর একটি গোঁয়ার-গোবিন্দ মাছ হইতেছে তরোয়াল মাছ। ইংরাজীতে ইহাদের বলে সোর্ড্ ফিশ্ (Sword Fish)। ইহাদের মুখের উপরকার ঠোঁটটা প্রায় ৪।৫ হাত লম্বা, দেখিতে ঠিক তরোয়ালের মত। শুধু দেখিতে নয়, কাজেও সেগুলি এক একটী তরোয়াল,—তেমনি ধারাল, তেমনি শক্ত। এই তরোয়ালের মত ঠোঁট লইয়া সে

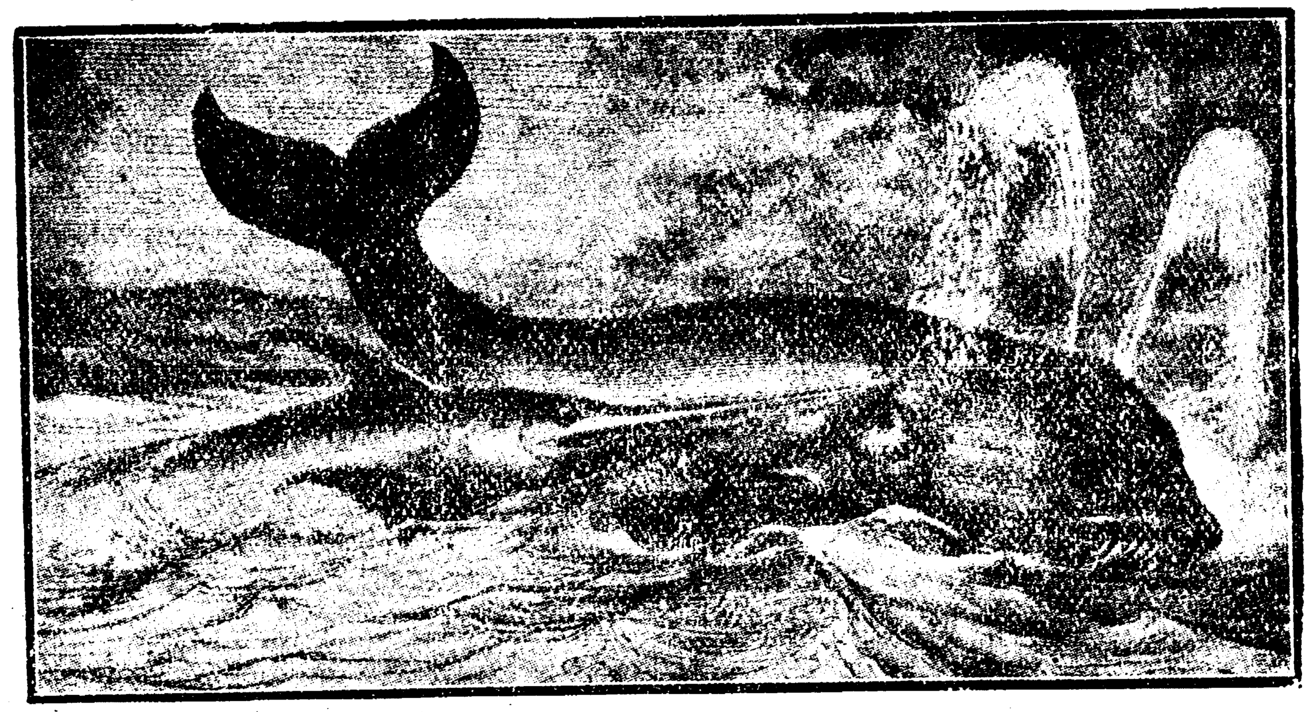

তরোয়াল মাছ তিমির গায়ে ঢুঁ মারিয়াছে।

যখন আসিয়া ঢুঁ মারে তখন ছোটখাট জন্তু ত ছার, বড় বড় তিমিকেও দস্তুর মত নাকাল হইতে হয়। একবার এক তরোয়াল মাছ একখানা জাহাজের গায়ে ঢুঁ মারিয়াছিল। জাহাজের তলাটা ছিল পিতলে বাঁধান, তার পর এক ফুট পুরু তক্তা। সে সব ভেদ করিয়া সেই তীব্র খোঁচা জাহাজের ভিতরে গিয়া সেখানকার লোকেদের জখম করে।

আর এক ধরণের মাছ আছে, তাদের তরোয়াল নাই, কিন্তু তার বদলে আছে একটি চাবুক। মুখে নয়, সে চাবুক থাকে তাদের লেজে। চাবুকের গায়ে আবার কাঁটা কাঁটা দাঁতও বসান থাকে। এই চাবুকের একটি বাড়ি খাইলে আর কাহাকেও সজ্ঞানে বসিয়া থাকিতে হয় না। কোন কোন মাছের আবার চাবুকের মধ্যে বিদ্যুৎ ভরা থাকে। ভাবিয়া দেখ কি ভয়ানক! এ সবই অবশ্য শিকার ধরিবার জন্য।

আমরা যেমন বঁড়শি দিয়া মাছ ধরি, কোন কোন মাছও তেমনি বঁড়শি দিয়া শিকার ধরে। এই বঁড়শি থাকে তাদের নাকের ডগায়। লম্বা ছড়ি,—তার আগায় বঁড়শি।

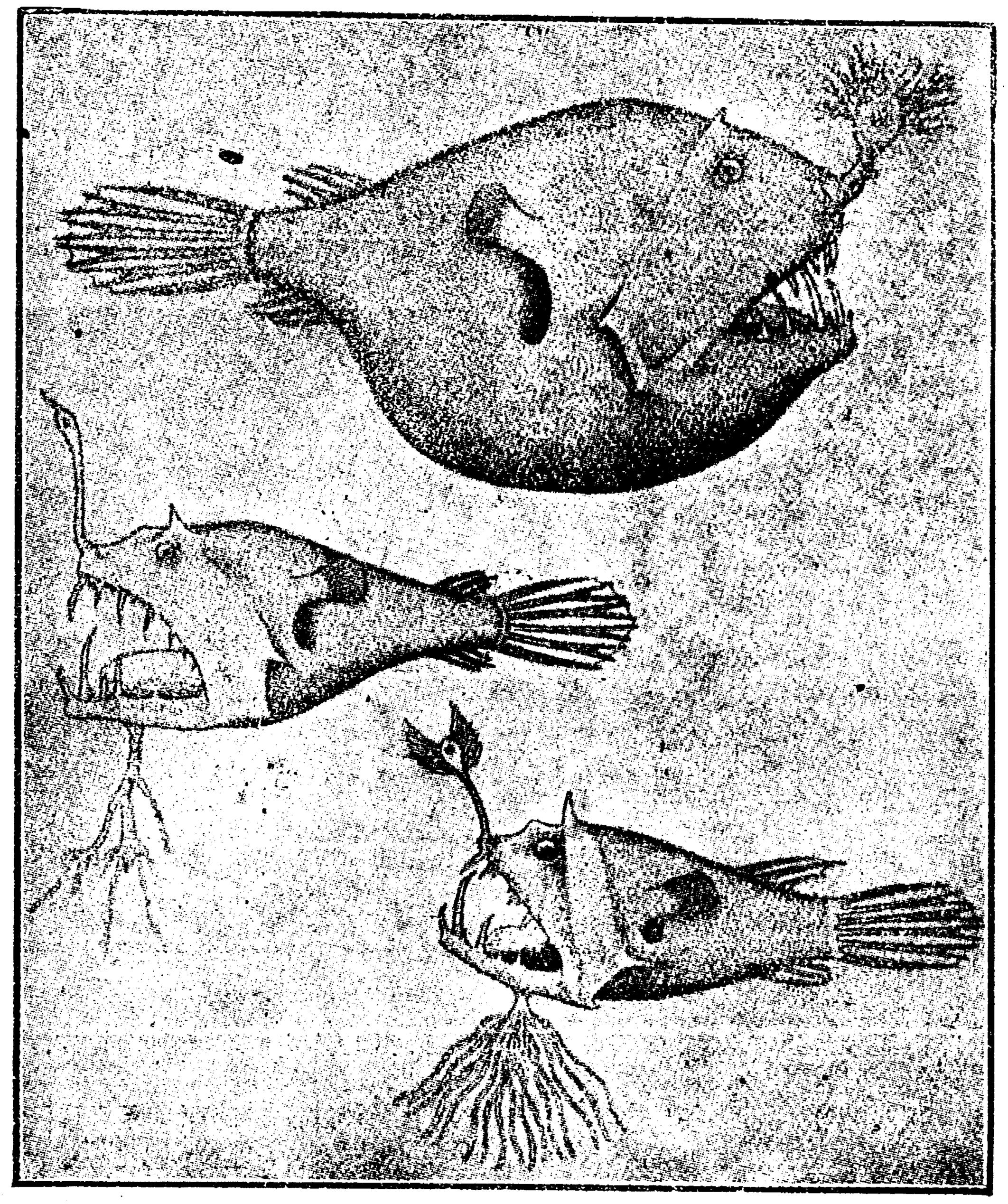

বঁড়শিওয়ালা মাছ।

গোঁয়ার মাছের কথা ছাড়িয়া এবার মজার মজার চেহারাওয়ালা দু'একটা মাছের কথা বলি শোন। আমাদের পুরাণে আছে ইন্দ্রের নাকি ছিল হাজারটা চোখ, মহাদেব ত্রিনয়ন, ব্রহ্মার চারটি মাথা কাজেই আটটি চোখ, রাবণের কুড়ি চোখ, কিন্তু বাস্তব জগতে ২টির বেশী চোখ কারও শুনিয়াছ কি? অবশ্য কোনও কোনও পোকা-মাকড়ের দু'টির বেশী চোখের কথা শোনা যায়। এক রকম মাছ আছে তাদের ৪টি চোখ। এই মাছ যখন জলে ভাসে তখন তার দু'টি চোখ থাকে জলের তলায়, দু'টি জলের উপরে।

ফলে ইহারা একই সঙ্গে জলের উপরে আর নীচে নজর রাখিয়া চলা ফেরা করিতে পারে। ভারী সুবিধা, নয়? আর এক রকম মাছ আছে তাদের চোখ দু'টাই, তবে সে দু'টি মাথার দু' পাশে নয়। একদিকে দু'টা চোখ, আর এক দিক্ একেবারে খালি। এই মাছ প্রায় সব সময়েই কাদার উপর কাৎ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাই সে দিক্‌টায় চোখের কোনও বালাই নাই। আবার নাকের উপর কেবল মাত্র একটা চোখ এমন মাছের কথাও শুনা গিয়াছে।

আর এক রকম মাছ আছে সেগুলিকে বলে লণ্ঠন মাছ। ইহাদের কোন কোনটার শরীরের দু'পাশে বোতামের মত সার বাঁধিয়া কতকগুলি ইলেক্‌ট্রিক্ বাল্‌বের মত বসান থাকে, দরকার হইলে সেগুলি এক সঙ্গে জ্বলিয়া উঠে—যেমন জোনাকি পোকার জ্বলে না, তেম্‌নি। কোন কোনটার আবার মাত্র একটি লণ্ঠন সম্বল, সেটা তার গায়ে লাগান থাকে না, থাকে মাথার উপর। দূর হইতে যখন এই মাছ আসিতে থাকে তখন মনে হয় ঠিক যেন একটি ক্ষুদে এঞ্জিন সার্চ্চ লাইট্ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে!

লণ্ঠন মাছ।

জানোয়ারদের মধ্যে বেশীর ভাগই হাঁটিবার সময় উপুড় হইয়া চলে। মানুষ, গরিলা, ক্যাঙ্গারু এরা চলে খাড়া হইয়া, কিন্তু কোন কোন মাছেরও নাকি আবার খাড়া

হইয়া চলিবার অভ্যাস আছে। ইহাদের নাম সূচ মাছ। শরীরটা সূচের মত লম্বা কিনা, তাই এই নাম। আবার মজা, চলিবার সময় ইহাদের মাথাটা আবার থাকে নীচের দিকে।

সেকালকার মুনি-ঋষিরা অনেকেই দাড়ী রাখিতেন। আজ কালকার লোকেদের মধ্যে দাড়ী রাখিবার রেওয়াজ কমিয়া গিয়াছে। মানুষ ছাড়া আর দাড়ী আছে রাম ছাগলের। কিন্তু কোন মাছ যদি তোমার কাছে এক মুখ দাড়ি লইয়া হাজির হয় তবে কেমন লাগে বল ত ? এমন মাছেরও কিন্তু অভাব নাই।

এবার কয়েকটি গুণী মাছের নাম করিয়া গল্প শেষ করিব। উড়ুক্কু মাছের গল্প তোমরা আরব্যোপন্যাসে পড়িয়াছ। কিন্তু উড়ুক্কু মাছ আরব্যোপন্যাসের আজগুবি কল্পনা নয়। একবার লোহিত সাগরের কাছে যাইতে পারিলে দেখিবে সমুদ্রের উপর দিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ুক্কু মাছ উড়িয়া চলিয়াছে।

মাছের শব্দ কখনও শুনিয়াছ কি ? কোন কোন মাছ আবার হল্লা করিতেও ওস্তাদ্। দূর হইতে হইাদের চীৎকার শুনিলে মনে হইবে বুঝি বা কোথাও হাট কি বাজার বসিয়াছে।

আর এক রকম গুণী মাছ আছে আফ্রিকায়। ভাল জিম্‌নাষ্টিক্ দেখাইতে পারে বলিয়া ইহাদের বেশ নাম-ডাক আছে। ইহারা শুধু জলের জীবদেরই কসরৎ দেখায় না, অনেক সময় ডাঙ্গায় উঠিয়া গাছে চড়িয়া ডাঙ্গার লোকদের কাছেও নিজেদের গুণপণা জাহির করে।

বাদশাহ্ ও তাঁর ভৃত্য

(কাদের নওয়াজ, বি-এ)

এক ছিলেন বাদশা, তাঁর আয়াজ্ নামে এক ভৃত্য ছিল। রাজ-দরবারে সকলেই আয়াজ্‌কে খুব বিশ্বাসী বলে জান্‌ত। শুধু তাই নয়, বাদশার সাম্‌নে আদব্-কায়দা দেখাতে তার তুল্য দক্ষ আর কেউ ছিল না। এজন্য জ‍াঁহাপনা সত্যই তার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট ও অনুগ্রহ-শীল ছিলেন। কিন্তু যে রকম হামেশা হয়ে থাকে, এই কারণেই

আবার একদল লোক তার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়াল ; তারা ক্রমাগতই চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল কিভাবে বাদশার চোখে আয়াজের ছোটখাট দোষ ত্রুটীগুলোকে প্রকাণ্ড করে বাড়িয়ে তুল্‌বে।

একদিন বাদশা, সিংহাসনে ব'সে আছেন, তাঁর চারিপাশে উজীর ও সভাসদেরা বসেছে, বড় বড় আমীর ওম্‌রাহ্ ও রাজপুত্রগণ দরবার অলঙ্কৃত ক'রেছেন, আসর সর্‌গরম। এম্‌নি সময় বাদশা দেখ্‌লেন যে তাঁরই বিশ্বস্ত ভৃত্য 'আয়াজ্' দরবারে বসে থাক্‌তে থাক্‌তে হঠাৎ জুতোর শব্দ কর্‌ল। তিনি বেশ বুঝ্‌তে পারলেন যে জুতোসমেত পা মাটীতে সজোরে আঘাত না করলে এরূপ শব্দ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু বাদ্‌শা'র সাম্‌নে, তাঁরই দরবারে বসে কোন চাকরের জুতোসমেত মাটীতে পা ঠোকা যে চূড়ান্ত বেয়াদবি! তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন, দরবারের কতগুলো লোক এই ব্যাপার দেখে একবার তাঁর দিকে, আর একবার আয়াজের দিকে তাকাচ্ছে— যেন বাদশাকে তাঁরা ভৃত্যের এই বেয়াদবির কথাই ইঙ্গিতে জানাচ্ছে। বলা বাহুল্য এরাই আয়াজের শত্রুদল।

ভৃত্যের বেয়াদবিতে বাদশার মুখে বিস্ময় ও ক্রোধের ভাব একসঙ্গে ফুটে উঠ্‌ল, তিনি তখনই আয়াজ্‌কে কাজের ওজুহাতে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন দূতকে ইঙ্গিত কর্‌লেন পেছু পেছু তাকে অনুসরণ কর্‌বার জন্য। কিছুদূর গিয়েই দূত আয়াজ্‌কে থাম্‌তে দেখ্‌ল এবং তারপর আশ্চর্য্য হ'য়ে দেখ্‌ল যে সে তার বাঁ পায়ের জুতো খুলে তার ভিতর থেকে কি একটা বের করে ফেলে দিচ্ছে।

যথা সময়ে দূত গিয়ে বাদশার কাছে সব ঘটনা খুলে বল্ল। শুনেই জ‍াঁহাপনা আয়াজ্‌কে ডেকে পাঠালেন, এবং সে উপস্থিত হ'লে দরবারে তাঁর সাম্‌নে তার বেয়াদবির জন্য ক্রোধ প্রকাশ করে কেন সে ওরকম করেছিল জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। আয়াজ তখন মাথা নীচু করে করজোড়ে বল্লে ঃ—

"জাঁহাপনা! আপনার এ দাস যখন তার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে ছিল তখন সে লক্ষ্য করে নাই যে তার বাঁ পায়ের জুতোর ভিতর একটা বিচ্ছু প্রবেশ করেছে। প্রথম বারের কামড়েতেই যন্ত্রণা বোধ হয়েছিল, কিন্তু বেয়াদবির ভয়ে সে নীরবেই তা সহ্য করেছে ; দ্বিতীয় বার যখন কামড় দেয় তখন দুই চোখ্ আঁধার হয়ে আসে,

কিন্তু এবারেও অতি কষ্টে সে নিজেকে সংযত করে রেখেছিল। তৃতীয় বারের কামড় সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল এ অধম অস্থির হ'য়ে প'ড়্‌ল্ল। তখন তার মুখ থেকে যন্ত্রণাব্যঞ্জক কোন কথা বার না হ'লেও পা'ত্নটী হঠাৎ কেঁপে উঠ্‌ল এবং সেইজন্যেই জুতোর শব্দ জ'াহাপনার কাণে গেছে।" ঘটনাস্থলে দরবারের সবাই এ কথা শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। বাদশা তখনই আয়াজকে তার সহিষ্ণুতার জন্য তিনশত দেহ্‌রাম পুরস্কার দিলেন। কুচক্রী শত্রুদের মুখ চূন হয়ে গেল।

হিংসুটেদের চক্রান্ত ব্যর্থ হ'ল বটে, কিন্তু তাতে তারা না দমে গিয়ে ফের ফিকির খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। কি করে অন্য কোন রকমে আয়াজের ওপর বাদশাকে বিরূপ করে তোলা যেতে পারে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে তাদের একটা প্রকাণ্ড সুবিধা জুটে গেল, কেননা তারা টের পেলে স্বয়ং উজীর আয়াজকে তু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না।

এম্‌নি ক'রে দিন যায়। হঠাৎ একদিন উজীর গিয়ে বাদশাকে জানাল যে রাজ-কোষাগারে আয়াজের অবাধ যাতায়াত থাকাটা ভাল নয়। বাদশা কারণ জিজ্ঞাসু হলে সে বল্লে, অনেকেই দেখেছে যে আয়াজ মাঝে মাঝে সন্ধ্যার একটু আগে সকলের অগোচরে কোষাগারে প্রবেশ করে এবং কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ আবার সকলের অজানিত ভাবেই সেখান থেকে সরে পড়ে। এজন্য অনেকেরই ধারণা যে সে কিছু না কিছু রাজকোষ থেকে আত্মসাৎ করছে। বাদশা উজীরকে একদিন প্রত্যক্ষ ব্যাপারটী লক্ষ্য কর্‌বার জন্য পরামর্শ দিলেন। ঠিক এক সপ্তাহ পর উজীর আবার গিয়ে জ'াহাপনাকে জানালো যে, সে নিজেই একদিন গোপনে লক্ষ্য ক'রে দেখেছে যে ঘটনা সত্য—আয়াজ সন্ধ্যার ঠিক আগে হপ্তায় তুবার ক'রে 'রাজকোষে' যায় এবং কিছুক্ষণ থেকেই ফের তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে আসে।

কথাটা শুনেই তো বাদশা ব্যাপার স্বচক্ষে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌লেন। একদিন সুযোগ বুঝে উজীরই সংবাদ দিলে যে আয়াজ চুপে চুপে কোষাগারের দিকে রওনা হয়েছে। শুনেই জ'াহাপনা তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেখ্‌লেন কথাটা ঠিকই বটে। তিনি তখন ধীরে ধীরে সমানে আয়াজের অনুসরণ করে চল্‌লেন। আয়াজ্‌ কোষাগারে প্রবেশ কর্‌ল, বাদশাও দ্বারের আড়ালে দাঁড়িয়ে

দেখ্‌তে লাগ্‌লেন সে কি করে! তিনি দেখ্‌লেন, আয়াজ্‌ তাঁর ধন-ভাণ্ডারের পাশ দিয়েও গেল না, কিন্তু যা কর্‌ল তা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য—একটা টীনের বাক্স থেকে কয়েকটা ময়লা কাপড় ও জামা বের ক'রে বাদ্‌শার দেওয়া পোষাক খুলে রেখে সেইগুলিই পর্‌ল। তারপর কিছুক্ষণ বাদে বাদ্‌শার দেওয়া পরিচ্ছদগুলো আবার প'রে, ময়লা কাপড়গুলি খুলে সেই বাক্সের মধ্যে পূরে, যেই বের হ'য়ে আস্‌বে অম্‌নি বাদ্‌শার সঙ্গে তার দেখা।

বাদ্‌শা তখন স্বচক্ষে যা দেখেছেন সবই আয়াজ্‌কে বলে তার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। সে উত্তর দিল—

"জ'াহাপনা, এ দাস যখন প্রথম আপনার ভৃত্যের পদে নিযুক্ত হয় তখন সে অত্যন্ত গরীব ছিল। বাক্সের মধ্যে ময়লা কাপড়-চোপড় যা রয়েছে, ঐগুলি পরেই তাকে বহু দিন কাটাতে হ'য়েছে; তারপর জাঁহাপনার কাছে এসে সে এই জরীর ও মখ্‌মলের পোষাক পর্‌তে পেয়েছে। এ অধম তার বর্ত্তমান সুখ-সম্পদে গর্ব্বিত হ'য়ে যেন বিগত তুঃখের অবস্থাকে ভুলে না যায়, সেজন্যই সে প্রতি সপ্তাহে জাঁহাপনার দেওয়া মূল্যবান্‌ পোষাক খুলে ফেলে কিছুক্ষণের জন্য তার আগেকার ছেঁড়া ও ময়লা কাপড় পরিধান করে, এবং দেখে, সে কি ছিল আর কি হ'য়েছে। তা ছাড়া, জ'াহাপনার দেওয়া দামী পোষাকের সঙ্গে এ দাসের যত দিনের সম্বন্ধ তার চাইতে ঢের বেশী দিনের সম্বন্ধ ঐ জীর্ণ কাপড়গুলির সঙ্গে। সৌভাগ্যশালী নূতন বন্ধুদের পেয়ে যেন তুঃখের দিনের দরিদ্র বন্ধুকে ভুলে না যায় সেজন্যই জ'াহাপনা, এ ভৃত্য নিরালায় এসে মাঝে মাঝে ওগুলিকে দেখে যায়।"

জবাব শুনে বাদশা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, তাঁর রাজ্যে এ ধরণের লোক আর কেউ আছে বলে তাঁর স্মরণ হল না। কিন্তু মনের ভাব চেপে রেখে তিনি বল্লেন, "আচ্ছা, আজ দরবারে উপস্থিত থেক।"

বাদশা আয়াজকে কোষাগারের দিকে যেতে দেখে তাঁর পেছু পেছু গিয়েছিলেন,—উজীর শুধু এই টুকুই খবর রাখ্‌তো, এর বেশী সে আর কিছু জান্‌ত না। কাজেই বাদ্‌শা যখন এসেই তাকে হুকুম দিলেন, আজ এক বিশেষ দরবারের অধিবেশন হবে, তখন সে ভাব্‌লে নিশ্চয়ই আয়াজ তার তুষ্কার্য্যে ধরা পড়ে গেছে, বাদশা তারই

শাস্তি-বিধান কর্‌বার জন্য বিশেষ দরবার ডাক্‌ছেন। সে খুব খুশী হয়েই সমস্ত জোগাড় করতে লেগে গেল, আর আয়াজের শত্রুর দলও ব্যাপারটা সেই রকমই এঁচে আহ্লাদে দিশে-হারা হয়ে পড়্‌ল।

যথাসময়ে সবাই দরবারে এসে উপস্থিত হল, বাদ্‌শা এলেন, আয়াজও এল। বাদ্‌শা মুখ খোলার উপক্রম কর্‌তেই উজীর আর তার কুচক্রী দলের লোকেরা ভাব্‌তে লাগ্‌ল না জানি কি গুরুতর শাস্তিই বাদশা আয়াজকে দিয়ে বসেন। কিন্তু তাঁর কথা শুনে তাদের চোখ একেবারেই ছানাবড়া—তিনি রাজকোষের সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করে শেষে বল্লেন, "ওহে দেশবাসীরা, তোমরা গুণের উপযুক্ত আদর কর্‌তে শেখ, আজ থেকে আয়াজ আর আমার চাকর নয়, সে আমার বন্ধু। তাকে আমি প্রধান উজীরের পদ দিলাম।"

সকলেই "সাধু সাধু" বলে উঠ্‌ল, বাদ শুধু উজীর মশাই, আর সেই হিংসুটে দলটী।

আলোকস্তম্ভের কথা

(শ্রীননীগোপাল মজুমদার)

নতুন যুগে বিজ্ঞানের কারসাজীর চোটে সমুদ্রকে আর সমুদ্র ব'লে লোকে মান্‌তে চায় না। নানা রকম যন্ত্রপাতি তৈরী হয়েছে, যাতে করে খুব সহজেই লোকেরা সাগর পাড়ি দিতে পারে—প্রকৃতি দেবীকে একেবারে সায়েস্তা করে লক্ষ্মী মেয়ে বানিয়ে ফেল্‌তে পারে। তাই মধ্যে মধ্যে সাগরও প্রলয়-মূর্ত্তি ধরে, তাণ্ডব নৃত্য নেচে বিদ্রোহ ঘোষণা করে থাকে, তার বুকের ভেতরকার ঘুমন্ত পাহাড়-পর্ব্বতদের সাহায্যে মানুষের ওপর শোধ নেবার চেষ্টা করে। জাহাজ এসে একবার এ গুলোতে লাগ্‌লেই হলো, তা হ'লেই একেবারে ঠাণ্ডা, সব ভেঙ্গে চুর্‌মার হয়ে যাবে। মানুষেরাও কিন্তু না-ছোড় বান্দা। তা'রা এই সব পাহাড়-পর্ব্বতগুলির উপর এক একটা ক'রে স্তম্ভ গড়ে তুলেছে, তাতে থাকে বিরাট বিরাট সব আলো।

সমুদ্রের বুকে, বহু দূর পর্য্যন্ত সেই আলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নাবিকেরা তা দেখেই টের পায় সেইখানে একটা রাক্ষুসে পাহাড় আছে।

এই আলোক-স্তম্ভ গুলি তৈরী কর্‌তে কিন্তু ভারী কষ্ট। কত কত দিন যে অনাহারে অনিদ্রায় যায়, কত কত বার যে প্রাণ যেতে যেতে বেঁচে যায়, তার সংখ্যা নেই। কেমন করে, কত দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে যে কয়েকজন বীর জগতের মঙ্গলের জন্যে কতগুলি আলোকস্তম্ভ গড়ে তুলেছেন সে কথাই আজ বল্‌বো।

এই আলোকস্তম্ভ জিনিষটীকে যত আধুনিক বল্‌লুম, আসলে কিন্তু এরা তত আধুনিক নয়। পৃথিবীর সেকালের সাত আশ্চর্য্যের মধ্যে Pharos দ্বীপের আলোক-স্তম্ভ ছিল অন্যতম। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরের কাছাকাছি দ্বীপটায় খৃষ্টের জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগে টলেমী ফিলাডেলফাস্‌ বলে একজন রাজা এটা বানিয়ে ছিলেন, যাতে করে এই বন্দরে আস্‌তে কারও অসুবিধে না হয়। চমৎকার সাদা মার্ব্বেল পাথরে আগাগোড়া তৈরী—সুন্দর, শুভ্র, অতুলনীয় ছিল এই আলোকস্তম্ভটী।

রোমান্‌রাও আলোকস্তম্ভ গড়েছিল অনেক, কিন্তু তার একটারও অস্তিত্ব আজ-কাল দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। পুরানো দলের মধ্যে ফ্রান্সের "কর্ডোয়ান স্তম্ভটাই" খালি বেঁচে আছে। প্রায় দুশো সাত ফিট উঁচু,—আর মজা হোল এই যে এটী একাধারে রাজবাড়ী, গীর্জ্জা এবং আলোকস্তম্ভ। রাজাও থেকে গেছেন এতে অনেক, পাদ্রীও ছিলেন ঢের, আবার জাহাজেরও চল্‌বার অনেক সুবিধা এর আলো করে দিয়েছে।

আজকালকার নতুন ধাঁচের স্তম্ভ তৈরী কিন্তু সুরু হয় জন্‌ স্মীটন বলে এক ভদ্রলোককে দিয়ে। বিলাতে এডিষ্টোন (Eddystone) নামে একটা ভারী সাংঘাতিক জায়গা আছে। সেখানে আলোকস্তম্ভের ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু সে টিঁক্‌লো না দু'দিনও, ভেঙ্গে পড়্‌লো। একটার পরে একটা গড়ে তোলা হ'তে লাগ্‌লো, আর ভাঙ্গতেও লাগ্‌লো ঠিক সে রকম ভাবেই। তখন স্মীটন সাহেব এলেন। তিনি দেখ্‌লেন বাড়ীর আকারে তৈরী কর্‌লে গেলে ত' কোন বাড়ীই সমুদ্রের উৎপাতে ঠিক দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌বে না। গাছের মধ্যে ও জায়গাটাতে আছে খালি 'ওক' গাছ। ব্যস্‌, তাঁর প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল, তিনি ওক্‌ গাছের মত এক বিরাট্‌ স্তম্ভ গড়ে তুল্‌লেন।

সেই থেকে আজ অবধি পৃথিবীর প্রায় জায়গাতেই আলোকস্তম্ভ গড়া হয় ওক্ গাছের মত করে।

এই এডিষ্টোন স্তম্ভটা গড়ে তুল্‌তে কারিগরদের কি রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল শুন্‌লে বাস্তবিকই ভারী কষ্ট হয়। আগেই বলেছি, এই স্তম্ভটা স্মীটনের আগেও তৈরী কর্‌বার চেষ্টা হয়েছিল কয়েক বার। কেন হলো না শোনো। প্রথম বার বাড়ীটা আরম্ভ করেছিলেন উইল্‌ষ্টান্‌লি বলে এক সাহেব। বাড়ীটা হচ্ছিল কাঠের; তাঁরা খানিকটা তৈরী করেছেন। একদিন বেলা শেষ হয়েছে, আঁধার এসে জগৎ ঘিরেছে, তাঁরাও খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়েছেন। সেই তাঁদের শেষ খাওয়া, শেষ ঘুম; রাত্রে সমুদ্র যে তাঁদের বাড়ীঘর শুদ্ধ কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল কেউ জানে না। তারপর চেষ্টা কর্‌লেন জন্ বাড্‌ইয়ার্ড—এঁর স্তম্ভটী গেল পুড়ে। লোকজন বাঁচলো বটে, কিন্তু স্তম্ভ আর উঠ্‌লো না। সবশেষে এলেন স্মীটন।

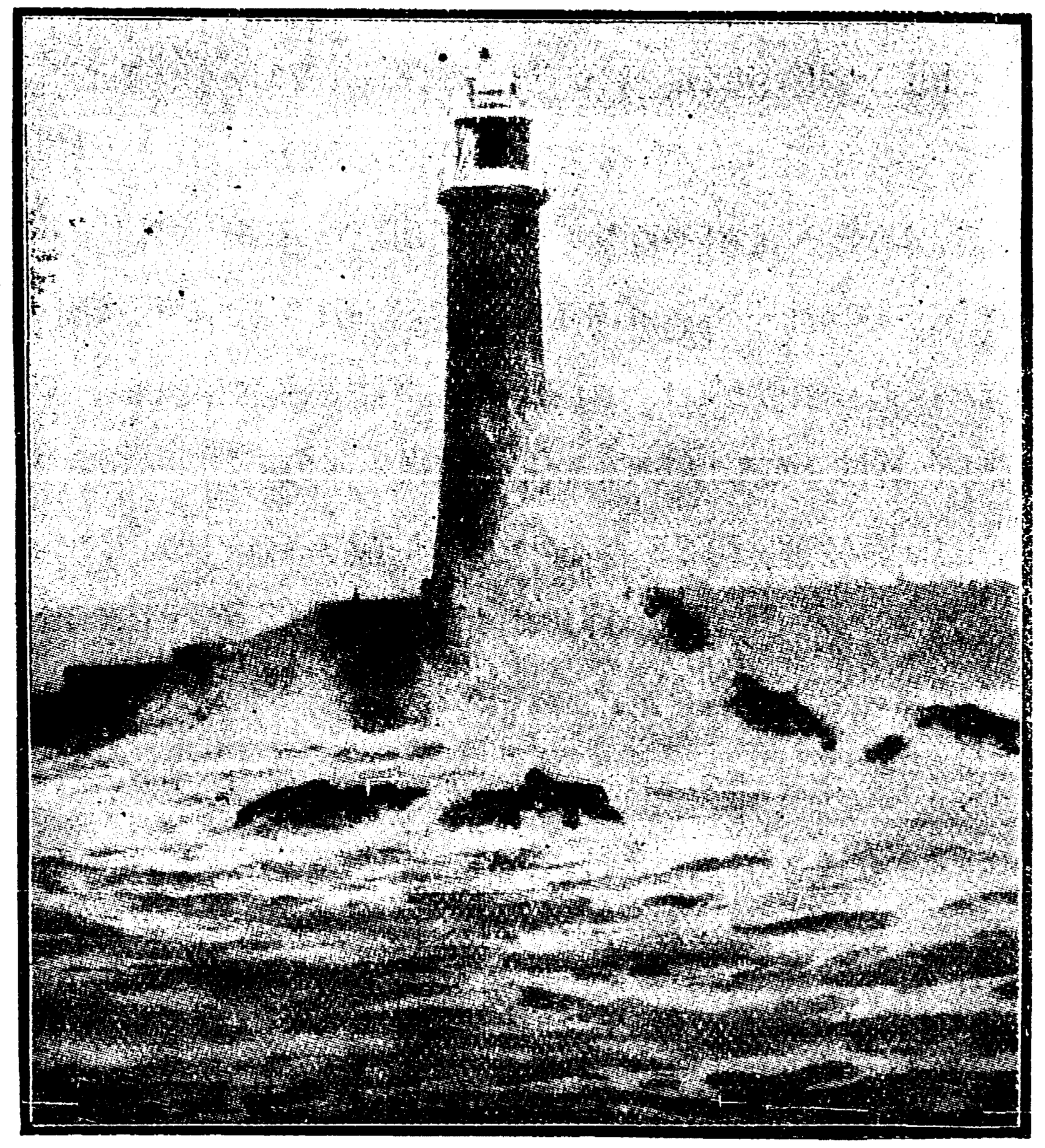

পেঙ্গ্লিন্সের লংসিপ্ লাইট্-হাউস।

এর পরেই যে স্তম্ভটা গড়্‌তে গিয়ে সত্যি সত্যি সাহসের কাজ কর্‌তে হয়েছিল, সেটা হলো স্কট্‌ল্যাণ্ডের কাছেই Inch cape পাহাড়ের উপর। তারই উপর রবার্ট ষ্টিভেনসন্ কবিতা লিখে গেছেন। জলের ঝাপ্‌টার পর ঝাপটা এসে গায়ে লাগ্‌ছে, মাটির উপর থেকে মিস্ত্রিদের ছিনিয়ে নিয়ে অতলে পাঠাবার জন্য সাগর প্রাণপণে চেষ্টা

কর্‌ছে, মস্ত মস্ত পাথর সব ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে যেন ক্রুদ্ধ সাপের মত গর্জ্জন হচ্ছে, বীর কারিগরদের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। পরের উপকার কর্‌বো বলে যারা নামে, প্রাণের পরোয়া তারা বড় করে না। কাজেই তাদের জয় হয় সর্ব্বত্রই। এখানেও তাই হলো, সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে মস্ত বড় এক স্তম্ভ ইঞ্চকেপ পাহাড়ের উপর গড়ে তোলা হলো।

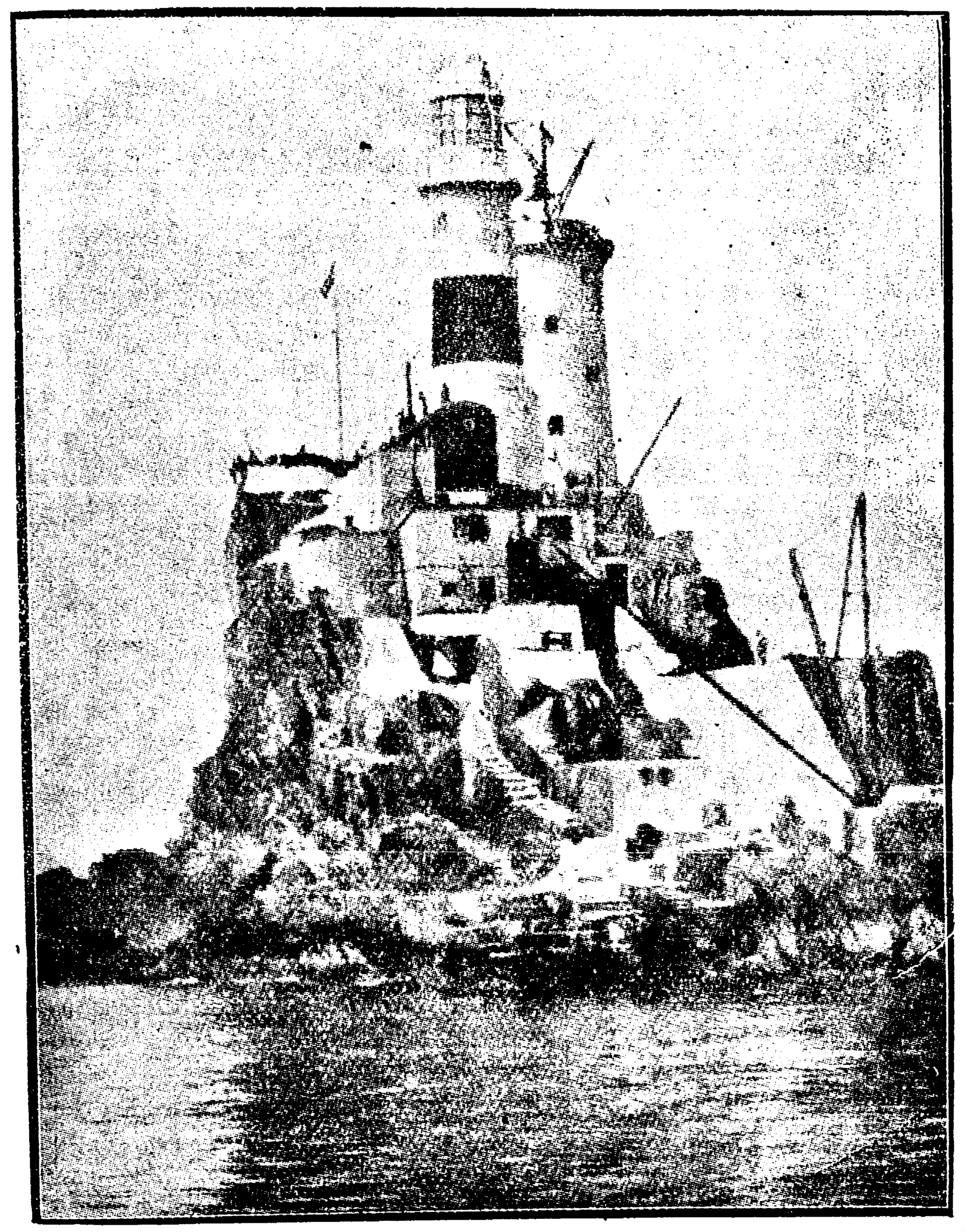

আয়ার্ল্যাণ্ডের ফাষ্টনেট্ রক লাইট্-হাউস্।

এর থেকেও দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে তুল্‌তে হয়েছিল বোষ্টনের কাছাকাছি "মিনো লেজ্" পাহাড়ের উপরকার আলোক-স্তম্ভটা। প্রথম দিন যখন কাপ্তান আলেকজান্দার সাহেব জায়গাটা দেখ্‌তে গেলেন সেখানে ভদ্রলোক দাঁড়াবারই সুযোগ পেলেন না, সারা পাহাড়টা ঢাকা শেওলা, ভারী পেছল। প্রায় সব জায়গাটাই জলে জলময়; যে জায়গাগুলিতে জল নেই সেখানেও বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বার জো নেই। লোকজন পাঠান হলো সেখানে সেগুলি তোলবার জন্যে। উঃ, কী পরিশ্রমটাই না তারা করেছে! মস্ত মস্ত ঢেউগুলি যখন আস্‌তে

থাক্‌তো, এক জন লোক তখন তাড়াতাড়ি চেঁচিয়ে উঠ্‌তো, আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই স্রোতের সাম্‌নে যা পেত তাই ধরেই পাহাড়ের বুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়্‌তো। মধ্যে মধ্যে তাদের নিয়ে যাবার জন্যে যেসব নৌকা আস্‌তো, পাড়ে লাগাতে সাহস কর্‌তো না তারা ; একটা করে দড়ি ছুঁড়ে দেওয়া হোত, সেই দড়ি ধরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে জলে ঢেউয়ের উপর উঠ্‌তে পড়্‌তে, উঠ্‌তে পড়্‌তে, যেতে হোত্। এম্‌নি ভাবে ক্রমাগত পাঁচ বছর চলে গেলে তবে এই স্তম্ভটা শেষ করা হলো।

যাঁরা জাহাজ ক'রে লোকজন, জিনিষপত্র, খাবার-দাবার নিয়ে উত্তর মেরু, দক্ষিণ-মেরু আবিষ্কার কর্‌তে গিয়ে প্রাণ হারান, তাঁদের আমরা শ্রদ্ধা করি যথেষ্ট, কিন্তু যেসব বীরেরা মানুষের উপকারের জন্য নীরবে প্রাণ দেন তাঁদের নাম আমরা করি অল্পই। এই কাজেই কত কত কারিগরদের যে প্রথম দিনই জিনিষপত্র যন্ত্রপাতি শুদ্ধ সমুদ্রের জলে ভেসে যেতে হয়েছে কে তার সংখ্যা করে? বাস্তবিকই বীরত্বের কাহিনী বল্‌তে গেলে এদের বাদ দেওয়া চলে না।

ঘোষচৌধুরীর ঘড়ি

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

"পোষাক বদ্‌লাবার কিন্তু আর প্রয়োজন হ'ল না। নানা গলি ঘুঁজি ঘুরে আপনি এগোতে লাগ্‌লেন, ছায়ার মত আমি বরাবর আপনার পেছনে, আপনার মনে বেশ সন্দেহ হ'ল পেছনে ফেউ লেগেছে, আড়্‌চোখে বার বার ফিরে ফিরে চাইতে লাগ্‌লেন পর্য্যন্ত, কিন্তু কোন ক্রমেই টের পেলেন না সে ফেউটি কে। বাসে গিয়ে আপনি উঠ্‌লেন, ঠিক আপনার সাম্‌নে এমন একটা জায়গায় চেপে বস্‌লাম যাতে আমার সমস্ত মুখটা আপনার নজরে আসে, তবু আপনি ফেল্। বুঝ্‌লাম, পোষাক সম্বন্ধে আর ভাব্‌নার কারণ নাই। কিন্তু শুধু নকল পোষাকেই তো কুলোবে না, গলা দিয়ে নকল আওয়াজও যে বার করা চাই। ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী বাজখাঁই গলায়

গান ধর্‌লাম। কিন্তু কই, চিন্‌তে পেরেছেন এমন কোন লক্ষণই তো প্রকাশ পেল না—একেবারে ডবল ফেল্!

"গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে বাস্ থেকে নেমে আপনি লেনের ভেতর ঢুক্‌লেন, আমিও তাই। হঠাৎ দেখি আপনি মাল্‌কোছা মার্‌ছেন! এতদিন এক সঙ্গে বেড়িয়েও কি মনে করেন বুঝ্‌তে পার্‌লাম্ না যে ওভাবে মাল্‌কোছা মারার অর্থ আর এক মুহূর্ত্ত পরেই বাঘের মত আমার ঘাড়ের ওপর আপনি লাফিয়ে পড়্‌বেন? কিন্তু নিজের ঘাড়ের ওপর আপনার ঐ মুগুর-ভাঁজা দেহটার ওজন বইতে ঘোরতর আপত্তি থাকায় এবং কাজ সফল হবার আগে কাউকে পরিচয় দেওয়া স্বভাব-বিরুদ্ধ হওয়ায়, তাড়াতাড়ি আমি রাস্তার পাশে একটা ডাষ্ট্‌বিনের আড়ালে বসে পড়্‌লাম। পর মুহূর্ত্তেই আপনি ফিরে দেখেন ভোজবাজীর মত আমি উড়ে গেছি। দারুণ বিস্ময়ে আপনি সাম্‌নে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে খোঁজ কর্‌তে লাগ্‌লেন আমি গেলাম কোথায়, আর সেই ফাঁকে আমিও উল্টো দিকে একটু এগিয়ে ডাইনের গলি ধরে একেবারে বড় রাস্তায়।

"এইবার বিরূপাক্ষ আচার্য্যের সঙ্গে বোঝাপড়া। সবচাইতে আগে দেখা দরকার, কিজন্যে সে ডান হাতটা কাঠের ফ্রেমে ঢেকে তার ওপর ব্যাণ্ডেজ্ বেঁধেছে—অর্থাৎ সত্যি সত্যিই তার হাত জখম হয়েছে কিনা। যদি প্রমাণ পাই আসলে হাত তার অক্ষতই আছে, তবে স্পষ্টই বুঝ্‌তে হবে সেদিন রাত্রে আপনাতে আর আমাতে যে সব কথা হয়েছিল তা সমস্তই সে শুনেছে, এবং পাছে তার বাড়্‌তি আঙ্গুলটা আমাদের লক্ষ্যে আসে সেই ভয়ে আগে থেকেই সাবধানী হয়ে ন্যাক্‌ড়ার ফালিতে সেটা ঢেকে ফেলেছে। এ হ'লে সে-ই যে চোর সে সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাক্‌বে না।

"কিন্তু কি করে জানা যাবে সত্যি সত্যিই কোন য়্যাক্‌সিডেণ্টে হাত তার ঘাল হয়েছে কিনা! মানুষ আর যাই করুক, ইচ্ছে করে ক্ষিধের সময় খাওয়াটাকে নষ্ট কর্‌তে বড়ই গর্‌রাজী। কাজেই খবরটা জান্‌বার পক্ষে খুবই সুবিধে হয়, যদি রাত্রে বাড়ী ফিরে বিরূপাক্ষ আচার্য্য যখন খেতে বস্‌বে কোন ফিকিরে সেই সময়টাতে সেখানে আমি উপস্থিত থাক্‌তে পারি। হাত অক্ষত থাক্‌লে ব্যাণ্ডেজ্ খুলে সে খেতে বস্‌বেই,

চাম্‌চে বা অন্য কিছুর সাহায্যে বাঁ হাতেও সে খেতে যাবে না, বা অপর কারো সাহায্য নিয়ে খাওয়া নষ্ট কর্‌তেও সে রাজী হবে না। ওদিকে আবার হাতে যে ধরণের ব্যথা হয়েছে বলে সে জাহির করে বেড়াচ্ছে, সত্যি সত্যিই তাই হলে সে হাতে ভাত মেখে খাওয়া তার অসম্ভব—দেখেন্‌ নি সামান্য একটু ছোঁয়াচ্‌ লাগ্‌লেই 'উহুহুঃ' করে উঠ্‌ছিল ?

"এই খবরটুকু নিতে পার্‌লেই রহস্য সম্পূর্ণ ভেদ হয়ে যায়, কাজেই এতটুকু সময় আর নষ্ট না করে একেবারে শেয়ালদয় গিয়ে হাজির হ'লাম। তারপর বারাক্‌পুর গিয়ে পৌঁছুতে আর কতক্ষণ ?

"কোন কাজ করতে গেলেই গোড়াটা আগে ঠিকমত সাম্‌লে চল্‌তে হয়। ধরুন, এমন কোন ঘটনাও তো সেখানে ঘট্‌তে পারে যার ফলে আমায় নিজেকেই গোপন করে ফেলার দরকার হবে ; কাজেই সে ব্যবস্থাও আগে হতেই ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। আপনি জানেন বোধ করি যে চুল-ছাঁটার কাজে আমাদের জাতের লোকেরা ভারী ওস্তাদ্‌। এই কল্‌কাতা সহরে হাল ফ্যাসানের যত হেয়ার-কাটিং সেলুন আছে, সবার সেরা হচ্ছে জাপানী সেলুন—বড় বড় সাহেবরা সব সেখানকার খদ্দের। বারাক্‌পুরের ওপর একটা ক্যান্টন্‌মেণ্ট্‌ রয়েছে, বিস্তর সাহেবসুবো সেখানে থাকে, তাই সেখানেও এক জাপানী গিয়ে চুল-ছাঁটার সেলুন খুলেছে। এ লোকটী আমারই খুব জানাশোনা, স্বজাতি বলে আমায় বড়ই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ষ্টেশন থেকে 'সেলুন'টাও তার কাছেই ; কি জন্য এসেছি সেটা খুলে না বল্লেও একটু আভাস দিয়ে তাকে জানিয়ে রাখ্‌লাম, দুপুর রাত পর্য্যন্ত সে যেন একটু সজাগ থাকে, কেননা যে কোন মুহূর্ত্তেই হয়তো আমি পলাতক হয়ে তার সেলুনে এসে লুকোতে পারি।

"তারপর একটু খোঁজ-খবর নিয়ে সেই হিন্দুস্থানী বেশেই এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলাম। আপনি চম্‌কাবেন না বিরূপাক্ষ বাবু, পর পর তিন তিনটে মৎলব ঠাওরান ছিল, একটায় না হলে আর একটা ফিকিরে আপনার খাবার ঘরে ঢুক্‌তামই আমি। ভগবান্‌ কিন্তু নিজে থেকেই সুযোগ জুটিয়ে দিলেন—বাড়ীর চাকরটাকে 'খৈনি' দিয়ে একটু আপ্যায়িত করে চাক্‌রীর কথা পাড়্‌তে সে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে উঠ্‌ল, তাদের বাড়ীর হেঁসেলের ভার বইতে আমি রাজী

আছি কিনা। মনে হ'ল হাতে হাতে বুঝি স্বর্গ-ই মিলে গেল, জানালাম, খুব রাজী। একটু বাদেই সে আমায় সঙ্গে করে তার মুনিবের কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে যা দেখ্‌লাম্‌ তাতে আর এক মুহূর্ত্ত না থেকে সোজা কল্‌কাতা চলে এলেও কোন ক্ষতি হোত না—আমার যা প্রয়োজন তা সেই মুহূর্ত্তেই সিদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। কেন ? এই আচার্য্য মশাই সেখানে দাঁড়িয়ে ডান হাতে এক ইলেক্‌ট্রিক্‌-ইস্ত্রির সাহায্যে বিপুল চাপে তাঁর একটা জামা ইস্ত্রি কর্‌ছিলেন। হাতে যার অমন চোট্‌ লেগেছে সে কখনো ওভাবে ইলেক্‌ট্রিক্‌ ইস্ত্রি ব্যবহার করতে পারে ? বুঝ্‌লাম, সবই ফাঁকি।

"বাড়ীর চাকর এঁকে বলেছিল আমি কল্‌কাতা থেকে এসেছি ; কিন্তু কল্‌কাতা কথাটা না বলাই ভাল মনে করে একটু শুধ্‌রে নিয়ে বল্লাম, বালীগঞ্জে আমার বাস। সেখানকার একজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের নাম কর্‌লে হয় তো আমার কথায় আরো বিশ্বাস হবে, তাই আরো জানালাম যে সুরেন বাবুর বাড়ীতে আমি আগে কাজ কর্‌তাম। সুরেন বাবুকে এই বিরূপাক্ষ আচার্য্যের খুবই চেনার কথা, কেননা প্রোফেসার গুপ্তের কাছে কার্য্যসূত্রে অনেক সময়েই তিনি আসা-যাওয়া কর্‌তেন। কোন অশিক্ষিত হিন্দুস্থানীর মুখে একজন বিদ্বান্‌ লোকের নাম শুন্‌লে সবাই তার কথায় বিশ্বাস করে থাকে।

"আমার যা জান্‌তে আসা তাতো আগেই জানা হয়ে গেছে। তবুও কতকটা রাত আচার্য্য-বাড়ীর হেঁসেলে কাটিয়ে রাত একটু গভীর হ'লে বাকী সময়টা আরামে কাটাবার জন্যে পাঁচীল টপ্‌কে জাত-ভায়ের সেলুনে এসে উপস্থিত হলাম। সে বেচারা তখন পর্য্যন্ত একটা পোষাক মজুত রেখে আমার জন্যে ঠায় বসে ছিল, যাতে আমি তাড়া খেয়ে দৌড়ে দোকানে এসে ঢুক্‌লে, এক নিমেষে হিন্দুস্থানী থেকে জাপানী বনে যেতে পারি। তারপর কল্‌কাতা এসে যখন পৌঁছালাম তখন পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল।"

হুকা-কাশির বর্ণনা শেষ হইলে রণজিৎ স্তব্ধ ভাবে খানিকক্ষণ বুদ্ধির এই অবতারটীর দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর বলিল, "ধন্য আপনি, মিষ্টার হুকা-কাশি, বাস্তবিকই আপনি ধন্য ! এর বেশী আর কিছু আমার মুখ দিয়ে বার হচ্ছে না।" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল, "কিন্তু একটা কথা তেমন বুঝ্‌তে না পেরে আমার মন বড়ই উস্‌ খুস্‌ কর্‌ছে, এ লোকটা এক টুক্‌রো রেয়ার

আর্থ মেটাল্ নিয়ে এত সব কাণ্ড করল কেন? সে জিনিষটাই বা কি, আর এত জায়গা থাক্‌তে এক ঘড়ির দোকানে ঢুকে ঘড়ির ডালার নীচে সেটা পোর্‌বার দরকারই বা কি পড়্‌ল তার? ব্যাপারটা তেমন বুঝ্‌তে পারছি না।"

হুকা-কাশি বলিলেন, "না বুঝ্‌তে পার্‌বার কথাই বটে।...আপনি খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আমি সবার প্রথমেই এঁকে প্রশ্ন করেছি, 'কি লুকিয়ে রেখেছিলেন ঘড়ির ভেতর, বলুন,' জবাব এল 'এক টুক্‌রো রেয়ার আর্থ্ মেটাল।' এই একটী জবাব এবং প্রোফেসার গুপ্তের শোচনীয় মানসিক অবস্থা—দুটী জিনিষ মিলে সমস্ত ব্যাপারটা এক নিমেষে আমার কাছে জল করে দিয়েছে, বায়োস্কোপের ছবির মত ঘটনা গুলো পর পর যেন সব আমার চোখের সাম্‌না দিয়ে ভেসে যাচ্ছে। আমি বলে যাই, আপনি শুনুন।" তারপর বিরূপাক্ষ আচার্য্যের দিকে তাকাইয়া তিনি বলিলেন, "আপনিও মন দিয়ে শুনে যান, যেখানে যেখানে ভুল যাবে শুধ্‌রে দেবেন।"

"কিছুদিন আগে দুর্গা পূজো উপলক্ষে 'ক্রণিক্লার' নামে খবরের কাগজের একখানা বিশেষ সংখ্যা বার হয়। কাগজের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত নামজাদা লোকের কাছ থেকেই প্রবন্ধ যোগাড় করে ছাপিয়েছিলেন, কাজেই সে সংখ্যা খানা কি রকম উঁচুদরের জিনিষ হয়েছিল তা তো বুঝ্‌তেই পার্‌ছেন। ভাল জিনিষ সবাই আগ্রহ করে পড়ে, আমিও একখানা কিনেছিলাম। তাতে প্রোফেসার গুপ্তও একটা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ দিয়েছিলেন—রেয়ার আর্থ মেটাল্ জিনিষটা যে কি সেটা পড়েই প্রথম আমি তা জান্‌তে পারি। তিনি লিখেছিলেন, সম্প্রতি রসায়ণ-শাস্ত্রে এক ধরণের নতুন ধাতু বেরিয়েছে, তার নাম রেয়ার আর্থ্‌মেটাল। রেয়ার আর্থ্‌মেটাল্ এক রকমের নয়, অনেক রকমের হতে পারে। সব রকমের রেয়ার আর্থ্‌মেটাল্ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কারও হয়নি, ভবিষ্যতে হয়তো হবে। পৃথিবীর বড় বড় পণ্ডিতেরা বিবেচনা করেন, এই রেয়ার আর্থ মেটাল্ থেকে এমন কতগুলি জিনিষের আবিষ্কার শীগ্‌গিরই হয়তো সম্ভব হবে, যাতে সারা বিজ্ঞান-জগৎ একটা বড় রকমের নাড়া-চাড়া খেয়ে যাবে।

"এই পর্য্যন্ত আমার জানা ছিল। তারপর সেদিন বিমল বাবুর মুখে শোনা গেল,

অক্লান্ত পরিশ্রমের সঙ্গে প্রোফেসার গুপ্ত সম্প্রতি এক গভীর গবেষণায় মেতে ছিলেন, কিন্তু কি বিষয়ের সে গবেষণা কেউ তা জান্‌তো না। আজ তাঁরই ল্যাবোরেটারী য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ এক টুক্‌রো রেয়ার আর্থ্‌মেটাল চোরের মত লুকিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে দেখে বেশ স্পষ্টই বুঝ্‌তে পার্‌ছি এই রেয়ার আর্থ্‌মেটালই ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়।

"কেন যে প্রোফেসার গুপ্ত তাঁর এই যুগান্তরকারী গবেষণা এত গোপনে গোপনে করে যাচ্ছিলেন তার একটা বেশ বড় রকমের কারণ আছে। আপনার মনে আছে কি না জানি না, একবার তাঁরই আর একটা আবিষ্কার অন্য একজন লোক বেমালুম নিজের নামে পৃথিবীতে চালিয়ে দিয়েছিল। সেই থেকে প্রোফেসার গুপ্ত সাবধান হয়ে গেছেন, সবটা জিনিষ বার কর্‌বার আগে আর তাঁর গবেষণার কথা বাইরে প্রকাশ করেন না।

"অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং সাধনার জোরে ছোট্ট এক কণিকা নতুন রেয়ার আর্থ্‌মেটাল আবিষ্কার করে তার থেকে ক্রমে বড় দরের একটা কিছু কর্‌বার চেষ্টায় তিনি ছিলেন। এত সাবধানতা সত্ত্বেও কিন্তু তাঁর এই গবেষণার বিষয়টী আর একজন লোক টের পেয়ে যায়—ল্যাবোরেটারী য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট্ বিরূপাক্ষ আচার্য্য।

"এই টের পাবার ফলেই কিন্তু এক অতি জঘণ্য মৎলব তার মাথায় এসে ঢুক্‌লো যা কর্‌তে অতি বড় পাষণ্ডেরও বোধ করি বাধ বাধ ঠেকে; কিন্তু ল্যাবোরেটারী-য়্যাসিষ্ট্যাণ্টের তা ঠেক্‌ল না। বহুদিনের অক্লান্ত, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের ফলে প্রোফেসার গুপ্ত যে এক কণিকা নতুন রেয়ার আর্থ্‌মেটাল আবিষ্কার করেছেন, যে করেই হোক্ সে সেটুকু সরিয়ে ফেল্‌বে—এই হোল তার মৎলব। ভেবে দেখুন তা যদি সে কর্‌তে পারে তো কত বড় লাভের সম্ভাবনা তার! কিছুদিন বাদেই নিজের আবিষ্কার বলে সে সেটাকে চালিয়ে দিতে পার্‌বে, দেশ-দেশান্তরে কতখানি খ্যাতি-প্রতিপত্তি তার ছড়িয়ে যাবে—চাই কি বিজ্ঞানের ইতিহাসে তার একটা নাম থেকে যাওয়াও বিচিত্র নয়। ভবিষ্যতের এই রঙ্গীন স্বপ্নে সে ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ভুলে গেল, যাঁর দয়ায় আজ সে লোক সমাজে মাথা তুলে চল্‌তে পার্‌ছে তাঁরই ঘরে বসে, তাঁরই সর্ব্বনাশের ফন্দি-ফিকির খুঁজ্‌তে সে এতটুকু কসুর কর্‌ল না। শুধুই সে সন্ধানে রইল কি করে ও জিনিষটুকু সরিয়ে ফেল্‌বে। কিন্তু প্রোফেসার গুপ্ত বড়ই সাবধানী;

চা খেতে ওপরে যেতে হলে পর্য্যন্ত নিজের ঘরের দরজাটী তিনি বেশ করে বন্ধ করে তবে যান। সুযোগ আর মেলে না।

"এদিকে গবেষণার কাজ তাঁর ক্রমেই এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌ল, ফল মেল্‌বার সময় খুবই কাছিয়ে এল। ফলে তাঁর খাটুনী চারগুণ বেড়ে গেল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের ফূর্ত্তিও বেড়ে গেল ঠিক্ আট গুণ। এই কথাই বিমল বাবু বার বার বল্‌ছিলেন, মনে আছে তো? কিন্তু বোধ করি এই অতি বেশী আনন্দের চোটেই এক দিন তিনি এক দারুণ ভুল করে বস্‌লেন,—ওপর থেকে চা খাওয়ার ডাক এলে দরজা বন্ধ না করেই চলে গেলেন। নয় কি?" বলিয়া হুকা-কাশি বিরূপাক্ষ আচার্য্যের দিকে তাকাইলেন।

বিরূপাক্ষের মাথা প্রায় মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল, সে কোন মতে জবাব দিল, "হাঁ।"

হুকা-কাশি তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "এবং ঠিক সেই সময়েই আপনিও এসে সে বাড়ীতে ঢুকেই দেখেন প্রোফেসারের ঘর খোলা। যাঁহা তক্ দেখা, অম্‌নি চট্ করে ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর থেকে রেয়ার আর্থ্ মেটাল্‌টুকু সরিয়ে ফেলা! নয়?"

বিরূপাক্ষ আচার্য্য এবার আর কোন জবাব দিল না, মাথা গুঁজিয়া বসিয়া রহিল। হুকা-কাশি কিন্তু সেই ভাবেই বলিয়া চলিলেন, "জিনিষটা বার করে এনেই আপনার মনে ধোকা লাগ্‌ল কোথায় সেটুকু লুকিয়ে রাখা যায়? নিজের কাছে চোরাই মাল রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। বাড়ীর সব জায়গাই সর্ব্বদা ঝাঁড়-পোঁছ হচ্ছে আর তা ছাড়া হাল্‌কা জিনিষ যেখানে সেখানে রাখ্‌লে বাতাসে উড়ে যাবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে আপনাকে কেউ দেখেনি, তাই চট্ করে আপনি অম্‌নি রাস্তায় নেমে পড়্‌লেন। কিন্তু বড়ই মুস্কিল, কোথাও গিয়ে এটাকে লুকিয়ে রেখে আস্‌তে হলে ফির্‌তে ঢের দেরী হয়ে যাবে, হয় তো প্রোফেসার গুপ্তের সন্দেহ আপনার ওপরেই পড়্‌বে। আর তা ছাড়া এমন একটা জিনিষ আপনি পরের কাছে রাখতেই বা যাবেন কি করে? বাড়ীও আপনার কল্‌কাতায় নয়। এই রকম সাত-পাঁচ কথা ভাব্‌তেই হঠাৎ রাস্তার ধারে ঘড়ির দোকানটার ওপর আপনার

দৃষ্টি পড়্‌ল—চেনা দোকান বোধ করি, দেখ্‌লেনও যে দোকান-দার একটু আড়ালে গেছে। অম্‌নি তাড়াতাড়ি সেখানে ঢুকে সাম্‌নেই যে ঘড়িটা পেলেন তারই পেছনের ডালার নীচে রেয়ার আর্থ্ মেটাল টুকু লুকিয়ে ফেল্‌লেন। ভাব্‌লেন উপস্থিত তো রইলো এখানে, পরে যে করে হোক্ বার করে নেবে'খন। এই সব ব্যাপারে কিছু সময় গেল, তাই প্রথম দিনে আমাদের বল্‌ছিলেন যে সেদিন আপনি পঁচিশ মিনিট্ লেট্ হয়েছিলেন, আসলে কেন যে হয়েছিলেন লেট্ তা এখন বুঝ্‌ছি!

"ঘড়ির দোকান থেকে প্রোফেসার গুপ্তের বাড়ী ফিরেই হয় তো আপনি ভেবেছিলেন দেখ্‌বেন—তিনি চা খেয়ে নীচে এসেই রেয়ার আর্থ্ মেটাল টুকু নেই দেখে সমস্ত লেবরেটারী-ময় হৈ চৈ করে তাই খুঁজ্‌তে লেগে গেছেন। কিন্তু তা নয়, আপনার এই চণ্ডালের মত ব্যবহারে তাঁর যে মনে কি দারুণ আঘাত লাগ্‌ল, কতখানি আশা ভঙ্গ হল তার এতটুকু বোঝ্‌বার ক্ষমতা আপনার মত লোকের থাকা সম্ভব নয়। দু'চার দিনের ভেতরেই যে আবিষ্কারে সমস্ত বিজ্ঞান-জগৎ তোলপাড় হয়ে উঠ্‌বে, এক মুহূর্ত্তে তারই গোড়া ভূমিসাৎ হয়ে গেছে দেখে যে ভীষণ 'শক্' তাঁর মনে লাগ্‌ল, এ বৃদ্ধ বয়সে তিনি আর তা সহ্য কর্‌তে পার্‌লেন না, জ্ঞান-হারা হয়ে মাটীতে লুটিয়ে পড়্‌লেন। পাষণ্ড আপনি, আপনার জঘণ্য কাজে দেশ তার এত বড় প্রিয় সন্তানটীকে হারাতে বসেছিল! তাই বল্‌ছিলাম, আপনার উপযুক্ত শাস্তি—ঐ" বলিয়া হুকা-কাশি দেওয়ালে টাঙ্গানো বেতখানাকে আর একবার দেখাইয়া দিলেন।

* * * *

ভাবুক লোকেরা অনেক সময় বলিয়া থাকে পৃথিবীটা যাদুঘরের মত। বোধ হয় তাঁহারা ভুল বলেন না। কিছুদিনের মধ্যেই প্রোফেসার গুপ্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিলেন—তাঁর মানসিক শক্তি ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, বিরূপাক্ষের বিষয় সমস্ত শুনিয়াও তিনি বিমল বা রণজিৎকে তার বিরুদ্ধে কিছুই করিতে দিতে রাজী হইলেন না, বলিলেন, "থাক্ থাক্, ছেলে-মানুষ নিমেষের ভুলে একটা কাজ করে বসেছে, এর জন্যে এর সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ করে দিতে আছে কি?" যে পৃথিবীতে বিরূপাক্ষ আচার্য্যের বাস, প্রোফেসার গুপ্তও আবার সেখানকারই লোক। দুনিয়া যাদুঘরই বটে।

রণজিৎ এবং বিমল কিন্তু বিরূপাক্ষকে আর প্রোফেসার গুপ্তের সংশ্রবে আসিতে দিল না। পাঞ্জাবে কোথায় তার এক কাকা থাকিত, বিরূপাক্ষ সেখানে চলিয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত আর সে বাংলা দেশে পা দেয় নাই।

সমাপ্ত।

অগ্নিকাণ্ড

(শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, এম্ এ)

মোড়লের ঘরে আজি হাহাকার
অগ্নি নাই—
উনুন ধরেনি, ছুটে গেল তা'র—
ভগ্নী তাই।
পাশের বাড়ীতে মিলিল বিন্দু
সর্ব্বভুক্,
দেখি তা'র ছিরি জ্বলিল কিন্তু
মর্ম্ম-বুক।
আনি চালে গুঁজি' বহ্নির রাখে
বাচ্চাটাক,
"আসুক মোড়ল, দেখুক সে আগে
আচ্ছা থাক্!"
বাচ্চা কিন্তু আচ্ছা করিয়া
হাস্ত তা'র
চড়ায় চালেতে সুখেতে ভরিয়া—
আস্ত তা'র।
মোড়লের বোন তখন বিকাশি'
দন্ত-রুচি,

"কোথায় রহিল" কহিল সে হাসি'
দন্ত-পুঁজি?
মোড়লের ঘরে কিসের অভাব?
জব্দ সবে!
শুনেছে কে হেন অগ্নি-প্রতাপ
শব্দ করে?"
মোড়ল আসিয়া শুধু চোখে ভরি'—
ঘর্ম্ম রোগ,
বাহবা দানিল, ছানাবড়া করি'
চর্ম্ম-চোখ।

বন্তিনাথের বিয়ে

(শ্রীধীরেন্দ্র রায়)

বন্তিনাথের মুখে হামেশাই একটা ডোন্ট-কেয়ার ভাব। পাড়ার কাউকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। পন্ত কাকা এসে নালিশ করেন, "বৌঠান্ ছেলেটাকে একটু সাম্লাও—কাল নষ্টচন্দ্র দিনে আমার বাগানটাকে একেবারে সাবাড় করে এসেছে। তোমার ছেলের দৌরাত্ম্যে কি আমরা পাড়া ছাড়্বো?"

ক্ষান্ত পিসী মুখখানাকে হাঁড়ির মতো করিয়া বলেন, "আর আমারই শশা-ক্ষেত-খানার রেখেছে নাকি কিছু? তোমাকে বলে রাখ্ছি বউ, এ ছেলে যদি তোমার ফাটকে না যায় তবে তোমরা আমার নামে কুকুর পুষো।"

কেদার বাবু দুঃখ ক'রে বলেন, "ছেলের আমার পরকালটা ঝর্ঝরে হয়ে গেছে।"

বক' আর ঝক' বন্তিনাথের সেদিকে গেরাহ্যই নাই।

বাভুল গাঁয়ের ইস্কুল, আঁকের মাষ্টার জগদীশ চক্রবর্ত্তী। বিক্রমে তাঁর বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। ছেলেরা তো তাঁকে যমের মতো ভয় ক'রে চলে!

এ হেন জগদীশ বাবু সেদিন ক্লাশে ঢুকেই বোর্ডে আঁক লিখে দিলেন। সেই চৌবাচ্চার আঁক। দুই নলে জল ঢোকে, এক নলে বেরিয়ে যায়, কতক্ষণে চৌবাচ্চা ভর্‌বে ?

আঁক লিখে দিয়েই তিনি ফি দিনের মতো পাশের ঘরটিতে চলে যান। সেখানে মাষ্টার মশায়দের তামাক খাবার বন্দোবস্ত ছিল।

বরাবর জগদীশ বাবু একটু দেরী করেই ফির্‌তেন। সেদিন কিন্তু চট্‌ করে ফিরেই ক্লাসে ঢুকে বদ্যিনাথকেই তিনি জিজ্ঞেস ক'রে বস্‌লেন, "আঁক কষা হয়েছে ?"

বদ্যিনাথ বইয়ের দিকেই চোখ রেখে শান্ত ছেলেটির মতো আম্‌তা আম্‌তা ক'রে বল্লে, "ভালো বুঝ্‌তে পারিনি, সার।"

রেগে উঠে আঁকের মাষ্টার মশাই বল্লেন, "লক্ষীছাড়া ছেলে, কোন্‌খানটা বোঝনি শুনি ?"

মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে বদ্যিনাথ বল্লে, "জল যদি ঢোকে তো বেরিয়ে যায় কেন সার ?" আঁকের মাষ্টার মশাই প্রশ্ন শুনে ওর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন।

গোবর্দ্ধনটা হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, বুঝ্‌ছিস্‌ নে, জল বেরোয় আমাদের পোড়া অদেষ্টে।

এম্‌নি সময় ক্লাশের ভালো ছেলে বিমল ধাঁ ক'রে বদ্যিনাথের খাতাখানা টেনে তুলে ধ'রে বল্লে, "এই দেখুন সার, এর কীর্ত্তি !" সবাই চেয়ে দেখি, বদ্যিনাথ তার খাতায় খুব মনোযোগ দিয়ে একটা গড়গড়া এঁকে বসে আছে।

রাগে জগদীশ বাবু অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে উঠ্‌লেন। বিমলকে বাদ দিয়ে একদিক্‌ থেকে ভীষণ ভাবে সেই যে প্রহার চল্‌ল, আমাদের পিঠের চাম্‌ড়া ফুলে উঠ্‌ল। বদ্যিনাথ আর গোবর্দ্ধন তো ষাঁড়ের মতো চেঁচাতে লাগ্‌ল। চীৎকার শুনে হেড্‌মাষ্টার মশাই স্বয়ং এসে বারান্দায় হাজির হওয়ায় তবে আমরা সে যাত্রা রক্ষা পাই।

ইস্কুল ছুটি হ'য়ে গেল। গোবর্দ্ধন ডাক্‌লে, "বদে !" বদ্যিনাথ বল্‌লে, "গোব্‌রা !"

আমরা কয়েক জনা তাদের পেছনে পেছনে চল্লুম। বিমলের ছোট ভাইটা

অমল না কি নাম, সে আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করে হাসে। গোবর্দ্ধন তো ঘুসি বাগিয়ে ওর দিকে ছুটে যায় আর কি !

আমরা বাধা দিলুম, আরে ছ্যা, এক ফোঁটা ছেলে, ও কি তোমার সাথে যুঝ্‌বার যুগ্যি, না আর কিছু ? পার ওর ভাইটাকে ঘায়েল কর্ত্তে, তবে বুঝ্‌বো হাঁ বীর বটে। বিম্‌লেটা তো ইস্কুলের ডনের আখড়ায় কুস্তি ক'রে ক'রে দিন দিন ষণ্ডা হ'য়ে উঠেছে ; সে যাই হোক্‌ এই যে বিনা দোষে আমাদের পিটিয়ে তূলোধুনো ক'রে দিলে আগে তার ব্যবস্থা, পরে আর সব।

ইস্কুলের দক্ষিণ দিকে ঠিক দেয়ালের নীচেই ছোট্ট একখানি ক্ষেত। ওপাশে একটি আম বাগান, মাঝে মাঝে ছোট ছোট ঝোপ।

তারই একটি ঝোপের আড়ালে আমাদের পরামর্শ সভা বস্‌ল। যেমন করেই হোক্‌, এ শাস্তি এবং অপমানের শোধ তোলা চাই-ই। গোবর্দ্ধন বল্‌লে, "বিম্‌লেটাকে একেবারে হাটু-ভাঙ্গা 'দ' ক'রে দিতে না পারি তো আমার মনের ঝাল মিট্‌ছে না।"

আমাদের দলে বিমলের একটি মাসতুতো ভাই ছিল, গণেশ। আজ তিনটি বছর একই ক্লাশে থেকে পড়াশুনোর ওপর তার ঘেন্না ধ'রে গেলেও, বাপ তার না-ছোড়বান্দা ; তার ওপর কিনা চার বছরের ছোট বিম্‌লেটার সঙ্গে এক ক্লাশে ব'সে পড়্‌তে হয়েছে, আবার মাঝে মাঝে পড়া বল্‌তে পারেনি বলে ছোট ভায়ের হাতে কাণমলাটি-আস্‌টিও খেতে হয়েছে। তাই বিমলের উপর সে জাতক্রোধ হয়েই ছিল।

গণেশ খবর দিলে, আজ্‌কে সন্ধ্যের ট্রেণে মেসো মশাই,—বিমলের বাবা—মৈমনসিং যাচ্ছেন। বিমল তাকে ষ্টেশনে এগিয়ে দিয়ে আস্‌বে শুনেছি। আঁধার রাতে একা একা যখন ফির্‌বে, সেই হবে সুযোগ।

গোবর্দ্ধন নিজের দুঃখ ভুলে উল্লাসে ব'লে উঠ্‌ল, "বাছাধন ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি !"

বদ্যিনাথ চিন্তিত ভাবে বল্লে, "থাম্‌না বাপু তুই। শুধু সুযোগ হলেই তো হয় না। যদি চিনে ফেলে তা হলেই তো আবার ফ্যাসাদ বাঁধাবে, এবার আঁকের মাষ্টার মশাই মেরেছেন, তখন মার্‌বেন হেড্‌মাষ্টার মশাই নিজে।"

গোবর্দ্ধন অত কথার ধার ধারে না, বল্লে, "তাই ব'লে আবার একটা ভাব্‌না! ভালো করে মুখোস্ প'রে নিলেই হবে।"

বষ্ঠিনাথ তাকে ভেংচিয়ে বল্লে, "মুখোস্ পর্‌লেই হবে! বোকা কোথাকার আমি বল্‌ছি, আমরা দু'জন আমি আর গোব্‌রা ওকে 'ফলো' কর্‌ব। সেই যে ঘোষেদের পড়ো বাড়ী, তার সুমুখ দিয়ে যাবার সময় পাক্‌ড়াও কর্‌বো। পড়ো বাড়ীতে ভূতের উপদ্রব কে না শুনেছে? ভাব্‌বে, ভূতের খপ্পরে পড়েছিল। কিন্তু তার আগে আমাদের গায়ের রং খানাকে মিশ্‌মিশে কালো ক'রে নিতে হবে। এখন ভাব্‌না হচ্ছে কি দিয়ে মুখখানাকে বে-মালুম নিগ্রো-ভূতের মতো করা যায়। আল্‌গা মুখোস ফুকোসে হবে না। রংটি আবার এমন হওয়া চাই যেন ধ্বস্তাধ্বস্তিতে উঠে না যায়।"

ঘোষেদের পড়ো বাড়ী—অনেকে এখানে ভূতের ভয় পেয়েছে।

একটা কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল। আমাদের বাড়ীতে আজ ক'দিন থেকে ছুতোরেরা কাজ কর্‌ছে। তাদের সঙ্গে কালো রংয়ের একটা বার্ণিস্ আছে। বুদ্ধু ছুতোর সেদিন আমাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিল, "ছোট বাবু, যদি দুষ্টোমি কর তো বাবুর হুকুম হয়েছে এই বার্ণিস্ দিয়ে তোমার ফুটফুটে রংখানাকে একেবারে নিগ্রোর মতো ক'রে দেব। জন্মের তরে কালো হয়ে থাক্‌বে।"

বুদ্ধু ছেলেবেলা থেকেই নাকি আমাদের বাড়ীর কাজ করে। তাই এমন অনেক কথাই সে বলে। আমরা কেউ তাতে দোষ নিই না।

যাই হোক্, বষ্ঠিনাথের সে নিগ্রো ভূতের কথাতে আমার এই বার্ণিসের কথা মনে প'ড়ে গেল। সে রংয়ের কথা তাদের বল্লুম। শুনে বষ্ঠিনাথও খুব খুসী হয়ে গেল।

সন্ধ্যের পর ঘোষেদের পড়ো বাড়ী। বষ্ঠিনাথ বল্লে, "এই চুপ্, কে আস্‌ছে না?"

স্থানটি শ্মশানের মতই বীভৎস, বাইরের অন্ধকারকে দ্বিগুণতর করে ঘন সন্নিবদ্ধ গাছগুলি যেন জড়াজড়ি হয়ে আছে। তারার আলোতে মাটীর ওপর তাদেরই বিকট ছায়াগুলি ঠিক যেন আরব্যোপন্যাসের দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। আমরা যে কয় জন তাদের সঙ্গে এসেছিলুম ভয়ে তাদের বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কর্‌তে লাগ্‌ল। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হচ্ছিল এই সীমাহীন অন্ধকার যেন শ্বাসরোধ করে আমাদের টুঁটি চেপে ধর্‌বে। কি একটা পাখী বিকট আওয়াজে চীৎকার ক'রে উঠে আমাদের বুকের তল হিম করে দিয়ে গেল।

বষ্ঠিনাথ বল্‌লে, "তোমরা এখন যার যার ঘরে চলে যাও। কাল সকাল বেলা ইস্কুলের পেছনে সেই আম বাগানের ভেতর আমাদের পাবে। আমায় বল্লে মন্তু, ভালো দেখে একটা সাবান, আরশী সব তৈরী রেখো। আমরা এখানকার কাজ সেরে তোমাদের বাড়ী যাব। সেখান থেকে মুখের রংটা তুলে ফেলে বাড়ী যাওয়া হবে।

পড়ো বাড়ীতে আমাদের দম আট্‌কে আস্‌ছিল। বাইরের খোলা হাওয়াতে এসে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম।

পথ চল্‌তে চল্‌তে কেষ্টোটা ফিক্ ক'রে হেসে ফেল্লে। বল্লুম, "হাস্‌ছিস্ যে বড়?"

চোখ দুটোকে ডাগর করে কেষ্টো বল্লে, "ওরে বাবা এই নিশুত আঁধার রাতে যদি কেউ এ দুটো মূর্ত্তি দেখে, তার আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হ'য়ে যাবে যে! কী বিকটই দেখাচ্ছিল এ দুটোকে। আমি বল্‌ছি, বিম্‌লেটা আবার ভয় টয় পেয়ে ফিট হয়ে না যায়।'

বিমলের মাস্‌তুতো ভাই সেই গণেশ বল্লে, "তোমার তাতে এত মাথা-ব্যথা কেন বাপু? কথায় বলে, মায়ের চেয়ে দরদ বড়ো তার নাম ডাইনী।"

রাত্রি তখন বারোটা। আমাদের বাড়ীতে তো আধ রাত। আমিই শুধু একা শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ কর্‌ছিলাম। খিড়কির দোরটা ভেজান ছিল, কি জানি কখন এসে জান্‌লায় টোকা মারে।

হঠাৎ একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শুন্‌লুম, "মন্তু"।

"এই যে যাই," বলে চুপি চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।

বষ্ঠিনাথ বল্লে, "দেখ্ সে গোব্‌রাটা ফ্ল্যাট্ হয়ে পড়ে আছে। আর আমাকেই কি আস্ত রেখেছে ছাই?" ব'লেই সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে গেল।

একটু দূরেই পুকুরের ঘাট্‌লার সিঁড়িতে দু'হাঁটুতে মুখ ঢেকে গোবর্দ্ধন ব'সে ব'সে চুপি চুপি কাঁদ্‌ছিল। আমাদের আস্‌তে দেখে উঠে দাঁড়াল। দেখ্‌লুম ওর নাকটা ইয়া ফু'লে গেছে। কনুইতে, হাঁটুতে, কপালে শুধু রক্তের দাগ। বষ্ঠিনাথ বল্লে, "যেমন গোয়ার্ত্তুমি ওর। আরে বিম্‌লেটা যে রকম ষণ্ডা ওর সঙ্গে পেরে উঠ্‌বে কেন? হিন্দীস্বরে বল্লুম, "চলা আও ভাই।" বোকাটা বলে কিনা, "নেই, নেই। উস্‌কা শির তোড়্‌কে তব্ লোটেঙ্গে।" এই না বলে পাল্লা দিতে ছুটে চলে গেল। ফলটিও হয়েছে দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ।

আমি বল্লাম, "যাক্, যা হয়েছে হয়েছে। চিন্‌তে পারেনি তো তোমাদের?"

বষ্ঠিনাথ বল্লে, "নাঃ।"

বল্লাম, "যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি। এখন দু'গ্রাস ভাত মুখে পূরে নাও।"

ঠাকুরকে ব'লে আগেই দু'থালা ভাত আমার ঘরে এনে রেখেছিলুম। হাতমুখ না ধুয়েই ওরা দক্ষিণ হস্তের ব্যাপারে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্‌ল।

খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে গায়ের রং ওঠাবার পালা। ওমা, কি হবে, যত সাবান জল লাগানো যায়, রং যে আরও ব'সে যায়। আমাদের চোখের ঘুম টুটে গেল।

গোবর্দ্ধন তো লাফাতে লাগ্‌লো। "এ কালামুখ নিয়ে আমি কোথায় যাব? কেমন করে আমি লোককে মুখ দেখাব।"

বষ্ঠিনাথ গম্ভীর ভাবে বল্লে, "মন্তু, কি ক'রে এ রং তুল্‌তে হয় ব'লে দাও।"

"ওমা সে আমি কি জানি?"

গোবর্দ্ধন তে'ড়ে এল, চালাকি হচ্ছে পাজি, শূয়ার কোথাকার! আমি ভ্যাবাচ্যাকা খে'য়ে গেলুম—"সত্যি ভাই, আমার কি দোষ?"

গোবর্দ্ধন ফোঁস ক'রে উঠ্‌লে, "বদ্‌মাস ছেলে, আবার ন্যাকামো হচ্ছে। তোমার গালে যদি আমি এ রং মাখিয়ে না দেই তো—"

এম্‌নি সময় উপর থেকে বাবার সাড়া পাওয়া গেল। তিনি খড়ম পায়ে খট্‌খট্ ক'রে নীচে নে'বে এলেন। বষ্ঠিনাথ আর গোবর্দ্ধন চোঁচা দৌড়। আমিও পালিয়ে আমার ঘরে চলে এলাম।

বাবা কাউকে না দেখ্‌তে পেয়ে আপন মনে ব'লে গেলেন, "কারা এতক্ষণ এখানে কথা কইছিল?"

অম্‌নি খিড়কির দোরের দিকে নজর প'ড়ে তাঁর তো চক্ষুস্থির! "য়্যাঁ খিড়কির দোর খুল্লে কে? চোর চোর! দরওয়ান্ দরওয়ান্—এ বৈজনাথ সিং, চোর ঘুস্‌সা হায়।"

"জী" বলে বৈজনাথ সিং লাঠি কাঁধে হাজির। অম্‌নি একটা হৈ চৈ প'ড়ে গেল। মোক্ষদা দাসী তো চীৎকার ক'রে কেঁদেই উঠ্‌ল। এত যে গোলমাল, আমি যেন কিছুই টের পাইনি এমনি ভাবে ঘুমের ভাণ করে বিছানা আঁক্‌ড়ে পড়ে রইলুম।

পরদিন আবার সেই মর্ণিং ইস্কুল। সেখানেও গিয়ে শুনি মহা হৈ চৈ। কারা নাকি বিমলকে মে'রে একেবারে হাড় গুঁড়ো ক'রে দিয়েছে। বিমলের যা চেহারা হয়েছে দেখে ভয়ই হল। গালের ওপরে একটা চোট পেয়ে অনেকখানি চাম্‌ড়া কেটে গিয়েছে। চোখটা দৈবগুণে বেঁচে গিয়েছে। ঠিক দাড়ির ওপর এক ইঞ্চি পরিমাণ ছড়ানো একটা ঘা। তবু সে ইস্কুলে এসেছে, একদিনও কামাই না ক'রে প্রাইজ পাবে বলে। ওর মা-তো কেঁদে কেটে অস্থির!

খবর শুনে হেড্‌মাষ্টার মশাই নিজেই এসে বিমলকে জেরা কর্ত্তে সুরু কল্লেন। 'গুণ্ডারা ক'জন ছিল।' দেখ্‌তে কি রকম, রাত্রি তখন ক'টা হবে? ইত্যাদি।

হেড্‌মাষ্টার মশাইকে দেখে বিমলের বুকখানা অহঙ্কারে ফুলে উঠ্‌ল। সে খুব বাড়িয়ে বাড়িয়ে নিজের বাহাদুরী জাহির কর্ত্তে লাগ্‌ল। গুণ্ডারা সব কয়টিই

পেশোয়ারী ব'লে মনে হ'ল। তা নয়তো ভীতু বাঙ্গালী হ'লে দশজনকে সে একাই পিষে ফেল্‌তে পারে। তারা দলে ছিল ছয় জন। সঙ্গে মার-ধর কর্‌বার অনেক যন্ত্রপাতি ছিল। আরও কত কি!

হেড্‌মাষ্টার মশাই আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্লেন, "এতো বড় ভয়ানক কথা। এ নিশ্চয়ই সেই কাবুলিওয়ালাদের কাজ। সুদ আদায় কর্‌বার নামে বাড়ী বাড়ী ফেরে আর লোক ঠেঙ্গিয়ে বেড়ায়। এদের গতিবিধি সম্বন্ধে পুলিশে তো একটা খবর দেওয়া দরকার। আর আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, বুঝ্‌লেন জগদীশ বাবু, যে ঘোষেদের পড়ো বাড়ীতে ভূতটুত কিছু নয়, কতগুলি দুষ্টু লোকের আড্ডা হয়েছে। দেখুন, তাই সত্যি কিনা!"

আমি গিয়ে বিত্তিনাথকে বিমলের বাহাদুরী করবার গল্পটা বলে এলুম। গণ্‌শা-টা এম্‌নি নিমক-হারাম—এগিয়ে গিয়ে হেড্‌মাষ্টার মশাইকে বল্লে, "কারা বিমলকে মেরেছে আমি জান্‌তে পেরেছি সার। বিত্তিনাথ আর গোবর্দ্ধন। ঐ আম-বাগানের ভেতর ভূত সেজে ব'সে আছে।"

হেড্‌মাষ্টার মশাইর আদেশ পেয়ে দপ্তরি, দরোয়ান সবাই ধর্‌ ধর্‌ করে বেরিয়ে পড়লো। বিত্তিনাথের নাম শুনে স্বয়ং আঁকের মাষ্টার মশাই পর্য্যন্ত কাপড়-চোপড় সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে ছুটে এলেন।

বিত্তিনাথ আর গোবর্দ্ধনের চেহারা দেখে সবাইতো হেসে খুন। হেড্‌মাষ্টার মশাই অবধি মুখে রুমাল গুঁজলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তিনি গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, "তোমরা এ রকম চেহারা করেছ কেন খুলে বল।"

বিমল তো এদের দেখে অবধিই আপন মনে ফোঁসাচ্ছিল, ইচ্ছে হচ্ছিল এদের ক'সে দু' ঘা লাগিয়ে দেয়। সে ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেনই বা বাহাদুরী নেবার জন্যে তিলকে তাল ক'রে বল্লুম। তা নয় তো এ বদমাস্‌ দু'টোকে আজ দে'খে নিতে পারতুম। কিন্তু কি আর করা, মুখের কথা আর হাতের ঢিল একবার ফস্কালে তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। তাই সে চুপ করেই রইল।

গোবর্দ্ধন এবার সত্যি সত্যিই কেঁদে ফেল্লে, "আমি কিছুই জানিনে সার।"

বিত্তিনাথ বল্লে, "কালকে আমরা ভৈরব গাঁয়ের হাট থেকে ফির্‌ছিলুম সার। সন্ধ্যের পর ঘোষেদের পড়ো বাড়ীর কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ আমার কাঁধের ওপর ধাঁ ক'রে এক লাঠির বাড়ি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন গোবর্দ্ধনের উপর লাফিয়ে পড়্‌ল। আঘাতে এবং ভয় পেয়ে গোবর্দ্ধন অজ্ঞান হয়ে গেল। ডাকাতগুলি তখন ওর মুখে কি একটা মাখিয়ে দিলে। আমার ওপরে তখনও সমানে লাঠি এবং ঘুসি-বৃষ্টি চলেছে। এই দেখুন সার, একেবারে খুন ক'রে ফেলেছে।" বলে সে কাঁদ কাঁদ হ'য়ে তার জখমগুলি অসঙ্কোচে দেখিয়ে দিলে।

হেড্‌মাষ্টার মশাই চোখ কপালে তুলে বল্লেন, "য়্যাঁ বল কি? সেই একই দল? তারা কোন্‌ দেশী লোক? সংখ্যায় ক'জন ছিল?"

চোখের জল মুছে গোবর্দ্ধন বল্লে, "দেখ্‌তে সার, তারা কাবুলি-ওয়ালার মতো। ছিল সব শুদ্ধ ছ'জন। মার খেয়ে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। আজ সকালে জ্ঞান হ'লে পর দেখ্‌লুম আমাকেও তারা সেই রং মেখে ফেলে গিয়েছে।" বিমল কি যেন একটা প্রতিবাদ কর্ত্তে যাচ্ছিল, হেড্‌মাষ্টার মশায়, তা' কাণেই তুল্লেন না। বল্লেন, "কি সর্ব্বনাশ! এক রাত্তিরে তিন তিনটে খুন-খারাবি!"

তার পর বিমলের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "ভাগ্যিস্‌ তুমি কাল পালিয়ে এসেছিলে, তা নয়তো তোমাকেও এম্‌নি চেহারা নিয়ে ফির্‌তে হ'ত।"

বিমল নিজের কথায় নিজেই আট্‌কে পড়েছে। রাগে সে ছট্‌ফট্‌ কর্ত্তে লাগ্‌ল।

হেড্‌মাষ্টার মশাই কিমিতি-শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞান টিচারকে বল্লেন, "আপনাকে এই রংগুলো তুলে ফেল্‌বার ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে, প্রসন্ন বাবু। ছেলে দুটোকে একেবারে—নাঃ, আমি আজই পুলিশ সাহেবকে চিঠি লিখ্‌বো। আমি বরাবর বলে আস্‌ছি, ভূত-টুত সব মিছে, পড়ো বাড়ীতে একটা গুণ্ডার আড্ডা হয়েছে।"

মুচ্‌কি হে'সে বিত্তিনাথ বিজ্ঞান টিচারের পেছনে পেছনে তাঁর ল্যাবরেটরীতে গিয়ে ঢুক্‌ল।*

---

* ইংরাজী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

চিত্র-কৌতুক

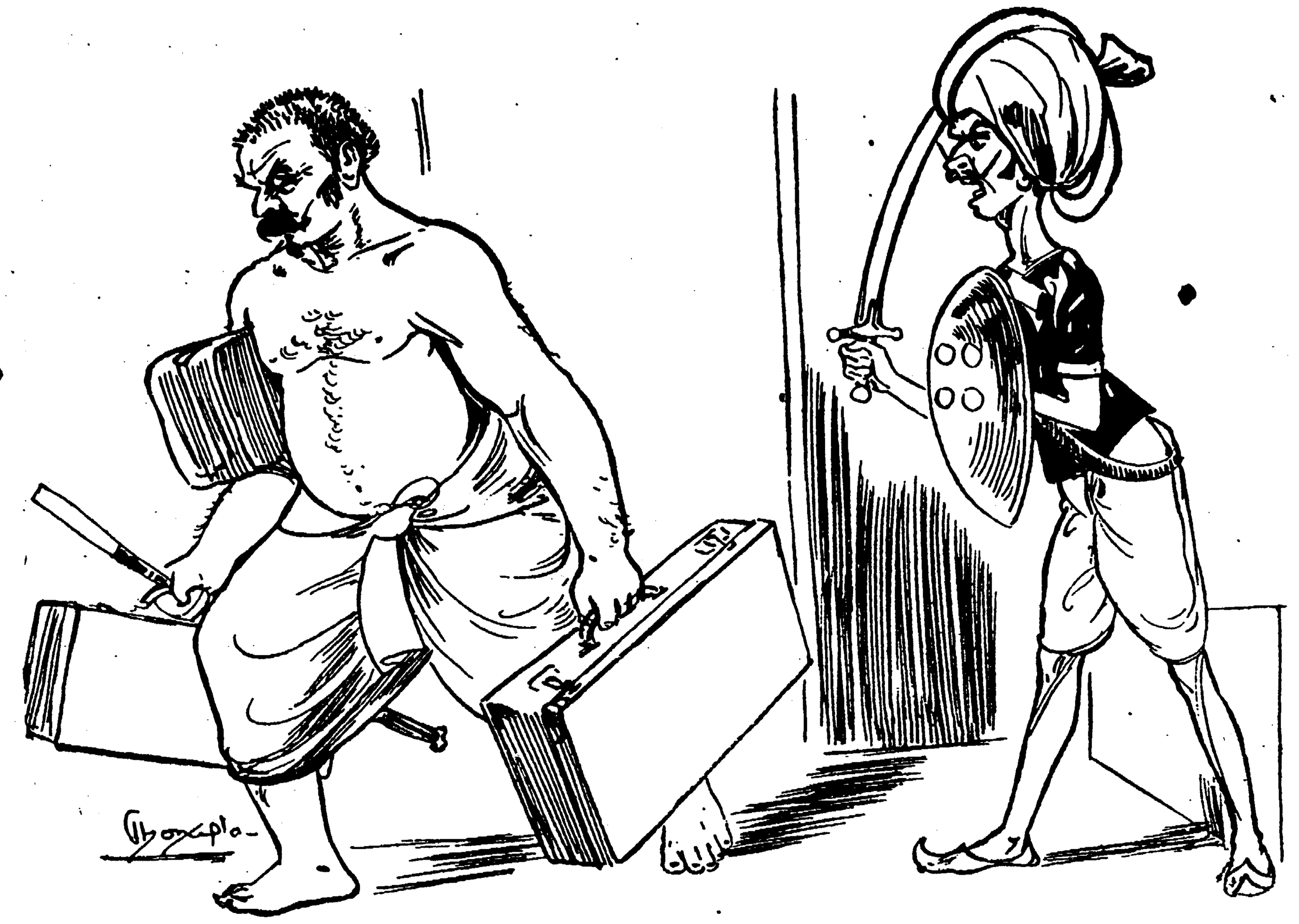

একহাতে তরোয়াল, ঢাল আর হাতে,
কি করিয়া যুঝে বল, 'ডাকু'টার সাথে ?

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

কন্‌স্ট্যান্সের মনে আর কিছুমাত্র সুখ ছিল না, তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ভগবান্ কী কঠোর পরীক্ষার মধ্যেই তাহাদের সকলকে ফেলিয়াছেন ! চার্লির কোনই উদ্দেশ নাই, ঈশ্বর জানেন, আজ পর্য্যন্ত সে বাঁচিয়া কি মরিয়া ; কর্ত্তব্যে অটল আর্থারকে সবাই জানে দাগী চোর ; স্কুলে সবার সেরা ছাত্র হওয়া সত্বেও টম্‌কে তার ন্যায্য অধিকার হইতে দাবাইয়া রাখিয়াছে ; আর তার নিজের ? তার নিজেরও ভবিষ্যতের সমস্ত সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইয়া গেছে। হ্যাঁ, ভগবান্ বড়ই কঠোর পরীক্ষায় তাদের সবাইকে ফেলিয়াছেন। তখনও কিন্তু সে জানে নাই যে আরো একটি "সুখবর" পাইতে তার বাকী আছে।

এই সমস্ত কথাই বসিয়া বসিয়া সে ভাবিতেছিল, এমন সময় গ্যাল্‌ওয়ের অফিস হইতে রক্তমুখে আর্থার ফিরিয়া আসিল। নিকটে আর কেউ নাই দেখিয়া সে বলিল, "কনস্ট্যান্স,

গ্যাল্‌ওয়ে-অপিসে এদিকে বেশ একটী কাণ্ড ঘটে গেছে—চিঠির ভেতরে করে কে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ তাঁকে পাঠিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে এক টুক্‌রো কাগজে বেনামীতে লিখে দিয়েছে—'টাকাটা আমি নিয়েছিলাম, ফিরে পাঠালাম।' আমার যেন গুরুতর সন্দেহ হচ্ছে এ হামিশের কাজ —হয় আমাকে নিন্দে-গ্লানির হাত থেকে রেহাই দেবার জন্যে, আর নয় তো নিজেরই বিবেকের তাড়নায় সে এমনটী করেছে। গ্যাল্‌ওয়ে মনে কর্‌ছেন, ফের বাটার-বাইকে খবর দিয়ে আনাবেন।"

একেই কন্‌স্ট্যান্সের মনটা আজ ভাল ছিল না, এই নতুন খবরে সে একেবারে যেন মুষড়িয়া পড়িল। এতদিন পর্য্যন্ত তার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, হয় তো তাহারা যা ভাবিয়া আসিয়াছে তা ঠিক নয়, হামিশ ও টাকা চুরী করে নাই। কিন্তু টাকা গ্যাল্‌ওয়ের হাতে ফিরিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে আর কোন মতেই সে আশাকে আমল দিতে পারিল না। না পারার একটা কারণও ছিল, সেইটী সে আর্থারকে বলিয়া ফেলিল—"আর্থার, তুমি ঠিকই এঁচেছ, এ নিশ্চয়ই হামিশের কাজ।"

"কি করে জান্‌লে তুমি ?"

"দিন কয়েক হোল তার কাছে বাসা-খরচের টাকা চাইতে গিয়েছিলাম, সেদিনই সে সবে বাবার আপিসের মাইনে পেয়েছে। আমার টাকা চাই শুনে তাড়াতাড়ি সে পাঁচ পাউণ্ড্ মনে করে একখানা কুড়ি পাউণ্ডের নোট্ বার করে দিল। আমি বুঝ্‌বার আগেই কিন্তু সে তার ভুল ধরে ফেলেছে—চট্ করে সেখানা তুলে নিয়ে হেসে বল্লে, 'না না, ওখানা পাচ্ছ না, ওটি আর এক জায়গায় পাঠাতে হবে।' তারপর সে একখানা সত্যিকার পাঁচ পাউণ্ডের নোট্ বার করে দিলে ; এখন বুঝ্‌তে পার্‌ছি কোথায় কুড়ি পাউণ্ডের নোট্‌খানা পাঠাবার দরকার পড়েছিল।"

এ সংবাদটী আর্থারের কাছে সম্পূর্ণ নূতন—শুনিয়া তার মুখ কালীবর্ণ হইয়া গেল। কন্‌স্ট্যান্স্ আবার বলিল, "ছাই দিয়ে আগুন কতকাল চেপে রাখ্‌ব আর্থার ? বাইরের লোকও এখন হামিশকে সন্দেহ কর্‌তে সুরু করেছে।"

আর্থার চম্‌কাইয়া উঠিল, "সেকি ?"

"হাঁ আর্থার, তাই। সেদিন এলেন হঠাৎ একটা কথা বলে ফেলেছিল যাতে করে মনে হোল মিষ্টার হান্ট্‌লি যেন হামিশকে সন্দেহ কর্‌ছেন—এলেন অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই কথাটা চেপে গেল।"

বাহির হইতে জুতার শব্দ আসিল ; তিনটা বাজিয়া গেছে, চায়ের সময় উপস্থিত, বাড়ীর সকলে এখনই আসিয়া জুটিবে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিল হামিশ, বগলে তার বরাবর-কার মত হিসাবের খাতা আর মুখে নিজস্ব হাসিটি। ঢুকিয়াই সে এক গাল হাসিয়া বলিল, "তোমাদের চায়ের জন্যে বসিয়ে রাখিনি তো ? আমার একটু দেরী হয়ে গেছে।" তারপর আর্থারের দিকে ফিরিয়া কহিল "দেরী

কি আর ছাই হোত, তোমার সেই পুরোনো মনিব গ্যালওয়ে পাকড়াও করেছিল। তার আপিসের সাম্‌নে দিয়ে আস্‌ছি, হঠাৎ পেছন থেকে রোল্যাণ্ড্ এসে জামা টেনে ধরে বল্লে—'শুনেছ খবর, মুট্‌কোর নোট যে নিয়েছিল আজ সে চিঠিতে করে তা ফেরৎ পাঠিয়েছে। অথচ মুট্‌কো এতদিন আর্থারের ওপর দোষ চাপিয়ে আস্‌ছিল। গ্যালওয়েও ঘর থেকে আমায় দেখেছিল, ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে চিঠিতে পুরে ও নোটখানা আমি পাঠিয়েছি কিনা!"

কন্‌স্ট্যান্সের মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে কহিল, "জিজ্ঞাসা করলে তোমায়? তা কি জবাব দিলে তুমি?"

"বল্লাম, পৃথিবীতে যদি তাঁর মত আরো কয়েক জন লোক থাক্‌তো যারা টাকা না দিলেও দিয়েছি মনে করে, তবে দুনিয়াটা বড়ই ভাল জায়গা হয়ে যেত।" (ক্রমশঃ)

মহাত্মা

তোমরা অনেকেই বোধ হয় জান মহাত্মা গান্ধী দিন কয়েক হইল লণ্ডনে গিয়া পৌঁছিয়াছেন। গতবারে যে গোল টেবিলের-বৈঠক হইয়াছিল মহাত্মাজী তাহাতে যোগ দেন নাই, এবারকার বৈঠকে তিনি যোগ দিয়াছেন। তিনি আছেন লণ্ডনের এক দরিদ্র-পল্লীতে।

সভ্য-জগতের সমস্ত লোকেরা মহাত্মা গান্ধীকে যতখানি ভক্তি-শ্রদ্ধা করে পৃথিবীর আর কাউকে ততটা করে না। তাঁর লণ্ডন-যাত্রা সময়ে চমৎকার সব দৃশ্য দেখা গিয়াছে। যেখানে যেখানে তাঁহার জাহাজ থামিয়াছে, পাড় ভাঙ্গিয়া লোক আসিয়া জড় হইয়াছে। নানা দেশ হইতে যে সব টেলিগ্রাম তিনি পাইয়াছেন. তার জবাব দিতে তাঁকে টাকা ধার করিতে হইয়াছে।

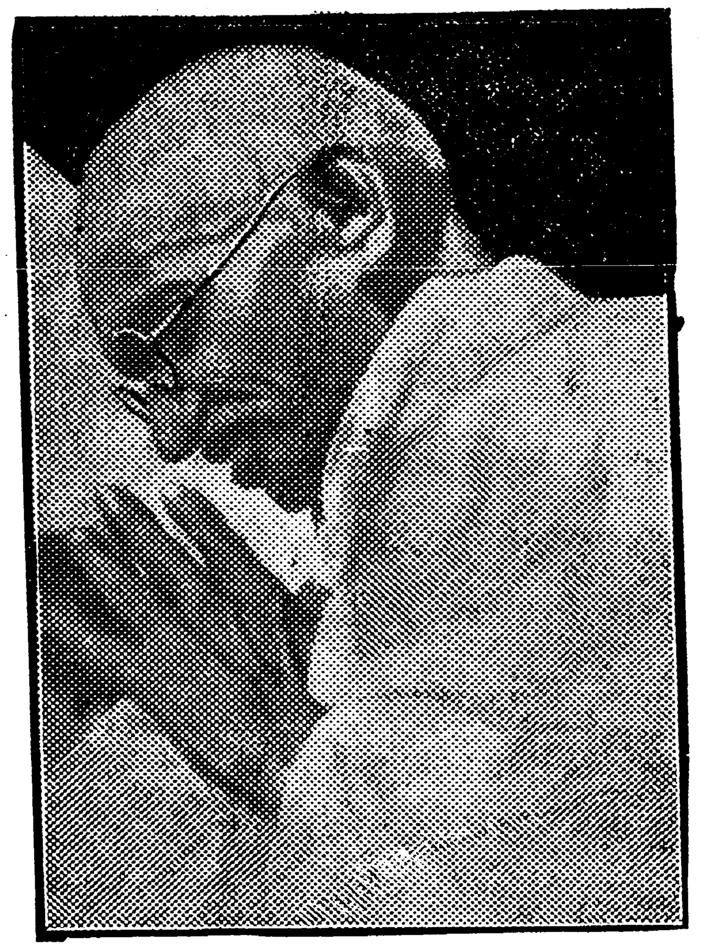
মহাত্মা গান্ধী।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

"বিপদ্-বরণ"

(শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায়, পোঃ বোয়ালমারী, ফরিদপুর)

উঠ্‌বে যত ঝড়,
নিব্‌বে যত তারা
প্রাণে আমার জাগ্‌বে তত সাড়া,
ততই আমি হব না পথ-হারা॥
পড়্‌বে যত বাজ,
আঁকড়ে ধ'রে রব।
ব্যথা পেয়েও মুখটী বুজে স'ব।
শান্তি তাতে পাবই আমি পা'ব॥
ঝঞ্ঝা যখন আসে,
সবাই ধরে তান্,
সমস্বরে সবাই গাহে গান,
ব্যাকুলতায় ওষ্ঠাগত প্রাণ॥
মেঘটী কেটে গেলে,
আবার যা তাই হয়।
ঘন-ঘটার কিছুই নাহি রয়,
শুধু জাগে ভবিষ্যতের ভয়॥
মেঘ্‌লা আকাশ খালি
দেখ্‌তে সদা চাই
তাতে তোমার পথটী খুঁজে পাই
মুক্ত হ'লে সে পথ ভুলে যাই।
আঁধার ক'রে রেখে
গানটী গেতে দিও

কোন্ সুরেতে শিখায়ে দিয়ে যেও,
আমায় তোমার আপন ক'রে নিও ॥

গুণ্ডা

(শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য, দুবরাজপুর, বীরভূম)

বাপ-মা রাখা নাম ছাড়া তার আর আর যে সব নাম ছিল, তার মধ্যে 'গুণ্ডা' নামটাই ছিল সমধিক প্রসিদ্ধ। তা ছাড়া 'ডাকাত,' 'দস্যি,' 'দজ্জাল,' 'ডান্পিটে' এ সব নাম তো ছিলই। মা-বাপ যে তাহার নাম রাখিয়াছিল রমেশ, সে কেবল আমরা ছেলেরা তাহাকে ডাকিব বলিয়া।

আমি আর গণেশ ছিলাম রমেশের ভক্ত ; ইহা ছাড়া ছেলেরাও রমেশকে ভাল বাসিত, তবে, আমাদের দুই জনের মত অতখানি নহে। ইহা ছাড়া আর কেহই তাহাকে দেখিতে পারিত না। না দেখিতে পারিতেন তাহার মা-বাপ, না মাষ্টার মহাশয়ের দল। বিশেষ করিয়া অঙ্কের মাষ্টার মহাশয়ের ত' সে ছিল দু'চক্ষের বিষ।

আমাদের অঙ্কের মাষ্টার মহাশয় বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বয়সের দোষে তিনি প্রায়ই ক্লাশে ঘুমাইয়া পড়িতেন।

সেদিনও তাই হইয়াছিল। জিওমেট্রির একটা শক্ত প্রোব্লেম কষিতে দিয়া মাষ্টার মহাশয় টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেটা থার্ড পিরিয়ড্, পরেই আধ ঘণ্টা টিফিন্। মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, ৪৫ মিনিট+৩০ মিনিট=৭৫ মিনিটে (১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট) একটু আরাম করিয়া লইবেন, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। মাষ্টার মহাশয় বোধ হয় সবে মাত্র একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইয়াছেন, এমন সময় "দপ্তর" কাঁধে রমেশ আসিয়া ক্লাশে উপস্থিত হইল। হাত, মুখ ও চোখের ইঙ্গিতে আমাদের চুপ করিতে বলিয়া সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'I see Satis Babu! You are sleeping.'

'No sir I am thinking' বলিয়া মাষ্টার মহাশয় ধড়্মড়িয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমরা ছেলের দল জোরে হাসিয়া উঠিলাম। মাষ্টার মহাশয়ের মুখ, চোখ ও মনের অবস্থা আর না বলিলেও চলে।

ইহারই দিন কয়েক পরে রমেশের সঙ্গে গিয়াছিলাম চৌধুরীদের বাগানে 'অমৃত' ফলের সন্ধানে। রমেশকে গাছে তুলিয়া দিয়া আমি আর গণেশ একাগ্রচিত্তে কোঁচড় ভর্ত্তি করিয়া চলিয়াছিলাম, এমন সময় কাহার বলিষ্ঠ বাহুর চাপনে পিছনে চাহিয়া দেখি স্বয়ং বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয় দাঁড়াইয়া, আর তাঁহারি বিশ্বস্ত চাকর পাঁড়েজী আমাদের চাপিয়া ধরিয়াছে।

আমাদের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের হাতে সঁপিয়া দিয়া সে ধীর-গম্ভীর পদে গাছের তলে আসিয়া দাঁড়াইল, তারপর তাহার সেই ভজন-সাধা গলাটাকে সপ্তমে চড়াইয়া হাঁকিল, 'আরে কোন্ হায়রে পেঁড়্কা উপর ?—উতার্!'

দেখিলাম, রমেশ অসম্ভব গম্ভীর পদে নামিয়া আসিতেছে, সে যখন নিম্নতম ডালে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন পাঁড়েজী একটা ভয়ঙ্কর রসিকতা করিবে বলিয়া দুই হাত উপরে বাড়াইল। দেখিয়া চৌধুরী মহাশয় 'হাঁ হাঁ' করিয়া উঠিলেন—আরে! আরে! পড়ে হাযে!!

পড়িল বটে, তবে, রমেশ নয়, পাঁড়েজী। সে হাত বাড়াইবা মাত্র রমেশ সজোরে তাহার 'শিখ্-সর্ব্বস্ব' 'শ্রীফল'-নিন্দিত মস্তকের উপর লাফাইয়া পড়িল। তারপর—দে ছুট্!

চৌধুরী মহাশয় এক হাতে আমাদের ধরিয়া অন্য হাতে পাঁড়েজীকে উঠাইতে গেলেন। সময় বুঝিয়া আমি সজোরে টান মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলাম। তারপর এদিক্ ওদিক্ না তাকাইয়া বীরপুরুষ সাজিলাম।

পড়িয়া রহিল গণেশ। তাহার জন্য ততটা ভাবিলাম না। হেড্মাষ্টারের ছেলে সে, যাহা হউক নিজের একটা বন্দোবস্ত সে করিয়া লইবেই।

পরদিন স্কুলে আমাদের দুজনার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ আসিল না। শুনিলাম, গণেশ নাকি অনেক 'কাঁদা-কাটা' করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে মাপ চাহিয়া লইয়াছে। রমেশকে নাকি চৌধুরী মহাশয় মাপ করিতে পারেন নাই। বলিয়াছেন—ওরকম গুণ্ডা ছেলের জেল হওয়া উচিত।

স্কুলে পাঁড়েজী আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, তার অনেক স্থানে 'ব্যাণ্ডেজ্' বাঁধা। আর রমেশের ভাগ্যে সেদিন যাহা জুটিয়াছিল, তাহা আর নাই বা বলিলাম। তবে সুখের বিষয় এই যে এ পুরস্কার রমেশের নূতন নয়।

এর দিন কয়েক পরে সেদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি হইতেছিল। আমি রমেশ আর গণেশ কিছু দূরে দূরে বসিয়া মাছ ধরিতেছিলাম। বিশ্ব-সংসারের দিকে তাকাইবার অবসর বা ইচ্ছা নাই। এমন সময় একটা অস্পষ্ট আর্ত্তস্বর কাণে আসিয়া পৌঁছাইল। পাশে তাকাইয়া দেখিলাম গণেশ নাই। চকিতে ঢেউয়ের তালে গণেশের চুল, কপাল আর চোখ ভাসিয়া উঠিয়া মিলাইয়া গেল। চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিলাম—রমেশ!

কিন্তু, তারও আগে রমেশ নদীতে ঝাঁপ্ দিয়াছে। বার তিনচার নিষ্ফল ডুব দিয়া অবশেষে সে গণেশের চুলের মুঠি ধরিয়া ভাসিয়া উঠিল! একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় হৃদয়ের দ্রুত স্পন্দনের তালে তালে আমি জ্ঞান হারাইতেছিলাম।

কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া অতিকষ্টে সে একাই তাহাকে ডাঙায় তুলিল। তারপর আমায় বলিল যা 'হেড্মাষ্টার মশায়কে খবর দিগে।'

তাহারই দিন কয়েক পরে রমেশকে একটা মেডেল্ দিবার সময়ে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—আমাদের দেশে লেখাপড়া শিখে লক্ষ্মী ছেলের চাইতে, এ রকম গুণ্ডার খুব দরকার।

সত্যই কি! সারা বছরের হাড়-ভাঙা খাটুনি খাটিয়া এক্জামিনে ফার্ষ্ট হওয়ার কি কোনও মূল্য নাই?

মন উত্তর দেয়—তুমি ছোট মানের সন্ধানে, আর 'মান' যে যাচিয়া রমেশের কপালে টিকা পরাইয়া দিয়াছে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

লগুড়।

আরও অনেক রকম উত্তর আসিয়াছিল। তার মধ্যে যেগুলি ঠিক হইতে পারে সেগুলির উত্তরদাতাদের নামও দেওয়া গেল।

উত্তরদাতাদের নাম

অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), অতীন্দ্রনাথ পাল (উল্টাডাঙ্গা কলিকাতা), অমলা দেবী (চক্রধরপুর), রামদাস, কালিদাস, সলিল, সমরেন্দ্র, ভবেশ, শ্যাম, সুনীল (করিমগঞ্জ), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া, ঢাকা), সমরেন্দ্রনাথ দাস (আমদা), অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (রংপুর), বিনয়ভূষণ ও বিজয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য (রংপুর), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), গুণেন্দ্রমোহন সিংহ (ভবানীপুর), কালু, বিনু, শক্তিনাগ (ঢাকা), সদানন্দ গোস্বামী (রাঁচি), পরিতোষ গঙ্গোপাধ্যায় (কলিকাতা), নীলিমা, প্রতিভা, অনুভা সেন (ফরিদপুর), কুম্‌কুম্‌লাল ঘোষ (জামসেদপুর), কুমুদনাথ বাগচি ও তার বন্ধুগণ (পাটনা), সূর্য্যকুমার পাইন (নগরকান্দি বাজার, খুলনা), অজয়, অজিত, সুজিত পুরকায়স্থ (শিলচর), নির্ম্মলা দেবী ও তাহার বন্ধুরা (মনোহরপুকুর, কলিকাতা), প্রীতি সেন (চাইবাসা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), অনাথবন্ধু শীল (গিরিডি), নিরুপম লাহিড়ী (মাহিগঞ্জ), প্রতিমা মিত্র (ভবানীপুর), শম্ভুনাথ ঘোষ (ভবানীপুর), কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের), কমলাক্ষ চট্টোপাধ্যায় (লাহোর)।

নূতন ধাঁধা

১। পাখা নাই অথচ উড়ে, মুখ নাই অথচ ডাকে। কে সে?

শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত।

কার্ত্তিক মাসের রামধনু ২০শে আশ্বিন প্রকাশিত হইবে। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে ১০ই আশ্বিনের মধ্যে তাহা জানাইতে হইবে। কার্ত্তিক মাসে পুরস্কার-প্রতিযোগিতার বিষয় দেওয়া হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ—এমাসের প্রথম ছবিখানি রিপণ কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।

আজি কি তোমার মধুর মুরতি, হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ঝলিছে অমল শোভাতে!

—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—শ্রীমতী নিভাননী চৌধুরী

By Courtesy of the Vangalakshmi

৪র্থ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৮ { ১০ম সংখ্যা।

পাখীর গান

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

আমরা যদি না থাকি ?
খোকা, খুকু, মোদের লাগি
জাগ্‌বে তোদের ব্যথা কি ?
কুহু এবং কা কা করে,
কে জাগাবে নিতুই ভোরে,
মেঘ করা কি লাগ্‌বে ভাল
বিনা চাতক চাতকী ?
আমরা যদি না থাকি !

আজি কি তোমার মধুর মূরতি, হেরিনু শারদ প্রভাতে!
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ, ঝলিছে অমল শোভাতে!

—রবীন্দ্রনাথ

[শিল্পী—শ্রীমতী নিভাননী চৌধুরী]

By Courtesy of the Vanalakshmi

৪র্থ বর্ষ } কার্ত্তিক, ১৩৩৮ { ১০ম সংখ্যা

পাখীর গান

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

আমরা যদি না থাকি ?
খোকা, খুকু, মোদের লাগি
জাগ্‌বে তোদের ব্যথা কি ?
কুহু এবং কা কা করে,
কে জাগাবে নিতুই ভোরে,
মেঘ করা কি লাগ্‌বে ভাল
বিনা চাতক চাতকী ?
আমরা যদি না থাকি !

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

আকাশ-বাতাস আকুলি
জাগ্‌বে না আর দোয়েল, শ্যামা,
পিক্ পাপিয়ার কাকলী।
ডুব্‌বে না 'পানকৌড়ি' গো,
উড়্‌বে না 'বাজচৌড়ি' গে,
কাকাতুয়া ময়না টিয়া
আর কহিবে কথা কি ?
আমরা যদি না থাকি !

জলে মরাল ভাস্‌বে না,
মাছরাঙা, হাঁস, বক কি টিটিভ
দীঘির ধারে আস্‌বে না।
আকাশ হবে শূন্যরে
বনস্পাতি ক্ষুণ্নরে।
কুলায়ে রয়ে কর্‌বে শোভন
বাবুই তালের পাতা কি ?
আমরা যদি না থাকি !

খোপের কপোত পালাবে ;
নিতুই বকম্ বকম্ করে
আর ত নাহি জ্বালাবে !
পেঁচাও আর থাক্‌বে না,
হলুদ পাখী ডাক্‌বে না,
খোকা, খুকু, সত্যি বল
তুষ্ট হবে তাতে কি ?
আমরা যদি না থাকি।

ছবির কথা

(চিত্রগুপ্ত)

ছবি দেখ্‌তে তোমরা সকলেই নিশ্চয় ভালবাসো। কোন বই হাতে পেলেই আগে তার পাতা উল্টে দেখ তার মধ্যে ছবি আছে কিনা। এমন কি, অনেকে বড়দের লুকিয়ে চুপি চুপি আলমারী থেকে বড় বড় বই পেড়ে তার ছবি দেখ্‌বার লোভও কিছুতেই সাম্‌লাতে পারো না। আমি জানি, তোমাদের মধ্যে অনেকেই ছবি আঁকবার চেষ্টা করো। কেউ কেউ বেশ সুন্দর আঁক্‌তেও পারো। আরো ভালো আঁক্‌তে পার্‌লে ক্রমে হয় তো তোমরা সেগুলোকে একজিবিসনে বা মাসিকপত্রিকা-অফিসে পাঠাবে এবং ভালো হলে সকলে দেখে তার সুখ্যাতিও কর্‌বে। আর্টিষ্ট্ বলে তখন লোকে তোমাদের সম্ভ্রম কর্‌বে।

আর্টিষ্ট্‌কে সকলেই খাতির করে, তোমরাও কর। কেন কর ? আর্টিষ্ট্‌রা কেমন সুন্দর ছবি আঁক্‌তে পারেন—পাঁচজনে যা' পারে না। পাঁচজনে যা' পারে না এমন একটা বাহাদুরীর কাজ যে কর্ত্তে পারে তাকেই সকলে খাতির করে চলে।

তোমাদের ঘরে এমন সব ছবি টাঙ্গানো আছে, বইএর মধ্যে এমন ছবি আঁকা আছে, যা'র দিকে চেয়ে তোমরা হয় তো ভাবো,—"আমি যদি এম্‌নি আঁক্‌তে পার্‌তুম !" যাঁরা ভালো আর্টিষ্ট্ হয়েছেন তাঁরাও এক সময়ে তোমাদেরই মত ছোট ছিলেন, তাঁরাও তোমাদের মতন ওই কথাই ভাব্‌তেন ; তারপর নিজেরাও আঁক্‌তে চেষ্টা করে করে কত দিনের অক্লান্ত সাধনায় এক এক জন বড় আর্টিষ্ট্ হয়েছেন। কত ভালো ভালো ছবি এঁকে শুধু যে নিজেরা নাম করেছেন, তা' নয়, পাঁচজনকেও কত আনন্দ দিয়েছেন।

বড় আর্টিষ্টের আঁকা ভালো ছবি দিয়ে ঘর সাজাবার জন্যে লোকে পাগল ! যাঁদের ছবির ওপর খুব বেশী ঝোঁক আছে তেমন বড় লোকরা এক একখানা ভালো ছবি কেন্‌বার জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পেছ্‌পা হন না। বাড়ানো কথা নয়, খবর নিলেই জান্‌তে পার্‌বে যে তিন চারশো বছর আগে, র‍্যাফেল, টিশিয়ান,

মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চি প্রভৃতি ইটালীর বিখ্যাত চিত্রশিল্পীরা এমন ছবি এঁকে গেছেন যা' আজকাল এক এক খানা ১৫।২০ লক্ষ টাকায় পর্য্যন্ত বিক্রী হয়।

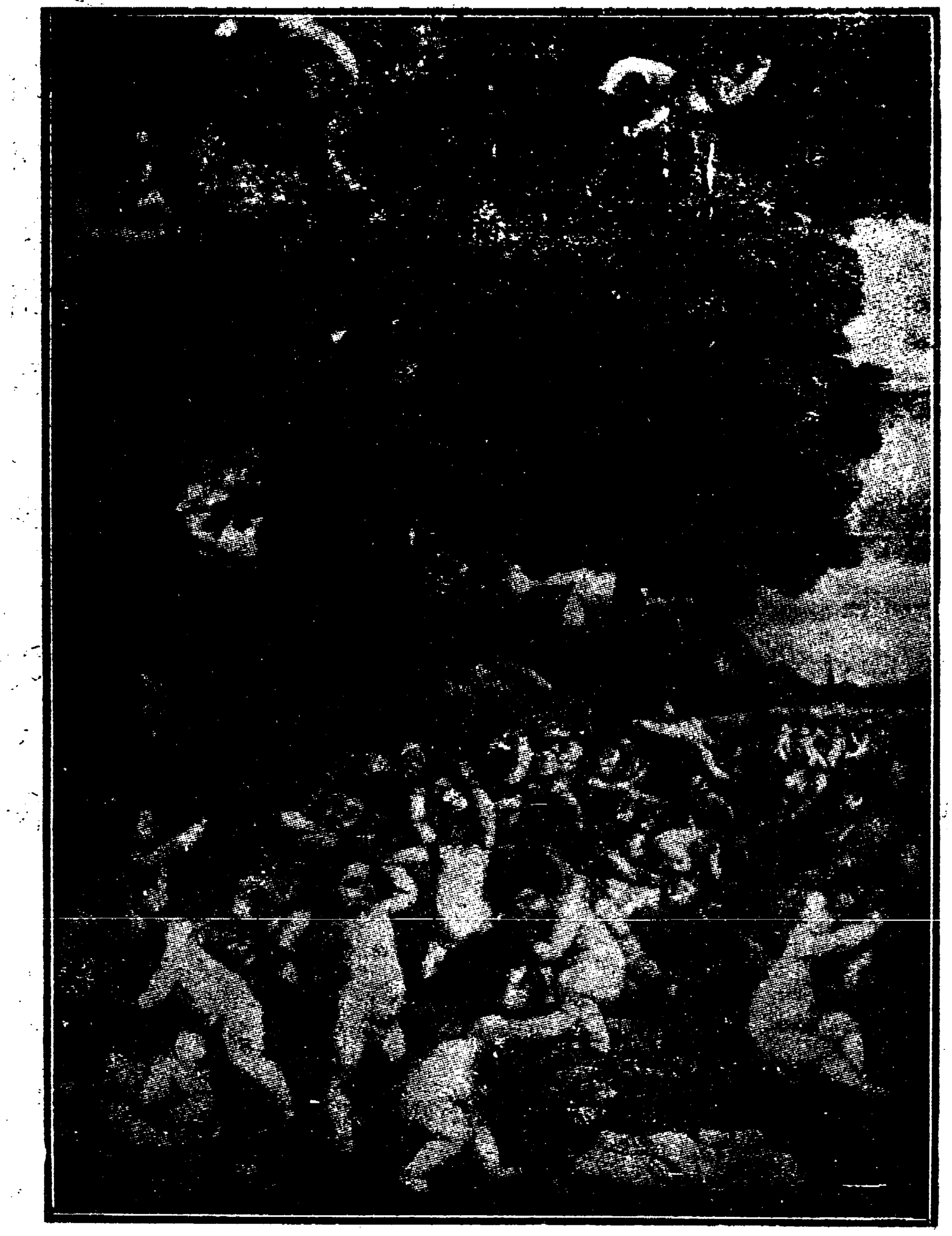

টিশিয়ানের আঁকা ছবি—'ভালবাসার বাগান'।

সে সব হল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অয়েল পেন্টিং—সে সব ছবির মানুষগুলো সত্যিকার মানুষের মতই বড়। আমাদের ভারতবর্ষেও তিন চারশো বছর আগে মোগল ও রাজপুত শিল্পীরা এক রকম ছোট্ট ছোট্ট ছবি আঁক্‌তেন, সে সব ছবিকে মিনিয়েচার পেন্টিং বলে। সেগুলো খুব ছোট্ট!—তোমাদের বই, খাতার মতন ছোট ছোট। কিন্তু তা এত সুন্দর যে সে সব ছবিরও এক এক খানার দাম ৫।৬ হাজার টাকা তো হয়ই, ১০।১৫ হাজার পর্য্যন্ত ওঠে! বোঝ, ব্যাপারখানা! হীরে নয়, মুক্তো নয়, এক টুক্‌রো ছোট্ট কাগজ বা মিহি কাপড় কিম্বা ফিন্‌ফিনে পাতলা চাম্‌ড়ার ওপর রঙ্‌ আর তূলি দিয়ে শিল্পীরা এমন সুন্দর ছবি এঁকে গেছেন—যে আজ তিন চারশো বছর পরেও লোকে হীরে মুক্তো ফেলে মুঠো মুঠো টাকা দিয়ে সেই সব ছবি কিন্‌তে চায়! কিন্তু শুধু টাকাটার কথাই ভেবো না, সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটার কথাও একবার ভাব্‌তে চেষ্টা করো। যে জিনিষ কেন্‌বার জন্যে লোকে এত টাকাকেও টাকা বলে গ্রাহ্য করে না, সেটা তা'হলে কেমন জিনিষ! কতখানি সুন্দর হ'লে তবে লোকে তার

এতটা আদর করে! উপায় থাক্‌লে তোমাদের দেখাতুম সে সব ছবি! ছাপ্‌লে তার আসল সৌন্দর্য্য কিছুই বোঝা যাবে না—তাকে ঠিক মত ছাপা প্রায় অসম্ভব বল্‌লেই হয়। তবে অনেক পরিশ্রম ও অজস্র টাকা খরচ করে কেউ কেউ সেই সব ছবির কতক কতক ছেপে বই বার করেছেন—হুবহু সেই রকম না হ'লেও তার মধ্যে কতকগুলো খুবই সুন্দর হয়েছে। আসল গুলো তো আর দেখ্‌বার বড় সুবিধে পাবে না সে সব বড় বড় লোকে কিনে নিজেদের বাড়ীতে রেখে দিয়েছেন। তবে ক'লকাতার 'যাদু ঘরে' আর 'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে' খান কতক মাঝারি রকমের মিনিয়েচার আছে। সুবিধে মত এক সময়ে সেগুলো দেখে আস্‌তে পারো। প্রথমে দেখ্‌লে হয় তো খুব ভাল নাও লাগ্‌তে পারে, কিন্তু অবহেলার সঙ্গে দেখো না। মনোযোগ দিয়ে তার আসল সৌন্দর্য্যটুকু বুঝ্‌তে পার্‌বে। এ সব জিনিষ বেশ ধীরে সুস্থে দেখ্‌তে হয়।

ইউরোপের শিল্পীদের গড়া মূর্ত্তি বা আঁকা ছবি ইউরোপের নানা স্থানের আর্ট গ্যালারী ও মিউজিয়মে আছে। ওখানকার ন্যাশান্যাল গ্যালারী, টেট্‌ গ্যালারী, প্রভৃতি বড় বড় আর্ট গ্যালারীর বিখ্যাত প্রাচীন মূর্ত্তি ও ছবি দেখ্‌বার জন্যে প্রতি বছরে পৃথিবীর নানা স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক সেখানে যায়। তোমরাও বড় হয়ে যখন সেখানে যাবে তখন সে সব দেখ্‌বে। দেখ্‌বে, তোমরা জন্মাবার কত আগে কত বড় বড় শিল্পী তাঁদের একাগ্র সাধনার সাহায্যে নিজেদের শিল্প-নৈপুণ্যকে পাথরে আর ক্যান্‌ভাসে অমর করে রেখে গেছেন।

আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় দু' হাজার বছর আগে শিল্পীরা পাথরের দেওয়ালের ওপর রঙ্‌, তুলি দিয়ে এমন সুন্দর ছবি এঁকে রেখে গেছেন যা' দেখ্‌লে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে। আজ কালকার কত শিল্পী সেই রকম ছবি আঁকবার কত চেষ্টা করেও আঁক্‌তে পারেন নি। এগুলোকে ফ্রেস্কো বলে। দাক্ষিণাত্যে যোগি-মারা, অজন্তা, এলোরা, বাঘ, এলিফাণ্টা প্রভৃতি পাহাড়ের গুহায় দেওয়ালের গায়ে এই সমস্ত ছবি আঁকা আছে। কত লোক কত কষ্ট করে সেই সমস্ত ছবি দেখে চক্ষু সার্থক করে আসেন। তোমরাও এক দিন নিশ্চয় ভারতের এই অমূল্য চিত্র-সম্পদ্‌ দেখে আস্‌বে।

ইউরোপেও অসংখ্য ফ্রেস্কো দেখ্‌তে পাবে। এক এক দেশের আঁক্‌বার রীতি ও ভঙ্গী অবশ্য আলাদা।

পারস্য, তির্ব্বত, চীন ও জাপানের ছবিও খুব সুন্দর। দেখ্‌লেই বুঝ্‌বে যে চিত্র-শিল্পে এ সব দেশও কত উন্নত। এক এক খানি চীনে বা জাপানী ছবির দিকে তাকালে মনে হয় যে শিল্পী যেন তূলি ধরে কাগজের ওপর স্বপ্ন রচনা করেছেন!

অজন্তার ছবি—মেয়েদের প্রসাধন।

শিল্পকলা নিয়ে যদি আলোচনা কর তবে দেখ্‌বে যে পৃথিবীর এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশের লোকে নিজের নিজের দেশের বিশেষ ভঙ্গীতে নিজেদের শিল্পনৈপুণ্যকে কি সুন্দর রূপ দিয়েছে!

এই সব দেখ্‌লে বুঝ্‌বে যে শিল্পকলার ওপর তোমার কেবল একারই ঝোঁক নয়। সারা বিশ্বের লোক বহুকাল ধরে এ নিয়ে চর্চ্চা করছে। এ সম্বন্ধে চর্চ্চা কর্‌লে জান্‌তে পার্‌বে যে মানুষ শিল্পের সাধনা করছে বড় আজ নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকরা গবেষণার সাহায্যে আবিষ্কার করেছেন যে আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে প্রাগৈতিহাসিক প্রাচীন প্রস্তর-যুগের লোকেরা পাহাড়ের অন্ধকার গুহার দেওয়ালে নানা রকম জীবজন্তুর সুন্দর সুন্দর রঙ্গীন ছবি আঁক্‌তো; এবং আরো মজার ব্যাপার এই যে অত আগেও শিল্পকলায় মানুষের আশ্চর্য্য নৈপুণ্য ছিল। পরে এ বিষয়ে তোমরা পড়্‌লে সে সব জান্‌তে পার্‌বে এবং ইচ্ছে কর্‌লে গিয়ে সে সব ছবি দেখেও আস্‌তে পার্‌বে। অবশ্য

ফ্রান্স ও স্পেন প্রভৃতি ছু' এক জায়গায় সামান্য সামান্য ছাড়া এ সব ছবি খুব বেশী দেখা যায় না।

যাই হোক্, এ তো গেল প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের কথা মেনে নেওয়া ছাড়া, এর কোন প্রামাণিক ইতিহাস নেই। কিন্তু বড় হয়ে যখন তোমরা শিল্পকলার ইতিহাস পড়্‌বে তখনও দেখ্‌বে যে প্রায় ছ' হাজার বছর আগে সভ্যতার ইতিহাসের গোড়া থেকেই প্রাচীন ইজিপ্ট্, ব্যাবিলোনিয়া, এসিরিয়া, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ, তির্ব্বত, চীন, জাপান, যবদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, সিংহল প্রভৃতি দেশের লোকে শিল্পকলার চর্চ্চা কর্‌তো। তাদের তৈরী অসংখ্য ছবি, ভাস্কর্য্য ও নানা রকম কারু-শিল্পের মধ্যেই আমরা তার নমুনা পাই।

কত দিন আগে তারা সে সব তৈরী করেছিল! তার পর তাদের দিন ফুরিয়েছে—তারা চলে গেছে। কিন্তু তারা যা' রেখে গেছে সে সব অদ্ভুত কীর্ত্তির গৌরবে তারা আজও অমর হয়ে আছে, আর আমাদের কাছ থেকে অজস্র শ্রদ্ধা আদায় কর্‌ছে!

মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না। সকলকেই একদিন এ পৃথিবী থেকে চলে যেতে হয়। কিন্তু যাবার আগে সে যদি এম্‌নি কিছু রেখে যেতে পারে যার জোরে মর্‌বার পরেও সে মানুষের মনে অমর হয়ে থাক্‌তে পারে তবেই ত সে ধন্য!

তোমরাও চেষ্টা করো, তোমাদের পৌরুষের সাহায্যে একনিষ্ঠ সাধনায় যাতে এমন অতুলনীয় কীর্ত্তি রেখে যেতে পার যার দিকে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চেয়ে থাক্‌বে, আর বার বার তোমাদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবে। আপন শিল্প-নৈপুণ্যে কালের ইতিহাসে তোমাদের নামকে যদি সোণার অক্ষরে উজ্জ্বল করে লিখে রেখে যেতে পারো, তার চেয়ে কাম্য আর কি আছে?

রঙ্গ-কণা

(কুমারী পুষ্পলতা গোস্বামী)

মা—"ওরে খোকা, ঘুমুলি নাকি?"

খোকা—"চশমাটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। চোখ খোলা কি বোঁজা ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।"

"জান্তাম যদি একটু গ্রামার—"

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি, টি)

আদার-পাড়ার কেদার গোঁসাই ?
তার কথা আর বলিস্‌নে ভাই !
ভা— রী চালিয়াৎ !
দুই চারি পাত্
ইংরেজী পড়ে'
ইস্‌কুল্ তক্ রান্না-ঘরে—
হাটে, মাঠে, ঘাটে,
দেয়ালে, কপাটে—
'ড্যাম্' 'ব্লাডি' 'ফুল্'—'থুতু'র মতন
কথায় কথায় ঝাড়েন বচন ! !

বিদ্যের দৌড় ?
জানি জানি থাম্ !
Mango যে আম—
তাও যে জানে না ! তারেও বলিস্
বিদ্বান্ ?—ঈস্ !

ফি বছরে ফেইল্ ! তবু টেনে' টেনে'
কোনো মতে শেষে, উঠে ক্লাশ্ Ten-এ
ছ' বছর ঘেঁটে
নাম নিল কেটে' !
'ম্যাট্রিক-ফেইল্'—তারই ত জাবর !
মার কাছে ফাঁকি মাসীর খবর ?

বিদ্বান্ নয়—বিদূষক বটে !
জানা গেছে ওর কত আছে ঘটে !
তাই বলি শোন্ কদ্দূর 'ষ্টক্'—
"মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ্ তক্ !"

গেছি ত সেদিন আমাতে প্যারীতে
ফুট্‌বল খেলা—হল্‌দী-বাড়ীতে—।
এক দিকে আছে এফ্—ডি—আই—
আর দিকে হোলো সোদ্‌পুর ভাই ।
সোদপুরী সব সাহেব খেলুড়ে !
বুটের বোঁটায় বল যাবে উড়ে'
ভেবেছিনু তাই—
কিন্তু রে ভাই—
এফ্—ডি—আই যে পার্‌বে এতটা
ভাবিনি স্বপ্নে ! যাক্‌গে যতটা
হয়েছিল ভয়—
দেখ্‌লাম শেষে ততটা নয় ।
তবু এক গোলে
হেরে গেল বলে
দুঃখিত সবে ।

কেদার গোঁসাই—
এক্স্ ষ্টুডেণ্ট্ অফ্ এফ্—ডি—আই—
দাঁড়িয়ে যেথায় গোল-কীপার
কথায় কথায় সঙ্গে তার
লাগ্‌লো ঝগড়া ।

গোরা ফিরিঙ্গী—বেজায় মগ্‌রা
ইংরেজী বোলে ছুটায়ে তুব্‌ড়ি
দিল গালাগাল ইব্‌ড়ি তুব্‌ড়ি !

শুনে ত কেদার রেগে মেগে লাল—
সবার সমুখে ইংরেজী গাল !

এদিকে ভীষণ দেখিয়া ব্যাপার
জুটে গেছে ছেলে হ'তে চারিধার।
'কালু' 'কামাখ্যা' 'টুনু' ও 'কানাই'
'পান্না' ও 'চুনী'—'অনিল' 'বলাই'।—
"সে কি কথা, দাদা, সঙ্গে তোমারি'
ইংরিজী ঠোঁসে—স্পর্দ্ধা ত ভারী !
দাও কেন ছেড়ে ?
ষ্টক্ থেকে ঝেড়ে'
ফেলে দাও কিছু বাছাই বচন—
ইংরেজী কা'রে কয়, বাছাধন
বুঝুক এবার———"

কিন্তু কেদার—
চুপ্‌চাপ্ যেন নির্ব্বিকার !
যে যত ক্ষেপায়
কিচ্ছুতে হায়
কোনো দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।
দম্ ভরা মুখে ফোঁসে ফোঁস্ ফোঁস্—
গুম্‌রে গুটায় মনৈ আফ্‌শোষ !

ক্রমে চোখ লাল—
ফুলে' গলা গাল—
মুহুঃ মুহুঃ তার
কাঁপে দেহ ভার,
যেমনটি হয় মূর্চ্ছা যাবার
আগে ভাগে ঠিক—

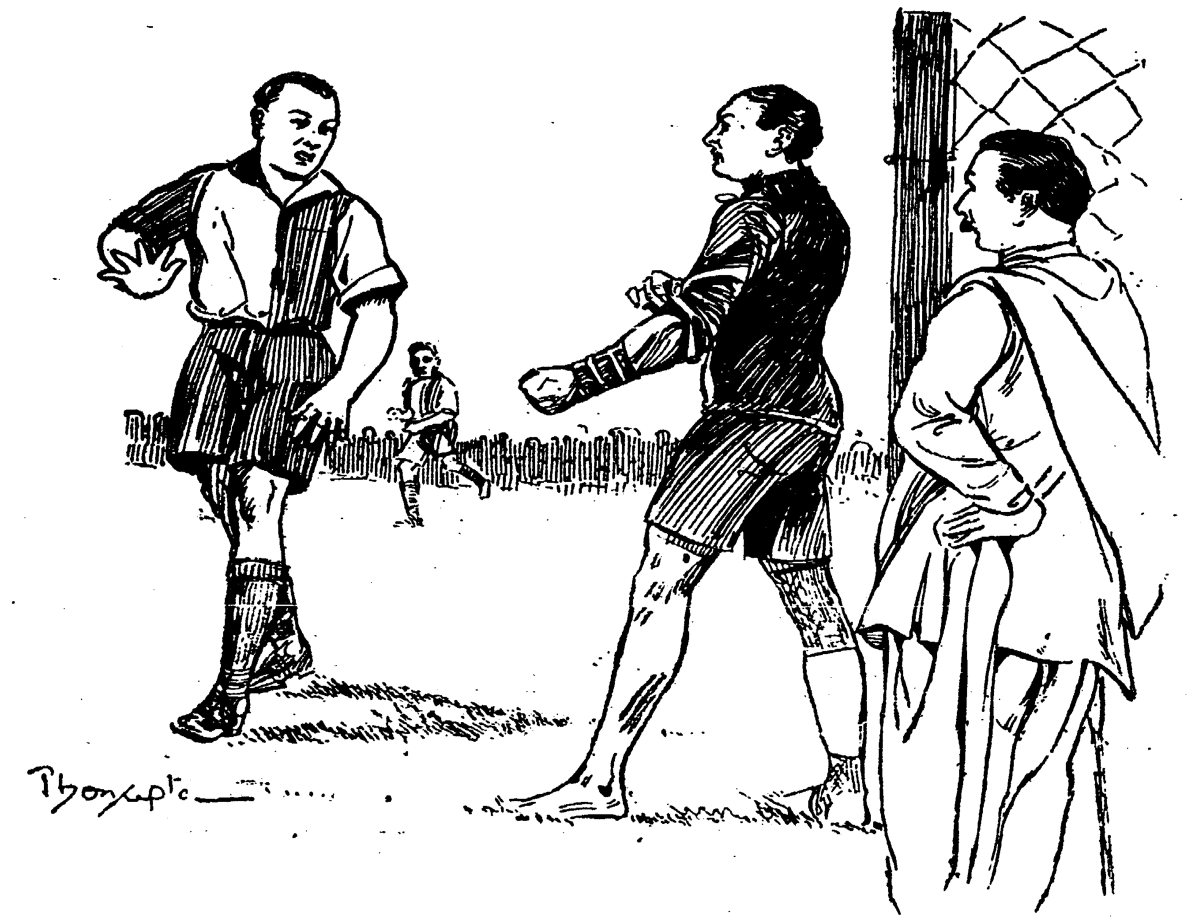

হঠাৎ কেদার—
হাত দুই তিন্
সরে গিয়ে পিছে—'কসে' আস্তিন
নেড়ে ডান্ মুঠি
রুখে' বলে—"টুটি
চেপে ধরে আজ পাঠাতাম ওরে
যমের বাড়ীর খিড়্‌কী-দুয়োরে ;

হেঁ হেঁ !—ঘুসী-চোটে
পিঠে আর ঠোঁটে
এক হোয়ে' যেতো 'ব্লাডি' ও চামার !
জান্তাম্ যদি একটু গ্রামার ! ! !

লাইট্-হাউসে

(শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র)

ভালো করে ভোর হবার আগেই আমাদের জাহাজ থেকে মঙমুলেনের লাইট্-হাউস্ দেখ্তে পাওয়া গেল। চারিধারের অকূল সমুদ্র—তারই মাঝখানে সমুদ্রের বিশাল প্রহরীর মত মেঘ-লোক পর্য্যন্ত মাথা তুলে লাইট্-হাউসটি দাঁড়িয়ে আছে।

সমুদ্রের মাঝখানে এম্‌নি নিঃসঙ্গ লাইট্‌হাউস্ দেখ্‌লেই মনে কেমন একটা অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়। ওখানে যারা দিনের পর দিন আলো জেলে সমুদ্রের জাহাজ্‌দের পথ দেখাবার জন্য বাস করে তাদের সঙ্গহীনতার কথা ভেবে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। পৃথিবীর কারুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কোথাও মাসে একবার কোথাও দু'মাসে একবার তাদের খাবার দাবার জিনিষপত্র নিয়ে একটি বোট যায়। মানুষের সংসারের সঙ্গে এই টুকুই তাদের যোগ। তারপর আবার দিনের পর দিন ওই লাইট্-হাউসেই তাদের কাটাতে হয়। দূর থেকে তারা দেখ্‌তে পায় অসংখ্য মানুষ ভর্ত্তি হয়ে দেশ-বিদেশে জাহাজ যাচ্ছে, কিন্তু তারা সেই এক জায়গাতেই বন্দী হয়ে থাকে—একেবারে নির্ব্বাসিত।

কিন্তু এই লাইট্ হাউসটি দেখ্‌বামাত্র এসব ভাব্‌না ছাপিয়ে ভয়ে বুক দুর্ দুর্ করে উঠ্‌ল।

জাহাজ থামান হয়েছে, ওদিকে খালাসীরা আমাদের বোট নামাচ্ছে। আর অল্পক্ষণ বাদেই ডাক্তার বাবু ও একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সঙ্গে এইখানে জাহাজ ছেড়ে আমাদের যেতে হবে ভাব্‌তেই গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

আগের দিন ডাক্তার বাবুর জরুরি টেলিগ্রাম পেয়ে সাইগনে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি বিকেলে। এবং তার খানিক বাদেই জাহাজে চড়ে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে রওয়ানা হয়েছি।

জাহাজে উঠবার আগে পর্য্যন্ত কেন যে এত জরুরি তার করে আমায় ডাক্তার বাবু আনালেন, কোথায় যে আমরা চলেছি তা তিনি কিছুই জানান নি। আমিও জিজ্ঞাসা করবার সময় পাইনি।

জাহাজ ছাড়বার পর রাত্রে তাঁর কেবিনে পুলিশ-অফিসারের সামনে ডাক্তার বাবু সমস্ত কথা আমায় খুলে বল্লেন। ভীতু আমি সাধারণতঃ নই। তাহলে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমার আলাপই হতে পার্‌ত না। কারণ, কম্বোজের জঙ্গলে শীকার কর্‌তে গিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। কিন্তু ডাক্তার বাবুর কাছে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শোন্‌বার পর বুক একেবারে কাঁপেনি বল্লে মিথ্যা বলা হবে।

ডাক্তার বাবু যা বল্লেন তা সংক্ষেপে এই—

দিন পোনেরো আগে জাপানী কোমাগাতো মারু লাইনের একটি জাহাজ হঙকঙ্ হয়ে কলকাতা যাবার পথে রেঙ্গুনে গিয়ে খবর দেয় যে কম্বোজের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে ঝড়ে তাকে বিশেষ বিপদে পড়্‌তে হয়েছিল ; বিশেষতঃ সেখানকার মঙমুলেনের লাইটহাউস্ থেকে আলোর সঙ্কেত না পাওয়ার দরুণ ডুবো পাহাড়ে বাণচাল হ'তে হ'তে সে কোন রকমে রক্ষে পেয়েছে।

লাইট হাউসটি ফরাসী সরকারের অধিকারে। এ খবর তাদের কাছে পোঁছোয়, কিন্তু এ নিয়ে বিশেষ মাথা বোধ হয় কেউ ঘামায় না। সমুদ্রে যে সব জায়গা বিপদ্‌সঙ্কুল সেইখানেই লাইট হাউস সাধারণতঃ থাকে। এ লাইট হাউসটি যে জায়গায় আছে সেখানটা আবার বিশেষ খারাপ, কিছুদিন আগেই সেখানে একটি জাহাজ লাইট হাউসের আলো থাকা সত্ত্বেও ঝড়ের রাত্রে ডুবো পাহাড়ে লেগে ডুবে যায়। সুতরাং জাপানী জাহাজের সেখানে বিপন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয় মনে করে ফরাসী সরকার এ বিষয়ে বিশেষ কিছু তদন্ত করে না। লাইটহাউস্ থেকে আলো না পাওয়াটার খবরটা একরকম চাপাই পড়ে যায়। কিন্তু এর কয়েকদিন বাদে

আর একটি মার্কিণ জাহাজও যখন ঐ লাইট-হাউস্ থেকে আলো না দেখ্তে পাওয়ার অভিযোগ করে তখন হঠাৎ ফরাসী গভর্ণমেণ্টের টনক নড়ে। সাইগন থেকে একটি ফরাসী নৌ-জাহাজ রাত্রে তদন্ত করে ফিরে এসে জানায় যে, সত্যিই লাইট্-হাউস্ থেকে আলো দেখা যাচ্ছে না। এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার এর আগে কখনও হয় নি। তার পর দিন যখন একটি লঞ্চ এই লাইট্-হাউসে খোঁজ কর্‌তে পাঠান হল এবং সে লঞ্চ যখন ফিরে এসে জানালে যে লাইট্-হাউসের কর্ম্মচারী, স্ত্রী-পুত্র গৃহপালিত পশু ইত্যাদি সমেত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে লোপ পেয়েছে তখন সকলের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সমুদ্রের মাঝখান থেকে ভোজবাজীর মত এতগুলো মানুষ কোথায় উধাও হয়ে গেল? এবং কেমন করেই বা এ সম্ভব হ'ল?

যাই হোক্, রহস্যের সমাধান হোক্ বা না হোক্, লাইট্ হাউসের আলো জ্বাল্‌বার বন্দোবস্ত তো কর্‌তে হবে! আবার নতুন একজন লোক সে ভার নিয়ে গেল। কিন্তু দিন তিনেক বাদে যখন আবার লাইট্-হাউসের আলো জ্বল্‌ছে না সংবাদ পাওয়া গেল তখন ফরাসী সরকার সত্যিই ফাঁফরে পড়্‌লেন। এবার আর এ অন্তর্দ্ধান-রহস্যের কিনারা না কর্‌লে চলে না। তাই বেছে বেছে সাইগনের সরকারী ডাক্তার সুরেন বাবু ও সেখানকার জল-পুলিশের বড় কর্ম্মচারী মিঃ বার্ণের ওপর ভার দেওয়া হল এ ব্যাপারের তদন্ত করবার। ডাক্তার বাবুকে ডাকা হয়েছিল শুধু এই ভেবে যে হয় ত কোন রকম উৎকট রোগে লাইট্-হাউসের বাসিন্দারা মারা পড়্‌ছে, সেটা ডাক্তার বাবু বুঝ্‌তে পার্‌বেন। কিন্তু ডাক্তার বাবুর ধারণা তা' নয়। তিনি বল্লেন, "রোগে মর্‌লে তাঁদের মৃত দেহগুলো যাবে কোথায়?" এর ভেতর আরো কিছু গভীর রহস্য আছে সন্দেহ করে তিনি আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল আমার মত লোকের সহায়তা তাঁর দরকার হতে পারে।

কিন্তু আপাততঃ অদূরে অকূল সমুদ্রের মাঝখানে এই রহস্যময় লাইট্ হাউসটিকে দেখে আমি যে ডাক্তার বাবুর কি সাহায্যে আস্‌তে পারি ভেবে পেলাম না। অতি বিনয়ের প্রয়োজন নেই—মাটির ওপর বন্দুক নিয়ে দাঁড়ালে কোন শিকার আমার হাতে কখনও ফস্‌কায় না সত্য, কিন্তু তাগ আমার যত বেশীই হোক্, এই লাইট্-হাউসের ভৌতিক সমস্যা শুধু বন্দুকের তাগ দিয়ে কেমন করে সমাধান হবে ভেবে পেলাম না।

তবু ডাক্তার বাবুর কথামত শিকারের সমস্ত সরঞ্জাম নিয়েই এসেছিলাম। সেগুলো এখন বোটে তোলা হচ্ছিল।

খানিক বাদেই বোট প্রস্তুত হ'ল। মাত্র দু'জন চীনা মাঝি নিয়ে আমরা তিনজনে বোটটিতে চেপে বস্‌লাম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে যে জাহাজে আমরা এসেছিলাম সেটা ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল। দুদিন বাদে আমাদের তদন্ত শেষ হলে আবার আমাদের এখান থেকে তুলে নিতে জাহাজটি আসবে। এ দুদিন আমাদের এই ভয়ঙ্কর লাইট্-হাউসে সমস্ত পৃথিবী থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস কর্‌তে হবে। যেখানে জাহাজ আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেল সেখান থেকে লাইট হাউসটি মাত্র আধ মাইল। কিন্তু সেটুকু যেতে না যেতেই জাহাজ দূরে দিক্‌চক্রবালের কাছে একটি ছোট রেখার মত অস্পষ্ট হয়ে গেল। আর সকলের কথা জানি না, কিন্তু মণ্ডমুলেনের এই ভীষণ লাইট্-হাউসের রহস্যের কথা ভেবে আমার সত্যি এইবার আফ্‌শোষ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল ডাক্তার বাবু ও মিঃ বার্ণ না হয় চাকরী বজায় রাখ্‌তে এসেছেন কিন্তু আমার ঘরের খেয়ে এমন বনের মোষ তাড়াবার কি দরকার ছিল? যাই হোক্, তখন আর উপায় নেই।

সমুদ্রের ভেতর থেকে একটা ছোট পাহাড় মাথা ঠেলে উঠেছে, তারই ওপরে লাইট্-হাউসটি তৈরী। আমরা যেদিকে গিয়ে নৌকো লাগালাম সেদিক্ ছাড়া আর কোন দিকে নৌকা ভেড়াবার জায়গা নেই। এদিকের ঘাটটিও পাহাড় কেটে অতি কষ্টে তৈরী কর্‌তে হয়েছে। নৌকো থেকে নাম্‌তেই গোটা-কতক সামুদ্রিক পাখী চীৎকার কর্‌তে কর্‌তে আমাদের চারি পাশ দিয়ে উড়ে গেল। তাদের সেই কর্কশ চীৎকারে মনে হ'ল যেন তারা আমাদের নাম্‌তে নিষেধ কর্‌ছে। তারা যেন কি ভয়ঙ্কর একটা বিপদের সম্ভাবনা সেই চীৎকারের দ্বারা জানিয়ে গেল।

লাইট্-হাউসের পাশেই ছোট একটি বাড়ী। ডাক্তার বাবুকে সাম্‌নে করে আমরা বাকী চার জন সেখানে ঢুক্‌লাম। ঘর দোর সব খাঁ খাঁ কর্‌ছে, কোথাও কারো সাড়া-শব্দ নেই। শোবার ঘরে বিছানাটি পরিপাটি করে পাতা, রান্নার ঘরে চারি ধারে রান্নার আয়োজন ছড়ান, দেখ্‌লে মনে হয় এই মাত্র যেন কে এ সব রেখে বাইরে গেছে, এখুনি আস্‌বে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাইট্-হাউসের কর্ম্মচারীটির কোন পাত্তাই পাওয়া গেল না।

বাড়ীটির ভেতর ও বার ভালো করে খুঁজে দেখ্‌বার পর আমাদের পরামর্শ-সভা বস্‌ল। ডাক্তার বাবু বল্লেন—"যত রহস্যজনকই মনে হোক, পৃথিবীর সব ব্যাপারেরই একটা সঙ্গত কারণ শেষ পর্য্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়। এই এতগুলো লোক যে অন্তর্হিত হয়ে গেছে এটা কোন ভৌতিক ব্যাপার নয়। এর অত্যন্ত স্থূল একটা কারণ আছে—সেটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।"

ডাক্তার বাবুর কথায় আমার মন সে সময় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছিল এ কথা বল্লে মিথ্যে বলা হবে। চীনে মাঝি দুজন ত এর মধ্যেই ভয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছ্‌ল। মনে হ'ল মিঃ বার্ণও যেন একটু হতভম্ব হয়ে গেছেন।

ডাক্তার বাবু তার পর বল্লেন, "এখনো লাইট হাউসের ওপরটা আমাদের খুঁজে দেখা হয়নি। সেখানে এ রহস্যের কোন সূত্র যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তখন আবার বসে আমরা ভবিষ্যৎ-কর্ত্তব্য ঠিক করব।"

এবার মাঝি দু'জনকে নীচে রেখে আমরা তিনজনে লাইট্‌-হাউসের ভেতরে ঢুকলাম। মনুমেণ্টের মত লাইট্‌-হাউসের চারি ধারের দেয়াল ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে ওপরে উঠে গেছে, কিন্তু তার ওপরে ওঠার সিঁড়িটি মনুমেণ্টের মত সুবিধাজনক নয়। মাত্র একটি সরু লোহার সিঁড়ি খাড়া ভাবে সব ওপরের ঘর পর্য্যন্ত লাগান। সে সিঁড়ি দিয়ে অতি সন্তর্পণে এক একজন করে ছাড়া ওঠা যায় না। হাত বা পা একবার ফস্কালেই একেবারে মৃত্যু। সেই সিঁড়ি দিয়ে পরের পর আমরা তিনজনে টর্চ্চ জ্বেলে ওপরে যে কি ভয়ে ভয়ে উঠ্‌লাম বল্‌তে পারি না। কোথায় যে কি ধরণের বিপদ্‌ অপেক্ষা করে আছে কিছুই জানি না, কিন্তু আমাদের আগে যারা এখানে প্রাণ হারিয়েছে তাদের কথা স্মরণ করে আমার অন্ততঃ প্রতি পদে হাত পা কাঁপ্‌ছিল। শেষ পর্য্যন্ত নিরাপদেই ওপরের ঘরে পৌঁছুলাম। ছোট্ট ঘর, তার চারি ধারে বিরাট্‌ সার্চ্চ লাইট্‌ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সমুদ্রের ওপর আলো ফেল্‌বার সরঞ্জাম। কিন্তু সে ঘরে কোন মানুষের কোন চিহ্নই নেই। ডাক্তার বাবু একটা সুইচ্‌ টিপ্‌তেই সার্চ্চ লাইটের আলো জ্বলে উঠ্‌ল। আলোটা আবার সুইচ্‌ টিপে নিভিয়ে ডাক্তার বাবু বল্লেন, "না সার্চ্চ-লাইট্‌ কিছুই খারাপ হয়নি, শুধু জ্বাল্‌বার লোকের অভাবেই এতদিন আলো দেখা যায়নি। সে ঘরে খানিক ঘুরে ফিরে কিছু না পেয়ে আমাদের নীচে নাম্‌তেই হ'ল।

রহস্যটা ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌ছিল। নীচে নেই ওপরে নেই, তা'হলে এতগুলো লোক গেল কোথায়? তাদের অন্তর্ধানের কারণ বুঝ্‌তে না পেরে ভয় আমাদের আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছিল।

সমস্ত দিনের ভেতর ডাক্তার বাবু কোন কথাই আর বল্লেন না। মিঃ বার্ণ ও আমি ছোট পাহাড়টি কতবার যে মিছেমিছি প্রদক্ষিণ কর্‌লাম্‌ তা বল্‌তে পারি না। দু'জনের মনে একই চিন্তা কিন্তু কেউ সে সম্বন্ধে কোন কথাই কারুকে বল্‌তে পার্‌লাম না। সন্ধ্যের সময়েই খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হ'ল। ডাক্তার বাবুর আদেশ সন্ধ্যের পর ঘরের বাইরে কেউ বেরুতে পার্‌বে না। আমরা যে বেরুবার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র ছিলাম, তাও নয়।

একটি ঘরে আমাদের তিন জনের ও তার পাশের ঘরে মাঝি দু'জনের শোবার আয়োজন হয়েছে; মাঝের দরজা খোলাই আছে।

ডাক্তার বাবু ঘরের মধ্যে পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। আমি আমার বন্দুকটা পরিষ্কার কর্‌তে কর্‌তে মিঃ বার্ণকে কম্বোজের বনে শীকারের গল্প কর্‌ছি। হঠাৎ ডাক্তার বাবু পায়চারী থামিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন্‌—"মিঃ বার্ণ, তোমার সঙ্গে এই লাইট-হাউস সংক্রান্ত সব কাগজপত্র এনেছ ত!"

মিঃ বার্ণ হঠাৎ এ প্রশ্নের কোন কারণ বুঝ্‌তে না পেরে একটু অবাক্‌ হ'য়ে বল্লেন—"হ্যাঁ, এনেছি, কিন্তু তাতে কি হবে?"

ডাক্তার বাবু বল্লেন, "বার কর দেখি, একটু দেখ্‌ব!"

আমি ও বার্ণ পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি কর্‌লাম। দু'জনেরই মনে হ'ল,—"লোকটার বোধ হয় ভয়ে, দুর্ভাবনায় মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নইলে এত রাত্রে কাগজ-পত্র দেখে কি কর্‌বে?"

যাই হোক্‌ মিঃ বার্ণ তাঁর ব্যাগ খুলে কাগজপত্র বার করে দিলেন। ডাক্তার বাবু তাঁর বিছানায় বসে সেগুলোর ওপর ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে কি যে দেখ্‌লেন বুঝ্‌তে পার্‌লাম না। খানিক বাদে কিন্তু কাগজপত্র ফিরিয়ে দিয়ে তিনি বল্লেন, "মিঃ বার্ণ শোবার আগে রিভলভারটা কাছে নিয়ে যেন শুতে ভুলো না।"

"সে আমার বালিশের তলায় আছে।"

ব্যস্, এর পর আর কোন কথা হ'ল না।

অনেক রাত পর্য্যন্ত শুয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনের নিদারুণ ভয় সত্ত্বেও কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা। হঠাৎ এক সময়ে খুট করে একটা শব্দ শুনে জেগে উঠলাম। ঘরের ভেতর মিট্ মিট্ করে আলো জ্বলছে, সেই আলোয় যা দেখ্‌লাম তাতে বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। ডাক্তার বাবু আমাদের ঘরের বাইরে যেতে বারণ করা সত্ত্বেও নিজে দরজা খুলে বাইরে বেরুচ্ছেন; হাতে তাঁর একটা রিভলভার। অত্যন্ত সন্তর্পণে তিনি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিছানায় উঠে বস্‌লাম। এবার আমার ঠিক ধারণা হ'ল তিনি ভয়ে-ভাবনায় পাগল হয়ে গেছেন। এই রাত্রে বাইরে গিয়ে তিনি কি কাণ্ড করে বস্‌বেন কে জানে? তাড়াতাড়ি পোষাক পরে নিয়ে বন্দুকটা সঙ্গে করে আমিও তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। বাইরের অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখ্‌লাম তিনি লাইট্-হাউসের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। এই উন্মত্ত অবস্থায় তাঁকে দেখা দিলে হয়ত তিনি আমাকেই গুলি করে বস্‌তে পারেন ভেবে আমি সন্তর্পণে গা ঢাকা দিয়ে এমন এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালাম যেখান থেকে আমি তাঁকে দেখ্‌তে পেলেও তিনি আমায় দেখ্‌তে পান না। খানিক ক্ষণ এই ভাবে দাঁড়াবার পর তিনি আমাদের বাড়ীটার পেছন দিকে চল্‌তে সুরু করলেন, আমিও দূর থেকে তাঁর পিছু নিলাম। একবার মনে হল যে মিঃ বার্ণকে জাগিয়ে সঙ্গে নিলে ভালো হ'ত—দু'জনে মিলে এই উন্মাদের হাত থেকে রিভলভারটা সরিয়ে ফেলে তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে আনা যেত। এক্‌লা আমি তা কর্‌তে পার্‌ব কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখন মিঃ বার্ণকে জাগাবার আর সময় নেই।

হঠাৎ আমাদের বাড়ীর ভেতর থেকে একটা চাপা আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুর রিভলভারের আওয়াজ। দুটো আওয়াজ এম্‌নি ভাবে এক সঙ্গে হল যে কোন্‌টা আগে কোনটা পরে তা পর্য্যন্ত আমি নির্ণয় কর্‌তে পারলাম না। কিন্তু তখন আর দ্বিধা করবার সময় নেই। ডাক্তার বাবু যে ক্ষেপে গেছেন এ বিষয়ে তখন আমি একেবারে নিঃসন্দেহ। মনে হল তিনি হয়ত এর পরই নিজের গায়ে গুলি কর্‌তে পারেন। সমস্ত ভয়-টয় বিসর্জ্জন দিয়ে দৌড়ে গিয়ে হাতের

বন্দুকটা ফেলে তাঁকে পেছন থেকে দুহাত-শুদ্ধ জড়িয়ে ধরলাম—রিভলভার যাতে তিনি আর না ছুঁড়তে পারেন। ডাক্তার বাবু প্রথমটা চম্‌কে উঠে বল্লেন, "কে?" এবং পর মুহূর্ত্তেই হাত ছাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করে বল্লেন, "ছাড়ো ছাড়ো, পাগল নাকি তুমি, পালিয়ে গেল যে!"

আমি তাঁকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরে বল্লাম, "আপনি পাগল হয়েছেন, রিভল-ভার না ফেল্লে আপনাকে ছাড়্‌ব না।"

কিন্তু ডাক্তার বাবু বিপুল বলে ধ্বস্তাধ্বস্তি কর্‌তে কর্‌তে ভয়ানক রেগে উঠে বল্লেন, "মুখ্যু উজ্‌বুক কোথাকার, পালিয়ে গেল যে, ছাড়ো।"

কিন্তু পাগলের কথা আমি তখন শুন্‌তে রাজী নই, বল্লাম, "কেউ পালায় নি, শুধু আপনার মাথা খারাপ হয়েছে, রিভলভার ফেলে ঘরে চলুন!"

ডাক্তার বাবু কিন্তু এবার একটা প্রকাণ্ড পট্‌কানিতে আমায় মাটিতে ফেলে দিয়ে, প্রবল বেগে সামনে দৌড়ে গেলেন। আমি মাটিতে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম, উঠে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিয়ে আবার তাঁর পাছু পাছু দৌড়োলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে হ'ল না; ডাক্তার বাবু কিছু দূরেই দাঁড়িয়ে সামনের দিকে পরের পর রিভলভার ছুঁড়ছেন। সেখানে পৌঁছোতেই ডাক্তার বাবুকে ধরার চিন্তা আমার মাথা থেকে কর্পূরের মত উবে গেল।

আমিও তখন দেখ্‌তে পেয়েছি। বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ডাক্তার বাবুর সঙ্গে গুলি কর্‌লাম।...

বন্দুকের শব্দে তখন মিঃ বার্ণ জেগে বেরিয়ে এসেছেন, তার পেছনে দু'জন চীনা খালাসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপ্‌ছে। ডাক্তার বাবুর সঙ্গে আমি নিঃশব্দে এসে ঘরে ঢুক্‌লাম। ডাক্তার বাবুকে পাগল ভেবে ধর্‌বার জন্যে লজ্জায় তখন আমি মাথা তুল্‌তে পার্‌ছি না। ডাক্তার বাবু নিজে থেকেই আমার পিঠ্ চাপ্‌ড়ে বল্লেন, "তোমার দোষ নেই, তবে আর একটু হলে সব মাটি হয়ে যেত।"

মিঃ বার্ণ তখনও কিছু বুঝ্‌তে পারেন নি, কৌতূহলী হয়ে ডাক্তার বাবুর মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বল্লেন—"এবার থেকে মণ্ডমুলেনের লাইট্-হাউসের আলো আর কখনও নিভ্‌বে না!"

"কিন্তু ব্যাপার কি ?" মিঃ বার্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

চীনা মাঝিদের আলো সঙ্গে নিতে বলে ডাক্তার বাবু বল্লেন, "চলুন দেখাচ্ছি" সেখানে গিয়ে পোঁছোতেই চীনা মাঝিদের সঙ্গে মিঃ বার্ণও অস্ফুট চীৎকার করে উঠ্‌লেন। সাম্‌নে বিশালকায় বোড়া-সাপটার মৃতদেহ কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। তার মাথাটা বন্দুক ও রিভলভারের গুলিতে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। ডাক্তার বাবু সেই দিকে দেখিয়ে বল্লেন—"এরি পেটে মণ্ডমুলেনের লাইট্‌-হাউসের গুটি আষ্টেক প্রাণীর দেহ হজম হয়ে গেছে! এত বড় বোড়া-সাপ কোন মিউজিয়মেও আছে কিনা সন্দেহ, আমি ত দেখিনি।"

ঘরে ফিরে এসে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার বাবু সব ব্যাপার খুলে বল্লেন।

বল্লেন, "কেন তোমার কাছে লাইট্‌-হাউস সংক্রান্ত কাগজ দেখ্‌তে চেয়েছিলাম জান ? আমি জান্‌তাম এ সমস্ত ব্যাপার ঘট্‌বার আগেই একটি জাহাজ এখানে ঝড়ে ডুবে যায়—সেই জাহাজ-ডুবির পরেই যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলির সঙ্গে জাহাজ-ডুবির কোন একটা সম্পর্ক আছে বলে আমার সন্দেহ হয়। তোমার কাছে কাগজ-পত্র চেয়ে নিয়ে পড়ে আমার সে সন্দেহ দূর হয়। তোমার কাগজপত্র পড়ে জান্‌তে পার্‌লাম, যে জাহাজটি ডুবে যায় সেটি 'হু' বন্দর থেকে লণ্ডনের চিড়িয়াখানার জন্যে কম্বোজের জঙ্গলের কয়েকটি জ্যান্ত প্রাণী নিয়ে যাচ্ছিল। তার ভেতর ছোট খাট কয়েকটি জানোয়ার, একটি চিতা, একটি বড় বোড়া-সাপ ইত্যাদি ছিল লেখা আছে। এটা পড়েই আমার সন্দেহ হয় যে সেই বোড়া-সাপটি সেই জাহাজের সঙ্গে ডোবেনি কোন রকমে সাঁত্‌রে এই পাহাড়ে এসে উঠেছে এবং ক্ষুধার জ্বালায় শেষ পর্য্যন্ত এখানকার অধিবাসীদের গ্রাস করেছে। আর কোন জানোয়ারের হাতে মর্‌লে মানুষগুলোর হাড়-মাংসের কিছু চিহ্ন পাওয়া যেত, কিন্তু বোড়া-সাপ সমস্তটাই গিলে খায়,—চিহ্ন রাখে না। যাই হোক্‌, এ আমার তখন সন্দেহ হয় মাত্র। এ সন্দেহ ঠিক্‌ কিনা না জান্‌তে পারা পর্য্যন্ত তোমাদের জানাতে আমি সাহস করি না, ভয় হয় তোমরা পাছে মনে মনে হাস। আমরা আসার পর বোড়া-সাপটি একবার আক্রমণ কর্‌তে আস্‌বেন জেনেই আমি কাউকে না জানিয়ে রাত্তিরে একলা পাহারা দিতে

বেরোই, এবং সাপটিকে লোভ দেখাবার জন্যে নিজে থেকে চীনে মাঝিদের একটা জান্‌লা যাবার আগে খুলে রেখে যাই। চীনে মাঝি সেই জানালায় সাপের মাথাটা গলাতে দেখেই ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। কিন্তু আমি সেই সুযোগটির জন্যেই কাছে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিলাম—সেই মুহূর্ত্তেই অম্‌নি গুলি করি। আমায় পাগল ভেবে সুরেশ জড়িয়ে না ধর্‌লে সেই খানেই আমি ওটাকে শেষ কর্‌তে পার্‌তাম। সুরেশ যে রকম জোরে আমায় জাপ্‌টে ধরেছিল, আর কিছুক্ষণ সে রকম ধরে রাখ্‌তে পার্‌লেই সাপটা গুলি খেয়ে বেমালুম সরে পড়্‌ত। এই পাহাড়ের এত গোপন ফোকর আছে যে তার পর আর তাকে খুঁজে পাওয়া এক রকম অসম্ভব হ'ত।

"আমি লজ্জিত হয়ে বল্লাম—"আমি বুঝ্‌তে পারিনি।" ডাক্তার বাবু হেসে আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন "যাক্‌ তুমি শেষরক্ষা করেছ, তোমার অব্যর্থ গুলিতেই সাপটার মাথা ফুটো হয়ে গেছে।"

কুম্ভকর্ণের জাত-ভাই

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

সেদিন দুপুর রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; জাগিয়া উঠিতে কোথা হইতে একটা দারুণ বিট্‌কেল আওয়াজ কাণে আসিল—যেন কেউ আস্তে আস্তে যাঁতা পিষিতেছে। খানিক পরে মনে হইল আওয়াজটা যেন আমি যে ঘরে আছি তারই নীচের তলাকার ঘরটা হইতে আসিতেছে। এত রাত্রে যাঁতা পিষিবার কোনও কারণ নাই, ব্যাপারটা দেখিবার জন্য নীচে নামিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি—বিশেষ কিছু নয়, আমার জনৈক আত্মীয় অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং শব্দটা তাঁরই নাক হইতে আসিতেছে। বেচারা আগের দিন রাত্রিতে ট্রেণে কাটাইয়াছেন, ঘুমটা বিশেষ মজবুত হয় নাই—তাই আজ একটু 'যুত' করিয়া ঘুমাইয়া লইতেছেন।

'যুত' করিয়া ঘুমাইতে সব লোকেই ভালবাসে, তবে সবাই যে নাক ডাকাইয়া যুত পায়, তা নয়। এক এক জনের ঘুমাইবার ধরণ এক এক রকম। কেউ চুপ্‌চাপ্‌ কুণ্ডলী পাকাইয়া এক কোণে পড়িয়া থাকিতে পারিলেই আরাম পায়, আবার কারও

কারও অনেকখানি জায়গা যুড়িয়া, হাত পা ছড়াইয়া (এবং ছুঁড়িয়া) না শুইতে পারিলে 'আয়েস' হয় না।

তবে এটা ঠিক্ যে শুইবার ধরণ যেমনই হউক্ না কেন, আয়েস করিয়া ঘুমাইতে হইলে শুইতে তোমাকে হইবেই। বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে হয় ত কেউ কেউ পারে কিন্তু তাতে ঠিক আরাম হয় না। আমাদের কলেজে একটি বেয়ারা ছিল, তার কাজ ছিল পড়াইবার সময় বোর্ডের পাশে চুপ্ চাপ্ দাঁড়াইয়া থাকা এবং দরকার মত বোর্ড্ পুঁছিয়া দেওয়া। সে কিন্তু দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াও দিব্যি ঘুমাইতে পারিত—এবং তার মুখ দেখিয়া তার যে আরামের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইতেছে তা কারও মনে হইত না। কিন্তু এরূপ প্রতিভাবান্ লোক কদাচিৎ দু' একটি মেলে।

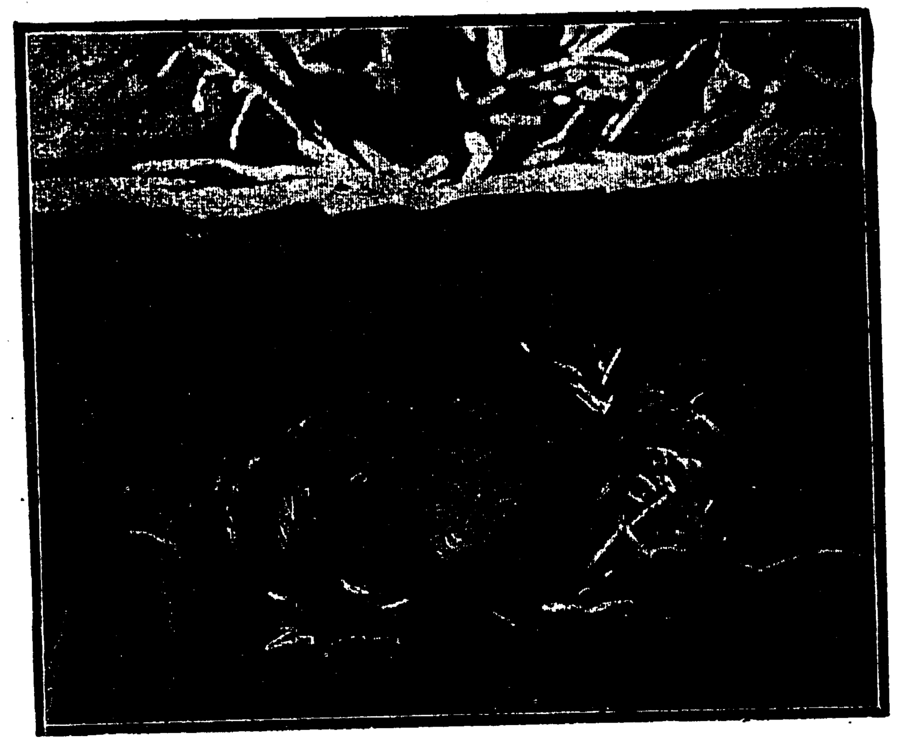

কাপড়ের পুঁটুলী নয়; 'ব্যাজার' মশাই সারা শীতকাল এই ভাবে ঘুমাইতেছেন।

জানোয়ার-রাজ্যে খোঁজ করিলে কিন্তু অনেক সময়ে এর চাইতেও 'গুণী' জীব চোখে পড়িবে। আস্তাবলে ঘোড়াকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছ কি? কেমন দিব্যি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুমায়! বক মহাপ্রভুর আবার শুধু দাঁড়াইয়াই আরাম হয় না—ঘুমাইবার সময় একটা ঠ্যাং গুটাইয়া এক পায়ে না দাঁড়াইতে পারিলে কি আর সেটা আরাম হইল? বাদুড় ভায়া আবার আরও ওস্তাদ্। ঘুমাইবার সময় তিনি ঠ্যাং দু'টি উপর দিকে আট্কাইয়া মাথাটা নীচের দিকে ঝুলাইয়া দেন। তাহাতেও তৃপ্তি নাই, শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুটাইয়া শরীরটিকে একটি বোঁচকার মত করিয়া তবে তাঁর ঘুমটা যুতসই হয়। দূর হইতে দেখিলে মনে হইবে বুঝি বা এক পাল বোঁচকাই গাছের ডালে ঝুলিতেছে!

মাথা নীচের দিকে রাখিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে ঘুমান'র অভ্যাস অনেক

পাখীরও আছে। পেঁচার ঘুম দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। শুনিয়াছি সে নাকি ঘুমাইবার সময় শরীরের পালকগুলি ফাঁপাইয়া চেহারাটাকে দ্বিগুণ করিয়া লয়। আবার সে ঘুমটাও রাত্রে নয়, দিনের বেলা। পেঁচা রাত্রি বেলা ঘুমায় না।

ঘুমানেওয়ালা জানোয়ারদের মধ্যে বোধ হয় সব চাইতে ওস্তাদ্ স্লথ্। ঘুমাইবার ধরণের জন্য না হইলেও ঘুমের বহরের জন্য নিশ্চয়ই। 'স্লথ্' কথাটার মানেই হইতেছে কুঁড়ে। বাস্তবিকই এমন কুঁড়ে জানোয়ার আর কোথাও পাইবে না। সময় নাই অসময় নাই, ঘুম যেন ইহাদের চোখে লাগিয়াই আছে। এক ডাল হইতে পাঁচ হাত দূরে আর এক ডালে যাইবার দরকার, এইটুকু পথেই হয় ত তারা কয়েক বার ঘুমাইয়া লইবে। কোন জ্যান্ত জানোয়ারের গায়ে মাকড়ষার জাল বুনিতে শুনিয়াছ কি? ইহাদের গায়ে, মাথায় প্রায়ই শেওলা, মাকড়ষার জাল চোখে পড়ে; কিন্তু তাতে তাদের ঘুমের কিছু মাত্র ব্যাঘাত হয় না।

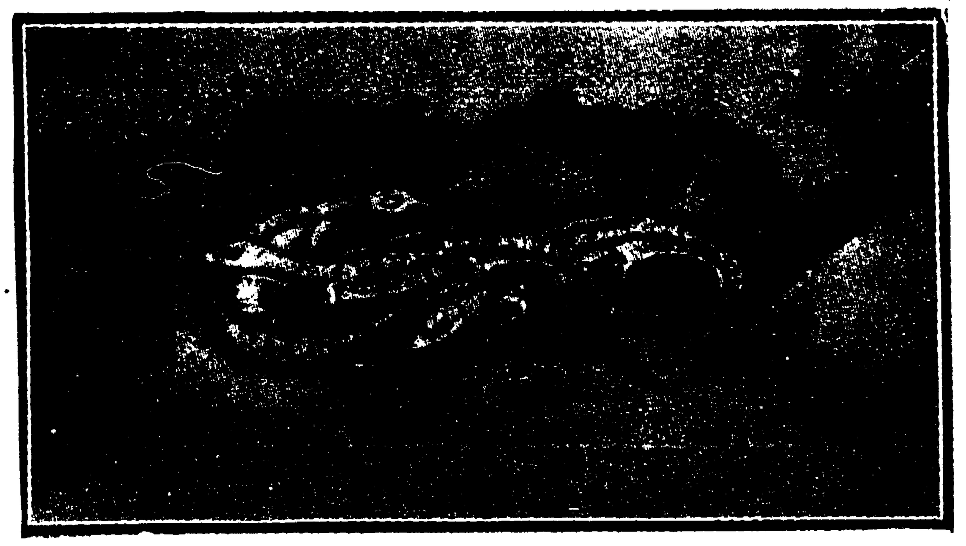

টিক্‌টিকিরা লম্বা ঘুমে বিভোর।

এ সব ত গেল নিত্যিকার ঘুম। কিন্তু আসল তোফা ঘুম যদি বলিতে হয় তবে সে কোনও কোনও জানোয়ারের শীতকালের ঘুম। শীতকালে সব জিনিষই দুর্ঘট হইয়া পড়ে, সব সময় মনের মত খাবারও পাওয়া যায় না। আবার তেমন তেমন শীতের রাজ্যে খাবারের চাইতে শীতের কষ্টটাও কম হয় না। কি দরকার বাপু, এ সব ঝক্কি পোহাইবার? তার চাইতে একটু নিরিবিলি জায়গা খুঁজিয়া লইয়া 'আরামসে' ঘুম দাওনা; দিব্যি সময় কাটিয়া যাইবে। সেকালে নাকি রাবণ রাজার ভাই কুম্ভকর্ণ এম্‌নি ভাবে ঘুমাইত। একবার ঘুমাইল ত ছয় মাস আর উঠিবার নাম নাই। ভালুক, বেঙ, নানা জাতের ইঁদুর, সাপ, টিকটিকি প্রভৃতি সরীসৃপ—এরা সবাই শীতকালে এক একটী কুম্ভকর্ণ হইয়া পড়ে। শীত আসিবার আগেই এরা সুবিধা মত এক একটি নিরিবিলি এবং নিরাপদ জায়গা বাছিয়া লয়, তার পর এক আধ দিন নয়,

মাসের পর মাস—সারা শীতকালটা এরা এক ঘুমে কাটাইয়া দেয়। এই দীর্ঘ সময় তারা একবারও জাগে না, কিছুই খায় না—একেবারে মড়ার মত অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে। গা হিম হইয়া যায়, শরীর শুকাইয়া যায়, শুধু কোন রকমে প্রাণটা টিঁকিয়া থাকে।

মানুষের মধ্যে অবশ্য এমন ঘুম কখনও শোনা যায় না, কিন্তু এই সেদিন কাগজে একটা ভারী অদ্ভুত খবর পাওয়া গেল। ব্যাপারটা নাকি ঘটিয়াছে ফ্রান্সের কোন্ এক সহরে, আমার ঠিক মনে পড়িতেছে না। একটি স্ত্রীলোকের কোনও আত্মীয় মারা যাওয়ায় সে মনের দুঃখে কেমন হইয়া যায়, তারপর হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়ে। এক আধ দিন নয়, কুড়ি বছর ধরিয়া সে এম্নি ভাবে ঘুমাইয়া এই সবে কয়েক মাস হইল জাগিয়া উঠিয়াছে।

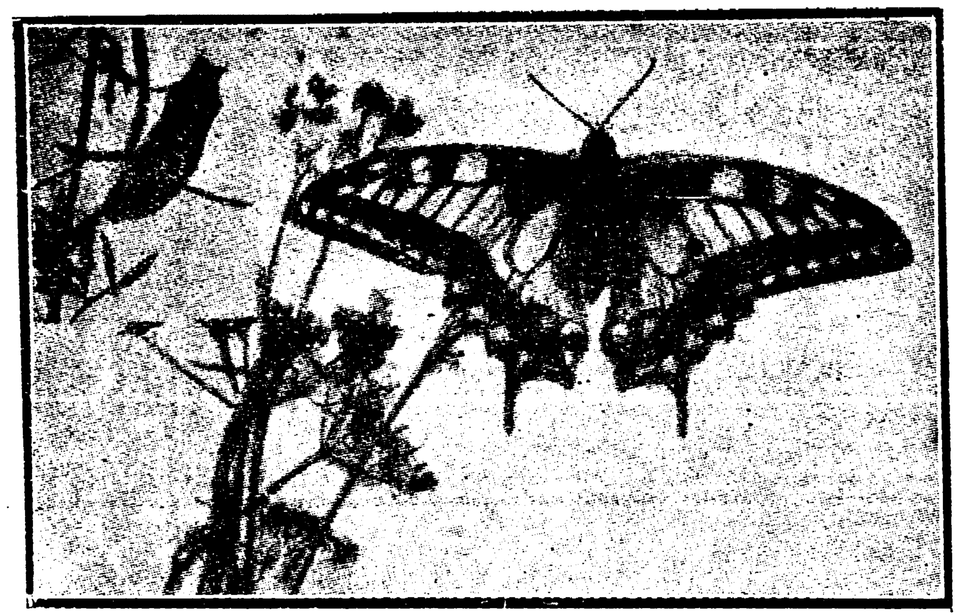
ডান দিকের প্রজাপতিটী শীতকালে বাঁ দিকের গুটিটির মত হইয়া ঘুম দিয়াছে।

ঘুমের সময় তাহার শরীর রক্ষার জন্য তাহাকে ইন্জেক্শন্ করিয়া খাবার দেওয়া হইত—তবুও তার চেহারা একেবারে কঙ্কালে গিয়া ঠেকিয়াছে। ঘুমাইবার আগে সে পৃথিবীর যে চেহারা দেখিয়াছিল এখনকার সঙ্গে তার কোথাও কোন মিল নাই। তোমরা কেউ কেউ রিপ্ ভ্যান্ উইংক্ল্ এর বিখ্যাত গল্প পড়িয়া থাকিবে, (সেই যে এক ভদ্রলোক শিকার করিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তার পর ঘুম হইতে উঠিয়া বাড়ী আসিয়া দেখে ইতি মধ্যে কুড়ি বছর সময় কাটিয়া গিয়াছে; তারপর তার পদে পদে নাকাল হওয়া) এও যেন ঠিক তাই। নয় কি ?

রং-তামাসা

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু)

মহাজন—"আজকে কিন্তু টাকাটা চাই…।"
বাবু—"শনিবারে এস, আমার টাকা পাবার কথা আছে।"

মহাজন—"কিন্তু আমি তো শনিবারে এখানে থাক্‌ব না।"
বাবু—"আমিই কি আর থাকব ?"

কাজের আরাম

(শ্রীসুনির্ম্মল বসু)

আমার কাজে কতই আরাম—তোমরা শুনিবে ?
স্নেহের চোখে দেখেন আমায় আমার মুনিবে।
আদর করেন সকল সময়—সুখের চাকরী !
কাজের আরাম শুন্‌লে পরে থাক্‌বে হাঁ করি'।
সূর্য্য ওঠার অনেক আগেই রাত্রি-ভোরেতে
কর্ত্তা হাঁকেন, "গাড়ুতে মোর জল্‌টি ভরে' দে"
শীতের ভোরে শরীর কাঁপে—বাপ্ কি কাঁপানি !
সোডার মতন ভস্‌ভসিয়ে উঠ্‌বে হাঁপানি।
কর্ত্তা বলেন, লেপ্ জড়িয়ে—"বুঝ্‌লি গদারে,
ভোরের হাওয়ায় শরীর তাজা থাক্‌বে সদারে,
তামাক্ সেজে আন্ দেখিনি—ভাবিস্ কি খালি ?
গরু দু'টোর হয়নি খাওয়া—কাট্‌তো বিচালী।"
কাপড় কাচি, বাসন মাজি সকাল দু'পরে,
কর্ত্তা-বাবুর অনেক দয়া আমার উপরে।
কাজ কি আমার কঠিন এমন—একটু মিছা না,
ঘর ঝাঁট্ দিই, ঝাড়ি পুঁছি তোষক-বিছানা।
গরু চরাই, উনান ধরাই,—বড়াই করি না
সামান্য কাজ, কীই বা এমন, মোটেই ডরি না।
বাজার করি, মশ্‌লা বাঁটি, পাড় দি' ঢেঁকিতে,
কোনো কাজেই দেখ্‌লো না কেউ আমায় ঠেকিতে !
কর্ত্তা বলেন, "ওরে গদাই, কাজ কি তোর হাতে ?
সময় মত জল দিবি রোজ গাছের গোড়াতে।

ফুলের বাগান যায় শুকিয়ে জলের অভাবে।"
বেজায় খুসী কর্ত্তা-বাবুর মধুর স্বভাবে।
মনিব আমার অনেক দিনই ভোগেন বাতেতে
ঘণ্টাখানেক গা' ডলে দিই, রোজই রাতেতে।
বাবুর আমার পেটের ব্যারাম—কেউ তা বোঝে না,
রান্না আমার না খেলে তাঁর মুখেই রোচে না।
কর্ত্তা-বাবুর দাড়ী কামাই নিয়ম মত রে—
জুতো জামা বুরুষ করি—বল্‌ব কত রে।
মনিব আমার বেজায় খুসী—বলেন, "গদা রে,
তোরই কথা আমার মনে জাগ্‌ছে সদা রে।
গাঁয়ে অনেক চোর এসেছে,—ঘুর্‌ছে তাহারা,
চুপ্‌টি করে রাতের বেলা দিস্ তো পাহারা।"
সমস্ত রাত পাহারা দেই সজাগ থাকিয়া,
মোর সাহসেই ঘুমান মনিব নাকটি ডাকিয়া।
আমি নাপিত, ধোপা, মুচী—দিবস-যামী রে
ঠাকুর, চাকর, মুদ্দাফরাস, একাই আমি রে।
কর্ত্তা-বাবুর নিন্দা আমি শুন্‌তে চাহি না—
বাবুর কাছে বাড়্‌ছে সুদে আমার মাহিনা।

বাঘের বাচ্চা

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

প্যারীদা আসলে কিন্তু আমাদের দাদা-টাদা কিছুই নয়। যখন ছোট ছিলাম, সে ছিল আমাদের বাড়ীর চাকর, তার উপর ছিল বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের 'মানুষ' করার ভার। সেই হইতে যে একবার তাকে 'দাদা' বলা সুরু করিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত আর সে অভ্যাসটা গেল না।

প্যারীদার আমাদের কখন্ যে কি খেয়াল হইত তা দেবতারা পর্য্যন্ত টের পাইতেন না, মানুষ তো কোন্ ছার! আমাদের বাড়ীতেই তখন সে চাক্‌রী করিত, হঠাৎ কি এক দরকারে একদিন সে কলিকাতা গেল; ঘরের কাছেই কলিকাতা, যাওয়া-আসায় কোনই অসুবিধা নাই। কিন্তু পর দিন যখন সে ফিরিল, তার চেহারা দেখিয়া তো আমাদের চক্ষু ছানাবড়া! প্যারীদার মাথার উপর ইয়া বড় পাগ্‌রী উঠিয়াছে, পরণে ঢিলা ইজার, গায়ে আচ্‌কান্—শুনিলাম সে নাকি একেবারে গোমেজ সাহেবের চাপ্‌রাশির কাজে ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে। সবার চাইতে আমার উপরেই প্যারীদার টানটা ছিল একটু বেশী, তাই একটা গোপনীয় কথাও চুপি চুপি আমাকে সে বলিয়া ফেলিল—সাহেব নাকি তাকে কথা দিয়া ফেলিয়াছেন, শীগ্‌গিরই যখন তিনি বিলাত যাইবেন, তখন প্যারীদাকেই তাঁর খাস্ খান্‌সামা করিয়া লইবেন। বিনি-পয়সায় অমন দেশটা দেখিতে পাইবে, তাই প্যারীদা সে লোভটা আর ছাড়িতে পারে নাই, সাহেবের কাজে একেবারে ভর্ত্তি হইয়া আসিয়াছে।

মাস কয়েক পরে একদিন প্যারীদার ভাইপো হলধরের সঙ্গে দেখা; হলধরকে যেন বড়ই বেজার বেজার মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তার মনে আর মোটেই সুখ নাই—তার কাকা প্যারীলালের নাকি জাত গিয়াছে। সাহেবের বাড়ী কাজ করার পর এখন দুই বেলাই নাকি সে মুর্গী খাইতে সুরু করিয়াছে।

তারপর বহুদিন পর্য্যন্ত—প্রায় দশ বছর—প্যারীদার আর কোন খবরাখবর পাই নাই। মনে করিয়াছিলাম, নিশ্চয়ই সে এতদিনে গোমেজ সাহেবের সঙ্গে বিলাত চলিয়া গেছে। হঠাৎ কিন্তু একদিন হগ্ সাহেবের বাজারে তাকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি প্যারীদা, বিলেত থেকে ফির্‌লে কবে?" প্যারীদা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, "আর দাদাবাবু, গোমেজ-ট্যাঁস্‌টার কথা আর বল্‌বেন না; ব্যাটার নিজেরই ভারী 'ক্ষ্যামোতা' বিলেত যাবার, তা ও আবার আমায় দেখাবে বিলেত!"

"তবে ছিলে কোথা এদ্দিন, এক দিনের তরেও তো দেখ্‌তে পাইনি!"

"দেখ্‌বেন কোত্থেকে দাদাবাবু, শুধু বাংলা মুলুকে কি আর বসেছিলাম, বুলক সাহেবের সঙ্গে দিল্লী-আগ্রা, বোম্বাই-মান্দ্রাজ করে বেড়াচ্ছি যে।"

"বুলক সাহেব ? ম্যাজিক্-ওলা বুলক্ ?"

"ঠিক ধরেছেন, সেই। তা দাদাবাবু, বিলেত যেতে পারি আর নাই পারি, আপনাদের কল্যাণে এ দেশটা খুব একচোট্ বেড়িয়ে নিইছি !"

আরও কিছুদিন গেছে, গ্রীষ্মের বন্ধে বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, প্যারীদা নাকি তার সাহেবের কাজে জন্মের মত ইস্তফা দিয়া সম্প্রতি বাড়ী আসিয়া বসিয়াছে। বিকালে একদিন নদীর ধারে তার সাক্ষাৎ মিলিল, অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে সে তখন মাছ ধরিতেছিল। তিন ঘণ্টার চেষ্টায় তিনটী পুঁঠি মিলিয়াছে, কিন্তু তবুও তার উৎসাহের অন্ত নাই। আমায় দেখিয়া প্যারীদা বলিল, "পেন্নাম হই দাদাবাবু ! শুনেছেন বোধ হয়, গোলামী ছেড়ে দিয়ে এসেছি···তবে কাল আর একবার কল্‌কাতায় যেতে হচ্ছে।"

"কেন গো, এবার আমেরিকা পাড়ি দেবার মৎলব করেছ নাকি ?"

প্যারী-দা দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "না দাদাবাবু, সে সব নয়, আমার সেই ম্যাজিক্-ওলা মুনিব বুলক্ সাহেব একবার স্মরণ করেছে। সাহেব আমায় ভারী ভালবাস্‌তো কিনা তাই বিদেয় দেবার সময় চমৎকার একটা জিনিষ বখ্‌শিশ্ দেবে বলেছে। আন্দাজ করুন তো কি জিনিষ সেটা দাদাবাবু !"

"তা কি করে বলি ? গায়ের পুরোনো কোট্-টোট্ নাকি ?"

প্যারী-দা আবার দাঁত বাহির করিয়া বলিল, "না, একেবারে নতুন ধরণের জিনিষ —একটা বাঘের বাচ্চা !"

কী সর্ব্বনাশ ! গাঁয়ের ভিতর বাঘের বাচ্চা আনিয়া প্যারীদা শেষটায় আমাদের পরকালের ব্যবস্থা করিতেছে নাকি ? লোকে বলিতেই বলে সাপ আর বাঘ ! এ দুটী জীব না করিতে পারে এমন কাজই নাই—তা সে বাচ্চাই হোক্, আর ধাড়িই হোক্ ! প্যারীদাকে বলিলাম, "তুমি ক্ষেপেছ প্যারীদা, এ সব গাঁয়ে কখনো ও জানোয়ার আন্‌তে আছে ? একবার ছুটে পালালে লোকের দশা কি হবে বল দেখি !"

প্যারীদা হাসিয়া জবাব দিল, "সে কথা কি আমি ভাবিনি দাদাবাবু, ভেবেছি। গরীব মানুষ আমি, বাঘ পোষার 'ক্ষ্যামোতা' কোথা আমার ? খাওয়াব কি তাকে ? তবে কি জানেন, বাঘটা নিতান্তই বাচ্চা, আর সায়েবও নিজে মুখে ভেঙ্গে বল্‌ছে,

তাই ভাব্‌ছি—নিয়ে তো আসি গে আপাততঃ, একটু বড় হলেই কল্‌কাতা গিয়ে বেচে দেব। হাতে কিছু টাকা আস্‌বে'খন।"

ঢের বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু কোন কাজ হইল না, শুনিলাম, প্যারীদা একদিন সত্যি সত্যিই কলিকাতা গিয়া বাঘের বাচ্চা নিয়া আসিয়াছে। কথাটা ঠিক কিনা জানিতে প্যারীদার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম ; দেখি গলায় লোহার শিকল বাঁধা বাস্তবিকই একটী বাঘের ছানা। বয়স অল্প, তাই মানুষকে এখনো সে সমীহ

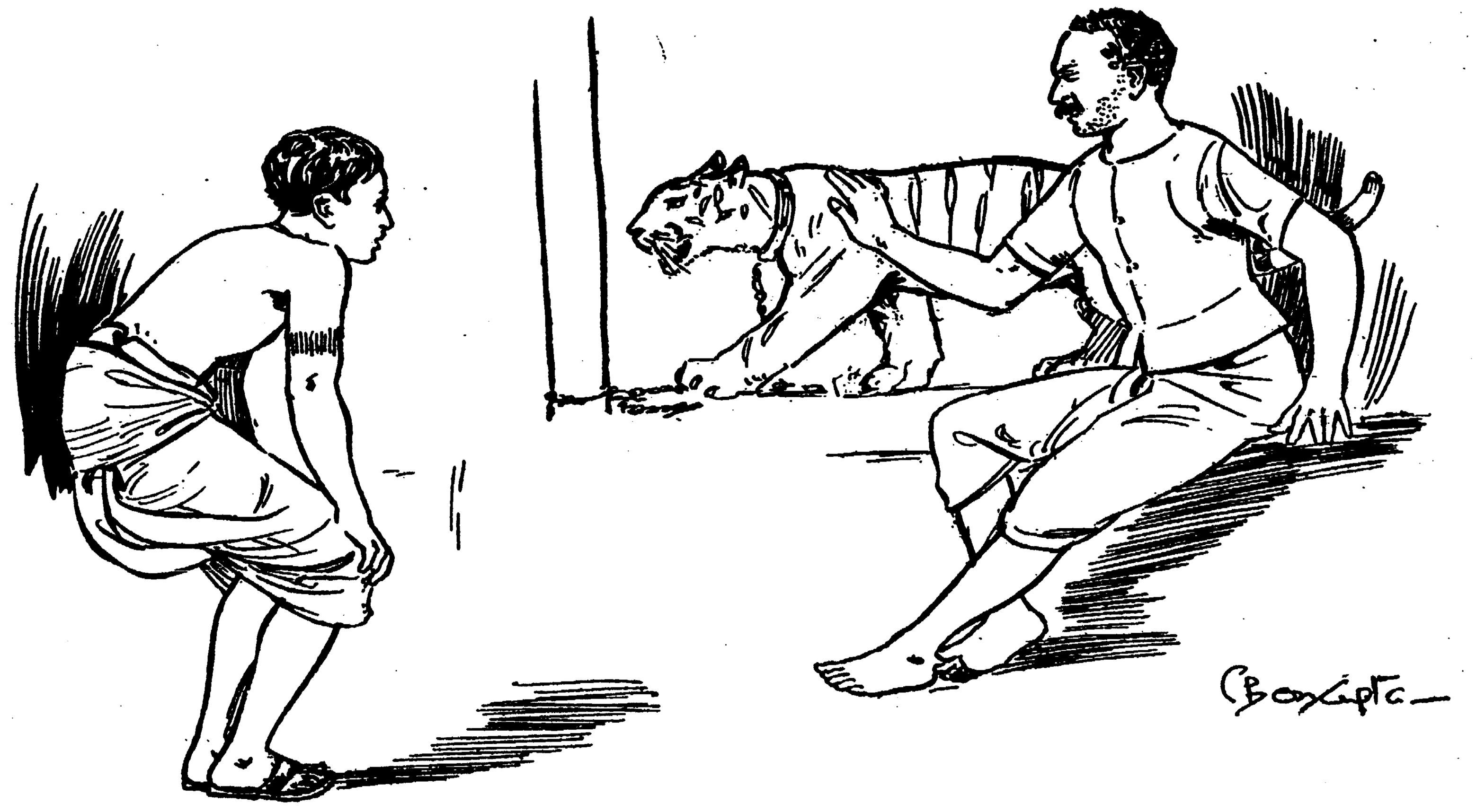

গলায় লোহার শিকল বাঁধা বাঘের ছানা।

করিয়াই চলে, প্যারীদা দিব্যি তার গায়ে যখন তখন হাত বুলাইয়া তোয়াজ করিতেছে। ডান কাণটা অর্দ্ধেক কাটা, নইলে বাঘটাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বলা যাইত। কিন্তু হাজার হোক্, বাঘেরই তো বাচ্চা, তার মুখের সেই হিংস্র হাব-ভাব যাইবে কোথায় ? গাঁয়ের যেখানে যত মরা ইঁদুরের খোঁজ প্যারীদা পাইয়াছে, সব আনিয়া জড় করিয়াছে, কোথা হইতে পাঁঠার নাড়ী-ভুঁড়িও কিছু সংগ্রহ করিয়াছে জলযোগের এই বিপুল আয়োজনে বাচ্চা বাঘের ভারী ফূর্ত্তি ; মাঝে মাঝে আহ্লাদের চোটে সে এক একটা হুঙ্কার যা দিতেছে তাতেই আমাদের চক্ষুস্থির !

সেদিন আর কালী পণ্ডিত মশায়ের পাঠশালা বসিল না। পণ্ডিত মশায় ঢের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু একটী পড়ুয়াকেও ঠেকাইয়া রাখিতে পারিলেন না, সবাই হল্লা করিয়া প্যারীদার বাড়ীর দাওয়ায় বাঘ দেখিতে আসিয়া জুটিল—পুঁচ্‌কে, ফচ্‌কে, পট্‌লা সবাই। প্যারীদা মহা ব্যস্ত; এদিক্ দিয়া হয় তো পুঁচ্‌কে তার বুড়ো আঙ্গুলটি বাঘের সাম্‌নে নাচাইতেছে, বাঘ ঘেঁাৎ করিয়া উঠিল; প্যারীদা অম্‌নি পুঁচ্‌কের কাছা টানিয়া তাকে সরাইয়া আনিল। ঠিক্ সেই সময়েই হয় তো ওদিক্ দিয়া ফচ্‌কে বাঘের লেজে মারিয়াছে টান। বাঘ বিরাট্ লাফ দিয়া তার ঘাড়ে পড়ে আর কি! ওকে বকুনি, একে ধমক্ প্যারীদা মহা অস্থির।

ব্যাপার বড় সুবিধার বোধ হইল না, প্যারীদাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "তাই তো প্যারীদা, ছেলেপেলের গাঁ, তুমি এক বাঘের বাচ্চা নিয়ে উপস্থিত হলে, কখন কি বিপদ্ আপদ্ ঘটে তাই ভাব্‌ছি।"

প্যারীদা জবাব দিল, "বাঘ আর কটা দিন, দাদাবাবু, একটু তাজা হলেই আলিপুরের বাগানে বেচে দিয়ে আস্‌ব।"

দিন দুই বাদে ঘুম হইতে উঠিয়া চায়ের পেয়ালা নিয়া সবে বসিয়াছি এমন সময় ছোট্‌কা হাঁফাইতে হাঁফাইতে এক ভয়ানক খবর আনিয়া দিল—কাল রাতে নাকি প্যারীদার বাচ্চা বাঘ শিকল ছিঁড়িয়া সরিয়া পড়িয়াছে! হাতের চা হাতেই রহিয়া গেল, মুখে আর উঠিল না। কী দারুণ খবর! গাঁয়ের ছেলে-ছোক্‌রারা হামেশা এখানে ওখানে যাইতেছে—কেউ যায় মাছ ধরিতে নদীর পাড়ে, কেউ যায় পাখীর ছানা পাড়িতে মাঠ ছাড়াইয়া বহু দূরে—কখন্ কোন্‌টা বাঘের হাতে ঘায়েল হয় কে জানে? হইলই বা বাচ্চা বাঘ, লোহার শিকল ছিঁড়িয়া যে সট্‌কাইতে পারে সে যে এক থাবায় যে কোন ছেলেকেই কাৎ করিয়া দিবে সে সম্বন্ধে কি আর সন্দেহের অবকাশ আছে? সারা গাঁয়ে না আছে ছাই একটা বন্দুক, না আছে বন্দুক ছুঁড়িতে পারে এমন একটা লোক। ইচ্ছা হইতেছিল তখনই গিয়া প্যারীদার দুই গালে দুই চড় কষাইয়া দিয়া আসি—হতভাগা গুলিখোর, বার বার নিষেধ

করিলাম, শুনিলি না, কোথা হইতে এক সর্ব্বনেশে জানোয়ার আনিয়া সারা গাঁটাকে এখন ভাবাইয়া মারিতে বসিয়াছিস্!

খুব রাগ করিয়াই প্যারীদার বাড়ীর দিকে চলিলাম, ভাবিয়াছিলাম গালাগালি দিয়া ভূত ভাগাইয়া দিব। কিন্তু সেখানে গিয়া প্যারীদার চেহারা দেখিয়া আর গালি দেওয়ার ইচ্ছা থাকিল না—অনুতাপে ও আফ্‌শোষে বেচারা এতটুকু হইয়া গেছে। হারানো বাঘকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টার সে কিছুমাত্র কসুর করে নাই—সারা রাত জাগার ফলে এবং দারুণ দুশ্চিন্তায় মুখখানা তার এমনই শুকাইয়া গেছে যে দেখিলে কষ্ট হয়।

যত দূর সম্ভব গাঁয়ের সবাই লাঠিসোটা নিয়া বাঘের খোঁজ করা গেল, যেখানে যেখানে তার লুকাইয়া থাকা সম্ভব সেব জায়গাগুলিই মোটামুটি পরীক্ষা করা হইল, কিন্তু বাচ্চা বাঘের আর পাত্তা পাওয়া গেল না। ভাবিলাম্ যাক্, আপদ্ দূর হইয়াছে,—ছাড়া পাইয়া সে কোথায় পালাইয়াছে কে জানে, মোদ্দা এ গাঁয়ে সে আর নাই নিশ্চয়ই।

কিন্তু দিন দুই বাদে ভোর হইতেই একদিন দেখা গেল আমাদের অনুমান একেবারেই ভুল, বাঘ গাঁয়েরই ধারে পাশের কোন জঙ্গলে গা-ঢাকা দিয়া আছে। গভীর রাতে ছিদাম মণ্ডলের বাড়ীর কাছে তার গলার আওয়াজ পাওয়া গেছে—ছিদাম আর তার ছেলে পরাণ সড়্‌কি নিয়া তখনই বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু তার আগেই ব্যাঘ্রচন্দ্র দুটী হাঁস মুখে নিয়া চম্পট্ দিয়াছেন। হাঁসের খোপের পাশে কতগুলি শাদা পালক পড়িয়া, জমিতে তখন পর্য্যন্ত রক্তের দাগ।

ব্যাপার শুনিয়া হাঁ হাঁ করিয়া সকলেই ছুটিয়া আসিল, মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ছিদাম মণ্ডল প্যারীদাকে গরম গরম অনেকগুলি বুলি শুনাইয়া দিল। বাঘ সরিয়া পড়ার পর হইতেই প্যারীদার মেজাজ ভাল ছিল না, এই বার তার মুখ দেখিয়া মনে হইল, একবার সে জানোয়ারটীর সাক্ষাৎ ফের পাইলে হয়, প্যারীদা তাকে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া ফেলিবে।

সেদিনই আমাদের পরামর্শ-সভা বসিল। দলের পাণ্ডা কেষ্ট—ভারী যোয়ান সে—বলিল, "গাঁয়ের ভেতর রাত্তিরে বাঘ ঘুরে বেড়াবে, আর আমরা নাকে তেল দিয়ে

ঘুমোবো, এ তো হতে পারে না! আজ রাতে আমরা লাঠি-সোটা নিয়ে সজাগ থাক্‌ব, বাঘ এলেই তার মাথা চৌচির করে দিতে হবে। কেমন রাজী সবাই ?”

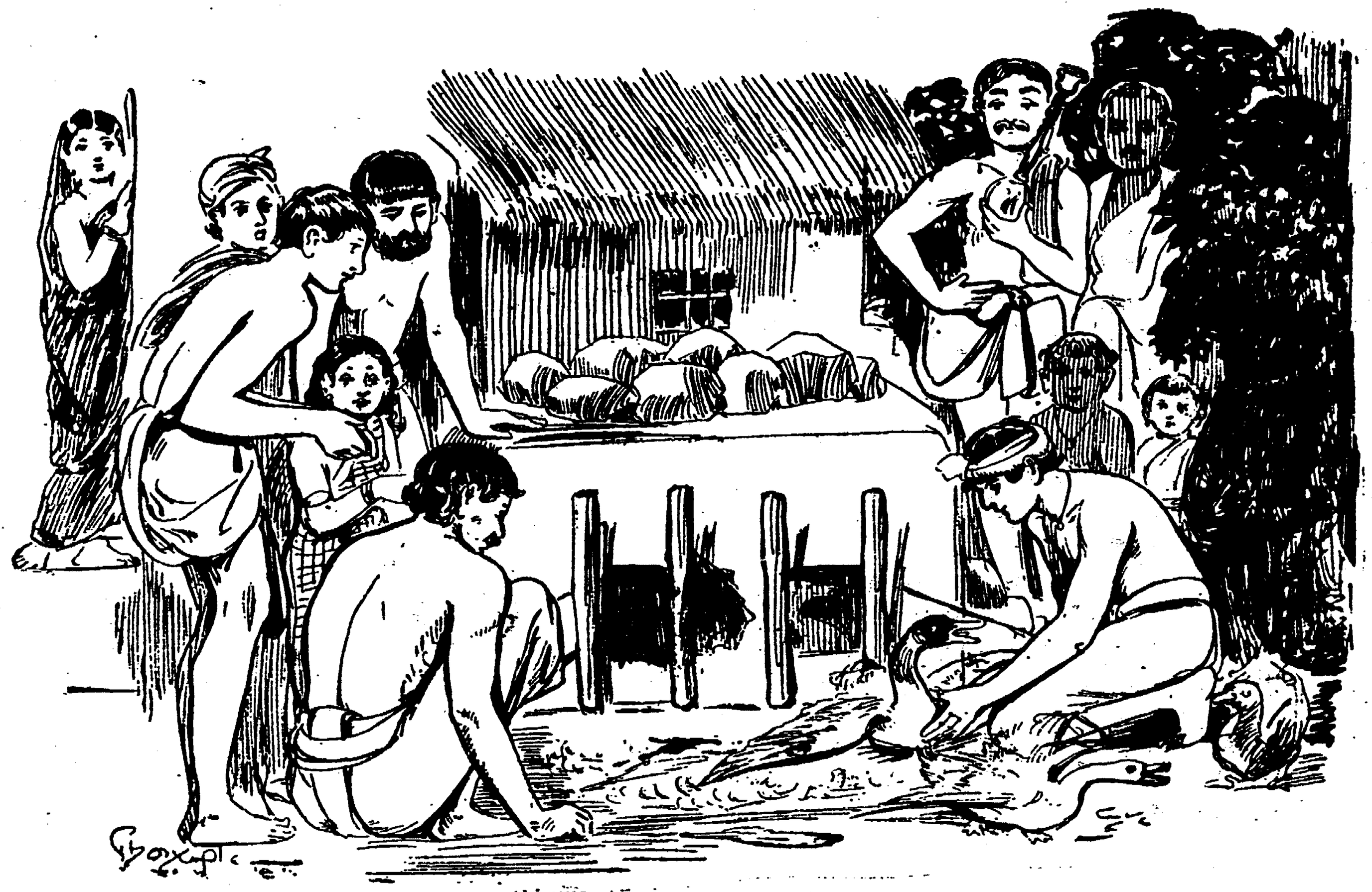

মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেল।

সকলেই রাজী হইয়া গেলাম; সন্ধ্যার পর যার যা হাতিয়ার ছিল, সঙ্গে নিয়া সবাই একত্র হইলাম, কিন্তু বাঘের সন্ধান পাওয়া গেল না। একদিন বাদেই কিন্তু আবার সকলে সভয়ে দেখিলাম ফের উপদ্রব সুরু হইয়াছে—রাস্তার ধারে একটা ছাগলের শরীরের খানিকটা অংশ! মাংস সবটাই বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে, শুধু হাড়, চামড়া, শিং ইত্যাদি পড়িয়া আছে আর সমস্ত জায়গাটাতে চাপ্‌টা বাঁধা রক্ত শুকাইয়া আছে। সে পাড়ার লোকেরা বলিল, গভীর রাতে বাঘের গর্জ্জন এবং ছাগলের চীৎকার দুই তারা স্বকর্ণে শুনিয়াছে। আমাদের দল আবার সজাগ হইয়া উঠিল, কিন্তু ক্ষুদে বাঘ ধরা দিল না। প্যারীদাও কম রাত্তির লাঠি হাতে বাঘের খোঁজে কাটাইল না, কিন্তু সবই বৃথা।

দুনিয়ার জীবের মধ্যে বুদ্ধিতে মানুষ যে সবার সেরা এ কথা কেউই অস্বীকার করিবে না; কিন্তু এর পর পূরা একটী মাস ধরিয়া ছোট্ট একটা বাঘের বাচ্চা আমাদের

এক গাঁ লোককে যে ভাবে নাকাল করিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাতে সে ধারণা আমাদের প্রায় উল্টাইয়া যাইবার জো হইল। এই এক মাসে গাঁয়ের আরও কত হাঁস-পাঁঠা যে মারা পড়িল তা আর কি বলিব? কেষ্টর দল লাঠি-সড়্‌কি নিয়া গ্রামের এক দিকে পাহারা দেয়, আর অন্য দিক্ হইতে শব্দ আসে—“হালুম!” লোকে ভাবনায় অস্থির হইয়া গেল; আজ যেন বাঘ ছোট আছে কিন্তু কাল যখন একটু বড় হইয়া মানুষ-গরু নিয়া টানাটানি করিবে, তখন? শিকারীদের কাছে খবর গেল, কিন্তু আসি আসি করিয়া তারাও যেন আসে না।

সেদিন ঘরে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছি, হঠাৎ চুপি চুপি কেষ্ট আসিয়া হাজির। খবর কি জিজ্ঞাসা করিতেই সে জানাইল, বাঘের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু ভারী ধড়িবাজ জানোয়ার, ‘সোরগোল করিলেই সে লুকাইয়া পড়িবে। বাঘ ধরার ইচ্ছা যদি থাকে তবে খাওয়া-দাওয়ার পর শক্তমত একটা লাঠি হাতে তার জন্য যেন অপেক্ষা করি, সে আসিলে দুই জনে একত্রে বাহির হইয়া পড়িব। ব্যাপারটা পাঁচ কান না হওয়াই ভাল, কেননা বেশী গণ্ডগোল হইলে সে সেয়ানা জানোয়ার ধরা বড় সহজ হইবে না—ভারী চতুর জীব কিনা!’

জবাব দিতে আমি কিছু দেরী করিতেছি দেখিয়া কেষ্ট একটু হাসি চাপিয়া বলিল, “ভয় খাচ্ছিস্ কেনরে? ছোট্ট একটা বাঘের বাচ্চা বই তো নয়! আর এদিকে আমরা দু'দু'জন পালোয়ান!”

এর পর অস্বীকার করিলে আর মান থাকে না, তাই রাজী হইয়া গেলাম।

রাত সাড়ে দশটার পর আমি আর কেষ্ট গাঁয়ের বড় বট গাছটার নীচে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—চারিদিক্ গভীর অন্ধকারে নিস্তব্ধ, চোখে যেন কিছুই মালুম আসে না। সত্যি কথা বলিতে কি, বড়ই ভাবনা হইতেছিল, অন্ধকারে কোন্ সময় যে বাঘের পো ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়ে কে জানে? কেষ্ট বলিল, “দাঁড়া এখানে; যাই চোখে দেখিস্ না কেন, চীৎকার করবি না, খবরর্দ্দার!”

আধ ঘণ্টাটেক সেই অবস্থাতেই দাঁড়াইয়া আছি—ক্রমে দেখি কে যেন ধীরে ধীরে রাস্তা ধরিয়া আমাদেরই দিকে আসিতেছে। কাছে আসিতে অন্ধকারেও

বুঝিলাম লোকটী প্যারীদা—বলিতে ভুলিয়াছি, বড় বট গাছটার কাছেই প্যারীদার বাড়ী। হাতে লাঠি দেখিয়া বুঝিলাম, আমাদের মত প্যারীদাও বাঘের খোঁজে বাহির হইয়াছে। সেই কথাটাই বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু কেষ্ট তাড়াতাড়ি তার ঠোঁটের উপর তর্জ্জনী চাপিয়া আমায় চুপ্ করিতে বলিল। প্যারীদা আগাইয়া চলিল, কেষ্টর সঙ্গে আমি তার পেছু পেছু চলিলাম। হামিদ শেখের বাড়ীর কাছে আসিয়া প্যারীদা হঠাৎ একটা ঘরের আড়ালে মিনিট্ খানেকের জন্য অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই যখন সে আবার দেখা দিল তখন বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া দেখি, সে তার ডান হাতের মুঠার মধ্যে খুব বড় একটা মুর্গীর গলা চাপিয়া ধরিয়া আসিতেছে! হাতের চাপুনীতেই বোধ করি মুর্গীটার দম্ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তার গলা দিয়া কোন আওয়াজ বাহির হইল না। প্যারীদা তখন তাড়াতাড়ি তার গা হইতে কতগুলি পালক খুলিয়া মাটীতে ছড়াইয়া দিল, আর সেই সঙ্গে বাঁ হাতের একটা বোতল হইতে লাল মত কি একটা তরল জিনিষ মাটীতে ঢালিয়া ফেলিল। ব্যাপার দেখিয়া আমি তো 'থ' হইয়া গেছি। কিন্তু ঠিক তার পরেই প্যারীদা আরো যে একটী কাণ্ড করিল তাতে 'থ' বলিলেও ঠিক হয় না, আমি একেবারে 'দ' হইয়া গেলাম—মুর্গীটিকে বগল-দাবা করিয়া হামিদ শেখের বাড়ীর বাহিরে আসিয়াই প্যারীদা গলা দিয়া আওয়াজ ছাড়িল—"হালুম!" অবিকল একটী বাচ্চা বাঘের গলার আওয়াজ! মানুষে সে আওয়াজ করে কি করিয়া?

ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই কেষ্ট গিয়া পেছন দিক্ হইতে প্যারীদাকে একেবারে জাপ্টাইয়া ধরিয়া কহিল, "ধন্যি তুমি ম্যাজিক্‌ওলা মুনিবের কাছে থেকে হরেক রকম জন্তু-জানোয়ারের ডাক্ শিখেছ প্যারীদা, আর ধন্যি বলি তোমার নোলাখানাকে যা সায়েব-বাড়ীর মুর্গী-মাটন খেয়ে এতটা বেড়ে গেছে যে পূরো একটী মাস ধরে এক গাঁয়ের হাঁস-পাঁঠা সাবড়েও এই গরীব বেচারীর মুর্গীটা নইলে ঠিক থাক্‌তে পার্‌ছে না। যা হোক্, বেচারা বাঘের ছানার ওপর মিছিমিছি দোষ চাপিয়ে আড়ালে আড়ালে এক মাসের খ্যাটোন্ যোগালে ভাল!"

প্যারীদার বগল হইতে মুর্গী, এবং হাত হইতে লাঠি ও রংয়ের বোতল একই সঙ্গে মাটীতে পড়িয়া গেল। যেভাবে আমাদের দিকে সে তাকাইতে লাগিল তাতে ও অবস্থাতেও আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না।

* * * *

সে রাত্রে বাড়ী ফেরার পর হাত-মুখ ধুইয়া কেষ্ট বলিল, "আরে ভাই, আমিই কি জানি ওর পেটে পেটে এত বিদ্যে? কাল গেছ্‌লাম কল্‌কাতা বিমল বাবুর সঙ্গে একটু দরকার ছিল, দেখি কিনা তাঁর বাড়ীর বারান্দায় লোহার শেকলে এক বাঘের বাচ্চা বাঁধা,! চেহারাটা দেখে, আর বিশেষ করে ডান কানটা কাটা লক্ষ্য করে আমার কেমন খট্‌কা লাগ্‌ল—এইটেই না প্যারীদার সেই হারাণো বাঘ যার খোঁজে আমরা হয়রাণ হয়ে বেড়াচ্ছি? কৌতূহল চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না, বিমল বাবুকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, এ বাঘের ছানাটা তিনি পেলেন কোথা? সে কথায় বিমল বাবু কি জবাব দিলেন জানিস্? বল্লেন, বুলক্ নামে এক ম্যাজিক্‌ওলা সাহেবের চাপরাশী প্যারীলালের কাছ হতে তিনি ওটা তিরিশ টাকায় কিনেছেন। আমার বুকের ভেতরটা খচ্ করে উঠ্‌ল, জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, 'কদ্দিন হোল কিনেছেন?' বিমল বাবু বল্লেন 'তা মাস খানেক হতে চল্ল। সাহেব নাকি প্যারীলালকে বাঘটা বখ্‌শিস্ দিয়েছিলেন। সে আর ও বাঘ নিয়ে কি কর্‌বে—আমায় চিন্‌ত, এ বিষয়ে আমার যে একটু সখ-টখ আছে সে খবরও রাখ্‌তো, কাজেই সাহেবের কাছে এটা পেয়েই সোজা আমার কাছে চলে এয়েছিল। আমি অবশ্যি টাকা দিয়ে তখনই রাখ্‌তে চাইছিলাম, কিন্তু ও বল্লে দিন তিনেক বাদে ফের এসে টাকা নিয়ে যাবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ছানাটাকেও দিয়ে যাবে; তাই কর্‌লে।' বিমল বাবুর কাছে এই ঘটনাটা শোনার পর সমস্ত ব্যাপারটা তখন বোঝা গেল। প্যারীদা মনে মনে ঠাউরে বসেছিল, এই বাঘের ছানা থেকে সে একেবারে ডবল লাভ কর্‌বে। এক, এটাকে বেচে টাকা তো পাবেই, তা ছাড়া আরো একটা ফন্দি! সাহেব-বাড়ী কাজ করে করে মাংস খাবার জিব্‌টা এর বড় বেড়ে গেছে। কিন্তু গরীব মানুষ, চাক্‌রী ছেড়ে এখন রোজ রোজ মাংস যোগায় কোত্থেকে? ফন্দিটা হোল এই, বাঘটাকে দিন তিনেক রেখে হঠাৎ এক দিন রটিয়ে দেবে সেটা শেকল ছিঁড়ে পালিয়েছে! ব্যস্, তারপর মজাসে গাঁয়ের হাঁস-পাঁঠা-মুর্গী রাতারাতি গেরস্তের বাড়ী থেকে সরাও, কেউ আর অপর কাউকে সন্দেহ কর্‌বে না, সবাই বাঘের ঘাড়ে দোষ চাপাবে। প্যারীদার আরো একটু সুবিধে হয়ে গেল এই যে, ম্যাজিক্‌-ওলার কাছে থেকে তাদের মত নানা রকম জন্তু জানোয়ারের আওয়াজের নকল কর্‌তে সে শিখেছে। কাজেই মাঝ রাতে গোটা দুচ্চার বাঘের আওয়াজ কর্‌লেই হোল,

লোকে ভুলেও বাঘ ভিন্ন অপর কাউকে সন্দেহ কর্‌বে না। আর দুপুর রাতে ঘুরে বেড়াবার তো তোফা কৈফিয়ৎই আছে—বল্লেই হোল হারাণো বাঘটার খোঁজ করছি! —কেমন প্যারীদাটি তোমার একখানা চীজ নয় কি?"

সেদিন হইতে আমাদের গাঁয়ে আর বাঘের উৎপাৎ শোনা যায় নাই। শুনিলাম, প্যারীদা নাকি সেদিনই গাঁ ছাড়িয়া তার মনিব বুলক্ সাহেবের কাছে চলিয়া গেছে —বলিয়া গেছে পাড়াগাঁয়ে আর বাস করা চলে না— যে ম্যালেরিয়া!

কলের মানুষ

(শ্রীসুবিনয় রায়)

'কলি-যুগ' বল্‌লেই যেন কলের কথা মনে পড়ে। বাস্তবিকই, কলি যুগ কলেরই যুগ। মানুষ যেন পারত-পক্ষে হাতে আর কোন কাজ কর্‌তে চায় না। তার হিসাব রাখে কলে, চিঠি ছাপে কলে, মাল তোলে কলে, জিনিষ গুছায় কলে, জুতা বুরুষ করে কলে, বাসন ধোয় কলে, কাপড় কাচে কলে, জিনিষ বেচে কলে। কলে চ'ড়ে মানুষ বেড়াতে যায়, সাগর পার হয়, আকাশে ওড়ে, জলের নীচে যায়। কলের সাহায্যে মানুষ দেশ-বিদেশের খবর আনে, খবর পড়ে; কলের সাহায্যে দুনিয়ার চারিদিকের সঙ্গে কথা বলে, চারিদিকের গান-বাজনা ঘরে ব'সে শোনে। কলের আর শেষ নাই;—প্রতিদিনই নূতন কলের আবিষ্কার হচ্ছে;—কড়াইশুটি-ছাড়ান কল, ময়দা-ঠাসা কল, বস্তা-বন্দির কল, বোতল-ধোয়া কল, চুল কোঁক্‌ড়ান কল, ঘুম-পাড়ানী কল, ঝাঁট-দেওয়া কল, রুটি-সেঁকা কল, পেঁয়াজ-কাটা কল, আলু ছাড়ান কল, পাঁউরুটি-কাটা কল, টাকা-গোণা কল, টাকার রেজ্‌কি-দেওয়া কল, টিকিট-বেচা কল—আর কত নাম কর্‌ব?

কলের মানুষ তৈরী করার সখও মানুষের বহুকাল থেকেই আছে। হাজার বছর আগেও মানুষ চেষ্টা করেছিল যা'তে কলে-চালান 'মানুষ' বানিয়ে তা'কে দিয়ে তা'র কাজ করিয়ে নেয়। সামান্য কয়েক বছর আগেও যে কলের মানুষ তৈরী হয়েছে তা'কে দিয়ে একটা বিশেষ কোন কাজ করান যেতে পারে বা বিশেষ

কোন খেলা সে কর্‌তে পারে। এনিগ্‌মারেল ("Fnigmarelle") নামে একটি কলের মানুষ বাইসিকেল চড়্‌তে পার্‌ত আর বোর্ডে নিজের নামটি লিখ্‌তে পার্‌ত। আরেকটি কলের পুতুল বাজনা বাজাতে পার্‌ত, নিজে শু'তে বস্‌তে পার্‌ত;—তবে, সে সব কাজ নিজের ইচ্ছায় সে কর্‌ত না;—একজন মানুষ তা'কে করিয়ে দিত। কাজেই, সে সব কলের মানুষকে দিয়ে বিশেষ কোন কাজ এগুতে পার্‌ত না। মানুষকে যদি তা'র পিছনে লেগেই থাক্‌তে হ'লো, তবে আর তা'কে দিয়ে কি কাজ? তবু, মানুষের মানুষ-তৈরীর সখটা চরিতার্থ করার জন্য নানা জনে নানান্ রকমের কলের মানুষ তৈরী ক'রেছে।

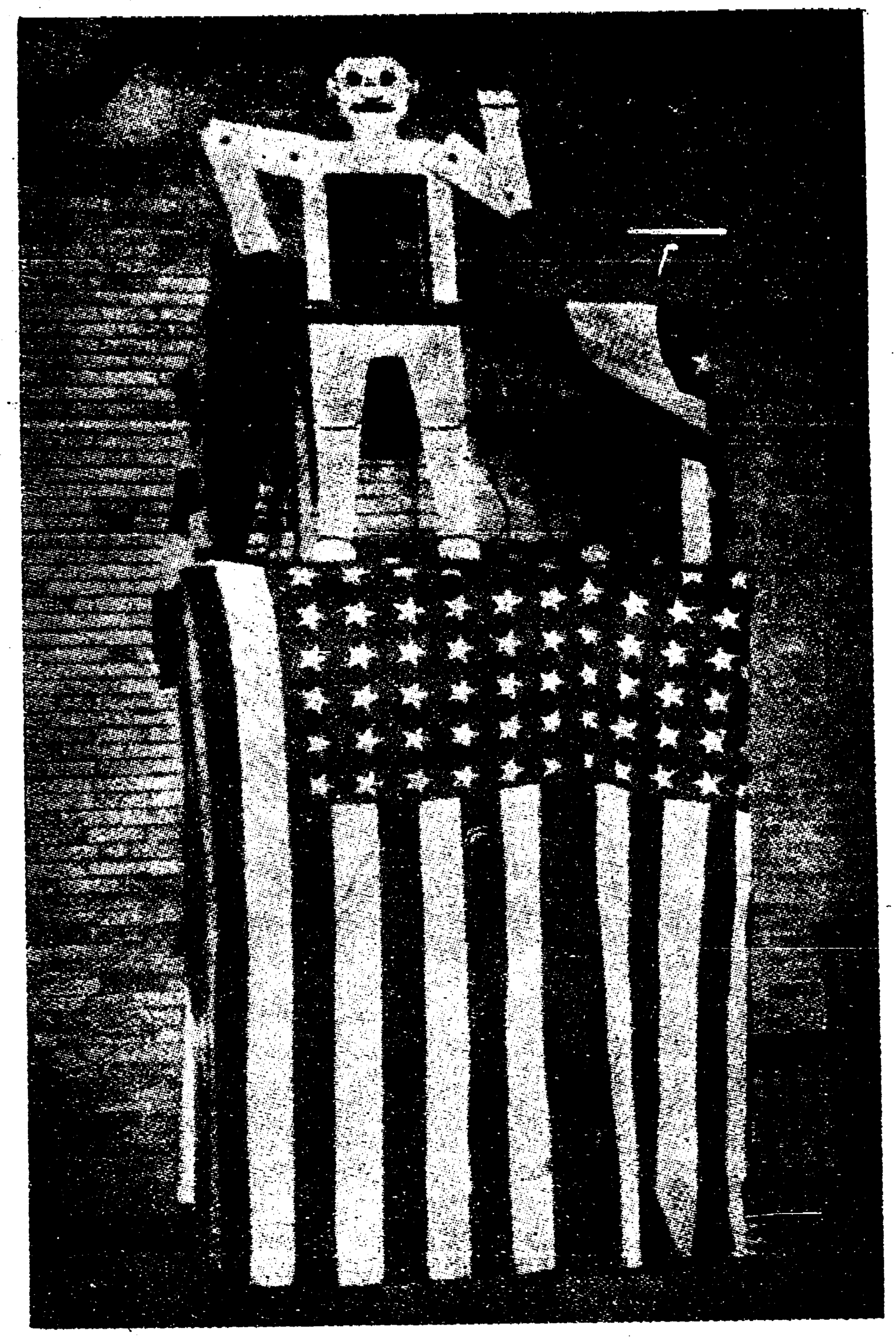

এঁর নাম টেলিভক্স্—ইনিই হচ্ছেন হুকুম-তামিল-ওয়ালা কলের মানুষদের মধ্যে প্রথম। শিকাগো সহরের বিরাট্ ড্রেন-কলের (Sewage) কারখানার দ্বার-উন্মোচন কাজে আপাততঃ ব্যস্ত।

সম্প্রতি, মানুষের জ্ঞানের উন্নতির ফলে কলের মানুষ তৈরীরও আশ্চর্য্য উন্নতি হয়েছে। এ কালের কলের মানুষকে চালা'তে হয় না; সে নিজেই চল্‌তে পারে; তবে, তা'কে হুকুম দিতে হয়। কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে তা'র উত্তর দিতে পারে; তবে, সব কথার উত্তর সে দিতে পারে না। তার ভিতরের যন্ত্রপাতিতে যে সব প্রশ্নের উত্তরের, বা যে সব কাজ কর্‌বার ব্যবস্থা আছে, শুধু সেই কাজই সে কর্‌তে পারে, সেই প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে।

প্রথম যে কলের মানুষটি হুকুম তামিল ক'রে নাম কেনেন, তাঁর নাম হচ্ছে "টেলিভক্স্"। ইনি টেলিফোন ধর্‌তে জানেন, ইলেক্‌ট্রিক লাইটের ও পাখার সুইচ্ হুকুম-মত টিপে দিতে পারেন ; আরো দু' চারটে কাজ কর্‌তে পারেন। ছবিতে দেখ, তিনি কত ব্যস্ত রয়েছেন। শিকাগো সহরের বিরাট্ ড্রেনের কলের কারখানার দ্বার উন্মোচন তিনি অন্যের হুকুম-মত কর্‌ছেন। এঁর চেহারা কিন্তু কল-কব্জা গোছেরই ; মানুষের সঙ্গে বিশেষ সাদৃশ্য নেই।

আরেকটি কলের মানুষ একটি বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা সম্প্রতি হঠাৎ লণ্ডন সহরের রাস্তায় দেখা দিয়ে রাস্তার লোকদের অবাক্ ক'রে দিয়েছিলেন। এঁর নির্ম্মাতা কাপ্তেন রবার্ট্‌সের সঙ্গে ইনি অনায়াসে রাস্তায় হেঁটে চলেছিলেন। ছবিতে দেখ,

বৃদ্ধা ভদ্রমহিলাটি রাস্তা পার হচ্ছেন ; পুলিশ হাত দেখিয়ে গাড়ীঘোড়া থামিয়ে এঁকে পার কর্‌ছে। এই কলের 'ভদ্রমহিলা'র আবিষ্কারক এবং নির্ম্মাতা কাপ্তেন রবার্ট্‌স্ তাঁর পাশেই হেঁটে চলেছেন।

পুলিশ হাত দেখিয়ে রাস্তা পরিষ্কার ক'রে এঁর পার হবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে ; ইনি কাপ্তেন রবার্ট্‌সের সঙ্গে রাস্তা পার হচ্ছেন। এঁর চলার ক্ষমতাটাই বিশেষ ভাবে ছিল ; অন্য কোন কাজ করার কথা শুনি নি। হাঁটার সময় সাধারণ মানুষের মত

পা ফেলে চল্‌তে পার্‌তেন। মুখের এবং হাত-পায়ের গড়নও এঁর অনেকটা সাধারণ মানুষের মতই।

কিছুকাল আগে, লণ্ডনের একটি এঞ্জিনিয়ারিং এক্‌জিবিসন খোলার কয়েক দিন আগে, দ্বার-উন্মোচন সভার যিনি সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েন। তখন একজন এঞ্জিনিয়ারের মাথায় চট্ ক'রে একটা বুদ্ধি এল। তিনি একটা কলের মানুষ বানাচ্ছিলেন। তা'কে দিয়ে এক্‌জিবিসনের দ্বার-উন্মোচনের কাজটা করা'লে কেমন হয় ? যেমন কথা তেম্‌নি কাজ। একজিবিসনের কাজ চালাবার জন্য যে সমিতির উপর ভার পড়েছিল তা'র সভ্যদের অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর কলের মানুষকে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত কর্‌তে লাগ্‌লেন। কলের মানুষের নাম তিনি দিলেন "এরিক্"।

নির্দ্দিষ্ট দিনে সভা-ঘর লোকে পূর্ণ হয়ে গেল। সাম্‌নে উঁচু মঞ্চের উপর

"প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাস আমার না থাকায়..."—এরিক্ নামক কলের মানুষ নিজের আসন থেকে ধীরে ধীরে উঠে হাতটি নেড়ে এই কথাগুলি বল্‌লেন।

"এরিক্" ব'সে। হঠাৎ সে আস্তে আস্তে উঠ্‌তে আরম্ভ কর্‌ল ; তারপর দাঁড়িয়ে উঠে,

হাত নেড়ে জলদ-গম্ভীর স্বরে, স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরাজীতে বল্‌ল, "উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ! প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দেবার অভ্যাস না থাকায়……" ইত্যাদি। দু' চার লাইন বক্তৃতা দিয়ে তিনি দ্বার-উন্মোচনের কাজ শেষ কর্‌লেন।

"এরিক্"এর পরও অনেক কলের মানুষের আবির্ভাব হয়েছে এবং ক্রমেই এদের জাতের নানা রকম উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু, সব সময়েই এই কথাই মনে হচ্ছে যে, কলের মানুষের উন্নতি যতই হোক্ না কেন, মানুষের বুদ্ধির পরিচয়ই এরা দেয় এবং দেবে—নিজের বুদ্ধির নয়। এদের চিন্তাশক্তিটা মানুষই জোগায়। মানুষ যা' ব্যবস্থা করে, এরা তা'ই করে;—নিজের ব্যবস্থা করার শক্তি, বুদ্ধি বা জ্ঞান এদের একতিলও নাই।

গদুর কাণ্ড

(শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ)

একটী ছেলে হ'লো যখন পাঁচটী মেয়ের পর,
আদর ক'রে রাখেন বাবা নামটী গদাধর!
ডাকেন দিদি 'যাদু আমার!' দাদা ডাকেন—'গদু!'
মা বলেন—'হও একটু বড়, সঙ্গী দেবো বধূ।'

বাড়্‌ল গদাধরের বয়স; বাড়্‌ল না যা বিদ্যে,—
বইয়ের আখর দেখ্‌লে চোখই কয় ডেকে, 'আয়, নিঁদ্ দে!'
বিদ্যে বরং মাথায় থাকুক্,—হস্তী এবং গাধা
দুইটীই কয় সমস্বরে 'এই আমাদের দাদা!'

বয়সে যখন গদাইচন্দ্র উঠ্‌ল নেহাৎ বেড়ে,
মায়ের দুঃখ—'মাণিক আমার যায় বুঝিবা ছেড়ে!

বৌ-ছাড়া আর থাক্‌বে কত খোকন-বাবা একা!'
গিন্নী খোঁচে—কর্ত্তার হ'লো বিয়ের কনে দেখা।

বিয়ের নামে গদাধরের ফূর্ত্তি—বেজায় ফূর্ত্তি!
আর্‌শীতে রোজ একশোবার ও দেখে নিজের মূর্ত্তি!
চ্যাঁচায় রোজই সন্ধ্যা-সকাল—টপ্পা-খেয়াল শেখে,
রজক ভাবে—'অই বুঝি মোর মর্‌চে গাধা ডেকে!'

পাড়ার মোড়ল চৌদ্দআনীর চৌধুরীদের রাধা
বলেন এনে কান ধ'রে তার—'হচ্ছে কি ও, গাধা?
বিয়ের নামে কার শুনেছিস্ চিল্লানিটা অত?
কর্‌বি বিয়ে, মুখ বুজে থাক্ ভদ্রলোকের মত।'

ভদ্রলোকে কয়না কথা বিয়ের কালে বুঝি—
রাধুবাবুর কথায় গদু বুঝ্‌ল সোজাসুজি।
সেই হ'তে সে ব্যোম্ ব'লে যে রাখ্‌লে চেপে ঠোঁট—
শালী-শালাজ ক'রেও তোয়াজ কেউ পেলে না ভোট।
পাঁচ বছরের একটী শালা মার্‌ল কাতুকুতু—
নড়্‌ল না ঠোঁট, গালটী ফুলে উঠ্‌ল শুধু থুথু।

চৌধুরীদের কর্ত্তা বলেন—'বোকাটা, শোন্ তো!
বোবার মত শ্বশুর-বাড়ী রইলি চেপে দন্ত?
ঠাট্টা-হাসি না-ই বা হ'লো, না-ই গোঁয়ালি রঙ্গে,—
কইতে কথা হয় তো দুটো গুরুজনের সঙ্গে!
কর্ত্তাবাবুর কথায় হ'লো অন্তরে আপশোষ,—
ভাব্‌ল গদু—'শুধ্‌রে নেবে যা-ই হয়েছে দোষ।'

শ্বশুর-বাড়ী গিয়েই ফিরে সাম্‌নে গদু দেখে—
গুড়ুক টেনে শ্বশুরটী তার জমাখরচ লেখে।
গুরুজনের সঙ্গে কথা কইতে তো হয় আগে—
কি কয় ?—ভেবে মনে যে, ছাই, কিচ্ছুই না জাগে !
অনেক ভেবে কয়, 'করেছেন শ্বশুর-মশায় বিয়ে ?'
চোখ তুলে তার শ্বশুর ভাবে—'বল্‌চে জামাই কি এ ?
হয় তো মাথা গরম হ'লো আস্‌তে হেঁটে রোদে !'
বলেন—'নেয়ে ঠাণ্ডা হবে, তেল দিয়ে যা, বোদে।'

দীঘির ঘাটে গদাই গিয়ে ফ্যাল্‌ফ্যালিয়ে চায়—
দীঘির মাটী কোথায় গেল ! খুঁজ্‌চে ডানে বাঁয়।
তক্ষুণি সে আস্‌ল ফিরে, বল্‌ল শ্বশুরটীকে,
'দেখ্‌চি না তো দীঘির মাটী !—রাখ্‌ল কে কোন্ দিকে ?'

হেসে বলেন শ্বশুর—'বাপু খোঁজ রাখনা কিছু !
দৃষ্টি তোমার উচ্চে কিনা, তাই দেখনা নীচু।
খেলেন কিছু মাটী বেয়াই ছেলের দিয়ে বিয়ে,
বাকীটা সব আমার পেটে তোমায় মেয়ে দিয়ে !'

গ্রহের ফের

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্)

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষের কাশ্মীর প্রদেশে মৃগাঙ্কদত্ত নামে এক প্রবলপরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব কর্‌তেন। রাজার ধনবল, ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না ; লক্ষ লক্ষ সৈন্য, হাতী, ঘোড়া কিছুরই অভাব নাই। মৃগাঙ্কদত্তের রাণীর নাম মুক্তাবলী। তাঁদের দুই পুত্র—নিখিলরঞ্জন ও নীহার রঞ্জন। ছেলেদের অল্প বয়স ; রূপে গুণে বুদ্ধিতে তারা রাজ্যের সকলেরই প্রিয়পাত্র।

পরিপূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ বল্‌তে যা বুঝায় রাজারাণীর তার একটুও অভাব ছিল না ; কিন্তু রাজা মৃগাঙ্কদত্তের এক মহৎ দোষ ছিল ; তিনি এমনি মদমত্ত ছিলেন যে তাঁর গর্ব্ব ও অহঙ্কারের শেষ ছিল না। ভারতবর্ষের আর কোন রাজাই তাঁর সমকক্ষ ন'ন, আর কারও তাঁর মত এত লক্ষ লক্ষ অজেয় সৈন্য নাই, ধনে, বলে, ঐশ্বর্য্যে, কেহই তাঁর তুল্য ন'ন—এই ছিল তাঁর গর্ব্বের বিষয় ও অহঙ্কারের কারণ। বাইরেও যেমন তাঁর অজেয় প্রতাপ, অক্ষুণ্ন সম্মান, ঘরেও তেমনি অতুল সুখ ও অটুট শান্তি। রাণী মুক্তাবলী ছিলেন আনন্দের প্রতিমা ; দুই পুত্র নিখিল ও নীহার ছিল তাঁর দুই নয়নের মণি। কিন্তু অতি অহঙ্কার পতনের মূল ; তাই এত সুখ, এত দর্প, এত প্রতাপ তাঁর বেশীদিন রইল না। কতবার তিনি অজেয় সৈন্যদল নিয়ে কত রাজ্য জয় করে এসেছেন ; ভারতবর্ষের আর আর সব রাজারাই তাঁর প্রধান্য স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কাশ্মীর রাজ্য নন্দনকানন-তুল্য ! এমন ফুলের বাগান, ফলের বাগান, এমন প্রাকৃতিক দৃশ্য আর কোন্ দেশে আছে ? তাই এ রাজ্যের আর একটি নাম ভূ-স্বর্গ ! পারস্যের সম্রাট্ অনেক দিন হতে এই কাশ্মীর রাজ্যটুকু অধিকার কর্‌বার জন্য আয়োজন কর্‌ছিলেন। পারস্যরাজের তখন জগদ্ব্যাপী খ্যাতি। তখনকার দিনে তাঁর মত পরাক্রমশালী রাজা পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না। তাঁর অগুণ্‌তি সৈন্য। সেই বিপুল সৈন্যদল নিয়ে তিনি কাশ্মীর-রাজ্য আক্রমণ কর্‌তে চল্‌লেন।

এদিকে মৃগাঙ্কদত্ত সেই খবর পেয়ে ভয়ে ও উৎকণ্ঠায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন। তাঁর রাজ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য থাক্‌লেও পারস্যরাজের সম্মুখীন হবার মত সৈন্য ছিল না। তাই তিনি আশপাশের রাজাদের নিকট সাহায্য ভিক্ষা চেয়ে পাঠালেন। কিন্তু তাঁর ব্যবহারে সকলেই তাঁর উপরে বিরক্ত ছিলেন, সেইজন্য কেহই তাঁকে সাহায্য কর্‌তে প্রস্তুত হলেন না। শেষে একদিন পারস্যের সৈন্যদল এসে তাঁর সৈন্যদলকে হারিয়ে দিয়ে কাশ্মীর-রাজ্য অধিকার করে বস্‌ল। তখন মৃগাঙ্কদত্ত রাণী মুক্তাবলী ও দুই পুত্র নিখিলরঞ্জন ও নীহার রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে রাজ্য ছেড়ে দক্ষিণ দিকে পালালেন। সাম্‌নেই সুবিস্তৃত মরুভূমি। অনেক কষ্টে সেই মরুভূমি পার হয়ে তিনি সমুদ্রকূলে এসে উপস্থিত হলেন। সমুদ্রকূলে এক ছোট্ট নগর ; বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে অনেক দেশের জাহাজ সেখানে এসে জড় হয়। মৃগাঙ্কদত্ত আত্মপরিচয় গোপন করে একখানি জাহাজে পালাবার ব্যবস্থা কর্‌লেন। জাহাজের পরিচালকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে তিনি ঠিক হয়ে রইলেন ; কাল সকালে জাহাজ ছাড়্‌বে। মৃগাঙ্কদত্ত অনেকটা নিরুদ্বেগ হলেন।

এখন সেই জাহাজের পরিচালক ছিল ভারী বদ্ লোক। সে আগে হতেই মনে মনে একটা ফন্দি এঁটে রেখেছিল, সেই ফন্দি-অনুযায়ী কাজ কর্‌বার জন্যে সে বন্দোবস্ত কর্‌তে লাগ্‌ল। পরদিন সকালে জাহাজ ছাড়্‌বার জন্য প্রস্তুত। জাহাজে সকলে উঠেছে ; কেবল মৃগাঙ্ক দত্ত উঠ্‌লেই হয়।

কিছুক্ষণ পরে রাজা স্ত্রী ও পুত্রদ্বয়কে নিয়ে সমুদ্রতীরে এসে উপস্থিত হলেন। সমুদ্রকূল হতে জাহাজের উপর তক্তা ফেলা। প্রথমে রাণী মুক্তাবলী উঠ্‌লেন, তারপর ছেলেরা উঠ্‌তে যাচ্ছে এমন সময়ে কতকগুলো বদ্‌মায়েস গুণ্ডা এসে রাজাকে ও ছেলেদের ধরে মাটীতে ফেলে চেপে রইল। ওদিকে চক্ষের নিমেষে জাহাজের তক্তা তুলে নিয়ে পরিচালক জাহাজ ছেড়ে দিল। অনুকূল বাতাসে পাল তুলে জাহাজ তর্‌তর্ করে সমুদ্রমধ্যে ভেসে চল্‌ল। মুক্তাবলী সমস্ত দেখে ভয়ে, দুঃখে, প্রাণপণে চীৎকার কর্‌তে লাগ্‌লেন। কিন্তু তিনি একান্ত অসহায়! পরিচালকের মৎলব যে রাজাকে মেরে তাঁকে বিবাহ করা, মুক্তাবলী তা বুঝ্‌তে পেরে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে গেলেন, কিন্তু এক জোড়া দৃঢ় হস্ত তাঁকে চেপে ধর্‌ল। রাণী ফিরে দেখেন পরিচালক তাঁর অসহায় অবস্থা দেখে হাস্‌ছে। সমস্ত শরীর তাঁর রাগে ও ঘৃণায় রি রি করে উঠ্‌ল। সঙ্গে তাঁর কোন্ অস্ত্রই নাই, যদিও রাজ্যে থাক্‌বার সময় তিনি সর্ব্বদাই একখানি ছোট্ট শাণিত ছুরি বুকের মধ্যে রেখে বেড়াতেন। কিন্তু এখন তিনি নিতান্ত অসহায়। কিন্তু নিরস্ত্র হলেও সে বীরনারীর মনে অসীম বল। রাণীর আঁচলে বাঁধা ছিল এক গোছা চাবি, তিনি আঁচল ধরে সেই চাবির গুচ্ছ এম্‌নি সজোরে পরিচালকের রগে আঘাত কর্‌লেন যে "বাপ্‌রে" বলে সেই খানেই পরিচালক শুয়ে পড়্‌ল। জাহাজের নাবিকগণ এতক্ষণ দূরে দাঁড়িয়ে তামাসা দেখ্‌ছিল; প্রভুর দুরবস্থা দেখে তারা সকলে ছুটে এসে পরিচালকের চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগ্‌ল। অনেকক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফির্‌লে পর সে ধীরে ধীরে উঠে বস্‌ল। তারপর সে ছুটে মুক্তাবলীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নানা রকম আস্ফালন এবং তর্জ্জন-গর্জ্জন কর্‌তে লাগ্‌ল—"রাক্ষসী, মেরে ফেলেছিলি আমাকে। তোকে কুঁচিয়ে কুঁচিয়ে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়াব।"

রাণী মুক্তাবলী তখনো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছিলেন। দুষ্ট পরিচালকের তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনে তিনি ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠ্‌লেন—"তা তোর ইচ্ছা হয় ত খাওয়াস্। কিন্তু ফের যদি আমার ত্রিসীমানায় আস্‌বি তবে তোরই একদিন কি আমারই একদিন। হয় তোকে শেষ কর্‌বো, নয় আমি এখান হতে জলে ঝাঁপ দিয়ে মর্‌বো।"

রাণীর সেই ক্রোধ-প্রজ্জ্বলিত মূর্ত্তি দেখে জাহাজের সমস্ত লোকই থতমত খেয়ে গিয়েছিল। তখন আর সকলে পরিচালককে বুঝিয়ে সুজিয়ে নিরস্ত করে ফিরিয়ে আন্‌লে। পরিচালকও বুঝ্‌লে, এহেন স্ত্রীলোকের সান্নিধ্য ত্যাগ করাই বুদ্ধিমানের কাজ, নচেৎ অনেক বিপদের সম্ভাবনা।

সেই জাহাজে একজন বণিক্‌ও যাচ্ছিল। পরিচালক তখন মুক্তাবলীকে তার কাছে দাসীরূপে বিক্রী করে দিল। বণিক্ প্রথমে ভেবেছিল যে দেশে গিয়ে উচ্চ-মূল্যে তাকে ক্রীতদাসীর মত বিক্রয় কর্‌বে, কিন্তু শেষে তার সে মত ঘুরে গেল—নিজেই মুক্তাবলীকে বিয়ে কর্‌বার জন্য সে সঙ্কল্প কর্‌ল।

রাণী মুক্তাবলীর অবস্থার কথা তোমরা বুঝ্‌তেই পার্‌ছ। একে স্বামি-পুত্রদের হারিয়েছেন,

তার উপর এই সব হীন লোকেদের হাতে পড়ে তিনি নিদারুণ মানসিক দুশ্চিন্তা ভোগ কর্‌ছিলেন। বণিক্ যখন তাঁর কাছে বিবাহের কথা তুল্‌লেন তখন তিনি ভেবে দেখ্‌লেন যে এই সব দুষ্টদের সঙ্গে তিনি এম্‌নি পার্‌বেন না, কোন রকম কৌশলের আবশ্যক। তিনি বল্‌লেন; "আমাকে পনেরো বৎসরের সময় দিতে হবে; এই সময়ের মধ্যে আমি যদি আমার স্বামী ও পুত্রদের সন্ধান না পাই তখন আপনার কথা মত কাজ করা যাবে।" রাণীর বিশ্বাস ছিল যে পনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি নিশ্চয়ই তাঁদের সন্ধান পাবেন। রাণীর কথায় বণিক্ সম্মত হ'ল।

ওদিকে রাজা মৃগাঙ্কদত্ত যখন দেখ্‌লেন যে তিনি অনেকগুলি বদ্‌মায়েসের হাতে পড়েছেন—জাহাজও কিছুক্ষণের মধ্যে দূর সমুদ্রবক্ষে বিলীন হয়ে গেল—তখন তিনি নিরুপায় হয়ে ধীরে ধীরে ছেলে দুটির হাত ধরে দেশের দিকে ফিরে চল্‌লেন—মনের ভিতর এই ইচ্ছা যে বাকি দিনগুলো কোন বনের মধ্যে ভগবানের নাম করে কাটাবেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, রাজা কত দুর্গম বন-জঙ্গল-মরু পার হয়ে চলেছেন। যেতে যেতে শেষে তিনি এক নদীর ধারে এসে উপস্থিত হলেন। নদীর জল অল্প, কিন্তু স্রোত ভয়ঙ্কর। নদীর মধ্যে অসংখ্য পাথর ও ছোট ছোট পাহাড়ের শ্রেণী! নদী পার হবার সময় যদি কোন রকমে একবার পা পিছ্‌লে যায় তা'হলে মৃত্যু অনিবার্য্য। রাজা ভেবে দেখ্‌লেন যে দুই ছেলেকে এক সঙ্গে কোলে করে নদী অতিক্রম করা দুঃসাহসের কাজ; তাই তিনি একটিকে নদীর এ পারে বসিয়ে অপরটিকে কোলে করে নদীর জলে নাম্‌লেন। নদীতে কোমর পর্য্যন্ত জল, কিন্তু এম্‌নি প্রখর স্রোত যে প্রতি পদেই রাজার পদস্খলন হতে লাগ্‌ল। অনেক কষ্টে তিনি ওপারে গিয়ে উঠ্‌লেন। ছেলেটিকে বসিয়ে তিনি আবার জলে নাম্‌লেন; কিন্তু ফির্‌বার মধ্যপথেই একটা পাথরের উপর পড়ে তিনি প্রখর জল-স্রোতের মধ্যে তলিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

নদীর দুই তীরে দুই ভাই বসে যখন দেখ্‌তে পেল যে তাদের বাবা নদীর জলে ডুবে গেল তখন তারা হাউ হাউ করে চেঁচিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সে গভীর নির্জ্জন প্রান্তর দেশে এমন জনমনুষ্যের বাস নাই যে তাদের কান্না শুন্‌তে পায়। এমন দুঃখের মাঝে যে দুই ভাই একত্র হয়ে বসে কাঁদ্‌বে সে পথও বন্ধ। নদীর দুই তীরে দুটী ভাই—মাঝে দুস্তর প্রবল নদী। তারা শুধু কাঁদে আর নদীর কিনারা ধরে ছুটোছুটি করে। শেষে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তারা ঘুমিয়ে পড়্‌ল। এই সময় একজন জেলে তার ছোট্ট নৌকা করে সেই নদী দিয়ে যাচ্ছিল। দেখে, নদীর দুই তীরে দুটী চাঁদের মত ছেলে! দুই জনকে নৌকায় তুলে সে যখন তাদের দুঃখের ইতিহাস শুন্‌লো তখন তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বুঝিয়ে বল্‌লে, "দেখ বাপু, এখন কি কর্‌বে বল, যদি আমার সঙ্গে যেতে চাও ত বল তোমাদের ঘরে নিয়ে যাই, আমারও ছেলেপুলে নাই; তোমাদের বেশ ছেলের মত যত্নে রাখ্‌বো।"

এমন তুরবস্থার মাঝে এমন আশ্রয় ও সাহায্য পেয়ে ছেলে তুটী যেন অকূল সাগর মাঝে কূল পেল। তুই ভাইএ তখন জেলের সঙ্গে জেলের কুটীরে গিয়ে উঠ্‌ল। জেলেনী ত অমন সুন্দর তুটী ছেলে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাদের কি খাওয়াবে, কি পরাবে, কোথায় বসাবে যেন ঠিকই কর্‌তে পার্‌ল না। বেচারীর ছেলেমেয়ে নাই, সমস্ত ভালবাসা তাই অজস্র ধারায় ছেলে তুটীর উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল।

দিনের পর দিন যায়। ছেলে তুটিও ক্রমশঃ বড় হতে লাগ্‌ল ও জেলেকে নানারূপে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌ল। কখনো জাল নিয়ে নদী, বিল, সায়র বা দীঘি হতে মাছ ধরে নিয়ে আসে; কখনো বা তীর-ধনুক নিয়ে বনে শীকার কর্‌তে যায়, আবার কখনো বা বর্শা দিয়ে বন্য শূকর, বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তু মেরে আনে।

ওদিকে রাজার কি হলো বলি শোন। যে নদীতে তিনি পা হড়্‌কে ডুবে গিয়েছিলেন সেই নদীরই তীরে এক গ্রামে লোকেরা ভোর বেলায় উঠে দেখে এক মহা আশ্চর্য্য ব্যাপার! এমন অদ্ভুত কাণ্ড তারা কেন, বোধ করি তাদের চোদ্দ পুরুষও দেখি নি। সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ভোর বেলা গ্রামের লোকেরা উঠে দেখে, নদীর ধারে মাঠের উপর একটা প্রকাণ্ড মাছ লাফিয়ে পড়েছে। মাছটি দৈর্ঘ্যে মানুষের দ্বিগুণ; এত বড় মাছ গ্রামের কেউ কখনো দেখেনি। নিশ্চয়ই সমুদ্রর রাক্ষুসে মাছ, কোন গতিকে নদীর ভিতর এসে পড়েছে। তারপর তীরে লাফিয়ে পড়ে আর জলে যেতে পারে নি। মাছটা তখনো লেজ নাড়্‌ছে। গ্রামের ভদ্র-ইতর সকলেই মাছটির চারদিকে জড়ো হয়ে নানা রকম জল্পনা কর্‌তে লাগ্‌ল। ভদ্রলোকেরা তাদের নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করে বাড়ী ফির্‌লে পর গরীবেরা কাটারি ও কুড়ুল নিয়ে মাছের শরীর হতে পাঁচ ছ সের করে মাংস কেটে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। তাদের মুখে আজ আনন্দ ধরে না; আজ তাদের মহাভোজ। গরীবেরা সকলেই যে যা পার্‌লে নিয়ে গেল তবুও মাছের গায়ে যথেষ্ট মাংস বাকি রইল। এখন সেই গ্রামে এক কুমোর বাস কর্‌ত—কুঁড়ের সর্দ্দার—কোথাও সে নড়্‌তে চড়্‌তে চাইত না। কুমোর-পত্নী গ্রামের লোকেদের মুখে মাছের কথা শুনে স্বামীকে কিছু কেটে নিয়ে আস্‌তে বল্‌লে। প্রথমে ত সে নড়্‌তেই চায় না, শেষে স্ত্রীর কাছ হ'তে তু' এক ধমক খেয়ে কুড়ুল আর চুপ্‌ড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়্‌ল।

তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। নদীর ধারে আর কেউ নেই, কেবল মাছটা পড়ে রয়েছে। যেমন গিয়ে সে এক ঘা কুড়ুল বসিয়েছে অম্‌নি এক অলৌকিক ব্যাপার দেখে সে চম্‌কে উঠে থম্‌কে দাঁড়াল। কে যেন চেঁচাচ্ছে, "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও।" ব্যাপার দেখে কুমোরের ত চক্ষুস্থির! মাছের পেটে নিশ্চয়ই ভূত আছে—এই ভেবে সে সেখানে কুড়ুল ও চুপ্‌ড়ি ফেলে সটান্ বাড়ীর পানে ছুট্ দিল। স্ত্রীর কাছে সকল কথা বল্‌তেই স্ত্রী তার মাথা খারাপ হয়েছে ভেবে স্বামীকে বল্‌লে, "চল, দেখিগে কেমন ভূত।"

যাই হোক্, স্ত্রীকে সঙ্গে করে নিয়ে কুমোর সেই মাছের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। মাছের ভিতর হ'তে তখনো সমান ভাবে শব্দ আস্‌ছিল, "আমাকে বাঁচাও।"

কুমোর বল্লে, "ঐ শোন।"

স্ত্রী সেই অলৌকিক শব্দ শুনে প্রথমে একটু ঘাব্‌ড়ে গেলেও মনের জোরে সাহস করে মাছটার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ কান পেতে রইল; তারপর স্বামীকে বল্লে, "আচ্ছা, কুড়ুলটা নিয়ে তুমি মাছের পেট্‌টা কেটে ফেল; দেখি কি রকম ভূত বেরোয়!"

স্ত্রীর কথামত সে ধীরে ধীরে কুড়ুল চালিয়ে মাছের পেট্‌টা কেটে ফেল্‌তেই তারা দেখ্‌তে পেল যে মাছের ভিতর একটা লোক শুয়ে রয়েছে। অনেক কষ্টে টানাটানি করে তারা লোকটাকে মাছের পেট থেকে বার কর্‌লে। লোকটা তখন অর্দ্ধমৃতপ্রায়। তু'জনে ধরাধরি করে তাকে বাড়ীতে এনে গরম তুধ খাইয়ে অনেকটা চাঙ্গা করে তুল্‌লে। তাকে পুনরায় বেঁচে উঠ্‌তে দেখে তাদের স্ত্রী-পুরুষের তু'জনের কি আনন্দ! কিন্তু লোকটি যে কে তার সঠিক খবর তারা পেল না, রাজাও তাঁর আত্মপরিচয় গোপন করে গিয়ে তাদের সঙ্গে সামান্য লোকের মত বাস কর্‌তে লাগ্‌লেন ও হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো, গেলাস, সরা, খুরি তৈরী কর্‌তে শিখে কুমোরকে সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লেন।

এদিকে সেই দেশের রাজা তখন মারা গেছেন। রাজসিংহাসন শূন্য; কারণ সেই দেশের নিয়ম এই ছিল যে এক রাজা মারা গেলে মৃত রাজার হাতী যাকে বেছে এনে সিংহাসনে বসাবে তাকেই সকলে রাজা বলে মেনে নেবে। রাজহস্তী অনেক দেশে ঘুরে এসে শেষে সেই কুমোরের বাড়ীর দরজার গোড়া থেকে বিদেশী লোকটিকে মাথায় করে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সকল লোক নূতন রাজাকে পেয়ে আনন্দে চীৎকার করে তাঁকে অভিনন্দন কর্‌তে লাগ্‌ল।

নূতন রাজার অনেক গুণ; তাঁর গুণে সকলেই মুগ্ধ। প্রথমেই তিনি সেই কুমোরকে একটা ভালো বাড়ী ও অনেক টাকা দিয়ে তাদের ভালো করে সুখে থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিলেন। তার পর অন্যান্য প্রজাদের সম্বন্ধেও তিনি অনেক সুব্যবস্থা করে দিলেন।

এই রকমে কয়েক বৎসর রাজত্ব কর্‌বার পর রাজার শরীর একেবারে ভেঙে পড়্‌ল। অসুখ এমন বিশেষ কিছু নয় কিন্তু শরীর ভালো নয়, খাদ্যে অরুচি, মাথা ঘোরা, গা ঝিম্‌ঝিম্ করা, কখনো উত্তেজনা, কখনো অবসাদ—অর্থাৎ কোন্‌টা যে আসল অসুখ, আর কোন্‌টা যে নয়, তা রাজাও বুঝ্‌তে পার্‌তেন না, আর রাজার কবিরাজও বুঝ্‌তে পার্‌তেন না। কবিরাজ ওষুধ দেবেন কি, রাজার রোগই ধর্‌তে পারেন না। কত ওষুধ, বড়ি, পাঁচন, রসায়ণ, সালসা, মোদক রাজা খেলেন—সে সবের কত রকমেরই না অনুপান, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। শেষে কবিরাজ ব্যবস্থা কর্‌লেন মৃগয়া।

সেই হতে রাজা বনে জঙ্গলে মৃগয়া করতে যান, কখনো বা নদীতে মাছ ধরতে যান। সঙ্গে সর্ব্বদাই ছুটি তরুণ বয়স্ক ছেলে থাকে। এরা দুজনে মাছ ধরতে যেমন ওস্তাদ, জীবজন্তু শীকার করতেও তেমনি পটু। কি জানি কেন, এই ছুটি ছেলেকে রাজার বড় ভালো লাগত; তাই তারা সব সময়ে—কি মৃগয়ার সময়ে, কি মাছ-ধরার সময়ে, কি রাজকার্য্যের সময়ে—রাজার সঙ্গে সঙ্গেই থাকত।

এখন সেই বণিক্, যে রাণী মুক্তাবলীকে কিনেছিল, সেই রাজ্যে এল ব্যবসার জন্য। বণিকের সঙ্গে নানা প্রকার বহু মূল্য মণি ও পাথর—হীরা, চুণী, পান্না, মরকত, প্রবাল, বৈদূর্য্য, নীলকান্ত, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি মণিমাণিক্য। প্রথমেই বণিক্ কতকগুলি মূল্যবান্ পাথর বেছে রাজার কাছে উপঢৌকন পাঠালো। রাজা তা পেয়ে খুব খুসী হলেন ও বণিক্‌কে তাঁর রাজ্যে ব্যবসা করবার হুকুম দিলেন ও বাস করবার জন্য একখানি বাড়ী দিলেন। শুধু তাই নয়; বণিকের সঙ্গে যত বহুমূল্য প্রস্তরাদি—সে সব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি সেই তরুণবয়স্ক ছেলে ছুটিকেও বাড়ী পাহারা দেবার জন্য নিযুক্ত করলেন।

একদিন রাত্রে ছেলে ছুটি বাড়ী পাহারা দিচ্ছে। গভীর রাত্রি, সকলেই নিদ্রামগ্ন, কোথাও কোন সাড়াশব্দ নাই। ছোট ভাই তখন দাদাকে একটি গল্প বলবার জন্য অনুরোধ করল। ছোট ভাইএর কথায় বড় ভাই গল্প বলতে আরম্ভ করল—তাদের নিজেদের জীবনের গল্প—কেমন করে তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তারা তাদের বাপ মাকে হারিয়েছে। তোমরা বুঝতেই পারছ. ছোট ভাই সে সব অনেক দিনের পূর্ব্বেকার ঘটনা সব ভুলে গেছে।

যাই হোক্, বড় ভাই গল্প বলছে আর ছোট ভাই তা শুনছে। তাদের অলক্ষ্যে বসে যে আর একজন তাদের গল্প শুনছে তা তারা জানতে পারল না। রাণী মুক্তাবলী উপরের বারাণ্ডায় শুয়ে তাদের গল্প শুনে চমকে উঠলেন। তাঁর বুঝতে আর দেরী হল না যে ছেলে ছুটি তাঁরই নিজের সন্তান। তবুও সন্দেহ দূর করবার জন্য তিনি ছেলে ছুটিকে ডেকে কতকগুলি প্রশ্ন করলেন। তাদের যথাযথ উত্তর শুনে তাঁর মনে আর কোন সন্দেহই রইল না। তখন তিনিও ছেলে ছুটির কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। সেই নিদ্রাহীন রজনীর অন্ধকারে বসে এই তিনটী প্রাণীর মধ্যে মিলনের যে কত আনন্দাশ্রু বয়ে গেল তার সংবাদ শুধু নক্ষত্রখচিত নীলাকাশই জানে।

যাক্, কিন্তু কেমন করে সেই বণিকের হাত হতে তিনি মুক্তি পান, এই হল এখন তাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। শেষে অনেক মতলব করে তারা এই স্থির করল যে রাণী মুক্তাবলী বণিকের কাছে এই বলে নালিশ করবেন যে এই ছেলে ছুটি তাঁকে অযথা অপমান করেছে। বণিক্ সেই কথা শুনে নিশ্চয়ই রাজার কাছে নালিশ করতে যাবে।

তখন তারা বলবে যে বণিকের কথা একান্ত মিথ্যা; যাঁকে তারা মার মত ভক্তি করে কেমন করে তাঁকে তারা অপমান করতে পারে?

তাদের পরামর্শ মত রাণী গিয়ে বণিকের কাছে নালিশ করল; বণিক্‌ও ছুটল রাজার কাছে সেই কথা নিয়ে নালিশ করতে। রাজা তখন ছেলে ছুটিকে ডেকে পাঠালেন। তারা এসে বলল— "মহারাজ, বণিকের কথা একেবারে মিথ্যা; যাঁকে আমরা মা বলে ডাকি, মার মত ভক্তি করি কেমন করে আমরা তাঁকে অপমান করতে পারি!"

তখন বণিক্ বললে—"মহারাজ, আমার স্ত্রীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, এ অভিযোগ সত্যি কিনা?"

তখন রাণী মুক্তাবলী রাজ-সভায় এসে উপস্থিত হলেন, রাজাকে দেখেই তিনি চমকে উঠলেন। রাজাও চমকালেন। মুক্তাবলী তখন জাহাজে ওঠার পর যা যা ঘটেছিল সমস্ত কথা খুলে বলে শেষে বল্লেন, "মহারাজ, এরাই আমাদের সেই হারানো সন্তান, বিধি কৃপায় আবার তাদের ফিরে পেয়েছি।"

এতদিন পরে বহু দিনের হারানো স্ত্রী ও ছেলে ছুটীকে পেয়ে রাজার যে কতদূর আনন্দ হ'ল তা তোমরা বুঝতেই পারছ। বণিক্‌কে দেশ হতে বিদায় করে, বড় ছেলে নিখিলরঞ্জনের উপর রাজকার্য্যের ভার দিয়ে রাজা জীবনের শেষ কটা দিন খুব সুখেই কাটালেন।

মা

(কাদের নওয়াজ, বি-এ)

উপ্‌চে পড়ে চাঁদের আলো মোর বিছানার' পরে,
আজ রাতে মা! তোমার লাগি মন যে কেমন করে!
এই বিদেশে কতই স্মৃতি জাগ্‌ছে হৃদি-মাঝে
প'ড়্‌ছে মনে, মা যে আমার গান গাহিত সাঁঝে!
সেই 'কেয়া'বন, সেই যে বাগান, মোদের বাড়ীর পাশে,
সেথায় কি মা 'পের্‌জাপতি' 'ভোম্‌রা' আজো আসে?
বন-করবীর গাছটীতে কি ফুল এখনও ফোটে?
আর কি তেমন হরেক রঙের ফড়িং আসি জোটে?
দুষ্টু "মাবু" আর কি কভু দুষ্টামি সে করে,
গুরুমশায় উমেশ বাবুর কাছেই কি সে পড়ে?
নিশীথে মোর এম্‌নি কতই প্রশ্ন জাগে প্রাণে,
সব ভুলি মা প্রণাম পাঠাই আজ তব সন্ধানে।

কোল্ জাতির কথা

(শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার, বি-এল্)

বাঙ্গলার মানচিত্রে দেশের পশ্চিম সীমাটি দেখিয়া ল'ও। দেখিতে পাইবে ঐ সীমার রেখাটি গিয়াছে উত্তর হইতে দক্ষিণে, বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাগুলির পশ্চিম দিক্ ধরিয়া। বাঙ্গলা দেশের ঐ সীমার পশ্চিম পারের দেশের সেকালের নাম ছিল ঝাড়খণ্ড। এই ঝাড়খণ্ডে সেকালে যাহারা বাস করিত, তাহারা অনেকে এখনও সেখানে বাস করে; তবে আমাদের আর্য্য বংশের অনেক লোকে এখন সেখানে বসবাস করিতেছেন। রাজমহল, বৈদ্যনাথ, মধুপুর, রাঁচী, সিংভূম প্রভৃতি ঐ ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি স্থান। এই ঝাড়খণ্ডের আদিম অধিবাসীদের নানা দলের নানা নাম আছে, যথা—সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, জুআঙ্গ, ভয়াঁ, প্রভৃতি। আমরা ভয়াঁদিগকে এই ভাবিয়া ভূঁইআ নাম দিয়াছি যে তাহারা ভূঁই চাষ করিয়া খায় বলিয়া বুঝি তাহাদের নাম হইয়াছিল ঐরূপ; কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। উহাদের নামের মানে উহাদেরই ভাষায় পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার—সঙ্গে নাতি ও নাতিনী।

এই সকল জাতির নাম আলাদা আলাদা হইলেও উহারা গোড়ায় ছিল এক বংশেরই লোক; তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় উহাদের শরীরের এক রকম চেহারায়,

এক রকমের ভাষায় ও প্রায় এক রকমের সামাজিক রীতিতে। আমার কাছে এখন উহাদের সকলের ছবি নাই; থাকিলে খানকতক ছাপাইয়া দিতাম। উহাদের ভাষা আমাদের ভাষার সঙ্গে মেলে না। এই দেখ, আমরা যেখানে বলি 'মাথা, কান, চোখ, নাক, হাত,' উহারা সেখানে পরে পরে বলে 'বো, লুতুর, মেদ্, মোচা, তিঃই।' উহাদের সমাজের সকল রীতির কথা এক প্রবন্ধে বলা চলে না, তবে গোটাকতক দৃষ্টান্ত দিব।

উহাদের মধ্যে যে জুআঙ্গ্ জাতি আছে তাহাদের একটা রীতির কথা বলিতেছি। আমি যখন ৪৫ বছর আগে ইহাদের কথা নিজে জানিতে পাই, তখন যে জুআঙ্গেরা বনে-পাহাড়ে থাকিত তাহারা কাপড় পরিত না; গাছের পাতা জুড়িয়া কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া রাখিত। 'কাপড় পর না কেন?' জিজ্ঞাসা করিলে হাসিয়া উত্তর দিত যে কাপড় বড় নোংরা,—উহাতে ধূলা-ময়লা লাগে; আর পাতা খুব পরিষ্কার, উহা একটু শুকাইয়া গেলেই ফেলিয়া দিয়া নূতন পাতা পরা চলে। ইহারা মনে করিত, ও করে, ইহাদের সকল রীতিই হিন্দুদের রীতিগুলির চেয়ে ভাল। কোন জুআঙ্গ, এরেঙ্গা, বা মুণ্ডা কিছুতেই অন্য জাতির ছোঁয়া জলটুকুও খায় না; হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণের যত গৌরবই থাকুক, কোন ব্রাহ্মণের ছোঁওয়া জল বা রাঁধা খাদ্য ইহারা অপবিত্র মনে করে।

ইহাদের নিজেদের আত্মগৌরব-বোধের আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বুনা জাতিদের নাম করিয়াছি, তাহারা গোড়ায় ছিল সকলে এক বংশেরই লোক, আর সেই এক বংশের নামের হিসাবে ইহাদের নাম কোল্। এই কোল্ বা কোর শব্দের মানে হইল 'মানুষ'; ইহাদের বিবেচনায় উহারা শ্রেষ্ঠ মানুষ বা কোর্, আর বাদবাকি মানুষেরা হীন জাতির লোক।

ইহারা হিন্দুদের ঠাকুর-দেবতা মানে না, তবে বাঙ্গলা দেশের কাছে যে সাঁওতালেরা বাস করে তাহারা এখন হিন্দুদের ঠাকুর-পূজা কিছু কিছু নিয়াছে। খাঁটি কোল্ জাতির লোকেরা এক পরমেশ্বর মানে ও সেই পরমেশ্বরের নাম তাহাদের ভাষায় মারাঙ্গ্ বোঙ্গা। উহারা অশরীরী অনেক ভূত মানে, আর সেই ভূতেরা যাহাতে উৎপাত না করে তাহার জন্য তাহাদের নামে পাঁঠা, কুঁকড়া প্রভৃতি বলি দেয়। উহাদের

মধ্যে ভূতের ওঝা আছে, তবে পূজা করিবার জন্য বা বিবাহাদি দেওয়াইবার জন্য পুরোহিত বলিয়া কেহ নাই।

ইহাদের বিবাহ হয় মেয়েরা যুবতী হইলে তাহাদের নিজের ইচ্ছায়। বিবাহের সময়ে জাতির লোকেরা মিলিয়া ভোজ খায় ও মেয়ে পুরুষে এক সঙ্গে গান গাইয়া নাচে। এই অনুষ্ঠানেই বিবাহ শেষ হয়। ইহাদের বিবাহের সময়কার একটা গানের প্রথম অংশটুকু লিখিতেছি। গানটি এই—বুরুবির হনরতে নেল্‌কতানা কাঁই; ডুমারিকি বাঃ; হিসি কোশে গামা হো, মোটা হিসি গামা। এই গানটির মধ্যে আমাদের ভাষার 'ডুমুর' শব্দটি আছে, আর 'কোশ' বা ক্রোশ শব্দটি আছে; বাদ বাকি কোল্ ভাষা। মানে হইল এই—পাহাড় ও বন বেড়াইবার সময়ে চোখে দেখা গেল না সেই ডুমুরের ফুল; কিন্তু তাহার গন্ধ কুড়ি ক্রোশ ধরিয়া, একশ' ক্রোশ ধরিয়া পাওয়া গেল।

একদল কোলের ছবি।

আমি উহাদের পরিচয় পাইয়া ভাষা শিখিয়াছিলাম ৪৫ বছর আগে, আর ৫৫ বছর আগে বঙ্গ-দর্শন পত্রে ঐ জাতির পালামৌ দেশের কথায় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উহাদের নাচের বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমরা অনেকে উহাদিগকে বুনা জাতি বলিয়া তুচ্ছ করি ও ঘৃণা করি, কিন্তু আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে উহারা খুব ভাল জাতি। ইংরেজ পণ্ডিত হণ্টর্ সাহেবের বিবরণে আছে যে এই জাতির লোকেদের মধ্যে যাহারা খৃষ্টান হয় নাই তাহারা সকলেই খুব সত্যবাদী ও সচ্চরিত্র।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

এবার কন্‌স্ট্যান্স্ একটু অনুযোগ না দিয়া থাকিতে পারিল না, কহিল, "এ সময়ে কোন্ প্রাণে যে তুমি এত রঙ্গ-রসিকতা আর ফূর্ত্তি কর, হামিশ, আমি তো তা বুঝেই উঠ্‌তে পারি না।"

হামিশ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, তারপর একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "বুঝেছি, চার্লির কথা আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছ। কিন্তু কন্‌স্ট্যান্স্, চার্লি যে বেঁচে নেই এ কথায় আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না—কে যেন ক্রমাগতই আমার ভেতর থেকে বল্‌ছে সে বেঁচে আছে, শীগ্‌গিরই আমাদের কাছে ফিরে আস্‌বে।"

কন্‌স্ট্যান্স্ গলার স্বর নীচু করিয়া বলিল, "ঠিক এই মুহূর্ত্তে কিন্তু আমি চার্লির কথার উল্লেখ কর্‌ছিলাম না—আমি বল্‌ছিলাম আর্থার বেচারার কাঁধে একটা মিথ্যা দুর্নামের বোঝা চেপে আছে, এটা কি আমাদের আমোদ-আহ্লাদের সময়?"

"কেন যে নয়, সেটাও কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, কন্‌স্ট্যান্স্! আসল চোর গ্যাল্‌ওয়েকে তার চোরাই টাকা ফিরে পাঠিয়েছে—এতে যে আর্থারের ঘাড় থেকে সমস্ত মিথ্যে বদ্‌নামই ধুয়ে মুছে গেল! আনন্দ কর্‌বার সময়ই তো এই। কিন্তু আনন্দের আরও একটী বড় কারণ যা আছে তাতো এখনো তোমাদের কাছে বলাই হয় নি। আজ বাবার চিঠি পাওয়া গেছে—অসুখ বলে কোন জিনিষই আর তাঁর নেই। যে মানুষ চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌তে পার্‌তেন না, সেই মানুষই নাকি আজ কাল রোজ রাস্তা দিয়ে দু'বেলা বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। চিঠিতে লিখেছেন তিনি দেশে এসে পৌঁছোলেন বলে! আর এসেই তাঁর চাক্‌রীতে যোগ দেবেন।"

খবরটা এমনই আনন্দের যে শুনিবামাত্র কন্‌স্ট্যান্সের মনের সমস্ত ভাবনা-চিন্তা, তাদের হাজারো দুঃখ-কষ্টের কথা এক নিমেষে যেন কোথায় উড়িয়া গেল, হঠাৎ-খুসী-হওয়া ছোট্ট বালিকাটীর মত তার মুখে-চোখে হাসি উপ্‌চাইয়া উঠিল। চা খাইতে খাইতে আর কোনই অপ্রিয় প্রসঙ্গের আলোচনা হইল না।

খাওয়ার ঘর হইতে বাহির হইয়াই হামিশ টুপি মাথায় একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল—একটু কারণ ছিল। আজ যে চিঠিখানা তার বাবার নিকট হইতে আসিয়াছে তাহাতে একটা 'পুনশ্চ' দিয়া লেখা ছিল, চিঠি পাওয়ার পর হামিশ যেন একবার মিষ্টার হাণ্ট্‌লির সঙ্গে দেখা করে, কেননা জার্ম্মেনীতে থাকিবার সময় তিনি মিঃ চ্যানিংকে একটু আভাস দিয়াছিলেন যে হামিশের জন্য তাঁকে কোন ভাবনা পোহাইতে হইবে না, তার কাজ-কর্ম্মের সুবিধা তিনিই করিয়া দিবেন। মিষ্টার চ্যানিং রোগে ভুগিতেছিলেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে এত দিন হামিশ তাঁরই জায়গায় কাজ

করিয়া আসিতেছিল ; কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই তো তিনি আসিয়া নিজের কাজে যোগ দিবেন, কাজেই হামিশেরও সেখানে ছুটী হইয়া যাইবে। তখন বেকার অবস্থায় বাড়ীতে বসিয়া থাকা তো কোন কাজের কথা নয় ! মিষ্টার হাণ্টলি প্রচুর ধনবান্, সহরে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তিরও অভাব নাই ; তিনি ইচ্ছা করিলে হামিশের মত অমন অনেকেরই চাকুরী-বাকুরীর সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। তাই হামিশ তাঁরই বাড়ীর দিকে রওনা হইল। শুধু চাকুরীর সুবিধা ভিন্ন আরও একটু কারণ ছিল। হামিশ টের পাইয়াছিল ইদানীং কোন কারণে মিষ্টার হাণ্ট্লি যেন তার উপর একটু বিরক্ত, কিন্তু কি যে সে কারণটা সে সম্বন্ধে তার কোনই ধারণা ছিল না। তাই আগের মত ঘন ঘন সে আর তাঁর বাড়ীতে যায় না। অনেক দিন হেলেনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই, আজ হয় তো হইবে—এটাও একটা কারণ।

হামিশকে দেখিয়া মিষ্টার হাণ্ট্লি কিন্তু মোটেই কলরব করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, বরং একটু কাঠখোট্টা ভাবেই বলিলেন, "হামিশ যে ! কি দরকার ?"

অভ্যর্থনার এই নমুনায় পলকের জন্য হামিশের চোখ-মুখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে সে ভাব সাম্লাইয়া নিল, বলিল, "বাবা ওঁরা শীগ্গিরই আস্ছেন, তিনি লিখেছেন, জার্ম্মেনীতে থাকৃতে আপনি নাকি তাঁকে বলেছিলেন আমার একটা কাজ-কর্ম্মের সুবিধা......"

"হ্যাঁ, বলেছিলাম, মনে আছে। হেল্‌ষ্টনলি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের বয়স হয়েছে, তিনি এখন চাক্‌রী থেকে অবসর নিতে চাচ্ছেন। তাঁরই জায়গায় একজন নতুন ম্যানেজার নিতে হবে।"

হামিশের বুক দুরু দুরু করিয়া উঠিল। এত বড় একটা চাক্‌রীর কথ সেতো স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সহরের মধ্যে একজন বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি, খুব মোটা মাহিনা তাঁর—মিষ্টার চ্যানিংয়ের মাহিনার চাইতে অনেক বেশী। আর তা ছাড়া থাকিবার জন্য একটা চমৎকার বাড়ীও ব্যাঙ্ক হইতে তাঁকে অম্‌নি দেওয়া হয়। হামিশের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মিষ্টার হাণ্ট্লি আবার বলিলেন, "ব্যাঙ্কের সব চাইতে বড় অংশীদার আমি, কাজেই আমি যাকে মনোনীত কর্‌ব, এ চাক্‌রী সে-ই পাবে। তোমায় বল্‌তে বাধা নেই হামিশ, এ পদের জন্য তোমাকেই আমি ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর আমি এ চাক্‌রী তোমায় দিতে পার্‌ব না !"

"কেন, মিষ্টার হাণ্ট্লি ?"

"কেন ? তোমার সম্বন্ধে এক সময় আমার খুবই উঁচু ধারণা ছিল, কিন্তু সে ধারণা এখন বড়ই ছোট হয়ে গেছে !"

হামিশের সমস্ত শরীরের রক্ত যেন মুখে আসিয়া জমা হইল, সে কহিল, "কেন, কি করেছি আমি ?"

"কি করেছ আমায় জিজ্ঞাসা কর'না, জিজ্ঞাসা কর তোমার নিজের বিবেককে।"

"কিন্তু আমার বিবেক তো এমন কোন ছোট কাজের কথাই আমায় মনে করিয়ে দিচ্ছে না, মিষ্টার হাণ্টলি !"

"তা না দিলে আমিও তা স্মরণ করিয়ে দেব না। যাক্ ! এ সম্বন্ধে আর কোন আলোচনাই আমি কর্‌তে চাই না ; অন্য কথা বল। চার্লির খবর কি ?"

গম্ভীর মুখে হামিশ পকেট হইতে তার বাবার চিঠি খানা বাহির করিয়া বলিল, "এর ভেতর মাও দুই ছত্তর লিখে দিয়েছেন, দেখুন ; সবাই উতলা হয়ে পড়্‌বে বলে বাড়ীতে এ খবর দিইনি।"

মিষ্টার হাণ্ট্লি চিঠিখানা হাতে নিয়া দেখিলেন, সেই চিঠির উপরেই খুব তাড়াতাড়ি মিসেস্ চ্যানিং চার্লির উদ্দেশে দুই ছত্র লিখিয়া দিয়াছেন, "চার্লি, সোণার চাঁদ আমার, মাকে কি একেবারেই ভুলে গেলে ? কই, তোমার চিঠি তো আর আসে না !" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মিষ্টার হাণ্ট্লি বলিলেন, "বেচারারা এত আনন্দ করে বাড়ী ফির্‌ছেন, আর এসে কি খবরই না শুন্‌বেন !"

হামিশ আগের মতই গম্ভীর ভাবে বলিল, "হুঁ। ভাল কথা, গ্যাল্‌ওয়ের নোট্ যে সরিয়েছিল, চিঠির ভেতর পূরে গ্যাল্‌ওয়েকেই সে আবার তা ফিরে পাঠিয়েছে।"

মিষ্টার হাণ্টলি এবার চরম বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "পাঠিয়েছে নাকি ? চোরের তবে ধর্ম্মজ্ঞান হয়েছে ! আর্থারের যে অনিষ্ট সে করেছে এই ভাবে বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে চায় ?"

হামিশ বিদায় নিয়া উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া নামিতেই সে দেখে এলেন উঠিতেছে, জিজ্ঞাসা করিল, "এলেন, তোমার বাবা হঠাৎ আমার ওপর এমন বিরূপ হয়ে উঠ্‌লেন কেন বল্‌তে পার ?"

এ কথার জবাব এলেন কি দিবে ? কি করিয়া সে জানাইবে তার নিজের চোখে যে দেবতার মত। তাকেই তার বাবা 'চোর' বলিয়া বিশ্বাস করেন ? তার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, কিছুতেই সে তা ঠেকাইয়া রাখিতে পারিল না।

রোল্যাণ্ড্ নেটাল যাইবে।

এদিকে আমাদের রোল্যাণ্ড্ ভায়া বার দুত্তিন জেঙ্কিন্সের বাড়ী গিয়া খবর নিয়া আসিয়াছে, সে কেমন আছে ; সবটাই যে জেঙ্কিন্সের উপর অফুরন্ত ভালবাসা হঠাৎ উথ্‌লাইয়া ওঠার ফলে, তা কিন্তু নয়, অনেকখানি নিজের উপর অগাধ ভালবাসার ফলেই। জেঙ্কিন্স অফিসে থাকিলে সে তার নিজের কাজও করিত, রোল্যাণ্ডের কাজও বার আনা করিয়া দিত। কাজেই এ হেন হিতকারী বন্ধুর বিরহ কি সহ্য করা যায় ! জেঙ্কিন্সের স্ত্রী রোল্যাণ্ড্‌কে চা-কেক্ খাওয়াইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝাইয়া দিল যে সে এবং তার মনিব গ্যাল্‌ওয়ে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে—মাস কয়েকের মধ্যে

জেঙ্কিন্স্‌কে সে আফিসের ত্রিসীমানাও মাড়াইতে দিবে না। ব্যাপার দেখিয়া রোল্যাণ্ডের পোর্ট-নেটাল যাইবার ইচ্ছা ধাঁ করিয়া দশগুণ বাড়িয়া গেল।

রোল্যাণ্ডের আরও কতগুলি অভিযোগ ছিল। এ পৃথিবীটা এমনই বদ্‌খৎ জায়গা যে যদি এখানে একটু আয়েস করিয়া থাকিতে গেলে, তো অম্‌নি টাকা খরচ হইয়া যাইবে। টাকা গুলারও আবার এমনই জঘন্য স্বভাব, যে খরচ করিলেই তারা ফুরাইয়া যায়। নিজের টাকা ফুরাইয়া গেলে পরের কাছ হইতে টাকা কর্জ্জ করা ছাড়া আর উপায় কি বল! কিন্তু এখানেও আবার মুস্কিল, এমনই স্বার্থপর এই দুনিয়ার লোকগুলা যে টাকা ধার করিলেই সে টাকা তারা ফেরৎ চাহিয়া বসিবে! এত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়া লোকে কখনো বাস করিতে পারে? হামিশ যে কি

কথাটা পাড়িয়া ফেলিল।

মন্ত্রে তার দেনা শোধ করিল তা রোল্যাণ্ডের অজ্ঞাত, কিন্তু তার নিজের দেনা যে সুদে-আসলে রোজ বাড়িয়াই চলিয়াছে তাতে আর সন্দেহ নাই। আজকাল তো পাওনাদারের তাগিদ আর শাসানি লাগিয়াই আছে!

সেদিন বাজারের কাছ দিয়া সন্ধ্যার পর সে ফিরিতেছিল, কে যেন হঠাৎ পেছন হইতে তার কাঁধে হাত দিল। ফিরিয়াই রোল্যাণ্ড যা দেখিল তাতে সে যে লোকটার নাকে-মুখে তখনই কয়েক ডজন ঘুসি মারিল না, এই আশ্চর্য্য - আদালতের পেয়াদা তার উপর সমন জারি করিতে আসিয়াছে, পাওনাদারেরা নালিশ করিয়াছে তাই। ঘুসি মারিল না বটে, কিন্তু গালাগালি রোল্যাণ্ড যা তাকে দিল তা ঘুসিরও বাড়া! পেয়াদা লোকটা ভালমানুষ, কহিল, "আমার দোষ কি মিষ্টার

রোল্যাণ্ড, যত দিন সমন জারি না করে পেরেছি, করেছি; আর না করে থাকা সম্ভব নয়—এই রইল।" বলিয়া সমনের কাগজখানা সে রোল্যাণ্ডের পকেটে গুঁজিয়া দিতে গেল। রোল্যাণ্ড সেখানাকে কুঁচি কুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া পেয়াদার মুখের উপরই ছড়াইয়া ফেলিল।

সেই মুহূর্ত্তেই রোল্যাণ্ড তার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল, নাঃ, পোর্ট নেটাল সে যাইবেই। কার কাছে সে শুনিয়াছিল পোর্ট নেটাল একেবারে 'স্বপ্ন দিয়া তৈরী, স্মৃতি দিয়া ঘেরা'—রাস্তায় রাস্তায় তার কয়েক ইঞ্চি পুরু সোণা জমাট্‌ বাঁধিয়া আছে, শুধু গিয়া একবার কুড়াইয়া আনিতে পারিলেই হইল।

রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর রোল্যাণ্ড লেডি আগাষ্টাকে পাকড়াও করিল, একখানা চেয়ারের উপর তাঁকে বসাইয়া এবং নিজেও তাঁরই সাম্‌নে বসিয়া ধীরে ধীরে একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িয়া ফেলিল। শুনিয়া লেডি আগাষ্টা যে ভাবে তার দিকে তাকাইলেন তাতে মনে হইল তাঁর বুঝি ধারণা জন্মাইয়াছে যে রোল্যাণ্ড পাগল হইয়া গেছে। (ক্রমশঃ)

সন্দেশ

"কবি-সার্ব্বভৌম" রবীন্দ্রনাথ

সেদিন কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সভা করিয়া মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে 'কবি-সার্ব্বভৌম' উপাধি দিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

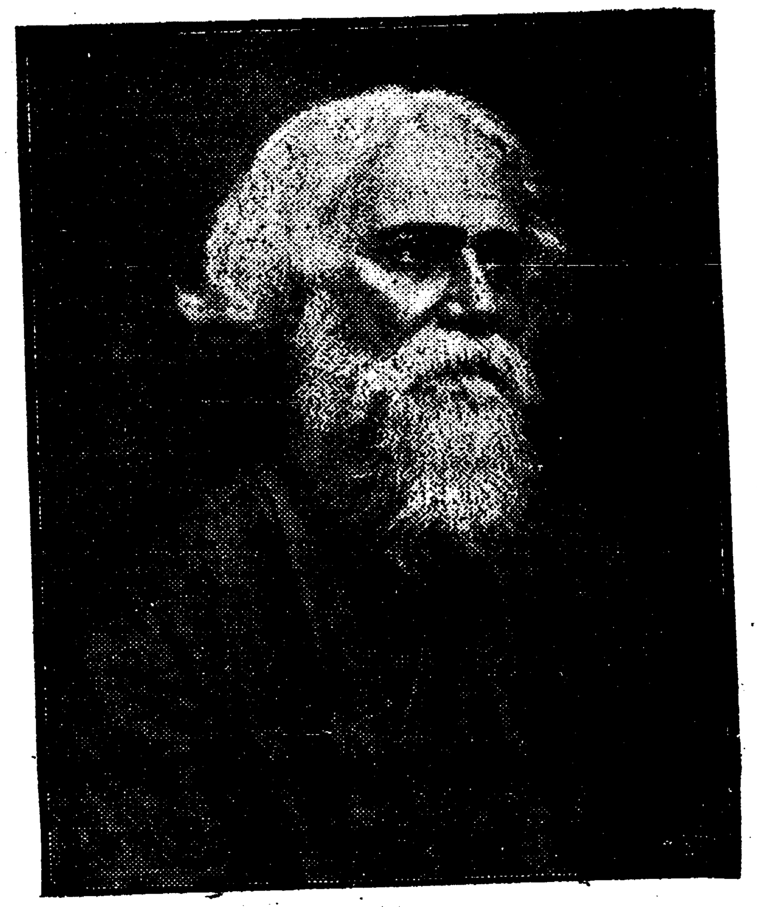

রবীন্দ্রনাথ।

অনেকের বোধ হয় ধারণা ছিল, এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিতে যাঁদের বুঝায় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখার ঠিক উপযুক্ত সমাদর করেন না। 'রবীন্দ্র-জয়ন্তী'র ঠিক আগে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত-মণ্ডলী কবিকে এই ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লোকের সে ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন।

জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি আমাদেরি বাংলার লোক, এ কথা ভাবিতে আমাদের বুক গর্ব্বে ফুলিয়া উঠে—তাঁর যে কোন সম্মানেই আমরা আনন্দ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারি না।

"গান্ধী-জয়ন্তী"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

গত ২রা অক্টোবর শুক্রবার ভারতের সমস্ত জায়গায়, এবং বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব হইয়া গেছে। মহাত্মাজী তেষট্টি বছরে পড়িলেন—সমস্ত জাতি একত্রে ভগবানের কাছে এই মহাপুরুষের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়াছে।

গান্ধীজী এখন লণ্ডনে আছেন তা তোমরা সবাই জান। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে আছেন ভারত-বর্ষের আরও দুই জন অতি-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

নূতন ধাঁধা

(১) কোন্ ঠাঁই লুচি নাই ; তাহা সত্ত্বেও
যত চাও লুচি খাও, নাহি বাদ্ দেও ?

(২) টম্ লণ্ডনের ইস্কুলে পড়ে ; তার বাবা তাকে দশটী পেন্সিল দিয়া বলিলেন, "কটা পেন্সিল হল টম্ ?" টম্ উত্তর দিল, "আজ্ঞে পাঁচ।" বাবা বলিলেন, "সেকি, আমি যে দশটী দিলাম।"

টম্ ও তার বাবা দুজনাই কিন্তু ঠিক কথা বলিয়াছে ? কিভাবে তাহা সম্ভব হইল বলতো ?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মেঘ। ——উত্তরদাতাদের নাম

তাপস কুমার ভৌমিক (রঙ্গপুর), বিবেকানন্দ শিশুপাঠ্য লাইব্রেরীর সভ্যগণ (বরাহনগর), প্রেমানন্দ, শিবু, শান্তি (রাঁচি), দীনু, পশুপতি, হাবলি, দুর্গা, লতি, জগু, বুলু, গুগু (পাটনা), এস্, পি, সোম চৌধুরী (খুলনা), কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের কেল্লা), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), কুম্‌কুম্ লাল ঘোষ (জামসেদ্‌পুর), সাদত্ হোসেন (ঝালকাটী), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), আশীষকুমার সরকার (এলাহাবাদ), কালিদাসী, স্নেহলতা (বাটিকামারী) প্রীতি সেন (চাইবাসা), মীরা, পূর্ণিমা, রমা ও প্রতিমা সেন (হাজারিবাগ), ভবেশ, অজিত, মহম্মদ ছিদ্দিক, বাহার-উদ্দিন (তাহিরপুর), উমা, তোতা ও গোরা বিশ্বাস (কাটিহার), নিখিল নাথ চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর), যশোমাধব সাহিত্যসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সূর্য্যকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও বরেন্দ্র গাইন, নিরুপমা, কনকলতা, টঙ্গ, শান্তো ও খোসাল (দেওডাঙ্গা, খুলনা), ঊষাময়ী, নিশাময়ী, সন্ধ্যাময়ী, সন্তু ও খোকন ঘোষাল (গাজিপুর), গজেন্দ্র, শচীন্দ্র, রমেশ, যোগেশ, শান্তি ও পুষ্প (মিরাপুর, ময়মনসিংহ), শম্ভুনাথ ঘোষ (ভবানীপুর), সুনীলকুমার গোস্বামী (পাট্‌না), শ্রীমতী লতিকা ব্যানার্জ্জি (রাজসাহী), নবাবগঞ্জ ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দ। রাধিকা, সরোজ, হিমেন্দু, সুধাংশু, নারায়ণ ও সত্যাংশু (মালিয়াড়া হাই স্কুল), রণেন্দ্রকুমার মিত্র, (পাট্‌না), শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (কুমিল্লা), মিস্ অঞ্জলি সেন (ঢাকা), রামরতি, পান্না, নীহার, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (মনোহরপুকুর, কলিকাতা) কুমারী প্রতিভা সেন, অনুভা সেন ও নীলিমা দত্ত (ফরিদপুর), দিলীপকুমার সরকার (দিল্লী)। সুরমা, প্রতিমা, নীলিমা, বৌদি, মেঝবৌদি ও আমিয় (পাঁতিহাল, হাওড়া)। তুহিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টি, সণু, কণু ও খোকন, (দিল্লী)। পরেশনাথ রায় চৌধুরী (মেদিনীপুর), কুমারী অমলা দেবী (জাম্‌সেদ্‌পুর) মায়া দেবী (ফৈজাবাদ)। সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর)। আশা বসু (লক্ষ্ণৌ), কুমারী সর্ব্বাণী ঘোষ (কলিকাতা), জগো, হাজারী, আব্দুর রহমান, অমূল্য, কুমারেশ, ইউছোপ, মাদারবক্স জোব্বার, (মৃজাপুর এম্-ই স্কুল), অমিয়কুমার বরাট্ (পাট্‌না)। কোমলতা ও সমরেন্দ্রনাথ বসু (রামপুর হাট), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (ভাঙ্গা), জৈবুন্নিসা (সিলেট), শ্রীগোরা ঘোষ (ভবানীপুর), মণিকা, মেদিনী, নেপাল, রাধাবল্লভ, ব্রজবল্লভ ক্ষেত্রমোহন সত্য ও মণি (দ্বিপাড়া) অজিতকুমার সান্নাল (পাবনা), বিজয়, বিনয় ভট্টাচার্য্য ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রঙ্গপুর) অলকা সেন (সেনহাটী, খুলনা), তারাকুমার সান্যাল (কলিকাতা), সুকুমার ও করুণা (বেড়া, পাবনা) গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জি (দিল্লী), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), অমরনাথ চৌধুরী (ভবানীপুর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য ও বেলা (কলিকাতা) হেমচন্দ্র রায় ও স্নেহলতা রায় (কলিকাতা) দীনেন্দ্রনাথ রায় ও গুণেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া), কালু, বিনু, চিত্রা ও মিস্ শক্তি নাগ (ঢাকা), রাণী, বীণা, মহাদেব, ভূদেব, অজিত ও বাসন্তী (পাবনা), প্রফুল্লকুমার, অরবিন্দ, কমল ও অশোক ভট্টাচার্য্য (মধুপুর) শ্যামসুন্দর, সমরেন্দ্র, সলিল, রামদাস, কালিদাস, সুনীলেন্দু, ভবেশ ও বিপুলেশ্বর (করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন)।

রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

'রামধনু'র পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, এমন একটী ছোট গল্প লিখিয়া অভিভাবকের সাক্ষর সহ ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যে তাহা রামধনু অফিসে পাঠাইতে হইবে। খামের উপর "পুরস্কার-প্রতিযোগিতা" কথাটা লিখিয়া দেওয়া দরকার। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নিজের গ্রাহক নম্বর না থাকিলে তাহা বিচারের জন্য পাঠানই হইবে না। স্কুল প্রভৃতির গ্রাহক-নম্বর চলিবে না। যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তিনি একটী রূপার মেডেল পাইবেন। রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে—কার্য্যাধ্যক্ষ।

"গান্ধী-জয়ন্তী"

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য।

গত ২রা অক্টোবর শুক্রবার ভারতের সমস্ত জায়গায়, এবং বিলাতে মহাত্মা গান্ধীর জন্মোৎসব হইয়া গেছে। মহাত্মাজী তেষট্টি বছরে পড়িলেন—সমস্ত জাতি একত্রে ভগবানের কাছে এই মহাপুরুষের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিয়াছে।

শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

গান্ধীজী এখন লণ্ডনে আছেন তা তোমরা সবাই জান। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে আছেন ভারত-বর্ষের আরও দুই জন অতি-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।

নূতন ধাঁধা

(১) কোন্ ঠাঁই লুচি নাই; তাহা সত্ত্বেও
যত চাও লুচি খাও, নাহি বাদ দেও?

(২) টম্ লণ্ডনের ইস্কুলে পড়ে; তার বাবা তাকে দশটী পেন্সিল দিয়া বলিলেন, "কটা পেন্সিল হল টম্?" টম্ উত্তর দিল, "আজ্ঞে পাঁচ।" বাবা বলিলেন, "সেকি, আমি যে দশটী দিলাম।"

টম্ ও তার বাবা দুজনাই কিন্তু ঠিক কথা বলিয়াছে? কিভাবে তাহা সম্ভব হইল বলতো?

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

মেঘ। ——উত্তরদাতাদের নাম

তাপস কুমার ভৌমিক (রঙ্গপুর), বিবেকানন্দ শিশুপাঠ্য লাইব্রেরীর সভ্যগণ (বরাহনগর), প্রেমানন্দ, শিবু, শান্তি (রাঁচি), দীনু, পশুপতি, হাবলি, দুর্গা, লতি, জগু, বুলু, গুণ্ড (পাটনা), এস্, পি, সোম চৌধুরী (খুলনা), কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের কেল্লা), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), কুমকুম্ লাল ঘোষ (জামসেদ্পুর), সাদত্ হোসেন (ঝালকাটী), শিশিরকুমার রায় (বসিরহাট), আশীষকুমার সরকার (এলাহাবাদ), কালিদাসী, স্নেহলতা (বাটিকামারী) প্রীতি সেন (চাইবাসা), মীরা, পূর্ণিমা, রমা ও প্রতিমা সেন (হাজারিবাগ), ভবেশ, অজিত, মহম্মদ ছিদ্দিক, বাহার-উদ্দিন (তাহিরপুর), উমা, তোতা ও গোরা বিশ্বাস (কাটিহার), নিখিল নাথ চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর), যশোমাধব সাহিত্যসঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সূর্য্যকুমার, রবীন্দ্রনাথ ও বরেন্দ্র গাইন, নিরুপমা, কনকলতা, টঙ্গ, শান্তো ও খোসাল (দেওডাঙ্গা, খুলনা), উষাময়ী, নিশাময়ী, সন্ধ্যাময়ী, সন্ত ও খোকন ঘোষাল (গাজিপুর), গজেন্দ্র, শচীন্দ্র, রমেশ, যোগেশ, শান্তি ও পুষ্প (মিরাপুর, ময়মনসিংহ), শম্ভুনাথ ঘোষ (ভবানীপুর), সুনীলকুমার গোস্বামী (পাটনা), শ্রীমতী লতিকা ব্যানার্জ্জি (রাজসাহী), নবাবগঞ্জ ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের ভ্রাতৃবৃন্দ। রাধিকা, সরোজ, হিমেন্দু, সুধাংশু, নারায়ণ ও সত্যাংশু (মালিয়াড়া হাই স্কুল), রণেন্দ্রকুমার মিত্র, (পাটনা), শ্রীসমরেন্দ্রনাথ চৌধুরী (কুমিল্লা), মিস্ অঞ্জলি সেন (ঢাকা), রামরতি, পান্না, নীহার, সুধা ও নির্ম্মলা দেবী (মনোহরপুকুর, কলিকাতা) কুমারী প্রতিভা সেন, অনুভা সেন ও নীলিমা দত্ত (ফরিদপুর), দিলীপকুমার সরকার (দিল্লী)। সুরমা, প্রতিমা, নীলিমা, বৌদি, মেঝবৌদি ও আমিয় (পাঁতিহাল, হাওড়া)। তুহিনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মণ্টি, সণু, কণু ও খোকন, (দিল্লী)। পরেশনাথ রায় চৌধুরী (মেদিনীপুর), কুমারী অমলা দেবী (জাম্সেদ্পুর) মায়া দেবী (ফৈজাবাদ)। সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর)। আশা বসু (লক্ষ্নৌ), কুমারী সর্ব্বাণী ঘোষ (কলিকাতা), জগো, হাজারী, আব্দুর রহমান, অমূল্য, কুমারেশ, ইউছোপ, মাদারবক্স জোব্বার, (মৃজাপুর এম্-ই স্কুল), অমিয়কুমার বরাট্ (পাটনা)। কোমলতা ও সমরেন্দ্রনাথ বসু (রামপুর হাট), নরেন্দ্রনাথ মিত্র (ভাঙ্গা), জৈবুন্নিসা (সিলেট), শ্রীগোরা ঘোষ (ভবানীপুর), মণিকা, মেদিনী, নেপাল, রাধাবল্লভ, ব্রজবল্লভ ক্ষেত্রমোহন সত্য ও মণি (দ্বিপাড়া) অজিতকুমার সান্ন্যাল (পাবনা), বিজয়, বিনয় ভট্টাচার্য্য ও অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (রঙ্গপুর) অলকা সেন (সেনহাটী, খুলনা), তারাকুমার সান্যাল (কলিকাতা), সুকুমার ও করুণা (বেড়া, পাবনা) গুণদাপ্রসাদ মুখার্জ্জি (দিল্লী), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), অমরনাথ চৌধুরী (ভবানীপুর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য ও বেলা (কলিকাতা) হেমচন্দ্র রায় ও স্নেহলতা রায় (কলিকাতা) দীনেন্দ্রনাথ রায় ও গুণেন্দ্রনাথ রায় (কলিকাতা), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া), কালু, বিনু, চিত্রা ও মিস্ শক্তি নাগ (ঢাকা), রাণী, বীণা, মহাদেব, ভূদেব, অজিত ও বাসন্তী (পাবনা), প্রফুল্লকুমার, অরবিন্দ, কমল ও অশোক ভট্টাচার্য্য (মধুপুর) শ্যামসুন্দর, সমরেন্দ্র, সলিল, রামদাস, কালিদাস, সুনীলেন্দু, ভবেশ ও বিপুলেশ্বর (করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন)।

রামধনু-পুরস্কার-প্রতিযোগিতা

'রামধনু'র পাঁচ পৃষ্ঠার বেশী না হয়, এমন একটী ছোট গল্প লিখিয়া অভিভাবকের সাক্ষর সহ ১০ই অগ্রহায়ণের মধ্যে তাহা রামধনু অফিসে পাঠাইতে হইবে। খামের উপর "পুরস্কার-প্রতিযোগিতা" কথাটা লিখিয়া দেওয়া দরকার। প্রত্যেক লেখার সঙ্গে নিজের গ্রাহক নম্বর না থাকিলে তাহা বিচারের জন্য পাঠানই হইবে না। স্কুল প্রভৃতির গ্রাহক-নম্বর চলিবে না। যাঁর লেখা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে তিনি একটী রূপার মেডেল পাইবেন। রামধনু-সম্পাদকের বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে—কার্য্যাধ্যক্ষ।

অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম-এ, বি-এল্ প্রণীত

ছেলেদের রোমাঞ্চকর উপন্যাস

পদ্মরাগ

বইখানা তোমরা সকলেই একবার পড়ে দেখ।

সুবিখ্যাত **"বিচিত্রা"** পত্রিকা পদ্মরাগ পড়ে কি সমালোচনা করেছেন দেখ :—

"এটি একটি ডিটেক্টিভ উপন্যাস। ছোট ছোট ছেলেদের জন্য প্রধানতঃ লেখা। কিন্তু পড়ে দেখলাম, প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকেরাও এই উপন্যাসটি পড়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। বইখানি পড়তে আরম্ভ করে আর শেষ না করে থাক্‌তে পারিনি। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ যতই এগোতে লাগ্‌লাম, আখ্যান-বস্তুর রহস্য ততই ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। যে সব ব্যস্ত পাঠকেরা অল্প একটু অবসরকালে চিত্ত-বিনোদন কর্‌বার জন্য বইখানি নিয়ে বস্‌বেন, তাঁদের একটু সাবধান করে দেওয়া ভাল, তাঁরা যেন একটু বিবেচনা করে বইখানি নিয়ে বসেন, নইলে পরে কাজ পণ্ড হবার বিশেষ আশঙ্কা আছে।

মনোরঞ্জন বাবুর ডিটেক্টিভ গল্প লিখ্‌বার বেশ হাত আছে বলে আমাদে বিশ্বাস। হয় ত বা বাংলা দেশের ভবিষ্যৎ কনান্ ডয়েল্ তাঁর মধ্যে আত্মগোপন ব আছে। আশা করি, তিনি বাংলা সাহিত্যকে আরো অনেক ডিটেক্টিভ উপন্ দান কর্‌বেন। তাঁর এ বইখানি পড়ে আমরা বিশেষ প্রীত হ'য়েছি।"

প্রচুর—ছবি, ১৮৫ পৃষ্ঠা, দাম মাত্র চৌদ্দ আন

* * * * *

প্রাপ্তিস্থান ঃ—রামধনু কার্য্যালয়; এম্, সি সরকার এণ্ড্ সন্স্ (১৫নং কলেজ স্কোয়ার) সেন ব্রাদার্স (১৫নং কলেজ স্কোয়ার) দাসগুপ্ত এণ্ড কোং (৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট্) কমলা বুক ডিপো (১৫নং কলেজ স্কোয়ার) আশুতোষ লাইব্রেরি (৫নং কলেজ স্কোয়ার) ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ (১৯১ নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্) ভবানীপুরের পুস্তকালয় সমূহ এবং দি বুক কোম্পানী (৪।৪এ, কলেজ স্কোয়ার) ডি, এম্ লাইব্রেরি (৬১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্) কলিকাতা।

ছত্রপতি শিবাজী।

৪র্থ বর্ষ } অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ { ১১শ সংখ্যা

সুখ-দুঃখ

(শ্রীহরেন্দ্রনাথ সিংহ, কবিভূষণ)

দুঃখ যদি আসে তবু কোরোনাক' ভয়
সুখ-দুঃখ পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রয় ;
দুঃখ না পাইলে কোথা সুযোগ শিক্ষার ?
সুখ-গেলে দিওনাক' জীবনে ধিক্কার।

বীর-চরিত

এক-আধ দিনের কথা নয়, দু'হাজার বছরেরও আগেকার ঘটনা।

রোম সহরের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। আজকাল ভূগোলের পুথি খুলিয়া তোমরা মুখস্থ কর—ইটালীর রাজধানী রোম। ছোট্ট, এক রত্তি সহর, দুনিয়ার বড় বড় নগরের নাম করিতে কেউ আর তাকে এখন পোছে না। কিন্তু এমন এক সময় গেছে যখন মাত্র এই ঐকটী সহরের নামে গোটা পৃথিবীটা থর থর করিয়া কাঁপিত। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার, জগতের ইতিহাসে তার আর জোড়া নাই। কলিকাতার চাইতেও ছোট একটা সহর, কতই বা আর তার লোকসংখ্যা? কয়েক লাখের বেশী তো নয় নিশ্চয়ই! সেই কয়টী লোকই কিন্তু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেশগুলিকে একেবারে হাতের মুঠার ভিতর চাপিয়া রাখিয়াছিল! এবং নিতান্ত অল্প দিনের জন্যও নয়, বেশ কিছু দিন।

শুধু গায়ে খানিকটা জোর থাকিলেই দেশকে বড় করা চলে না, সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের বলও অনেকখানি চাই। কি রকম চরিত্রের লোকেরা সে সময় রোমে জন্মিত তা রোমান্ সেনাপতি রেগুলাসের গল্প শুনিলে তোমরা অনেকটা আন্দাজ করিতে পারিবে।

যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন রোম সবে উঠিতে সুরু করিয়াছে। সমস্ত ইটালী দেশটা বাগে আসিয়াছে, রোমান্‌দের নজর পড়িয়াছে সিসিলির উপর। সিসিলি কোথায় জান বোধ হয়—ইটালীর একেবারে ঘরের কাছে। ইয়োরোপের ম্যাপ খুলিলে দেখিবে ইটালী দেশটা দেখিতে অনেকটা মানুষের পায়ের মত; আর ঠিক সেই পায়ের পাতার সাম্‌নে ফুট্‌বলের মত ছোট্ট সিসিলি; যেন ইটালী-পা সিসিলি-ফুট্‌বলে লাথি মারিতেছে। এই সিসিলির সম্পর্কে রোমের সঙ্গে আর এক দারুণ সহরের লড়াই বাধিয়া গেল। সে সহরের নাম কার্থেজ।

সিসিলির ওপারে ভূমধ্যসাগরের জল যেখানে আফ্রিকার তীরে গিয়া আছাড় খাইয়া পড়িতেছে ঠিক সেখানে ছিল সাবেক আমলের কার্থেজ। বীরত্বে, সাহসে, ক্ষমতায় কার্থেজ ছিল রোমেরই ঠিক সমান জুড়িদার—এ বলে আমায় দেখ্, ও বলে

আমায় দেখ্। কার্থেজের ইচ্ছা রোমকে 'ছাতু' করিয়া দিয়া একাই সে দুনিয়াটা ভোগ-দখল করে, আবার রোমেরও ইচ্ছা কার্থেজকে সাগরের জলে উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া পথের কাঁটা সাফ্ করিয়া নেয়। কার্থেজের সেনাপতি হানিবল্ তো স্পেন হইয়া, আল্‌প্‌স্ পাহাড় ডিঙ্গাইয়া রোমকে প্রায় সাবাড়ই করিয়া আনিয়াছিল। আর কিছুদিন সেভাবে আক্রমণ চলিলে রোম গুঁড়াই হইয়া যাইত। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম, তাই অনেক দিনের যুদ্ধ-বিগ্রহের পর রোমই দিল কার্থেজকে গুঁড়া করিয়া। যাক্, সে সব পরের ঘটনা।

যা বলিতেছিলাম—সিসিলির ব্যাপার লইয়া তো রোম-কার্থেজে লড়াই বাধিয়া গেল। প্রথম প্রথম রোমান্‌রা খুব জিতিতে লাগিল, যেমন ডাঙ্গায়, তেম্‌নি জলে। ভারী স্ফূর্ত্তি তখন তাদের। রেগুলাস্ তাঁদের সেনাপতি, তাঁরই অধীনে আফ্রিকায় নামিয়া একেবারে কার্থেজের দুয়ারে আসিয়া তারা হানা দিল। কার্থেজের প্রাণ কণ্ঠাগত, সেখানকার লোকেরা বুঝিল এবার হারিলে তাদের একেবারেই দফা ঠাণ্ডা। তখন তারা 'মরিয়া' হইয়া শত্রুর উপর এম্‌নি ভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল যে, সে তেজ সহ্য করা রোমান্‌দের সাধ্যে কুলাইল না। তাদের বহু সৈন্য কার্থেজের হাতে বন্দী হইল, আর বন্দী হইলেন সেনাপতি রেগুলাস্ স্বয়ং।

কিন্তু রোমান্‌রাও চুপ্ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকার পাত্র নয়, আবার নতুন করিয়া তারা সৈন্য পাঠাইল। বছর পাঁচেক ধরিয়া ক্রমাগত লড়াই চলিতে লাগিল, দু'দলের লোকই প্রচুর ঠেঙ্গানি খাইল। শেষটায় যেন মনে হইল রোমই কিছু বেশী সুবিধা করিতেছে। তাদের সেনাপতি মেটেলাস্ বড় একটা লড়াইয়ে জিতিয়া দেশে গিয়া এক বিরাট্ মিছিল বাহির করিলেন—তের জন বড় বড় কার্থেজবাসীকে বেড়ি পরাইয়া সে মিছিলের সঙ্গে হাঁটাইয়া লওয়া হইল, ১২০টা হাতী সেনাপতি মশায় কাড়িয়া নিয়াছিলেন, সেগুলিও মিছিলের সঙ্গে চলিল। যুদ্ধে জিতিলে এ রকম ব্যাপার রোমে হামেশাই হইত—ইহাকে বলা হইত triumph বা বিজয়-যাত্রা।

চারিদিকের কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া কার্থেজ ভাবিল, আর নয়, ঢের হইয়াছে, এইবার সন্ধি করিয়া সব মিটাইয়া ফেলা যাক্। তাদের মাথায় একটা মৎলবও ঢুকিল খাসা; ভাবিল রোমান্ সেনাপতি রেগুলাস্ তো আমাদের হাতে বন্দী আছে!

একটা কাজ করা যাক্ না, সন্ধির প্রস্তাব লইয়া আমাদের এখান হইতে যে সব দূত যাইবে তাদের সঙ্গে রেগুলাস্‌কেও পাঠাইয়া দেওয়া যাক্! হাজার হোক্, লোকটার দেশে বেশ কিছু খাতির-প্রতিপত্তি আছে তো, সে গিয়া ধরিলে রোমান্‌রা নিশ্চয়ই সন্ধি করিতে রাজী হইয়া যাইবে। সন্ধি হইয়া গেলে তারা আমাদের যে সব লোককে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে তাদের ছাড়িয়া দিবে, আর আমরাও তাদের বন্দীদের মুক্তি দিব। এই ধরণের সন্ধি করিতে রেগুলাস্ রোমের কর্ত্তাদের নিশ্চয়ই পীড়াপীড়ি করিবে, কেননা এখানে তো বন্দি-শালায় সে পচিয়া মরিতেছে, মিট্‌মাট্ হইয়া গেলেই তো তার মুক্তি!

কার্থেজের মোড়লরা রেগুলাসের কাছে গিয়া কথাটা পাড়িতে তিনি বলিলেন, "বেশ, আমায় যেতে বলেন, যাব।"

"কিন্তু একটা কথা আছে। প্রতিজ্ঞা করে যেতে হবে যে সেখানে গিয়ে সন্ধি ঘটাতে না পার্‌লে ফের এখানে এসে আপনাকে বন্দীর বেশ পর্‌তে হবে!"

"আচ্ছা, সেই প্রতিজ্ঞাই রইল।"

কার্থেজের দূতেদের সঙ্গে রেগুলাস্ তখন রোমের দরজায় আসিয়া পৌঁছিলেন, কিন্তু সহরের ভিতর ঢুকিতে কিছুতেই তিনি রাজী হইলেন না, বলিয়া পাঠাইলেন, এখন তিনি কার্থেজের বন্দী, নগরে ঢুকিবার তাঁর অধিকার নাই। রোমের মাতব্বরেরা নিজেরাই তখন নগর-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া সভা বসাইলেন। সেই সভার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রেগুলাস্ কহিতে লাগিলেন, "কার্থেজ আমায় তাদের দূত স্বরূপ আপনাদের কাছে পাঠিয়েছে—তাদের প্রস্তাব সমস্ত ঝগ্‌ড়া চুকিয়ে ফেলে এখন সন্ধি করা। সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আমরা—যারা এখন কার্থেজে বন্দী হয়ে রয়েছি—সবাই আমাদের স্বাধীনতা ফিরে পাব; তার পরিবর্ত্তে তাদের বন্দীদেরও ছেড়ে দিতে হবে।...কিন্তু"...রেগুলাসের চোখ অপূর্ব্ব দীপ্তিতে জ্বলিয়া উঠিল, তিনি বলিতে লাগিলেন..."কিন্তু আমি কেন এতটা পথ বেয়ে আপনাদের সাম্‌নে এসে উপস্থিত হয়েছি, তা-ও শুনুন। আমি আপনাদের বল্‌তে এসেছি কার্থেজের সঙ্গে এ সন্ধিতে কখনোই আপনারা রাজী হবেন না। কার্থেজের সঙ্গে সন্ধি নাই, অবিশ্রান্তভাবে আমাদের যুদ্ধ চালাতে হবে।"

জ্বালাময়ী ভাষায় তিনি বক্তৃতা দিয়া চলিলেন, যুক্তির পর যুক্তি আনিয়া বুঝাইতে লাগিলেন কেন রোমের পক্ষে এখন যুদ্ধে বিরাম দেওয়া উচিত নয়, কেন তাকে যুদ্ধ চালাইতেই হইবে। কার্থেজ হইতে যে ক'জন দূত আসিয়াছিল তারা হাঁ করিয়া রেগুলাসের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল—লোকটা বলে কি? ওঃ, পেটে পেটে এই ছিল তোমার?

সভার লোকেরা রেগুলাসের যুক্তিই মানিয়া লইল—সন্ধি নয়, যুদ্ধ! যুদ্ধ!

খুসীতে রেগুলাসের সারাটা মন ভরিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "তবে আসি এখন বন্ধুরা; বিদায়!"

বিদায়? সে আবার কি? কোথায় যাইতে চান রেগুলাস্? সকলে প্রশ্ন করিয়া উঠিল। রেগুলাস জবাব দিলেন, "কার্থেজে। আস্‌বার সময় কথা দিয়ে এসেছি, বলে কয়ে সন্ধিতে আপনাদের রাজী করাতে না পার্‌লে সেখানে ফিরে গিয়ে আবার তাদের বন্দী হব।"

সর্ব্বনাশ! কার্থেজে ফিরিয়া গেলে কি আর রক্ষা আছে? তাদের দূতেরা দাঁড়াইয়া নিজকাণে সব কথা শুনিয়াছে। যে মুহূর্ত্তে কর্ত্তারা শুনিবে যে রেগুলাস্‌ই জোর করিয়া সন্ধি হইতে দেন নাই সেই মুহূর্ত্তেই যে জল্লাদ দিয়া তাঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলার হুকুম হইবে! রেগুলাস্ নিজেও একথা ভাল মতই জানিতেন, কিন্তু উপায় কি, তিনি নিজের মুখে কথা দিয়া আসিয়াছেন, সে কথার কি খেলাপ করিতে পারেন? লোকে বলিতেই বলে, 'মরদ্‌কা বাৎ, হাঁথীকা দাঁত!'

অনেকে বলিয়া উঠিলেন, "কাজ নাই তবে যুদ্ধে, সন্ধিই হইবে; এভাবে সাক্ষাৎ যমের মুখে আপনাকে আমরা কিছুতেই পাঠাইতে পারি না।"

জলদগম্ভীর-স্বরে রেগুলাস্ কহিলেন, "কখনোই নয়! রোমের কল্যাণের জন্য যুদ্ধ করিতেই হইবে।"

তখন সেই সহরের বাহিরে যে দৃশ্য ঘটিল তা বাস্তবিকই বড় করুণ। রেগুলাসের স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজনেরা আসিয়া তাঁকে জড়াইয়া ধরিল, কোন্ প্রাণে তারা তাঁকে ছাড়িয়া দিবে। এ অবস্থায় কার্থেজে তাঁকে ফিরিয়া যাইতে দেওয়া

আর নিজেহাতে তাঁকে জবাই করা একই কথা। বন্ধুবান্ধবেরা চারিদিকে ভীড় করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মহাবীর কারো কথায় এতটুকু টলিলেন না, স্ত্রী-পুত্রের বুক-ফাটা কান্নায়ও দমিলেন না, সকলের অনুরোধ-উপরোধ এড়াইয়া কার্থেজী দূতেদের সঙ্গে জাহাজে গিয়া উঠিলেন। টাইবার নদীর দু'ধার দিয়া—কাতারে কাতারে লোক ছল্ ছল্ চোখে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইল, আর রেগুলাস্ দু'হাত তুলিয়া তাদের কাছে চিরবিদায় লইলেন।

দেশে ফিরিয়াই কার্থেজের দূতেরা কর্ত্তাদের কাছে রেগুলাসের নামে লাগাইতে এতটুকু দেরী করিল না। এত বড় দেশপ্রেমিক বীরের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে যতখানি উদারতা লাগে কার্থেজের লোকেদের তা ছিল না, তারা রেগুলাসের উপর যে ভীষণ প্রতিহিংসাটা লইল তা ভাবিতেও তোমরা শিহরিয়া উঠিবে। তাঁর দু'চোখের পাতা কাটিয়া ফেলা হইল। অন্ধকার গারদের মধ্যে কিছুদিন আটক রাখিয়া হঠাৎ তাঁকে প্রচণ্ড রোদের মধ্যে আনিয়া ফেলা হইল। অনেক দিন পরে দারুণ সূর্য্যের তেজ চোখে পড়ায় চোখ তাঁর ধাঁধিয়া গেল, কিন্তু পাতা নাই, চোখ বুজিবেন কিভাবে? হাত দিয়া যে চোখে আড়াল দিবেন পাষণ্ডেরা সে উপায়ও রাখিল না, একটা ফ্রেমের সারা গায়ে পেরেক লাগাইয়া তার সঙ্গে কষিয়া তাঁকে বাঁধিয়া দিল। ছুঁচালো পেরেকের খোঁচায় তাঁর সারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া

দু' চোখের পাতা কাটা—প্রচণ্ড রোদে কাঁটা-দেওয়া ফ্রেমে বাঁধা রেগুলাস্।

গেল, প্রচণ্ড রোদে চোখ অন্ধ হইয়া আসিল। এইভাবে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে রেগুলাস পৃথিবী হইতে বিদায় লইলেন। কিন্তু রাখিয়া গেলেন তাঁর অমর কীর্ত্তি।

কাশ্মীরী রহস্য

[গল্প]

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

সেবার গরমের ছুটীতে আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলিয়া বেড়াইতে গেলাম—একেবারে কাশ্মীর। আমরা বলিতে—আমি, হরিদাস, মধুসূদন আর চিরঞ্জীব। চিরঞ্জীব অবশ্য বাঙ্গালী নয়; তার বাড়ী কাশ্মীরে, কিন্তু অনেক দিন বাংলা দেশে থাকিতে থাকিতে সে প্রায় আমাদের মতই হইয়া গিয়াছিল। বাংলাও সে মন্দ বলিতে পারিত না, তবে মাঝে মাঝে দু'একটা "হোবে" "টোবে" আসিয়া পড়ায় কিঞ্চিৎ খাপ-ছাড়া শুনাইত। এই চিরঞ্জীবের পাল্লায় পড়িয়াই আমাদের কাশ্মীর-যাত্রা।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর যাইতে হইলে রাওলপিণ্ডি হইতে দু'শ মাইল্ মোটরে যাইতে হয়; কিন্তু চিরঞ্জীবের বাড়ী ছিল শ্রীনগর হইতে প্রায় ষাট-সত্তর মাইল্ দূরে চম্পকনাগ নামে একটা গ্রামে। সেখানে মোটরে যাইবার রাস্তা নাই, যাইতে হয় হাঁটিয়া কিংবা ঘোড়ায় চড়িয়া।

চম্পকনাগ গ্রামটি বেশ। চার ধারে পাহাড়, ছোট ছোট ঝর্‌ণা, পাইন্ গাছের বন সবই আছে। তবে শীতটা বড় বেশী। রাত্তিরে ত ঘরের বাহির হওয়া এক রকম অসম্ভব বলিলেই হয়। যখন তখন ঝুর্ ঝুর্ করিয়া বরফ পড়িতেছে। সকালে উঠিয়া দেখিবে—যতদূর চোখ যায়—মাঠ, ঘাট সব বরফে সাদা হইয়া আছে।

চিরঞ্জীবের বাপ-মা আমাদের একেবারে আপনার করিয়া ফেলিলেন। আজ এখানে চড়ুই ভাতি, কাল ওখানে; পরশু আর এক যায়গায় শিকার—এম্‌নি মহা ফূর্ত্তিতে দিন কাটিতে লাগিল।

সেদিনও আমরা এম্‌নি ধারা এক চড়ুই ভাতি করিতে গিয়াছি। বেশ একটু দূরেই আসা গিয়াছে। কয়েক দিন কাটাইবার মত সাজ-সরঞ্জাম, 'তাঁবু টাঁবু'ও সঙ্গে আনিয়াছি। প্রকাণ্ড একটা চেনার গাছের নীচে ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চাপান

হইয়াছে। চিরঞ্জীব যদিও কাশ্মীরী পণ্ডিত কিন্তু অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া তার আর আজকাল খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে বাছ-বিচার নাই। সে এক রাশ ডিম আর পেঁয়াজ লইয়া মাম্‌লেট ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছে। আর হরিদাস সম্মুখে বসিয়া কতক্ষণে সেগুলি শেষ হইবে তারই আশায় অধীর ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। বেচারার নিজে হাতে কাজ করিবার তেমন আগ্রহ নাই, কিন্তু তৈরী খাবারের সদ্ব্যবহার করিবার আগ্রহ আছে যথেষ্ট।

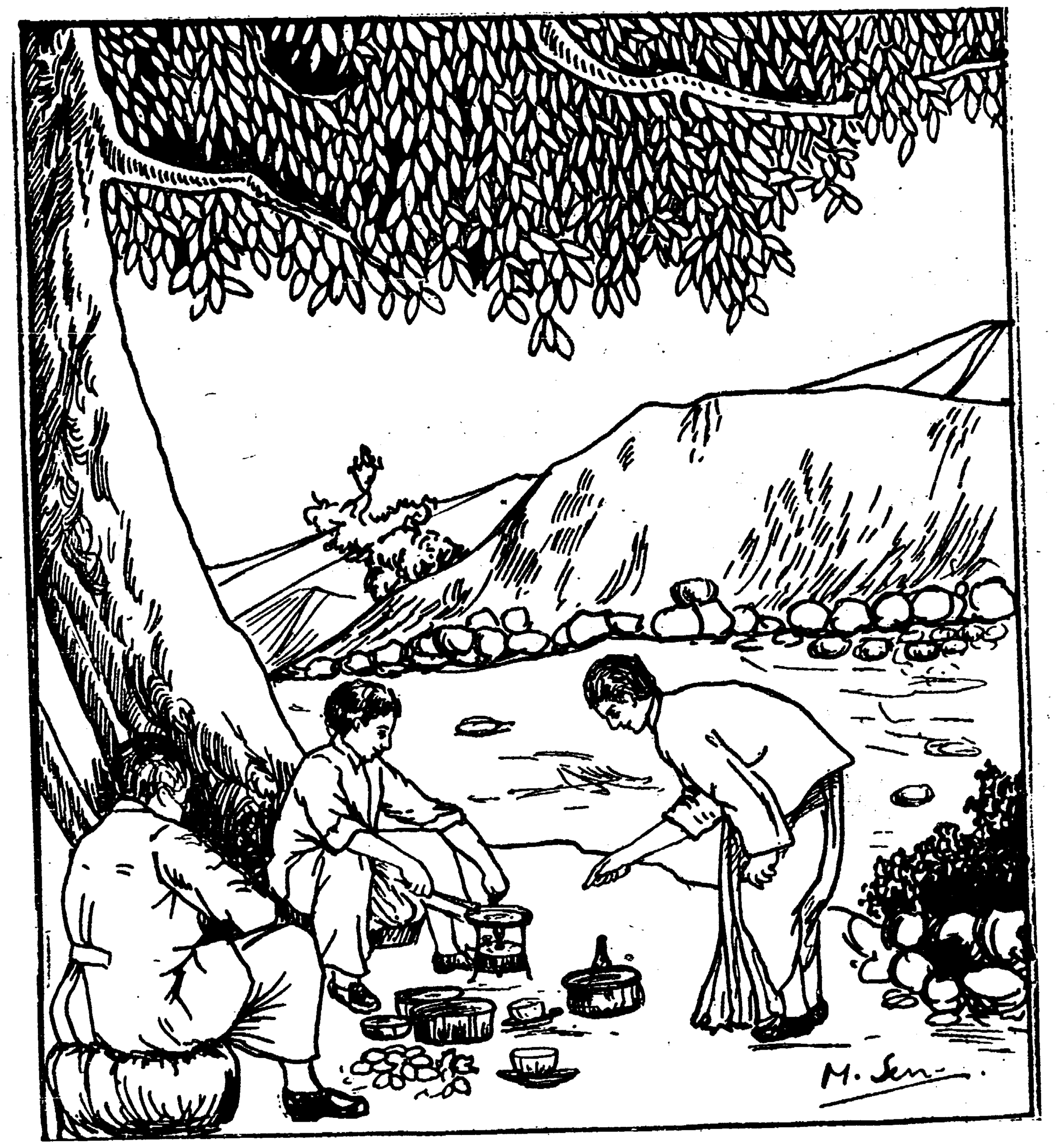

কতক্ষণে শেষ হইবে!

পাশে একটা ছোট্ট পাহাড়িয়া নদী। আজকাল তাহাতে আর জল টল কিছু নাই, সব শুকাইয়া গিয়াছে। আছে শুধু বালি আর কতকগুলি পাথরের নুড়ি। আমি একটা বাইনকুলার লইয়া তারই পাশ দিয়া ঘুরিতেছি।

হঠাৎ নজরে পড়িল, নদীর ঠিক মাঝখানে বালির ভিতর কি একটা সূর্য্যের আলোয় চক্ চক্ করিতেছে। কাছে গিয়া দেখি অবাক্ কাণ্ড! একটা ভাঙ্গা থার্ম্মোফ্লাস্ক্ বালির মধ্যে আধখানা ডুবিয়া আছে। তার যায়গায় যায়গায় মর্‌চে পড়িয়া গিয়াছে, দু'এক যায়গায় টোলও খাইয়াছে। উপরে বাঁকা অক্ষরে ছুরি দিয়া পরিপাটী

করিয়া একটা ইংরাজী L হরফ লেখা। ভাবিলাম, একটু মজা করা যাক্। আলগোছে সেটা তুলিয়া লইয়া বন্ধুদের কাছে আসিয়া বলিলাম, "দেখ্, আমরা কি রকম পিক্‌নিকের যায়গা বেছেছি! কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যও এখানে এসে পিক্‌নিক্ কর্‌তেন। এই দেখ্ না একটা থার্ম্মোফ্লাস্ক্ ফেলে গেছেন।" ললিতাদিত্য কাশ্মীরের খুব বড় এক রাজা ছিলেন—তবে আজকাল নয়, হাজার খানেক বছর আগে। তখন অবশ্য থার্ম্মোফ্লাস্কের নামও কেউ শোনে নাই। সকলে হাসিয়া উঠিল। চিরঞ্জীব বলিল, "না, না ঠাট্টা নয়। এখেনে কিন্তু বাস্তবিকই কেউ কোখোনো আসে না, সাহেব-লোগ শুদ্ধ নয়। কি করে আস্‌বে বল? শ'খানেক মাইলের মধ্যে ত' আর নাম জাদা কুছু নেই। যা আসে দিশী লোগ দু' চারটা, সেও দু' চার বরষ পর পর এক আধটা।" কিন্তু লোক না আসিলে থার্ম্মোফ্লাস্ক্ আসিল কি করিয়া? হরিদাস ততক্ষণে থার্ম্মোফ্লাস্ক্‌টা খুলিয়া ফেলিয়াছে। ইচ্ছা, ঠিক থাকিলে সেটাকে কাজে লাগাইবে। কিন্তু থার্ম্মোফ্লাস্ক্ খুলিতেই তার ভিতর হইতে এক দারুণ রহস্যজনক ব্যাপার বাহির হইয়া পড়িল। দেখা গেল—বাংলা অক্ষরে পেন্সিলে লেখা একখানা চিঠি—যেম্‌নি তাড়াতাড়ি লেখা, তেম্‌নি সংক্ষেপ; কিন্তু ফ্লাস্কের ভিতরে থাকায় অক্ষরগুলি একটুও নষ্ট হয় নাই। চিঠিখানা এই রকম—

'বড় বিপদ্। বরফে পথ বন্ধ। ফির্‌বারও উপায় নেই। দেওদার পিকের নীচে তাঁবু ফেলেছি কিন্তু আজ রাত্রেই হয় ত বরফের নীচে সমাধি হবে। চিনু-বিনুকে আর বাঁচান গেল না। খুঁটি খানিকটা দিয়েছিলাম। সম্‌শেরকে নিয়ে পার ত' একটু এস ভাই। ইতি—'তার পরের নামটা বড় জড়ান লেখা। প্রথম অক্ষরটা শুধু 'ল' বলিয়া মনে হইল। বাকীটুকু পড়িতে পারিলাম না।

পিক্‌নিকের কথা আর মনে রহিল না। নতুন এক চিন্তায় আমরা তখন বিভোর। বেশ বুঝা গেল আমাদেরই মত কোন্ এক হতভাগ্য বাঙ্গালী এরই কাছাকাছি কোন এক যায়গায় বরফের মধ্যে চাপা পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। চিনু-বিনু বোধ হয় তাঁরই ছেলেমেয়ে কারও নাম। তারাও হয় ত সেই সঙ্গে গিয়াছে। ভদ্রলোকের সঙ্গে বোধ হয় অন্য সঙ্গীও ছিল। ইচ্ছা করিয়াই হোক্, আর ঘটনাচক্রেই হোক্, তাঁদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হইয়া যায়। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শেষ আশায় ভদ্রলোক

সেই সঙ্গীদের কাছে এই চিঠিখানা লেখেন। চিঠি লিখিয়া সেটা পাঠাইবার আর কোনও উপায় তিনি খুঁজিয়া পান নাই। শেষে এই অদ্ভুত খেয়ালটি তাঁর মাথায় আসে। থার্ম্মোফ্লাস্কের মধ্যে চিঠিটি ভরিয়া তিনি এই নদীর মধ্যে ভাসাইয়া দেন। নদীর মধ্যে তখন জল ছিল, হয় ত কিছু বরফও থাকিয়া থাকিতে পারে, ভদ্রলোকের ক্ষীণ আশা ছিল যদি এটা কোন রকমে তাদের নজরে পড়ে তবে হয় ত বা তাঁরা এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু সে আশা তাঁর মেটে নাই, সঙ্গীরা সে চিঠি পায় নাই। তারপর কত দিন, কত বছর না জানি চলিয়া গিয়াছে। নদী শুকাইয়া গিয়াছে, সঙ্গীরা চলিয়া গিয়াছে, আর সেই ভদ্রলোকটি বোধ হয় এখনও দু'টি কচি কচি ছেলে-মেয়ের হাত ধরিয়া এরই কোন খানে চিরনিদ্রায় মগ্ন হইয়া আছেন। কত কাল ধরিয়া কে জানে? কেনই বা এমন দেশে ছেলেমেয়ে লইয়া তিনি আসিয়াছিলেন!

চিঠিখানা হাতে করিয়া কতক্ষণ বসিয়া ছিলাম মনে নাই, হঠাৎ হরিদাসের গলা শোনা গেল—"কিন্তু এদিকে মামলেট্ ত পুড়ে ছাই হয়ে গেল।" হতভাগা পেটুকটার উপর বড় রাগ হইল—দুনিয়ায় খাওয়া ছাড়া কিছুই বুঝিল না। মধুসূদন তার কথায় বাধা দিয়া চিরঞ্জীবকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, দেওদার পিকটা কোথায় জান?"

"ঠিক জানি না, তবে নাম শুনা আছে। কেননা ওরকম দুর্গম যায়গা গোটা কাশ্মীর দেশটির মধ্যে নাকি খুব 'ওল্লোই' আছে। আর তার ওদিকটায় এ পর্য্যন্ত কেউ গেছে বলে শুনা যায় নাই। তবে এখন 'গোরোম কাল' এখন বোধ হয় রাস্তা বেশী খারাপ হোবে না, শীতকালেই ঝঞ্ঝাট।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্ল্যান ঠিক করিয়া ফেলিলাম। এই নদীর ধার দিয়া উপরের দিকে চলিতে থাকিলে নিশ্চয়ই দেওদার পিকের কাছাকাছি কোথাও গিয়া উঠিব। তারপর 'ল' বাবুর দেখা পাই না পাই, তাঁর ২।১টা চিহ্ন হয় ত মিলিতে পারে। বরফের তলে চাপা পড়িলে এবং উপরের বরফ না সরাইলে কোন কোন জিনিষ আশ্চর্য্য রকম ভাবে টিঁকিয়া থাকে বলিয়া শুনিয়াছি। এই ত সেদিনও পড়িলাম সাইবেরিয়ার উত্তরে কোন্ এক যায়গায় বরফ খুঁড়িয়া একটা একেবারে লোম শুদ্ধ আস্ত ম্যামথ্ পাওয়া গিয়াছে। ম্যামথ্—সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় হাতী—প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দাঁত ওয়ালা; কবে পৃথিবী হইতে সেগুলি লোপ পাইয়াছে। হরিদাস প্রথমটা

একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, কিন্তু ভোটে হারাইয়া সে আপত্তি আমরা নাকচ করিয়া দিলাম।

ডবল মার্চ্চ্ করিয়া চার বন্ধু চলিয়াছি। দু' পাশ দিয়া চীর গাছ সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা এক রাশ বন্য-ফুল ফুটিয়া আছে। কি চমৎকার রং! উপরে নীল আকাশ—আর তার একটু নীচেই সাদা বরফের ঘোমটা পড়িয়া পাহাড়ের শ্রেণী দাঁড়াইয়া আছে।—চার দিকেই তাই। গ্রীষ্ম হোক্, বর্ষা হোক্, শীত হোক্, এ বরফ কখনও গলিবে না।

২

দেওদার পিকের নীচে আসিয়াছি। বরফ খুঁড়িয়া অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা ভাঙ্গা তাঁবুও বাহির করিয়াছি। বাস্তবিকই যা ভাবিয়াছিলাম, তাই। বরফের নীচে থাকায় তাঁবুর ভিতরকার জিনিষপত্র বেশ ভাল ভাবেই টিঁকিয়া আছে। একটু খুঁজিতেই এক তাড়া চিঠি, কয়েক খানা খাতা, এক খানা ছোট ছেলেদের ছবির বই, কাশ্মীরের একটা ভাল ম্যাপ্, কয়েকটা অদ্ভুত যন্ত্র, মাপের ফিতাও আরও কতকগুলি খুঁটিনাটি জিনিষ বাহির হইল। আর বাহির হইল খবরের কাগজ-মোড়া একখানা ফটো—অনুমান পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সের এক ভদ্রলোক চেয়ারে বসিয়া আছেন। অনেক খুঁজিয়াও কোন মৃতদেহ বা কঙ্কাল চোখে পড়িল না। ফটোটা দেখিয়া মনে হইল লোকটিকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, কিন্তু কোথায়, ঠিক মনে পড়িল না। ফটো-জড়ান কাগজটা খুলিয়া দেখিলাম—সেটা লাহোর হইতে প্রকাশিত একখানা 'ট্রিবিউন্'। উপরে তারিখ রহিয়াছে ২৭শে এপ্রিল, ১৯২৬। অর্থাৎ প্রায় তিন বছর আগেকার কথা। তারপর খাতাপত্র আর চিঠির তাড়াটা খুলিয়া ফেলিলাম। একটু ঘাঁটাঘাঁটি করিতে ইভিতরের ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। জানা গেল যে 'ল' বাবুর আসল নাম ললিত বাবু। কোন একটা মহামূল্য জিনিষের সন্ধানে তিনি এই দুর্গম রাজ্য ছুটিয়া আসেন! জিনিষটি খুবই মূল্যবান্, কিন্তু কোথাও তার নাম করা হয় নাই, বরাবর X বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পাছে অন্য লোকে সেটার কথা টের পায় তাই যে এ ব্যবস্থা সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ললিত বাবুর বোধ হয় স্ত্রী ছিলেন না, ছিল দু'টি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—চিনু আর বিনু। তাদের তাই তিনি

সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সঙ্গে তাঁর আরও একটি বন্ধু ছিল, আর ছিল সমশের নামে এক নেপালী চাকর; কিন্তু তারা দেওদার পিক্ পর্য্যন্ত আসে নাই, বোধ হয় অন্য দিকে ঐ X এরই সন্ধানে গিয়াছিল এবং এদেরই উদ্দেশে ললিত বাবু তাঁর শেষ চিঠি থার্ম্মোফ্লাস্কে ভরিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

এখন কথা হইতেছে দু'টি। প্রথম—এই X জিনিষটি কি? সেটা কি হীরা-টিরা জাতীয় কিছু, যার জন্য ভদ্রলোক বাংলা দেশ ছাড়িয়া এই সুদূর প্রান্তে আসিয়া বরফের মধ্যে প্রাণ খোয়াইলেন? দ্বিতীয় ললিত বাবু এবং তাঁর চিনু মিনু—এরা গেল কোথায়? তাঁবুর ভিতর বরফ চাপা পড়িয়া যদি তারা মরিয়া থাকে তবে তাদের দেহগুলি—অন্ততঃ পক্ষে হাড়গুলিও ত পাওয়া যাইত! তবে কি কোন নেকৃড়ে টেকৃড়ে আসিয়া তাদের আর কোথাও লইয়া গেল? কিন্তু তাঁবুর ভিতরের জিনিষ-পত্র ত বেশ গোছানই আছে, ওলট্ পালট্ ত কিছুই হয় নাই। আর অতটা বরফ খুঁড়িয়া জানোয়ারেরা সত্যিই কি তাঁদের সন্ধান পাইতে পারে? নাঃ, ব্যাপারটা ক্রমেই ঘোরালো হইয়া উঠিতেছে।

৩

সে রাত্রিটা নতুন তাঁবু খাটাইয়া, আগুন জ্বালাইয়া, কম্বল মুড়ি দিয়া কোন রকমে কাটাইয়া দিলাম। গ্রীষ্মকাল, তবু শীতে একেবারে জমাইয়া দিল। ললিত বাবুরা বোধ হয় অন্য সময়ে আসিয়াছিলেন। তবে অমন ব্যাপার হইবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পরদিন বেশ রোদ উঠিল। অনেক বরফও গলিয়া গেল—দেখিলাম ভাঙ্গা তাঁবুটার কাছাকাছি এক যায়গায় কয়েকটা খুঁটি আর তারের বেড়া বরফের ভিতর দিয়া উঁকি মারিতেছে। এই কি চিঠির সেই খুঁটি? আরও বরফ সরাইয়া দেখা গেল খুঁটি গাড়িয়া গাড়িয়া তাতে তার বাঁধিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত নেওয়া হইয়াছে। আমরা তাই ধরিয়া ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। প্রায় মাইল তিনেক আসিয়া দেখা গেল খুঁটি শেষ হইয়া গিয়াছে এবং পথও এখানে শেষ হইয়া সম্মুখে এক গহ্বরের মধ্যে ঢুকিয়াছে। অন্য সময় হইলে বোধ হয় গহ্বরের ভিতরে যাওয়া দূরে থাক্, তার কাছেও ঘেঁষিতাম কি না সন্দেহ; কিন্তু তখন কেমন যেন এক অজানা শক্তি আসিয়া পা দু'টাকে

আপনা হইতেই গহ্বরের ভিতরে চালাইয়া দিল। গহ্বরের ভিতরটা ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল; টর্চ্চ্ জ্বালিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ হরিদাসের চীৎকারে পিছন ফিরিয়া দেখি—বেচারা একেবারে মাটীর মধ্যে চিৎ হইয়া পড়িয়া হাত পা ছুঁড়িতেছে। কে নাকি তার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে! সকলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আলো ধরিতে দেখা গেল—মানুষ নয়, পায়ের কাছে একটা পাথর খুঁড়িবার মরচে-পড়া গাঁতি পড়িয়া আছে, আর আছে কতক-গুলি পাথরের টুকরা। টর্চ্চের আলোয় সেগুলি জ্বল্ জ্বল্ করিয়া উঠিল। সবাই এক সাথে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—"সোণার খনি, সোণার খনি, নিশ্চয় এটা সোণার খনি।"

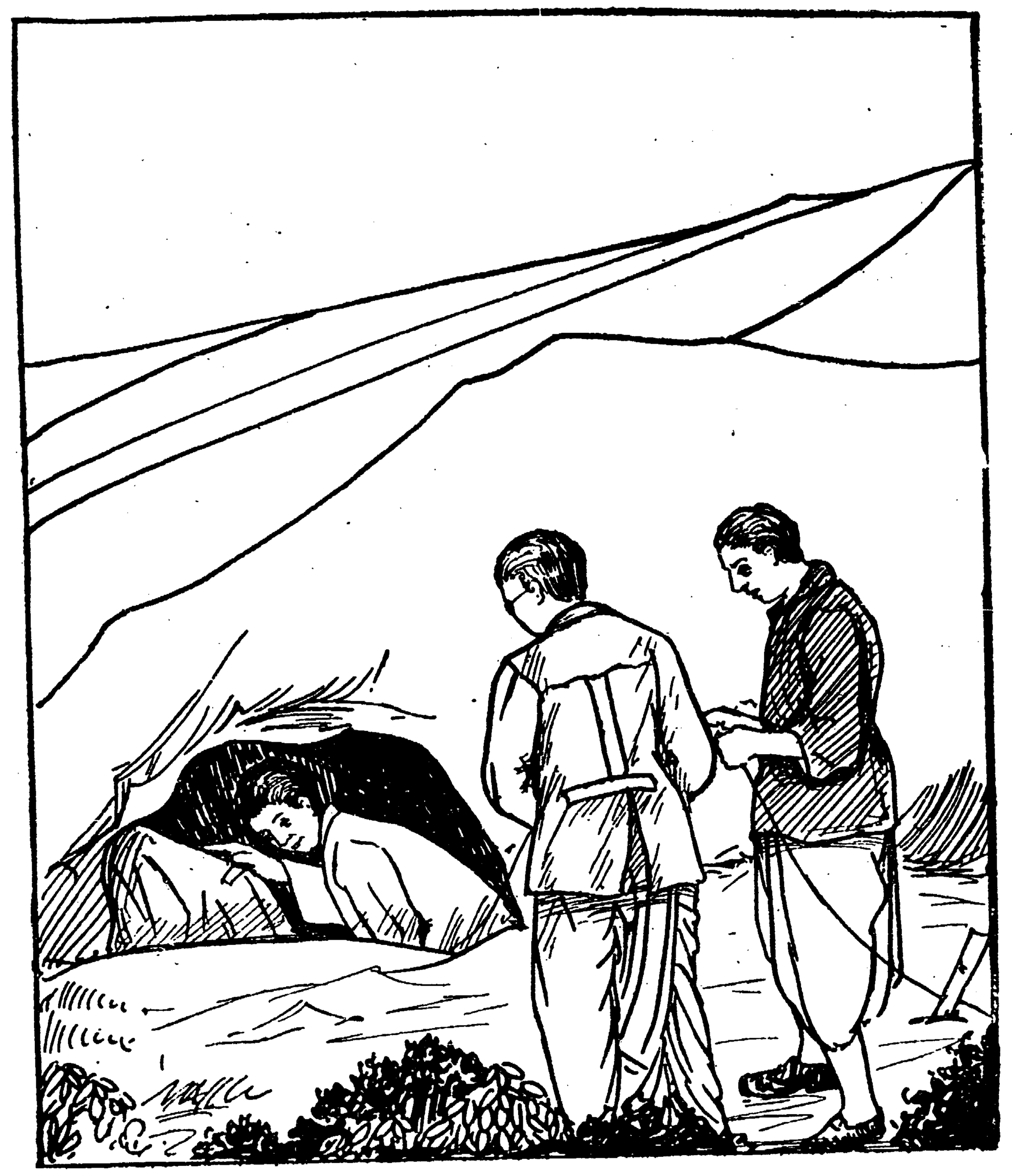

গহ্বরের ভিতরে।

তার পরেই এক মহা হট্টগোল। হরিদাস কখন লাফাইয়া উঠিয়া গাঁতি দিয়া পাথর ভাঙ্গিতে সুরু করিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে আমাদের সকলের পকেট দারুণ ভারী হইয়া উঠিল—আমাদের কারোই তখন মাথার ঠিক নাই—উৎসাহেরও অন্ত নাই। শেষে যখন এমন অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইল যে আর এক তিল পাথরও লইবার ক্ষমতা নাই তখন বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল। পরদিন যা হয় ব্যবস্থা করা যাইবে।

পথে চলিতে চলিতে ললিত বাবুর কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সাম্‌নে, পিছনে সব লেপিয়া মুছিয়া একেবারে একাকার হইয়া গিয়াছে; সোণা—সোণা—সোণা। ওঃ সে কি উত্তেজনা!

৪

তাঁবুতে ফিরিয়া দেখি এক বৃদ্ধ কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ গেরুয়া আলখাল্লা গায়ে, কাঠের জুতা পায়ে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমাদের দেখিয়া সে 'আনন্দ্' বলিয়া অভিবাদন করিল। আমরাও "আনন্দ্" বলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলাম। এই জন-মানবহীন দেশে কেন আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করায় ললিত বাবুর কথা খুলিয়া বলিলাম। আমরা বাঙ্গালী জানিয়া লোকটি বড় খুসী হইল। হঠাৎ হরিদাসের পকেটের দিকে নজর পড়ায় বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কি, আপনার পকেটে ও কি পাথর বাবুজি, আপনারা কি জিয়লজিষ্ট্?" ধরা পড়িয়া গিয়াছি, আর গোপন করিয়া লাভ নাই। বৃদ্ধকে সোণাগুলি দেখাইতে হইল। লোকটি এক টুক্‌রা লইয়া খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করিল, তারপর বলিল, "এগুলি ওই গহ্বর হইতে আনিয়াছেন বুঝি? কিন্তু এগুলি ত' সোণা নয়! এর নাম চ্যালকোসাইট্। তামা আর গন্ধক দিয়া এগুলি তৈরী হয়। দেখিতে অনেকটা সোণার মত তাই অনেকে সোণা বলিয়া ভুল করে। এর আর একটা নামও তাই ফুল্‌স্ গোল্ড (বোকাদের সোণা)। জিনিষটি তেমন দামীও নয়, আর ঐ গহ্বরে খুব সামান্য পরিমাণ আছে আমি জানি।" বৃদ্ধের কথায় হঠাৎ চমক্ লাগিল। চ্যাল্‌কোসাইট্! তাই ত বটে! আমার কাকা বাবু এক জন মস্ত বড় ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অর্থাৎ জিয়লজিষ্ট। তাঁর কাছে আমি এ জিনিষ অনেক দেখিয়াছি, নিজেও অনেকবার ঘাঁটাঘাঁটি করিয়াছি। দারুণ উত্তেজনায় তখন এ কথা একবারও মনে হয় নাই। শেষে সোণা বলিয়া একরাশ তামা ঘাড়ে করিয়া আনিলাম! হরিদাস বেচারা কিন্তু বাস্তবিকই বড় মুষ্‌ড়াইয়া পড়িল। অনেক আপত্তির পর নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পাথরগুলি ফেলিয়া দিয়া সে মুখখানা হাঁড়ীর মত করিয়া বসিয়া রহিল।

এইবার মনে পড়িল ললিত বাবুর চেহারা কেন চেনা চেনা ঠেকিয়াছিল। ভদ্রলোককে আমাদের বাড়ীতেই দেখিয়াছি। কাকাবাবুর কাছে বছর কয়েক আগে

তিনি প্রায়ই আসিতেন। কাকাবাবুর কাছে তাঁর অনেক গল্প শুনিয়াছি। লোকটির বাপের টাকা ছিল বিস্তর, কিন্তু কাজকর্ম্ম না করিয়া দু'দিনেই তিনি তা উড়াইয়া দেন। ভদ্রলোকের একটা বাতিক ছিল নানা দেশের কথা-উপকথা লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা। নানা বই পড়িতে পড়িতে তাঁর ধারণা হয় যে কাশ্মীরের দেওদার পর্ব্বতের কাছাকাছি কোথাও মস্ত একটা সোণার খনি আছে। কোন রকমে যদি সেটা আবিষ্কার করা যায় তবে আর টাকার কষ্ট সহিতে হয় না। ভাবিতে ভাবিতে তাঁর মাথায় গোলমাল বাধিয়া যায়। তিনি টাকা ধার করিয়া সত্যসত্যই কাশ্মীরে গিয়া খনি বাহির করিবার সঙ্কল্প করেন। কাকাবাবুর কাছে এই উপলক্ষেই তিনি আসিতেন। কাকাবাবু তাঁকে বলেন যে ও রকম কোনও খনির কথা তিনি কখনও শোনেন নাই এবং এও বলেন যে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকিলে খনি বাহির করার বিশেষ সম্ভাবনা নাই, বরঞ্চ পদে পদে ঠকিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। ললিত বাবু সে কথায় নিরস্ত হন নাই। তারপর তাঁর খামখেয়ালীর এই শাস্তি।

বৃদ্ধ কাশ্মীরীটি আবার কথা বলিল, কহিল "আমার কথায় আপনারা বড় নিরাশ হইয়াছেন। চলুন আমার ঘরে, আপনাদের সোণার চাইতেও ভাল জিনিষ উপহার দিব।" পথে চলিতে চলিতে বৃদ্ধ তার জীবনের কথা বলিতে লাগিল। বড় বংশেই তার জন্ম হইয়াছিল। লেখাপড়াও সে অনেক দূর পর্য্যন্ত শিখিয়াছিল—বিশেষতঃ কাশ্মীরের লোক বলিয়া ভূতত্ত্বটা তার ছিল খুবই প্রিয় জিনিষ। তার ইচ্ছা ছিল বড় হইয়া সে একজন জিয়লজিস্ট্ হইবে। কিন্তু কপাল তার বড় মন্দ। অল্প বয়সেই বাপ মা, ভাই বোন্ সব হারাইয়া সে একেবারে আত্মীয়-বান্ধবহীন হইয়া পড়ে। তখন সংসারের উপর তার বিরক্তি ধরিয়া যায়, সে সন্ন্যাস ধর্ম্ম নেয়। তার পর দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাটিয়া গিয়াছে, সে আর মায়ার ফাঁদে পা দেয় নাই, কিন্তু তিন বছর আগে হঠাৎ একদিন তার জীবনের গতি অন্য দিকে ফিরিয়া গিয়াছে। এই দিক্‌টা জনমানবহীন বলিয়া সে মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া কিছুদিন করিয়া কাটাইত। বছর তিনেক আগে একদিন এম্‌নি এক সকাল বেলায় সে পথের ধারে দু'টি ছোট ছেলে মেয়ে কুড়াইয়া পায়। অনুমানে মনে হয় তারা বাঙ্গালী। বরফের চাপে তারা মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সে ঘরে আনিয়া বহু কষ্টে তাদের প্রাণ বাঁচায়। তার পর

হইতে সে প্রত্যেক গ্রীষ্মে এখানে আসিয়া ঘর বাঁধে,—যদি সেই ছেলেমেয়ে দু'টির বাপ মা কিংবা কোন আত্মীয়-স্বজন তাদের খোঁজে এখানে আসে তবে তাদের ফিরাইয়া দিয়া তার ছুটী। কিন্তু এই তিন বছরে একটি প্রাণীও এই দুর্গম জায়গায় আসে নাই। আজ হঠাৎ পথে জুতার চিহ্ন দেখিয়া সে খোঁজ করিতে করিতে এই তাঁবুর কাছে আসিয়াছে। তার পর আমাদের সঙ্গে দেখা।

চিনুবিনুকে দেখিলাম। বাপের ফটো তারা চিনিতে পারিল। তাদের লইয়া বৃদ্ধের কাছে বিদায় লইলাম। আসিবার সময় সন্ন্যাসীর চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা জল পড়িল।

চম্পকনাগে ফিরিয়াই কাকাবাবুর কাছে সব খুলিয়া চিঠি লিখিয়া দিলাম,—ললিত বাবুর কোন খোঁজ তিনি রাখেন কিনা? উত্তর আসিল—ললিত বাবু বছর খানেক হইল দেশে ফিরিয়াছেন। আসিবার সময় তিনি কোথা হইতে সোণা মনে করিয়া এক গাদা চ্যাল্‌কোসাইট্ লইয়া আসেন। এখানে আসিয়া জানিতে পারিলেন সেগুলি সোণা নয়, তামা মাত্র। ইতিপূর্ব্বেই তিনি ছেলেমেয়ের শোকে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিলেন। এই নতুন খবরে সত্য সত্যই পাগল হইয়া যান্। এখন তিনি বাঁচিয়া আছেন বটে কিন্তু একেবারে উন্মাদ্।

চিনু বিনুকে লইয়া সেই দিনই বাংলা দেশের দিকে রওনা হইলাম।

৫

ললিত বাবু এখন ভাল হইয়া গিয়াছেন। বাজারের ধারে তাঁর ছোট্ট খেলনার দোকানটিতে আজকাল প্রায়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। চিনু-বিনুও সেখানে থাকে। সোণার খনির কথা উঠিলেই তিনি বলেন, "সোণার খোঁজ কর্‌তে গিয়ে এই আসল সোণা হারিয়ে এসেছিলাম, আপনাদের কল্যাণেই আবার তা ফিরে পেয়েছি। অন্য সোণা আমি আর চাই না, এরাই আমার সোণার খনি।"

"ক্রু—উ—উ—স্!"

(শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-টি)

শ্রীমান্ গঙ্গা-গোবিন্ গাংগুলি
খেল্‌তে গিয়ে ডাংগুলি—
হোঁচট্ খেয়ে' কপালে,
এক্কেবারে চালান হ'লো—
সদরের হাঁস্‌পাতালে।

বরাবর পাড়াগাঁতেই বাস
(তাই) গণ্ডী-ঘেরা বন্দি-ঘরে মন করে হাঁস-ফাঁস্।
সব কথাতেই আইন-মানা
উঠ্‌তে শুতে শাসন-হানা!—
কী-ই বা এমন রোগ্!
অলক্ষুণে ডাংগুলিটার জন্যে যত ভোগ।

বার্লী, সাবু, মিছ্‌রি—এ'তে হায়!
পেটুকরামের পেট্‌টি পূরাই দায়।
গঙ্গা ভাবে—"কবে
হায় রে সেদিন হবে,
এ দুর্ভোগের পরে—
(যেদিন) আগের মতই রোজ দু'বেলা—
ভাত খাবে পেট ভরে'!"

এমন সময়— "ক্রু—উ—উ—স্—স"
হঠাৎ হ'তে হুঁস্—

(উঠে) ভর দিয়ে দুই হাতে,
গঙ্গা দেখে, তারি ঘরের ঠিক্ লাগা ফুট্‌পাতে
চল্‌চে এঁকে বেঁকে—
বুরুষ-ওয়ালা আপন মনে একটানা সুর হেঁকে।

আজব্ এ কল্‌কেতা!—
নিত্যি পথে হেথা
লক্ষ রকম খাবার নিয়ে' লক্ষ ফিরিওয়ালা —
লক্ষ সুরে কর্ণ-যুগল কর্চ্ছে ঝালাপালা।

ক্ষুধার জ্বালা গঙ্গা তখন আর সহিতে নারে;
পেটেপিঠে হাড় হোয়েছে এক্‌সা একেবারে!
(তাই) লজ্জা ছেড়ে'
গলা ঝেড়ে'
ডাক্‌লো জোরে—"ফেরি-ওলা এসো ত এই দিকে!"—
ভাঙ্গা গলা! (হায় বেচারা!—পেটমরা চাম্‌চিকে!)

যেম্‌নি শোনা ডাক,
পেরিয়ে পথের বাঁক,
বুরুশ্-আলা—সেই সড়কে ফের,
জান্‌লা-মুখে দাঁড়ায় এসে, গঙ্গা-গোবিনের।

* * * * *

"বুরুশ বাবু!" বল্‌তে—গোবিন্
পকেট্ থেকে পয়সা দু'তিন্
বের কোরে' না এনে'—
শুক্‌নো ঠোঁটে একটুখানি খুসীর হাসি টেনে'—

বলে ফেল্‌লো অকপট—
"তিন পয়সার "বুরুশ" বাপু দাও দিকি চটপট্!"

"জুত্তি কাঁহা—" হাঁকতে মুচী,
গঙ্গা ভাবে—বাঙ্গলা কথা খোট্টা ব্যাটা
বুঝ্‌তে নারে বুঝি!'

ভাঙ্গা গালে হাত বুলিয়ে—ইসারাতে
বুঝিয়ে দিলে তারে,
কী দুর্দ্দশা হয়েছে তার, এই ক'দিনের
অসুখ-অনাহারে !

* * * * *

পয়সা ফেলে' থলের মুখে গঙ্গা পাতে হাত—
বরাত ভালো ! তাইতো হলো মুচীর বাজী মাৎ !
একটুখানি 'কোব্রা' কালি—তাই মেখে বেশ ক্রুশে
গাঙ্গুলী-পো'র দুই গালে পোঁছ্ লাগিয়ে দিল ঠুসে !'

টেলিফোনের আবিষ্কার

বিজ্ঞানের কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্-সি)

"হ্যালো, সাউথ্ ওয়ান্ টু সিক্স্ প্লীজ্ ।"

শ্যামবাজারের একটি ছোট্ট বাড়ীর দোতালার ঘরে বসিয়া আমাদের শ্যামচাঁদ একটি যন্ত্রের সম্মুখে এই ক'টি কথা বলিল। কয়েক সেকেণ্ড্ পরেই উত্তর আসিল —"হ্যালো, কাকে চাই ?"

"এটা কি ভবানীপুর রামধনু-অফিস্ ?" শ্যামচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল। যন্ত্রের ভিতর হইতে আবার শোনা গেল, "আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

"একবার সম্পাদক মশাইকে ডেকে দেবেন কি ?"

তারপর সম্পাদক মহাশয় আসিলেন ; তাঁহার সহিত শ্যামচাঁদের অনেক সুখ-দুঃখের কথা হইল।

আর কেউ যদি সে ঘরটায় তখন উপস্থিত থাকিত তবে তার নিশ্চয়ই মনে হইত যে রামধনু-সম্পাদক মশাই শ্যামচাঁদেরই হাত-খানেক তফাতে দাঁড়াইয়া আছেন, যদিও তাঁকে দেখা যাইতেছে না—কিংবা তাঁর কথাও শোনা যাইতেছে না। কিন্তু

আসলে দু'জনে দাঁড়াইয়া আছেন কতটা তফাতে জান ? প্রায় আট মাইল দূরে —সহরের একেবারে দুই প্রান্তে। এই অসম্ভব কাণ্ডটি যে যন্ত্রের জন্য সম্ভব হইয়াছে তার নাম টেলিফোন্।

তোমাদের মধ্যে যারা বড় বড় সহরে থাক তাদের কথা আমি বলিতেছি না, কিন্তু যারা পাড়াগাঁয়ে থাক তাদের কাছে ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত ঠেকিবে। নয় কি ? আট মাইল্ তফাতে দাঁড়াইয়া দুই ভদ্রলোক দিব্যি গল্প করিতেছে, য়্যাঁঃ ? কিন্তু আট মাইল্ ত ছার, আজকাল লোকে এ দেশে বসিয়া হাজার হাজার মাইল্ দূরের বিলাতের লোকের সঙ্গেও ঠিক এম্নি ভাবে গল্প করিতে পারে। ঠিক্ যেমন ভাবে তুমি চেয়ারে বসিয়া পাশের লোকটির সাথে কথা বল না—তেম্নি ভাবে।

রামধনু-অফিস্ ?

ঘরে বসিয়া দূরের লোকের সাথে কথা বলিবার চেষ্টা অবশ্য বৈজ্ঞানিকেরা অনেক দিন হইতেই করিতেছিলেন, কিন্তু সবাই ব্যাপারটা কাজে ঘটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। প্রথম যিনি কাজে হাঁসিল করেন তাঁর নাম আলেক্জাণ্ডার গ্রেহাম্ বেল্।

গ্রেহাম্ বেলের বাড়ী ছিল স্কট্ল্যাণ্ডে কিন্তু তাঁর কর্ম্মস্থল আমেরিকার বোষ্টন্ সহর। বেলের বাবা ছিলেন কলেজের অধ্যাপক। কিন্তু তাঁর জীবনের

প্রধান কাজ ছিল বোবা-কালাদের লইয়া। কি করিয়া তাদের একটু লেখাপড়া শিখাইবেন, তাদের দিয়া কথা বলাইবেন, কথা শুনাইবেন—এই ছিল তাঁর এক মাত্র চেষ্টা। বাপের দেখাদেখি গ্রেহাম্ বেল্‌ও ঐ কাজে নামিয়া পড়িলেন।

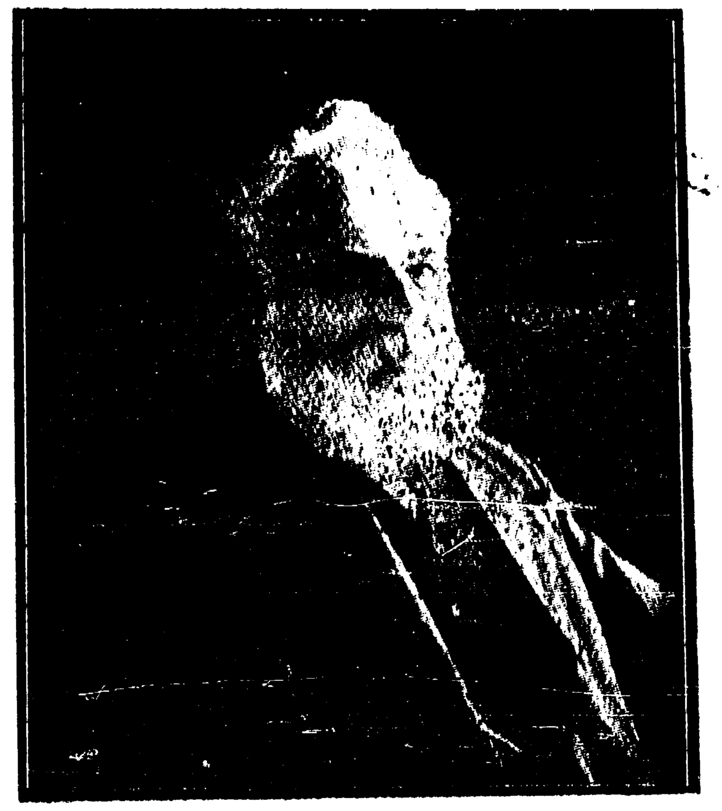

গ্রেহাম্ বেল্।

আমরা যখন কোনও কথা বলি তখন আমাদের মুখের সম্মুখের বাতাসটা কাঁপিতে থাকে—বাতাসের মধ্যে একটা ঢেউ উঠে। সেই ঢেউ যখন আমাদের কাণে গিয়া লাগে তখন মগজের সাহায্যে আমরা সেটা শুনিতে পাই। বেল্ ভাবিলেন, আচ্ছা, বাতাসটা ঠিক যেমন ভাবে কাঁপিতেছে ঠিক তেম্‌নি ভাবে যদি একটা পাৎলা পর্দ্দাকেও কাঁপাইয়া দেওয়া যায় তবে ঐ পর্দ্দার কাঁপন চোখে দেখিয়া কি কথা বলা হইতেছে সেটা বুঝিবার একটা উপায় করা যায়না কি? আলবৎ যায়। তিনি পরীক্ষা করিতে সুরু করিলেন।

বেল্ এক জিনিষের জন্য পরীক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিতে করিতে নানা যন্ত্র ঘাঁটিয়া তাঁর মাথায় এক নতুন খেয়াল আসিল। তাঁর ধারণা হইল, হয় ত চেষ্টা করিলে যন্ত্রের সাহায্যে এক যায়গা হইতে আর এক জায়গায় মুখের কথা পাঠান যায়। সম্ভাবনাটা এক দিন তিনি বন্ধু-মহলে প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

বেল্ ভাবিয়াছিলেন বন্ধুরা তাঁকে খুব উৎসাহ দিবেন, কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল উল্টা। সকলেই ধরিয়া লইল বেলের মাথায় গোলমাল হইয়াছে। কেউ কেউ তাঁর পুরানো পরীক্ষাটার জন্য কিছু কিছু খরচ যোগাইত—তাঁরা সবাই এক সঙ্গে বাঁকিয়া বসিলেন—এমন পাগলামি করিলে তাঁরা আর এক পয়সাও দিবেন না। ব্যাপার কিন্তু আরও গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল—যেদিন সকাল বেলা বেল্ তাঁর ভাবী-শ্বশুরের কাছ

হইতে একখানা চিঠি পাইলেন। চিঠিতে লেখা ছিল—"তুমি যদি তোমার পাগ্‌লামি না ছাড় তবে আর তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কোনও সম্পর্ক নাই।"

বেচারা বেল্ প্রথমটা বড় দমিয়া গেলেন। তিনি এত বড় একটা আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিতেছেন—কোথায় লোকে তাঁকে সাহায্য করিবে, উৎসাহ দিবে, তা না পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁর বিরুদ্ধে আসিয়া দাঁড়াইল! কেন কি অপরাধটা তিনি করিয়াছেন?

কয়েক দিন ধরিয়া মনের সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ চলিল—শেষে তাঁর আত্ম-বিশ্বাসেরই জয় হইল। বেল্ ঠিক করিলেন, তিনি নিজে যা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহাই মানিবেন—অপরে কি বলিল, না বলিল তা লইয়া মাথা ঘামাইবেন না। বন্ধুবান্ধবেরা হয় ত এজন্য তাঁকে ত্যাগ করিবে। করিলে আর কি করা যায় বল। বেলের বয়স তখন ২৮ বছর।

তারপর এই তরুণ বৈজ্ঞানিক নিজের পরীক্ষা লইয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গেলেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিতে লাগিল—তাঁর চোখে যেন ঘুম নাই—বিশ্রামেরও দরকার নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়া সহরে এক বিরাট্ প্রদর্শনী বসিল। দেখা গেল, আমাদের ছোক্‌রা বৈজ্ঞানিক বেল্‌ও তার এক কোণে ছোট্ট একটি যন্ত্র লইয়া চুপ্‌চাপ্ বসিয়া আছেন। কিন্তু সেখানে লোকের ভিড় বলিয়া কোনও বালাই নাই। তার পর হঠাৎ একদিন সেখানে ব্রেজিলের রাজা আসিয়া হাজির। রাজামশাইও প্রদর্শনী দেখিতে আসিয়াছেন, পিছু পিছু বিস্তর লোক। বেল্‌কে তিনি চিনিতেন—তার অদ্ভুত খেয়ালের কথাও শুনিয়াছিলেন। বেল্‌কে গম্ভীর মুখে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি কাছে আসিলেন। বেল্ তাঁর যন্ত্র লইয়া সেটা রাজামশাইকে কাণে লাগাইতে বলিলেন—তার পর অন্য দিক্‌টা তুলিয়া লইয়া কথা শোনাইবার জন্য অনেক দূরে চলিয়া গেলেন। খানিক পরে রাজামশাই অবাক্ হইয়া শুনিলেন, যন্ত্রের ভিতর দিয়া দিব্যি মানুষের স্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

শব্দ কেমন করিয়া বাতাসের মধ্যে ঢেউ তুলে তা তোমাদের আগেই বলিয়াছি।

বেল্ করিয়াছিলেন কি তাঁর যন্ত্রের দু'দিকে দু'টা তার-জড়ান কাঠিম বা রীল বসাইয়াছিলেন (যেমন রীলের গায়ে সূতা জড়ান থাকে তেমনি ভাবে), আর এক কাঠিমের তারের এক একটি মুখের সহিত অন্য কাঠিমের তারের এক একটি মুখ দু'টি লম্বা তার দিয়া যুড়িয়া দিয়াছিলেন। তার পর তিনি ঐ তার-জড়ান কাঠিম দু'টির মধ্যে এক একটি করিয়া চুম্বক লোহা বসাইয়া দিয়াছিলেন। আর দিয়াছিলেন দুই কাঠিমের দুই দিকে পাৎলা দুইটি লোহার পর্দ্দা। মোটামুটি এই হইল তাঁর টেলিফোনের যন্ত্র। এখন, চুম্বক লোহার একটা গুণ এই যে, ঐরকম তার-জড়ান কোনও কাঠিমের কাছে তাকে ধরিলে ঐ তারের মধ্যে একটুখানি বিদ্যুৎ চলিতে থাকে। আবার চুম্বকটি যদি সরাইয়া লওয়া যায় তবে সে বিদ্যুৎ-প্রবাহ যায় অন্য দিকে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জড়ান তারটিও গুণে একটি চুম্বক লোহা হইয়া পড়ে। আবার চুম্বক লোহার সম্মুখে অন্য লোহা ধরিলে চুম্বক সেটাকে টানিতে থাকে, আর সেটাও সঙ্গে সঙ্গে চুম্বকের গুণ পায়। কতটা টানিবে তা এক্ষেত্রে নির্ভর করে তারের ভিতর দিয়া কতটা বিদ্যুৎ যাইতেছে তার উপর।

এখন মনে কর বেলের যন্ত্রের একদিকে এক ভদ্রলোক কোনও কথা উচ্চারণ করিলেন; উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে একটা ঢেউ উঠিল আর সেই ঢেউ গিয়া একদিকের পাৎলা লোহার পর্দ্দায় পড়িয়া সেটাকে কাঁপাইয়া তুলিল। এখন এই পর্দ্দাটি আছে চুম্বকের কাছে, কাজেই পর্দ্দাটিও একটি চুম্বক। পর্দ্দাটি কাঁপিতেছে, অর্থাৎ একবার তার-জড়ান কাঠিমটির কাছে যাইতেছে আবার সরিয়া আসিতেছে। কাজেই সেই কাঠিমটির তারে এক একবার এক এক দিকে বিদ্যুৎ চলিতে লাগিল। এই তার আবার অনেক দূরের অন্য কাঠিমটির সাথে তার দিয়া যোড়া। সুতরাং ঐ তার দিয়া বিদ্যুৎ গিয়া সেই কাঠিমটির চারদিকে জড়ান তারের মধ্যেও চলিতে লাগিল। শুধু তাই নয়, এ কাঠিমটির সম্মুখেও একটি পাৎলা লোহার পর্দ্দা আছে—এবং চুম্বকের কাছে থাকায় সেটিও একটি চুম্বক। কাজেই এ পর্দ্দাটাও সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতে থাকিবে। আর মজা এই যে প্রথম পর্দ্দাটি যেভাবে কাঁপিবে, দ্বিতীয় পর্দ্দাটিও অবিকল সেইভাবে কাঁপিবে। শুধু পর্দ্দাই কাঁপিবে না, পর্দ্দার পিছনকার বাতাসেও তদনুযায়ী একটা ঢেউ উঠিবে—ঠিক এদিকে যেমন উঠিয়াছিল—অবিকল তেমনি।

কাজেই দ্বিতীয় পর্দ্দার পিছনে যদি কেউ কাণ পাতিয়া থাকে তবে সে এদিক্‌কার ভদ্রলোকের কথাগুলিই শুনিতে পাইবে।

এই ঘটনার পর দেখিতে দেখিতে বেলের নাম পৃথিবীর চারদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের পাশে তাঁর নামও লেখা হইয়া গেল। বন্ধু-বান্ধবেরা যারা পাগল বলিয়া বেল্‌কে ঠাট্টা করিত তারা আসিয়া ক্ষমা চাহিল। বেলের ভাবী শ্বশুরটি—যিনি কড়া চিঠি দিয়া বেল্‌কে শাসাইয়াছিলেন—তিনি তাঁর মেয়ের সাথে বেলের বিবাহ দিয়াছিলেন কিনা সে খবর অবশ্য আমরা আর পাই নাই—তবে দিবার সম্ভাবনাই বেশী।

টমাস্ এলভা এডিসন্।

গ্রেহাম্ বেলের পরে টেলিফোনের আরও অনেক উন্নতি হইয়াছে—তবে মূল কাঠামোটি বেল্ যা করিয়াছিলেন তাই আছে। প্রথম যন্ত্রের যা কিছু অস্পষ্টতা, গলদ ছিল সেগুলি শুধু পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এ বিষয়ে অবশ্য অনেক পণ্ডিতের হাত আছে, তবে তার মধ্যে সব চাইতে যাঁর কাজ বেশী উল্লেখ-যোগ্য তাঁর নাম টমাস্ এলভা এডিসন্। ইনিই টেলিফোন্ যন্ত্রকে আজকালকার নিখুঁত অবস্থায় আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। ইঁহার কথা তোমরা রামধনুতে আগেও পড়িয়াছ। এই কয়েক দিন হইল ইনি গোটা পৃথিবীকে কাঁদাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লইয়াছেন।

'রঙ্গ-কণা'

(শ্রীঅনিলচন্দ্র সরকার।)

বাবু—ওহে, ও পাড়ায় অত গোল কেন ?

নাপিত—আজ্ঞে দাদাবাবু, বিশেষ কিছু নয়, ও পাড়ায় আমার ভাই ক্ষৌরি ক'র্‌তে গেছে।

"যেম্‌নি কুকুর তেম্‌নি মুগুর"

(শ্রীমদনকুমার চট্টোপাধ্যায়)

দেখ্‌লে ত মাধবের কাণ্ডটা! সেদিন মাত্র বাপটা মরেছে, মাসটাও ঠিক্ পূর্‌তে দিল না, অম্‌নি তার দেবতুল্য বড় ভাই যাদবকে দিল কিনা পৃথক্ করে! আর তাও যা করেছিল যদি ঠিক মত ভাগ কর্‌ত তবে আর কেই বা তাকে গায়ে প'ড়ে যেত মন্দ বল্‌তে? আমাদের তো সে কিছু করেনি। কিন্তু বাছাধন পরে বুঝেছিলেন যে তিনি যেমন কুকুর, মুগুরটী হয়েছিল আবার অবিকল তেম্‌নি। এখন ব্যাপারটা হয়েছিল কি শোন। যাদব লোকটা নেহাৎ ভাল মানুষ, ছোট ভাই যাতে সুখে থাকে তার সর্ব্বদা সেই চেষ্টা, ছোট ভাই তাকে ঠকিয়ে নিক্ তাতে তার দুঃখ নাই। যে করেই হ'ক ছোট ভাই সুখে থাকলেই তার সুখ। কিন্তু মাধব খুব সয়তান, সর্ব্বদা চেষ্টা—কি করে তার দাদাকে ঠকাবে। এতদিন বাপ ছিল, বিশেষ কিছু সুবিধা পেয়ে ওঠেনি; বাপটী মরেছে কি, অম্‌নি তার দাদাকে ডেকে বল্‌লে, "দেখ দাদা, এখন এক সঙ্গে থাক্‌লে হয় ত কোন দিন বিবাদ হ'তে পারে—তা এখন আমাদের যা সম্পত্তি আছে সমান সমান ভাগ করে নিই।" বড় ভাই নির্ব্বিকার, সে বল্লে, "তাই হোক্!" তখন ভাগ হ'ল। ভাগ অবশ্য ছোট ভাইই কর্‌লে। পালের গরুগুলো সব আধাআধি ভাগ হ'ল, মুখের দিকটা বড় ভাইয়ের, আর পিছন দিকটা ছোট ভাইয়ের। লেপ কম্বল যা ছিল সেও আধাআধি, দিনের বেলায় বড় ভাইয়ের রাত্রিবেলা ছোট ভাইয়ের। মাঠের ধানগুলো—তাও ঠিক অম্‌নি ভাবে; গাছগুলো কেটে আগার দিক্‌টা ছোট ভাইয়ের, গোড়ার দিক্‌টা বড় ভাইয়ের। দেখ্‌লে একবার ভাগের ছিরি খানা? এতেও কিন্তু যাদবের কোন দুঃখ হ'ল না; সে দেখ্‌লে যে ভাই ত আর তাকে ঠকিয়ে নেয়নি! ভাগ তো সমান সমানই হয়েছে।

সে দিন ভরে' গরু চরিয়ে বেড়ায়, আর সময় হ'লে ছোট ভাই এসে তার ভাগ থেকে ঘড়াঘড়া দুধ দুয়ে নিয়ে যায়। দিনের বেলায় লেপ কম্বল বিছানা পত্র যা কিছু যাদব সেগুলি রৌদ্রে দিয়ে বেশ পরিপাটী করে রেখে দেয়, আর সন্ধ্যা হ'তেই মাধব সেগুলি নিয়ে গিয়ে আরাম ক'রে ঘুমায়। মাঠে ধান পেকে থাকে, মাধব তার

নিয়ম মত আগা থেকে ধানগুলি কেটে নিয়ে আসে, আর যাদবের জন্য পড়ে থাকে খড়। সে তাই গুছিয়ে-গাছিয়ে বাড়ী নিয়ে যায়, গরুর খোরাকটা জুটাতে হবে তো? এম্‌নি করে আর কয়দিন চলে বল! ছোট ভাই দিব্যি স্ফূর্ত্তিতে দিন গুজরান্ করে, আর বড় ভাই তার যে না খেতে পেয়ে মরবার উপক্রম করল তবু তার মুখে রা-টী নাই।

কিন্তু সে চুপ্ ক'রে থাক্‌লে কি হয় সবাইতো আর কিছু সমান না। অভাবের তাড়নায় যাদবের স্ত্রী অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠ্‌লো; সে তখন দিব্যি এক ফন্দি এঁটে বসলো। দিন ভরে' তার যা কিছু করার দরকার সব সে ঠিক ক'রে রেখে দিল। বিকালে মাঠে গিয়ে মাধবের চক্ষু তো একেবারে চড়ক গাছ। মাঠের ধানগাছগুলি কেবল লক্‌লকিয়ে উঠেছিল আর সব কিনা একে ভূমিসাৎ! বাড়ী এসে সে চীৎকার ক'রে বল্‌লে—"কে এমন সর্ব্বনাশটা কর্‌লে—ধানের গোড়াগুলি এমন ক'রে কেটে দিলে কে?" উত্তর হ'ল মেয়ে-কণ্ঠে "আমি"। "কেন?" "কেন কি হয়েছে? আমাদের জিনিষ আমি যা ইচ্ছা তাই করেছি। তোমায় কে তা দেখ্‌তে বলেছে? আর তা নিয়ে তোমার শাসনের কি অধিকার আছে?" ব্যাপারটা বুঝ্‌তে পেরে মাধব আর কোন কথা বল্‌তে সাহস পেলে না; ঠিকই তো, পরের জিনিষের উপর তার কি অধিকার। আস্তে আস্তে সে সেখান থেকে সরে গিয়ে গেল দুধ দুইতে। সেখানে গিয়ে দেখে, গরুগুলি রয়েছে ঠায় বাঁধা, আর না খেতে পেয়ে ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট্ কচ্ছে। দুইতে যেতেই মহা বিপদ। তাদের একেই পেয়েছে ভয়ানক ক্ষিধে, তাতে আবার ঐ বিরক্ত, তারা শিং নেড়ে তেড়ে এল, পিছনের পা দিয়ে লাথি ঝাড়তেও কসুর করলো না। শেষ পর্য্যন্ত দুধতো পাওয়া গেলই না মাঝ থেকে ২।৪টা ঢুঁ খেয়ে ফিরতে হ'ল। রেগে মেগে এসে সে বল্ল, "ভাগ নেবার বেলায় সমান সমান, আর এখন গরুগুলি না খেয়ে মর্‌ছে কেন?" এবারও সেই একই উত্তর "বারে বারে মিছে বকে মর্চ্ছ কেন? আমাদের জিনিষ আমরা যা ইচ্ছে তাই করি। তাতে তোমার কি?" চুপ করা ছাড়া এর আর কোন উত্তর সে খুঁজে পেল না। রাগে গজ্ গজ্ করতে কর্‌তে সে গিয়ে ঘরে ঢুক্‌লো। তারপর রাত্রি হ'ল; বিছানায় শুয়ে একটু আরামের নিশ্বাস ফেল্‌তে যাবে, হায়রে হায়—তাতেও জঞ্জাল? বিছানাপত্র

যে সবই একেবারে জলে জল। সে আর স্থির থাক্‌তে পারল না। মারামারি বাধিয়ে একটা অনাসৃষ্টি করে তুল্‌বে মনে করল, কিন্তু পরক্ষণেই তার বিবেক ফিরে এল, সে বুঝতে পারলে ব্যাপারটা কি? তখন গ্রাম থেকে কয়েকজন মাতব্বর গোছের লোক ডেকে তাদের দিয়ে সম্পত্তিটা দুই ভাইয়ে সমান সমান ভাগ করে নিল। তারপর আর কোন গণ্ডগোল নেই। এখন তারা বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছে।

দান

(শ্রীঅনিলকুমার সরকার)

দিয়াছ অনেক প্রভু, তবু শুধু চাই,
কাঙালের খালি হাত সদা 'নাই' 'নাই'।
হে দয়ালু, যত চাহি মুঠি মুঠি দাও,
প্রভাত-শিশির সম আঁচল ভরাও ॥

অন্তর ভরিয়া নাথ পাঠাই প্রণাম,
তোমার উদ্দেশে কত গাহিলাম গান।
দয়াধার, আজি আমি এই দান চাই,
অপরকে ভালবাসা দিতে যেন পাই ॥

সাবধানতা

(শ্রীকীর্ত্তীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

নোটীশ

সাবধান, কেহই বিদ্যুতের তারে হাত দিও না—হাত দিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হ'বে। এ সত্ত্বেও যদি কেহ হাত দেয় তবে তাকে বিচারালয়ে নিয়ে আসা হবে ও তার অপরাধের বিচার হ'বে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

"ন্যায়ের সিংহাসন"

(কুমারী পুষ্পলতা গোস্বামী, বেতিয়া)

তোমরা অনেকেই হয় ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম শুনেছ। তিনি যেমন বীর ছিলেন তেমনই বিদ্বান্ ছিলেন। আবার তাঁর মতন ন্যায়বান্ রাজা ত কেউ ছিলেনই না। তাঁরই সম্বন্ধে আজ একটী গল্প বল্‌ব।

একবার দেবাধিপতি ইন্দ্রের সভাতে এই নিয়ে ঝগড়া আরম্ভ হল যে উর্ব্বশী আর রম্ভার মধ্যে কে বেশী সুন্দরী? খুব তর্ক-বিতর্ক চল্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু কিছুতেই এর মীমাংসা হল না। শেষটায় দেবতাদের মধ্যে হাতাহাতি হবার যোগাড় আর কি। ইন্দ্র ভাবলেন যদি শেষকালে হাতাহাতি আরম্ভ হয় তবে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। তখন নিরুপায় হয়ে ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যকে নিজের রাজ্যে ডেকে পাঠালেন। বিক্রমাদিত্যের মতন ন্যায় বিচার কেউ কর্‌তে পার্‌তেন না। তাঁর বিচারে সমস্ত দেবতারা সন্তুষ্ট হলেন। ইন্দ্র বিক্রমাদিত্যের বিচারে খুব খুসী হয়ে তাঁকে এক অদ্ভুত সিংহাসন দান কর্‌লেন।

এই সিংহাসনের অদ্ভুত কাহিনী শুন্‌লে তোমরা বোধ হয় আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে যাবে। যে প্রকৃত ন্যায়বান এবং লোকে যাকে ভালবাসে তারই শুধু সেই সিংহাসনে বস্‌বার অধিকার ছিল, অন্য কেউ এতে বস্‌তে পার্‌ত না। সিংহাসনটীতে বত্রিশটী পরী বসান ছিল। রাজা যখন এই সিংহাসনে এসে বস্‌তেন পরীগুলো তাঁকে নানা রকম ভাল ভাল গল্প শোনাত। রাজা বিক্রমাদিত্য এই সব গল্প শুনে খুব খুসী হতেন। বিক্রমাদিত্যের স্বর্গারোহণের পর সেই সিংহাসনটী নিজে নিজেই মাটীর মধ্যে ঢুকে গেল।

এর প্রায় এক শ' বছর পরে একদিন এক পোড়ো মাঠে কতকগুলো ছেলে খেলা কচ্ছিল। খেল্‌তে খেল্‌তে তাদের মধ্যে দুটো ছেলেতে মারামারি আরম্ভ করে দিলে। কিছুতেই তাদের ঝগড়া মেটে না। তখন সেই ছেলে দু'জনা তাদের ঝগড়ার মীমাংসার জন্য অন্য একটি ছেলের কাছে গেল। সেই ছেলেটি একটা উঁচু ঢিপিতে বসে মস্ত বড় বিচারকের মত বিচার কর্‌তে আরম্ভ করে দিলে। তার ন্যায্য বিচারে ছেলে দুটো খুব খুসী হয়ে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে নিলে। সেই

ছেলেটীর বিচার-বুদ্ধি দেখে সেখানকার অন্যান্য লোকেরাও খুব প্রশংসা কর্‌তে লাগ্‌ল। সেই থেকে সে মুলুকে সমস্ত লোক কিছু হলেই সেই ছেলেটীর কাছে মীমাংসা করাতে আস্‌ত আর তার বিচারে খুসী হয়ে প্রশংসা কর্‌তে কর্‌তে চলে যেত। ছেলেটী কিন্তু যে ঢিপিটির উপর বসে তার সঙ্গীদের ঝগড়ার মীমাংসা করেছিল ঠিক সেই ঢিপিটীর উপরে বসেই অন্যান্য সকলের বিচার কর্‌ত।

এখন এই কথা একদিন ভোজ-রাজার কাণে গেল। তিনি ভাব্‌লেন ছেলেটী কেবল ঐ ঢিপিটারই উপর বসে বিচার করে কেন?

একদিন ভোজ-রাজ এক বৃদ্ধ সর্দ্দারের কাছে এই বিষয় জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। সর্দ্দার বল্‌লে, "মহারাজ, আমার বোধ হয় ঐ ঢিপির নীচে দেবাধিপতি ইন্দ্র-প্রদত্ত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন আছে। সেজন্যই ঐ ছেলেটী ন্যায্য বিচার করতে পারে।" রাজা এ কথা শুনে সেই ঢিপি খুঁড়্‌তে আদেশ দিলেন। সেখানে সত্যি সত্যিই সেই বত্রিশ পরী-যুক্ত সিংহাসন পাওয়া গেল। পঞ্চাশ জন মিলে সেই সিংহাসন ভোজ-রাজার মহলে নিয়ে এল। যখন সেই সিংহাসনটীকে ঘসে মেজে পরিষ্কার করা হল তখন সেটী আয়নার মত ঝক্‌মক্ কর্‌তে লাগ্‌লো।

পরদিন রাজ-সভাতে রাজা ঐ সিংহাসনে বস্‌বেন ঠিক হোল। রাজা পোষাক-টোষাক পরে পরদিন যথা সময়ে রাজ-সভায় এসে হাজির হলেন। কিন্তু যেম্‌নি সেই সিংহাসনে বস্‌তে গেলেন, অম্‌নি পরীগুলো বলে উঠ্‌ল, "মহারাজ ঠিক ঐ খানে দাঁড়িয়ে থাকুন। একটুও নড়্‌বেন না।" পরীদের কথা শুনে রাজা ভয়ে ও আশ্চর্য্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। পরীগুলো রাজাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগল, "মহারাজ, আপনি কি এই সিংহাসনে বস্‌বার যোগ্যতা লাভ করেছেন? আপনি কি যথার্থ ন্যায়-কার্য্যই করে থাকেন? আপনি কি কখনও কুকর্ম্ম করেন নি? আপনার মন কি বালকের মত সরল?" রাজা ভোজ এতগুলো প্রশ্নের উত্তর কী যে দেবেন, ভেবে পেলেন না। তিনি বল্‌লেন, "সত্যই আমি এতে বস্‌বার যোগ্য নই।"

তারপর পরীগুলো পাখা মেলে সিংহাসন নিয়ে স্বর্গে উড়ে গেল। এই দেখে রাজার মন উদাস হয়ে গেল। তখন বৃদ্ধ সর্দ্দার বল্লে, "মহারাজ, রাগ কর্‌বেন না। এই সংসারে বিক্রমাদিত্যের মত ন্যায়-পরায়ণ রাজা আর নাই। কেউই তাঁর আসনে বস্‌বার উপযুক্ত নয়।"

ভোরের সাথী

(শ্রীবিজনকুমার জোয়ার্দ্দার, বালীগঞ্জ)

ওগো ভোরের নবীন সাথী,
খোল নয়ন গগন পানে।
ঊষার বাঁশী তান তুলেছে,
মেশে সে তান পাখীর গানে॥
নিশার নেশা ঘুচিয়ে দিয়ে
জাগো যখন রঙীন রবি.
আবেশ বশে চম্‌কে উঠে
কলম ধরে ভাবুক কবি।
নীল আকাশে রঙের খেলা
রক্ত-রঙের কমল যেন—
কে আর কবে পেয়েছে স্বাদ
নীলের মাঝে এরূপ হেন।
জগৎ ঘুরে যখন তুমি
ক্লান্ত চরণ ফেল ঘরে,
কাল সাঁঝের কাল চুলে
আঁখির আলো নেয়গো হ'রে॥

মায়ের শাস্তি

(শ্রীকানাইলাল দীর্ঘাঙ্গী, অমরদহ কাব্যকুঞ্জ, হাওড়া)

(১)

মাগো! আমার সোণার মাগো!
বল্ দেখি তুই মোরে,
এম্‌নি ক'রে আর কতকাল;
রাখ্‌বি ঘরে ধ'রে?

বদ্ধ গেহের রুদ্ধ বায়ে
থাক্‌বো কত কাল!
চিত্ত যে হয় বিত্ত হারা,
জম্‌তেছে জঞ্জাল।

(২)

উপরে ওই সুনীল আকাশ,
ওইখানে যাই উড়ে।
মেঘের দেশের সোণার রেণু,
ফেল্‌বো ধরায় ছুড়ে।
তারকাদের হার গড়ায়ে
পর্‌বো গলায় মাগো!
ধর্‌ছি দুটো পায়ে মা তোর
ধরে রাখিস্ নাগো!

(৩)

সাগর আছে ধরার শেষে
আকাশ মেশে তায়,
সেইখানে মা যাবই আমি
প্রাণ যে যেতে চায়।
সেই সাগরের শ্যামল তীরে
অচিন রাজার মেয়ে।
ব'সে আছে মাল্য হাতে
সত্যি যে পথ চেয়ে!
আমি যদি না যাই তবে
কর্‌বে অভিমান।
প্রতীক্ষা তার কর্‌তে বিফল
চাইছে নাকো প্রাণ।

(৪)

তার পরে আর বল্‌বো কত?
সেদিন সকাল বেলা,
যখন আমি ফুল-বাগানে।
কর্‌তে ছিলাম খেলা,
ফুল-পরী এক মিষ্টি হাসি'
বল্‌লে আমায় ডাকি,
সে আমারে কর্‌বে বিয়ে
পরিয়ে দেবে রাখী।

(৫)

চাঁদের দেশের রাণী সে যে,
সাতশো পরী তার—
গলায় তাদের দুল্‌ছে দোদুল
রামধনুকের হার।
তার দেশেতে যেতেই হবে
—হ'বেই হ'বে মাগো।
ছোট্ট অমন কোলটিতে তোর—
ধ'রে রাখিস্ নাগো।

(৬)

ওকি! মা তুই কাঁদিস্ কেন?
আচ্ছা বোকা মেয়ে!
কিচ্ছু তুমি বুঝ্‌তে নার
রইলে অবাক্ চেয়ে।
সত্যি কি আর যাব আমি?
দেখাই তোরে ভয়।
কিন্তু যদি আবার কাঁদিস
যাবই মা নিশ্চয়।

নদীর কথা

(শ্রীরমেশচন্দ্র দাস, এম্-এ, বি-এল্)

কিছু দিন আগে তোমাদিগকে যখন হ্রদের বিষয়ে বলিয়াছিলাম, তখনই কথা দিয়াছিলাম নদী সম্বন্ধেও কিছু বলিব। আজ সেই কথা শোন।

গোড়াতেই তোমরা হয় তো আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিবে, নদী উৎপন্ন হয় কি ভাবে আর নদীর এত জলই বা আসে কোথা হইতে?

অনেক রকম ভাবে নদীর উৎপত্তি হইতে পারে। প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ পাহাড়ের উপর যে বৃষ্টির জল পড়ে সেই জলই কোন ঢালু জায়গা দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ একেবারে নদীর চেহারা নিয়া নামিতে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্যের বড় বড় নদীগুলি—যেমন মহানদী, গোদাবারী, কৃষ্ণা, কাবেরী—এই ভাবে জন্মিয়াছে। বর্ষার সময় ইহাদের ভারী দাপট্! কূল ছাপাইয়া ভৈরব মূর্ত্তিতে হয় তো গ্রামের পর গ্রামই ভাসাইয়া লইবে। কিন্তু অন্য সময়ে গিয়া দেখ—শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেছে; কোথায় বা বিক্রম, জল নাই বলিলেই চলে।

নর্ম্মদা নদী। ইহারই সম্বন্ধে কালিদাস লিখিয়াছেন—
'রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপল-বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাম্।'

দ্বিতীয়তঃ খুব উঁচু পাহাড়ের বরফ গলিয়াও নদীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। পৃথিবীর যত বড় বড় বিখ্যাত নদী, প্রায়ই সৃষ্টি হইয়াছে এই ভাবে—যেমন ধর সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মিসিসিপি, আমেজান প্রভৃতি। এ নদীগুলি সর্ব্বদাই জলে পূর্ণ থাকে। তৃতীয়তঃ,

ঝর্ণা হইতেও নদী-প্রবাহের সুরু হয়। স্কট্‌ল্যাণ্ডের 'ডী' নদীটী এই ভাবে হইয়াছে। পাহাড়ের একটা ঝর্ণা হইতে ঝির্ ঝির্ করিয়া জল পড়িতেছে আর সেই জল পরে তর্ তর্ করিয়া নদী হইয়া বহিয়া চলিয়াছে। যেমন দেখিতে সুন্দর, তেম্‌নি উপকারী তার জল। আয়ার্ল্যাণ্ডের স্থানন্ নদীও এই রকমেই বাহির হইয়াছে।

এইবার একটা মজার কথা শোন। মাটী ফাটিয়া সেই ফাটলের মুখ হইতে হু হু শব্দে জল উঠিয়া তাহা নদীরূপে বহিয়া যায়—এমন কথা শুনিয়াছ কি? আসলে কিন্তু তাও হয়। মধ্য আফ্রিকায় গেলে এই ধরণের অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে পাইবে। কালিমাঞ্জারো একটা প্রকাণ্ড পাহাড়। এই পাহাড়ের তলাকার চওড়া ফাটল হইতে প্রচণ্ড বেগে জল উঠিয়া নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে। ভাবিয়া দেখ তো সে দৃশ্য কেমন অদ্ভুত, আর কতখানি সুন্দর!

নদী একবার বাহির হইলে সেই পথেই যে বরাবর চলিবে তার কিন্তু কোন মানে নাই। আজ নদী যেখান দিয়া বহিয়া যাইতেছে, পঞ্চাশ বছর পরে হয় তো তার বহু দূরে সরিয়া যাইবে। আমাদের এই বাংলা দেশে হামেশাই এ ব্যাপার চলিতেছে। এক কালে আমাদের কলিকাতার গঙ্গাই ছিল আসল গঙ্গা, এখন আসল গঙ্গা হইতেছে 'পদ্মা'। তবুও লোকের এম্‌নি কুসংস্কার, তারা পদ্মার পার হইতে রেল ভাড়া দিয়া কলিকাতায় আসে গঙ্গা-স্নানের জন্য। ইটালীতে 'পো' নামে একটি নদী আছে; এমন খাম্‌খেয়ালী নদী বোধ করি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। নদীটী নেহাৎ ছোট নয়, ক্রমাগতই সে গতি বদ্‌লাইতেছে। চীন দেশের হোয়াংহো নদীটীও কম নয়,—একজন সাধারণ লোকের জীবনের মধ্যেই সে যে কতবার পথ বদ্‌লায় তার ঠিক নাই। বাঁধ ভাঙ্গিয়া, তীর ছাপাইয়া গ্রামের পর গ্রাম নষ্ট করাই যেন তার কাজ। এই জন্যই এ নদীটীর আর একটী নাম "China's Sorrow" বা "চীনের আপদ্।"

এইবার তোমাদের নদীর বন্যার কথা বলিব। বর্ষাকালে অবশ্য প্রায় সব নদীতেই কম-বেশী কিছু বন্যা হয়, কিন্তু বড় বড় এমন কয়েকটা নদী আছে যাদের বন্যায় অসংখ্য গ্রাম ভাসিয়া যায়, অগুণ্‌তি লোক মারা পড়ে। প্রথমেই ধরা যাক্ আমেজান্ নদীর বন্যার কথা। এমন সুবিশাল, সুপ্রশস্ত ও সুগভীর নদী পৃথিবীতে আর কোথাও নাই—লম্বাতেও চার হাজার মাইল। প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি লইয়া আমেজান্ সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—পথে বিস্তর উপনদী আসিয়া তার সাথে মিশিয়াছে। এই উপনদীগুলিই এক একটা আমাদের গঙ্গা-সিন্ধুর চাইতে বড়। প্রতিদিন আমেজান্ সমুদ্রেরই গায়ে কি পরিমাণ জল ঢালিয়া দিতেছে তা শুনিলে তোমরা একেবারে হাঁ করিয়া থাকিবে। নদী যেখানে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে সেখান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত সাগরের জল আর লোণা নয়, সুস্বাদু হইয়া গেছে। এ হইয়াছে আমেজান্ নদীর দেওয়া সুস্বাদু জলের দরুণ।

রোজ কতখানি করিয়া জল আনিয়া দিলে সমুদ্রের লোণা জলকেও সুস্বাদু করিয়া তোলা যায় তার হিসাব কষ দেখি! সংক্ষেপে এই বলিলেই চলে যে নীল? মিসিসিপি ও লা প্লাতা এই তিনটী অতিকায় নদী মিলিয়া সমুদ্রে যত জল ঢালে তার দ্বিগুণ জল আমেজান একাই সাগরকে উপহার দেয়। সাধারণ অবস্থাতেই যে নদী এমন 'শান্ত-শিষ্ট', বর্ষার বন্যার সময় সে কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে একবার কল্পনার চোখে দেখ দেখি। তখন নদী আর নদী বলিয়া মনে হয় না। চারিদিকে মহাসমুদ্রের মত উন্মত্ত জলরাশি তাথৈ তাথৈ রবে নাচিতেছে—সে জল-সমুদ্রের সীমা নাই, কূল নাই। একজন ইংরাজ লেখক আমেজান্ নদীর বন্যা দেখিয়া লিখিয়াছেন—"আমেজানের বন্যা দেখিলে মনে হয় যে পৃথিবীর শেষ দিন, অর্থাৎ প্রলয় কাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে জল এক এক জায়গায় সমুদ্রের মত এমন আকার ধারণ করে যে সমস্ত ইংল্যাণ্ড্ দেশটার প্রায় সবখানিই তার তলায় ডুবিয়া যাইতে পারে।" তখন জল আর জল বলিয়া মনে হয় না, যেন এক ঘোর-দর্শন ক্রূর দৈত্য রাগে সংহার-মূর্ত্তি লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সত্যিই যেন পৃথিবীর শেষ দিন।

উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি নদীটীও কম যান্ না। প্রতি বছর বর্ষার পর এই নদীতে এমন বন্যা উপস্থিত হয় যে অসংখ্য গ্রাম প্লাবিত হইয়া যায় আজকাল বাঁধ বাঁধিয়া নদীকে অনেকটা সায়েস্তা করার বন্দোবস্ত হইতেছে বটে, কিন্তু তবুও মাঝে মাঝে ক্ষ্যাপাটে লোকের মত বাঁধ-টাঁধ ভাঙ্গিয়া নদী একেবারে দেশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। অমন যে ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক আমেরিকান্ জাত, তারাও বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারে না।

নীল নদের বন্যাও উল্লেখযোগ্য, তবে এই বন্যা যদি না থাকিত তা হইলে মিশর দেশ কিন্তু আজ আর এত উন্নত ও ঐশ্বর্য্যশালী হইতে পারিত না। এই বন্যাই মিশরদেশের প্রাণ, মিশরবাসীদের ভরসা। ব্যাপারটা দেখিবার বস্তু! কোথাও কিছু নাই, হঠাৎ দুই দিকের শত শত মাইলব্যাপী মরুভূমি একেবারে জলে ডুবিয়া গেল।

আমাদের ভারতবর্ষেও এমন দু'একটী নদী আছে যা বর্ষাকালে প্রবল হইয়া ভারী উৎপাৎ করে। এই তো কিছুদিন আগে, সিন্ধু আর বর্ম্মার ইরাবতী কি ভয়াবহ কাণ্ডটাই না করিল!

পৃথিবীর পাঁচটি মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সব চাইতে বড় বটে, কিন্তু বড় নদী বেশী গিয়া পড়িতেছে আট্‌লান্টিক মহাসাগরে। আমেজান, কঙ্গো, পারানা, লা প্লাতা, সাঁ ফ্রান্‌সিস্ কো, এ গুলি আট্‌লান্টিকে পড়িতেছে। আমেজানের উপনদী গুলাই তো এক একটা দারুণ! প্রশান্ত মহাসাগরে বড়র মধ্যে পড়িতেছে ইয়াংসিকিয়াং, হোয়াংহো ও আমুর। কোন্ নদী কত বড় তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া গেল।

নদীর নাম	কত মাইল্	কোন্ মহাদেশে	নদীর নাম	কত মাইল্	কোন্ মহাদেশে
আমেজান্	৪,০০০	দক্ষিণ আমেরিকা	ম্যাকেনজি	২৩০০	উত্তর আমেরিকা
নীল	৩৬০০	আফ্রিকা	লা প্লাতা	২৩০০	দক্ষিণ আমেরিকা
ইয়াংসিকিয়াং	৩৪০০	এসিয়া	ইউকোন্	২০০০	উত্তর আমেরিকা
ইনিসি	৩৩০০	এসিয়া	আরকান্সাস্	২০০০	ঐ
* { মিসিসিপি	৩১৬০	উত্তর আমেরিকা	মাদেরা	২০০০	দক্ষিণ আমেরিকা
{ মিসৌরি	৩০০০	ঐ	সেন্ট্ লরেন্স	১৮০০	উত্তর আমেরিকা
কঙ্গো	৩০০০	আফ্রিকা	রিও দেল নর্ট	১৮০০	আমেরিকা
লেনা	৩০০০	এসিয়া	সাঁ ফ্রান্সিস্কো	১৮০০	ঐ
নিগার	৩০০০	আফ্রিকা	ডানিয়ুব	১৭২৫	ইয়োরোপ
ওবি	২৭০০	এসিয়া	ইউফ্রেটিস্	১৭০০	এসিয়া
হোয়াংহো	২৬০০	ঐ	সিন্ধু	১৭০০	এসিয়া (ভারত)
আমুর	২৫০০	ঐ	ব্রহ্মপুত্র	১৬৮০	এসিয়া (ভারত)
পারাণা	২৪৫০	দক্ষিণ আমেরিকা	জাম্বেসী	১৬০০	আফ্রিকা
ভল্গা	২৪০০	ইয়োরোপ	গঙ্গা	১৫০০	এসিয়া (ভারত)

আমেজান্ নদী সম্বন্ধে গুটি দুই কথা বলিয়া এবার তোমাদের কাছ হইতে বিদায় লইব।

আমেজান্ ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। চার হাজার মাইল ছুটিয়া আসিয়া আট্লান্টিকের সঙ্গে যেখানে আমেজান আসিয়া মিলিয়াছে সে মোহানার যুড়ি এ পৃথিবীতে নাই। নদীর দু' পাশের জমি অসম্ভব রকম নীচু এবং সেই জন্যই নদীর গতি অতি প্রশান্ত; নদী চওড়াও এই জন্যই এত বেশী, গভীরও ততোঽধিক। নদীর মধ্যে যে কত রকমের মাছ, কত কুমীর ও কত জাতের সাপ আছে, কে তার ইয়ত্তা করে?

নদীর দুই ধারের জমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। কিন্তু বহু দূর ব্যাপিয়া তার উপর ঘোর অরণ্য। এই সব জঙ্গলে এত বড় বড় গাছ এমন ঘনভাবে জন্মিয়াছে যে মাটীতে সূর্য্যের আলো পড়িতে পায় না; সেই জন্য জঙ্গলের মধ্যে দিনের বেলাও ঘোর অন্ধকার আর মাটী বছরের সব সময়েই ভিজা, সঁ্যতসেঁতে। এই সব জঙ্গলে এত বড় ও এত ঝোপালো গাছ দেখিতে পাওয়া যায় যে দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়; আমাদের দেশের বট বা অশ্বত্থ গাছও অত ঝোপালো ও অত বড় নয়। এমন গাছও নাকি আছে যাদের বয়স হাজার দু' হাজার বছরেরও বেশী। এই সব গাছের তলায় কত রকমের বন্য লতানো গাছ ও আগাছা জন্মিয়াছে; লতাগুলি এমন ঘনবদ্ধ-ভাবে গাছগুলিকে জড়াইয়া উঠিয়াছে ও এক গাছ হইতে আর এক গাছে লতাইয়া গিয়াছে যে মানুষ ত দূরের কথা বনের পশুপক্ষীরাও ইহার মধ্য হইতে পথ করিয়া যাইতে পারে না। জমী এত অসম্ভব উর্ব্বরা, এত পলি মাটীতে পূর্ণ কিন্তু কেহই এখানে চাষবাস করে না; কারণ এমন শক্তি বা সাহস কারও

* কেহ কেহ মিসিসিপি ও মিসৌরিকে এক নদী ধরেন; সে হিসাবে লম্বায় ইহা সব চাইতে বড়। তবে চওড়া, গভীরতা, জলের পরিমাণ ইত্যাদিতে আমেজান্ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

নাই যে এই জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করে। আফ্রিকার জঙ্গলও বুঝি এত ভয়ঙ্কর নয়। এই জঙ্গলের তলায় এত বিষাক্ত সাপের বাস যে ভাবিতেও ভয়ে সর্ব্ব শরীর কাঁটা দিয়া ওঠে। গাছের তলায় তলায়, ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে, লতাপাতার অন্তরালে, আশে পাশে চতুর্দ্দিকে লাখে লাখে বিষাক্ত সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া পরস্পর পরস্পরকে জড়াইয়া তাল পাকাইয়া শুইয়া আছে। সাপের এমন ভয়ঙ্কর জোট্ আর কোথায় আছে জানি না। তারপর কুমীর, গিরগিটি, মাকড়সা, রাক্ষুসে গেছো কাঁকড়া; এই সব কাঁকড়া ও মাকড়সাদের যে কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তা তোমরা কিছুতেই ভাবিয়া উঠিতে পারিবে না। এ মাকড়সা জাল পাতিয়া পাখী ধরে আর তাদের খাইয়া জীবন ধারণ করে। বন্য পশুর ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া রক্ত চুষিয়া খায়। বনের মধ্যে চারিদিকেই নদী, নালা, খাঁড়ি, জলা—সমস্তই মাছে ও কাঁকড়ায় পূর্ণ কিন্তু খাইবার কেহই নাই। আমেজান্ নদী বাস্তবিকই পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার।

ত্যাগ

(শ্রীগুরুগৌরব রায়)

দু'তিন বছর এক সঙ্গে অজন্মা হওয়ায় এবারে জনসাধারণ একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছিল অন্নকষ্ট এত ছড়িয়ে পড়্ছিল যে শীগ্রই অনেকের কপালে এক বেলা ভাতও জুট্বে বলে বোধ হয় নি। রাজা ছিলেন কিন্তু খুবই ভাল লোক; এ বছরের খাজনা তিনি রেহাই দিলেন আর হুকুম কর্লেন যে প্রত্যেক চাষাকে তার নিজের দরকার মত সামান্য কিছু বাদে বাকী ফসল যা কিছু আছে তা সবই তাঁর কাছে জমা দিতে হবে, এর দাম অবশ্য তিনি যথেষ্টই দেবেন। যাদের একদম কিচ্ছু নেই তারাও রাজার কাছ থেকে নিয়ম মত ফসল নিয়ে যাবে। রাজার হুকুম না মান্লে গোলমাল হতে পারে এজন্যও আর এই সুযোগে দু' পয়সা করে নেবার চেষ্টায় বড় বড় আড়ৎদারেরা যে যা পার্ল রাজার কাছে বেচে গেল। কিন্তু যারা মধ্যবিত্ত তারা ভবিষ্যতের আরও দুর্দ্দিনের কথা ভেবে কিছুই দিল না। আর যারা গরীব তাদের ত কথাই নেই।

এই গ্রামেতেই ছিল নমুরা নামে এক চাষী। বয়স তার ষাটের কাছাকাছি হবে, কিন্তু আজও সে নিজের হাতে চাষ করে খায়। আর তা না কর্লেই বা চল্বে কেমন করে? এক দিন তার অবস্থা ছিল ভাল, গোলা ভরা ধান ছিল তিনটি জোয়ান ছেলেও ছিল আর তার ওপরে ছিল তার গায়ে ভীষণ ক্ষমতা। তারা চার জনে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা কিছুই না মেনে অক্লান্ত পরিশ্রমে মাঠের কাজ কর্ত,

সময় মত তাঁতে বুনত গাম্‌ছা আর তাদের ঠাকুরদার আমলের একটা ভাঙা কাঁসর বাজিয়ে বুদ্ধদেবের নাম গান কর্‌ত। তবে সন্ধ্যে বেলা তারা পাড়ার লোকের সঙ্গে গল্প-গুজব করে সারা দিনের খাটুনির পর মনটাকে একটু হাল্‌কা করে নিত।

তারপর এক দিন রুষের সঙ্গে বাধ্‌ল যুদ্ধ। বুড়োর দুই ছেলে সৈনিকের কাজ নিয়ে বাড়ী ছেড়ে গেল, কিন্তু ফিরে তারা আর কেউই এল না। তারপর সেবারে প্লেগ এল তাদের গাঁটাকে উজাড় করে দিতে। নমুরার একমাত্র ছেলে কিমুরা গেল প্লেগ-রুগীদের সেবা কর্‌তে। প্লেগ কিন্তু কিমুরাকে ছেড়ে দিল না—তাকেও বুড়োর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। বুড়োর শিথিল হাতের বাঁধন ছিঁড়ে তার তিনটি ছেলেই অজানার পথে পাড়ি দিল—কোন ওজর আপত্তিতে কাণ দিল না। বুড়োর নিজের বল্‌তে আর কেউই রইল না। আজ তার ছিল মাত্র তিন বস্তা চাল। সে সব কয়টিই রাজাকে দিয়ে দিল—নিজের জন্য কিছুই রাখ্‌ল না। রাজার লোকেরা দাম দিতে চাইল, সে কিন্তু কিছুই নিল না, বল্‌ল—"আমার মুখের ভাত আমি নিজে ইচ্ছে করে দিচ্ছি, এর দাম তোমরা কেন তোমাদের রাজাও দিতে পার্‌বেন না।" রাজার লোকেরা আশ্চর্য্য হয়ে রাজার কাছে এই বুড়োর কথা বল্‌তে চল্‌ল।

তারা চলে গেলে বুড়ো একবার প্রাণ ভরে হাস্‌ল, একবার তার ভাঙা শরীরটাকে খাড়া করে দাঁড় করাতে চেষ্টা কর্‌ল—কাঁধ থেকে তার একটা বোঝা নেমে গেছে এই ভেবে সে আনন্দে বিভোর হয়ে উঠ্‌ল। তার সকল কাজ আজ ফুরিয়েছে—সে আজ পাখীর মত উদার আকাশের তলে মুক্ত। ক্ষিদেয় তার নাড়ী জ্বল্‌ছে, সেদিকে কিন্তু তার ভ্রূক্ষেপই নেই। একদিন, দু দিন এম্‌নি করে তিন দিন কাট্‌ল, বুঝি সে আর পারে না। সে তার নিজের জীবন নিজের হাতে দেশ-মাতৃকার পায়ে অর্ঘ্য দিয়েছে, কি করে ফেরৎ চাইবে? না—না—আর যে সহ্য হয় না। অনাহারের ব্যথা যে এত ভয়ানক সে ত আগে বোঝে নি। চাই—ভাত চাই! দু মুঠো ভাত তার চাই-ই চাই···

শূন্য মরায়ের ভেতর সে উন্মত্ত হয়ে ছুটে গেল—কৈ নিজের জন্যে সে ত কিছুই রাখে নি! একবার রান্না ঘরে, একবার শোবার ঘরে ছুটাছুটি কর্‌তে লাগ্‌ল—কোথাও কি দু মুঠো চালও পড়ে নেই? সে চীৎকার করে কেঁদে উঠ্‌ল "দু মুঠো ভাত,—ওগো, দু মুঠো ভাত আমায় দাও—।"

হঠাৎ তার মনে পড়্‌ল—আস্‌ছে বছরের বীজের জন্যে সে এক বস্তা ধান লুকিয়ে রেখেছে। আনন্দের আতিশয্যে সে লাফিয়ে উঠ্‌ল। তারপর বস্তাটাকে পেড়ে এনে ঢেঁকির কাছে গেল। একটা দা নিয়ে সে বস্তার মুখটা কাট্‌তে যাচ্ছিল—অম্‌নি তার কাণে এল একটা রুদ্ধ হাহাকার—তার নিজের কথার প্রতিধ্বনি বোধ হয়। তখনও তাকে ঘিরে কাঁদ্‌ছিল—"দু মুঠো ভাত······ওগো

দু মুঠো ভাত।" সে চম্‌কে উঠ্‌ল। দেখ্‌ল সারা দেশ তৃষিত ব্যগ্র আঁখিতে তার ঐ ধানের বস্তাটার দিকে চেয়ে কাঁদ্‌ছে···"দু মুঠো ভাত—ওগো, দু মুঠো ভাত আমাদের দাও।" সে দা ফেলে তার দুর্ব্বল বুকখানাকে দু' হাত দিয়ে চেপে ধর্‌ল—একবার আকাশের দিকে চাইল—ওকি! ঐ যে তার তিন ছেলে, হ্যাঁ তারাই ত! ঐ যে তার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বল্‌ছে—"আমরা তোমার ছেলে; দেশের কাজে প্রাণ দিয়েছি, আর তুমি? নমুরা ওপরে তাকাতে পার্‌ল না, একটা ধিক্কারে তার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল।

ওদিকে রাজা যখন শুনলেন যে নমুরা চালের দাম নেয়নি—তিনি ত রেগে আগুন। বল্লেন—"তার দান আমি নোব?—এমনই দুর্ভাগা আমি যে একটা চাষা আমাকে দান নেওয়াবে।" কর্ম্মচারীদের বল্লেন—"যাও এখুনি তার চাল ফেরৎ দিয়ে এস। আর সে যা চায়—একটা সহরের অধিকার যদি চায় তাও দিতে স্বীকার করে আমাকে ঋণমুক্ত কর।" তাঁর লোকেরা নমুরার বাড়ীতে তার চাল ফেরৎ দিতে এল। সেখানে তারা দেখ্‌ল—একবস্তা ধানের ওপর লোকটা ঘুমুচ্ছে। মুখ তার সাদা হয়ে গেছে কিন্তু চোখের কোণে কি যেন এক অপূর্ব্ব আনন্দের পরশ—মুখে তার স্নিগ্ধ হাসির রেখা লেগে রয়েছে। শুধু একটা সহর নয়, রাজার সমস্ত রাজ্য দিতে স্বীকার করে নমুরাকে কেউ আর জাগাতে পার্‌ল না। তার তিন বস্তা চালের দাম সারা পৃথিবীতে মিল্‌ল না।*

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

সত্যি ?

কিন্তু ভড়্‌কাইবার ছেলে রোল্যাণ্ড্ নয়, সে তখন সাড়ম্বরে তার ভবিষ্যৎ নেটাল-জীবনের অতি সরস-মধুর এক বর্ণনা দিবার উপক্রম করিল। কিন্তু কে শোনে সে বর্ণনা? (লেডি আগাষ্টা মাথা নাড়িয়া, হাত কচ্‌লাইয়া এবং পরিশেষে চোখ হইতে অজস্র জল বাহির করিয়া যে কথাগুলি বলিলেন তার মর্ম্ম এই যে এতটা বয়স পর্য্যন্ত শান্তি নামক কোন জিনিষই তিনি পাইলেন না। তাঁর ছেলেমেয়েরা হইয়াছে শত্রুরও বাড়া—বেশ, তারা এক কাজ করুক না কেন, একটা ধারাল ছুরি তাদের মায়ের গলায় বসাইয়া দিক্—সমস্ত আপদের শান্তি হইয়া যাইবে। বলিয়াই তিনি ফের হু হু করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।)

রোল্যাণ্ড্ রুমাল দিয়া পরম যত্নে জননীর চোখের জল মুছাইয়া দিল; তার পর আদরের

* জাপানী গল্প থেকে।

সঙ্গে তাঁর হাত দুটি ধরিয়া বলিল, "তুমি একটু ঠাণ্ডা হয়ে আমার সবগুলো কথা শোন মা ; শুন্‌লে পরে বুঝ্‌তে পার্‌বে যে তোমার রোল্যাণ্ডের মত এমন একটী জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান্ ছেলে আর জন্মায়নি। পোর্ট নেটালে কি আর আমি অম্‌নি যেতে চাইছি—যাচ্ছি ক্রোড়পতি হয়ে ফিরে আস্‌তে! তুমি জাননা মা, সে কী দেশ! নেংটি পরে সেখানে গিয়ে সবাই নামে, আর যখন ফিরে আসে তখন একেবারে লাল!"

"তবে যে শুনি সেখানে গিয়ে সকলে সর্ব্বস্ব খুইয়ে আসে? না না, রোল্যাণ্ড্ অত দূরে তোমায়..."

"হ্যাঃ—খুইয়ে আসে না আরো কিছু! কোন্ পণ্ডিত তোমায় বলেছে? ভুল, ভুল, একদম্ ভুল। টাকা টাকা করে এই যে রাত্তির-দিন কাৎরানি সইতে হচ্ছে, এর ওর কাছে হাত পাত্‌ছি, গ্যাল্‌ওয়ে মুট্‌কো খাটিয়ে পাৎলা সল্‌তেটি বানিয়ে তুল্‌ছে—এ সমস্তের কিছুই থাক্‌বে না—একেবারে পকেট্ বোঝাই করে টাকা নিয়ে আস্‌ব। জান মা বড়লোক হয়ে প্রথমেই আমি কি কিন্‌ব? তোমার জন্যে একজোড়া খাঁটী হীরার দুল।"

লেডি আগাষ্টা দুঃখের মধ্যেও একটু হাসিয়া ফেলিলেন, বলিলেন "পাগল ছেলে! তখন কি আর আমার দুল্ পর্‌বার বয়েস থাক্‌বে?"

"খুব থাক্‌বে। ভা-রী তো সময় লাগ্‌বে বড়লোক হতে! যাব, ব্যবসা ফাঁদ্‌ব, টাকা লুঠ্‌ব—চলে আস্‌ব। ক'দিনই বা! যাবার খর্‌চা যোটাব কোত্থেকে? ভালরে ভাল তোমার ঐ লর্ড্ ভাইটী—ক্যারিক্‌মামা আছেন কি কর্‌তে? সোজা লণ্ডন গিয়ে তাঁকে বল্‌ব নেটাল যাচ্ছি, চলুন কিছু সদয়-পত্র করেনি। সঙ্গে দোকানে গেলে জিনিষ-পত্রের দাম তিনিই দিয়ে দেবেন। রাহাখরচটাও তাঁর কাছ থেকেই আদায় কর্‌ব—সব আঁট ঘাঁট আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে।"

অনেক রাত হইয়া গিয়াছিল, লেডি আগাষ্টা তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আজ শোও গিয়ে, কাল ফের কথা হবে। আমি কিন্তু মত দিইনি এখনো, সে কথা মনে রেখ।"

উদাস কণ্ঠে রোল্যাণ্ড্ জবাব দিল, "মত না দিলে অগত্যা অমতেই যেতে হবে। যাওয়া যখন ঠিকই তখন তো আর তা শুধু মতের জন্যে ঠেকে থাকতে পার্‌বে না!" একটু থামিয়া আবার বলিল, "এখান থেকে সরে পড়্‌বার আরো একটা গুরুতর রকমের কারণ আছে, তবে সে কারণটা এখন আপাততঃ তোমাদের কাছে উহ্যই থাক্।"

পর দিন মৎলবটা রোল্যাণ্ড্ ঠারে ঠোরে গ্যাল্‌ওয়েকেও জানাইয়া দিল ; সে ভদ্রলোক কিন্তু কথাটাকে বিশ্বাসের কোণেও আনিলেন না। বরঞ্চ বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "কোথায় যাবে বল্লে—নেটাল? হুঁ তা যাবে ছাড়া কি? আজ নেটাল, কাল জাপান, পরশু দিন হয়তো

মঙ্গল গ্রহেই যাবার সাধ যাবে! তোমার সাধের কি আর অন্ত আছে? তা বাপু, যতক্ষণ রওনা না হচ্ছ ততক্ষণ যেন হাতের ঐ দলীলগুলো সেরে ফেল্লেই ভাল হয়।"

"তা সার্‌ছি। কিন্তু পরে যেন এ বলে দোষ দেবেন না যে ছোঁড়া আমায় খবর না দিয়েই কাজ ফেলে পালিয়েছে!"

গ্যাল্‌ওয়ে পুনরায় বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "উঁহু, তা দেব না।"

কিন্তু গ্যাল্‌ওয়ে স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই, লেডি আগাষ্টাও আশঙ্কা করেন নাই যে এই ঘটনার কয়েক দিনের পরেই রোল্যাণ্ড্ নেটাল যাইবার উদ্দেশ্যে লণ্ডন-অভিমুখে সত্যি সত্যিই রওনা হইয়া পড়িবে। ভোরের আলো তখনও ভাল করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই, শুধু একটী সুট্‌কেস্ মাত্র সম্বল করিয়া রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক তার আপিসের সহকর্ম্মী জেঙ্কিন্সের কাছে বিদায় নিতে তাহারই বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। একটু বাদে কাঠের সিঁড়িতে দুম্ দুম্ করিয়া দুরমুজ্ ঠোকার শব্দ হইতেই মিসেস্ জেঙ্কিন্স্ গলা বাড়াইয়া দেখে, সিঁড়ির অস্তিত্ব কোন মতে বজায় রাখিয়া রোল্যাণ্ড্ ইয়র্ক্ হৈ হৈ করিয়া নামিয়া যাইতেছে।

লণ্ডন-গামী ট্রেণ তখন ষ্টেশনের প্লাট্‌ফর্ম্মে আসিয়াছে। টিকিট্‌টি কাটিতে যা দেরী, তার পরেই মিষ্টার রোল্যাণ্ড্ এক ফার্ষ্ট ক্লাশের কাম্‌রায় গিয়া চাপিয়া বসিল। লর্ডের ভাগ্নে, যার-তার সঙ্গে থার্ড্ ক্লাশে যাওয়া কি তার পোষায়?

কি একটা বিশেষ কাজে সেদিন প্রাতেই হামিশের ষ্টেশনে আসার দরকার পড়িয়াছিল, রোল্যাণ্ড্ লণ্ডনের গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে দেখিয়া সে বিস্ময় বোধ করিল ; দ্রুত পদে গাড়ীর জানালার দিকে সে আগাইয়া গেল, কিন্তু গাড়ী তখন নড়িতে সুরু করিয়াছে। রোল্যাণ্ড্ কোন মতে মাথা গলাইয়া তাকে জানাইয়া দিল যে 'মুট্‌কো গ্যাল্‌ওয়েকে' কদলী দেখাইয়া সে বড় লোক হইতে নেটাল চলিয়াছে। সেখানে গিয়া ব্যবসা ফাঁদার ইচ্ছা আছে।

রোল্যাণ্ড ইয়র্কের এই হঠাৎ অন্তর্ধানে দুটী ব্যক্তি বড়ই মুষড়িয়া পড়িলেন। প্রথম, তার মা লেডি আগাষ্টা ; তিনি কেবল ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতেই বাকী রাখিলেন। দ্বিতীয়, এটর্ণী গ্যাল্‌ওয়ে ; তাঁর মনে হইল উপরের আকাশটা বুঝি ভাঙ্গিয়া সমুদায়ই ঝপ্ করিয়া তাঁর মাথার উপর পড়িয়াছে। হতভাগা যে মরিতে সত্যি সত্যিই পোর্ট্ নেটাল যাইবে, এ কে কবে ভাবিয়াছিল? অবশ্য বড় লোক হইবার সাধ শীগ্‌গিরই মিটিবে, সে ভাবনা নাই, কিন্তু তাঁর এখন কী উপায় হইবে! যে অফিসে তিন-তিন জন কেরাণীও খাটিয়া কূল পাইত না, একা তিনি তার কয় দিক্ সাম্‌লাইবেন? হঠাৎ দু'এক দিনের মধ্যে বিশ্বাসী উপযুক্ত লোকই বা তিনি জোটান কোথা হইতে? অথচ জরুরী কাজ রাশি রাশি পড়িয়া। নিতান্ত অপ্রসন্ন এবং বিরক্ত মুখে সম্মুখের

বারান্দার উপর তিনি পায়চারি করিতেছিলেন, এমন সময় সাশ্চর্য্যে দেখিলেন, একটা ঘোড়ার গাড়ী আসিয়া তাঁরই আপিসের সাম্‌নে দাঁড়াইল। গাড়ীখানা আসামাত্র ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোক টক্ করিয়া নামিয়া পড়িয়া গাড়ীর অপর আরোহী এক জীর্ণ শীর্ণ লোককে অতি সন্তর্পণে হাত ধরিয়া নামাইয়া আনিল। সেদিকে নজর পড়িতেই গ্যাল্‌ওয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। মানুষ যে কোন অবস্থাতেই অমন রোগা এবং অস্থিচর্ম্মসার হইতে পারে তা বুঝি তিনি ভাবিতেও পারেন নাই। আরোহী দুই জন আরও নিকটে আসিলে কিন্তু গ্যাল্‌ওয়ের মুখ দিয়া এক অস্ফূট আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল—য়্যাঁ, তাঁরই অফিসের কেরাণী জেঙ্কিন্সের আজ এই অবস্থা হইয়াছে? তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া জেঙ্কিন্সের কাঁধে হাত রাখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি কহিলেন, "এমন হয়ে গেছ জেঙ্কিন্স্? তা এ শরীর নিয়ে, তুমি বাড়ীর বার হয়েছ যে!"

গাড়ী হইতে নামিয়া এইটুকু আসার পরিশ্রমেই জেঙ্কিন্স্ হাঁফাইতেছিল, তার হইয়া জবাব দিল তার স্ত্রী; কহিল, "না এনে কি করা বলুন মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে! সেই ভোর হ'তে চেঁচাতে সুরু করেছে, 'নিয়ে চল গাড়ী করে আমায় আপিসে—মিষ্টার রোল্যাণ্ড্ চলে গেছেন, আপিসে দ্বিতীয় ব্যক্তি নেই, মুনিব একেবারে হাবুডুবু খাবেন যে! যেটুকু পারি সেটুকু কাজই আমি গিয়ে কর্‌ব।' দাব্‌ড়ানি দিয়ে কি থামিয়ে রাখ্‌তে পারি? শেষটায় ভাব্‌লাম্, না নিয়ে গেলে হয় তো ভেবে ভেবে হার্টই ফেল্ করে বস্‌বে। তাই নিয়ে আস্‌তে হল।"

গ্যাল্‌ওয়ের চোখে জল আসিয়া পড়িল। এমন প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী তিনি পাইয়াছিলেন, ঈশ্বর জানেন তাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিবেন কিনা! কোমল স্বরে বলিলেন, "কিন্তু এ শরীরে তোমায় আমি কিছুতেই স্বার্থপরের মত খাটাতে পার্‌ব না জেঙ্কিন্স্, তুমি এ গাড়ীতেই বাড়ী ফিরে যাবে।"

"আপনিই বা ক'দিকে যাবেন স্যর? আর কিছু না পারি. আপিস্‌টাও তো আমি আগ্‌লে রাখ্‌তে পার্‌ব?" কথা কয়টা বলিয়াই কিন্তু জেঙ্কিন্স্ প্রবল বেগে কাসিতে লাগিল।

দুই জনে কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় আর্থার আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোরে হামিশের মুখে রোল্যাণ্ডের নেটাল-যাত্রার খবর শুনিয়াই গ্যাল্‌ওয়ের অসহায় অবস্থাটা মনে মনে সে কল্পনা করিয়া লইয়াছে। পুরানো মনিব—তাঁর এই অসময়ে নিজে যাচিয়া গিয়া সাহায্য করাটাই যে তার কর্ত্তব্য সঙ্গে সঙ্গে সে কথাও মনে জাগিয়াছে। নিজের আহত গর্ব্ব দু'একবার যে মাথা ঠেলিয়া না উঠিতে চাহিয়াছে এমন নয়, কিন্তু সংযমী আর্থার সবলে তাকে দাবাইয়া দিয়া এখন এটর্নী-আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

জেঙ্কিন্সের দিকে নজর পড়িতে আর্থারও চম্‌কাইয়া উঠিল। গ্যাল্‌ওয়ে তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ আর্থার, দেখ। আমার দুটী কর্ম্মচারী, তার মধ্যে একজন আমার মাথায় ডাণ্ডা

মেরে বড়লোক হতে পোর্ট্ নেটাল্ যাত্রা করেছে, আর অপর জন তাইজন্যে শরীরের হাড় ক'খানা শুধু নিয়ে কাজ কর্‌তে এসেছে। দেখ, একটা দেখ্‌বার জিনিষ বটে!"

আর্থার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "সেইজন্যেই আমি এসেছি। জেঙ্কিন্স্ আর কিছু এ শরীরে কাজ কর্‌তে পার্‌বে না। যত দিন না আপনি আর একজন উপযুক্ত লোকের সন্ধান পাচ্ছেন ততদিন আপনার আপিসের সমস্ত কাজই আমি করে দিয়ে যেতে রাজী আছি।"

গ্যাল্‌ওয়ে যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। এমন সময় আর্থারের মত লোক মেলা যে সৌভাগ্যের চূড়ান্ত! প্রকাশ্যে বলিলেন, "ধন্যবাদ আর্থার! আমার আর অন্য উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন নেই, তুমি বরাবরকার মতই এখানে চাকরী কর্‌বে।"

আর্থারের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে বলিল, "তার দরকার হবে না স্যর, এর ভেতর ভাল লোক একজন যোগাড় করে নিতে আপনি অবশ্যই পার্‌বেন।"

গ্যাল্‌ওয়ে আর অনাবশ্যক কথা বাড়াইলেন না জেঙ্কিন্স্‌কে সযত্নে গাড়ীতে তুলিয়া বিদায় দিয়া তিনি ও আর্থার কাজের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন।

বাড়ীর দরজায় আসিয়া জেঙ্কিন্সের গাড়ী যখন থামিল তখন তারই পাশ দিয়া এঞ্জিনের বেগকেও তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল ষ্টিফেন বাইওয়াটার। ঢং ঢং করিয়া গীর্জ্জার ঘণ্টা বাজিতে সুরু করিয়াছে, লেট্ হইবার ভয়েই ভায়ার এই অনুকরণীয়, অলৌকিক উৎসাহ।

মুহূর্ত্ত মধ্যে কিন্তু এঞ্জিনের বেগ থামিয়া গেল, জেঙ্কিন্সের সে মূর্ত্তি দেখিয়া বাইওয়াটার একেবারে থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। সাম্‌নে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এ কাকে দেখ্‌ছি? জেঙ্কিন্স্‌কে, না তার ভূতকে?"

জেঙ্কিন্স্ মৃদু হাসিয়া জবাব দিল, "না মাষ্টার বাইওয়াটার, আমি নিজেই বটি। গুড্ মর্ণিং" ধীরে ধীরে সে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া গেল।

বাইওয়াটার কিন্তু আর এক পাও নাড়িতে পারিল না; কোথা হইতে একটা উড়ো চিন্তা আসিয়া তার সমস্ত চেহারাটাকেই যেন বদ্‌লাইয়া দিল। নির্ভীক বাইওয়াটার—সহস্র বিপদ্‌কেও যে তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে পারে, পলকের মধ্যে তারই মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল কেন?

জেঙ্কিন্সের পিছন পিছন সে-ও ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল, তার পর তাকে একা নিরালায় পাইয়াই প্রশ্ন করিয়া বসিল, "হ্যাঁহে জেঙ্কিন্স্, সেই যে সে রাত্রে কেচের সঙ্গে তুমি গীর্জ্জার হাতায় আট্‌কা পড়ে গিয়ে শেষটায় মাথায় দারুণ চোট্ পেয়ে মূর্চ্ছা গেলে, সেই থেকেই

কি তোমার এই দারুণ অসুখের সুরু ? তা'হলে কিন্তু তোমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্যে দায়ী আমি, কেননা সে চক্রান্তের মূলই ছিলাম আমি।

সপ্রশংস ভাবে এই হৃদয়বান্ অথচ নির্ভীক ছেলেটীর পানে চাহিয়া জেঙ্কিন্স্ বলিল, "না না মাষ্টার বাইওয়াটার, সে অসুখ তো আমার ক'দিন বাদেই সেরে গেছ্‌ল। আর তা ছাড়া সে ব্যাপারটা ঘটাতে আমার অন্য ভাবে যা উপকার হয়েছে তার জন্যে রোজই আমি একবার করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই।"

"তা তুমি একবার কেন পাঁচবার ধন্যবাদ দিও, কিছু আপত্তি নেই। শুধু আমার জন্যে তোমার এ দশা না হ'লেই হোল···আরে, এটা কিহে এখানে" বলিতে বলিতে বাইওয়াটার তাকের উপর হইতে একটা ভাঙ্গা বোতলের নীচেকার অংশ উঠাইয়া লইল। দেখিলেই বোঝা যায় সেটা এককালে ছিল কালীর বোতল, তবে চেহারাটা একটু অদ্ভুত। তার চোখের দৃষ্টি তখন অস্বাভাবিক রকম প্রখর হইয়া উঠিয়াছে।

জেঙ্কিন্স্ অত-শত লক্ষ্য করিল না, কহিল, "গীর্জ্জের কবরখানায় পড়ে ছিল এটা। বাবা এর ওপর পড়ে হাত কেটে ফেলেছেন, তাই এটাকে কুড়িয়ে এনেছেন। মাটীর ভেতর অনেকটা সেঁদিয়ে গিয়েছিল, বোধ করি অনেক দিন হতে ওখানে পড়ে আছে।" (পাঠক পাঠিকার স্মরণ থাকিতে পারে জেঙ্কিন্সের বাবা নিম্নশ্রেণীর লোক—গীর্জ্জায় অতি সামান্য চাকৃরী করিত।)

এক টুক্‌রা হীরা পাইলে মানুষ যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, ঠিক সেই রকমই আনন্দে বাইওয়াটারের মুখ ভরিয়া গেল, চোখের তারা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এটাতে তোমার কোন দরকার নেই জেঙ্কিন্স্? আমি নিয়ে যেতে পারি ?"

"স্বচ্ছন্দে। ওদিয়ে আমি কি কর্‌ব ?"

বাইওয়াটার আর দ্বিরুক্তি না করিয়া বোতলের ভাঙ্গা টুক্‌রাটাকে পকেটে ফেলিয়া পুনরায় এঞ্জিনের বেগে স্কুলের দিকে ছুটিয়া চলিল।

প্রত্যাবর্ত্তন।

সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া মিষ্টার ও মিসেস্ চ্যানিং আজ হেল্‌ষ্টন্‌লি আসিয়া পৌঁছিবেন, চিঠি আসিয়াছে। অন্য সময় হইলে বাড়ীতে উৎসবের আর অন্ত থাকিত না, কিন্তু আনন্দের মধ্যেও আজ ঘোর নিরানন্দ। চার্লি নাই, এ কথা কোন্ প্রাণে তারা তাঁদের জানাইবে!

ভোর হইতেই হামিশ বাহিরে একটা ছদ্ম আনন্দের ভাব বহিয়া বেড়াইতেছিল বটে, কিন্তু অন্তরটা তার ক্রমাগতই দুরু দুরু করিতেছিল। সংবাদটা যে দিতে হইবে তাকেই। তার মনে হইল এত বড় ঘোরতর পরীক্ষার মধ্যে সে সারা জীবনে আর কখনো পড়ে নাই।

ভাই বোনেরা সকলে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল বাবা-মা একেবারে বাড়ীতে আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত কোন খবরই ভাঙ্গা হইবে না। কাজেই ষ্টেশন হইতে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে সকলের যাওয়া হইবে না, যাইবে শুধু হামিশ একা। সকলে গেলে চার্লিকে না দেখিয়া স্বভাবতঃই তাঁরা তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন, মা-বাবার নিকটে তো আর তখন মিথ্যা বলা চলিবে না!

গাড়ীর সময় যতই কাছাইয়া আসিতে লাগিল ততই যেন হামিশের বুকের মধ্যে মোচড় পড়িতে লাগিল। কিন্তু সময় কারোই খাতির রাখে না, অবশেষে ট্রেণ ধীরে ধীরে হেল্‌ষ্টনলির প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে আসিয়া দাঁড়াইল। কাহারো সাহায্য না লইয়া মিষ্টার চ্যানিং গাড়ী হইতে নিজেই প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া হামিশ ছুটিয়া গিয়া তাঁকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া ফেলিল। মিসেস্ চ্যানিং পাশে দাঁড়াইয়া সকৌতুকে হাসিতেছিলেন, কহিলেন, "আর আমায় বুঝি চিন্‌তেও পার্‌লি না হামিশ।"

হামিশ হাসিয়া বলিল, "না চিন্‌বার কথাই বটে। মনে হচ্ছে যেন বয়সে আমার চাইতেও ছোট হয়ে গেছ। আশ্চর্য্য জায়গা বটে!"

আগে হইতেই বাহিরে গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি সে মা-বাবাকে লইয়া তাহাতে গিয়া উঠিল —কি জানি যদি কোন উৎসাহী বন্ধু ইতিমধ্যেই চার্লির জন্য সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বসে!

এ দিকে, ট্রেণের আওয়াজ পাইয়াই কন্‌স্‌ট্যান্স্ একতালার হলঘরটাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল; আর্থার, এনাবেল ও জুডিও সেখানেই ছিল। বাড়ীর দরজায় গাড়ী দাঁড়াইতেই সকলে ভয়ে বিবর্ণ, পাংশু হইয়া গেল, জুডি তো প্রায় চীৎকারই করিয়া ফেলিল। মিষ্টার এবং মিসেস চ্যানিং সে ভাব লক্ষ্য করিলে তাঁদের আর বিস্ময়ের পরিসীমা থাকিত না। কিন্তু তখন তাঁরা নিজেদের আনন্দেই বিভোর, কিছুই নজরে পড়িল না, সকলকে আদর ও আশীর্ব্বাদ করিতেই মাতিয়া গেলেন।

একটু পরে মিষ্টার চ্যানিং পাশের ঘরটীতে ঢুকিলেন, মিসেস্ চ্যানিং অপর সবাইকে লইয়া উপরে উঠিয়া গেলেন। হামিশ শুনিল, উপরে যাইতে যাইতে তার মা কন্‌স্‌ট্যান্স্‌কে বলিতেছেন, "টম-চার্লি বুঝি এখনও ইস্কুল থেকে ফেরেনি? আঃ, বাছা চার্লিকে ছেড়ে কি ভাবেই যে দিন কেটেছে তা শুধু এক ভগবান্‌ই জানেন!"

আর নয়, যতই অপ্রিয় হউক কর্ত্তব্য এই বার সম্পন্ন করিতে হইবে। মিষ্টার চ্যানিং এখন নীচে একা রহিয়াছেন—ইহাই প্রকৃষ্ট সময়।

ফাঁসীর আসামী যে ভাবে কাঠগড়ার দিকে অগ্রসর হয় সেই ভাবে মিষ্টার চ্যানিংয়ের সম্মুখে আসিয়া হামিশ বলিল, "বাবা, একটা বড়ই দুঃসংবাদ আছে।"

মিষ্টার চ্যানিং চকিত হইয়া উঠিলেন, "দুঃসংবাদ? কি দুঃসংবাদ বাবা? আমার ছেলেমেয়েরা সুস্থ দেহে আছে, এর পর আর কি দুঃসংবাদ থাকৃতে পারে?"

"কিন্তু বাবা, আপনি তো আমাদের সবাইকে এখনও দেখেন নি! চার্লি..."

মিষ্টার চ্যানিংয়ের মাথা ঘুরিতে লাগিল, অবশ হস্তে তিনি হামিশের হাত চাপিয়া ধরিলেন, কহিলেন, "হামিশ. শুধু একটী কথা, সে বেঁচে আছে তো?"

কান্নায় এইবার হামিশের গলা ধরিয়া আসিল; "সে বেঁচে আছে কি নেই, তা আমরা কিছুই জানি না বাবা," বলিয়া প্রথম হইতে শেষ অবধি সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পিতার কাছে সে বিবৃত করিল।

মিষ্টার চ্যানিংয়ের মুখ শ্বেত পাথরের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। গম্ভীর মুখে তিনি বলিলেন, "হামিশ, এ তো তোমার কাছে আমি আশা করিনি! কেন তুমি এক মাস ধরে এ খবর আমার কাছে চেপে রেখেছ? আমি তখুনি হয় তো ফিরে তার উদ্ধারের নানা রকম চেষ্টা কর্‌তে পার্‌তাম।"

"মানুষের দ্বারা যত রকমের চেষ্টা হতে পারে তার কিছুরই কসুর আমরা করিনি বাবা। আমার নিজের প্রাণ দিয়েও তাকে যদি ফিরে পাওয়া যেত তাতেও আমি প্রস্তুত ছিলাম, শুধু আপনার স্বাস্থ্যের দিকে চেয়েই আপনাকে সংবাদ দেওয়া হয় নাই।" একটু থামিয়া হামিশ আবার বলিল, "খবরটা তো মাকেও এবার দেওয়া দরকার। এ কাজটা কিন্তু আপনাকেই কর্‌তে হবে। পাঠিয়ে দেব তাঁকে আপনার এখানে?"

উদাস ভাবে জানালা দিয়া অনির্দ্দিষ্ট ভাবে তাকাইয়া মিষ্টার চ্যানিং বলিলেন, "দাও!"

হামিশ গিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল; সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেও আসিল—সকলের মুখই তখন অমাবস্যার রাত্রির মত অন্ধকার।

মিসেস্ চ্যানিং ঘরে ঢুকিতেই হামিশ দরজাটা ভেজাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটু পরেই ভিতর হইতে করুণ কান্নার স্বর ভাসিয়া আসিল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তার মা পাগলের মত বাহিরে আসিয়া বলিতে লাগিলেন, "না না, আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। জুডি, কোথায় চার্লি? কন্‌স্ট্যান্স্, কথা কইছ না যে, কোথায় সে?"

(ক্রমশঃ)

ফুলবাগানের ম্যাপ্

নীচে যে আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের ম্যাপটি দেখিতেছ ওটি কিন্তু আসলে একটি ফুলের বাগান। উনপঞ্চাশটি রাষ্ট্র (যাদের লইয়া যুক্তপ্রদেশ গঠিত) হইতে নানা রকম ফুল গাছ

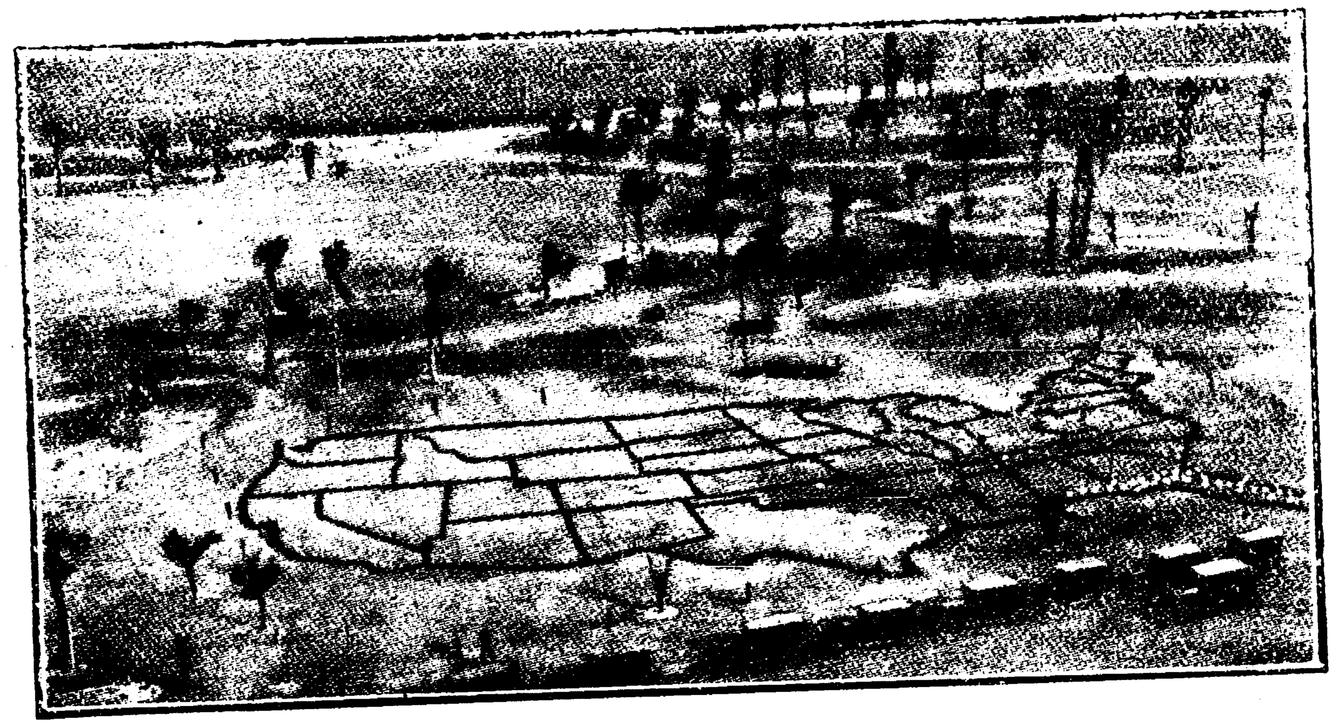

ফুল গাছ দিয়া তৈরী আমেরিকার ম্যাপ্।

যোগাড় করিয়া এই অদ্ভুত বাগান তৈরী হইয়াছে। এয়ারোপ্লেন্ হইতে বাগানটিকে দেখিলে মনে হয়—ঠিক যেন একটি ফুল দিয়া তৈরী ম্যাপ্।

পরলোকে এডিসন্

প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারক এডিসন্ আর ইহলোকে নাই। এই সেদিনও রামধনুতে তোমরা তাঁর অদ্ভুত জীবন-কথা এবং তার চেয়েও অদ্ভুত আবিষ্কারের গল্প পড়িয়াছ।* কী বা তিনি করেন নাই? কলকে দিয়া কথা বলাইয়াছেন ছবিকে দিয়া মানুষের মত কাজ করাইয়াছেন, ঘরে বসিয়া বহু দূরের লোকের সাথে আলাপের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বিদ্যুতের আলো দিয়া রাতকে দিন বানাইয়াছেন, বিদ্যুৎকে নানা কাজে চাকরের মত খাটাইয়াছেন—আর কত বলিব! জীবনের

* রামধনু—আষাঢ়, ১৩৩৫ ও বৈশাখ, ১৩৩৭।

একটি মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি বাজে খরচ করেন নাই, চুরাশী বছর বয়সে—মরিবার আগে পর্য্যন্ত কি দারুণ পরিশ্রমটাই না করিয়া গিয়াছেন !

সমস্ত পৃথিবী আজ তাঁর শোকে কাতর। তাঁহাকে যখন কবর দেওয়া হইল তখন এক মিনিটের জন্য নিউ ইয়র্কের সমস্ত আলো নিভাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এ কি যেমন তেমন সম্মান ?

রবার টায়ারের সদ্ব্যবহার

রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে ফট্ করিয়া মোটরের টায়ার ফাটিয়া গেল। বাস্, আবার নতুন টায়ার লাগাও। কিন্তু পুরানো টায়ারটির কি হইবে ? সেটার দামও ত কম নয়, অথচ সেটা দিয়া গাড়ীও আর টানানো যাইবে না। ভাবনার কারণ নাই। আজকাল এই সব টায়ার ফেলিয়া না দিয়া হরেক রকম কাজে তাদের লাগান হইতেছে। পুরানো ছেঁড়া টায়ার হইতে রবার আর ক্যান্ভাসটুকু বাহির করিয়া লইয়া সেগুলি দিয়া আবার নতুন নতুন জিনিষ তৈরী হইতেছে—যেমন ধর গালিচা, মোড়ক, জুতা আরও কত কি ! ছবিতে দেখ এই রকম কত ছেঁড়া অব্যবহার্য্য টায়ার কাজে লাগাইবার জন্য জড় করিয়া রাখা হইয়াছে।

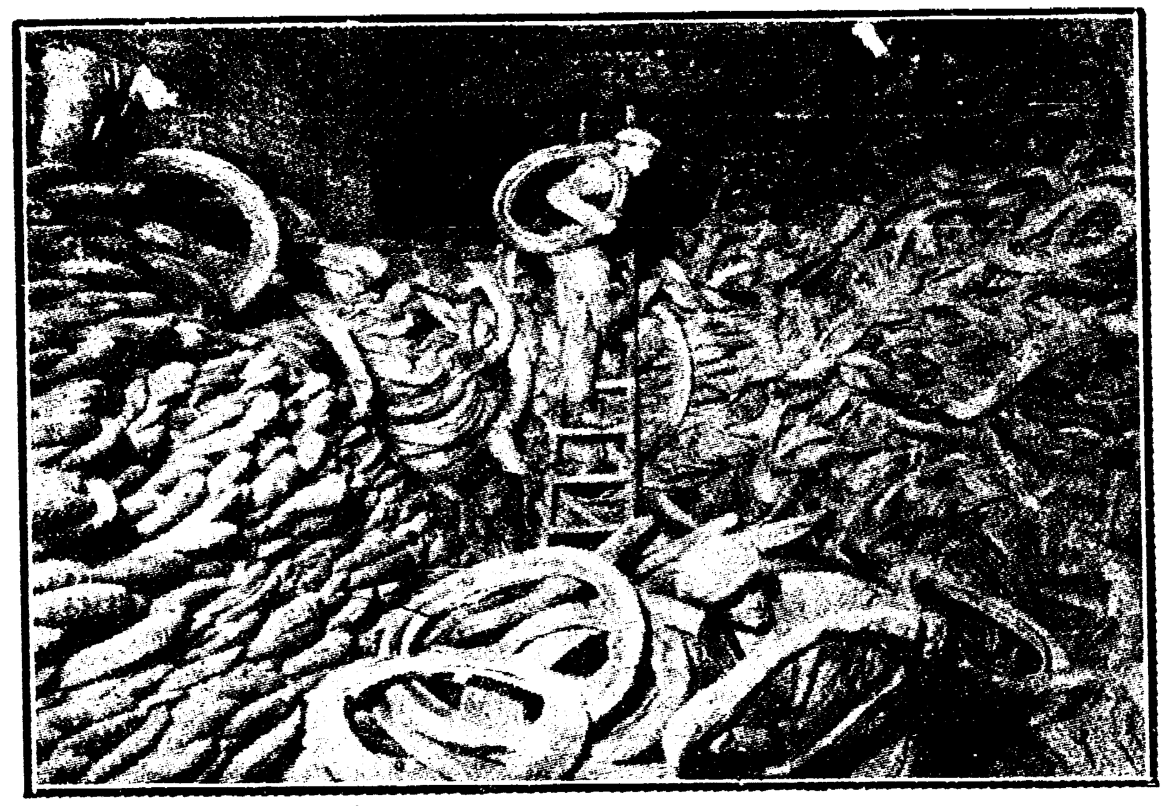

ছেঁড়া টায়ারের স্তূপ।

পেটে না খাইয়া পেট ভরানো

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ভারী মজার এক ওষুধ বাহির করিয়াছেন। এই ওষুধের সাহায্যে পেটে না খাইয়াও ক্ষুধা মেটান চলে। আর কিছু করিতে হয় না, খানিকটা ওষুধ লইয়া বুকে, পিঠে কিংবা পায়ের উপর মাখাইয়া দিলেই হইল ; বাস্ ; এক দিনের মত

নিশ্চিন্ত। আর কিছু না খাইলেও দিব্যি শরীর পুষ্ট হইতে থাকিবে। আসল ব্যাপারটা হইতেছে এই—ওষুধের মধ্যে খাদ্যের আসল সার অংশটুকু এমন সূক্ষ্ম ভাবে এবং এমন কায়দায় মিশান আছে যে শুধু প্রলেপ লাগাইলেই সেগুলি শরীরের মধ্যে ঢুকিয়া দেহের পুষ্টি সাধন করিতে সুরু করে।

"মেয়েরাই বেশী অন্যমনস্ক"

আমেরিকার এক মস্ত রেলওয়ে কোম্পানীর ম্যানেজার অনেক দিনের অভিজ্ঞতায় মত প্রকাশ করিয়াছেন—"ছেলেদের চাইতে মেয়েরাই বেশী অন্যমনস্ক।" তাঁদের হারাণো জিনিষ পাওয়ার গুদামে যত জিনিষ আমদানী হয় তার মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই মেয়েদের জিনিষ। হারাণো জিনিষগুলি এই ধরণের—আংটি, ঘড়ি, চশমা, দস্তানা, শাল, টুপি বই, হাত-ব্যাগ এমন কি ঠেলাগাড়ী, বাইসাইকেল পর্য্যন্ত।

নিরামিষাশীদের সহর

চেকোস্লেভিয়ায় একটি সহর তৈরী হইতেছে। যাকে তাকে সেখানে থাকিতে দেওয়া হইবে না। সেখানে থাকিতে হইলে নিরামিষ খাইতে হইবে। শুধু তাই নয়, কোন রকম মাদক দ্রব্য—এমন কি সিগারেটটি পর্য্যন্ত সে সহরে বসিয়া খাওয়া চলিবে না।

সব চেয়ে উঁচু মন্দির

তিব্বতে ইলেন নামে একটা যায়গা আছে। সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরই আজকাল পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উচু যায়গায় অবস্থিত ধর্ম্ম-মন্দির। সমুদ্রের উপর হইতে এই মন্দির সতেরো হাজার ফিট্ উচুতে।

অদ্ভুত বিবাহের নিয়ম

অষ্ট্রেলিয়ার নিকটবর্ত্তী এক দ্বীপে নিউ বিং নামে এক জাতীয় লোক বাস করে। ইহাদের বিবাহের নিয়মটা ভারী চমৎকার। বিবাহের আগের দিন বর কনের মাথা কামাইয়া দেওয়া হয়। তারপর তাদের ঘোড়ার উপর উল্টা দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া দিয়া সেই অবস্থায় সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করানো হয়। আমাদের দেশে সেকালে সেই যে সাজার কথা শোনা যাইত—মাথা মুড়াইয়া উল্টা গাধায় চড়াইয়া সহর ঘুরানো, এও প্রায় সেই রকমই ; নয় কি ! বাদ শুধু মাথায় ঘোল ঢালা টুকু।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) বেলুচিস্থান

(২) টম্‌ পেন্সিলগুলিকে এইভাবে সাজাইয়া দেখিয়াছিল—

F I V E

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

কুমকুমলাল ঘোষ (জামসেদপুর), দীনু, হাবলি, অনাথ, যতু, নিমু, দুর্গা, লতি, জয়ন্তী, মায়া, গোপী, বলাই (পাটনা), অরুণকুমার ব্যানার্জ্জী (মধুপুর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (কলিকাতা), কোমলতা বসু, সমর, কুমার, গৌর, নতু, কান্টু, মন্টু, নন্টু, কুমুদ, বেলা (রামপুরহাট), ধীরাজকুমার ব্যানার্জ্জী (মধুপুর) ।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন—

প্রফুল্ল, অরবিন্দ, কমল, অশোক ভট্টাচার্য্য (মধুপুর), লতিকা ব্যানার্জ্জী (রাজসাহী), পরেশনাথ রায় চৌধুরী (বিভীষণপুর), সুনীল, দিদি, বঙ্কিম ও বিশ্বনাথ (কলিকাতা), অনাথবন্ধু শীল (গিরিডি), অরুণকুমার সেন (টালিগঞ্জ), অমর, প্রভা, পুষ্প, সরোজ, মন্টু, খোকা, শৈলেশ, সুনু, মতি, বুলু, দিলীপকুমার সরকার (দিল্লী), সুকুমার পালিত (পাটনা), কার্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের), মনোজ, প্রীতি, শেফু, মুকুল, বকুল, সত্য, সরোজ, নীহার (বাজিতপুর), ইন্দুবিকাশ দত্ত, অমিয়, বিমল, খোকা, শান্তি, (শিবসাগর), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া, ঢাকা), অতীন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া, ঢাকা), মায়া ও সুধা সর্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর), উমা, তোতা গোরা ও বিশু (কাটিহার), গোপীনাথ, পুষ্প, নেপা, সুশান্ত, কনক, কার্ত্তিক মল্লিক (হাজারিবাগ), বিমল, অমল, নির্ম্মল, কমল, তুষার (শিলং), অনিলচন্দ্র মল্লিক য়্যাণ্ড ব্রাদার্স (পুরুলিয়া), যশোমাধব সাহিত্য-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, বেনু, বাদল, দুলাল, মন্টু, নেপাল, গোরা, (কানুনগোপাড়া, চট্টগ্রাম), সুনীলকুমার গোস্বামী (পাটনা), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), রামরতি, পানু, বাপু, সুধা, নীহার, নির্ম্মলা দেবী (কলিকাতা), রণেন্দ্রকুমার মিত্র (পাটনা), মহাদেব চৌধুরী (পাবনা) ।

নূতন ধাঁধা

(মোছাম্মাৎ জোবেদা খাতুন)

করিম, রহিম ও নছিম খাওয়া দাওয়ার পর পান না খাইয়াই শুইয়া পড়িল। তাহাদিগকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া এক রেকাবী পান তাহাদের বিছানার নিকটে রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে করিম উঠিয়া দেখে তাহার নিকট পান রহিয়াছে। তখন সে পানগুলি সমান তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ খাইল। উহার অল্প ক্ষণ পরে রহিম অবশিষ্ট পানগুলি ঐরূপে তিন ভাগ করিয়া নিজের ভাগ খাইল। নছিমও কিছুক্ষণ পর ঐরূপে বাকীগুলি ভাগ করিয়া এক ভাগ খাইল। পরদিন প্রাতঃকালে জলযোগ করার পর তাহারা অবশিষ্ট পানগুলি ভাগ করিয়া দেখে প্রত্যেক ভাগে সমান সমান পান আছে। বল দেখি রেকাবীতে কতগুলি পান ছিল।

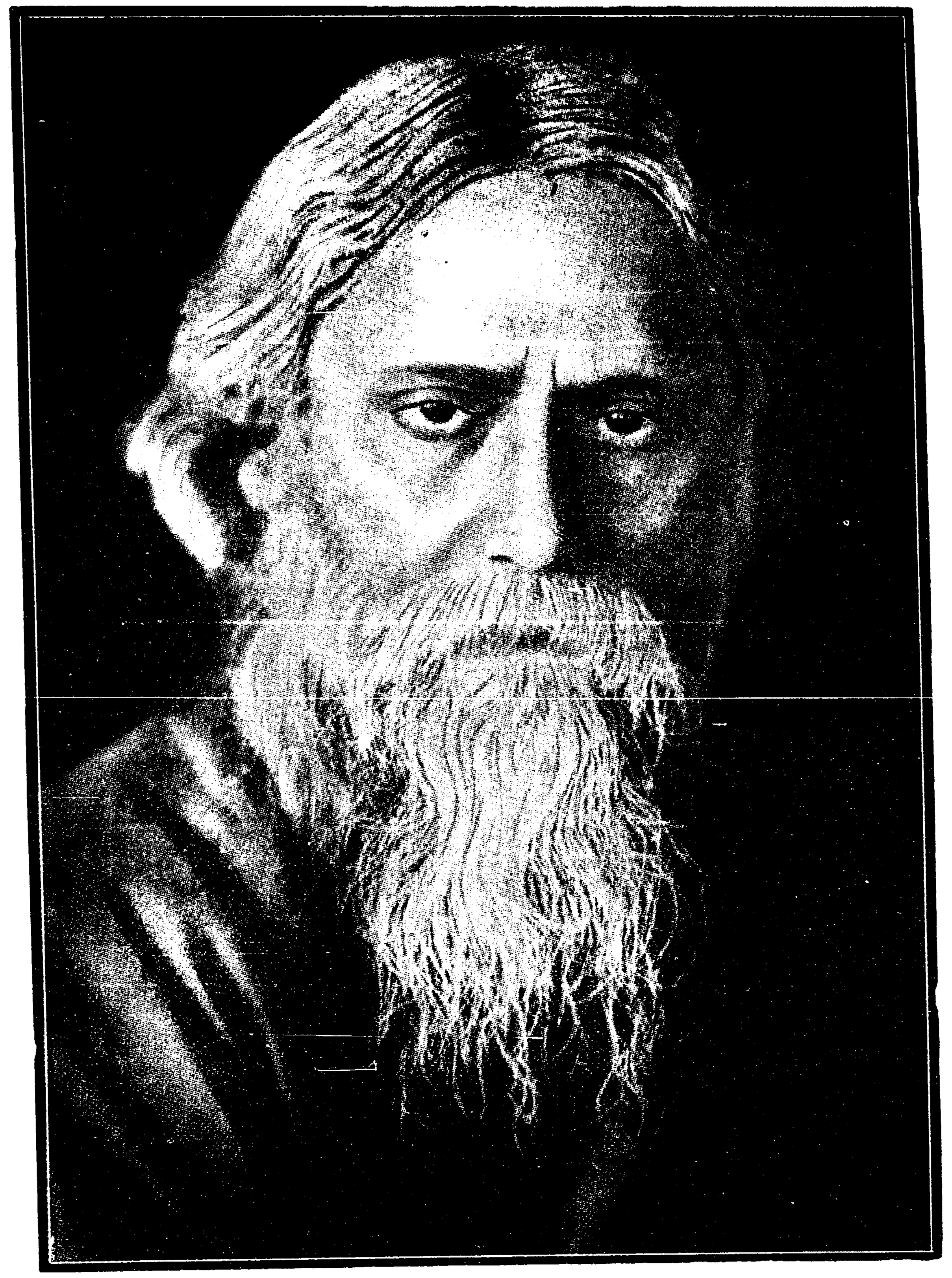

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

এই বছর ইঁহার বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এ মাসে সেই উপলক্ষে কলিকাতায় জয়ন্তী উৎসব হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

(১) বেলুচিস্থান

(২) টম্ পেন্সিলগুলিকে এইভাবে সাজাইয়া দেখিয়াছিল—

F I V E

উত্তরদাতাদের নাম

যাঁহারা নির্ভুল উত্তর দিয়াছেন—

কুমকুমলাল ঘোষ (জামসেদপুর), দীনু, হাবলি, অনাথ, যতু, নিসু, তুর্গা, লতি, জয়ন্তী, মায়া, গোপী, বলাই (পাটনা), অরুণকুমার ব্যানাৰ্জ্জী (মধুপুর), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য (কলিকাতা), কোমলতা বসু, সমর, কুমার, গৌর, নতু, কান্টু, মন্টু, নন্টু, কুমুদ, বেলা (রামপুরহাট), ধীরাজকুমার ব্যানাৰ্জ্জী (মধুপুর)।

যাঁহারা একটির উত্তর দিয়াছেন—

প্রফুল্ল, অরবিন্দ, কমল, অশোক ভট্টাচার্য্য (মধুপুর), লতিকা ব্যানাৰ্জ্জী (রাজসাহী), পরেশনাথ রায় চৌধুরী (বিভীষণপুর), সুনীল, দিদি, বঙ্কিম ও বিশ্বনাথ (কলিকাতা), অনাথবন্ধু শীল (গিরিডি), অরুণকুমার সেন (টালিগঞ্জ), অমর, প্রভা, পুষ্প, সরোজ, মন্টু, খোকা, শৈলেশ, সুনু, মতি, বুলু, দিলীপকুমার সরকার (দিল্লী), সুকুমার পালিত (পাটনা), কাৰ্ত্তিকচন্দ্র বসু (মুঙ্গের), মনোজ, প্রীতি, শেফু, মুকুল, বকুল, সত্য, সরোজ, নীহার (বাজিতপুর), ইন্দুবিকাশ দত্ত, অমিয়, বিমল, খোকা, শান্তি, (শিবসাগর), বীরেন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া, ঢাকা), অতীন্দ্রনাথ পাল (গাউপাড়া, ঢাকা), মায়া ও সুধা সৰ্ব্বাধিকারী (ভবানীপুর), উমা, তোতা গোরা ও বিশু (কাটিহার), গোপীনাথ, পুষ্প, নেপা, সুশান্ত, কনক, কাৰ্ত্তিক মল্লিক (হাজারিবাগ), বিমল, অমল, নিৰ্ম্মল, কমল, তুষার (শিলং), অনিলচন্দ্র মল্লিক য়্যাণ্ড ব্রাদার্স (পুরুলিয়া), যশোমাধব সাহিত্য-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), সদানন্দ সাহা (মেদিনীপুর), বিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী, বেনু, বাদল, দুলাল, মন্টু, নেপাল, গোরা, (কানুনগোপাড়া, চট্টগ্রাম), সুনীলকুমার গোস্বামী (পাটনা), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), রামরতি, পানু, বাপু, সুধা, নীহার, নিৰ্ম্মলা দেবী (কলিকাতা), রণেন্দ্রকুমার মিত্র (পাটনা), মহাদেব চৌধুরী (পাবনা)।

নূতন ধাঁধা

(মোছাম্মাৎ জোবেদা খাতুন)

করিম, রহিম ও নছিম খাওয়া দাওয়ার পর পান না খাইয়াই শুইয়া পড়িল। তাহাদিগকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিয়া এক রেকাবী পান তাহাদের বিছানার নিকটে রাখা হইল। কিছুক্ষণ পরে করিম উঠিয়া দেখে তাহার নিকট পান রহিয়াছে। তখন সে পানগুলি সমান তিন ভাগে ভাগ করিয়া এক ভাগ খাইল। উহার অল্প ক্ষণ পরে রহিম অবশিষ্ট পানগুলি ঐরূপে তিন ভাগ করিয়া নিজের ভাগ খাইল। নছিমও কিছুক্ষণ পর ঐরূপে বাকীগুলি ভাগ করিয়া এক ভাগ খাইল। পরদিন প্রাতঃকালে জলযোগ করার পর তাহারা অবশিষ্ট পানগুলি ভাগ করিয়া দেখে প্রত্যেক ভাগে সমান সমান পান আছে। বল দেখি রেকাবীতে কতগুলি পান ছিল।

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ

এই বছর ইহার বয়স সত্তর বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এ মাসে সেই উপলক্ষে কলিকাতায় জয়ন্তী উৎসব হইবে।

INTENTIONAL
DUPLICATE EXPOSURE.

৪র্থ বর্ষ } পৌষ, ১৩৩৮ { ১২শ সংখ্যা

ছেলে ভুলানো ছড়া

(শ্রীবিশ্বনাথ দত্ত)

বইছে বাতাস, হাস্‌না-হানার গন্ধ ছুটেছে,
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদম তলায় কে ?
শাল-পথে আজ সবুজ আলো, সবুজ নীলাকাশ,
মাঠের উপর ঘন সবুজ—হোল সবুজ ঘাস।
এক রঙের এক সবুজ ছবি বেশ তো এঁকেছে !
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদম তলায় কে ?

আজকে আবার গল্প বল, গল্প বল গো ;
ছেলে বেলার খেলার ঘরে ঢুক্‌বে চল গো।

'পাশে'র পড়া, চাক্‌রী করা থাকুক্ না প'ড়ে ;
পুতুল ক'রে সাজিয়ে ফেল' রঙিন কাপড়ে।
বেগুন ডাঁটায় আলুর খোসায় দাও কি রেঁধেছ,
দেখাও দেখাও পুঁতির মালা কেমন গেঁথেছ !

লজ্জা কিসের, লজ্জা কিসের, কিসের হাসি এ ?
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদম তলায় কে ?
হারিয়ে গেছে ছেলে বেলার সঙ্গী সাথী গো,
হারিয়ে গেছে আমোদ-প্রমোদ, চড়ুইভাতি গো।
ঘুড়ি, লাটাই, গঁদের শিশি হারিয়ে গিয়েছে ;
চাঁদ উঠে আজ সব যে মনে পড়িয়ে দিয়েছে।

গল্প বল, গল্প বল, গল্প কে জানো ?
গল্প মজার বল্‌তে হ'বে, দরজা ভেজানো।
ঝগড়া ভোল, কান্না ভোল, বায়না ভোল গো ;
সবাই হাস, আসর খানি মাতিয়ে তোল গো।
গান যদি গাও মন্দ সে নয়, খুল্‌বে গলা কে ?
চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, কদম তলায় কে ?

কাগজের জন্ম-কথা

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি-এস্‌-সি)

দু'পাঁচ শ' বছর নয়, হাজার হাজার বছর আগেকার কথা। মানুষ তখনও ঘর-বাড়ী তৈরী করিতে শেখে নাই, বন্য জানোয়ারদের সাথে সমানে পাল্লা দিয়া গুহার মধ্যে দিন কাটায়, পাথর ঘষিয়া ঘষিয়া ধারাল করিয়া তাই দিয়া সেকালকার সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হিংস্র জন্তুগুলিকে ঠেকাইয়া রাখে। হয় ত কাপড়ও

পরিতে জানে না ; কিংবা গাছের ছাল, পাতা, চাম্‌ড়া এই সব জড়াইয়া শরীর ঢাকিয়া রাখে।

সেই সময় মানুষ হঠাৎ একদিন এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিল। গুহার গায়ে ধারাল পাথর দিয়া, লাল মাটী দিয়া সে ছবি আঁকিতে সুরু করিল। ছবি বলিতে অবশ্য তোমরা বড় বড় 'অয়েল্ পেন্টিং' বা ঐ ধরণের কিছু মনে করিয়া বসিও না। নিতান্ত ছেলে মানুষের মত দু' একটা আঁকা বাঁকা আঁচড়—ছোট ছেলেমেয়েরা অক্ষর পরিচয়েরও আগে হাতে কাগজ কলম পাইলে যে ধরণের ছবি আঁকে সে ছবি ছিল অনেকটা সেই রকমের। বলিয়া না দিলে শুধু চোখে দেখিয়া—ছবিটা গরুর,না হাতীর,না মানুষের সেটা ধরা কঠিন। কিন্তু এই ছবিই সেই গুহা-মানুষকে অন্য জানোয়ারদের ভিতর হইতে আলাদা করিয়া আজকালকার সভ্য মানুষে আনিয়া দাঁড় করাইল।

চোখে যা দেখা যায় ছবির মধ্যে তারা তাই ফুটাইতে চেষ্টা করিত। এম্‌নি করিয়া ক্রমে তারা পরস্পরের মনের কথা ছবির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে শিখিল। কিন্তু মুস্কিল—ছবি আঁকিতে সময়ও যেমন লাগে, জায়গাও তেম্‌নি লাগে, তার উপর ধৈর্য্যও লাগে যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়েও অসুবিধা সবাইকার ছবি আঁকিবার ক্ষমতা এক রকম নয়। ফলে মাঝে মাঝে এমন ব্যাপারও হইত যে ছবি দেখিয়া তার মানে করা হইত ঠিক উল্টা ; নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়া সেটাকে যুদ্ধের চিঠি বলিয়া ধরাটাও নেহাৎ অসম্ভব ছিল না।

তখন আরম্ভ হইল ছবির বদলে তাকে সহজ এবং সঙ্ক্ষেপ করিয়া এক একটা চিহ্ন ব্যবহার করা। এম্‌নি করিয়াই অক্ষরের সৃষ্টি।

কিন্তু অক্ষর সৃষ্টি হইলে কি হইবে ? সে অক্ষর লিখিবার মত জায়গা চাই ত ! সেটা কিন্তু তেমন সুবিধার হইল না। পাথর কাটিয়া খোদাই করিয়া করিয়া সে সব লিখিতে হইত। রাজা অশোকের সময় আমাদের দেশে এই ধরণের লেখার খুব চল্‌তি ছিল। তোমরা, যারা ভুবনেশ্বরের কাছে খণ্ড গিরি, উদয় গিরি, কাশীর সারনাথ কিংবা এলাহাবাদে অশোক-স্তম্ভ দেখিয়াছ তারা নিশ্চয়ই এই ধরণের লেখা দেখিয়াছ। কলিকাতার মিউজিয়ামেও এ সব জিনিষ অসংখ্য আছে। কিন্তু পাথর ত আর সব সময়ে হাতের কাছে জোটে না—তাই লিখিবার জন্য পাথর ছাড়া আরও অনেক জিনিষ

ব্যবহার করা হইত। নরম কাদার চাক্‌তি বা ইট তৈরী করিয়া তার উপর লিখিয়া সেগুলি আগুনে পোড়াইয়া লইয়াও চমৎকার বই হইত। বড় বড় লোকেরা তামার চাক্‌তির উপর, পিতলের উপর ধারাল অস্ত্র দিয়া কাটিয়া কাটিয়া লিখিতেন। তারপর চলন হইল গাছের ছাল, পাতা এই সবের। প্রাচীন সংস্কৃত বইগুলিতে ভূর্জ্জ পাতার নাম ত খুবই পাওয়া যায়; কলা পাতাও ব্যবহার করা হইত, আর তাল পাতার ত কথাই নাই! আমরা ছেলে বেলায় পাড়া-গাঁয়ে ছোট ছোট ছেলেদের তালপাতায় লিখিতে দেখিয়াছি, এখনও হয় ত অনেকে লেখে। পুরুত ঠাকুর-দের বেশীর ভাগ পুঁথিই ত তালপাতায় লেখা।

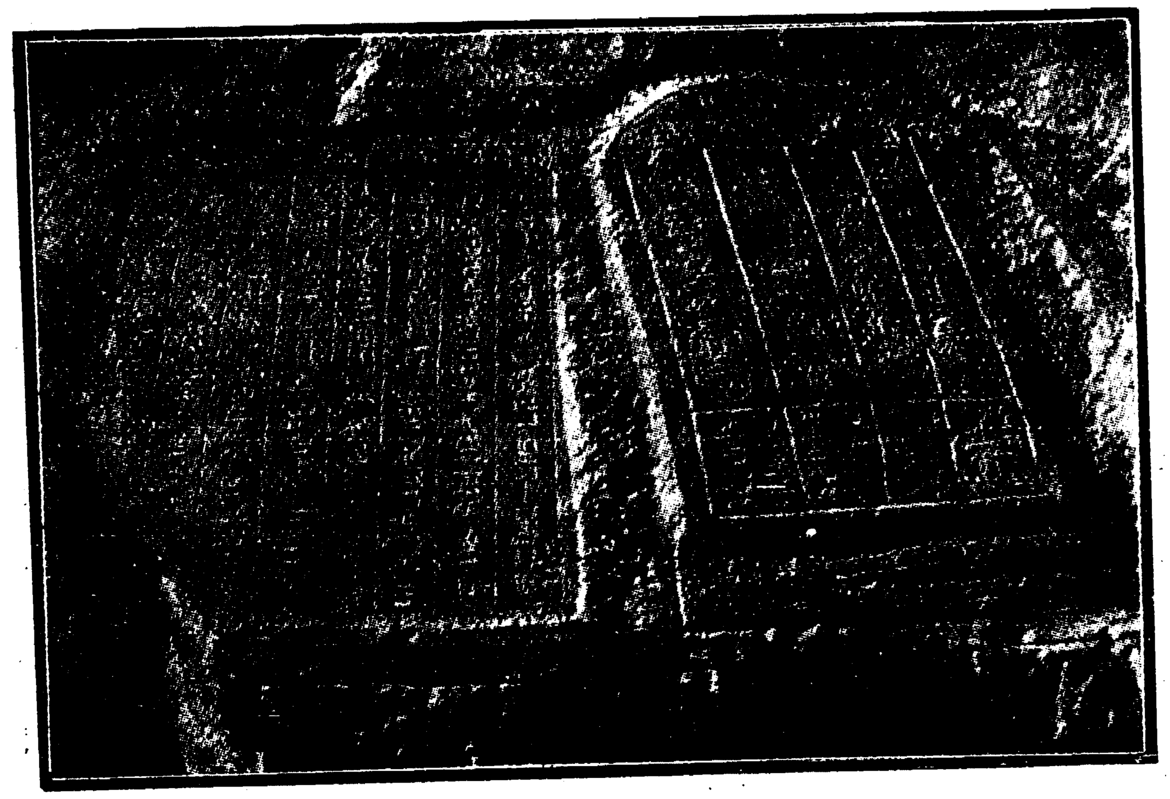

মিশর দেশের পাথরের উপর ছবির ভাষায় লেখা বই।

প্রাচীন মিশরের লোকেরা প্যাপায়রাস্ গাছের ছাল পিটাইয়া তার মধ্যে লিখিত। এই প্যাপায়রাস্ হইতেই কাগজের নাম ইংরাজীতে 'পেপার' রাখা হইয়াছে। তা' ছাড়া জীব-জন্তুর পাৎলা চামড়া দিয়া 'পার্চ্চমেণ্ট্' বলিয়া কাগজের মত এক রকম জিনিষ তৈরী করিয়া তার মধ্যেও যথেষ্ট লেখা হইত।

কাগজ যিনি প্রথম আবিষ্কার করেন তিনি কিন্তু আমাদের চীনা ভায়াদেরই একজন। তাঁর নাম 'ৎসাইলুন্'। আজকালকার কথা নয়—প্রায় দু' হাজার বছর আগে চীন দেশে বসিয়া ইনি কাগজ তৈরী করিতে সুরু করেন। সেখান হইতে শিখিয়া ক্রমে অন্যান্য দেশেও ইহার চলন হয়। বিলাতের লোকেরা কাগজের ব্যবহার শিখিয়াছে মাত্র কয়েক শ' বছর আগে।

এই ত গেল কাগজ আবিষ্কারের ইতিহাস, কিন্তু কাগজ জিনিষটা তৈরী হয় কেমন করিয়া? এইবার সেই কথা বলি।

কাগজের ভিতরকার যে আসল জিনিষটুকু—বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বলেন 'সেলুলোজ্'। গাছের মধ্যে এই সেলুলোজ্ যথেষ্ট পাওয়া যায় তাই কাগজ তৈরী

জঙ্গল কাটিয়া বড় বড় কাঠ সংগ্রহ করা হইতেছে। এই কাঠ হইতেই কাগজ তৈরী হইবে।

করিতে হইলে দরকার হয়—কাঠের কুচি, খড়, নানা জাতের ঘাস—এই সবের। পাট, ছেঁড়া ন্যাকড়া, ছেঁড়া কাগজ—এগুলিও অনেকে ব্যবহার করে।

কাগজের কারখানায় প্রথম কাজ হইতেছে এই সব কাঁচা মাল হইতে সেলুলোজটুকু বাহির করিয়া ফেলা। এই জিনিষগুলির সবটুকুই আর কিছু সেলুলোজ্ নয়—অন্য জিনিষও তার সাথে যথেষ্ট মিশান থাকে, কাজেই গোড়ায় সেগুলিকে আলাদা করিয়া না ফেলিলে চলিবে কেন? কাঁচা মালগুলিকে লইয়া প্রথমে বড় বড় যন্ত্রের সাহায্যে কুচি কুচি করিয়া অতি সূক্ষ্ম ভাবে কাটিয়া ফেলা হয়। তার পর সেলুলোজ্ বাহির করিবার পালা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মুখ বন্ধ করা পাত্রের মধ্যে সেগুলিকে পূরিয়া তার মধ্যে দেওয়া হয় চূণ, ক্ষার কিংবা ঐ জাতীয় নানা রকম

মশলা। তার পর ভিতরে গরম বাষ্প ছাড়িয়া দারুণ চাপের মধ্যে সেগুলিকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সিদ্ধ করা হয়। সেলুলোজের সঙ্গে যে অন্যান্য বাজে জিনিষ থাকে সেগুলি ইহাতে গলিয়া যায়—কিন্তু সেলুলোজের বিশেষ কিছু হয় না, কাজেই সহজেই সেটাকে পৃথক্ করা চলে।

তারপর ধুইবার পালা। এ ধোয়ার কাজ হাত দিয়া চলে না, তার জন্যও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সেলুলোজ্ গুলি তখন দেখিতে হয় অনেকটা তুলার মত; কিন্তু তখনও যথেষ্ট ময়লা থাকে—সাদা ধবধবে কাগজের পক্ষে সেটা খুব খাপ খায় না। তখন সেগুলিকে সাদা করিবার জন্য আবার নতুন নতুন মশলা দেওয়া হয়। বৈশাখ মাসের রামধনুতে তোমাদের নূনের কথা বলিতে গিয়া ব্লিচিং পাউডারের উল্লেখ করিয়াছিলাম। বেশীর ভাগ জায়গায়ই এই জিনিষটি ব্যবহার করা হয়। এগুলি তৈরী হয় চূণ আর ক্লোরিন্ দিয়া—ক্লোরিন্ আবার পাওয়া যায় নূন হইতে। কাজেই কাগজের কারখানায় শত শত মণ নূন আর চূণ ও রাখিতে হয়—আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ত আছেই।

ঠিক মত সাদা হইলে অতিরিক্ত ব্লিচিং পাউডারটুকুকে আবার অন্য মশলা দিয়া তাড়াইয়া দিতে হয়; তারপর আবার ভাল করিয়া ধুইয়া সেলুলোজ্ গুলির আঁশ ছাড়াইবার জন্য অন্য যন্ত্রের ভিতর ফেলা হয়। এই আঁশের উপর কাগজের ভাল-মন্দ অনেকটা নির্ভর করে।

কাগজকে শুধু সাদা করিলেই চলে না, কাগজে কালি দিলে যাহাতে চুপ্সাইয়া না যায় তারও ব্যবস্থা করা দরকার; কাগজ যাতে দেখিতে সুন্দর হয়, মসৃণ হয় সে সব দিকেও নজর রাখিতে হয়। এই সবের জন্যও নানা রকম মশলা মিশান হয়; যেমন ধর—রজন, ফিট্কিরি, শ্বেতসার প্রভৃতি। আরও কত রকম পোষাকী জিনিষ —এমন কি দুধের ভিতরকার সাদা অংশটুকু—যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন 'কেসিন্'—সেগুলি শুদ্ধ কাগজের মধ্যে মিশান হয়। রঙ্গিন কাগজের জন্য নানা রকম রং, সস্তা, বাজে কাগজের জন্য নানা রকম ভেজাল—এ সবও দেওয়া হয়।

তার পর সেই মশলা মাখান সেলুলোজের সঙ্গে পরিমাণ মত জল মিশাইয়া দেওয়া হয়। তখন সেগুলি দেখিতে হয় অনেকটা দুধের মত—তবে তার চাইতে ভারী।

এইবার সেগুলিকে ছাঁকনির ভিতর দিয়া খুব সাবধানে আনিয়া আসল কাগজ তৈরীর কলের মধ্যে নেওয়া হয়। এইখানে খুব কৌশলের সাথে কাজ করিতে হয়।

কাগজের কল এক দারুণ ব্যাপার। নীচের ছবিখানার দিকে চাহিলেই আমার কথা বুঝিবে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জালের পাটাতনের উপর দিয়া দারুণ বেগে এই কাগজের মশলা চলিতে থাকে—সঙ্গে সঙ্গে জল শুষিয়া, চাপ দিয়া, গরম করিয়া তাকে কাগজের চেহারায় আনিয়া ফেলা হয়। কলের এক এক জায়গায় এক এক কাজ হয়। কোথাও জল শুষিয়া লওয়া হয়, কোথাও ভিজা মশলার উপর চাপ দিয়া, পিটিয়া তাকে পাৎলা ছালের মত করা হয়, কোথাও তার উপর অদৃশ্য মার্কা দেওয়া হয়, কোথাও বা কাগজ গরম করিয়া শুকানো হয়, কোথাও বা রোলার ঘষিয়া ঘষিয়া

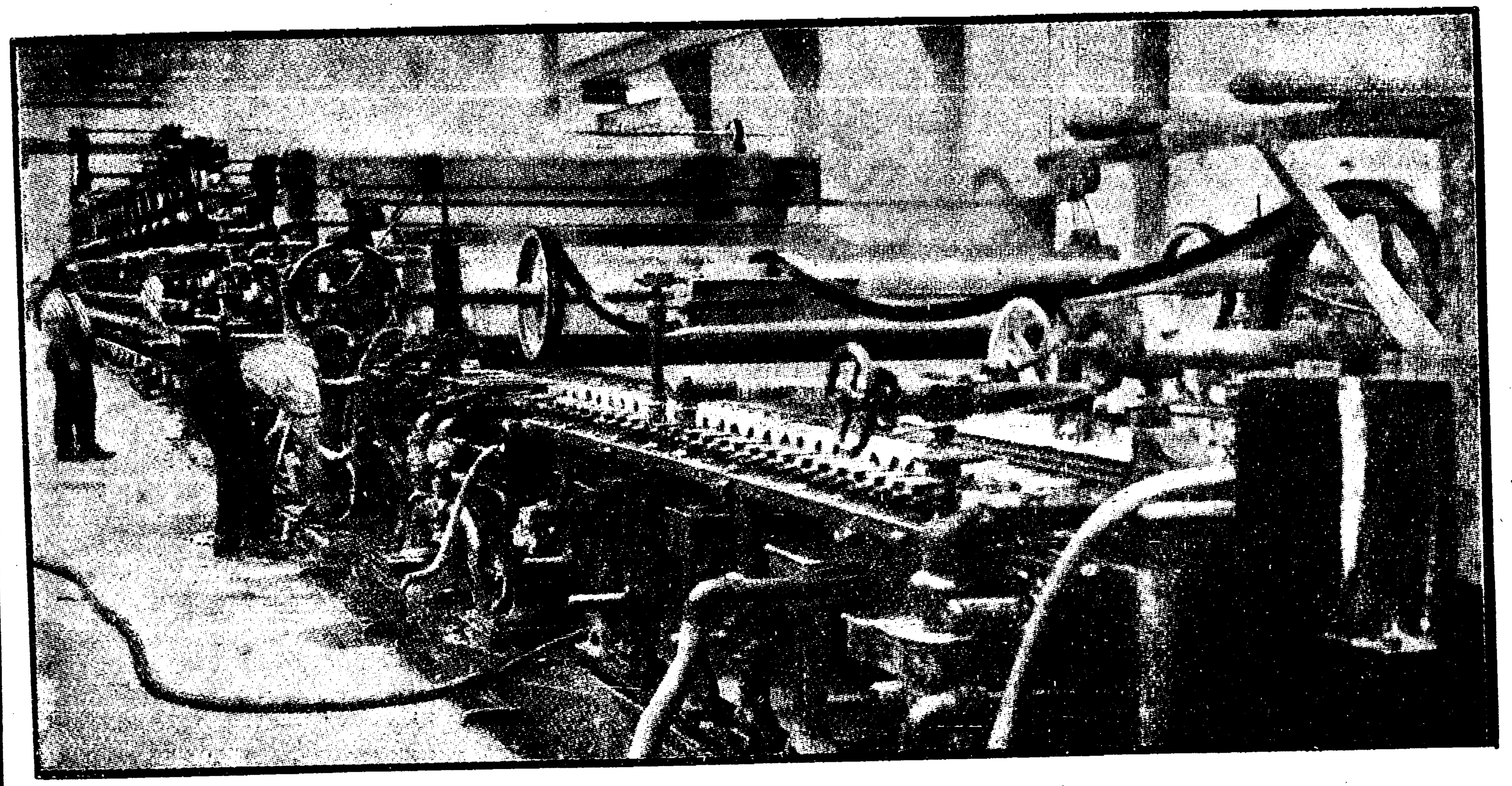

কাগজ তৈরীর কল

তাকে চক্চকে মসৃণ করিয়া তোলা হয়। কলের এক দিকে দেখা যায়—দুধের মত পাৎলা কাগজের মশলা নদীর মত ভীম বেগে বহিয়া আসিয়া কলের মধ্যে ঢুকিতেছে, আর এক দিকে দেখা যায়—ভেল্কী বাজীর মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড, চক্চকে ঝক্ঝকে, মসৃণ কাগজ ঠিক তেম্নি বেগেই বাহির হইয়া আসিতেছে।

মানুষ দিনকে দিন যতই সভ্য হইতেছে—বইএর কাটতিও ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। তার জন্য আজকাল প্রত্যহ হাজার হাজার—লক্ষ লক্ষ মণ কাগজের দরকার। এই কাগজ তৈরী করিতে আবার কি বিরাট্ পরিমাণ গাছপালার যোগাড় করিতে হয় তা'ত বুঝিতেই পার। পৃথিবীর নানা জায়গায়—বিশেষ করিয়া আমেরিকায় শত শত মাইল যুড়িয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন শুধু এরই জন্য আলাদা করিয়া রাখা হইয়াছে ; কিন্তু সরস্বতী দেবীর সাথে প্রকৃতি দেবী পাল্লায় পারিয়া উঠিতেছেন না, দেখিতে দেখিতে সে সব বনকে বন কোথায় উড়িয়া যাইতেছে।

লঙ্কা-কাণ্ড

লঙ্কা পুরীতে মহা হৈ চৈ পড়িয়া গেছে।

ভোর হইতে বেহারী রাক্ষসেরা সহর ময় খবর-কাগজ ফিরি করিয়া বেড়াইতেছে—“এই ভীষোণ কাণ্ডো হোয়ে গেলো বাবু, নন্দন বাগানে ভীষোণ কাণ্ডো হোলো—কাঁচা লঙ্কা পত্রিকা—আজকের কাঁচা লঙ্কা পত্রিকা।” পত্রিকাখানা লঙ্কা নগরের কাঁচা অর্থাৎ অল্প বয়সের রাক্ষসেরা বাহির করে, কাজেই তার নাম ‘কাঁচা লঙ্কা পত্রিকা’।

ব্যাপারটা অসাধারণই বটে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাল রাত্রেই রেডিওতে সে খবর লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিয়া গেছে। ফি বছর ডিসেম্বর মাসের গোড়াতে স্বর্গ, মর্ত্ত্য এবং পাতাল—এই তিন মহাদেশের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে টেনিস্ কম্পিটিশন্ হয়, এত দিন ধরিয়া তার সেরা খেলোয়াড় বা চ্যাম্পিয়ান্ হইয়া আসিতেছিলেন ইন্দ্র। এবার সে জাঁক্ তাঁর ভাঙ্গিয়াছে। লঙ্কার কুমার মেঘনাদ ফাইনালে তাঁকে পর পর তিনটী লাভ-সেট্ দিয়া ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ান্সিপ্ কাড়িয়া লইয়াছে। দেবতাদের নন্দন গার্ডেনের সুবিশাল ষ্টেডিয়ামে যে পঁচাশী কোটী দর্শক সে খেলা দেখিয়াছে তারা নাকি মেঘনাদের ফর্ম্ম্ দেখিয়া হাঁ করিয়া ফেলিয়াছিল। তার সে কী সার্ভিস্! সে কী ব্যাক্হ্যাণ্ড্! টিল্‌ডেন, কোশে লজ্জায় রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়াছিল; লাকোস্ত বোরোত্রার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়াছিল।

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কায় উৎসাহও দ্বিগুণ বাড়িয়া চলিল। ট্রামে চাপিয়া আপিস্ যাইবার পথে কেরাণী রাক্ষসেরা অনেকেই এক এক খানা

কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা।'

কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা কিনিয়া লইল। কাগজের স্বর্গস্থ সংবাদ-দাতা টেনিস্ ম্যাচের হুবহু বর্ণনা পাঠাইয়াছে। কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা তার উপর টিপ্পনী কাটিয়াছে—“ইটিং কম্পিটিশনে (খাইবার প্রতিযোগিতায়) রাক্ষসেরা বরাবর প্রথম হইলেও, টেনিসে ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ন্‌সিপ্-লাভ তাদের কপালে এই সর্ব্বপ্রথম। কুমার মেঘনাদ আজ সমস্ত রাক্ষসজাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। সকলের ধারণা ছিল টেনিস্ ম্যাচে ইন্দ্র অজেয়। সেই ইন্দ্রকে তিনি হারাইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ‘ইন্দ্রজিৎ’ উপাধি দেওয়া হউক্।”

রাবণ রাজার মনে আনন্দ আজ আর ধরে না। ছেলে এত বড় দিগ্বিজয় করিয়া দেশে ফিরিতেছে, তাকে একটা জাঁকাল গোছের অভ্যর্থনা দিতে হইবে। তা ছাড়া, মহারাজের ইচ্ছা কুমার দেশে ফিরিলে এই উপলক্ষ্যে খুব উঁচু দরের একটা

গার্ডেন পার্টিও দেওয়া হয়। আজ প্রাতেই তিনি মেঘনাদের 'ওয়ারলেস্' পাইয়াছেন, ইন্দ্র ভদ্রতা করিয়া তাঁর নিজস্ব এরোপ্লেন 'দি পুস্পাক' খানা দেশে ফিরিবার জন্য তাকে দিতেছেন। কিন্তু গতকল্য পাইলট্ মাতলী এক মোটর য়্যাক্সিডেণ্টে কাবু হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার অশ্বিনীকুমারকে কল্ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন, আঘাত গুরুতর নয়, দু'চার দিনের মধ্যেই তারা রওয়ানা হইতে পারিবে।

রাবণ বড়ই ব্যস্ত। সেই যে ভোর বেলা তিনি চায়ের সঙ্গে খান কতক তিমি-কাট্লেট্ (চিংড়ি-কাট্লেট্ নয় কিন্তু—তোমাদের জিভের জল পড়ে না যেন) এবং ঘোড়ার ডিমের মাম্লেট্ খাইয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ঘটন-চৌকশের সহিত পরামর্শে বসিয়াছেন, তার পর কত বেলা হইয়া গেছে সেদিকে তাঁর হুঁস্ই নাই। মাঝে রোদের তাত যখন খুবই বাড়িয়া উঠে তখন অন্দর হইতে মন্দোদরী টন খানেক বেঙ্গল কেমিকেলের লেমন সিরাপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী এখন পস্তাইতেছেন, কেন না সরবৎ পেটে যাওয়ার পর বার বার তাড়া দিয়াও তিনি আর এখন রাবণকে স্নানে পাঠাইতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁর নিজের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে।

দিন দুয়ের মধ্যেই খবরের কাগজ মারফৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল তিন মহাদেশেই সংবাদ রটিয়া গেল,—কুমার মেঘনাদের ওয়ার্ল্ড্ চ্যাম্পিয়ান্ হওয়ার দরুণ রাবণ এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিতেছেন। দুনিয়ার সমস্ত জাতেরই বাছা বাছা লোকের সে ভোজে নিমন্ত্রণ হইবে, এমন কি মুনি-ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের জন্যও আলাদা বন্দোবস্ত থাকিবে। কণ্ব মুনির আদুরে মেয়ে শকুন্তলা বাপকে ধরিয়া পড়িয়া মালিনী নদীর পারে জঙ্গলের মধ্যেই এক রেডিও বসাইয়াছিল—তার এবং তার সখিদের অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল কটকের 'উড়িয়া-সঙ্গীত-সম্মিলনীতে' প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যে উঁচু দরের গান গাওয়া হয়, সেই গান শ্রবণ করা। কাজেই তপোবনে খবরের কাগজ না আসিলেও শকুন্তলার রেডিওতে রাবণের ভোজের কথা প্রকাশ পাইয়া গেল। শুনিয়া মুনিঋষিরা তো ভারী খুসী! দুর্ব্বাসা ঋষির মেজাজ সেদিন অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা দেখা গেল, গোটা দিনটাতে তিনি একবারও রাগিলেন না, বা কাউকে শাপ দিলেন না। অষ্টাবক্র মুনি একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আর নারদ তো খবর

শুনিয়া নিজের ভাবে এমনি মশ্গুল্ হইয়া গেলেন যে, সেদিন পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়ার কথা তাঁর একবারও মনে আসিল না। কাজেই ঋষি-বালকদের ডাংগুলি খেলায় সেদিন একটুও মারামারি হইল না, বা কাহারো মাথা ফাটিল না। ফলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরের সুষেণ ডাক্তার আর অমরানগরীর অশ্বিনীকুমার সেদিক্ হইতে কোন কল্ না পাইয়া মনমরা হইয়া ফিরিতে লাগিলেন আর উকীলেরা পরস্পর এই বলিয়া জটলা পাকাইতে লাগিলেন যে নারদ এ ভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহাদের নির্ঘাৎ না খাইয়া মরিতে হইবে। আর কষ্ট পাইল এক নিরীহ বেচারী—নারদের বাহন ঢেঁকিটি। বহুদিন বাদে তাকে হাতে পাইয়া ঋষি-পত্নীরা তাকে দিয়া পঞ্চাশ মণ ধান ভাঙ্গাইয়া লইল। এদিকে কলিকাতার বড় বড় ওষুধের দোকান

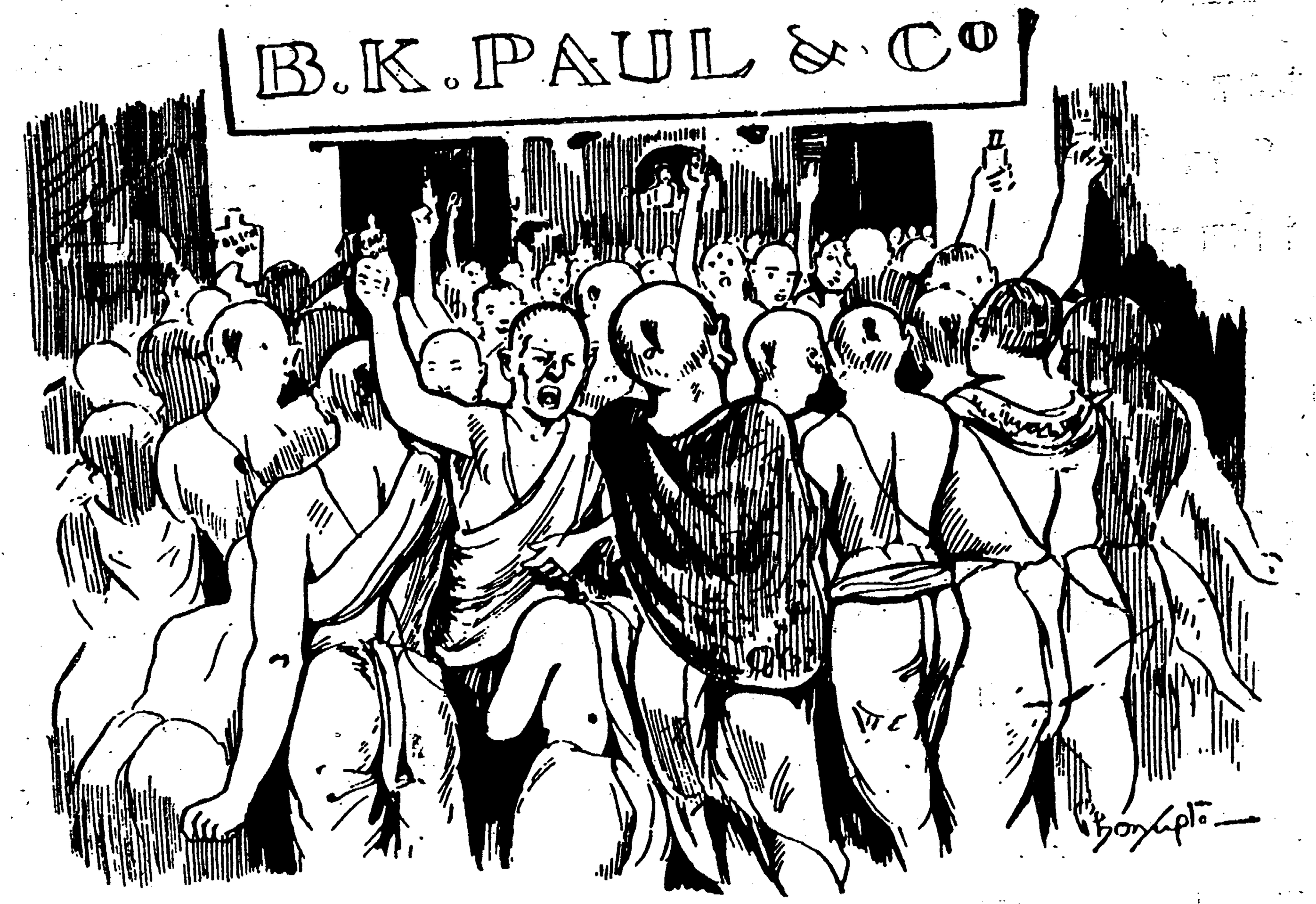

ক্যাষ্টর অয়েল্ কিনিলেন।

গুলি—যেমন বটকৃষ্ট পাল, বাথ্গেট্ প্রভৃতি—একেবারে ফাঁপিয়া উঠিল, কেননা খবরের কাগজে রাবণের সদিচ্ছার কথা শুনিতে পাইয়াই বাংলা দেশের ব্রাহ্মণেরা অনেক টাকার ক্যাষ্টর-অয়েল কিনিয়া ফেলিলেন।

ভোজের দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। কোন্ দেশ হইতে কে কে

আসিবেন কাঁচালঙ্কা-পত্রিকায় প্রত্যহ তারই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বেশ একটু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ভোজের ঠিক আগের দিনকার কথা। রাবণ প্রাতে চা-পানান্তে ড্রইংরুমে বসিয়া সবে একটী স্বদেশী বিড়ি ধরাইয়াছেন এমন সময় উস্কো-খুস্কো চুলে, শুক্‌নো মুখে তাঁর সেক্রেটারী—ঘটন-চৌকশ আসিয়া উপস্থিত। তাকে সে অবস্থায় দেখিয়া রাবণ ভয় পাইয়া গেলেন, কহিলেন, "ব্যাপার কি, ঘটন-চৌকশ ?"

"হুজুর, কাল বোধ করি ভোজ দেওয়া চল্‌বে না, তারিখ পিছিয়ে দিতে হবে।" হুজুর ভীষণ চটিয়া গেলেন, "হোয়াট্‌ নন্‌সেন্স্‌ ! তা হ'লে আমার মান-সম্ভ্রম কোথা থাক্‌বে শুনি ?" বিশ্বের বড় বড় লোকেদের সব নেমন্তন্ন করা হয়েছে—সবাই তাঁরা বিজি (ব্যস্ত) লোক, হাজারো রকমের কাজ আছে—এক হপ্তা আগে থেকে তাদের সব কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করা থাকে ! তাদের কখনো ও কথা বলা চলে ?"

"তবে হুজুর কয়েক লাখ মোহর আমায় এখুনি সংগ্রহ করে দিতে হবে। পনেরো দিন মাথা খাটিয়ে যত রকম খরচা হওয়ার সম্ভব সমস্তই আমি ভেবে রেখে-ছিলাম,—সমুদ্রের ধারে সামিয়ানা টানাবার খরচা, অতিথিদের গায়ে আতর ছিটিয়ে দেবার খর্‌চা, আঁচাবার পর তাঁদের সোণার খড়্‌কে যোগাবার খর্‌চা, দি গ্রেট্‌ লঙ্কা বিড়ি কোম্পানীর বিলের খর্‌চা—কিছু বাদ পড়েনি ; শুধু একটা কথা আমার আদবেই স্মরণ হয়নি। যাদের নেমন্তন্ন করে আনা হচ্ছে তাদের যে খেতে দিতে হবে আর তারই জন্যে যে আরও একটা খর্‌চা হবে সেটা আমার এতদিন খেয়ালেই আসেনি। আজ ভোরে যেই সে কথা মনে হয়েছে অম্‌নি কোষাধ্যক্ষের বাড়ী ছুটেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন কাল সন্ধ্যের আগে অত টাকা যোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব।"

শুনিয়া রাবণের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল ; অত টাকা তিনি এখন হঠাৎ পান কোথা ? তাড়াতাড়ি টেলিফোন্‌টা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "অল্‌ ফাইভ্‌ থ্রি সেভেন্‌ প্লিজ্‌ ! হ্যালো…অলকাপুরী এটা ? কুবের দাদার সঙ্গে একটু কথা বল্‌তে চাই—তাঁকে বলুন লঙ্কা থেকে তাঁর ছোট ভাই রাবণ ফোনে ডাক্‌ছে।…হ্যালো, কে, কুবের দা নাকি ? হ্যাঁ আমি রাবণ। ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি দাদা, লাখ দশেক

মোহর নইলে আর আমার মান থাক্‌ছে না। কী ? ব্যাঙ্ক অব্‌ অলকা ফেল্‌ পড়েছে ? কাল ? এই সেরেছে !" হতাশ ভাবে রাবণ টেলিফোন রাখিয়া দিলেন।

কুবেরের সহিত রাবণ যখন ফোনে আলাপ করিতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই রাজবাড়ীর সামনে বেশ একটী ছোটখাট দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা দিয়া এক ক্ষ্যাপাটে চেহারার বুড়া রাক্ষস চোখ দুইটীকে ছানাবড়ার মত করিয়া সাম্‌নের দিকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে হাঁটিয়া চলিয়াছে আর তার পেছনে একদল রাক্ষস-বালক হাত তালি দিতে দিতে, কখনো তার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া, কখনো তার লেজ টানিয়া, কখনো বা তার মাথায় চাঁটি মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তা বালকদের ইহাতে বড় বেশী দোষ নাই—যে চেহারা লইয়া বুড়া রাক্ষসটী রাস্তায় বাহির হইয়াছে তাহাতে ছেলে তো ছেলে, সুসভ্য রাক্ষসদের দেশ না হইয়া অন্য দেশ হইলে বড়র দল পর্য্যন্ত তার পিছনে লাগিত। বুড়ার সমস্ত মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, হাতের দু'মুঠায় গুটি দশ বারো মরা জানোয়ার, তাদের টুঁটি কামড়াইয়া সে যে রক্ত চুষিয়া লইয়াছে এখন পর্য্যন্ত তার দুই কষে সে রক্তের সুস্পষ্ট দাগ। পরণে যে জিনিষটী সেটী দেখিলে শিশুও আঁৎকাইয়া উঠিবে। রাবণ টেবিলের উপর ফোন্‌ নামাইয়া রাখিতেই সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল, মনে হইল তিনি যেন একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন। টি-পয়ের উপর হইতে তাড়াতাড়ি বাইনাকুলারটী চোখে লাগাইয়া সে দিকে তিনি তাকাইলেন, ধীরে ধীরে সমস্ত মুখখানা তাঁর অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বেহারাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সেই 'জংলী' রাক্ষসটীকে তাঁর সম্মুখে আনিয়া হাজির করিতে আদেশ দিলেন।

জংলী-রাক্ষস ঘরে আসিয়া ঢুকিল—বেশ একটু ভয় ভয় ভাবেই। প্রথমটা দাড়ি-গোঁফ্‌-কামানো চশমা আঁটা রাবণকে সে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে একেবারে পরম ভক্তিভরে তাঁর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

বুড়ার নাম বিকট-কটাহ। কেনই বা রাবণ তাকে ডাকাইলেন, আর সে-ই বা কেন অমন উচ্ছ্বসিত ভাবে তাঁর পায়ে পড়িয়া গড় করিল সেটী বুঝিতে হইলে কয়েক লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। সে সময়ে এই বিকট-কটাহই

ছিল রাবণ রাজার পাক-শালার চার্জ্জে। সে যে শুধু রান্নাই করিত অতি চমৎকার, তাই নয়, তার আরো এমন একটা গুণ ছিল যার ফলে রাবণ রাজার প্রত্যহ অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত। কী সে গুণটী বলিতেছি।

সে সময় রাক্ষসদের মধ্যে একটা নিয়মের চল্‌তি ছিল—গোঁফ গজাইবার আগে প্রায় সকলেই গিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিত। ব্রহ্মা সাদাসিধা 'ভাল-মানুষ', তুটী খোসামুদে মিষ্টি কথা শুনিয়াই একেবারে গলিয়া যাইতেন, কাছে গিয়া বলিতেন, "বৎস, কি চাই তোমার ?" ব্রহ্মার হাতে অনেকখানি ক্ষমতা, রাক্ষসেরা তাই সুযোগ পাইয়া বলিত, আমায় 'অমর' করিয়া দেওয়া হউক, আমায় দিগ্বিজয়ী করিয়া দেওয়া হউক—ইত্যাদি। চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া ব্রহ্মা প্রায়ই রাজী হইয়া যাইতেন। তার পর সুরু হইত রাক্ষসদের প্রতাপ।

বিকট-কটাহও ছোকরা-বয়সে ব্রহ্মাকে খুসী করিয়া বর চাহিয়াছিল—যখন যে খাবার জিনিষ সে যতখানি চাহিবে তখনই যেন সে জিনিষ ঠিক ততখানিই তার সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন আর কি, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রের নন্দন-বাগানের মালী ছুটিয়া আসিয়া ঘোরতর আপত্তি জানাইল, কহিল, ওরূপ সর্ব্বনেশে বর দিলে দেবরাজের বাগানের একটী ফুলকপি, বাঁধাকপি বা শালগম্‌ও বিক্রী হইবে না, বাগান নির্ঘাৎ ফেল পড়িবে। ব্রহ্মা তখন তুইজনকেই খুসী করিবার জন্য বিকট-কটাহকে বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমাকে একটা মন্ত্র দিতেছি, পাঁচ ঘণ্টা এই মন্ত্র জপিলে তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাই হইবে।" মালীকে কাণে কাণে বলিলেন, "ও বেটা রাক্ষস, পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া দেবতার নাম জপা উহার ধৈর্য্যে কুলাইলে তো!"

কথাটা পাঁচ কাণ হইতে হইতে শেষে রাবণের কাণে উঠিল, অমনি তিনি টাকা বাঁচাইবার ফন্দি মনে মনে আঁটিয়া বিকট-কটাহকে ডাকিয়া আনিয়া হেড্ বাবুর্চ্চির পদ দিলেন। বিকট-কটাহের চাক্‌রী হইল বটে, কিন্তু সেই যে ইন্দ্রের মালীর উপর সে চটিয়াছিল, সে রাগ আর তার গেল না। একদিন তাই সুযোগ পাইয়া মালীর পোকে ধরিয়া সে 'ফলার' করিতে যাইতেছিল, কিন্তু দেবরাজ টের পাইয়া দারুণ চটিয়া গেলেন, শাপ দিলেন,—যা বেটা তুই পাথর হইয়া পড়িয়া থাক্।

রাক্ষস তখন খুব একচোট্ কাঁদা-কাটি করিল, দেখিয়া ইন্দ্রের রাগও পড়িয়া আসিল; তিনি বলিলেন—আচ্ছা যা, যা, তোদের যুবরাজ মেঘনাদ যদি কোন দিন আমাকে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় হারাইতে পারে তবে তোর শাপ-মুক্তি হইবে। সেই হইতে আজ এত যুগ ধরিয়া বেচারা অচেতন পাথর হইয়া পড়িয়াছিল, এখন টেনিস্ খেলায় ইন্দ্রের হার হওয়ায় সে আবার রাক্ষস-দেহ ফিরিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়া বিকট-কটাহের অবস্থা হইল বাস্তবিকই সঙ্গীন। সে তো আর জানে না যে তাদের সেকেলে বর্ব্বর রাক্ষস জাতি এখন কতটা সুসভ্য হইয়াছে! রাস্তায় ট্রাম-বাসের হুড়াহুড়ি, মোটরের ভোঁ ভোঁ, বাইকের ক্রিং ক্রিং—বেচারা প্রায় আবার পাথর হইবার উপক্রম। ঠিক এই সময়েই রাবণ আর্দ্দালী পাঠাইয়া তাকে ডাকাইলেন।

রাবণ বলিলেন, "বড়ই সুসময়ে তোমার দেখা পেলাম বিকট-কটাহ! কাল আমি খুব বড় একটা ভোজ দিচ্ছি—তুনিয়ার অনেক লোক আস্‌বে। রান্না ঘরের ভার নিতে হবে কিন্তু তোমাকে—অবশ্যি বিনি খরচায় চালাতে হবে।"

বিকট-কটাহ ঠিক বুঝিতে পারিল না; রাজা বলিতেছেন—অনেক 'লোক' আসিবে তবে আর খাইবার জিনিষের অভাব কি, তাদের ধরিয়া পেটে পূরিলেই তো হইল। রাবণ হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সে দিন-কাল এখন আর নাই, এখন ত্রিভুবনের মানুষ-রাক্ষস-দেবতা-যক্ষ-কিন্নর-বানর সব বন্ধুভাবে বাস করিতেছে। বুড়া বিকট-কটাহ অবশ্য রাজী হইল, তবে খুব খুসী হইয়া নয়। মানুষ আর বানর এই তুইটীই হইল তার প্রিয় খাদ্য—খাদ্যের সঙ্গে আবার বন্ধুতা কি ?

পরের দিন ভোজ। লঙ্কানগরীতে যেন হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাজকর্ম্মচারী রাক্ষসদের আর মরিবার ফুরসুৎ নাই—তারা বিড়ি-মুখে একবার আসিতেছে রাজবাড়ী, আর একবার যাইতেছে সমুদ্রের ধারে যেখানে সুবিশাল সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। বেলা নাগাদ সাড়ে বারোটার সময় রাবণ বিকট-কটাহকে লইয়া রান্না ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, "এইবার তবে বিকট-কটাহ তুমি জপে বসে পড়। ঠিক ছ'টার সময় ভোজ আরম্ভ হবে, তার আগেই তোমার সমস্ত সেরে ফেলা চাই।"

"ছ'টার সময়" কথাটা বিকট-কটাহ বুঝিতে পারিল না, বলিল, "মোটে ছ'টা কি, অন্ততঃ ছ'শো'টা জিনিষ না হলে কি রাবণ-রাজার ভোজ মানায়!" রাবণ হাসিয়া বলিলেন, "ছ'টা পদের কথা হচ্ছে না, ঘড়িতে ছ'টা বাজ্‌বার কথা হচ্ছে।" রান্না ঘরে একটা প্রকাণ্ড সেট্ টমাসের ঘড়ি ছিল, সেটার কাছে গিয়া রাবণ ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই কাঁটা দুটো দেখ্‌ছ, এ দুটো ক্রমাগত ঘুর্‌ছে। ছোট কাঁটাটা এখানে (বলিয়া তিনি ছয়ের অঙ্কটা দেখাইয়া দিলেন) আর বড় কাঁটাটা এই জায়গায় (সঙ্গে সঙ্গে বারোর অঙ্কে হাত দিলেন) এলেই ছটা বাজা হল। ও দুটো ওখানে যাবার আগেই তোমার কাজ সার্‌তে হবে; কাজেই এখুনই তুমি জপে বস। খাবার জিনিষের লিষ্টি এই রইল, জপ সারা হলে এগুলো পড়ে পড়ে জিনিষ আমদানী কর্‌বে।"

বিকট-কটাহ ব্যাপার সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বলিল, "আমি তবে এবার ভেতর থেকে দরজা এঁটে জপে বসি। দরজা-জান্‌লা খোলা থাক্‌লে আর আমার জপ সারা হবে না। রাস্তা দিয়ে মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে দেখ্‌লেই আমার সব মন্ত্র গুলিয়ে যাবে—ইচ্ছে হবে ছুটে গিয়ে ওগুলোকে টপাটপ্ গালে পূরি।"

রাবণ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে দরজা-জানালা এঁটেই বস।"

বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত সমুদ্র-তীরের বিরাট্ সামিয়ানা একেবারে শূন্য। নিমন্ত্রিতেরা সকলেই কাজের লোক, ফলার মারিবার জন্য কেউ তো আর আধ ঘণ্টা আগে আসিয়া আড্ডা জমাইতে পারে না! পৌণে ছ'টা বাজিবার পরেই কিন্তু লঙ্কার আকাশ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন, জেপেলিন মাথার উপর উড়িতে লাগিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিমন্ত্রিত জনগণে সামিয়ানা ভরিয়া গেল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের চাঁইদের মধ্যে কেউই আর বাদ নাই—ইন্দ্র, কুবের, দুর্য্যোধন, বাসুকী, বলি, নারদ, কত নাম করিব? সকলেরই মুখে খুব ব্যস্ত ভাব। পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে ডাইরি খুলিয়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইতেছেন। এখনো কার কত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ সারা বাকী আছে প্রধানতঃ সেই কথাই চলিতেছে। রাবণ ও মেঘনাদ সহাস্যে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করিতেছেন। ঘটন-চৌকশ আশ্বাস দিতেছে, 'পাংচুয়ালি' ছ'টার সময় সে সকলকে খাইবার সামিয়ানায় লইয়া যাইতে পারিবে।

ছ'টা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী, রাজ-কর্ম্মচারীরা রান্না ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিকট-কটাহ তখনও দরজা খোলে নাই। দেখিতে দেখিতে ছ'টা বাজিয়া গেল, তবুও বিকট-কটাহের সাড়াশব্দ নাই। কিন্তু আর অপেক্ষা করা অসম্ভব। সকলে ঘন ঘন দরজায় ঘা দিতে লাগিল। ভিতর হইতে এবার আওয়াজ আসিল—"আঃ, থাম না বাপু! আমি এখন দরজা খুল্‌তে যেতে পারিনে, তা হ'লেই ছ'টা বেজে যাবে।"

ঘটন-চৌকশ ক্রুদ্ধ হইয়া এক লাথিতে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল; ভিতরে গিয়া সবাই দেখে সেট্ টমাস ঘড়ির কাঁটাটা পাঁচটা আটান্ন মিনিট্ পর্য্যন্ত যাওয়ার পর বিকট-কটাহ কাচ ভাঙ্গিয়া মিনিটের কাঁটাটাকে চাপিয়া ধরিয়া আছে, আর বিড় বিড় করিয়া নিজের মনে মন্ত্র পড়িয়া চলিয়াছে। রাজ-কর্ম্মচারীদের ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সে একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "ভয় পাচ্ছ কেন, ছ'টা বাজ্‌তে দেব না, এই দেখ ধ'রে আছি—কাঁটার সাধ্য কি আর নড়ে! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই জপে বস্‌তে দেরী হয়ে গেছ্‌ল। প্রহর খানেকের ভেতরেই মন্ত্র পড়া সারা হয়ে যাবে। মহারাজকে ভাবনা কর্‌তে বারণ কর গে যাও। জপ সারা হ'লে তবে কাঁটা এগুতে পাবে, ছ'টা বাজ্‌বে।"

ঘটন-চৌকশ মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

হৈ চৈ শুনিয়া স্বয়ং রাবণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার বুঝিয়া চোখে সরিষা-ফুল দেখিতে লাগিলেন। তাঁর ইচ্ছা হইতেছিল ঘুষি মারিয়া বিকট-কটাহের কর্ণ-পটাহ ফাটাইয়া দেন। কিন্তু বিপদের সময় মাথা গরম করিলেই মুস্কিল, তাই তিনি তাড়াতাড়ি সামিয়ানার দিকে চলিয়া গেলেন।

নিমন্ত্রিতেরা তখন ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিলেন, রাবণকে পাংশু-মুখে সামিয়ানায় ফিরিতে দেখিয়া সকলে উদ্বিগ্ন ভাবে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। ব্যাপারটা তখন প্রকাশ পাইয়া গেল। সকলে সহানুভূতির সুরে বলিতে লাগিলেন, "আহা হা, তাতে আর কি হয়েছে? খাওয়াটাই তো আর সব নয়, এমন পাঁচ-জনের সঙ্গে মেলা-মেশা হল এই তো ঢের! আপনি ও নিয়ে আর মন খারাপ কর্‌বেন না,"—ইত্যাদি। কেবল মাত্র ইন্দ্র মুখ মুছিবার ছলে রুমালটা ঠোঁটের উপর চাপিয়া ফিক্ করিয়া একটু হাসিলেন।

কিন্তু ভোজের জন্য অপেক্ষা করা তো কারোই সম্ভব নয়। ঠিক দশটার সময় ব্যাঙ্ক্-অব্-অলকার ডিরেক্টরদের লইয়া কুবেরকে মিটিং করিতে হইবে; বারোটায় চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা বন্ধ করিবেন, কাজেই যমরাজের সেখানে উপস্থিত থাকা দরকার; ন'টার সময় নারদের ত্রিচিনপল্লী ব্রড্‌কাষ্টিং ক্লাবে বীণা বাজাইবার এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্, সাড়ে ন'টায় যুধিষ্ঠিরের বৈঠকখানায় সকলে পাশা খেলিতে আসিবে; সুষেণ ডাক্তারের জন্য কিষ্কিন্ধ্যায় কত রোগী বসিয়া আছে কে জানে; আর সূর্য্যদেবকে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আমেরিকা পৌঁছিতে হইবে—সেখানে এখন শেষ রাত্রি, গোটা আটেকের মধ্যে বেলা করিতে না পারিলে যে দুরন্ত বৈজ্ঞানিক জাতি, আর যে বাঘা এডিসন্ আছে—কি যে করিয়া বসে কে জানে? মিনিট্ পনের'র মধ্যে লঙ্কাপুরী শূন্য করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন-জেপেলিন আকাশে উঠিল।

উঠিলেন না কেবল বাংলা দেশের ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন—ক্যাষ্টর অয়েলের দাম না পাইলে তাঁরা নড়িবেন না।

রাবণ কৌচের উপর এলাইয়া পড়িয়া ঘটন-চৌকশকে 'পিনাল কোড্' খানা (আইনের বই) আনিবার হুকুম করিলেন। বিকট-কটাহকে কোন্ ধারায় ফেলা যায় তাহাই তিনি দেখিবেন।

কাঁটা

(শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি-এ)

১

কাঁটা সে যে কাঁটা,
ফুটবে পায়ে পূজা কর
কিম্বা মার ঝাঁটা।
ফুল নহে যে গন্ধ দেবে,
আদর এবং পরশ নেবে,
কপালে তার কষ্ট দেবার
জয় পত্র আঁটা।

২

কাঁটা সে যে কাঁটা,
বিঁধে বিঁধে পড়লো তাহার
সর্ব্ব দেহে ঘাঁটা।
সে বাছে না দেব কি দানব,
ছেলে, বুড়া সমান যে সব,
অপকারের মানত করা
অন্ধ বোকা পাঁঠা।

৩

কাঁটা সে যে কাঁটা,
তাহার ভয়ে শক্ত বড়
নগ্ন পায়ে হাঁটা।
সোজা পথেই অঙ্গ রেখে
ধূলায় থাকে মুখটী ঢেকে,
পদে পদে ক্লিষ্ট করে
নিত্য ঘটায় ল্যাটা।

৪

কাঁটা সে যে কাঁটা,
নরম পদের চরম অরি
কঠিন চরণ চাঁটা।
ভাই-দ্বিতীয়া জানায় তারে
স্থানটী তাহার যমের দ্বারে,
সেথায় আছে তাহার লাগি'
নূন হলুদে বাঁটা।

কলোসিয়াম্

(শ্রীচারুলতা দেবী)

বড় দিনের ছুটী আসিতে না আসিতে নানা জায়গায় আমোদ প্রমোদের ধূম পড়িয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তাঁবু খাটাইয়া তার মধ্যে নানা রকমের সার্কাস্ দেখানো হইতেছে—বাঘের খেলা, হাতীর খেলা, ঘোড়ার নাচ—আরও কত কি! ভারী মজা, নয়? কিন্তু আজ তোমাদের যে খেলার কথা বলিব তার তুলনায় এ সব কিছুই না।

বড় হইয়া তোমরা যদি কখনও ইয়োরোপে বেড়াইতে যাও তবে ইটালীর রোম সহরে একটা বিরাট্ বাড়ী দেখিতে পাইবে। বাড়ীটার অনেক জায়গায় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ইট-পাথর খসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তবুও আজ পর্য্যন্ত অত বড় বাড়ী পৃথিবীর আর কোথাও তৈরী হইয়াছে কি না সন্দেহ। বাড়ীটার নাম 'কলোসিয়াম্'।

সে আজকার কথা নয়—প্রায় দু'হাজার বছর আগেকার কথা। রোম তখন সৌভাগ্যের একেবারে চূড়ায় উঠিয়াছে—রোমের নামে গোটা পৃথিবী কাঁপিতে থাকে। সেই সময় এই বিরাট্ কলোসিয়াম্ তৈরী হইয়াছিল। এটি ছিল রোমের রঙ্গালয়। নানা রকমের খেলাধূলা, সার্কাস্, মল্লযুদ্ধ, নৌযুদ্ধ এখানে দেখান হইত।

আগে বাড়ীটার চেহারা সম্বন্ধে তোমাদের একটু ধারণা দিয়া দেই। বাড়ীটা দেখিতে গোলাকার—ঠিক গোল নয়, অনেকটা ডিমের মত। তার ব্যাস এক মাইলের এক তৃতীয়াংশ। মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠান—তাকে বলা হইত 'এরিনা'। সে উঠান লম্বায় ২৭৩ ফিট্, চওড়ায় ১২০ ফিট্। উঠানের চার ধার ঘিরিয়া দালান—সেও চার তালা। নীচের তালার ঘর-

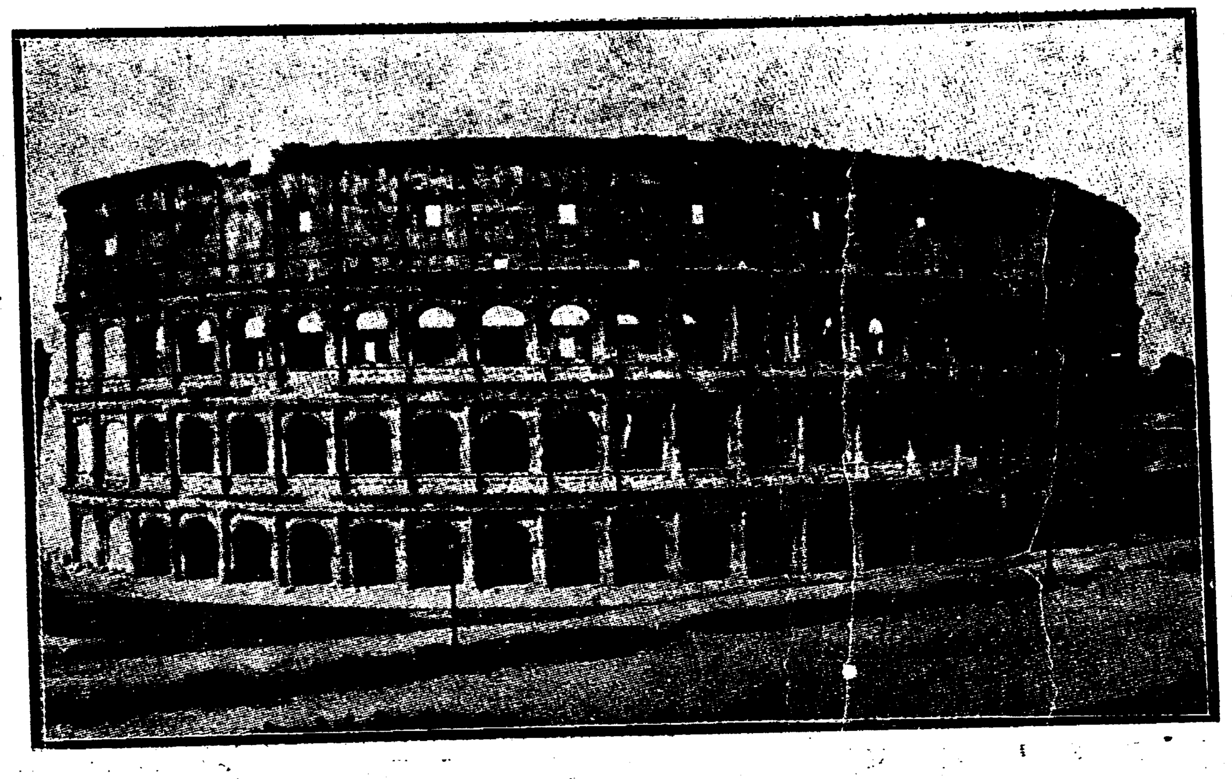

কলোসিয়াম্—রোম।

গুলিতে বন্য জানোয়ারদের আট্কাইয়া রাখা হইত। দরকার হইলে (নৌযুদ্ধের সময়) জল দিয়া সমস্ত উঠান ভর্ত্তি করিয়া ফেলা হইত—এক তালায় তারও বন্দোবস্ত ছিল। উপরে চার দিক ঘিরিয়া দর্শকদের বসিবার জায়গা। এরিনার মধ্যে খেলা হইত, উপরে বসিয়া সবাই দেখিত। বড় বড় লোকেদের জন্য বিশেষ বিশেষ আসন নির্দ্দিষ্ট থাকিত, জনসাধারণের জন্যও তাই। প্রত্যেক আসনে নম্বর দেওয়া থাকিত। সব শুদ্ধ এই রকম কতগুলি আসন ছিল জান? চল্লিশ হাজার।

খেলাও ছিল তেমনি। এখনকার দিনের মত পোষা জানোয়ার লইয়া সে খেলা হইত না। একেবারে সদ্য-ধরা বুনো জানোয়ার লইয়া এরিনার মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইত—বাঘ, সিংহ, হাতী, গণ্ডার, বাইসন্ আরও কত কি! জানোয়ারগুলি পরস্পর আক্রমণ করিত, লড়াই করিত, তার পর চোখের সম্মুখে একে একে মরিত। দর্শকের দল মজা দেখিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত। কলোসিয়াম্ তৈরী হইবার

পর প্রথম বার যে উৎসব হয় শুধু সেটাতেই পাঁচ হাজার নিরপরাধ পশু এমনি ভাবে মারা গিয়াছিল।

কিন্তু এর চাইতেও ভয়ানক, এর চাইতেও নিষ্ঠুর ব্যাপার হইত যখন বুনো জানোয়ারদের সাথে লড়াই করিবার জন্য ক্রীতদাসদের ধরিয়া আনিয়া ভিতরে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সামান্য অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তারা সেই প্রচণ্ড হিংস্র জন্তুদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িত। প্রাণের মায়া বড় মায়া, কিন্তু শুধু ঢাল-তলোয়ার আর বল্লম

কলোসিয়ামে খেলা দেখান' হইতেছে।

দিয়া ওই সব জানোয়ারকে আর কত ক্ষণ আটকাইয়া রাখা যায়! তাও আবার এক আধটা নয়। দেখিতে দেখিতে সমগ্র দর্শকমণ্ডলীর চোখের সম্মুখে জানোয়ারগুলি ক্রীতদাসদের টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিত, সমস্ত উঠানময় রক্তের নদী বহিয়া যাইত, কিন্তু দর্শকদের দুঃখ হওয়া দূরে থাক্ তারা হাততালি দিয়া পরমানন্দে সে সব 'মজা' উপভোগ করিত।

শুধু যে মানুষে জানোয়ারে লড়াই হইত তা নয়, অনেক সময় আবার মানুষে মানুষে যুদ্ধও হইত, আর যতক্ষণ না এক জনের মৃত্যু হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে যুদ্ধের আমোদ হইতে দর্শকেরা বঞ্চিত হইত না।

শুধু কি এই! অপরাধীদের শাস্তি ও অনেক সময় সকলের সম্মুখে এখানেই দেওয়া হইত। তাদের বাঁধিয়া আনিয়া এরিনার মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হইত, তার পর কতকগুলি সিংহকে কয়েক দিন অনাহারে রাখিয়া তাদের উপর লেলাইয়া দেওয়া হইত। সিংহেরা তাদের ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইত—রোমান্‌রা উপর হইতে সে দৃশ্য দেখিত, আর বড় আমোদ পাইত। প্রথম যখন খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তন হয় তখন কত খৃষ্টানকে—তারা বিধর্ম্মী শুধু এই অপরাধে এখানে বন্য জানোয়ার দিয়া খাওয়ান হইয়াছে তার হিসাব দেওয়াও কঠিন।

কিন্তু পাপের প্রশ্রয় আর কত দিন চলে? একদিন কলোসিয়ামেরও শেষ উৎসব আসিল। অনেক দিন ধরিয়া কোনও আমোদ-প্রমোদ না হওয়ায় রোমের লোকদের মনে বড় দুঃখ—এমন সময় হঠাৎ এক মস্ত বড় বিজয়-সংবাদ আসিয়া হাজির—গথ্‌ সেনাপতি রোম অবরোধ করিয়াছিল—রোমান্‌রা তাদের যুদ্ধে হারাইয়া দিয়াছে। এত বড় একটা আনন্দের দিনে একটু উৎসব না হইলে কি চলে? দেখিতে দেখিতে হাজার হাজার নরনারী—যুবক, বৃদ্ধ, শিশু আসিয়া কলোসিয়ামে জড় হইল।

খেলা আরম্ভ হয় হয়। সমগ্র জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে—এমন সময় দু'দিক্ হইতে দু'জন মল্লযোদ্ধা আসিয়া এরিনার মধ্যে দাঁড়াইল। ওঃ, এবার কি জোর লড়াইটাই না হইবে! আনন্দে দর্শকেরা ফাটিয়া পড়ে আর কি! কিন্তু হঠাৎ সে আনন্দে বাধা পড়িল। দেখা গেল—এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী ছুটিয়া আসিয়া দুই দলের মাঝখানে দাঁড়াইয়াছেন। সবাই তাঁকে চিনিল—তিনি বিখ্যাত ধর্ম্মযাজক—টেলিমেকাস্‌। সন্ন্যাসী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "না, না, আর রক্তপাত নয়। রোমান্‌রা, তোমরা আর কতকাল চোখের সম্মুখে এই নিষ্ঠুর, বীভৎস হত্যাকাণ্ড সহ্য করবে?" এমন আমোদের মধ্যে বাধা! উত্তেজিত জনতা গর্জ্জিয়া উঠিল, "তাড়িয়ে দাও, দাও বুড়োকে তাড়িয়ে। আমরা লড়াই দেখ্‌তে এসেছি, লড়াই দেখ্‌ব। আরম্ভ কর লড়াই।" কিন্তু সন্ন্যাসী নড়িবেন না। যতক্ষণ তাঁর দেহে এক বিন্দু রক্ত আছে ততক্ষণ তিনি রোমান্‌দের এই হিংস্র, বর্বর মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবেন—এই তাঁর পণ। এম্‌নি করিয়া বিনা কারণে শুধু মজা দেখিবার জন্য

রক্তপাত ঘটাইতে আর তিনি দিবেন না। বেরসিক সন্ন্যাসীর কথায় কিন্তু উত্তেজিত জনতা শান্ত হইল না। দেখিতে দেখিতে শিলা-বৃষ্টির মত ইট-পাথর আসিয়া তাঁর গায়ে পড়িতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র, তার পরেই তাঁর রক্তাক্ত দেহ চির-জন্মের মত মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

তারপর সব চুপ্‌চাপ্‌। উন্মত্ত জনতা শান্ত হইয়া ভাবিতে লাগিল—একি করিলাম! সন্ন্যাসীর পবিত্র রক্তপাত, এ যে মহা পাপ—এ কলঙ্কের কি আর কিনারা আছে? সেদিনকার যুদ্ধ আর শেষ হইল না। সন্ন্যাসীর রক্তে কলোসিয়ামের শেষ উৎসব সাঙ্গ হইল।

তার পর কত বছর চলিয়া গিয়াছে। সে রোমান্‌রাও আজ নাই, সে আমোদ-প্রমোদও এখন আর হয় না; কিন্তু সেই নিষ্ঠুর, জঘন্য আমোদের স্মৃতি বুকে করিয়া কলোসিয়াম্‌ এখনও দাঁড়াইয়া আছে।

ছোট ছেলে

(শ্রীরসোদর শর্ম্মা)

নাট্টু বেচারার মনে বড় দুঃখ। ভাইবোনদের মধ্যে সকলের চাইতে ছোট বলিয়া কেউ আর তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতে চায় না। উঠিতে বসিতে বাধা, কোন কাজেই তার মতামতের কোনও মূল্য নাই। তাকে দরকার শুধু দাদা-দিদিদের হুকুম তামিল করিবার বেলায়। তা' নয় ত কি! নহিলে ছোড়দিটা পর্য্যন্ত কিনা যখন তখন তার উপর মোড়লি ফলাইতে আসে! কেন রে বাপু, দৈবক্রমে সে দু' বছর পরে জন্মিয়াছে বলিয়াই কি তাকে মুখ বুজিয়া সমস্ত অবিচার সহ্য করিতে হইবে? ছোড়দির সাথে তার তফাৎটা কোথায়? বয়স ছাড়া কোন বিষয়টায় সে বড়? লেখাপড়া? না হয় ধরিয়া লওয়া গেল যে উষা ইংরাজীটা একটু বেশী জানে, কিন্তু অঙ্কের বেলা?—হুঁ হু, নাট্টু এখন 'ইউনিটারি মেথড্‌' শেষ করিয়া 'স্কোয়ার রুট্‌' ধরিয়াছে—উষা ত' 'প্র্যাক্‌টিস্‌ই' শেষ করিয়া উঠিতে পারিল না। মেয়েদের মাথা ত' মাথা নয়, ঘুঁটের ঝুড়ি; ছোঃ।"

এইখানে তোমাদের চুপি চুপি একটা কথা বলিয়া রাখি। নাট্টু নিজেও যে অঙ্কে খুব 'তোখড়' তা' নয়—বরঞ্চ ঠিক তার উল্টা। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় প্রায় বারই অঙ্কের তিরিশটা

নম্বর সে আর তুলিয়া উঠিতে পারে না। আর সব বিষয়ে সে ভাল, টোটালেও সে ফার্ষ্ট্ ই হয়, কিন্তু শুধু ঐ অঙ্কটার জন্য তাকে প্রমোশন পাইতে হয় 'সেকেণ্ড্ চান্সে'। তবে হ্যাঁ, কষে সে উষার চাইতে ঢের ঢের কঠিন কঠিন অঙ্ক, কিন্তু বেয়াড়া উত্তরগুলি প্রায়ই ঠিক মত মিলিতে চায় না। তা' এতে আর নাটুর কি দোষ বল ?

কোনও দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নাটুর উপর দেওয়া হয় না। মা বলেন, "ছেলে মানুষ, ও পারবে কেন ?" কাকিমা বলেন, "বয়েসটাই বা কি, এই ত সেদিন হল।" দিদিরা হাসিয়া বলে, "হ্যাঃ, ও আবার করবে এ কাজ !" দাদারা ঠাট্টা করে, "তোর মত বয়সে আমরা···।" নাটু দেখাইতে চায়—সেও কারুর চাইতে কম নয়, তাকে সুযোগ দিলে, 'চান্স্' দিলে সেও তার প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু সেখানেই গলদ, তার সে কথায় তখন আর কেউ আমলই দেন না।

এই ত সেদিনকার একটা ঘটনা। কলিকাতা হইতে নৈহাটী কতটুকুই বা পথ,—না আছে গাড়ী বদল, না আছে আর কোনও হাঙ্গামা। নৈহাটী ষ্টেশনও প্রকাণ্ড, গাড়ী বহু ক্ষণ দাঁড়ায়। পিশে মশাই নিজে ষ্টেশনে আসিবেন তাহাও জানাইয়াছেন, কিন্তু তবু তাকে একা সেখানে যাইতে দেওয়া হইল না। বাবা নিজে গিয়া শিয়াল দ'য় তুলিয়া দিয়া আসিলেন, আর তার চাইতেও অপমান করিলেন সঙ্গে সেই ছাতুখোর ভগ্‌লু চাকরটাকে দিয়া,—সেই যেন ওকে চালাইয়া লইয়া যাইবে। কেন, সে কি পড়িতে জানে না ? ষ্টেশনের গায়ে বড় বড় অক্ষরে "নৈহাটী জংশন" কথাটা কি আর সে পড়িয়া লইতে পারিত না ?

ভগ্‌লু ত' ভারী 'কম্মো' করিল ;—শিয়াল দ' ছাড়িতে না ছাড়িতে লাগাইল ঘুম,—ঘুম ত নয়, রাম ঘুম। নাটু জাগাইয়া নৈহাটীতে নামাইয়া না দিলে বাছাধনকে একেবারে গোয়ালন্দে গিয়া উঠিতে হইত। তখন বাহির হইত গার্জ্জিয়ান্-গিরি, বেশ হইত তা' হইলে। অথচ এই ব্যাপারটা লইয়াই আবার দাদা-দিদিরা—বিশেষ করিয়া বিনয় আর উষা যখন তখন তা'কে খোঁটা দেয়—"তুই থাম্, একলা নৈহাটীটুকু পর্য্যন্ত যাবার মুরোদ নেই, তুই আবার···।" কি অন্যায় বল দেখি !

সেদিনও আর এক ব্যাপার। কিছু না, চায়ের টেবিলে বসিয়া বালীগঞ্জে তাদের যে নতুন বাড়ীটা তৈরী হইবে তারই প্ল্যান্ লইয়া আলোচনা হইতেছিল। সকলের দেখাদেখি নাটুও একটা সাজেস্‌শন্ দিয়াছিল মাত্র—বাড়ীর "ভেন্টিলেটারগুলি যেন মৌরের (ময়ূর) মত করা হয়—বেশ আর্টিষ্টিক্ হইবে তা' হইলে"। তারপর—ওঃ, ঘর শুদ্ধ লোকের সে কি অট্টহাসি ! যেন সবাই এক সাথে এক্‌জিবিশনের সেই লাফিং গ্যালারীটাতে ঢুকিয়াছে। সে ঘরে আবার সেই সময়ে বীরেন বাবু, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা সবাই ছিলেন। তাঁরা বাবার বন্ধু বটে, কিন্তু থাকেন সেই লাহোরে, বাংলা দেশে কালেভদ্রে আসেন—কাজেই এক রকম অপরিচিত বলিলেই চলে। তাদের সাম্‌নে

অমন করিয়া···? কেন, সে বাড়ীর ছোট ছেলে বলিয়া তার কি একটা আত্মসম্মান বলিয়া কিছু নাই ?

নাটুর মনে বড় লাগিল। সেদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া শুইয়া এই কথাটাই তার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল। পাশে দাদা বিনয় দিব্যি নাক ডাকাইতেছে, কিন্তু নাটুর চোখে আজ ঘুম নাই। নাঃ, এমন করিয়া আর টিঁকিয়া থাকা যায় না, এবার সে বিদ্রোহ করিবে। শুইয়া শুইয়া সে নানা রকম মতলব আঁটিতে লাগিল। আচ্ছা, এমন কোনও ওষুধ পাওয়া যায় না যা' খাইলে রাতারাতি চেহারাটাকে পঁচিশ বছরের জোয়ান্ মানুষের মত করিয়া ফেলা যায়—সেই যেমন উপকথায় আছে ; তা' হইলে বোধ হয় লোকে একটু সমীহ করিবে। কিংবা অন্ততঃ পক্ষে মুখে লম্বা লম্বা দাড়ী-গোঁফ গজাইবার কোন একটা ওষুধ পাইলেও চলিতে পারে। দাড়ী গজাইলে চেহারাটা অবশ্য একটু কুৎসিত দেখায় কিন্তু দাড়ীওয়ালা লোককে অনেকে বেশ ভয় করিয়া চলে। ঐ ত নেবুরাণীকেই দেখনা—বড়দা'র মেয়ে নেবুরাণী। এক বছরও তার বয়স হয় নাই—কী দস্যি মেয়ে, কিছুরই কোনও তোয়াক্কা রাখে না—কিন্তু দাদামশায়ের দাড়ী দেখিলে সেও একেবারে ঘাবড়াইয়া এতটুকু হইয়া যায়। নাটুর মনে হইল—বেশ ছিল পৌরাণিক যুগের দিনগুলি যখন সবই সম্ভব হইত। এখনকার দিনে কি আর ও সব ছাই বিশ্বাস করা চলে ! বিশ্বাস করিলে ত' লোকে তাকে সত্যি সত্যিই ছেলে-মানুষ ঠাওরাইবে, মানবেই না যে তার বয়স এই কার্ত্তিক মাসে বারো পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আচ্ছা, এক কাজ করিলে কেমন হয় ? সে যদি কাল ভোর বেলা সকলের আগে উঠিয়া কোথাও দূরদেশে—ধর যদি সটান্ বিলাত চলিয়া যায়, তবে কেমন হয় ! টাকা ?—টাকাই যদি সঙ্গে লইবে তবে আর বাহাদুরী হইল কিসে ? জাহাজে একটা চাকরী জুটাইয়া লইতে পারিলেই ত' হইল। অবশ্য সামান্য ২।৪ টাকা তবু হয় ত লাগিতে পারে—তা সেটা তার ঐ প্রাইজের বইগুলি কোনও একটা পুরানো বইএর দোকানে অৰ্দ্ধেক দামে বেচিয়া দিলেই পাওয়া যাইবে। তারা লইবে না ? আলবৎ লইবে। অমন সুন্দর সুন্দর গল্পের বই ! মা'র মনে হয় ত একটু কষ্ট হইবে। তা' একটু হওয়া ভাল। তাঁর স্নেহ এখন তার কাছে অত্যাচার বলিয়া মনে হয়। তার আতিশয্যেই ত' আজ তার এই দশা।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে নাটু স্বপ্ন দেখিল। নীল সমুদ্রের বুকে ঢেউ কাটিয়া কাটিয়া জাহাজ ছুটিয়াছে। চার ধারে যতদূর চোখ যায়—শুধু নীল, নীল, নীল,—আর কিছু না। মাঝে মাঝে দূরে জলের মধ্যে এক একটা তিমি বিরাট্ লেজের আছাড় মারিয়া মারিয়া জল তোলপাড় করিয়া তুলিতেছে ; তাদের মুখ দিয়া পিচ্‌কারির মত জল ছিট্‌কাইয়া পড়িতেছে। নাটুর হাতে জাহাজ চালাইবার কল, সম্মুখে কম্পাস্, ম্যাপ্ আরও কত রকম বিদ্‌ঘুটে যন্ত্র। জাহাজের ক্যাপ্টেন্ চোখে

দূরবীণ লাগাইয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছেন। হঠাৎ মাথার উপর দিয়া এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ উড়িয়া গেল। ক্যাপ্টেন্ আসিয়া বলিলেন, "ঐ যে দূরে মেঘের মত দেখ্‌ছ—ওটা কিন্তু একটা চুম্বকের পাহাড়। ওর কাছে গেলে জাহাজের আর রক্ষা নেই, জাহাজের সমস্ত লোহা টেনে নিয়ে যাবে। সাবধানে ডান দিক্ ঘেঁষে চালাও।" নাট্টু তাড়াতাড়ি কল ঘুরাইয়া দিল, একবার কম্পাস্ আর একবার ম্যাপ্‌টার দিকে তাকাইল। তার উপর আজ এতগুলি যাত্রীর জীবন-মরণের দায়িত্ব। আঃ, ছোড়দিটা যদি একবার দেখিত!

নাট্টুর যখন ঘুম ভাঙ্গিল তখনও ভাল করিয়া ভোর হয় নাই। গত রাত্রের স্বপ্ন তাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে; নাঃ, আর দেরী নয়। ছোট্ট একটা পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া সে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল, তার পর হাঁটিতে হাঁটিতে একেবারে ষ্ট্র্যাণ্ড্ রোডে গঙ্গার ধারে গিয়া হাজির হইল। জাহাজে চাকরী চাই, কিন্তু বড় বড় অফিস্‌গুলি তখনও কোনটা খোলে নাই। সে ইডেন্ গার্ডেনে ঢুকিয়া একটা বেঞ্চিতে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—বাড়ীতে একটা চিঠি দিয়া যাইবে কি না! তার পর ভাবিল, দূর্, তা' হইলে কি আর রক্ষা আছে, এক্ষুনি দলকে দল আসিয়া তাকে আবার জোর করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবে। তার চেয়ে থাক্, বোম্বাই কি এডেনে গিয়া চিঠি দিলেই চলিবে।

একটু বেলা হইলে সে আবার বাগান হইতে বাহির হইয়া পড়িল, তার পর সামনে একটা অফিসের ফটক খোলা দেখিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু গোড়াতেই বিপদ্। হঠাৎ কোথা হইতে এক বিরাট্ ভূঁড়ি লোটা হাতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল—"আরে, ইয়ে লেড়্‌কা-লোক কাঁহা ঘুষ্‌তা?" নাট্টু দেখিল, ভুঁড়ির অধিকারীটি একজন দ্বারোয়ান্ কোন বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় এখনও 'কেতা মাফিক' পোষাক পরিয়া লইতে পারে নাই। নাট্টু আকারে, ইঙ্গিতে, বাংলা-হিন্দীতে মিশাইয়া নানা ভাবে তার বক্তব্য বলিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু না পারিল সেই বিরাট্ ভূঁড়িকে এক তিল সরাইতে, না পারিল সেই ভুঁড়ির মালিকটিকে একটি বর্ণ বুঝাইতে। হায়রে, সাধে কি গান্ধীজি সবাইকে হিন্দী শিখিতে উপদেশ দিয়াছেন!

এমন সময় একখানা মোটর আসিয়া ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইল। তার ভিতর হইতে বছর চল্লিশ বয়সের একটি ফিট্‌ফাট্ চেহারার বাঙ্গালী ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। দ্বারোয়ান্ নাট্টুকে ছাড়িয়া আভূমি নত হইয়া তাঁকে সেলাম করিল। ভদ্রলোকটি নাট্টুকে দেখিয়া বেশ একটু অবাক্ হইয়াছিলেন, দ্বারোয়ান্ ব্যাপারটা বুঝাইয়া দিল।

বাবুটি কিন্তু লোক ভালই। নাট্টুকে তিনি ভিতরে লইয়া গেলেন। তার পর একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে স্তূপীকৃত কাগজে ভরা প্রকাণ্ড একটা টেবিলের পাশে বসিয়া আম্‌তা আম্‌তা

করিয়া নাট্টু তার মনের অভিলাষ জানাইয়া ফেলিল। কেন যে তার এই মতলব তাহাও বলিল।

বাবুটি অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর হঠাৎ নাট্টুকে নানা রকম প্রশ্ন করিতে সুরু করিলেন—"ইয়োরোপে ত যাবে, প্রথম কোথায় নাম্‌বে? মার্সেলিস্? সেটা ক্যালে থেকে কদ্দূর? জিব্রাল্‌টার ঘুরে গেলে দোষ কি? সুয়েজটা ক' মাইল্ লম্বা, কাদের জায়গা সেটা? রেড্ সি নাম হ'ল কেন? ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন। এ সব জিনিষ নাট্টুর কণ্ঠস্থ, সে একটুও ঘাবড়াইল না। মনে হইল বাবুটি বেশ খুসী হইয়াছেন।

বিরাট্ ভুঁড়ি……পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।

আর একটু বেলা হইলে বাবুটি নাট্টুকে লইয়া নিজের বাড়ীতে গেলেন, তারপর তাকে বৈঠকখানায় বসাইয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে টেবিলের উপরকার কাগজপত্র দেখিয়া নাট্টু আবিষ্কার করিল—ভদ্রলোকটির নাম সুশীল বাবু। খানিক পরে সুশীল বাবু ফিরিয়া আসিলেন। তার পর আরও অনেক কথা হইল—ঘরের কথা, বাহিরের কথা। অমন ভাল মানুষ, তাঁর কাছে কি কিছু গোপন করা যায়?

চাকর আসিয়া জানাইল—খাবার তৈরী। সুশীল বাবু টেলিফোন্ গাইড্‌টা টানিয়া লইয়া নাট্টুকে বলিলেন, "যাও তুমি স্নান করে নেও, আমি একটু পরে যাচ্ছি। খাওয়া দাওয়ার পর জাহাজে যাওয়া যাবে, কেমন?"

নাট্টু ভাবিয়াছিল, সে জাহাজে চাকরী লইয়া বিলাত যাইতেছে—বাড়ীর মেয়েরা নিশ্চয়ই তাকে একটু সমীহ করিবে—অন্ততঃ তার কাছে বাহির হইবে না নিশ্চয়ই, কিন্তু কাজের বেলা,

দেখা গেল সুশীল বাবুর স্ত্রী তাকে নিতান্ত ছেলে-মানুষের মত কাছে বসাইয়া খাওয়াইতেছেন, আর তাঁর মেয়ে সে বোধ করি তার ছোড়দির বয়সীই হইবে—সামনে দাঁড়াইয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে। মেয়েটার নির্লজ্জতা দেখিয়া নাট্টুর বড় রাগ হইল। মনে মনে ভাবিল, "মেয়েগুলি দেখ্‌ছি সব সমান।"

দুপুর বেলা সুশীল বাবু নাট্টুকে লইয়া বাহির হইলেন। পথে কতকগুলি বই কিনিয়া নাট্টুর হাতে দিয়া বলিলেন, "প'ড়ে দেখ, বেশ সহজ। বিলাত যাবার আগে খুব কাজে লাগ্‌বে।" বই-গুলি সবই নানা দেশের ভ্রমণ-কাহিনী। তার পর গঙ্গার ধারে গিয়া তিনি নাট্টুকে লইয়া একটা মস্ত জাহাজের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন নাট্টু এর আগে কখনও জাহাজের ভিতর আসে নাই, সে অবাক্ হইয়া গেল। তার পর কল-কব্জার ঘর। ওরে বাবা! ভাল করিয়া তাকান'ই যে যায় না! কাল রাত্রে স্বপ্নে এ সবের কল্পনাও ত' সে মনে আনিতে পারে নাই। সুশীল বাবু নাট্টুর পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "কেমন, পার্‌বে ত এ সব চালাতে?" "পার্‌ব" বলিতে নাট্টুর বেশ খানিকটা ভয় হইল—কিন্তু দূর্, এখন কি আর পিছ-পা হইলে মুখ দেখাইবার যো আছে?

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। জাহাজ ছাড়িবে আর দিন দুই পরে। আবার মোটরে উঠিয়া সুশীল বাবু নাট্টুকে বলিলেন, "জাহাজ চালাবার আগে অবশ্য কিছুদিন কল-কব্জা শিখ্‌তে হবে।" তার পর সে সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল; শেষে সুশীল বাবু বলিলেন, "ভাল কথা, কল-কব্জা শিখ্‌বার আগে কিন্তু আর দু'টো জিনিষ ভাল করে শিখে নেওয়া চাই। একটু ইংরেজী—বিদেশে গেলে ওটার বড্ড দরকার। আর একটু অঙ্ক—ওটা না হ'লে ত' কল-কব্জাগুলো বুঝ্‌তে পারবে না। কেমন? আচ্ছা, এবার তবে শেখ' গিয়ে। ঐ দেখ তোমার মাষ্টারমশাই বোধ হয় বসে আছেন।" নাট্টু অবাক্ হইয়া দেখিল, তাদেরই নিজেদের বাড়ীর ভিতর মোটরখানা ঢুকিতেছে।

নাট্টু আরও আশ্চর্য্য হইল এই দেখিয়া যে তার জন্য বাড়ীর কেউই একটুও ব্যস্ত হয় নাই এবং সে ছাড়া বাড়ীর সবাই সুশীল বাবুকে চেনে। তার পর শোনা গেল—সুশীল বাবুর সঙ্গে তাদের অনেক দিনের জানা-শোনা—মাঝে বহুদিন তিনি এদেশে ছিলেন না বলিয়া এতদিন দেখা-শোনা হয় নাই। এই সবে কয়েক দিন হইল তিনি দেশে ফিরিয়াছেন। সুশীল কাকার কথা নাট্টুও যে আগে শুনে নাই তা নয়, কিন্তু ইনিই যে তিনি তা সে কেমন করিয়া জানিবে বল? সুশীল বাবু বলিলেন, "আমি যখন এখান থেকে যাই তখন তুমি জন্মাওইনি। উষা সবে হয়েছে, তুমি ত' সব্বার ছোট কি না!" তার পর ইহাও জানাইলেন যে নাট্টু বাড়ীর ছোট ছেলে—তার অদর্শনে বাড়ীতে নিশ্চয়ই হৈ চৈ পড়িয়া যাইবে তাই তিনি সকালেই টেলিফোন্ করিয়া তাদের বাড়ীতে জানাইয়াছেন যে 'মর্ণিং ওয়াক্' করিতে করিতে নাট্টুর সাথে তাঁর দেখা হয়, পরিচয় পাইয়া তিনি

তাকে তাঁর বাড়ীতে লইয়া আসিয়াছেন এবং নাট্টু তাঁর অভিভাবকত্বে নিরাপদেই আছে। আসল ব্যাপারটা 'কায়দা' করিয়া চাপিয়া গিয়াছেন। বাড়ীর লোকেরাও নাকি শুধু সেই আশ্বাসেই এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিল। নাট্টু পাছে গোলমাল করে তাই তাকে তিনি কিছু বলেন নাই।

মুহূর্ত্তের মধ্যে নাট্টুর মন সুশীল বাবুর উপর বিষাইয়া উঠিল। ওঃ, বাড়ীর ছোট ছেলে, ছেলে মানুষ, কিছু বোঝে না,—তাই তিনি দয়া করিয়া তার ভার লইয়াছিলেন। তাকে ভুলাইয়া তার সমস্ত প্ল্যান্ মাটী করিয়া এমনি করিয়া তার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। ছিঃ।

সেই দিনই নাট্টু প্রতিজ্ঞা করিল—জন্মান্তর-বাদ বলিয়া যদি সত্যিই কিছু থাকে তবে পরের জন্মে সে যদি বাড়ীর বড় ছেলে হইয়া জন্মাইতে পারে তবেই জন্ম-গ্রহণ করিবে, নচেৎ নয়। এ জন্য যদি তাকে জন্ম জন্ম ধরিয়া ভূত হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়—সে ভি আচ্ছা।

নারিকেল

(শ্রীমনোরমা দেবী)

কোন গাছ যদি প্রাণ দিয়া মানুষের সেবা করে তবে বোধ করি তা নারিকেল গাছ। অন্যান্য সমস্ত গাছেরই কোন না-কোন অংশ আমরা অকেজো আর নয় তো নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া ফেলিয়া দিই; নারিকেল গাছ সম্বন্ধে কিন্তু ওটী বলা চলে না।

প্রথমে ফল হইতেই সুরু করা যাক্। গ্রীষ্মকালে তোমরা যে ডাবের জলের নাম শুনিতেই অজ্ঞান হইয়া পড় সেটী কাঁচা অবস্থায় এই ফলেরই জল ছাড়া আর তো কিছুই নয়! শুধু খাইতেই সুস্বাদু নয়, ডাবের জলের অনেক গুণ। ডাক্তারেরা অনেক অসুখ-বিসুখে আজকাল এই জলের পথ্য দেন। রক্ত পরিষ্কার করার ক্ষমতাও নাকি এ জলের বেশ আছে।

তার পর ধর নারিকেলের নেওয়া বা শাঁস। শাঁস কুরাইয়া তোমাদের মা-দিদিরা কত রকম মেঠাই-মোণ্ডা বানাইয়া যে খাওয়ান তার খবর রাখ কি? তরকারি-পাতিতেও আমরা সর্ব্বদাই শাঁসের কুচি দিই—তাতে জিনিষের স্বাদ ঢের বাড়িয়া যায়। নারিকেলের শাঁস একটী অতি পুষ্টিকর খাদ্য, কাজেই সাহেব-সুবোদের কাছেও ইহার কদর আছে। য়ুরোপের গরীব লোকেরা নারিলের শাঁস সিদ্ধ করিয়া খায়, কখনো কখনো বা আটা-ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া রুটি গড়ে। ফলে অল্প পয়সায়

বেশ পুষ্টিকর খাবার জুটিয়া যায়। শুধু গরীব লোক নয়, 'বড় আদমী'দের খাবারের টেবিলেও আজকাল যে কেক্-বিস্কুট ওঠে তাহাতেও কারিকরেরা এই পুষ্টিকর নারিকেলের শাঁস মিশাইয়া দেয়। নারিকেলের দুধ জিনিষটীও বেশ উপাদেয়। অবশ্য দেখিতে দুধের মত বলিয়াই আমরা ইহাকে দুধ বলি, আসলে দুধে যে সব উপাদান আছে তা ইহাতে নাই। ততটা না থাক্, সার পদার্থ ইহাতেও যথেষ্ট আছে। এই 'দুধ' চূণের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়ালে লাগাইলে চমৎকার রংয়ের খোল্তাই হয়।

নারিকেল বাগান।

তার পর নারিকেলের খোল বা মালা। ঠাকুরদাদাদের এটী অবশ্য খুবই পেয়ারের জিনিষ, কেননা নারিকেল-খোলের অভাব হইলে ডাবা হুঁকায় তামাক খাওয়া একটু মুস্কিলেরই ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত। নারিকেলের মালাকে সহজেই ইচ্ছামত বাঁকিয়া চুরিয়া লওয়া চলে। ফলে, বোতাম প্রভৃতি জিনিষ তৈরীতে এগুলি হামেশাই লাগে। প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি আসল নারিকেলের দেশ—সেখানে বহু লোক নারিকেল-মালার বাসনপত্র ব্যবহার করে। নারিকেলের মালা হইতে ওষুধ তৈরী করা চলে, তা জানো? মালাকে আগুনে পোড়াইয়া সেই মালা লাল থাকিতে থাকিতে একটা পাথরের বাটীর ভিতর রাখিয়া দিলে, পরে আগুন নিভিয়া গেলে দেখা যায় তাহাতে ঘামের মত জল লাগিয়া আছে। চুল্‌কানি-দাদ্ প্রভৃতিতে এ জল খুবই উপকারী।

মালার মত নারিকেলের ছোব্‌ড়াও অনেক কাজে আসে। গদি, ঘোড়ার

সাজ প্রভৃতি তো হয়ই, আরও যে একটী প্রধান জিনিষ তৈরী হয় সেটী দড়ি। সাধারণতঃ ছোবড়াগুলিকে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিয়া পরে মুগুরে পিটিয়া আঁশ তৈরী করা হয়; পরে চরকার মত সেই আঁশ হইতে দড়ি বাহির করে। নারিকেলের দড়ি খুবই মজবুৎ। নারিকেলের শাঁসকে ঘানিতে পিষিলে যে তেল বাহির হয় সে তেল একটী বিশেষ মূল্যবান্ সামগ্রী। আমাদের দেশের মেয়েরা চুল বাড়াইবার জন্য মাথায় নারিকেল-তেল মাখে, আবার দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেখ, সেখানকার মেয়েরা এই নারিকেল তেলেই দিব্যি রান্নাবান্না চালাইতেছে। কোচিনের নারিকেল তেলই সব চাইতে সেরা। এ ছাড়া, সাবান তৈরীর কাজে নারিকেল তেলের ব্যবহার, নানা রকম ওষুধপত্র তৈরীতেও এ তেলের দরকার, আর আর্টিষ্ট্‌রা যে অমন জৌলস-ওয়ালা রং-চংএ ছবি আঁকে সে রংয়ের ভিতরেও নারিকেলের তেল। নারিকেল গাছের কচি শিকড় কুচি কুচি করিয়া শুপারির বদলে পানে খাওয়া যায়। এই রকমে নারিকেল গাছের পাতায় ঝুড়ি-টুক্‌রি, ডাঁটায় ঝাঁটা, গুঁড়িতে নৌকা-ডোঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বদাই তৈরী হইতেছে। এমন অনেক দ্বীপ আছে যেখানকার লোকেদের নারিকেল গাছই প্রাণ—নারিকেল ফল তাদের খাবার, নারিকেল গাছে তৈরী জিনিষপত্রই তাদের 'তৈজস'; থাকিবার ঘর পর্য্যন্ত নারিকেল-গুঁড়ির থামের উপর নারিকেল পাতায় ছাওয়া।

পাখীর বাসা—নারিকেল ফলের এ ব্যবহারটী বোধ হয় সম্পূর্ণ নুতন।

নারিকেল গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের ফল। আমাদের বাংলাদেশে সমুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গার দুই ধারে দু'শো মালই পর্য্যন্ত নারিকেল গাছ দেখা যায়—অবশ্য যত্ন করিয়া লাগাইলে অন্যান্য স্থানেও এ গাছ হয়। এ গাছের কিন্তু অনেক শত্রু। এক রকম পোকা

মাটীর নীচ হইতে শিকড় দিয়া গাছের ভিতরে ঢোকে, তারপর একেবারে গুঁড়ি ফুঁড়িয়া বাহির হয়। এ অবস্থায় গাছকে বাঁচাইতে হইলে তার মাথায় খানিকটা লবণ ঢালিয়া দিলে বেশ উপকার দেখা যায়—লবণ ধীরে ধীরে গাছের ভিতরে ঢুকিয়া পোকার বাছাদের শুধু গাছ-ছাড়া নয়, জান্‌-ছাড়া করিয়া তবে ছাড়ে। নোয়াখালি, বরিশাল, যশোর এবং ২৪ পরগণায় যথেষ্ট নারিকেল জন্মে। বোম্বাই, মহীশূর, মান্দ্রাজ প্রভৃতি জায়গার শুঁড়িরা আবার নারিকেল হইতে মদ তৈরী করিতেও ওস্তাদ্‌। লঙ্কা-দ্বীপে এক রকম খুব ছোট জাতের নারিকেল দেখা যায়, সেগুলি খাইতে নাকি অতি সুস্বাদু।

কিন্তু আগেই বলিয়াছি নারিকেলের আসল মুলুক—প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি। কত 'সাহেব লোক' এ সব জায়গায় ব্যবসা করিয়া একেবারে 'লাল' হইয়া যাইতেছে হইবার কথাও বটে। এক একটী গাছ সত্তর-আশী বছর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে এবং বছরে প্রায় শ' দুই করিয়া ফল দেয়। কাজেই ভাল মত নারিকেল বাগান বসাইতে পারিলে টাকা মারে কে? ফি বছরে দেশ-

অস্থানে নারকেল গাছ।

বিদেশে চালান যাইবার জন্য এ সব বাগানে কি পরিমাণ ফল জড় হয়, হাতের কাছে থাকিলে তার একটা ছবি ছাপাইয়া দিতাম। দেখিতে কি তাজ্জব ব্যাপার!

নারিকেল গাছ অনেক অস্থানেও ভারী অদ্ভুত ভাবে জন্মে। সমুদ্রের পাড়ে কোন দ্বীপে হয় ত গাছ ফলে ভরিয়া গেল। তারপর টপ্‌ করিয়া একটী পাকা ফল জলে পড়িল। সমুদ্রের ঢেউয়ে হয় তো ধাক্কা খাইতে খাইতে সে ফল বহু দূরের কোন

মুলুকে গিয়া উঠিল—যেখানে কস্মিন্‌ কালেও নারিকেলের নাম গন্ধ নাই। ব্যস্‌, কয়েক বছর পরে গিয়া দেখ সেখানে সেই ফল হইতেই তোফা এক নারিকেল গাছ গজাইয়াছে। শোনা যায়, জাহাজডুবির পর কখনো কখনো নাবিকেরা নাকি কোন দ্বীপে উঠিয়া সমুদ্রের ঢেউয়ে আনা এই রকমের নারিকেল খাইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত বাঁচাইয়াছে।

ভানুমতীর বাঘ

(শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র)

সাম্‌নে বড় দিনের ছুটি।

কোথায় যাব, কেমন ক'রে ছুটিটা কাটাব ভাবছি এমন সময়ে খবরের কাগজের একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ বড় দিনের ছুটি কাটাবার সমস্ত বন্দোবস্ত মনে মনে ঠিক ক'রে ফেল্‌লাম।

খবরের কাগজে বিহার ও উড়িষ্যার বন বিভাগের বড় কর্ম্মচারী বিজ্ঞাপন দিয়েছেন যে মুঙ্গের জেলার ভেতর জামালপুর সহর থেকে কিছু দূরে একটি পাহাড়ের কাছে মানুষ-খেকো একটি কেঁদো বাঘের ভয়ানক উপদ্রব সুরু হয়েছে। সেখানকার গ্রামবাসীরা ভয়ানক বিপন্ন। যদি কোন শিকারী অনুগ্রহ ক'রে বড় দিনের ছুটিতে সে বাঘটি মারবার ব্যবস্থা করেন তা' হ'লে গ্রামবাসীদের পরম উপকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরও শিকারের আমোদ কিছু লাভ হ'তে পারে। এ বিষয়ে আর যা কিছু জানবার বনবিভাগের কর্ম্মচারীর কাছে চিঠি লিখলে তিনি তা' সাগ্রহে জানাতে প্রস্তুত।

তৎক্ষণাৎ বিহার-উড়িষ্যার ফরেষ্ট অফিসারের কাছে চিঠি লিখে দিলুম এবং শিকারের সাজ সরঞ্জাম ঠিক করে প্রস্তুত হতে লাগ্‌লুম।

এর আগে বাঘ-শিকার আমি কয়েক বার করেছি বটে কিন্তু তাদের কোনটাই মানুষ-খেকো নয়। সাধারণ বাঘ আর যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে তার মধ্যে তফাৎ যে কি ভয়ানক বেশী তা হাতে-বন্দুকে শিকার যে না করেছে তাকে ব'লে বোঝান এক রকম অসম্ভব। ভালো বন্দুক ও হাতের টিপ থাক্‌লে সাধারণ বাঘ শিকারে বিপদ বিশেষ কিছু নেই বল্লেই হয়। সাধারণ বাঘ বনের আর সব জানোয়ারের মতই ভীতু। মানুষের হাত থেকে কোন রকমে পালাতে পার্‌লেই সে বাঁচে। আহত না হ'লে বা নেহাৎ বেকায়দায় না পড়লে সে আক্রমণই করে না। কিন্তু যে

বাঘ নর-রক্তের একবার স্বাদ পেয়েছে তার সয়তানীর আর সীমা নেই। মানুষের রক্ত খাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বুদ্ধিও সে যেন আয়ত্ত করে ফেলে। নিজে কখন শিকার করিনি কিন্তু মানুষ-খেকো বাঘ যারা শিকার করেছে তাদের কাছেই শুনেছি যে সাক্ষাৎ সয়তানের চেয়েও সে ভয়ঙ্কর। সে যেমন চতুর তেমনি হিংস্র। কত রকম ফন্দি-ফিকির ক'রে সে যে মানুষ মারে তার আর অন্ত নেই।

সাধারণ বাঘ নয় সত্যিকারের মানুষ-খেকো বাঘ শিকার কর্‌তে পাব ভেবে সত্যি সত্যিই মনে আনন্দ হচ্ছিল।

দিন তিনেকের ভেতরই ফরেষ্ট অফিসারের চিঠি এসে গেল।

জামালপুর ষ্টেশনে নেমে কি ভাবে বাঘের উপদ্রবের জায়গায় যেতে হবে তিনি তার বিবরণ দিয়েছেন। জামালপুরের কাছেই যে পাহাড়-শ্রেণী আছে তারই ভেতরকার একটি উপত্যকায় ছোট একটী গ্রাম। সে গ্রামের চারিদিকেই পাহাড়ের দেয়াল উঁচু হ'য়ে আছে। জামালপুর থেকে সেখানে যাবার একটী মাত্র পথ। তাতে গরুর গাড়ী চলে না, হেঁটে যেতে হয়। তবে জিনিষপত্র বয়ে নিয়ে যাবার মত কুলির ব্যবস্থা ফরেষ্ট অফিসার নিজেই করে রাখবেন জানিয়েছেন।

ছুটি সুরু হতেই রওনা হয়ে পড়লাম। জামালপুরে নেমে দেখলাম ফরেষ্ট অফিসার আগে থেকেই কুলি মোতায়েন রেখেছেন। একটা দিনও নষ্ট করবার ইচ্ছে আমার ছিল না। সেই দিন সকালেই চার জন কুলির ঘাড়ে মাল চাপিয়ে পাহাড়ের পথে যাত্রা কর্‌লাম।

পথ খুব দীর্ঘ নয় কিন্তু পাহাড়ের ভেতর দিয়ে চড়াই উৎরাই দিয়ে যাওয়া বিশেষ কষ্টকর। বিকেল নাগাদ আমরা সরু একটা পাহাড়ের পথে এসে পড়লাম। কুলিরা বল্লে, এই পথ দিয়ে খানিকটা এগুলেই আমাদের গন্তব্য স্থান দেখা যাবে।

মিনিট দশেক সেই পথ দিয়ে যাবার পরই সাম্‌নে যে দৃশ্য দেখলাম তা ভোলবার নয়।

পার্ব্বত্য পথটি হঠাৎ সেখানে নীচে নেমে গেছে। নীচে ছবির মত একটি উপত্যকা। তার তিন ধারেই পাহাড়ের দেয়াল। মাঝখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একটি গ্রাম ও তারই ধারে ধারে ভুট্টা ও গমের ক্ষেত। পাহাড়ের ওপর থেকে সমস্ত দৃশ্যটা এমন সুন্দর, শান্তময় দেখাচ্ছিল যে এই খানেই আমি দুর্দ্ধর্ষ একটা কেঁদো বাঘ শিকার করতে চলেছি সে কথা আমার মনেই ছিল না। অমন সুন্দর শান্তিময় জায়গায় মানুষ সারা দিনরাত বাঘের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে আছে এ কথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়?

কিছুক্ষণ বাদেই গ্রামে পৌঁছুলাম। গ্রামের মোড়লকে দেখা কর্‌বার জন্যে ডাক্‌তে পাঠিয়ে রাত্রের মত তাঁবু ফেল্‌বার বন্দোবস্ত কর্‌ছি এমন সময় ভারী মোটা গলায় 'হ্যালো' শুনে চম্‌কে উঠ্‌লাম। এই জঙ্গলে বাঘের রাজ্যে আবার 'হ্যালো' বলে কে!

ফিরে দেখি মোটাসোটা লম্বা-চওড়া ধরণের এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। পরনে তাঁর খাকি প্যাণ্ট ও সার্ট, হাতে একটা দো-নলা বন্দুক।

লোকটিকে আগে কখন দেখিনি। কিন্তু পরিচয় কর্‌বার কোন রকম চেষ্টা কর্‌বার আগেই তিনি সবলে আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন—"দু'জনেই এক পথের পথিক"—তারপর হাসি। লোকটির চেহারা যেমন বিশাল, গলার আওয়াজও তেম্‌নি বাজখাঁই ধরণের।

আমার কাছে কোন রকম উত্তরের অপেক্ষা না করেই তিনি নিজের কথা বলে যেতে লাগ্‌লেন।

তাঁর কথায় জান্‌লাম যে দিন সাতেক ধ'রে তিনি এই বাঘের সন্ধানে এখানে ঘুর্‌ছেন, এখনও পর্য্যন্ত বাঘ শিকার করা দূরে থাক্ তার পাত্তাই পান নি। অথচ এই সাত দিনের ভেতর দুটো মোষ ও একজন মানুষ বাঘের হাতে মারা পড়েছে। তিনি যদি উত্তর দিকে বাঘের খোঁজে যান ত' শোনেন বাঘ দক্ষিণ দিকে উপদ্রব করছে, আবার তাই শুনে দক্ষিণ দিকে রওনা হ'লে শোনা যায় বাঘ উত্তর দিকে এসেছে। অনেক বাঘ তিনি শিকার করেছেন কিন্তু এমন নাকাল কখনও হন নি।

তাঁর কথার শেষে একটু ফাঁক পেয়ে বল্লাম,—"কিন্তু দু'জনে মিলে শিকার কর্‌লে আর একটু সুবিধে হয় ত' হবে।"

তিনি যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে বল্লেন, "তা হতে পারে।"

তার পর খানিক চুপ্ করে থেকে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"গাঁয়ের লোকেরা কি বলে জানেন? বলে এ ভানুমতীর বাঘ, কোন শিকারীর সাধ্য নেই একে ছোঁয়। আমাদের আগে আরো তিন জন শিকারী সাহেব নাকি হয়রাণ হয়ে হার মেনে স'রে পড়েছে।"

আমায় হাস্‌তে দেখে তিনি আরো গম্ভীর হ'য়ে বল্লেন, "নেহাৎ ঠাট্টার কথা নয় মশাই, চোখের ওপর থেকে এ বাঘ এমন ভাবে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় যে মনে হয় যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে গেল।"

বল্লাম—"বাঘেদের লুকোবার ক্ষমতা অসাধারণ বলেই শুনেছি।"

তিনি শুধু গম্ভীর ভাবে বল্লেন—"হুঁ।"

খানিক বাদে মোড়ল এসে সেলাম দিলে। লোকটা দেখ্‌লাম আমাদের ওপর বিশেষ সন্তুষ্ট নয়। নেহাৎ না দিলে নয় তাই বাঘের খবর একটু আধটু দিলে। তাদের বিশ্বাস শিকারীরা এসে ঘাঁটাচ্ছে বলেই বাঘের উপদ্রব এত বেড়েছে।

বল্লাম, "শিকারীরা চলে গেলে বাঘের হাতে গ্রাম যে ওজাড় হয়ে যাবে!"

মোড়ল একটু রাগের স্বরেই জানালে—শিকারীরা থেকেই যেন সব হচ্ছে। এই যে পাঁচ

পাঁচটা লোক বাঘের হাতে মারা গেল, পার্‌লে শিকারীরা তার কিছু কর্‌তে? এ ভানুমতীর বাঘ, তারা ভাল রকম টের পেয়েছে। ভানুমতীর পূজো না কর্‌লে এ বাঘ কেউ তাড়াতে পারবে না।

বল্লাম—"তা তোমরা পূজো কর না কেন?"

মোড়ল বল্লে—"শিকারীরা বন্দুক নিয়ে গ্রামে থাক্‌তে পূজোর ফল হবে কেন?"

হেসে বল্লাম—"এ যে ভানুমতীর বাঘ এ কথা কেমন করে জান্‌লে?"

মোড়ল গম্ভীর হয়ে বল্লে—"দু'দিন থাক্‌লে আপনিও টের পাবেন।"

খুব খানিকটা হাসলাম, কিন্তু দেখ্‌লাম অপর শিকারী ভদ্রলোকও সে হাসিতে যোগ দিলেন না।

কিন্তু সে হাসির জন্যে পরের দিনই অনুতাপ কর্‌তে হবে কে জান ত! সকালেই আমাদের এক জন লোক এসে খবর দিলে গ্রামের উত্তরে ভুট্টা-ক্ষেতের পাশে বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেছে। জন কুড়ি জঙ্গল তাড়াবার লোক নিয়ে তৎক্ষণাৎ সেদিকে রওনা হলাম। অপর শিকারী ভদ্রলোকের নাম অজয় বাবু। তিনিও সঙ্গে এলেন। কিন্তু তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ল বাঘ মার্‌বার আশা বিশেষ তিনি রাখেন না। মনে মনে হেসে ভাব্‌লাম ভদ্রলোকের এ কয় দিন গ্রামের লোকেদের সঙ্গে বাস করে বুদ্ধিশুদ্ধিতে একটু মরচে পড়ে গেছে বোধ হয়। মনে হ'ল গ্রামবাসীদের মত তাঁরও ভানুমতীর বাঘে বিশ্বাস হয়েছে।

যেখানে বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গিয়েছিল সেখানে পৌঁছে মনে হ'ল ভাগ্য আমাদের ভাল। পায়ের দাগ দেখে বোঝা গেল বাঘ খুব অল্প সময় আগেই সেখান দিয়ে গেছে। শুধু যায় নি, কোন একটা ভারী জিনিষ টেনে নিয়ে গেছে—পায়ের দাগ খুব গভীর ভাবে সেজন্যে মাটিতে পড়েছে।

আর একটু এগুতেই ভারী জিনিষটা যে কি তা বোঝা গেল। গাঁয়ের একটি বলদ লুকিয়ে বোধ হয় সকাল বেলা ভুট্টা ক্ষেতে চর্‌তে এসেছিল। চুরির শাস্তি তার হাতে হাতে মিলে গেছে। তার রক্তাক্ত মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে দেখা গেল। আশে পাশে বাঘের পায়ের দাগ। বাঘ বলদের পেট চিরে শুধু হৃদপিণ্ডটি খেয়ে গেছে। আমরা এসে পড়ায় বোধ হয় তার আহার শেষ কর্‌তে পারেনি।

অজয় বাবু বল্লেন—"কিন্তু বেশী দূর এখনো যেতে পারেনি। মাটিতে রক্তটা কি রকম টাট্‌কা দেখছেন ত!"

আমারও তাই মনে হ'ল। দশ জন করে লোক দু'ধারে বন তাড়াবার জন্যে পাঠিয়ে অজয় বাবু ও আর দু'জন লোক নিয়ে মাঝে অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌লাম।

যেখানে আমরা দাঁড়িয়েছিলাম তার সাম্‌নের জঙ্গল কিছু দূরে গিয়েই পাহাড়ে শেষ হয়েছে।

মনে হ'ল—বাঘকে তাড়িয়ে কোন রকমে পাহাড়ের দিকে নিয়ে যেতে পার্‌লেই বাছাধনের আর পালাবার পথ থাক্‌বে না। অজয় বাবুরও দেখ্‌লাম উৎসাহ একটু বেড়েছে। বল্লেন—"আপনার ভাগ্য ভাল মশাই এমন কায়দায় কোন দিন বাঘকে পাওয়া যায় নি।"

তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই ডান দিকে ক্যানাস্তারা বাজাবার শব্দ পাওয়া গেল। বোঝা গেল আমাদের লোকেরা বাঘের সন্ধান পেয়েছে। খানিক বাদেই এক জন লোক দৌড়োতে দৌড়োতে এসে খবর দিলে যে বাঘ তারা দেখ্‌তে পেয়েছে; তাদের সাড়া পেয়ে বাঘ পাহাড়ের দিকে গেছে। বাঁ ধারের লোকেরাও ধীরে ধীরে ইতিমধ্যে বন তাড়িয়ে এগিয়ে আসছিল। বাঘের চারি ধারে বেড় দিয়ে তাড়া দেবার আদেশ দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। যত পাহাড়ের কাছে পৌঁছোলাম জঙ্গলও তত পাৎলা হয়ে আসছিল। পাহাড়ে জমির মাঝে মাঝে দু'একটা ঝোপ, তার ভেতর লুকোলে অনায়াসেই বাঘকে খুঁজে বার করা যাবে। মনে হ'ল ভানুমতীরই হোক আর যারই হোক বাঘের জারি জুরি আজ বেরিয়ে যাবে। পাহাড়টা সাম্‌নে রেখে আমরা ক্রমশঃ বাঘের চারি ধারের বেড় ছোট করে আনছিলুম। বাঘকে পালাতে হ'লে এখন আমাদের ভেতর দিয়েই পালাতে হবে এবং এই রকম খোলা জায়গায় সে রকম ভাবে পালাতে গেলে তার নিস্তারের বিশেষ আশা নেই।

হঠাৎ আমাদের সাম্‌নের কিছু দূরের একটি ঝোপ ন'ড়ে উঠ্‌ল এবং ভীষণ গর্জ্জন করে একটি প্রকাণ্ড বাঘ পাহাড়ের দিকে বিদ্যুতের বেগে ছুটে গেল। তখনই গুলি কর্‌তে পার্‌তাম কিন্তু পাহাড়ের দিকে যখন গেছে তখন পরে আরো সুবিধা হবে ভেবে আমরা তার পেছু পেছু এগিয়ে গেলাম।

সাম্‌নেই পাহাড়ের খাড়া প্রাচীর; সেখানে বাঘের লুকোবার মত একটি ঝোপও নেই। নেহাৎ মৃত্যু ঘনিয়েছে বলেই মনে হ'ল বাঘ সেদিকে দৌড়েছে। আর একটু এগুবার পরই বাঘকে আবার দেখা গেল। এবার তার ভাব গতিক দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তার চারিধারে যে আমরা তাকে ঘিরে তাড়া কর্‌ছি তাতে যেন তার ভ্রূক্ষেপই নেই। গদাই-লস্করি চালে পাহাড়ের একটা উঁচু ঢিবির ওপর দিয়ে সে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। বন্দুকের নাগালের একটু বাইরে পড়ে বলে গুলিও আমরা ছুঁড়্‌লাম না। খানিক বাদেই আমরা পাহাড়ের একেবারে ধারে গিয়ে পড়্‌লাম। তিন দিকে আমাদের লোকজন, সাম্‌নে পাহাড়. বাঘকে এবার দেখা দিতেই হবে।

দেখাও মিল্‌ল। যে দিক থেকে আমরা তাড়া কর্‌ছিলাম তারই সাম্‌নে পাহাড়ের খানিকটা থাকের মত জায়গা। হঠাৎ বাঘটাকে সেইখানে দেখা গেল। আমাদের সাম্‌নে একটা উঁচু ঢিবি। আমরা যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে সে ঢিবিতে উঠ্‌তে গেলে কয়েক পা নেমে আবার উঠ্‌তে হয়। উঁচু ঢিবি থেকে তাগ কর্‌বার বেশী সুবিধে হবে জেনেও পাহাড়ের ওই জায়গা

থেকে বাঘের পালাবার উপায় নেই বুঝে আমরা দ্রুতপদে একটু নেমেই সে ঢিবিতে উঠে পড়্‌লাম।

কিন্তু কোথায় বাঘ ?

এক ঢিবি থেকে নেমে আর এক ঢিবিতে উঠ্‌তে মাত্র দু' সেকেণ্ড বাঘটা আমাদের চোখের আড়াল হয়েছে। এই দু' সেকেণ্ডের মাঝে এতগুলো লোকের মাঝখান থেকে বাঘ অদৃশ্য হয়ে গেল কেমন করে ?

পাহাড়ের যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল তার আশে পাশে পালাবার কোন জায়গা তার নেই। সে চেষ্টা করলে আমাদের চোখে নিশ্চয়ই সে ধরা পড়ত।

তবে ?

অজয় বাবু খানিক বাদে বল্লেন, "বলেছিলাম না মশাই– এ একেবার ভোজবাজি। একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।"

আজ আর হাসতে পারলুম না। তবু লোকজন নিয়ে পাহাড়ের সেই জায়গাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম—যদি কোন গুহা টুহায় বাঘ লুকিয়ে থাকে। কিন্তু পাহাড়ের গায়ে সামান্য দু' চারটা ফাটল্ ছাড়া বাঘ লুকোবার মত একটা গুহাও দেখতে পেলাম না।

সত্যিই মনে হল যেন বাঘটা আমাদের সকলের মাঝখান থেকে এক পলকে হাওয়ায় মিশিয়ে গেছে।

এর পর আর কি করা যায়! মাথা নীচু করে গাঁয়ে ফিরতেই হ'ল। পথে আবার মোড়লের সঙ্গে দেখা। বল্লে, "কি সাহেব, বাঘ মিল্‌ল ?"

গলার স্বরে মনে হ'ল যেন পরিহাস করছে, কিন্তু তার কথার জবাব দিতে পারলাম না।

তার পর দু তিন দিন বাঘের আর পাত্তাই পাওয়া গেল না। মরা বলদটার কাছে টঙ্ বসিয়ে দু'রাত্রি পাহারাও দিলাম কিন্তু বাঘ সেদিকে মাড়াল না।

এদিকে গাঁয়ের লোকেরা ক্রমশঃ আমাদের ওপর চটে উঠছে মনে হ'ল। আমরা তাদের উপকার করতে এসেছি বলে কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্ তাদের ভাব-গতিক দেখে মনে হল বাঘটাকে তাদের বিরুদ্ধে আমরাই যেন ক্ষেপিয়ে তুলছি।

দু' দিন এমনি করে ব্যর্থ হওয়ার পর এক রাত্রি আর ঘুমোতে পারলাম না। আর যে যাই ভাবুক এ বাঘ যে রক্ত-মাংসের জানোয়ার এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই হয়নি। তার অমন করে অন্তর্ধান হওয়ায় একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেটা কি ? সারারাত সেই চিন্তাতেই কেটে গেল।

সকালে উঠে দেখি অজয় বাবু জিনিষপত্র গুছোচ্ছেন।

বল্লাম, "সে কি মশাই—চল্লেন নাকি ?"

গম্ভীর হ'য়ে অজয় বাবু বল্লেন, "বাঘ শিকার করতে এসেছিলাম মশাই। ভূত-প্রেতের পেছনে দৌড়োতে ত' নয়।"

"ভূত-প্রেত আবার কোথা থেকে এল ?"

আমার দিকে অত্যন্ত বিরক্তি-ভরে চেয়ে অজয় বাবু বল্লেন, "জেনে শুনে বোকা সাজবেন না মশাই। নিজের চক্ষে সেদিন কি দেখলেন ?"

বুঝলাম, এঁর সঙ্গে এ বিষয়ে তর্ক করা বৃথা। তাই সে কথা বাদ দিয়ে বল্লাম—"আর দুটো দিন অপেক্ষা করুন, এক সঙ্গেই যাব'খন।"

অজয় বাবু বল্লেন, "বৃথা চেষ্টা মশাই! বাঘ শিকার অনেক করেছি কিন্তু এখানে কিছু হবে না জানি।"

শেষ পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে তাঁকে দু'দিন থাকতে রাজী করান' গেল।

অজয় বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা থাক্‌লামই না হয় দু'দিন কিন্তু কি করবেন ভেবেছেন জানতে পারি কি ?"

"আপাততঃ গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে যাচ্ছি।"

অজয় বাবু কপালে চোখ তুলে বল্লেন, "ছেলেদের সাথে গল্প! আপনার মাথা খারাপ হয়েছে।"

"বোধ হয়" বলে তাঁর বিস্ময়ের মাত্রা আরো দু'ডিগ্রি বাড়িয়ে বেরিয়ে গেলাম।

* * * *

প্রথম দিন অমনি কেটে গেল। অজয় বাবু থেকে থেকে আমার মুখের দিকে তাকান।

মাঝে মাঝে বলেন—"বৃথা সময় নষ্ট মশাই!"

আমি কোন উত্তর দিই না।

দ্বিতীয় দিন সকালেই খবর পাওয়া গেল – গ্রামের পূব দিকের গমের ক্ষেতের ভেতর বাঘের পায়ের দাগ দেখা গেছে।

তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হ'য়ে অজয় বাবুকে বল্লাম, 'চলুন'।

"কোথায় ?"

"সেই পাহাড়ে।"

অজয় বাবু বিরক্ত হয়ে বল্লেন—"আপনি আচ্ছা পাগল ত মশাই! বাঘের পায়ের দাগ পাওয়া গেল পূবদিকের ক্ষেতে আর আপনি যাবেন পশ্চিম দিকের পাহাড়ে।"

হেসে বল্লাম, "আপনিই ত বলেছিলেন দক্ষিণ দিকে বাঘ খুঁজতে গেলে উত্তর দিকে তাকে দেখতে পাওয়া যায়।

তার পর তাঁর রাগ বেড়ে যাচ্ছে দেখে বল্লাম, "এই একটা দিন আমার কথামত কাজ ক'রে দেখুনই না, তার পর ত এক সঙ্গেই যাব।"

অজয় বাবু গুম্ হয়ে আমার সঙ্গে বন্দুক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সঙ্গে আজ আর লোকজন নেই। ছ'জনে অনেক দূর যাবার পর অজয় বাবু বল্লেন—"লোকজন কিছু নিলে হত না?"

বল্লাম "দরকার নেই।"

অজয় বাবু আর কথা বল্লেন না।

পাহাড়ে পৌঁছোতে বেশ বেলা হয়ে গেল। যেখানে বাঘ অন্তর্ধান করেছিল সেই পাহাড়ের থাকের ওপরে উঠে বল্লাম, "ভানুমতীর খেল্ আজ এখানেই শেষ।"

অজয় বাবু গম্ভীর ভাবে বল্লেন, "হুঁ," এবং পরের মুহূর্ত্তেই আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ও কি কর্‌ছেন! পাহাড় ঠেলে ফেল্‌বেন নাকি?"

কোন কথা না বলে আমি প্রত্যেক ফাটলের কাছে পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। "নাঃ এ রকম পাগ্‌লামি আর কখন দেখিনি," বলে অজয় বাবু পাহাড়ের গায়ে ঠেসান দিয়ে বসে পড়্‌লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট চীৎকার করে চিৎ হয়ে পড়্‌লেন।

অবাক হয়ে দেখ্‌লাম তাঁর পেছনেই যেখানটা পাহাড়ের গায়ের ফাটল বলে মনে হচ্ছিল সেখানকার একটা পাথর ঠিক মাঝখানে কব্জা দেওয়া দরজার মত পেছনে হটে গেছে। অজয় বাবুকে তাড়াতাড়ি তুলে ফেলে তাঁর হাত ধরে নাড়া দিয়ে বল্লাম, "ভানুমতীর বাঘের সমস্যা আপনার হাত দিয়েই সমাধান হয়ে গেল অজয় বাবু!"

অজয় বাবুর তখনও বিমূঢ় ভাব কাটে নি, তিনি অবাক্ হয়ে বল্লেন—"তার মানে?"

বল্লাম, "এই গুপ্ত গুহাটির সন্ধানেই এখানে এসেছিলাম। দৈবাৎ আপনি বসে না পড়লে এর জন্যে কতক্ষণ খুঁজতে হ'ত কে জানে?

অজয় বাবু উঠে দাঁড়াতেই পাথরটা আবার সোজা হয়ে গেছ্‌ল। বাইরে থেকে এখন পাহাড়ের ফাটল্ ছাড়া সেটা যে একটা গুহার মুখ এ কথা বোঝবার কোন উপায় নেই দেখলাম। প্রকৃতির খেয়ালে পাথরটা ছ'ধারের পাহাড়ের গায়ে এমন ভাবে বসেছে যে ভেতর বা বার থেকে ঠেল্‌লে ঠিক দরজার মত খুলে যায়।

বল্লাম—"সেদিন বাঘ এই গুহাতেই অন্তর্ধান হয়েছিল এবং এই গুহাটির সন্ধান পাওয়ার দরুণ এ পর্য্যন্ত কোন শিকারী তার পাত্তা পায়নি।"

অজয় বাবু বল্লেন—"এখন তা' হ'লে কি করা যাবে?"

বল্লাম, "এখন ব্যাঘ্রাচার্য্যের ঘরে ফেরার প্রতীক্ষা এবং তার পর সংহার।"

এবার দেখলাম অজয় বাবুর অপেক্ষা কর্‌তে কোন রকম আপত্তি নেই। বরং উৎসাহিত হ'য়ে বল্লেন, "এক দিন হোক্ ছ' দিন হোক্ বাছাধনকে এখানে ফিরতেই হবে, কি বলেন!"

* * *

ভানুমতীর বাঘকে যে সেইখানেই মেরেছিলাম এ কথা আর বিশেষ করে বল্‌বার বোধ হয় প্রয়োজন নেই। ফেরবার পথে গাঁয়ের মোড়ল তার তুই ছেলেকে নিয়ে নিজে থেকে আমাদের মোট ব'য়ে দিয়ে গেল। দেখ্‌লাম আমাদের ওপর আর তার কোন বিদ্বেষ নেই কিন্তু তাই ব'লে বাঘ মারার বাহাত্নরী আমাদের দিতে সে একেবারে নারাজ। ভানুমতীর বাঘ—পূজোয় সন্তুষ্ট হয়ে নিজেই তিনি তাকে মেরেছেন তাদের এ বিশ্বাস অটল।

অজয় বাবু আমার সঙ্গে এক গাড়ীতেই উঠেছিলেন। ঘণ্টা তুই তিন এক সঙ্গে যাবার পর তিনি হঠাৎ চীৎকার করে বল্লেন—"বুঝ্‌তে পেরেছি মশাই, বুঝ্‌তে পেরেছি!"

অবাক্ হয়ে বল্লাম, "কি বুঝ্‌তে পেরেছেন মশাই?"

"আপনি কি করে ও গুহার কথা জান্‌তে পার্‌লেন।"

"কি ক'রে বলুন ত'!"

"গাঁয়ের ছেলেদের সাথে গল্প করে! কেমন!"

বল্লাম—"ঠিক বলেছেন। এক দিন সমস্ত রাত্রি ভেবে আমার অমনিতর একটা কিছু ব্যাপার আছে ব'লে সন্দেহ হয়। তার পর মনে হয় গাঁয়ের রাখাল-ছেলেরা ত' নানা জায়গায় ঘোরে এ রকম কিছু থাক্‌লে তাদেরই কারুর না কারুর তা জানবার কথা। সেই জন্যেই তাদের সঙ্গে সেদিন গল্প করতে গেছলাম এবং তাদের এক জনের কাছ থেকেই অনেক বকশিষ দিয়ে ওই গোপন খবরটি আদায় করি।"

অজয় বাবু খানিক চুপ্ করে থেকে বল্লেন, "কিন্তু দেখুন, ভানুমতীর বাঘ সত্যি হ'লে নেহাৎ মন্দ হ'ত না। এমনি বাঘ শিকার ত' সবাই করে—হাওয়ায় মিলিয়ে যায় এমন বাঘ শিকার কর্‌লে জাঁকিয়ে গল্প বলবার মত একটা কিছু হ'ত।

কষ্টি-পাথর

[পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর]

(অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, বি-এল্)

"জাহাজ ডুবে গেছে!"

শোকের প্রথম ধাক্কাটাই প্রবল হয় কিন্তু খানিকটা সময় কাটিয়া গেলে তুঃখের যে জ্বালা গোড়ায় একেবারেই অসহ্য বলিয়া বোধ হইত, তাহাও যেন গা-সওয়া হইয়া আসে। মঙ্গলময় ভগবানেরই

এই বিধান নতুবা শোকে-তাপে ভরা ছুনিয়ায় মানুষ পাগল হইয়া যাইত। মিষ্টার চ্যানিংও গোড়াতে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া চার্লির উদ্ধারের কি কি উপায় হইতে পারে তাহাই ভাবিতে বসিলেন।

এদিকে বাড়ীতে বন্ধু-লোকদেরও ক্রমে সমাগম হইতে লাগিল—মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ে, মিষ্টার হাণ্ট্‌লি, রেভারেণ্ড্ মিষ্টার ইয়র্ক্ সকলেই একে একে বিদেশ-প্রত্যাগতদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। শেষের ভদ্রলোকটীর বোধ করি বাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আরো একটু "বিশেষ কথা" ছিল—দেখা যাক্।

একটা আলাদা ঘরে মিষ্টার চ্যানিং গ্যাল্‌ওয়ের সহিত আলাপ করিতেছিলেন, হঠাৎ টম্ সেই ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "এবার তো আপনারা ফির্‌লেন বাবা, কবে আমায় ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেবেন?"

তাহার বাবা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেব? কেন?"

টমের মেজাজ পর্দ্দায় পর্দ্দায় চড়িতে লাগিল। সে কহিল "কেন? কি সুখে আমি সেখানে থাক্‌ব বলুন! দ্বারোয়ানের কুকুরটাও বোধ করি সেখানে আমার চাইতে ভাল আছে। সিনিয়র-সিপের সঙ্গে সঙ্গে আমার মান-সম্মান তো গেছেই, পুঁচ্‌কে ছোঁড়াগুলো পর্য্যন্ত এখন আর্থারের কথা নিয়ে আমার পেছনে লাগ্‌তে সুরু করেছে। আমার—"

তাহার কথার মধ্যে গ্যাল্‌ওয়ে বাধা দিয়া বলিলেন, "আমি নিজে যদি আর্থারকে নির্দ্দোষ ব'লে মেনে নিয়ে ফের আমার আপিসে চাক্‌রী দিই, তবে তোমাদের ইস্কুলের ছেলেদের সে সম্বন্ধে মাথা ঘামাতে বারণ করো, টম্।"

মিষ্টার চ্যানিংয়ের কপালে গভীর রেখা ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন, "অন্য সময় তোমার নালিশ শোনা যাবে টম্, এখন বরং তুমি যাও।" সে চলিয়া যাইতেই তিনি গ্যাল্‌ওয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "আপনার চোরাই নোট্ যে ফিরে এসেছে সে কথা আমি শুনেছি। আমার মনে হয় আর্থারের নির্দ্দোষিতার এটা একটা অকাট্য প্রমাণ, কেননা আমি জানি অত টাকা জোটান তার পক্ষে অসম্ভব। কাজেই আর যেই ফিরিয়ে দিক্, সে যে দেয়নি এ কথা ঠিকই।"

গ্যাল্‌ওয়ে একটু কুণ্ঠিত হইলেন, কহিলেন, "অপরের কাছে আমি সেই রকম ভাবই প্রকাশ কর্‌বো, সন্দেহ নেই, কিন্তু আপনাকে চুপি চুপি জানিয়ে রাখ্‌ছি মিষ্টার চ্যানিং, যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাইয়ের দুর্দ্দশা আর চোখে দেখ্‌তে না পেরে হামিশই এ চাতুরীটুকু খেলেছে—বেনামীতে টাকাটা পাঠিয়ে দিয়েছে।"

"হামিশ! না না মিঃ গ্যাল্‌ওয়ে, সে সম্ভব নয়। হামিশের মত ছেলে যে জেনে শুনে চুরীর কাজে প্রশ্রয় দেবে, এ আমি কোন মতেই বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না—সে শিক্ষা সে পায় নি।"

ঘরের অপর প্রান্তে হাণ্ট্‌লির মূর্ত্তি দেখা গেল। তুই জনে একান্তে বসিয়া কোন একটা গোপনীয় আলোচনা করিতেছেন দেখিয়া তিনি তখনই ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু মিষ্টার চ্যানিং তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যাবেন না মিষ্টার হাণ্ট্‌লি, আসুন, আপনার কাছে আমার গোপন কর্‌বার কিছু নেই। আমরা সেই নোট্ চুরীর ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্ত্তা কইছি গ্যাল্‌ওয়ে বল্‌ছেন তাঁর ধারণা হামিশ তাঁকে নোট্ ফিরে পাঠিয়েছে।"

হাণ্ট্‌লি আগাইয়া আসিলেন। এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটাতে যোগ দিবার তাঁর আদবেই ইচ্ছা ছিল না, তিনি শুধু বলিলেন, "টাকা যে হামিশ পাঠিয়েছে সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই।"

মিষ্টার চ্যানিং যেন মহা ধান্ধায় পড়িয়া গেলেন—এ তু'টী ভদ্রলোকই এমন কথা বলিতেছেন কেন? প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা হামিশকে ডেকে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসাই করা যাক্ না!"

সংবাদ পাইয়া হামিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। যে জন্য তাকে ডাকা হইয়াছে সে প্রশ্ন শুনিয়াই কিন্তু তার মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া গেল, তরল হাস্যের সহিত ঠাট্টার সুর মিশাইয়া সে কহিল, "তা এ মন্দ নয় যে আপনারা সকলেই আমায় একটী অদ্বিতীয় দানশীল লোক ঠাউরে বসে আছেন। শুধু মুস্কিল হচ্ছে এই, যে এ 'দাতব্য'টী আমাদ্বারা ঘটেনি।"

এবার নিবিড় ঘৃণার রেখা মিষ্টার হাণ্ট্‌লির মুখে দেখা দিল, তিনি ভাবিয়া পাইলেন না বাহিরের এমন সুন্দর চেহারার মধ্যে এত বড় একটা মিথ্যাবাদী বাসা বাঁধিল কিরূপে! হামিশ আবার বলিল, "আর্থারকে দোষী প্রমাণ কর্‌বার জন্যে যতটা চেষ্টা হচ্ছে খাঁটি প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্যে যদি তার অর্দ্ধেকটা চেষ্টাও করা হ'ত, তবে বোধ করি এত দিনে কোন্ কালে তার সমস্ত নিন্দা-অপবাদ ধুয়ে মুছে যেত।"

খোঁচাটা দেওয়া হইল অবশ্য গ্যাল্‌ওয়েকে, কিন্তু ইহার জবাব দিলেন মিষ্টার হাণ্ট্‌লি। একটু বিদ্রূপ-মাখা কণ্ঠেই যেন তিনি বলিলেন, "কিন্তু তুমি বোধ করি মনে মনে নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর যে আর্থার নিরপরাধ?"

"করি বৈ কি, হাজার বার করি।"

গ্যাল্‌ওয়ের প্রয়োজন ছিল, তাই তিনি উঠিয়া পড়িলেন; কাজেই প্রসঙ্গটা আপাততঃ সেইখানেই চাপা পড়িয়া গেল, আর অগ্রসর হইল না। ইঁহারা তিন জনেও উঠিয়া গিয়া বড় হল্ ঘরে—যেখানে অপর সকলে মিলিয়া জটলা করিতেছিল,—সেইখানে গিয়া সকলের সঙ্গে মিলিলেন।

হলের এক পাশে তখন আর্থার আপন মনে একখানা চিঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। চিঠিখানা রোল্যাণ্ডের নিকট হইতে আজিকার ডাকে আসিয়াছে, জুডি এই মাত্র দিয়া গিয়াছে। অন্যান্য সকলে নিজে নিজেদের গল্পেই মত্ত ছিল, তাহার দিকে বিশেষ কারো লক্ষ্য ছিল না।

হঠাৎ আর্থারের মুখ দিয়া আচম্‌কা একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া পড়িল—"উঃ, রোল্যাণ্ড্। রোল্যাণ্ড্!!" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতে সে নিজের মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

ঘরের ভিতর বাজ পড়িলেও বোধ করি ইহা অপেক্ষা কেউ বেশী চমকাইত না। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি হয়েছে রোল্যাণ্ডের আর্থার ?"

বুদ্ধিমতী এনাবেল চেঁচাইয়া উঠিল, "হায়,হায়, রোল্যাণ্ড ইয়র্কের জাহাজ বুঝি ডুবে গেছেরে !"

রোল্যাণ্ডের চিঠিতে মারাত্মক খবর এমন কি ছিল জানিতে পাঠক-পাঠিকাদের নিশ্চয়ই খুব কৌতূহল হইতেছে। যদি আর্থারের ঠিক পিছনে দাঁড়াইয়া তাঁহারা চিঠিখানি পড়িতে পাইতেন তবে দেখিতেন সে চিঠিতে এইরূপ লেখা আছে :—

ভাই আর্থার,

এ চিঠিখানা যখন তোমার হাতে পড়্‌বে তখন আমি আট্‌লাণ্টিক সাগর পাড়ি দিয়ে নেটালের দিকে চলেছি। চিঠিখানা লিখে আমি আমার মামা ক্যারিকের কাছে রেখে যাচ্ছি, তিনি ডাকে পাঠাবেন—অবশ্যি যদি ইতিমধ্যে না ভুলে বসেন।

যাই বল ভাই, কলি কালে ক্যারিকের মত মামা হয় না। আমার যা কিছু জিনিষের দরকার তাতো তিনি কিনে দিয়েছেনই, উপরন্তু নেটাল যাবার টিকিটখানা পর্য্যন্ত কিনে দিয়েছেন, আর সঙ্গে টাকাও দিয়েছেন প্রচুর। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, শীগ্‌গিরই যেন আমার একটী সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন মামী লাভ ঘটে। আর মুট্‌কো গ্যাল্‌ওয়েকে রোজ সকালে উঠে একবার ক'রে তাঁর নাম নিতে ব'ল, দিনটা ভাল যাবে।

আস্‌বার দিন তোমার সঙ্গে দেখা করে আসিনি বলে নিশ্চয়ই তুমি ভারী খাপ্পা হয়েছ। কিন্তু এ চিঠিখানা পড়্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে তখন দেখা করা আমার সম্ভব ছিল না। গ্যাল্‌ওয়ে বুড়োর নোটখানা ভাই আমি নিয়েছিলাম। এ কথা শুনেই যেন তুমি আমায় গালি পাড়্‌তে বস না—ধৈর্য্য ধরে সব কথা শুন্‌লে বুঝ্‌বে এখনও পাকা সিঁদেল চোর আমি হয়ে উঠিনি, এবং যাকে ঠিক 'চুরী' বলে তাও আমার মৎলব ছিল না। লোকে যেমন ধার নেয় না, ঠিক সেইভাবেই টাকাটা আমি নিয়েছিলাম ; পরে সুবিধে মত ফিরিয়ে দেবার ইচ্ছা আমার ছিল, এবং ফিরিয়েও যে দিয়েছি তাও তুমি জান। কি করি ভাই, ও ছাড়া অন্য উপায় তখন আমার আর কিছুই ছিল না। সে সময়ে ওভাবে টাকাটা না পেলে নির্ঘাৎ আমায় জেলে পচ্‌তে হত। বাজারে কি পরিমাণ দেনা এ শ্রীমানের ছিল তাতো তুমি জানো—পাওনাদারদের মুখ বন্ধ করা তখন নিতান্ত দরকার হ'য়ে পড়েছিল। মার কাছে টাকা চাইলেই তাঁর মাথা ধরে ; আর ওই মুট্‌কোর কাছে ধারের আশা ? হ্যা, তুমিও যেমন !

তুমি হয়তো অবাক্ হয়ে ভাবছ, টাকটা সরালাম আমি কোন্ ফাঁকে ! সেদিনকার ঘটনাটা বেশ মনে আছে কি ? গ্যাল্‌ওয়ে বুড়ো আমাদের দু'জনার সাম্‌নে বসে লেপাফার ভেতর নোট্ এবং চিঠি পূরে গঁদের আঠা দিয়ে খামের মুখ বন্ধ কর্‌লে। ঠিক সেই সময়েই রাস্তায় সুরু হল হৈ হৈ কাণ্ড—হ্যান্স্ পাগ্‌লী কেরাণীর পোকে নিয়ে পড়েছে। গ্যাল্‌ওয়ে খামের মুখে সীল্ না এঁটেই জানালার দিকে এগিয়ে গেল, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলে। খামের মুখে তখন একেবারে কাঁচা আঠা—তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে নোট্‌খানা পকেটে পূরে ফের খামখানাকে আট্‌কে ফেল্লাম। আধ মিনিটের বেশী সময় আমার তাতে লাগেনি। তার পর তোমাদের কাছে জান্‌লার ধারে গিয়ে যখন উপস্থিত হলাম, তখন রাস্তার তামাশা দেখে হাসির ধাক্কায় তোমরা লুটিয়ে পড়্‌ছ।

এর পরে গ্যাল্‌ওয়ে এসে সে চিঠিতে সীল আঁট্‌লে। তার পর থেকেই সারা দিন আমি অফিস্ থেকে অনুপস্থিত ছিলাম, কাজেই আমি যে টাকা নিতে পারি, এ কথা কারো মনেই আসেনি।

অবশ্য দু' দিন বাদে নোট্ খোয়া গেছে শুনে আমাদের বুড়ো কর্ত্তা যে লাফাতে থাক্‌বে তা আমি জান্‌তাম ; কিন্তু ভেবেছিলাম বুঝিয়ে সুঝিয়ে সমস্ত দোষ পোষ্ট-অফিসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেব। কিন্তু মুট্‌কো যখন কেবল সীলের দোহাই পাড়্‌তে লাগ্‌ল—বল্‌তে লাগ্‌ল পোষ্ট-অফিস টাকা নিলে সীলের গালা অমন আস্ত থাক্‌তেই পারে না, তখন তার ভুঁড়ির ওপর গোটা দুই খোঁচা দেওয়ার জন্যে ডান হাতটা আমার কি সুড়্‌সুড়ই যে কর্‌ছিল ভায়া !

প্রথম যেদিন শুন্‌লাম টাকা-চুরীর অপবাদ তোমার ঘাড়ে চেপেছে, আমায় বিশ্বাস কর আর্থার, রোজ বোধ হয় হাজার বার মনে হয়েছে ছুটে গিয়ে গ্যাল্‌ওয়েকে সব কথা বলে আসি। কিন্তু তা হলে আর পরের দিন এ সহরে মুখ দেখাতে পার্‌তাম না, কাজেই এত বড় সাধু সংকল্পটা কাজে পরিণত করা হল না। আর্থার ভাই, আমার এ দুর্ব্বলতাটুকু মাপ কর্‌বে তো ?

সেদিন থেকে কি করে তোমায় এই দূর্ণাম থেকে মুক্তি দিতে পারি তাই হোল আমার প্রধান চিন্তা। আমার সাম্‌নে তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলে পার পেত না—তা সে যত বড় মিঞাই হোন্ না কেন। হাজার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লাম কি ভাবে টাকাটার যোগাড় ক'রে গ্যাল্‌ওয়েকে ফেরৎ পাঠাতে পারি, যাতে করে সে তোমায় নির্দ্দোষ মনে করে। কিন্তু বরাত খারাপ, হঠাৎ টাকার যোগাড় কিছুতেই হয়ে উঠ্‌ল না।

তার পর অনেক দিন বাদে টাকা সংগ্রহ করা গেল,—দিলেন অবশ্য ক্যারিক্ মামাই। বাঁ হাতে গ্যাল্‌ওয়েকে এক খানা চিঠি লিখে সেই চিঠি আর নোট্ এক সঙ্গে খামে পূরে ঠিক তেম্‌নি বাঁ হাতেই আবার বুড়োর ঠিকানা লিখে ফেল্লাম। সে দিনই মামা লণ্ডন ফির্‌ছিলেন, তাঁর হাতে চিঠিখানা দিয়ে বল্লাম গ্যাল্‌ওয়ের সঙ্গে একটু রসিকতা কর্‌ছি, তাই চিঠি খানা এখানে ফেল্‌ব না, তিনি যেন লণ্ডনে গিয়ে ডাক-বাক্সে ফেলে দেন। মামুর আমার কি স্মরণ-শক্তি ! দিন দশেক

ধ'রে সে চিঠি তাঁর পকেটে পকেটেই ঘুর্‌ল, কাজেই টাকাটাও এল দেরী ক'রে। ভেবেছিলাম নোট ফিরে পেলেই তোমার সম্বন্ধে গ্যাল্‌ওয়ে তার ভুল বুঝ্‌তে পার্‌বে। কিন্তু মুট্‌কোর গন্দ হাড়ে হাড়ে, সে ভাব্‌লে তুমিই বুঝি ছল করে টাকা পাঠিয়েছে। বল দেখি, তখন হেলষ্টন্‌লি ছেড়ে পোর্ট-নেটালে চলে এসে এ খবর তাকে দেওয়া ছাড়া আর আমার কি উপায় থাক্‌তে পারে? এই সঙ্গে বুড়োর নামেও আলাদা এক চিঠি দিচ্ছি—সব কথা তাতেও লেখা আছে। তার গোল গোল চোখ দুটো নিশ্চয়ই সে চিঠি পেয়ে চ্যাপ্‌টা হয়ে যাবে। ভাই, আমার জন্যে তোমায় ঢের সইতে হয়েছে। আমি যখন বড় লোক হয়ে দেশে ফির্‌ব তখন আমার টাকার একটা ভাগ তোমায় দেবই দেব, এ বলে রাখ্‌ছি।

ভাল কথা, আমার হয়ে একটা কাজ কর্‌তে পার্‌বে? আমার মহা সম্মানিত আত্মীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত রেভারেণ্ড উইলিয়ম্‌ ইয়র্ক্‌কে বলে আসতে পার্‌বে যে কন্‌স্‌ট্যান্সের পরিবার চোরের পরিবার নয়, চোট্টার পরিবার তাদেরই। এই ব্যাপারের পর কন্‌স্‌ট্যান্স্‌ যদি তাকে ক্ষমা করে তবে বুঝ্‌ব উইলিয়মের মত সেও অপদার্থ।

তবে আসি ভাই আজ। ইতি তোমারই অভিন্নহৃদয় বন্ধু রোল্যাণ্ড ইয়র্ক্‌।

সমস্ত চিঠিখানা পড়া আর্থার তখনও শেষ করে নাই, অমন আর্ত্ত-রব সে করিয়া উঠিয়াছিল মাত্র গোড়ার কয়েক ছত্র পড়িবার পরেই। সকলে যখন এক সঙ্গে তাহাকে প্রশ্ন করিয়া উঠিল তখনও সে প্রশ্ন তার মগজে ঢুকিয়াছে কিনা সন্দেহ, অপর সকলেই যে সেখানে বসিয়া সে কথাটী পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া সে চেঁচাইয়া উঠিল—"কন্‌স্‌ট্যান্স্‌, কন্‌স্‌ট্যান্স্‌, হামিশ নির্দ্দোষ। হামিশ ভাই, ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর,—মূর্খ আমি কি দুর্ম্মতি হয়েছিল, ভেবেছিলাম গ্যাল্‌ওয়ের টাকা বুঝি তুমিই নিয়েছ।"

ঘরের ভিতর তখন যে অবস্থা হইল তাহার সঠিক রূপ কলমে ফুটাইয়া তোলা আমার অসাধ্য। উপস্থিত কেহই তাহার কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না—ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করিয়া তাকাইয়া রহিল—এ কথা বলিলে নিতান্তই অল্প বলা হইবে। মিষ্টার হাণ্ট্‌লিই সর্ব্ব-প্রথম জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও চিঠিতে কি খবর এসেছে আর্থার?"

"রোল্যাণ্ড্‌ লিখে পাঠিয়েছে যে মিষ্টার গ্যাল্‌ওয়ের নোট খানা সে নিয়েছিল। আর, আমি, মিষ্টার হাণ্ট্‌লি, এতদিন ধরে হামিশকে মনে মনে সন্দেহ ক'রে আস্‌ছি। হামিশ আমায় ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে কখনো?"

(ক্রমশঃ)

দ্রষ্টব্য ঃ—আমাদের বহু চেষ্টাতেও এই সুবৃহৎ বইখানি এ বছরে সমাপ্ত করিতে পারা গেল না। আগামী দুই এক মাসে ইহা সমাপ্ত হইবে।

ভাবী সাহিত্যিকের বৈঠক

গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা

ভক্ত কবীর

(শ্রীননীলাল দে)

(১)

কবীরের এক শত্রু ছিল
নিন্দা ক'রে ক'রে,
সকল সময় বেড়াতো সে
সকল ঘরে ঘরে।

(২)

এমনতর শত্রু তাহার
পড়্‌লো যবে মারা,
ভক্ত কবীর তাহার শোকে
কেঁদে হ'লেন সারা।

(৩)

শিষ্য জনেক ব্যাপার দেখে
শুধায় তাঁকে, "হায়!
নিন্দুক সে মরেই গেছে
দুঃখ কিবা তায়?"

(৪)

ভক্ত কবীর বলেন তখন,
"বল কি ভাই আর—
শত্রু আমার নিন্দা ক'রে
কর্‌ত উপকার।

(৫)

নিন্দা-ভয়ে ভাল ভাবে
চল্‌তে হ'ত যে
এম্‌নি ক'রে সৎপথে আর
রাখ্‌বে মোরে কে?"

রঙ্গ-কৌতুক

(শ্রীসুধেন্দুপ্রকাশ সোম চৌধুরী)

১ম ভদ্রলোক—"দেখুন, শিবেন বাবুর মত ঠাণ্ডা লোক বড় দেখা যায় না।"
২য় ভদ্রলোক – "কিন্তু আমি ওর চেয়েও ঠাণ্ডা লোক দেখেছি।"
১ম ভদ্রলোক—"কি রকম?"
২য় ভদ্রলোক—"কলেরার রোগী শেষ অবস্থায় ওর চেয়েও বেশী ঠাণ্ডা হয়।"

হাঁসি-খুসী

(কুমারী পুষ্পলতা গোস্বামী, বেতিয়া)

এক ভদ্রলোক—আজ্ঞে, আপনার নামটা একটু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?

অপর ভদ্রলোক—আজ্ঞে হ্যাঁ, অনায়াসে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, করুন না !

অগ্নি-কাণ্ড

(দাদা ও উষাময়ী দেবী, গাজিপুর)

ভাইপো—কাকাবাবু, কাকাবাবু, শিগ্‌গির আসুন ; গোয়ালে আগুন লেগেছে ।

খুড়া—আগুন কি ক'রে লাগবেরে, চাবি যে আমার কাছে রয়েছে !

ঝরণা

(কুমারী বীণা দেবী, মেমিও, ব্রহ্মদেশ)

চন্দ্রের সুধারাশি অঙ্গেতে মাখিয়া,
কোথা যাস্ ঝরঝর মৃদু গান গাহিয়া ?
লীলায়িত তনুখানি ভ'রে নিয়ে হাস্যে
এলি নেমে ঝরণা, পুলকিত লাস্যে ।
চির কাল শৈবাল খেলে তোর সঙ্গে
তপনের শিখা-রাশি ঝরে তোর অঙ্গে ।
তোর সনে খেলিবারে কুসুমেরও সাধ যায়,
তাই বুঝি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে এসে তোর গায় !
মেখলায় তোর শত রামধনু বিরাজে
তোরই তীরে রাখালের মধু বেণু বাজে যে ।
পাহাড়ের প্রিয়তমা ওগো শত-বরণা,
কোন্ কবি সৃজিয়াছে তোরে ওরে ঝরণা ?
কল কল, ছল ছল, কার গুণ গাহিয়া
কোন্ দেশে যাস্ তুই আন্‌মনে বহিয়া ?

বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে লঙ্কায় উৎসাহও দ্বিগুণ বাড়িয়া চলিল। ট্রামে চাপিয়া আপিস্ যাইবার পথে কেরাণী রাক্ষসেরা অনেকেই এক এক খানা

কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা।

কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা কিনিয়া লইল। কাগজের স্বর্গস্থ সংবাদ-দাতা টেনিস্ ম্যাচের হুবহু বর্ণনা পাঠাইয়াছে। কাঁচালঙ্কা-পত্রিকা তার উপর টিপ্পনী কাটিয়াছে—"ইটিং কম্পিটিশনে (খাইবার প্রতিযোগিতায়) রাক্ষসেরা বরাবর প্রথম হইলেও, টেনিসে ওয়ার্ল্‌ড্ চ্যাম্পিয়ন্‌সিপ্-লাভ তাদের কপালে এই সর্ব্বপ্রথম। কুমার মেঘনাদ আজ সমস্ত রাক্ষসজাতির মুখ উজ্জ্বল করিলেন। সকলের ধারণা ছিল টেনিস্ ম্যাচে ইন্দ্র অজেয়। সেই ইন্দ্রকে তিনি হারাইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে 'ইন্দ্রজিৎ' উপাধি দেওয়া হউক্।"

রাবণ রাজার মনে আনন্দ আজ আর ধরে না। ছেলে এত বড় দিগ্বিজয় করিয়া দেশে ফিরিতেছে, তাকে একটা জাঁকাল গোছের অভ্যর্থনা দিতে হইবে। তা ছাড়া, মহারাজের ইচ্ছা কুমার দেশে ফিরিলে এই উপলক্ষ্যে খুব উঁচু দরের একটা

গার্ডেন পার্টিও দেওয়া হয়। আজ প্রাতেই তিনি মেঘনাদের 'ওয়্যারলেস্' পাইয়াছেন, ইন্দ্র ভদ্রতা করিয়া তাঁর নিজস্ব এরোপ্লেন 'দি পুস্পাক' খানা দেশে ফিরিবার জন্য তাকে দিতেছেন। কিন্তু গতকল্য পাইলট্ মাতলী এক মোটর য়্যাক্সিডেণ্টে কাবু হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার অশ্বিনীকুমারকে কল্ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি বলিয়াছেন, আঘাত গুরুতর নয়, দু'চার দিনের মধ্যেই তারা রওয়ানা হইতে পারিবে।

রাবণ বড়ই ব্যস্ত। সেই যে ভোর বেলা তিনি চায়ের সঙ্গে খান কতক তিমি-কাট্‌লেট্ (চিংড়ি-কাট্‌লেট্ নয় কিন্তু—তোমাদের জিভের জল পড়ে না যেন) এবং ঘোড়ার ডিমের মাম্‌লেট্ খাইয়া প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ঘটন-চৌকশের সহিত পরামর্শে বসিয়াছেন, তার পর কত বেলা হইয়া গেছে সেদিকে তাঁর হুঁস্ই নাই। মাঝে রোদের তাত যখন খুবই বাড়িয়া উঠে তখন অন্দর হইতে মন্দোদরী টন খানেক বেঙ্গল কেমিকেলের লেমন সিরাপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু রাণী এখন পস্তাইতেছেন, কেন না সরবৎ পেটে যাওয়ার পর বার বার তাড়া দিয়াও তিনি আর এখন রাবণকে স্নানে পাঠাইতে পারিতেছেন না। অথচ তাঁর নিজের বড়ই ক্ষুধা পাইয়াছে।

দিন দুয়ের মধ্যেই খবরের কাগজ মারফৎ স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল তিন মহাদেশেই সংবাদ রটিয়া গেল,—কুমার মেঘনাদের 'ওয়ার্ল্‌ড্ চ্যাম্পিয়ান্ হওয়ার দরুণ রাবণ এক বিরাট্ ভোজের আয়োজন করিতেছেন। দুনিয়ার সমস্ত জাতেরই বাছা বাছা লোকের সে ভোজে নিমন্ত্রণ হইবে, এমন কি মুনি-ঋষি এবং ব্রাহ্মণদের জন্যও আলাদা বন্দোবস্ত থাকিবে। কণ্ব মুনির আদুরে মেয়ে শকুন্তলা বাপকে ধরিয়া পড়িয়া মালিনী নদীর পারে জঙ্গলের মধ্যেই এক রেডিও বসাইয়াছিল—তার এবং তার সখিদের অবশ্য উদ্দেশ্য ছিল কটকের 'উড়িয়া-সঙ্গীত-সম্মিলনীতে' প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় যে উঁচু দরের গান গাওয়া হয়, সেই গান শ্রবণ করা। কাজেই তপোবনে খবরের কাগজ না আসিলেও শকুন্তলার রেডিওতে রাবণের ভোজের কথা প্রকাশ পাইয়া গেল। শুনিয়া মুনিঋষিরা তো ভারী খুসী! দুর্ব্বাসা ঋষির মেজাজ সেদিন অসম্ভব রকম ঠাণ্ডা দেখা গেল, গোটা দিনটাতে তিনি একবারও রাগিলেন না, বা কাউকে শাপ দিলেন না। অষ্টাবক্র মুনি একেবারে সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। আর নারদ তো খবর

শুনিয়া নিজের ভাবে এমনি মশ্‌গুল্ হইয়া গেলেন যে, সেদিন পাড়ায় পাড়ায় টহল দেওয়ার কথা তাঁর একবারও মনে আসিল না। কাজেই ঋষি-বালকদের ডাংগুলি খেলায় সেদিন একটুও মারামারি হইল না, বা কাহারো মাথা ফাটিল না। ফলে কিষ্কিন্ধ্যা নগরের সুষেণ ডাক্তার আর অমরানগরীর অশ্বিনীকুমার সেদিক্ হইতে কোন কল্ না পাইয়া মনমরা হইয়া ফিরিতে লাগিলেন আর উকীলেরা পরস্পর এই বলিয়া জটলা পাকাইতে লাগিলেন যে নারদ এ ভাবে ঘরে বসিয়া থাকিলে তাহাদের নির্ঘাৎ না খাইয়া মরিতে হইবে। আর কষ্ট পাইল এক নিরীহ বেচারী—নারদের বাহন ঢেঁকিটি। বহুদিন বাদে তাকে হাতে পাইয়া ঋষি-পত্নীরা তাকে দিয়া পঞ্চাশ মণ ধান ভাঙ্গাইয়া লইল। এদিকে কলিকাতার বড় বড় ওষুধের দোকান

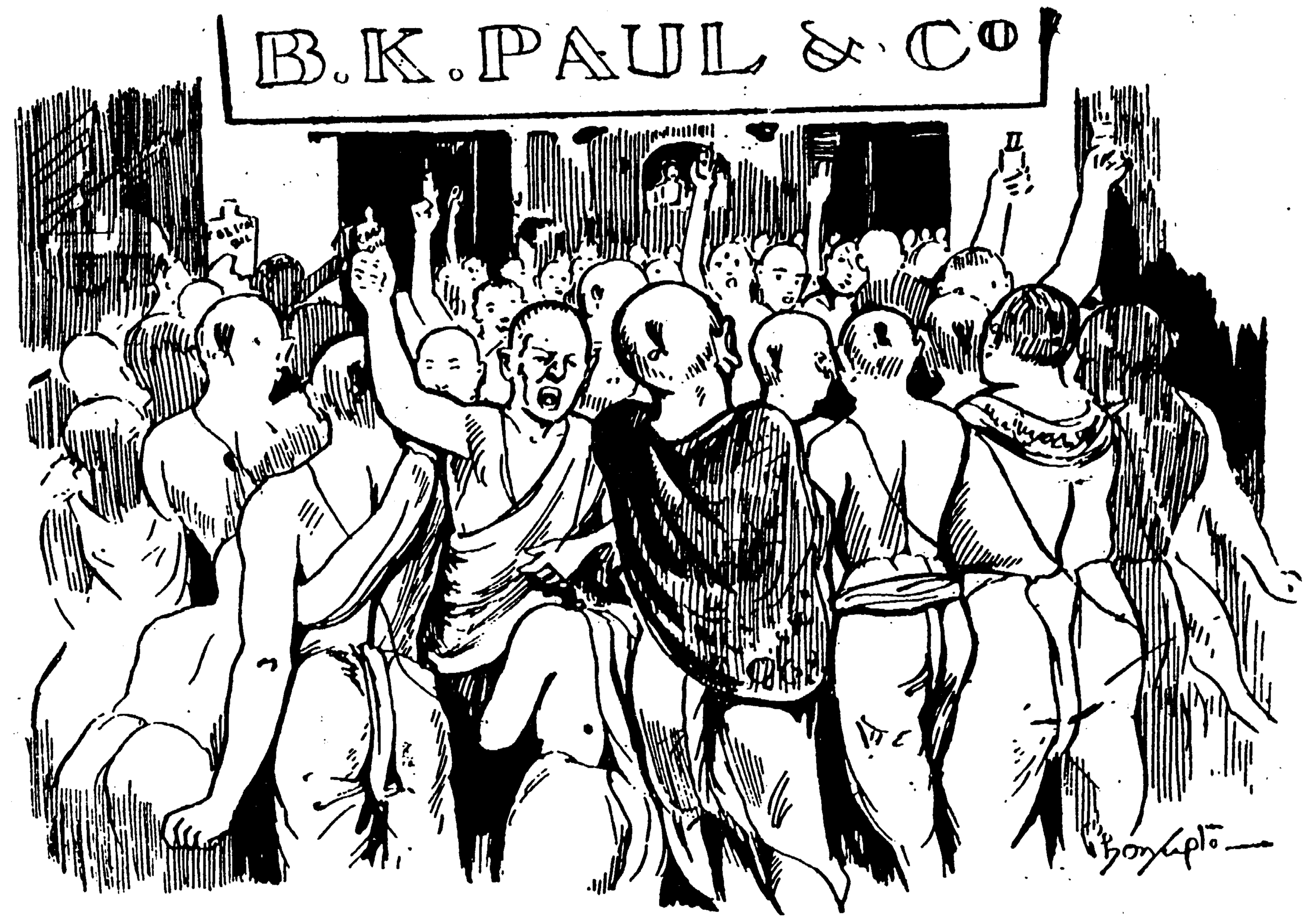

ক্যাষ্টর অয়েল্ কিনিলেন।

গুলি—যেমন বটকৃষ্ট পাল, বাথ্‌গেট্ প্রভৃতি—একেবারে ফাঁপিয়া উঠিল, কেননা খবরের কাগজে রাবণের সদিচ্ছার কথা শুনিতে পাইয়াই বাংলা দেশের ব্রাহ্মণেরা অনেক টাকার ক্যাষ্টর-অয়েল কিনিয়া ফেলিলেন।

ভোজের দিন ক্রমেই আগাইয়া আসিতে লাগিল। কোন্ দেশ হইতে কে কে

আসিবেন কাঁচালঙ্কা-পত্রিকায় প্রত্যহ তারই জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ বেশ একটু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটিয়া গেল।

ভোজের ঠিক আগের দিনকার কথা। রাবণ প্রাতে চা-পানান্তে ড্রইংরুমে বসিয়া সবে একটী স্বদেশী বিড়ি ধরাইয়াছেন এমন সময় উস্কো-খুস্কো চুলে, শুক্নো মুখে তাঁর সেক্রেটারী—ঘটন-চৌকশ আসিয়া উপস্থিত। তাকে সে অবস্থায় দেখিয়া রাবণ ভয় পাইয়া গেলেন, কহিলেন, "ব্যাপার কি, ঘটন-চৌকশ ?"

"হুজুর, কাল বোধ করি ভোজ দেওয়া চল্‌বে না, তারিখ পিছিয়ে দিতে হবে।" হুজুর ভীষণ চটিয়া গেলেন, "হোয়াট্‌ ননসেন্স্‌ ! তা হ'লে আমার মান-সম্ভ্রম কোথা থাক্‌বে শুনি ?" বিশ্বের বড় বড় লোকেদের সব নেমন্তন্ন করা হয়েছে—সবাই তাঁরা বিজি (ব্যস্ত) লোক, হাজারো রকমের কাজ আছে—এক হপ্তা আগে থেকে তাদের সব কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করা থাকে ! তাদের কখনো ও কথা বলা চলে ?"

"তবে হুজুর কয়েক লাখ মোহর আমায় এখুনি সংগ্রহ করে দিতে হবে। পনেরো দিন মাথা খাটিয়ে যত রকম খরচা হওয়ার সম্ভব সমস্তই আমি ভেবে রেখেছিলাম,—সমুদ্রের ধারে সামিয়ানা টানাবার খরচা, অতিথিদের গায়ে আতর ছিটিয়ে দেবার খর্‌চা, আঁচাবার পর তাঁদের সোণার খড়্‌কে যোগাবার খর্‌চা, দি গ্রেট্‌ লঙ্কা বিড়ি কোম্পানীর বিলের খর্‌চা—কিছু বাদ পড়েনি ; শুধু একটা কথা আমার আদবেই স্মরণ হয়নি। যাদের নেমন্তন্ন করে আনা হচ্ছে তাদের যে খেতে দিতে হবে আর তারই জন্যে যে আরও একটা খর্‌চা হবে সেটা আমার এতদিন খেয়ালেই আসেনি। আজ ভোরে যেই সে কথা মনে হয়েছে অম্‌নি কোষাধ্যক্ষের বাড়ী ছুটেছিলাম, কিন্তু তিনি বলেন কাল সন্ধ্যের আগে অত টাকা যোগাড় করা একেবারেই অসম্ভব।"

শুনিয়া রাবণের মুখে চিন্তার রেখা ফুটিয়া উঠিল ; অত টাকা তিনি এখন হঠাৎ পান কোথা ? তাড়াতাড়ি টেলিফোন্‌টা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "অল্‌ ফাইভ্‌ থ্রি সেভেন্‌ প্লিজ্‌ ! হ্যালো...অলকাপুরী এটা ? কুবের দাদার সঙ্গে একটু কথা বল্‌তে চাই—তাঁকে বলুন লঙ্কা থেকে তাঁর ছোট ভাই রাবণ ফোনে ডাক্‌ছে।...হ্যালো, কে, কুবের দা নাকি ? হ্যাঁ আমি রাবণ। ভারী মুস্কিলে পড়ে গেছি দাদা, লাখ দশেক

মোহর নইলে আর আমার মান থাক্‌ছে না। কী ? ব্যাঙ্ক অব্‌ অলকা ফেল্‌ পড়েছে ? কাল ? এই সেরেছে !" হতাশ ভাবে রাবণ টেলিফোন রাখিয়া দিলেন।

কুবেরের সহিত রাবণ যখন ফোনে আলাপ করিতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই রাজবাড়ীর সামনে বেশ একটী ছোটখাট দৃশ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাস্তা দিয়া এক ক্ষ্যাপাটে চেহারার বুড়া রাক্ষস চোখ দুইটীকে ছানাবড়ার মত করিয়া সাম্‌নের দিকে অনির্দ্দিষ্ট ভাবে হাঁটিয়া চলিয়াছে আর তার পেছনে একদল রাক্ষস-বালক হাত তালি দিতে দিতে, কখনো তার গায়ে ধূলা ছিটাইয়া, কখনো তার লেজ টানিয়া, কখনো বা তার মাথায় চাঁটি মারিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। তা বালকদের ইহাতে বড় বেশী দোষ নাই—যে চেহারা লইয়া বুড়া রাক্ষসটী রাস্তায় বাহির হইয়াছে তাহাতে ছেলে তো ছেলে, সুসভ্য রাক্ষসদের দেশ না হইয়া অন্য দেশ হইলে বড়র দল পর্য্যন্ত তার পিছনে লাগিত। বুড়ার সমস্ত মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, হাতের দু'মুঠায় গুটি দশ বারো মরা জানোয়ার, তাদের টুঁটি কামড়াইয়া সে যে রক্ত চুষিয়া লইয়াছে এখন পর্য্যন্ত তার দুই কষে সে রক্তের সুস্পষ্ট দাগ। পরণে যে জিনিষটী সেটী দেখিলে শিশুও আঁৎকাইয়া উঠিবে। রাবণ টেবিলের উপর ফোন্‌ নামাইয়া রাখিতেই সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়িল, মনে হইল তিনি যেন একটু চম্‌কাইয়া উঠিলেন। টি-পয়ের উপর হইতে তাড়াতাড়ি বাইনাকুলারটী চোখে লাগাইয়া সে দিকে তিনি তাকাইলেন, ধীরে ধীরে সমস্ত মুখখানা তাঁর অপূর্ব্ব আনন্দে ভরিয়া উঠিল। বেহারাকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সেই 'জংলী' রাক্ষসটীকে তাঁর সম্মুখে আনিয়া হাজির করিতে আদেশ দিলেন।

জংলী-রাক্ষস ঘরে আসিয়া ঢুকিল—বেশ একটু ভয় ভয় ভাবেই। প্রথমটা দাড়ি-গোঁফ্‌-কামানো চশমা আঁটা রাবণকে সে ঠিক চিনিয়া উঠিতে পারিল না, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে একেবারে পরম ভক্তিভরে তাঁর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল।

বুড়ার নাম বিকট-কটাহ। কেনই বা রাবণ তাকে ডাকাইলেন, আর সে-ই বা কেন অমন উচ্ছ্বসিত ভাবে তাঁর পায়ে পড়িয়া গড় করিল সেটী বুঝিতে হইলে কয়েক লক্ষ বছর আগেকার ঘটনা স্মরণ করিতে হইবে। সে সময়ে এই বিকট-কটাহই,

ছিল রাবণ রাজার পাক-শালার চার্জ্জে। সে যে শুধু রান্নাই করিত অতি চমৎকার, তাই নয়, তার আরো এমন একটা গুণ ছিল যার ফলে রাবণ রাজার প্রত্যহ অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত। কী সে গুণটী বলিতেছি।

সে সময় রাক্ষসদের মধ্যে একটা নিয়মের চল্‌তি ছিল—গোঁফ্ গজাইবার আগে প্রায় সকলেই গিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিত। ব্রহ্মা সাদাসিধা 'ভাল-মানুষ', ছুটী খোসামুদে মিষ্টি কথা শুনিয়াই একেবারে গলিয়া যাইতেন, কাছে গিয়া বলিতেন, "বৎস, কি চাই তোমার ?" ব্রহ্মার হাতে অনেকখানি ক্ষমতা, রাক্ষসেরা তাই সুযোগ পাইয়া বলিত, আমায় 'অমর' করিয়া দেওয়া হউক, আমায় দিগ্বিজয়ী করিয়া দেওয়া হউক—ইত্যাদি। চক্ষু লজ্জায় পড়িয়া ব্রহ্মা প্রায়ই রাজী হইয়া যাইতেন। তার পর সুরু হইত রাক্ষসদের প্রতাপ।

বিকট-কটাহও ছোকরা-বয়সে ব্রহ্মাকে খুসী করিয়া বর চাহিয়াছিল—যখন যে খাবার জিনিষ সে যতখানি চাহিবে তখনই 'যেন সে জিনিষ ঠিক ততখানিই তার সাম্‌নে আসিয়া উপস্থিত হয়। ব্রহ্মা 'তথাস্তু' বলিয়া ফেলিয়াছিলেন আর কি, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে ইন্দ্রের নন্দন-বাগানের মালী ছুটিয়া আসিয়া ঘোরতর আপত্তি জানাইল, কহিল, ওরূপ সর্ব্বনেশে বর দিলে দেবরাজের বাগানের একটী ফুলকপি, বাঁধাকপি বা শালগম্‌ও বিক্রী হইবে না, বাগান নির্ঘাৎ ফেল পড়িবে। ব্রহ্মা তখন ছুইজনকেই খুসী করিবার জন্য বিকট-কটাহকে বলিলেন, "আচ্ছা বাপু, তোমাকে একটা মন্ত্র দিতেছি, পাঁচ ঘণ্টা এই মন্ত্র জপিলে তুমি যাহা চাহিতেছ তাহাই হইবে।" মালীকে কাণে কাণে বলিলেন, "ও বেটা রাক্ষস, পাঁচ ঘণ্টা ধরিয়া দেবতার নাম জপা উহার ধৈর্য্যে কুলাইলে তো!"

কথাটা পাঁচ কাণ হইতে হইতে শেষে রাবণের কাণে উঠিল, অমনি তিনি টাকা বাঁচাইবার ফন্দি মনে মনে আঁটিয়া বিকট-কটাহকে ডাকিয়া আনিয়া হেড্ বাবুর্চ্চির পদ দিলেন। বিকট-কটাহের চাক্‌রী হইল বটে, কিন্তু সেই যে ইন্দ্রের মালীর উপর সে চটিয়াছিল, সে রাগ আর তার গেল না। একদিন তাই সুযোগ পাইয়া মালীর পোকে ধরিয়া সে 'ফলার' করিতে যাইতেছিল, কিন্তু দেবরাজ টের পাইয়া দারুণ চটিয়া গেলেন, শাপ দিলেন,—যা বেটা তুই পাথর হইয়া পড়িয়া থাক্।

রাক্ষস তখন খুব একচোট্ কাঁদা-কাটি করিল, দেখিয়া ইন্দ্রের রাগও পড়িয়া আসিল; তিনি বলিলেন—আচ্ছা যা, যা, তোদের যুবরাজ মেঘনাদ যদি কোন দিন আমাকে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় হারাইতে পারে তবে তোর শাপ-মুক্তি হইবে। সেই হইতে আজ এত যুগ ধরিয়া বেচারা অচেতন পাথর হইয়া পড়িয়াছিল, এখন টেনিস্ খেলায় ইন্দ্রের হার হওয়ায় সে আবার রাক্ষস-দেহ ফিরিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়া বিকট-কটাহের অবস্থা হইল বাস্তবিকই সঙ্গীন। সে তো আর জানে না যে তাদের সেকেলে বর্ব্বর রাক্ষস জাতি এখন কতটা সুসভ্য হইয়াছে! রাস্তায় ট্রাম-বাসের হুড়াহুড়ি, মোটরের ভোঁ ভোঁ, বাইকের ক্রিং ক্রিং— বেচারা প্রায় আবার পাথর হইবার উপক্রম। ঠিক এই সময়েই রাবণ আর্দ্দালী পাঠাইয়া তাকে ডাকাইলেন।

রাবণ বলিলেন, "বড়ই সুসময়ে তোমার দেখা পেলাম বিকট-কটাহ! কাল আমি খুব বড় একটা ভোজ দিচ্ছি—ছুনিয়ার অনেক লোক আস্‌বে। রান্না ঘরের ভার নিতে হবে কিন্তু তোমাকে—অবশ্যি বিনি খরচায় চালাতে হবে।"

বিকট-কটাহ ঠিক বুঝিতে পারিল না; রাজা বলিতেছেন—অনেক 'লোক' আসিবে তবে আর খাইবার জিনিষের অভাব কি, তাদের ধরিয়া পেটে পূরিলেই তো হইল। রাবণ হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন, সে দিন-কাল এখন আর নাই, এখন ত্রিভুবনের মানুষ-রাক্ষস-দেবতা-যক্ষ-কিন্নর-বানর সব বন্ধুভাবে বাস করিতেছে। বুড়া বিকট-কটাহ অবশ্য রাজী হইল, তবে খুব খুসী হইয়া নয়। মানুষ আর বানর এই ছুইটীই হইল তার প্রিয় খাদ্য—খাদ্যের সঙ্গে আবার বন্ধুতা কি ?

পরের দিন ভোজ। লঙ্কানগরীতে যেন হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। রাজকর্ম্মচারী রাক্ষসদের আর মরিবার ফুরসুৎ নাই—তারা বিড়ি-মুখে একবার আসিতেছে রাজবাড়ী, আর একবার যাইতেছে সমুদ্রের ধারে যেখানে সুবিশাল সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। বেলা নাগাদ সাড়ে বারোটার সময় রাবণ বিকট-কটাহকে লইয়া রান্না ঘরে ঢুকিলেন, বলিলেন, "এইবার তবে বিকট-কটাহ তুমি জপে বসে পড়। ঠিক ছ'টার সময় ভোজ আরম্ভ হবে, তার আগেই তোমার সমস্ত সেরে ফেলা চাই।"

"ছ'টার সময়" কথাটা বিকট-কটাহ বুঝিতে পারিল না, বলিল, "মোটে ছ'টা কি, অন্ততঃ ছ'শো'টা জিনিষ না হলে কি রাবণ-রাজার ভোজ মানায়!" রাবণ হাসিয়া বলিলেন, "ছ'টা পদের কথা হচ্ছে না, ঘড়িতে ছ'টা বাজ্‌বার কথা হচ্ছে।" রান্না ঘরে একটা প্রকাণ্ড সেট্ টমাসের ঘড়ি ছিল, সেটার কাছে গিয়া রাবণ ব্যাপারটা সংক্ষেপে তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন, "এই কাঁটা দুটো দেখ্‌ছ, এ দুটো ক্রমাগত ঘুর্‌ছে। ছোট কাঁটাটা এখানে (বলিয়া তিনি ছয়ের অঙ্কটা দেখাইয়া দিলেন) আর বড় কাঁটাটা এই জায়গায় (সঙ্গে সঙ্গে বারোর অঙ্কে হাত দিলেন) এলেই ছটা বাজা হল। ও দুটো ওখানে যাবার আগেই তোমার কাজ সার্‌তে হবে; কাজেই এখুনই তুমি জপে বস। খাবার জিনিষের লিষ্টি এই রইল, জপ সারা হলে এগুলো পড়ে পড়ে জিনিষ আমদানী কর্‌বে।"

বিকট-কটাহ ব্যাপার সমস্ত বুঝিয়া লইয়া বলিল, "আমি তবে এবার ভেতর থেকে দরজা এঁটে জপে বসি। দরজা-জান্‌লা খোলা থাক্‌লে আর আমার জপ সারা হবে না। রাস্তা দিয়ে মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে দেখ্‌লেই আমার সব মন্ত্র গুলিয়ে যাবে—ইচ্ছে হবে ছুটে গিয়ে ওগুলোকে টপাটপ্ গালে পূরি।"

রাবণ হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তবে দরজা-জানালা এঁটেই বস।"

বেলা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত সমুদ্র-তীরের বিরাট্ সামিয়ানা একেবারে শূন্য। নিমন্ত্রিতেরা সকলেই কাজের লোক, ফলার মারিবার জন্য কেউ তো আর আধ ঘণ্টা আগে আসিয়া আড্ডা জমাইতে পারে না! পৌণে ছ'টা বাজিবার পরেই কিন্তু লঙ্কার আকাশ একেবারে অন্ধকার হইয়া গেল, ঝাঁকে ঝাঁকে এরোপ্লেন, জেপেলিন মাথার উপর উড়িতে লাগিল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই নিমন্ত্রিত জনগণে সামিয়ানা ভরিয়া গেল। স্বর্গ-মর্ত্ত্য পাতালের চাঁইদের মধ্যে কেউই আর বাদ নাই—ইন্দ্র, কুবের, দুর্য্যোধন, বাসুকী, বলি, নারদ, কত নাম করিব? সকলেরই মুখে খুব ব্যস্ত ভাব। পরস্পর আলাপ পরিচয় করিতেছেন, আর মাঝে মাঝে ডাইরি খুলিয়া হাতের ঘড়ির দিকে তাকাইতেছেন। এখনো কার কত এন্‌গেজ্‌মেণ্ট্ সারা বাকী আছে প্রধানতঃ সেই কথাই চলিতেছে। রাবণ ও মেঘনাদ সহাস্যে সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ড্‌সেক্ করিতেছেন। ঘটন-চৌকশ আশ্বাস দিতেছে, 'পাংচুয়ালি' ছ'টার সময় সে সকলকে খাইবার সামিয়ানায় লইয়া যাইতে পারিবে।

ফটো তোলার কেরামতি

বল ত' কি?

পাশের ছবিটা দেখ, কি ভীষণ চেহারার শিং-ওয়ালা একটা জানোয়ার ঘাড় উঁচু করিয়া রাশভারী চালে বসিয়া আছে। আসলে কিন্তু এটি একটি বোল্‌তা, বড় করিয়া দেখান' হইয়াছে মাত্র। যে দু'টিকে শিং বলিয়া মনে হইতেছে সে দু'টি ওর দাঁড়া। ফটোগ্রাফারের বাহাদুরীতেই এমনটা হইয়াছে।

ডাক্তারের 'ফি'

ডাক্তারেরা রোগী দেখিতে আসিলে তাঁকে দর্শনী বাবদ টাকা দিতে হয় বলিয়াই আমরা জানি —কিন্তু অমন যে সুসভ্য দেশ আমেরিকা, সেখানকার অনেক পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারকে কি 'ফি' দেওয়া হয় জান? হাঁস, মুর্গী, ডিম, রুটী, ফল, শস্য ইত্যাদি। এমন কি সেখানকার একটি কলেজে পর্য্যন্ত ছেলেদের মাহিনা বাবদ টাকার বদলে গম লওয়ার নিয়ম আছে।

নূতন ফিল্ম্-ক্যামেরা

বায়স্কোপের ছবি তুলিবার জন্য যে সব ক্যামেরা ব্যবহার করা হয় তা'তে সেকেণ্ডে কয়েক শ' ফটো তোলা যায়। কিন্তু সম্প্রতি একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটা নূতন ধরণের ক্যামেরা বাহির করিয়াছেন; ইহার সাহায্যে প্রত্যেক সেকেণ্ডে দু' হাজারেরও বেশী ফটো তোলা যাইবে।

'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস্‌'

জন্‌ বেনিয়ানের লেখা 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রগ্রেস্‌' বইটার নাম তোমরা অনেকে শুনিয়া থাকিবে। ইংরাজী ভাষায় এটি একটা খুব নাম-করা বই। বইটা নানা দেশে কি রকম আদর পাইয়াছে তার নমুনা—এ পর্য্যন্ত এক শ' ছাব্বিশটা বিভিন্ন ভাষায় বইটার অনুবাদ করা হইয়াছে।

খবরের কাগজের কাটতি

ইংলণ্ডে প্রত্যেক সপ্তাহে তের কোটি আশী লক্ষ দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজ ছাপা হয়। মাসিক পত্রিকা ছাপা হয় পাঁচ কোটি। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—সেখানে সপ্তাহে কুড়ি কোটি কাগজ বিলি হয়।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

অল্প কয়েক দিন হইল বাংলা দেশের কত বড় একজন বিদ্বান্‌ লোক চলিয়া গিয়াছেন সে খবর তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়াছ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা বলিতেছি।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

হরপ্রসাদের মত পণ্ডিত লোক এ যুগে খুব কমই জন্মিয়াছিলেন। একাধারে তিনি ছিলেন সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, বহু-ভাষাবিদ্‌ ও সুরসিক। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির তিনি ফেলো ছিলেন, বঙ্গীয় এসিয়াটিক্‌ সোসাইটির তিনি ছিলেন সভাপতি, আর বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ত' তিনি এক রকম প্রাণ ছিলেন বলিলেও বেশী বলা হয় না। সেখানকার তিনি শুধু স্থায়ী সভাপতিই ছিলেন না, সাহিত্য-সম্মিলনেও তিনি কয়েক বার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

সামান্য হেড্‌ পণ্ডিত হইতে জীবন আরম্ভ করিয়া কেবল মাত্র নিজ প্রতিভায় তিনি যশের উচ্চস্তরে উঠিয়াছিলেন। তাঁর আসন কবে পূর্ণ হইবে কে জানে?

দ্রষ্টব্য—রামধনু পুরস্কার-প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী সংখ্যায় বাহির হইবে।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

রেকাবিতে ৮১টি পান ছিল।

উত্তরদাতাদের নাম

নিখিলনাথ চট্টোপাধ্যায় (ভবানীপুর), সুবোধ, অপর্ণা, প্রবোধ এণা (কলিকাতা), যশোমাধব সাহিত্য-সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দ (ধামরাই, ঢাকা), পীণ্টু, কালু, বকু ও শক্তি নাগ (ঢাকা), অনাথবন্ধু শীল (গিরিডি), অজয়কুমার দাস (বালিগঞ্জ), সুকুমার ঘটক ও করুণাপ্রসাদ চৌধুরী (বেড়া, পাবনা), কালীপদ, ভবেশ, রেবতী, ধীরেন্দ্র (তাহিরপুর), শিশির, রমা ও ইন্দিরা (কলিকাতা), সুনির্ম্মলচন্দ্র দত্ত (শিলচর), গৌরীরাণী ঘোষ (ভোলা), ললিতমোহন কুণ্ডু (রামরাজতলা), রমলারাণী বসু (টালিগঞ্জ, কলিকাতা), সুকুমার পালিত (পাটনা), রমেন্দ্রনাথ চৌধুরী (মেদিনীপুর), রমারাণী দেবী (শ্রীরামপুর), দীনবন্ধুপ্রসাদ মিত্র (বেনারস), অলকা সেন (সেনহাটী, খুলনা), দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায় (পাটনা), অমিয়কুমার সেন (কুমিল্লা), রাধিকা, সরোজ, সত্যাংশু ও সুধাংশু (মালেয়াড়া), কালিপদ, সাহাদাৎ, জাফর, ছফের, রাধাকান্ত (চিলমারি), অরুণকুমার ঘোষ (আসানসোল), অরুণকুমার সেন (টালিগঞ্জ, কলিকাতা), কৃষ্ণ, কুঞ্জ, কমল, লাবণ্য, বেলা (কলিকাতা), অতীন্দ্রনাথ পাল (কলিকাতা), দীনেন, রথীন, গুণেন, রণেন (ইটালি, কলিকাতা), ইন্দুবিকাশ দত্ত, চোক্ষা, বিমল, অমিয়, নীলু, শান্তি (শিবসাগর), পুষ্পলতা গোস্বামী (বেতিয়া), উষাময়ী, নিশাময়ী, সন্ধ্যাময়ী, সন্তোষ, পরিতোষ ঘোষাল (গাজিপুর), মনীষা সেন (গৌহাটী), সূর্য্য গাইন, রবীন্দ্র, বরেন্দ্র, সুরেন, কুমুদ, কনকলতা, নিরুপমা, মদন (দত্তডাঙ্গা, খুলনা), বীরেন, বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী (গাউপাড়া), কোমলতা বসু, সমরেন্দ্র, যশোদা, কাণ্টু, গৌরী, নন্তু, কুমুদ (রামপুরহাট), বাদল (নাগপুর), নরেশ, বৈদ্যনাথ, ট্যার, হাবোল, বুলু, সরোজিনী পাঁড়ে, হেমন্ত দেব্যা, নরেশ চাকী (কুমারপুর, রাজসাহী), মায়াদেবী মুখোপাধ্যায় (ফয়জাবাদ), শক্তিপ্রসাদ গর্গ (কলিকাতা), রণেশকুমার গুপ্ত (জামসেদপুর), সমরেন্দ্র, শ্যামসুন্দর, সলিল, রামদাস, কালিদাস, ভবেশ ও সন্তোষ (করিমগঞ্জ), বিষ্ণুসাধন মিত্র (বাগের হাট), উমা, তোতা, গোরা, বিশু ও মাষ্টার মহাশয় (কাটিহার), নিত্যানন্দ ঘোষাল (আকিয়াব), সুনীল, রেণু, মলিনা, বাণী গোস্বামী (পাটনা), রণজিৎ, রামরতি, পান্না, নিভা, সুধা, নীহার, ধাপু, রাণু ও নির্ম্মলা দেবী (মনোহরপুকুর, কলিকাতা), অমর, প্রভা, সরোজ, পুষ্প, অরুণ, প্রতিমা, নিটু, মতি, সুনু, খোকা, শৈলেশ, ননী, অজিত, নিখিল, বরকা, চাঁদু (ময়মনসিংহ), জ্ঞানশঙ্কর, তারাশঙ্কর, গিরিজা (বাঁকুড়া)।

নূতন ধাঁধা

(১)

(ক) কোন্‌ সহর দেখতে কালো?
(খ) কোন্‌ জায়গায় গেলে কিছু মনে রাখতে পারা যায় না?
(গ) কোন্‌ জায়গা গৃহ-হীন?

কুমারী অনুপমা লাহিড়ী।
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

(২)

(ক) কোন্‌ নদীর শেষের একটু বাদ দিলে ফুল হয়?
(খ) কোন্‌ নদীর শেষের একটু বাদ দিলে দেবতা হবে?
(গ) কোন্‌ সহরের শেষের একটু বাদ দিলে বাকীটা বাজায়?

শ্রী———।

(৩)

প্রথমে এল দানব, তার পর এল মন, তার পর এল এক পশু—অমনি ভেল্কী বাজীর মত দেখলাম বাংলার এক মস্ত সহরে এসে পড়েছি। কেমন ক'রে বল ত ?

শ্রীমতী গৌরীরাণী ঘোষ।

(৪)

আমি একবার শিকার করিতে গিয়া কেবল ঘুঘু আর খরগোস মারিলাম। শেষে গণিয়া দেখিলাম—আমার কাছে ৪০টা মাথা আর ৯৬টা পা আছে। বল তো আমি ক'টা খরগোস ও ক'টা ঘুঘু মারিয়াছিলাম ?

শ্রীইন্দুবিকাশ দত্ত।

আগামী বছরের রামধনু

এই পৌষ সংখ্যায় রামধনুর চতুর্থ বর্ষ শেষ হইল। আগামী মাঘ মাস হইতে ৫ম বর্ষ আরম্ভ হইবে। গ্রাহকগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া **২৪শে পৌষের মধ্যে** মণি-অর্ডারে বার্ষিক মূল্য ২৷৵০ পাঠাইয়া দেন তবে তাঁদের পক্ষে এবং আমাদের পক্ষে সব দিক্ দিয়াই সুবিধা। ভিঃ পিঃ তে কাগজ পাইতে অনেক দেরী হয় বলিয়া তাঁদের আর তা' হইলে অনুযোগ করিতে হয় না; তা' ছাড়া এ বছর আবার ভিঃপিঃর মাশুল অন্যান্য বছর হইতে বাড়িয়াছে। এ বছর ভিঃ পিঃ তে ২৵০ লাগিবে। কোনও বিশেষ কারণে যদি কাহারও রামধনু লইতে অনিচ্ছা থাকে তবে তিনি যেন **২৪শে পৌষের মধ্যে** আমাদের তা' জানান। ঐ তারিখের মধ্যে চিঠি না পাইলে আমরা পত্রিকা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইব। সে ভিঃ পিঃ ফিরিয়া আসিলে আমাদের মিছামিছি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাতে ত' আর গ্রাহকদের লাভ নাই !

আগামী বছরের রামধনু যাতে পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আরও নূতন নূতন বৈশিষ্ট্য দেখাইতে পারে সেজন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি। আগামী বছরে একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখা একখানা ধারাবাহিক ছেলেমেয়েদের উপন্যাস রামধনুতে বাহির হইবে। রামধনু-সম্পাদকের লেখা গল্পও আগেকার চাইতে আরও ঘন ঘন বাহির হইবে, অন্যান্য নানা বিষয়ের রচনার সংখ্যা আরও বাড়ান, হইবে। তা' ছাড়া ভাবীসাহিত্যিকের বৈঠক, পুরস্কার-প্রতিযোগিতা ইত্যাদি ত' আছেই।

কার্য্যাধ্যক্ষ—**রামধনু।**